যোগসমন্বয়

(পূর্বার্ধ)

The Synthesis of Yoga

(Parts I-II)

শ্রীঅরবিন্দ
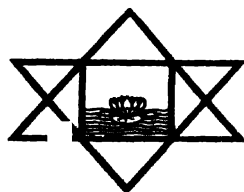
শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি

কলিকাতা : পণ্ডিচেরী—২

প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পণ্ডিচেরী-২

শতবার্ষিকী সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৭৩

মুদ্রক : অল ইণ্ডিয়া প্রেস
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী-১

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যায়				পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীঅরবিন্দ

যোগসমন্বয়

"সমগ্র জীবনই যোগ"

ভূমিকা

সমন্বয়ের শর্তাবলী

১

জীবন ও যোগ

মানুষের যে সব কাজ সাধারণ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা যে সবের লক্ষ্য অনন্যসাধারণ লোক ও সার্থকতা অর্থাৎ আমাদের ধারণায় ঊর্ধ্বে ও ভগবানের দিকে—এই সকল প্রকার কাজেরই বড় বড় রূপগুলির মধ্যে দেখা যায় যে প্রকৃতির কর্মপ্রণালীর দুইটি রীতি সর্বদাই সক্রিয়। প্রতি বিভিন্ন রূপের প্রবণতা হল অন্য অনেকের সংগে মিশে একটি সুষম সমষ্টি গড়ে তোলা; আবার এই সমষ্টিও ভেঙে গিয়ে তা থেকে বাহির হয়ে আসে বিশেষ বিশেষ শক্তি ও প্রবণতার বিভিন্ন ধারা, কিন্তু এরাও আবার মিলিত হয় এক বৃহত্তর ও বলবত্তর সমন্বয়ে। দ্বিতীয়তঃ, যদিও কার্যকরী অভিব্যক্তির এক অত্যাবশ্যকীয় নিয়ম হল রূপগঠন, তবু সত্য ও সাধনাকে বিধিব্যবস্থার কঠোর কাঠামোর মধ্যে বেঁধে রাখলে তারা জীর্ণ হয়ে পড়ে এবং তাদের সব না হ'ক অধিকাংশ গুণই নষ্ট হয়। এদের নবজীবনের জন্য দরকার তাদের নব প্রাণধারায় সঞ্জীবিত করা যাতে মৃত বা মুমূর্ষু বাহনগুলি প্রাণবন্ত হয়ে রূপান্তরিত হতে পারে। নিরন্তর পুনর্জন্ম গ্রহণই জড়ীয় অমরত্বের শর্ত। বর্তমান যুগ নবজন্মসম্ভাবনার যন্ত্রণায় পূর্ণ; চিন্তা ও কার্যের যে সব রূপগুলির মধ্যে কার্যকারিতার বিশেষ শক্তি বা স্থায়িত্বের গূঢ়গুণ বর্তমান তারা চরম পরীক্ষাধীন; তাদের পুনর্জন্মের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আজকার জগৎ যেন মায়াবিনীর এক বিরাট কটাহ যেখানে সব কিছুকেই ফেলে, কেটে টুকরো টুকরো ক'রে, পরীক্ষা করে, মিশিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা হচ্ছে; হয় তারা ধ্বংস হবে ও তাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে গড়ে উঠবে নতুন রূপ, নয় তারা নব প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে পরিবর্তিত হবে নতুন করে আবার এক পর্ব থাকার জন্য। ভারতীয় যোগের সার এই যে ইহা প্রকৃতির কতগুলি বড় শক্তির বিশেষ ক্রিয়া বা বিধিব্যবস্থা; তারও মধ্যে কত ভাগ, কত ধারা, কত পদ্ধতি; আর মানবজাতির ভবিষ্য জীবনের অন্যতম সক্রিয় উপাদান হবার যোগ্যতা ইহাতে বর্তমান। কোন স্মরণাতীত কালে ইহার উৎপত্তি, আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইহা টিঁকে রয়েছে তার প্রাণশক্তি ও সত্যের বলে; এতদিন ইহা আশ্রয় নিয়েছিল মরমীয়া সম্প্রদায় ও তপস্বীর আশ্রমে, এখন আবার ইহা বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে যাতে ইহা হতে পারে মানবের ভবিষ্য জীবন্ত শক্তি ও প্রয়োজনের অন্যতম। কিন্তু ইহার প্রথম দরকার নিজের পুনরাবিষ্কার,

প্রকৃতির যে সর্বজনীন সত্য ও বিরামহীন লক্ষ্যের প্রতিরূপ ইহা, তার মধ্যে ইহার অস্তিত্বের গভীরতম অর্থ উদ্ঘাটন এবং এই নতুন আত্মজ্ঞান ও আত্ম-মূল্যায়নের বলে নিজের পুনর্লব্ধ বৃহত্তর সমন্বয় সন্ধান। নতুন ভাবে গঠিত হলে ইহা জাতির নবগঠিত জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে আরো অনায়াসে ও জোরালো হয়ে, কারণ এর প্রণালী জীবনকে নিয়ে যেতে পারে তার নিজের সত্তার ও ব্যক্তিভাবনার অন্তরের গহনতম পুরে এবং ঊর্ধ্বে সর্বোচ্চ শিখরে।

জীবন ও যোগকে সঠিক দৃষ্টিতে দেখলে জানা যায় যে সচেতন ভাবেই হ'ক আর অবচেতনভাবেই হ'ক, সমগ্র জীবন এক যোগ। কারণ যোগ বলতে আমরা বুঝি এমন এক সুসংহত সাধনা যার লক্ষ্য হল আত্ম-সিদ্ধি. আর এই লক্ষ্য প্রাপ্তির উপায় হল সত্তার অন্তঃস্থিত সব সুপ্ত শক্তির বিকাশ এবং মানবে ও বিশ্বে আমরা যে বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত সত্তার আংশিক প্রকাশ দেখি তাঁর সহিত ব্যষ্টি মানবের মিলন। বাহ্যজীবনের পিছনে তাকালে আমরা দেখি যে সমগ্র জীবন প্রকৃতির এক বিরাট যোগ, কারণ তার প্রয়াস হল তার সব গূঢ় শক্তির সদা বর্ধমান বিকাশের মাধ্যমে স্বীয় সিদ্ধিলাভ ও স্বীয় দিব্যসত্তার সহিত মিলন সাধন। ক্ষিপ্রতা ও বীর্যের সহিত এই মহান উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রকৃতি এই পৃথিবীতে প্রথমে মনোময় মানুষের মাঝে কার্যের আত্ম-সচেতন উপায় ও সংকল্পিত ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—যোগকে বলা যায় এমন এক সংকুচিত উপায় যাতে এক দৈহিক জীবনের মধ্যেই বা কয়েক বৎসর বা কয়েক মাসের মধ্যেই নিজের ক্রম-বিকাশ সম্পূর্ণ করা যায়। প্রকৃতিমাতা তাঁর বিরাট ঊর্ধ্বগামী কর্মে বিভিন্ন সর্বজনীন পদ্ধতি অবলম্বন করে আসছেন, তবে তাঁর গতি মন্থর, প্রয়োগ শিথিল ও ব্যাপক, মনে হয় শক্তি ও উপাদানের প্রভূত অপচয় হচ্ছে, কিন্তু এতে সংহতি দৃঢ় হয়। সব যোগসাধনাই প্রকৃতির এই সব পদ্ধতির কোন না কোন অংশ বা তাদের সংকুচিত সমাহার যা প্রয়োগ করা হয় সংকীর্ণ রূপের মধ্যে, তবে আরো তীব্র ও প্রখরভাবে। একমাত্র যোগের এই তত্ত্বজ্ঞানই বিভিন্ন যোগপন্থার দৃঢ় ও যুক্তিযুক্ত সমন্বয় গঠনের ভিত্তি হতে পারে। কারণ তখন আর মনে হবে না যে যোগ রহস্যময় অপ্রাকৃত কিছু যা বিশ্বশক্তির সাধারণ ক্রিয়াপ্রণালীর সহিত সম্পর্কশূন্য; আবার প্রকৃতির প্রত্যক্ ও পরাক্ আত্ম-সার্থকতার দুই মহতী ধারার উদ্দেশ্যের সহিত যোগের যে কোন সম্বন্ধ নেই তাও মনে হবে না। বরং মনে হবে যে কম উন্নত কিন্তু আরো ব্যাপক ক্রিয়ায় প্রকৃতির যে সব শক্তি ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়েছে বা উত্তরোত্তর সংহত হচ্ছে সেই সব শক্তিরই প্রখর ও অসামান্য প্রয়োগ হল যোগ।

তড়িৎ ও বাষ্পের সাধারণ ক্রিয়ার সহিত তাদের প্রাকৃতিক শক্তির বৈজ্ঞানিক

ব্যবহারের যে সম্বন্ধ, মানুষের পরিচিত সাধারণ চিত্তবৃত্তিক্রিয়ার সহিত যৌগিক পদ্ধতিরও সেই সম্বন্ধ। নিয়মিত পরীক্ষা, ব্যবহারিক বিশ্লেষণ, নিয়তফলপ্রাপ্তির দ্বারা সমৃদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত জ্ঞানের উপরেই তাদের প্রতিষ্ঠা। যেমন রাজযোগের বেলায়, দেখা যায় যে আমাদের আন্তর উপাদান, সমবায়, ক্রিয়া, শক্তিগুলিকে পৃথক বা নিবৃত্ত করা সম্ভব বা সে সবকে ভিন্নভাবে মিলিয়ে এমন নতুন ভাবে প্রয়োগ করা যায় যা পূর্বে অসম্ভব ছিল বা নির্দিষ্ট আন্তর প্রণালী দ্বারা তাদের রূপান্তর ও নতুন ব্যাপক সমন্বয় গঠন সম্ভব। এই জ্ঞান ও অনুভূতির উপরেই রাজযোগ গড়ে উঠেছে। হঠযোগের ভিত্তি এইরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি: আমাদের সাধারণ জীবন যে সব প্রাণিক শক্তি ও ক্রিয়ার অধীন এবং যাদের সাধারণ ক্রিয়া পদ্ধতি মনে হয় নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য সে সবকে আয়ত্তে এনে তাদের ক্রিয়া পরিবর্তিত ও নিরুদ্ধ করে এমন ফল পাওয়া যায় যা অন্যথায় অসম্ভব এবং প্রণালীগুলির যুক্তিবত্তা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞের কাছে মনে হবে অলৌকিক। অবশ্য অন্য কিছু যোগ-পন্থায় এরূপ অসাধারণ ফল কম দেখা যায় কারণ এসব আরো বোধিময় ও কম যান্ত্রিক এবং ইহারা ভক্তিযোগের মত পরমতম উল্লাস বা জ্ঞানযোগের মত চেতনা ও সত্তার পরমতম আনন্ত্যের অধিকতর নিকটবর্তী। তবু ইহাদেরও আরম্ভ আমাদের কোন না কোন প্রধান আন্তর শক্তির প্রয়োগ থেকে তবে এমন উপায়ে ও এমন উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার করা হয় যা ইহার প্রাত্যহিক স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার পক্ষে অভাবনীয়। "যোগ" এই সাধারণ নামে পরিচিত সব বিভিন্ন পদ্ধতি কতকগুলি বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক প্রণালী: প্রকৃতির নির্দিষ্ট সত্যের উপর এদের প্রতিষ্ঠা এবং যে সব সাধারণ বৃত্তি, শক্তি ও ফল সর্বদাই গূঢ় ছিল কিন্তু সাধারণ ক্রিয়ায় যাদের সহজে বা প্রায়শঃ প্রকাশ হয় না সে সব থেকেই এদের অভ্যুদয়।

জড়বিজ্ঞানের বেলায় দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বাহুল্যের অসুবিধা অনেক; যেমন, এতে এমন এক বিজয়ী কৃত্রিমতা বেড়ে ওঠার প্রবণতা থাকে যাতে যন্ত্রের চাপে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অভিভূত হয়, আর কোন কোন ধরনের স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব পাবার জন্য আমরা ক্রমশঃ অনেক কিছুর দাস হয়ে পড়ি। সেরূপ যৌগিক প্রণালী ও তাদের অসামান্য ফলে তন্ময় হয়ে থাকারও অসুবিধা ও ক্ষতি অনেক। যোগীর ঝোঁক জন-জীবন থেকে সরে যাওয়া; এর ফল এই জীবনের উপর প্রভাবনাশ। অধ্যাত্ম সম্পদ ক্রয়ের জন্য সে মূল্য দিতে চায় মানবীয় ক্রিয়ার রিক্ততায়, আন্তর মুক্তির মূল্য দেয় বহির্মৃত্যুতে। সে ভগবান পায় তো জীবন হারায়, আবার জীবন জয়ের চেষ্টা ক'রলে ভগবান হারাবার আশংকা আসে। তাই দেখি, ভারতবর্ষে সাংসারিক জীবন এবং অধ্যাত্ম শ্রীবৃদ্ধি ও সিদ্ধির মাঝে তীব্র

অসঙ্গতি। যদিও আন্তর আকর্ষণ ও বাহিরের দাবীর মধ্যে এক বিজয়ী সমন্বয়ের আদর্শ ও ঐতিহ্য এখনও বর্তমান কিন্তু কার্যতঃ তার কিছু নেই। বস্তুতঃ কোন মানুষ অন্তরের দিকে তার দৃষ্টি ও শক্তি ফিরিয়ে যোগের পথে এলে ধরে নেওয়া হয় যে সমষ্টি জীবনের মহাস্রোত এবং মানবজাতির ঐহিক কার্য থেকে তার বিদায় অনিবার্য। এই ধারণা এত প্রবল এবং প্রচলিত দর্শন ও ধর্মে এর উপর এত জোর দেওয়া হয়েছে যে সাধারণতঃ মনে করা হয় যে জীবন থেকে পলায়ন শুধু যে যোগের পক্ষে অপরিহার্য তা নয়, ইহা যোগের সাধারণ উদ্দেশ্যও বটে। মুক্ত ও সিদ্ধ মানবজীবনে ভগবান ও প্রকৃতির পুনর্মিলন সাধন যে যোগসমন্বয়ের উদ্দেশ্য নয় বা যার পদ্ধতি এমন যাতে আমাদের আন্তর এবং বাহ্য কর্ম ও অভিজ্ঞতাগুলিকে তাদের দুয়েরই দিব্য পূর্ণতার মধ্যে সুসংগত করার অনুমতি ও উপরন্তু অনুমোদন নেই—এমন কোন যোগসমন্বয়ই সন্তোষজনক হতে পারেনা। মানুষ হল এই জড় জগতে অবতীর্ণ এক উচ্চতর সত্তার ঠিক সেই সংজ্ঞা ও প্রতীক যাতে নিম্নের পক্ষে নিজেকে রূপান্তরিত করে ঊর্ধ্বের ধর্মলাভ এবং নিম্নের রূপে ঊর্ধ্বের আত্মপ্রকাশ সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য তাকে যে জীবন দেওয়া হয়েছে তা এড়িয়ে যাওয়া কখনই তার পরম সাধনার বা আত্ম-সার্থকতার বলবত্তম উপায়ের অপরিহার্য সর্ত বা সমগ্র ও চরম উদ্দেশ্য হতে পারে না। শুধু কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে এর আবশ্যকতা থাকতে পারে বা ইহা মানবজাতির মহত্তর সাধারণ সম্ভাবনার প্রস্তুতির জন্য ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ আত্যন্তিক সাধনা হতে পারে। প্রকৃতির অবচেতন যোগের মত যখন মানুষের সচেতন যোগ জীবনের সহিত বাহ্যতঃ সমপরিধি হয় তখনই যোগের সত্যকার পূর্ণ উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সিদ্ধ হয়; আর তখনই আমরা পথ ও সিদ্ধির পানে চেয়ে আর একবার, তবে আরো পূর্ণ ও দীপ্ত অর্থে বলতে পারি "সমগ্র জীবনই যোগ।"

২

প্রকৃতির তিনটী ক্রম

অতীতে যোগ যে ভাবে গড়ে উঠেছে তাতে আমরা দেখি বিচ্ছিন্নতা ও বিশেষীকরণের প্রবণতা। প্রকৃতির সব বিষয়েরই মত এরও ন্যায়সঙ্গত, এমন কি অত্যাবশ্যক দরকার ছিল। এর ফলে যে-সব বিশেষ উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে তাদের সমন্বয়-সাধন আমাদের উদ্দেশ্য। সুবিবেচনার সহিত এ-কাজ করার জন্য আমাদের প্রথম জানা দরকার এই বিচ্ছিন্নতার প্রবৃত্তির মূলে কি সাধারণ তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য নিহিত; দ্বিতীয়তঃ এক একটি যোগ-সম্প্রদায়ের পদ্ধতি কি বিশেষ উপকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাও জানা চাই। সাধারণ তত্ত্বের জন্য আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে প্রকৃতিরই বিশ্বব্যাপী কর্মপ্রণালীর মধ্যে; প্রকৃতিকে আমরা কুহকিনী মায়ার ছলনাপূর্ণ অলীক ক্রিয়া বলে স্বীকার না করে স্বীকার করব যে সে ভগবানেরই বিশ্বসত্তার বিশ্বশক্তি ও কর্মপ্রণালী যার বিধান ও অন্তঃপ্রেরণার উৎস হল এক বিরাট অনন্ত অথচ সূক্ষ্ম নির্ধারণী প্রজ্ঞা, গীতোক্ত "প্রজ্ঞা প্রসৃতা পুরাণী"—আদি থেকে সনাতন হতে উৎসারিত প্রজ্ঞা। বিশেষ বিশেষ উপকারিতাগুলি কী তা জানার জন্য দরকার বিভিন্ন যোগপদ্ধতির মর্মভেদী বিশ্লেষণ এবং তাদের খুঁটিনাটির স্তূপ থেকে তাদের উপাসিত নিয়ামক ভাবনা এবং সাধন-প্রণালীর উৎপত্তি ও প্রবেগের মৌলিক শক্তির নিরূপণ। এ হলে পর, যে সাধারণ তত্ত্ব ও সাধারণ শক্তি থেকে তাদের উৎপত্তি ও প্রবণতা, যার দিকে অবচেতন ভাবে তাদের গতি এবং সেই হেতু যার মধ্যে তাদের সকলের মিলন-সাধন সম্ভব—তাদের জানা সহজ হবে।

মানুষের মধ্যে প্রকৃতির উত্তরোত্তর আত্ম-অভিব্যক্তি, অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় অভিহিত বিবর্তন (evolution) তিনটি অত্যাবশ্যকীয় ক্রমিক অঙ্গের উপর নির্ভরশীল : (১) যা আগেই ব্যক্ত হয়েছে, (২) যা দৃঢ়ভাবে সচেতন অভিব্যক্তির অবস্থায় বর্তমান এবং (৩) যা ব্যক্ত হবে। তবে এই তৃতীয়টি হয়তো ইতিপূর্বেই প্রাথমিক গঠনে বা অন্য আরো উন্নত গঠনে বা এমন কি বিরল হলেও আমাদের বর্তমান মানবজাতির উচ্চতম সম্ভাব্য পরিণতির নিকটবর্তী যে সব গঠন, তাদের মধ্যেও, সর্বদা না হলেও মাঝে মাঝে বা কতকটা নিয়মিতভাবে, পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হয়ে থাকবে। কেন না, ধীর পদক্ষেপে যন্ত্রের মত বাঁধাধরা এগিয়ে চলা প্রকৃতির ধারা নয়। সে

সর্বদাই নিজেকে ছাড়িয়ে চলে, এমন কি এর জন্য পরে তাকে শোচনীয় ভাবে পিছু হটতে হলেও। মাঝে মাঝে সে ছুটে চলে হুড়মুড় করে, তার বহিঃ-বিস্ফোরণও হয় প্রচণ্ড ও চমকপ্রদ এবং উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় বিপুল পরিমাণে। আবার কখন কখন সে জোর করে স্বর্গরাজ্য ছিনিয়ে নেবার আশায় সামনের দিকে এগিয়ে চলে ঝড়ের মত প্রচণ্ড বেগে। তার মধ্যে যা পরম দিব্য বা চরম আসুরিক—তারই প্রকাশ এই সব স্বোত্তরণ; কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই এই স্বোত্তরণ তার লক্ষ্যের দিকে তাকে দ্রুত নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সব চেয়ে শক্তিশালী।

প্রকৃতি আমাদের জন্য যা ব্যক্ত করে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা আমাদের দৈহিক জীবন। জড় ও প্রাণশক্তি অবর হলেও এরা পৃথিবীতে আমাদের কার্য ও উন্নতির পথে সব চেয়ে প্রধান আবশ্যকীয় উপাদান; প্রকৃতি তাদের মধ্যে এক এক প্রকার মিলন ও সামঞ্জস্য এনেছে। অতিমাত্রায় অপার্থিব অধ্যাত্মবাদীর কাছে জড় হেয় হলেও ইহাই আমাদের সকল শক্তি ও সিদ্ধির ভিত্তি ও প্রাথমিক অবস্থা; আর প্রাণশক্তি জড়দেহে আমাদের জীবন ধারণের উপায় তো বটেই, এমন কি ইহা আমাদের মানসিক ও অধ্যাত্ম কর্মেরও বনিয়াদ। মানবজাতির মধ্যে উত্তরোত্তর প্রকাশমান দেবতার যোগ্য আবাস ও যন্ত্র যোগাবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতি জড়ের সতত চাঞ্চল্যের মাঝে সাফল্যের সহিত এমন এক প্রকার স্থিরতা সাধন করেছে যা যুগপৎ যথেষ্ট দৃঢ় ও স্থায়ী এবং যথেষ্ট নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। ইহাই ঐতরেয় উপনিষদের উপাখ্যানের তাৎপর্য। এতে বলা হয়েছে যে দিব্য আত্মা দেবতাদের কাছে একটির পর একটি যে-সব প্রাণী-দেহ আনলেন, দেবতারা সে-সব প্রত্যাখ্যান করলেন; কিন্তু যখন মানুষের দেহ আনা হল তখনই শুধু তাঁরা বলে উঠলেন [সুকৃতমেতৎ] "এর গঠন বেশ ভালই হয়েছে", আর তাঁরা তার মধ্যে প্রবেশ করতেও সম্মত হলেন। জড়ের নিশ্চেষ্টতা এবং সক্রিয় প্রাণ যা জড়ে বাস করে ও তা থেকেই পুষ্টি নেয় এবং যার জন্য শুধু যে জীবন-যাত্রা চলে তা নয়, মানসিকতারও পূর্ণতম শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব—এ দুয়ের মধ্যে প্রকৃতি এক কাজ-চলা মিলও এনেছে। এই সাম্য হল মানুষের মাঝে প্রকৃতির মৌলিক স্থায়ী অবস্থা এবং যোগের ভাষায় একে বলা হয় অন্নকোষ (উপাদান) ও প্রাণকোষ (নাড়ীতন্ত্র) সমন্বিত তার স্থূল শরীর।

এই অবর সাম্য যদি পরম বিশ্বশক্তির অভিপ্রেত পরতর গতিক্রিয়ার ভিত্তি ও প্রাথমিক উপায় হয়, যদি ইহা সেই আধার হয় যাতে ভগবান এখানে আত্ম-প্রকাশ করতে চান, ["শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং"]—"আমাদের প্রকৃতির ধর্ম পালনের জন্য এই দেহযন্ত্র দেওয়া হয়েছে"—এই ভারতীয় বচন যদি সত্য হয় তাহলে দৈহিকজীবন থেকে চরম নিবৃত্তির অর্থ দিব্য প্রজ্ঞার

পূর্ণতা থেকে ফিরে আসা এবং পার্থিব অভিব্যক্তিতে তার লক্ষ্য পরিহার করা। হয়তো কোন কোন লোকের পক্ষে তাদের বিকাশের গূঢ় বিধান অনুযায়ী এ রকম অস্বীকার সঠিক মনোভাব, কিন্তু ইহা কখনই মানবজাতির জন্য অভিপ্রেত লক্ষ্য হতে পারে না। সুতরাং যে-যোগে দেহকে উপেক্ষা করা হয় বা পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার জন্য এর ধ্বংস বা বর্জন অনিবার্য গণ্য করা হয় সে যোগ পূর্ণযোগ হতে পারে না। বরং দেহের পূর্ণতাসাধনই হওয়া উচিত পরম চিৎ-পুরুষের চরম বিজয়, আর দৈহিক জীবনকেও দিব্য করা, বিশ্বে ভগবদ্-কর্মের চরম উৎকর্ষ। অধ্যাত্ম পথে শরীর বাধা-স্বরূপ—শরীর বর্জনের পক্ষে এ কোন যুক্তিই নয়, কারণ সকল কিছুর অদৃশ্য ভগবদ্-বিধানে আমাদের বৃহত্তম বাধাসমূহ আমাদের মহত্তম সুযোগ। প্রবলতম বাধার মাঝে আছে প্রকৃতির এই ইঙ্গিত যে আমাদের সাধ্য হল এক পরম বিজয় অর্জন ও এক চরম সমস্যার সমাধান; কোন অমোচনীয় পাশ যা পরিহার করা চাই বা কোন অজেয় শত্রু যা থেকে পলায়ন করাই বিধেয়—ইহা সেরূপ কিছুর বিপদ্-সংকেত নয়।

সেরূপ দেহের মতই, আমাদের অন্তঃস্থ প্রাণ ও স্নায়ু শক্তিরও উপ-কারিতা প্রচুর। তারাও চায় আমাদের চরম সিদ্ধির মধ্যে তাদের সম্ভাবনার দিব্য সার্থকতা। বিশ্ব-ব্যবস্থার মাঝে এই অংগকে যে গুরুভার দেওয়া হয়েছে তার কথা উপনিষদের উদার জ্ঞানে বিশেষভাবে জোর করে বলা হয়েছে। "চক্রের নাভিতে সংলগ্ন অরসমূহের মত প্রাণে সব কিছুই প্রতিষ্ঠিত যথা ত্রিবিদ্যা, যজ্ঞ, সবলের তেজ (ক্ষত্র) ও জ্ঞানীর পবিত্রতা (ব্রহ্ম)"। "ত্রিদিবে এই যে সব প্রতিষ্ঠিত সে সমস্তই প্রাণের অধীন"*। সুতরাং যে-যোগে এই সব স্নায়ুশক্তি ধ্বংস, বা এ-সবকে জোর করে স্নায়ুহীন নিঃস্তব্ধ বা সকল কিছু অনিষ্টকর কাজের আকর বলে তাদের মূলোৎপাটন করা হয় সে যোগ পূর্ণ যোগ নয়। যে উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্যে তাদের সৃষ্টি ও বিকাশ তা হল তাদের শুদ্ধি; ধ্বংস নয়, তাদের রূপান্তর, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার।

যদি পরিণামধারায় প্রকৃতি আমাদের জন্য তার ভিত্তি ও প্রথম যন্ত্র হিসাবে দৈহিক জীবন দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছে, তবে তার অব্যবহিত পরবর্তী লক্ষ্য ও উন্নততর যন্ত্র হিসাবে সে ব্যক্ত করেছে আমাদের মনোময় জীবন। তার সাধারণ উন্নতির ক্রিয়ায় ইহাই তার উচ্চ একাগ্র চিন্তা। যখনই প্রাণের ও দেহের প্রাথমিক প্রাপ্তির শৃঙ্খল থেকে সে মুক্তি পায়, তখন সর্বদা ইহাই তার কাজ—অবশ্য অবসন্ন হয়ে কাজ থেকে নিবৃত্ত হবার পর যে সময় শক্তি

* প্রশ্ন উপনিষদ ২।৬, ১৩

পুনরুদ্ধারের জন্য সে তমসার মাঝে বিশ্রাম নেয় সে সময় বাদে। কারণ মানুষের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার গুরুত্ব অসাধারণ। তার মানসিকতা একটি নয়, ইহা দ্বিবিধ ও ত্রিবিধ—জড়গত স্নায়বিক মন, শুদ্ধ বুদ্ধিগত মন যা নিজেকে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে, এবং বুদ্ধির ঊর্ধ্বে দিব্যমন যা আবার ন্যায়ানুগ বিবেকী ও কল্পনাপ্রবণ যুক্তিবুদ্ধি থেকে নিজেকে মুক্ত করে মানুষের মন প্রথম দেহগত প্রাণের মধ্যে পাশবদ্ধ. অপর-পক্ষে উদ্ভিদের মধ্যে মন সম্পূর্ণ নিগৃহিত এবং প্রাণীদের মাঝে এ সর্বদাই অবরুদ্ধ। মানুষের মনের কাছে প্রাণ যে মানসিক ক্রিয়াসমূহের শুধু প্রাথমিক অবস্থা তা নয়, ইহা তার সমগ্র অবস্থা, আর সে ব্যস্ত প্রাণের সব প্রয়োজন মেটাতে যেন এই সবই জীবনের সমগ্র উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষের দৈহিক জীবন এক ভিত্তি; ইহা লক্ষ্য নয়, ইহা তার প্রাথমিক অবস্থা, তার চরম নির্ধারক নয়। পূর্বতনদের যথাযথ ধারণায় মানুষ মূলতঃ মননশীল, মনু অর্থাৎ মনোময় পুরুষ যে প্রাণ ও শরীরের নেতা; * সে এদের দ্বারা চালিত পশু নয়। সুতরাং সত্যকার মানবজীবন তখনই আরম্ভ হয় যখন বুদ্ধিপ্রধান মানসিকতা জড় থেকে বাহিরে আসে আর আমরা স্নায়বিক ও দেহের মোহাবেশ থেকে মুক্ত হয়ে উত্তরোত্তর বাস করতে শুরু করি মনে এবং সেই স্বাধীনতার মাপে সমর্থ হই দেহগত প্রাণকে যথাযথভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করতে। কারণ প্রভুত্বলাভের উপায়—স্বাধীনতা, কুশল অধীনতা নয়। বাধ্য না হয়ে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন অবস্থা—আমাদের দৈহিক সত্তার প্রসারিত ও ঊর্ধ্বায়িত বিভিন্ন অবস্থা গ্রহণ করাই মানবের উচ্চ আদর্শ।

এই ভাবে মানুষের মাঝে যে মনোময় জীবনের অভিব্যক্তি হচ্ছে তা বস্তুতঃ সকলের অধিকারে আসেনি। বাস্তব দৃষ্টিতে মনে হয় এ যেন কতক-গুলি ব্যক্তির মধ্যেই পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে, এবং অনেকের মধ্যেই, এমন কি অধিকাংশের মধ্যে ইহা হয় তাদের সাধারণ প্রকৃতির ক্ষুদ্র এবং মন্দগঠিত অংশ, নয় আদৌ বিকশিত হয়নি, অথবা সুপ্ত রয়েছে, সহজে তাদের সক্রিয় করা যায় না। একথা নিশ্চিত যে প্রকৃতির বিবর্তনে মনোময় জীবের বিকাশ এখনও অপূর্ণ; মানুষ-প্রাণীর মাঝে ইহা এখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইহার নিদর্শন এই যে প্রাণশক্তি ও জড়ের সূক্ষ্ম ও পূর্ণ সাম্য, এবং সুস্থ, সুগঠিত, দীর্ঘজীবী মানবদেহ সাধারণতঃ দেখা যায় সেই সব জাতি ও শ্রেণীর মাঝে যারা চিন্তাশক্তির শ্রম, বিশৃঙ্খলা ও আতান (tension) পরিহার করে বা শুধু জড়গত মন দিয়ে চিন্তা করে। সভ্য মানবের মাঝে পূর্ণ সক্রিয় মন ও দেহের সাম্য প্রতিষ্ঠা এখনও বাকী, এখনও ইহা স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত

---

* মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা—মুণ্ডক উপনিষদ, ২।২।৭

হয় নি। বাস্তবিকই মনোময় জীবনকে তীব্রতর করার দিকে যত চেষ্টা করা হয়, মনে হয় মানবদেহে তত বেশী বৈষম্য বৃদ্ধি পায়; এজন্যই বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের একথা বলা সম্ভব হয়েছে যে প্রতিভা এক প্রকার উন্মত্ততা, অপকর্ষের ফল, প্রকৃতির এক ব্যাধিগ্রস্ত রুগ্নাবস্থা। এই অতিরঞ্জনের অনুকূলে যে সব ঘটনার কথা বলা হয় সেগুলিকে পৃথক-পৃথক না নিয়ে অন্য সব প্রাসঙ্গিক তথ্যের সহিত নেওয়া হলে অন্য এক সত্যের সন্ধান মেলে। প্রতিভা হল বিশ্বশক্তির সেই প্রচেষ্টা যাতে আমাদের বিভিন্ন বুদ্ধিশক্তিকে এত প্রখর ও তীব্র করা হয় যে তারা বুদ্ধির ঊর্ধ্বকার মানস বা দিব্যমানসের ক্রিয়াস্বরূপ শক্তিশালী, মৌলিক ও ক্ষিপ্র বৃত্তিসমূহের উপযোগী হয়। ইহা যে প্রকৃতির খেয়াল বা ব্যাখ্যার অতীত কোন ঘটনা তা নয়, বরং প্রকৃতির বিবর্তনের সহিত সুসংগত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরবর্তী ক্রম। প্রকৃতি দেহগত জীবন ও জড়গত মনের মধ্যে সামঞ্জস্য এনেছে, এখন সে এই জীবন ও বুদ্ধিগত মানসিকতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে রত; কারণ এতে তার পূর্ণ পাশব ও প্রাণিক তেজ মন্দীভূত হওয়ার প্রবণতা এলেও, সক্রিয় কোন বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হয় না বা হবার কোন হেতুও নেই। আরো উচ্চতর স্তরে যাবার চেষ্টায় সে বর্তমানের সীমানা ছাড়িয়ে আরো ছুটে চলেছে। তা ছাড়া এই সব বিশৃঙ্খলাকে যত বড় করে চিত্রিত করা হয় তারা তত বড় নয়। অন্যগুলি হ'ল অবক্ষয়ের সরল সংশোধিত ক্রিয়া যা থেকে নতুন নতুন কার্যের উৎপত্তি হয়; যে সব সুদূরপ্রসারী ফল প্রকৃতির উদ্দেশ্য তাদের জন্য এ রকম স্বল্প মূল্য দিতেই হয়।

সকল অবস্থা বিবেচনা করে দেখলে আমরা হয়তো এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে মানুষের মাঝে মনোময় জীবনের আবির্ভাব সম্প্রতি কালের ঘটনা নয়, মানুষ আগে থেকেই এ পেয়েছিল, তবে মানবজাতির মধ্যস্থিত বিশ্ব-শক্তির যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে দুঃখজনক পশ্চাদপসরণ হয়, এ ক্ষেত্রেও তেমন হয়েছিল; এখন আবার ইহার দ্রুত পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। অসভ্য বর্বর হয়তো সভ্যমানুষের প্রথম পূর্বপুরুষ ততটা নয়, যত সে এক পূর্বসভ্যতার অধঃপতিত বংশধর। কারণ বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন সবার মাঝে সমভাবে না হলেও ইহার সামর্থ্য সর্বত্র বিস্তৃত। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আমরা যে জাতিগোষ্ঠীকে নিম্নতম মনে করি, যেমন মধ্য-আফ্রিকার চিরন্তন বর্বরতা থেকে সদ্য-আগত নিগ্রো, সেও প্রবল ইওরোপীয়র মত বুদ্ধির নিপুণতা না পেলেও বুদ্ধিগত উৎকর্ষ লাভে সমর্থ, আর ইহার জন্য রক্ত-সংমিশ্রণের দরকার হয় না বা তাকে ভবিষ্য বংশের জন্য অপেক্ষাও করতে হয় না। এমন কি মনে হয় সাধারণ শ্রেণীর লোকও অনুকূল পরিবেশে কয়েক পুরুষের মধ্যেই এতদূর অগ্রসর হতে পারে যার জন্য সাধারণতঃ সহস্র

সহস্র বৎসর লাগার কথা। তাহলে হয় বলতে হবে যে মানুষ মনোময় জীব হিসাবে তার বিশেষ অধিকারের বলে বিবর্তনের মন্থর বিধানের পূর্ণ ভার বহন থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, নয় বলতে হয় যে বুদ্ধিপ্রধান জীবনের জন্য উচ্চস্তরের উপাদানগত সামর্থ্য তার মধ্যে ইতিপূর্বেই বিদ্যমান, আর সে অনুকূল অবস্থায় ও যথাযথ উদ্দীপক পরিবেশে তা সর্বদাই বাহিরে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। বর্বরসৃষ্টির কারণ যে মানসিক অসামর্থ্য তা নয়, এর কারণ দীর্ঘদিনব্যাপী সুযোগ প্রত্যাখ্যান বা তা থেকে দূরে অবস্থান এবং উদ্বোধক সংবেগের অপসারণ। বর্বরতা মধ্যবর্তী নিদ্রা, আদি অন্ধকার নয়।

অধিকন্তু পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে আধুনিক চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টার সমগ্র প্রবণতার তাৎপর্য এই যে ইহা মানুষের মাঝে প্রকৃতির এক বৃহৎ সচেতন সাধনা, যার উদ্দেশ্য হল মনোময় জীবনের জন্য আধুনিক সভ্যতা যে সব সুবিধা দেয় সে সবকে সর্বজনীন করে বুদ্ধিবৃত্তি, সামর্থ্য ও অন্যসব সম্ভাবনার এক সাধারণ ভূমি রচনা। এমন কি এই প্রবণতার নায়ক যে ইউরোপীয় বুদ্ধি, তার জড়প্রকৃতি ও জীবনের বহিরঙ্গে ব্যস্ততাও এই সাধনার আবশ্যকীয় অঙ্গ। ইহার লক্ষ্য মানবের পূর্ণ মানসিক সম্ভাবনার জন্য তার শারীরিক সত্তায়, প্রাণশক্তিতে ও জড়ীয় পরিবেশে উপযুক্ত ভিত্তি প্রস্তুত করা। প্রকৃতির এই মহতী গতিধারার তাৎপর্য ও অভিপ্রায় রূপায়ণের বিভিন্ন সহজবোধ্য নিদর্শন হল শিক্ষাবিস্তার, পশ্চাদ্‌বর্তী জাতির অগ্রসর, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধান, শ্রমলাঘবকারী যন্ত্র সমূহের বহুল ব্যবহার, আদর্শ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে অগ্রগতি, সভ্যমানবজাতির মধ্যে স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও সুগঠিত দেহ লাভের জন্য বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা। হয়তো যথাযথ বা চরম উপায়গুলি সর্বদা ব্যবহৃত হচ্ছে না কিন্তু তাদের লক্ষ্য, সঠিক প্রাথমিক লক্ষ্য—ব্যষ্টি ও সমাজের সুস্থ দেহগঠন, জড়গত মনের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন ও দাবীপূরণ, পর্যাপ্ত আরাম, অবকাশ ও সুযোগ-দান যাতে এখন আর শুধু অনুগৃহীত জাতি, শ্রেণী বা ব্যক্তি নয়, সমগ্র মানবজাতি তাদের ভাবাবেগপ্রধান ও বুদ্ধিপ্রধান সত্তাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার স্বাধীনতা পায়। বর্তমানে হয়তো জড়ীয় ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যই প্রধান কিন্তু পশ্চাতে সর্বদাই উচ্চতর প্রধান সংবেগ ক্রিয়ারত বা পূর্ণশক্তি নিয়ে অপেক্ষমাণ।

আর যখন প্রাথমিক সর্তগুলির পরিপূরণ হবে ও তৈরী হবে মহতী প্রচেষ্টার ভিত্তি, তখন বুদ্ধিপ্রধান জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকে যে পরবর্তী সম্ভাবনা সাধনে রত হতে হবেই তার প্রকৃতি কিরূপ? যদি মনই প্রকৃতির সর্বোচ্চ সংজ্ঞা হয়, তাহলে যুক্তিপ্রধান ও কল্পনাপরায়ণ বুদ্ধির পূর্ণবিকাশ এবং ভাবাবেগ ও সূক্ষ্মবোধ বৃত্তির সুসমঞ্জস পরিতৃপ্তি তাদের নিজেদের পক্ষে

যথেষ্ট। কিন্তু অপর পক্ষে যদি মানুষ যুক্তিশীল ও ভাবাবেগপ্রধান প্রাণীর অতিরিক্ত কিছু হয়, যা ব্যক্ত হচ্ছে তা ছাড়িয়ে যদি এমন কিছু থাকে যাকে ব্যক্ত হতে হবে তাহলে এ কথাই সংগত যে মনোময় জীবনের পূর্ণতা, বুদ্ধিশক্তির নমনীয়তা, সাবলীলতা ও বিশালসামর্থ্য, ভাবাবেগ ও সূক্ষ্মবোধবৃত্তির সুসংহত সমৃদ্ধি যাত্রার শেষ নয়, এ পথের নিশানা হল এমন উচ্চতর জীবন ও প্রখরতর বৃত্তিশক্তি গঠন করা যা পরে ব্যক্ত হয়ে নিম্নকরণকে আয়ত্তে আনবে, ঠিক যেমন মন নিজেই দেহকে এমন ভাবে অধিকার করেছে যে দৈহিক সত্তা এখন আর নিজের তৃপ্তির জন্যই জীবন ধারণ করে না, বরং এক পরতর ক্রিয়ার ভিত্তি ও উপাদান হওয়ার জন্যই তার জীবন।

মনোময় জীবন অপেক্ষা এক পরতর জীবন বর্তমান—এই দৃঢ় স্বীকৃতিই ভারতীয় দর্শনের সমগ্র ভিত্তি; আর ইহার অর্জন ও সংহতিসাধন বিভিন্ন যোগপদ্ধতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। মন বিবর্তনের শেষ সংজ্ঞা নয়, চরম উদ্দেশ্য নয়, এ দেহের মত এক করণ। যোগের ভাষাতেও এর নাম অন্তঃকরণ। আর ভারতীয় ঐতিহ্য এই যে যা ব্যক্ত করতে হবে তা মানবীয় অনুভূতিতে নতুন জিনিস নয়, ইহার বিকাশসাধন আগেই করা হয়েছে এবং এমন কি বিকাশের কোন কোন পর্বে ইহা মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণও করেছে। যাই হোক না কেন ইহার কথা যে জানা আছে তা থেকেই বোঝা যায় যে কোন এক সময় এর আংশিক বিকাশসাধন হয়েছিল। আর তারপর প্রকৃতি যে তার সিদ্ধি থেকে নেমে এসেছে এ বিষয়ে সন্ধান করলে পাওয়া যাবে যে এর কারণ হল কোন বিষয়ে সাম্যস্থাপনের অভাব বা যে মানসিক ও জড়গত ভিত্তিতে সে ফিরে এসেছে তার কোনরূপ অসম্পূর্ণতা বা নিম্নজীবনের ক্ষতি করে উচ্চজীবনের অতিমাত্রায় বিশেষী করণ।

এখন প্রশ্ন হবে, এই যে পরতর বা পরতম জীবনের দিকে আমাদের বিবর্তনের উন্মুখতা তার স্বরূপ কী? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের এমন সব অসামান্য ভাবনার কথা উল্লেখ করতে হবে যে পুরনো সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য কিছুতে এদের সঠিক বর্ণনা দুষ্কর, কারণ শুধু এই ভাষাতেই এসবকে কতকটা সুব্যবস্থিত করা হয়েছে। ইংরাজী ভাষায় এসবের কাছাকাছি সংজ্ঞাগুলির সহিত অন্যরূপ ধারণা সংশ্লিষ্ট, তাদের ব্যবহারে অনেক, এমন কি গুরুতর ভুল হবার সম্ভাবনা। যোগের ভাষায় বলা হয় যে আমাদের স্থূল শরীর নামে অভিহিত অন্নকোষ ও প্রাণকোষ—এই দুয়ে গঠিত শারীরিক ও প্রাণিক সত্তার পাদ, এবং শুধু মনকোষে গঠিত মনোময় সত্তার পাদ ছাড়াও এক তৃতীয় অতিমানসিক সত্তার পরম দিব্য পাদ বর্তমান যার নাম কারণশরীর এবং যা চতুর্থ ও পঞ্চম কোষ অর্থাৎ বিজ্ঞানকোষ ও আনন্দকোষ দ্বারা গঠিত। এই বিজ্ঞান কিন্তু মানসিক জিজ্ঞাসা ও যুক্তিপ্রসূত সুবিন্যস্ত জ্ঞান নয় বা

সাময়িকভাবে সাজানো এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত বা অভিমত নয় যাদের সত্যতার সম্ভাবনা খুব বেশী; বরং এ হল শুদ্ধ স্বাধিষ্ঠিত স্বয়ং-প্রকাশ সত্য। আর এই আনন্দ হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির এমন নিরতিশয় সুখ নয় যার পিছনে আছে দুঃখযন্ত্রণার বোধ; এই আনন্দও স্বাধিষ্ঠিত এবং কোন বিষয় ও বিশেষ অনুভূতি নিরপেক্ষ, ইহা আত্ম-আনন্দ, যেন ইহা এক বিশ্বাতীত ও অনন্ত জীবনের আত্ম-প্রকৃতি ও আত্ম-উপাদান।

কোন সম্ভাব্য বা প্রকৃত বস্তুর সহিত কি এইসব মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার মিল আছে? সকল যোগেই দৃঢ়ভাবে বলা হয় যে এসব চরম অনুভূতি ও পরম লক্ষ্য। আমাদের চেতনার সর্বোচ্চ সম্ভাব্য অবস্থা, জীবনের বিশালতম সম্ভাব্য বিস্তারের নিয়ামক তত্ত্ব ইহারাই। আমাদের কথা এই যে প্রকাশন (শ্রুতি), চিদাবেশ ও বোধি এই তিন মানসশক্তির মোটামুটি অনুরূপ পরমা শক্তিনিচয়ের সৌষম্য বর্তমান, কিন্তু এসব এখনও বোধিময় বুদ্ধিতে বা দিব্যমানসে সক্রিয় নয়, এসব সক্রিয় আরো পরতর স্তরে; এরা সত্যকে দেখে সরাসরি ও মুখোমুখি; বরং বিষয়সমূহের বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ সত্যের মধ্যেই তাদের বাস ও তারই বিধান ও দীপ্ত ক্রিয়া ইহারা। অহমাত্মক জীবনের ধ্বংসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সচেতন জীবন বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ উভয়ই ও আনন্দস্বরূপ তারই জ্যোতি এই সব পরমাশক্তি। স্পষ্টতঃ এরা দিব্য এবং মানুষের বর্তমান আপাত প্রতীয়মান গঠনের অবস্থার পক্ষে এরা চেতনা ও ক্রিয়ার অতিমানুষী অবস্থা। পরম অজ্ঞেয় তত্ত্বকে শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতা বা বিশ্বপ্রকাশক বিরাট পুরুষ বলে ভাবা হোক না কেন আমাদের প্রবুদ্ধ জ্ঞানে তাঁর যে আত্ম-বিভাবনা, পরমাত্মা তর দার্শনিক বিবরণ হল সচ্চিদানন্দ--বিশ্বোত্তীর্ণ সত্তা, আত্ম-সংবিৎ ও আত্ম-আনন্দের ত্রিত্ব। কিন্তু যোগে তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিভাবেও তাদের গণ্য করা হয় প্রত্যক্-বৃত্ত জীবনের অবস্থা হিসাবে: তবে এইসব অবস্থার সহিত এখন আমাদের জাগ্রত চেতনার কোন পরিচয় না থাকলেও তারা আমাদের মধ্যে অতিচেতন স্তরে অবস্থিত এবং সেজন্য তাতে আমাদের উত্তরণ সর্বদাই সম্ভব।

কেননা, আর নামেই বোঝা যায় যে, করণ নামে অভিহিত দুই শরীরের বিপরীত যে কারণ-শরীর ও যা ক্রম-বিকাশের এক গৌরবমণ্ডিত পরিণতি, সে তার পূর্ববর্তী সব কিছু বাস্তব বিকাশের উৎস ও কার্যসাধিকা শক্তিও বটে। বস্তুতঃ দিব্যজ্ঞান থেকেই আমাদের সব মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন, এসব তারই অংশ এবং যতক্ষণ এরা তাদের গূঢ় উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ এরা দিব্যজ্ঞানের বিকৃতি। পরম আনন্দের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ও ভাবাবেগের, দিব্যচেতনার নেওয়া পরম সংকল্প ও পরমাশক্তির বিভাবের সহিত আমাদের স্নায়বিক শক্তি ও কার্যের, ঐ পরম আনন্দ ও চেতনার শুদ্ধ স্বভাবের

সহিত আমাদের শারীরিক সত্তারও সেই একই সম্পর্ক। যে বিবর্তন-ধারা আমরা দেখি এবং পার্থিব প্রকৃতিতে আমরা যার শীর্ষ-স্থানীয় তাকে এক অর্থে বিপরীত ক্রম-বিকাশধারা মনে করা যেতে পারে: এর মাধ্যমে এই সব মহাশক্তি তাদের একত্বে ও বৈচিত্র্যে জড়, প্রাণ ও মনের অপূর্ণ ধাতু এবং ক্রিয়াসমূহকে এমনভাবে ব্যবহার করে ও এমন ভাবে উন্নত ও পূর্ণ করে তোলে যাতে তারা তাদের উৎসস্বরূপ দিব্য ও শাশ্বত অবস্থার সৌষম্য উত্তরোত্তর প্রকাশ করতে সমর্থ হয় পরিবর্তনশীল আপেক্ষিকতার মধ্যে। এই যদি বিশ্বের সত্য হয়, তা হলে বিবর্তনের লক্ষ্য যা, তার কারণও তা এবং ইহাই তার উপাদানের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে ও সে সব থেকে মুক্ত হচ্ছে। কিন্তু যদি মুক্তির অর্থ হয় পলায়ন, যে উপাদান ও ক্রিয়ার মধ্যে এই সত্য নিহিত ছিল তাদের উন্নত ও রূপান্তরিত করাতে যদি তা ফিরে না আসে তাহলে এই মুক্তি যে অপূর্ণ থেকে যায় তা নিশ্চিত। যদি পরিণামে এরূপ এক রূপান্তর সাধন না হয় তাহলে সত্যের অন্তর্নিহিত হওয়ারও কোন বিশ্বাসযোগ্য হেতু থাকে না। কিন্তু যদি মানুষের মন দিব্য জ্যোতির মহিমা লাভে সমর্থ হয়ে ওঠে, যদি মানুষের ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে পরম আনন্দের ছাঁচে রূপান্তরিত করে তার মত বৃহৎ ও সক্রিয় করা যায়, যদি মানুষী কর্ম দিব্য অহং-শূন্য শক্তিকে শুধু ব্যক্ত না করে নিজেকে তার গতি বলে অনুভব করে আর যদি আমাদের সত্তার জড়ীয় ধাতু এই সব পরম অনু-ভূতি ও শক্তিকে ধারণ ও দীর্ঘস্থায়ী করার উপযোগী পরমতম স্বভাবের বিশুদ্ধতা যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করে এবং যথেষ্ট পরিমাণে নমনীয় ও তার সাথে স্থায়ী ও দৃঢ় হয়ে ওঠে তা হলে প্রকৃতির এই সুদীর্ঘ সাধনা সার্থক হবে এক গৌরবময় পরিণতিতে, আর তার পরিণামধারায় উদ্ভাসিত হবে তার গভীর তাৎপর্য।

এই পরম জীবনের ঈষৎ আভাসও এত সমুজ্জ্বল আর এত দুর্বার এর আকর্ষণ যে একবার এর দেখা পেলে আমাদের আর দ্বিধা থাকে না যে সেই জীবনলাভের সাধনার জন্য অন্য সব কিছু অবহেলা করার সঙ্গত কারণ বর্তমান। এমন কি এক মতে বলা হয় যে মন এক অযোগ্য বিকৃতি ও প্রচণ্ড বাধা, এক ভ্রমাত্মক জগতের উৎস ও পরম সত্যের অপলাপ, আর চরম মুক্তি পাওয়ার জন্য দরকার মনকে অস্বীকার ক'রে তার সকল কাজ ও ফলের বিলোপ-সাধন। অবশ্য অন্য যে মতে সব কিছুকেই দেখা হয় মনে এবং মনোময় জীবনই আত্যন্তিক আদর্শ, সে মতের সম্পূর্ণ বিপরীত অতিশয়োক্তি ঐ পূর্বমত; কিন্তু এ অর্ধসত্য, এর ভুল এই যে এতে মনের বাস্তব অক্ষমতা-গুলিই দেখা হয়, এর দিব্য তাৎপর্য লক্ষ্য করা হয় না। যে জ্ঞানে দেখা হয় ও স্বীকার করা হয় যে ভগবান বিশ্বের মধ্যে অথচ বিশ্বের অতীত, সেই জ্ঞানই

চরম জ্ঞান। আর পূর্ণ যোগও তা-ই যা বিশ্বাতীতকে পেয়ে জগতে ফিরে এসে তাকে অধিকার করে এবং সেই সঙ্গে তাতে থাকে অস্তিত্বের বৃহৎ সোপান দিয়ে ইচ্ছামত উত্তরণ ও অবতরণ করার শক্তি। কেননা যদি শাশ্বত প্রজ্ঞা আদৌ থাকে তা হলে মনঃশক্তিরও উচ্চ ব্যবহার ও নিয়তি থাকাও নিশ্চিত। মনের এই ব্যবহার নির্ভর করে উত্তরণের অবস্থা ও প্রত্যাবর্তনের উপর, আর তার নিয়তি হল পরিপূর্ণতা ও রূপান্তর, মূলোৎপাটন বা বিলোপসাধন নয়।

তা হলে আমরা দেখি প্রকৃতির এই তিনটি ক্রম—(১) দৈহিক জীবন যা এই জড়জগতে আমাদের জীবনের ভিত্তি, (২) মনোময় জীবন যার মধ্যে আমাদের উদ্বর্তন হচ্ছে এবং যার দ্বারা আমরা এই দৈহিক জীবনকে উচ্চতর ব্যবহারে উন্নীত ও এক মহত্তর পূর্ণতায় প্রসারিত করি; এবং (৩) দিব্য অস্তিত্ব যা অন্যদুটির সাধ্য লক্ষ্য, অথচ যা আবার ফিরে আসে ঐ দুটি জীবনের উপর তাদের মুক্ত করে নিয়ে যেতে তাদের মহত্তম সম্ভাবনার মধ্যে। আমাদের ধারণায় এদের কোনটিই আমাদের নাগালের বাহিরে বা প্রকৃতির নিম্নে নয়, আর চরম প্রাপ্তির জন্য এদের কোনটিরই বিনাশ অত্যাবশ্যক নয়। সুতরাং আমাদের কাছে এই মুক্তি ও পরিপূর্ণতা যোগের লক্ষ্যের অন্ততঃ একটি অংশ আর সে অংশ বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ।

৩

ত্রিবিধ জীবন

তা হলে যখন প্রকৃতি এক শাশ্বত ও গূঢ় সত্তার বিবর্তন অর্থাৎ উত্তরোত্তর আত্ম-অভিব্যক্তি আর ইহার তিনটি ক্রমিক রূপ যেন উত্তরণের তিনটি ক্রম, তখন আমাদের সকল ক্রিয়া এই তিনটি অন্যোন্যাশ্রয়ী সম্ভাবনার উপর নির্ভর-শীল—(১) দৈহিক জীবন, (২) মনোময় জীবন এবং (৩) গোপন চিৎ-সত্ত্ব যা নিবর্তন ধারায় অন্য দুটির কারণ এবং বিবর্তন ধারায় তাদের ফল। দেহের সংরক্ষণ ও পূর্ণতাসাধন ও মনের সার্থকতা আনার পর সিদ্ধ দেহ ও মনে পরম চিৎ-পুরুষের বিশ্বোত্তীর্ণ ক্রিয়া প্রকট করা প্রকৃতির লক্ষ্য; আমাদেরও লক্ষ্য তা-ই হওয়া উচিত। যেমন মনোময় জীবন দৈহিক জীবনের বিলোপ ঘটায় না, বরং তার কাজ দেহের উন্নয়ন ও সূক্ষ্মতর প্রয়োগ সাধন, তেমন অধ্যাত্ম জীবনেরও উচিত আমাদের বুদ্ধি, ভাবাবেগ, সৌন্দর্যবোধ ও প্রাণের সব ক্রিয়াকে বিনাশ না করে তাদের রূপান্তরিত করা।

মানুষ পার্থিব প্রকৃতির শীর্ষস্থানীয়, একমাত্র তারই পার্থিব দেহে প্রকৃতির পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব। এই মানুষের তিনটি জন্ম। তাকে এক জীবন্ত কাঠামো দেওয়া হয়েছে, তাতে দেহ হ'ল দিব্য অভিব্যক্তির আধার এবং প্রাণ তার স্ফুরন্ত (dynamic) সাধন। তার সব ক্রিয়ার কেন্দ্র হল এক ক্রমোন্নতিশীল মন যার লক্ষ্য,—নিজের, তার বাসগৃহের ও তার ব্যবহারের উপায়স্বরূপ প্রাণের পূর্ণতা সাধন; আর উত্তরোত্তর আত্মোপলব্ধির দ্বারা সে তার প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ পরম চিৎ-পুরুষের রূপে উদ্বুদ্ধ হতে সমর্থ। সে যা সর্বদাই ছিল, তা-ই তার পরিণতি অর্থাৎ ভাস্বর পরমতম আনন্দময় পুরুষ: এখন তার যে জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রচ্ছন্ন তার দ্বারা প্রাণ ও মনকে উদ্‌ভাসিত করাই দিব্য অভিপ্রায়।

এই যখন মানবের মধ্যে সক্রিয়া দিব্যশক্তির পরিকল্পনা তখন আমাদের সত্তার এই তিন উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমাদের সমগ্র জীবনধারা ও লক্ষ্যসাধনের কাজ চলা চাই। প্রকৃতির মধ্যে তাদের রূপায়ণ পৃথক হওয়ায় মানুষ এই তিন প্রকার জীবনের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে পারে : (১) সাধারণ জড়গত জীবন, (২) মানসিক ক্রিয়া ও উন্নতির জীবন, (৩) অব্যয় চিদানন্দ। তবে উন্নতির সাথে সাথে সে এই তিনটি রূপ মিশিয়ে তাদের বিরোধ দূর করে তাতে আনতে পারে এক সুসমঞ্জস ছন্দ এবং এইভাবে সে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে পূর্ণ দেবতা, সিদ্ধ মানব।

সাধারণ প্রকৃতিতে এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যসূচক নিয়ামক সংবেগ আছে।

দেহগত প্রাণশক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে এর কাজ যতটা স্থায়িত্ব সাধনে ততটা অগ্রগতিতে নয়, যতটা আত্ম-পুনরাবৃত্তিতে, ততটা ব্যষ্টির আত্ম-প্রসারে নয়। অবশ্য জড়প্রকৃতিতে অগ্রসরতা আছে—এক জাতিরূপ থেকে অন্য জাতিরূপে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে মানুষে; কেন না অচেতন জড়েও মন ক্রিয়ারত। কিন্তু একবার কোন জাতিরূপের জড়দেহ সুস্পষ্ট চিহ্নিত হলে মনে হয় পৃথ্বী জননীর প্রধান অব্যবহিত কাজ হল অবিরত পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে সেই রূপটিকে বজায় রাখা। কারণ প্রাণ সর্বদাই চায় অমরত্ব; কিন্তু ব্যষ্টিরূপ অনিত্য। অবশ্য কোন রূপের ভাবনা জগৎসৃজনকারী চেতনায় নিত্য, কারণ সেখানে তার বিনাশ নেই। ব্যষ্টিরূপের অনিত্যতাহেতু যে জড়ীয় অমরত্ব সম্ভব তা হল অবিরত পুনরুৎপাদন। সেজন্য আত্ম-সংরক্ষণ, আত্ম-পুনরাবৃত্তি, আত্ম-বহুলীকরণ—এগুলিই অবশ্যম্ভাবীরূপে সব জড়গত সত্তায় প্রবল সহজাত সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়।

শুদ্ধ মনঃশক্তির বৈশিষ্ট্য,—পরিবর্তন; যতই ইহা উন্নত ও সংহত হয় মনের এই বিধানে ততই সে ক্রমাগত চায় তার লাভের পরিধির বিস্তার, তাদের উন্নতি ও সুষ্ঠুতর পারিপাট্য। এইভাবে সে ক্রমাগত চায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সরল থেকে বৃহৎ ও জটিল সিদ্ধি। কারণ দেহগত প্রাণ অন্যরূপ হলেও মনের ক্ষেত্র অনন্ত, তার বিস্তার সাবলীল এবং গঠন সহজেই পরিবর্তনীয়। এর যথাযথ সহজ সংস্কার হল পরিবর্তন, আত্ম-প্রসার ও আত্মোন্নতি। পূর্ণতা-সাধন সম্ভব—এই তার বিশ্বাস, এগিয়ে চল, 'চরৈব'—এই তার মন্ত্র।

পরম চিৎ-পুরুষের স্বভাবধর্ম হল স্বরূপস্থিত পূর্ণতা ও অপরিবর্তনীয় আনন্ত্য। যে অমরত্ব প্রাণের লক্ষ্য, যে পূর্ণতা মনের নিশানা সে সব সর্বদাই তাঁর অধিগত, তাঁর স্বভাব ধর্ম। সর্বভূতের অন্তরে ও তাদের ছাড়িয়েও যিনি একই সমান, বিশ্বের মধ্যে ও তা ছাড়িয়েও যিনি সমভাবে আনন্দময়, তাঁর আবাসের সব রূপের ও ক্রিয়ার অপূর্ণতা ও দীনতা যাঁকে স্পর্শ করে না, সেই তাঁকে উপলব্ধি, করা সনাতনকে লাভ করা—ইহাই অধ্যাত্মজীবনের জয় গৌরব।

এই তিনরূপের প্রতিটিতেই প্রকৃতির কাজ চলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ভাবেই; কারণ সনাতন যেমন ব্যষ্টিরূপে প্রতিষ্ঠিত, তেমন সমভাবে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার সমষ্টি জীবনেও, অর্থাৎ বংশে, গোষ্ঠীতে, রাষ্ট্রজাতিতে বা জড় অপেক্ষা সূক্ষ্মতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল অন্য কোন সঙ্ঘে বা মহত্তম সমষ্টিতে অর্থাৎ মানবজাতিতে। এই সব কর্মক্ষেত্রের যে কোন একটি বা সবগুলি থেকে মানুষও পারে তার নিজের ব্যষ্টি মঙ্গল খুঁজতে অথবা তাদের মধ্যে সমষ্টির সাথে

একাত্ম হয়ে তার জন্যই জীবনধারণ করতে অথবা ঊর্ধ্বে উঠে এই জটিল বিশ্ব সম্বন্ধে সত্যতর দৃষ্টি পেয়ে সমষ্টির লক্ষ্যের সহিত নিজের ব্যষ্টি উপলব্ধির সামঞ্জস্য আনতে। কেননা অন্তঃপুরুষের এই বিশ্বে থাকাকালীন পরাৎপরের সঙ্গে তার সঠিক সম্বন্ধ যেমন অহমিকাবশে নিজের স্বাতন্ত্র্য জাহির করা নয়, বা নিজেকে অনির্বচনীয়ের মধ্যে লোপ করা নয়, বরং ভগবান ও জগতের সহিত নিজের ঐক্য উপলব্ধি করা ও ব্যষ্টির মধ্যে তাদের মিলন সাধনই সঠিক সম্বন্ধ, সেরূপ সমষ্টির সহিত ব্যষ্টিরও সঠিক সম্বন্ধ অহমিকা বশে সঙ্গী-সাথীদের উপেক্ষা করে নিজের পার্থিব বা মানসিক উন্নতি বা অধ্যাত্ম মুক্তি অন্বেষণ করা নয় বা সমষ্টির জন্য নিজের যথাযথ বিকাশ রোধ বা ক্ষুণ্ণ করা নয়, বরং নিজের মধ্যে ইহার উৎকৃষ্ট ও পূর্ণতম সম্ভাবনাগুলিকে একত্র করা এবং সমগ্র জাতি যাতে তার পরম ব্যক্তিভাবনা প্রাপ্তির আরো নিকটবর্তী হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সে সবকে মনন, ক্রিয়া ও অন্য সকল উপায়ে চতুষ্পার্শ্বের সকলের উপর বর্ষণ করাই সঠিক সম্বন্ধ।

এথেকে বোঝা যায় যে প্রকৃতির প্রাণিক লক্ষ্য পূর্ণ করাই জড়গত জীবনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। জড়াসক্ত মানুষের একমাত্র লক্ষ্য—বেঁচে থাকা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলা আর মাঝখানে সম্ভবমতো আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া; তবে যে কোন ভাবেই হোক বেঁচে থাকাই তার লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সে গৌণ করতে পারে, তবে তা শুধু জড়-প্রকৃতির অন্য সংস্কারের কাছে যেমন ব্যষ্টির পুনরুৎপাদন এবং বংশে, শ্রেণীতে বা সম্প্রদায়ে জাতিরূপ (type) সংরক্ষণে। নিজে বেঁচে থাকা, গার্হস্থ্যজীবন, সমাজ ও জাতির অভ্যস্ত ব্যবস্থা—এইগুলিই জড়গত জীবনের অঙ্গ। প্রকৃতির বিধানে ও ব্যবস্থায় ইহার বিশাল গুরুত্ব স্বতঃসিদ্ধ এবং এইভাবে ভাবিত যে সব মানুষ তাদের গুরুত্বও অনুরূপ। তাদের দেখে প্রকৃতি নিশ্চিন্ত যে তার তৈরী কাঠামোর স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত এবং অতীতের লাভগুলিও তারা যত্ন করে রক্ষা করবে ও পরম্পরাক্রমে বজায় রাখবে।

কিন্তু এই উপকারিতার অপরিহার্য ফল এই যে এই ধরণের সব মানুষ ও তাদের জীবন সীমিত, অযৌক্তিকভাবে রক্ষণশীল এবং পার্থিব বিষয়ে বদ্ধ হতে বাধ্য। চিরাচরিত জীবনধারা, প্রচলিত বিধান ও প্রতিষ্ঠান, বংশানুগত বা অভ্যস্থ চিন্তাপ্রণালী—এই সব তাদের প্রাণবায়ুস্বরূপ। প্রগতিশীল মন অতীতে যে সব পরিবর্তন এনেছে তা তারা স্বীকার করে ও আগ্রহের সহিত সমর্থন ও রক্ষা করে; কিন্তু বর্তমানে ইহা যে সব পরিবর্তন আনছে তাদের বিরুদ্ধে সে সমান উৎসাহে সংগ্রাম করে। কারণ জড়াসক্ত মানুষের কাছে বর্তমান প্রগতিশীল চিন্তাবিৎ ভাববিলাসী, স্বপ্নবিহারী ও উন্মাদ। প্রাচীন সেমেটিক জাতির সে সব লোক ভগবদ্‌বাণী প্রচারকদের পাথর দিয়ে জীবন্ত

মেরে ফেলে পরে তাদের মৃত্যুর পর তাদের স্মৃতিপূজা করত, তারা প্রকৃতির এই সংস্কারবন্ধ বুদ্ধিহীন তত্ত্বের মূর্তিমান অবতার। প্রাচীন ভারতে এক-জন্মা ও দ্বিজন্মার (বা দ্বিজর) মধ্যে যে পার্থক্য করা হ'ত তাতে এই জড়াসক্ত মানুষের পক্ষেই প্রথম বিশেষণটি প্রযোজ্য। এরূপ মানুষ প্রকৃতির নিম্নক্রিয়াসাধক, সে উচ্চতর ক্রিয়ার ভিত্তি রক্ষা করে, কিন্তু তার কাছে দ্বিজত্বের গৌরব সহজে উন্মুক্ত হয় না।

তথাপি অতীতকালের ধর্মের সব বহিঃপ্রকাশ তার প্রচলিত ভাবধারায় যতটা আধ্যাত্মিকতা এনেছে তা সে স্বীকার করে এবং তার বিশ্বাসমত নিরাপদ ও সাধারণ আধ্যাত্মিকতার আহার দিতে সমর্থ এমন সব পুরোহিত বা পন্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদদের জন্য সে তার সমাজ-ব্যবস্থায় পূজ্য স্থান রাখে, তবে প্রায়শঃই এ তেমন কার্যকরী নয়। কিন্তু যে নিজের জন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক তাকে সে, যদিই-বা আদৌ স্বীকার করে তবু পুরোহিতের পরিচ্ছদ দেয় না, তাকে দেয় সন্ন্যাসীর বসন। সে যদি তার বিপজ্জনক স্বাধীনতার ব্যবহার করতে চায় তাহলে তার স্থান সমাজের বাহিরে। এইভাবে সে হবে পরম চিন্ময়পুরুষের তড়িৎ-গ্রহণের এক মানুষী তড়িৎদন্ড যাতে সমাজসৌধকে রক্ষা করার জন্য সে ঐ তড়িৎকে দূরে চালনা করে।

এ সব সত্ত্বেও জড়গত মনের উপর প্রগতির প্রথার, সচেতন পরিবর্তনের অভ্যাসের, জীবনের ধর্ম হিসাবে অগ্রসরতার বদ্ধমূল ধারণার ছাপ বসিয়ে জড়াসক্ত মানুষ ও তার জীবনকে কিছু পরিমাণে প্রগতিসম্পন্ন করা সম্ভব। এই উপায়ে ইওরোপে যে প্রগতিশীল সমাজ সৃষ্টি হয়েছে তা জড়ের উপর মনের এক মহত্তম বিজয়। কিন্তু জড়প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়; কারণ যে উন্নতি হয় তা অপেক্ষাকৃত স্থূল ও বহির্মুখী হবার ঝোঁক থাকায় উচ্চতর বা আরো দ্রুতগতি আনার চেষ্টার ফল হয় দারুণ ক্লান্তি, দ্রুত অবসন্নতা ও বিস্ময়কর পশ্চাদ্‌গমন।

আবার জীবনের সকল প্রতিষ্ঠান ও প্রথাসম্মত ক্রিয়াকে ধর্মভাবের দৃষ্টিতে দেখায় অভ্যস্ত করে জড়াসক্ত মানুষ ও তার জীবনে কিছু পরিমাণ আধ্যাত্মিকতা আনা সম্ভব। প্রাচ্যে এরূপ আধ্যাত্মিক সংঘের সৃষ্টি জড়ের উপর পরম চিৎ-পুরুষের অন্যতম মহত্তম বিজয়। তবু এখানেও ত্রুটি আছে, কারণ প্রায়শঃই ইহার ঝোঁক হল এক ধার্মিক ভাব গঠন যা আধ্যাত্মিকতার সব চেয়ে বাহ্যরূপমাত্র। এর উচ্চতর এমন কি সব চেয়ে গৌরবময় ও বীর্যশালী অভিব্যক্তিরও ফল—হয় সমাজত্যাগী মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে সমাজকে দীন করা, নয় সাময়িক উন্নতি এনে সমাজের মধ্যে কিছুকালের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আসলে, কি মানসিক প্রচেষ্টা বা কি আধ্যাত্মিক সংবেগ, কোনটিই

বিচ্ছিন্নভাবে জড়প্রকৃতির বিশাল বাধা দূর করতে সমর্থ হয় না। প্রকৃতি চায় এ দুয়ের মিলিত পূর্ণ প্রচেষ্টা, তবেই যদি মানবজাতির মধ্যে পূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। কিন্তু সাধারণতঃ এই দুই বড় কার্যসাধকের কোনটিই অপরকে কিছু ছাড়তে নারাজ।

সৌন্দর্যবোধ, সুনীতি ও বুদ্ধির কাজকর্মেই মনোময় জীবনের মনোযোগ। মৌলিক মানসিকতা আদর্শপরায়ণ ও পূর্ণতা-অন্বেষু। সূক্ষ্ম আত্মা, তৈজস আত্মা* সর্বদাই স্বপ্ন বিহারী। দিব্য সনাতনের নতুন রূপ অন্বেষণই হোক বা পুরানো রূপগুলিকে সঞ্জীবিত করাতেই হোক শুদ্ধ মানসিকতার প্রাণ হল ষোড়শকল সৌন্দর্য, সিদ্ধ আচরণ ও অখণ্ড সত্যের স্বপ্ন দেখা। কিন্তু কেমন করে জড়ের বাধার মোকাবিলা করতে হয় তা সে জানে না। এখানে সে বদ্ধ ও অপটু, আনাড়ির মত ভুল তার পরীক্ষণ এবং হয় সে সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে আসে, নয় মলিন বাস্তবতার কাছে নতিস্বীকার করে। আর না হয় জড়জীবন পর্যালোচনার পর সংগ্রামের সর্তসমূহ স্বীকার করে সে সফল হতে পারে, কিন্তু তা শুধু সাময়িকভাবে এক কৃত্রিম ব্যবস্থা চাপিয়ে কেন না অনন্ত প্রকৃতি হয় তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করে, নয় এমন ভাবে বিকৃত করে যে তাকে চেনা অসাধ্য হয়, অথবা তার সম্মতি প্রত্যাহার করে ফেলে রেখে যায় শুধু এক মৃত আদর্শের শব। স্বপ্নদ্রষ্টা মানবের খুব কম উপলব্ধিই জগৎ সাদরে গ্রহণ করেছে বা সাগ্রহে তাদের স্মরণ করে বা স্বীয় উপাদানের মধ্যে পোষণ করতে চায়।

বাস্তব জীবন ও চিন্তাবিদ্‌দের স্বভাবের মধ্যে ব্যবধান বড় বেশী হলে মন নিজের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করার জন্য জীবন থেকে একরকম সরে দাঁড়ায়। আগের দিনে প্রায়ই দেখা যেত, এখনও এমন দৃষ্টান্ত কম নয়, যে কবি নিজের উজ্জ্বল কল্পনার মধ্যেই নিবদ্ধ, শিল্পী তাঁর শিল্পেই তন্ময়, দার্শনিক তাঁর নিঃসঙ্গ কক্ষে বুদ্ধির সমস্যাসমাধানে সমাহিত, বৈজ্ঞানিক ও বিদ্বান তাঁদের পাঠ ও পরীক্ষণেই মগ্ন। এঁদের বলা যায় বুদ্ধিশক্তির সন্ন্যাসী। মানবজাতির জন্য তাঁরা যে কাজ করেছেন অতীত সে সবের সাক্ষ্য বহন করে।

কিন্তু কোন বিশেষ বিশেষ কর্মসাধনের জন্যই এরূপ একান্ত বাস সঙ্গত হতে পারে। মন যখন জীবন কুরুক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ ক'রে মহত্তর আত্মসিদ্ধির উপায় হিসাবে তার সকল সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধককে সমভাবে স্বীকার করে তখনই তার শক্তি ও ক্রিয়ার পূর্ণ প্রকাশ হয়। জড়জগতের সব বাধা বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করেই ব্যষ্টির নৈতিক বিকাশ দৃঢ় আকার ধারণ

---

* যিনি স্বপ্নে বাস করেন, অন্তঃপ্রজ্ঞ, প্রবিবিক্তভুক, তৈজস—মাণ্ডুক্য ৪

করে ও সদাচরণের মহান সংঘের সৃষ্টি হয়, আর জীবনের বাস্তব ঘটনার সহিত সংস্পর্শে এলেই শিল্পে পায় জীবনীশক্তি, মনন শক্তি নিশ্চিত হয় তার অচ্ছিন্ন প্রত্যয় সম্বন্ধে ও দার্শনিকের সামান্যীকরণ প্রতিষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান ও অনুভূতির দৃঢ় ভিত্তির উপর।

অবশ্য জড়জীবনের রূপ বা জাতির উন্নয়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে ব্যষ্টিমনের জন্য এইভাবে জীবনের সহিত মেশামেশি সম্ভব। এরূপ উদাসীনতার চরম নিদর্শন হল (গ্রীসীয়) এপিকিউরিয়ান সম্প্রদায়ের সাধনা। স্তোয়িকরাও (Stoics) একে সম্পূর্ণ পরিহার করেনি। এমন কি পরোপকারীরও করুণার কাজ সাধারণতঃ জগৎ অপেক্ষা নিজের জন্যই বেশী। কিন্তু এও সীমিত পূর্ণতা। প্রগতিশীল মনের পরাকাষ্ঠা দেখা যায় সমগ্র জাতিকে নিজের ভূমিতে আনার প্রয়াসে; আর এ কাজের জন্য হয় সে তার নিজের ভাবনা ও পরিপূর্ণতার প্রতিরূপ সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, নয় জাতির জড়গত জীবনকে ধর্ম, বুদ্ধিশক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের নব নবরূপে এমন ভাবে পরিবর্তিত করে যাতে এসবে যতদূর সম্ভব ফুটে উঠতে পারে ব্যক্তির নিজের আন্তর জীবন আলো-করা সত্য, সৌন্দর্য, ন্যায়নিষ্ঠা ও সুনীতি-পরায়ণতার সমুজ্জ্বল আদর্শ। এরকম কাজে বিফল হলেও যায় আসে না, কারণ শুধু প্রয়াসও স্ফুরন্ত ও সৃজনক্ষম। জীবনকে উন্নীত করার জন্য মনের যে সংগ্রাম তাতে আছে মনের চেয়েও মহত্তর শক্তির দ্বারা জীবন জয়ের আশ্বাস ও বিধান।

পরম বস্তুর অর্থাৎ অধ্যাত্মজীবনের আগ্রহ শাশ্বতে, কিন্তু সেজন্য সে যে অনিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন তা নয়। মন যে ষোড়শকল সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখে, অধ্যাত্মব্যক্তির বাস্তব উপলব্ধিতে তা এমন শাশ্বত প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দ যা পরনির্ভর নয় ও সকল পরাক্‌বৃত্ত দৃশ্যের পশ্চাতে সমভাবে বিদ্যমান; মন যে অখণ্ড সত্যের স্বপ্ন দেখে অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে তা এমন স্বরূপস্থিত স্বপ্রকাশক সনাতন সত্য যা অপরিবর্তনীয় কিন্তু সকল পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ও মূল রহস্য এবং প্রগতির লক্ষ্য; মন যে সিদ্ধ কর্মের স্বপ্ন দেখে, অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে তা সর্বক্ষম স্বয়ংক্রিয় এমন বিধান যা সকল বিষয়ের মধ্যে চিরন্তন অনুস্যূত এবং যা জগতের ছন্দে এখানে রূপায়িত হ'চ্ছে। তৈজস আত্মায় যা চঞ্চল দর্শন বা সৃজনের অবিরত প্রচেষ্টা তা সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বরের আত্মায় নিত্যবিরাজমান পরম সদ্‌বস্তু*।

কিন্তু নিঃসাড় বাধাদায়ী জড়গত কর্মের সহিত খাপ খাইয়ে চলা মনোময়

---

* যিনি একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময় ও আনন্দভুক্ প্রাজ্ঞ..। ইনি সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী—মাণ্ডূক্য উপনিষদ ৫,৬।

জীবনের পক্ষে যদি প্রায়শঃই কষ্টকর হয় তাহলে এই যে জগৎ যা সত্যের বদলে সর্বপ্রকার মিথ্যা ও ভ্রান্তিতে পূর্ণ, প্রেম ও সৌন্দর্যের বদলে সর্বব্যাপী বিরোধ ও কদর্যতায় পূর্ণ, সত্যের বিধানের বদলে বিজয়ী স্বার্থপরতা ও পাপে পূর্ণ, তাতে অধ্যাত্মজীবনের বাস করা কত না কষ্টকর। সেজন্য সাধু ও সন্ন্যাসীর অধ্যাত্মজীবনের স্বাভাবিক ঝোঁক হল জড়জীবন থেকে সরে যাওয়া এবং স্থূলভাবে বা অন্তর থেকে তাকে পুরোপুরি বর্জন করা। ইহার কাছে জগৎ অশিব বা অবিদ্যার রাজ্য আর শাশ্বত ও দিব্যের বাস—হয় সুদূর স্বর্গে, নয় জগৎ ও জীবন ছাড়িয়ে ওপারে। ঐ অপবিত্রতার সহিত সে কোন সম্পর্ক রাখে না, সে বলে, অধ্যাত্মসত্যের স্থান নিরঞ্জন একান্তে। এই প্রত্যাহারে জড়জীবনেরও মহদুপকার হয় কেন না এই ভাবে জড়জীবন এমন কিছুকে সম্ভ্রম, এমন কি মান্য করতে বাধ্য হয় যা তার ক্ষুদ্র আদর্শ, হীন ভাবনা ও অহং-গত আত্মতুষ্টির সোজা অস্বীকৃতি।

কিন্তু জগতে আধ্যাত্মিক শক্তির মত পরমাশক্তির কাজ এই ভাবে খর্ব করা যায় না। অধ্যাত্মজীবনও জড়ে ফিরে এসে একে ব্যবহার করতে পারে তার নিজের মহত্তর পূর্ণতার উপায় হিসাবে। সে জগতের দ্বন্দ্ব ও বাহ্য-রূপে বিভ্রান্ত না হয়ে সকল কিছুর মধ্যে খুঁজতে পারে একই সর্বেশ্বর, একই শাশ্বত সত্য, সুন্দর, প্রেম ও আনন্দকে। "সর্বভূতে আত্মা, আত্মায় সর্বভূত, সর্বভূত আত্মারই সম্ভূতি"—বেদান্তর এই সূত্র শুদ্ধতর ও সর্বগ্রাহী এই যোগের চাবিকাঠি।

কিন্তু মনোময় জীবনের মত অধ্যাত্মজীবনও বাহ্য জীবনকে ব্যবহার করতে পারে শুধু ব্যষ্টির মঙ্গলের জন্য আর এই যে জগৎকে সে শুধু প্রতীকরূপে ব্যবহার করে তার সমষ্টির উন্নয়নের প্রতি সে হবে সম্পূর্ণ উদাসীন। যেহেতু শাশ্বত সদ্‌বস্তু সর্বভূতে সর্বদা এক, তাঁর কাছে সর্বভূত এক, যেহেতু তার নিজের সিদ্ধিলাভের সাধনার তুলনায় কর্মের রীতি ও ফলের কোন মূল্য নেই, এই আধ্যাত্মিক উদাসীনতা নিজস্ব পরমার্থ সিদ্ধ হলেই বিদায় নিতে প্রস্তুত, আর যে কোন পরিবেশ বা ক্রিয়া আসুক না কেন সেসব সে গ্রহণ করে অনাসক্ত ভাবে। গীতার আদর্শ অনেকে এই ভাবে বুঝেছে। আর না হয় সৎকার্য সেবা ও করুণার মাধ্যমে আন্তর প্রেম ও আনন্দ এবং জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে আন্তর সত্য, জগতের উপর নিজেদের ঢেলে দিতে পারে, আর সেইহেতু জগতের রূপান্তর সাধনের জন্য কোন প্রয়াসও করে না। তার ধারণায় জগতের অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতিই এমন যে ইহা পাপ ও পুণ্য, সত্য ও মিথ্যা, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহের সংগ্রাম ক্ষেত্রই রয়ে যাবে।

কিন্তু যদি প্রগতিও জগৎজীবনের অন্যতম বড় কথা হয় এবং উত্তরোত্তর ভগবদ্—অভিব্যক্তিই প্রকৃতির প্রকৃত তাৎপর্য হয় তা হলে এরূপ গণ্ডি

টানাও যুক্তিহীন। জগতে আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে জড়গত জীবনকে নিজের প্রতিচ্ছবিতে, ভগবানের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব, আর ইহার আসল ব্রতও এই। তাই দেখি যে সব মহাসাধক সংসার ত্যাগ করে নিরালায় নিজেদের আত্মমুক্তি খুঁজেছেন এবং তা পেয়েছেনও তাঁরা ছাড়াও এমন অনেক অধ্যাত্ম মহাগুরু এসেছেন যাঁরা অপরকেও মুক্ত করেছেন; এবং সর্বোপরি দেখতে পাই এমন সব শক্তিমান মহাপুরুষ যাঁরা পরম চিৎ-পুরুষের শক্তিতে জড়গত জীবনের সকল মিলিত শক্তি অপেক্ষা বলীয়ান হয়ে জগতে নেমে এসেছেন, ভালবেসেই তার সহিত মল্লযুদ্ধ করে তাকে রূপান্তরে সম্মতি দিতে চেষ্টা করেছেন। সাধারণতঃ মানবজাতির মানসিক ও নৈতিক পরিবর্তনেই এই চেষ্টা নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু তাঁরা এর পরিধি বাড়িয়ে জীবনের বিভিন্ন রূপ ও প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন যাতে এসবও ভগবদ্‌-শক্তির বর্ষণ গ্রহণের উপযুক্ত আধার হয়। এইসব প্রচেষ্টা মানব আদর্শের উত্তরোত্তর বিকাশসাধন ও জাতিকে দিব্যভাবে প্রস্তুত করার কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাহ্য পরিণাম যাই হোক না কেন এ সব চেষ্টার প্রতিটিতেই পৃথিবী পেয়েছে স্বর্গশক্তি ধারণের জন্য অধিকতর সামর্থ্য এবং প্রকৃতির ক্রম-বিকাশ-যোগের মন্থর গতিরও বেগ বেড়েছে।

ভারতবর্ষে গত সহস্রাধিক বৎসর ধরে অধ্যাত্মজীবন ও জড়জীবন প্রগতি-শীল মনকে বাদ দিয়ে পাশাপাশি বাস করেছে। সর্বসাধারণের জন্য অগ্রগতির চেষ্টা বর্জন করে আধ্যাত্মিকতা তার বিনিময়ে জড়ের কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায়ের চুক্তি করেছে। সমাজের কাছ থেকে সে পেয়েছে সন্ন্যাসীর গৈরিকবস্ত্রের মত কোন বিশেষ প্রতীকধারী ব্যক্তিগণের জন্য স্বাধীনভাবে অধ্যাত্ম উন্নতি সাধনের অধিকার আর এই স্বীকৃতিও পেয়েছে যে এরূপ জীবনই মানবের লক্ষ্য এবং এই পথের পথিকরা পরম শ্রদ্ধার পাত্র; আর সমাজকে এমন এক ধর্মের ছাঁচে ফেলা হয়েছে যে মানুষের অতিপ্রচলিত কর্মানুষ্ঠানও যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনের অধ্যাত্ম প্রতীকার্থ ও এর চরম লক্ষ্যের কথা। অন্য দিকে সমাজকেও দেওয়া হয়েছিল নিশ্চেষ্টতা ও নিশ্চল আত্ম-সংরক্ষণের অধিকার। এই সুবিধা দেওয়াতে চুক্তির মূল্য অনেক কমে গেল। ধর্মের কাঠামো নির্দিষ্ট হওয়ায় স্মারক অনুষ্ঠানের প্রবণতা হল ছককাটা কার্যক্রমে পরিণত হওয়া, তার জীবন্ত তাৎপর্য নষ্ট হতে লাগল। অবশ্য নতুন নতুন সম্প্রদায় ও ধর্ম কাঠামো পরিবর্তনের জন্য পুনঃ-পুনঃ চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদেরও পরিণতি এক এক নতুন বাঁধা কার্যক্রম বা পুরনোর কিছু অদলবদল; যে স্বাধীন ও সক্রিয় মন এই অধোগতি রোধ করতে পারত তাকে নির্বাসন দেওয়ারই এই পরিণাম। অবিদ্যাগ্রস্ত ও উদ্দেশ্যহীন অসংখ্য দ্বন্দ্ব-কবলিত এই জড়জীবন হয়ে দাঁড়াল

এক গুরুভার কণ্টকর জোয়াল যা থেকে পলায়ন করাই অব্যাহতির একমাত্র উপায়।

ভারতীয় যোগসম্প্রদায়গুলিও এই আপোষ মেনে নিয়েছিল। তাদেরও লক্ষ্য করা হল ব্যষ্টির সিদ্ধি বা মুক্তি, যার জন্য দরকার সংসারের কাজ কর্ম থেকে দূরে কোন রকমের একান্ত বাস; আর এর পরিণতি সন্ন্যাস, জীবন বর্জন। গুরু জ্ঞান বিতরণ করতেন তাঁর শিষ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে। আর যদিই বা কখনও ব্যাপকতরভাবে কোন আন্দোলনের চেষ্টা করা হ'ত শেষ পর্যন্ত তারও লক্ষ্য ছিল ব্যষ্টি পুরুষের মুক্তি। নিশ্চল সমাজের সহিত চুক্তি প্রায় পুরোপুরিই মানা হ'ত।

জগতের তখনকার বাস্তব অবস্থায় এই সন্ধির যে অনেক উপকারিতা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ইহার ফলে ভারতে এমন এক সমাজ গড়ে উঠল যার ব্রত হল আধ্যাত্মিকতার সংরক্ষণ ও পূজা, আর ভারত এমন এক স্বতন্ত্র দেশ হল যার দুর্গের মত আশ্রয়ে সর্বোত্তম অধ্যাত্ম আদর্শ তার চারিদিককার বিরোধী শক্তির অবরোধে অভিভূত না হয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হল তার পূর্ণ বিশুদ্ধতা নিয়ে। কিন্তু ইহা এক আপোষ মাত্র, চরম বিজয় নয়। জড়জীবন হারাল বিকাশের দিব্যসংবেগ; আর অধ্যাত্ম জীবন নিরালায় থেকে তার তুঙ্গতা, বিশুদ্ধতা রক্ষা করল বটে, কিন্তু সে-ও হারাল তার পূর্ণশক্তি ও জগতের পক্ষে তার কার্যকারিতা। সুতরাং ভগবানের বিধানে যোগী ও সন্ন্যাসীর দেশ যে উপাদানকে অর্থাৎ প্রগতিশীল মনকে বর্জন করেছিল তারই কঠোর ও অলঙ্ঘ্য সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হল নিজের বর্তমান অভাব পূরণের জন্য।

আমাদের একথা স্বীকার করতে হবে যে ব্যষ্টির বাস শুধু নিজের মধ্যে নয়, সমাজেও, এবং ব্যষ্টির সিদ্ধি ও মুক্তি জগতে ভগবদ্-অভিপ্রায়ের একমাত্র তাৎপর্য নয়। আমাদের স্বাধীনতার অবাধ ব্যবহারের মধ্যে অপরের ও মানবজাতির মুক্তিও অন্তর্গত; আমাদের সিদ্ধির কার্যকারিতার পরাকাষ্ঠা হল নিজেদের মধ্যে দিব্য প্রতীক উপলব্ধির পর অন্যের মধ্যে তা ফুটিয়ে তোলা, বহুগুণিত করা ও অবশেষে বিশ্বজনীন করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতির সাধারণ কর্মপ্রণালী ও তার ক্রমবিকাশের তিনটি ক্রম পর্যবেক্ষণ করে আমরা যে সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, সেই একই সিদ্ধান্তে এলাম মানবজীবনের ত্রিবিধ যোগ্যতার বাস্তব দৃষ্টিতে। এখন আমরা উপলব্ধি করছি আমাদের যোগসমন্বয়ের পূর্ণ লক্ষ্য।

পরম চিৎ-পুরুষ বিশ্বজীবনের শীর্ষ; জড় তার ভিত্তি এবং মন এ-দুয়ের যোগসূত্র। চিৎ-পুরুষই নিত্য; মন ও জড় তার কর্মপ্রণালী। যা প্রচ্ছন্ন ও যাকে প্রকাশ করতে হবে তা এই চিন্ময় পুরুষ। মন ও দেহ তাঁর

ঈপ্সিত আত্ম-প্রকাশের উপায়স্বরূপ। চিন্ময় পুরুষ যোগেশ্বরের বিগ্রহ; মন ও দেহ সাধন। প্রাতিভাসিক জীবনে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর বিধান। সমগ্র প্রকৃতি হল গোপন সত্যের ক্রম-বিকাশের সাধনা, উত্তরোত্তর সাফল্যের সহিত দিব্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

জন সাধারণের জন্য প্রকৃতি যা সাধন করতে চায় মন্থর পরিণাম ধারায়, যোগ তা সাধন করে ব্যষ্টির জন্য দ্রুত আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে। যোগের পন্থা হল প্রকৃতির সব শক্তির উদ্দীপন, তার সকল সামর্থ্যের ঊর্ধ্বায়ন। প্রকৃতি আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তোলে অতিকষ্টে, অবর সিদ্ধির জন্য তাকে সর্বদাই আসতে হয় পিছনে; কিন্তু যোগের ঊর্ধ্বায়িত শক্তিতে ও একাগ্র পদ্ধতিতে একাজ নিষ্পন্ন হয় দ্রুত গতিতে এবং ইহার সঙ্গে মনের সিদ্ধি, এমন কি ইচ্ছা হলে দেহের সিদ্ধিলাভ সম্ভব। প্রকৃতি ভগবানকে খোঁজে নিজের সব প্রতীকের মধ্যে, যোগ প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে চলে প্রকৃতির অধীশ্বরের কাছে, বিশ্ব ছাড়িয়ে বিশ্বোত্তীর্ণের নিকট এবং সেখান থেকে ফিরেও আসতে পারে বিশ্বোত্তীর্ণ জ্যোতি ও শক্তি সমেত, সর্বশক্তিমানের আদেশ সহ।

কিন্তু পরিণামে উভয়েরই লক্ষ্য এক। মানবজাতির মধ্যে যোগকে সর্বজনীন করে তোলাতেই প্রকৃতির নিজের বিলম্ব ও প্রচ্ছন্নতার উপর তার চরম বিজয়। এখন যেমন সে জড়বিজ্ঞানে প্রগতিশীল মনের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে মনোময় জীবনের পূর্ণ বিকাশের উপযুক্ত করতে চাইছে, তেমন ইহা অপরিহার্য যে তাকে চেষ্টা করতে হবে যোগের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে যোগ্য করতে পরতর পরিণামের জন্য, দ্বিজন্ম, অধ্যাত্মজীবনের জন্য। আর মনোময় জীবন যেমন জড়গত জীবনকে ব্যবহার করে তাকে পূর্ণ করতে চাইছে, তেমন অধ্যাত্মজীবনও ব্যবহার ও পূর্ণ করবে জড়গত ও মনোময় জীবনকে দিব্য আত্মপ্রকাশের সাধন হিসাবে। যে-যুগে একাজ নিষ্পন্ন হবে তা হবে পৌরাণিক সত্য বা কৃত যুগ, প্রতীকের মধ্যে সত্য-অভিব্যক্তির যুগ। দীপ্ত, পরিতৃপ্ত ও আনন্দপূর্ণ মানবজাতির মধ্যে প্রকৃতি যখন তার কর্মের পরিণতিতে, কর্মের সমাপ্তিতে বিশ্রাম নেবে, এ হবে সেই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের যুগ।

মানবের কর্তব্য হল বিশ্ব-মাতাকে আর ভুল না বুঝে, তাঁর অপবাদ ও অপব্যবহার থেকে বিরত হয়ে তাঁর অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করা এবং তাঁর বীর্যবত্তম উপায়ে পরমতম আদর্শের জন্য সর্বদা আস্পৃহা করা।

৪

যোগের বিভিন্ন পথ

মানুষের মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ ও তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সাধনার বিভিন্ন কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে এই যে সব সম্বন্ধ আমরা প্রাকৃতিক বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখলাম, তারই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখব বিভিন্ন যোগসম্প্রদায়ের মূল তত্ত্ব ও প্রণালী সম্বন্ধে। আর যদি আমরা তাদের সব কেন্দ্রীয় সাধনপদ্ধতি ও মুখ্য লক্ষ্য মিলিয়ে সুসমঞ্জস করতে চাই তা হলে দেখা যাবে যে প্রকৃতিদত্ত ভিত্তিই আমাদের স্বাভাবিক ভিত্তি ও তাদের সমন্বয়ের বিধান।

কিন্তু এক বিষয়ে যোগ বিশ্বপ্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়া ছাড়িয়ে তার ঊর্ধ্বে উঠে যায়। কারণ বিশ্বমাতার লক্ষ্য হল তার নিজের লীলা ও সৃষ্টির মধ্যে ভগবানকে আলিঙ্গন করা ও সেখানে তাঁকে উপলব্ধি করা। কিন্তু যোগের উচ্চতম স্তরে প্রকৃতি নিজেকে ছাড়িয়ে যায় এবং ভগবানকে উপলব্ধি করে তাঁর স্বরূপে, বিশ্বোত্তীর্ণ বিভাবে,—এমন কি বিশ্বলীলা থেকে তফাৎ থেকে। সেই জন্য কেউ কেউ মনে করেন যে ইহা যোগের শুধু শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নয়— ইহাই তার একমাত্র আসল উদ্দেশ্য বা একান্ত কাম্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু প্রকৃতি যে এই ভাবে তার বিবর্তনধারা ছাড়িয়ে যায় তা সর্বদা তারই এক গঠনের মাধ্যমে। জীবের হৃদয়ই তার শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম সকল ভাবাবেগকে ঊর্ধ্বায়িত ক'রে বিশ্বোত্তীর্ণ আনন্দ বা অনির্বচনীয় নির্বাণ লাভ করে; ব্যষ্টি মনই তার সাধারণ ক্রিয়াধারাকে মানসিকতার ঊর্ধ্বের জ্ঞানে পরিবর্তিত ক'রে অনির্বচনীয়ের সহিত তার একত্ব উপলব্ধি করে এবং সেই বিশ্বাতীত ঐক্যের মধ্যে তার পৃথক সত্তা ডুবিয়ে দেয়। আর সর্বদা এই জীবই অর্থাৎ যে আত্মার অভিজ্ঞতা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ও কর্ম তারই গঠনের মধ্যে সীমিত তা-ই মিলিত হয় অনপেক্ষ, নিত্যমুক্ত বিশ্বোত্তীর্ণ আত্মায়।

কার্যতঃ যোগানুশীলন সম্ভব হবার পূর্বে তিনটি ভাবনা দরকার, অর্থাৎ সাধনার জন্য যেন তিন পক্ষ ও তাদের সম্মতি প্রয়োজন; এই তিন হল ভগবান, প্রকৃতি ও মানুষের অন্তঃপুরুষ অর্থাৎ দার্শনিক ভাষায় বিশ্বোত্তীর্ণ, বিশ্বাত্মক ও জীব। শুধু জীব ও প্রকৃতি থাকলে, একটি অন্যটির কাছে আটক থাকবে, সে প্রকৃতির মন্থর গতি ছাড়িয়ে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারবে না। সুতরাং

বিশ্বাতীত এমন কিছুর প্রয়োজন যা প্রকৃতির চেয়ে মহত্তর ও তার অনধীন এবং যা আমাদের উপর ও প্রকৃতির উপর সক্রিয় হয়ে আমাদের আকর্ষণ করবে তার দিকে ঊর্ধ্বপানে এবং জীবের উত্তরণের জন্য প্রকৃতির সম্মতি আদায় করবে স্বেচ্ছায় বা জোর করে।

এই সত্যের জন্যই প্রতি যোগদর্শনে ঈশ্বর, প্রভু, পরম পুরুষ, পরমাত্মার ভাবনা প্রয়োজনীয়; তিনিই সাধনার সাধ্য, তিনিই দেন তাঁকে পাবার শক্তি ও জ্যোতিঃপ্রদ স্পর্শ। আবার ঠিক তেমনই সত্য, ভক্তি যোগের এই দৃঢ় ও প্রাচীন অনুপূরক ভাবনা যে যেমন জীবের কাছে বিশ্বাতীত প্রয়োজনীয় ও জীব তাঁকে চায়, তেমন এক অর্থে জীবও প্রয়োজনীয় বিশ্বাতীতের কাছে এবং বিশ্বাতীত তাকে চান। যেমন ভক্তের আকর্ষণ ভগবানের পানে, আকুল আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পাবার জন্য, তেমন ভগবানের আকর্ষণ ও ব্যাকুলতা ভক্তের* জন্য। মানবরূপী জ্ঞানান্বেষু, জ্ঞানের পরম বিষয়, ও জীবের দ্বারা জ্ঞানের বিশ্বজনীন শক্তির দিব্য ব্যবহার—এই তিন ব্যতীত যেমন জ্ঞানযোগ সম্ভব হয় না, তেমন ভক্তিযোগও সম্ভব হয় না মানুষী ভগবদ্-প্রেমিক, প্রেম ও আনন্দের পরম বিষয় এবং জীবের দ্বারা অধ্যাত্ম, ও রসাত্মক উপভোগের বিশ্বজনীন শক্তির দিব্য ব্যবহার বিনা; আবার তেমন মানব কর্মী, পরমসংকল্প সকল কর্ম ও যজ্ঞের অধীশ্বর এবং জীবের দ্বারা শক্তি ও ক্রিয়ার বিশ্বজনীন শক্তির দিব্য ব্যবহার বিনা কর্মযোগও সম্ভব নয়। বিষয়সমূহের পরমতম সত্য সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিগত ভাবনা যতই অদ্বৈতভাবাত্মক হ'ক না কেন এই সর্বব্যাপী ত্রিতত্ত্বকে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য।

কারণ যোগের সার দিব্য চেতনার সহিত মানুষী ব্যষ্টিচেতনার সংস্পর্শ। বিশ্বলীলায় যা তার নিজের প্রকৃত আত্মা, উৎস ও বিশ্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়েছে তার সহিত মিলনই যোগ। যাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বলি সেই জটিল ও দুর্বোধ্য গঠনের চেতনার যেকোন বিন্দুতে এই সংস্পর্শ আসতে পারে। একে আনা যেতে পারে জড়ের শরীরের মাধ্যমে, প্রাণে আনা যেতে পারে আমাদের স্নায়বিক সত্তার অবস্থা ও অনুভূতির নিয়ামক বৃত্তিসমূহের ক্রিয়ার মাধ্যমে, আবার মানসিকতার মধ্য দিয়েও তা আনা সম্ভব আর এর জন্য ভাবাবেগপ্রধান হৃদয়, সক্রিয় সংকল্প বা মনের ধীশক্তি অথবা আরো ব্যাপকভাবে মানসচেতনার সকল ক্রিয়ারই সাধারণ রূপান্তর—এসবের যে কোনোটিই সহায় হতে পারে। ঠিক সেইভাবে মনোমধ্যস্থিত কেন্দ্রীয় অহং-এর রূপান্তর দ্বারা বিশ্বাত্মক বা বিশ্বাতীত পরমসত্য ও আনন্দের দিকে সরাসরি উদ্বো-

---

* ভক্ত হল দিব্যপ্রেমিক, ভগবান প্রেম ও আনন্দের ঈশ্বর। ত্রয়ীর তৃতীয় তত্ত্ব হল ভাগবত অর্থাৎ প্রেমের দিব্য প্রকাশ।

ধনের মাধ্যমেও ঐ সংস্পর্শসাধন সম্ভব। আর সংস্পর্শের বিন্দু আমরা যেমন নির্বাচন করব আমাদের অনুশীলিত যোগের প্রকারও হবে তেমন।

কারণ ভারতে এখনও যে প্রধান যোগসম্প্রদায় প্রচলিত আছে তাদের বিশিষ্ট প্রণালীগুলির জটিলতা বাদ দিয়ে তাদের কেন্দ্রীয় তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করলে তাদের মধ্যে দেখি এক উত্তরোত্তর ক্রম-বিন্যাস যেমন এক সোপানশ্রেণী যা সর্ব-নিম্ন সোপান অর্থাৎ দেহ থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বে উঠেছে জীব এবং বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক পরমাত্মার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে। সিদ্ধি ও উপলব্ধির সাধন হিসাবে হঠযোগ নির্বাচন করে দেহ ও প্রাণিক বৃত্তিসমূহ, স্থূল দেহ নিয়ে তার কার-বার। রাজ যোগ নির্বাচন করে বিভিন্ন অংশ সমেত মনোময় পুরুষকে তার ঊর্ধ্বারোহণের শক্তি হিসাবে; সূক্ষ্মদেহেই এর মনোযোগ। কর্ম, প্রেম ও জ্ঞানের ত্রিমার্গ মনোময় পুরুষের কোন না কোন অংশ অর্থাৎ সংকল্প, হৃদয় বা বুদ্ধিকে তার যাত্রারম্ভরূপে ব্যবহার করে, আর তাদের রূপান্তর দ্বারা উপনীত হতে চায় মুক্তিপ্রদ পরমসত্যে, আনন্দে ও আনন্ত্যে—যা অধ্যাত্ম-জীবনের প্রকৃতি। ইহার সাধন পদ্ধতি হল ব্যষ্টিদেহস্থ মানবপুরুষ এবং সর্ব-ভূতস্থ অথচ নামরূপের অতীত দিব্য পরমপুরুষের সহিত সরাসরি আদান প্রদান।

হঠযোগের লক্ষ্য প্রাণ ও দেহকে জয় করা। আমরা আগেই দেখেছি যে অন্নকোষ ও প্রাণকোষের মধ্যে প্রাণ ও দেহের সমবায়েই স্থূলশরীর গঠিত আর ইহারই সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের মধ্যে প্রকৃতির সকল কার্য। কিন্তু প্রকৃতি-স্থাপিত সাম্য সাধারণ অহংগত জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হলেও হঠযোগীর উদ্দেশ্যের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। মানবজীবনের সাধারণ আয়ুঃসীমা পর্যন্ত দেহযন্ত্র চালাবার জন্য এবং তার মধ্য দিয়ে এই দেহস্থ ব্যষ্টি প্রাণ ও তার নিয়ামক জগৎপরিবেশ যে সব কাজ করতে চায় সেগুলি কমবেশী পর্যাপ্তভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে পরিমাণ প্রাণিক বা স্ফুরন্ত শক্তির প্রয়োজন সেই পরিমাণের হিসাবেই প্রকৃতির সাম্য স্থাপিত হয়েছে। সেজন্য হঠযোগ চায় প্রকৃতিকে সংশোধন করে এমন এক সাম্য আনতে যার দ্বারা জড়দেহ আরো বেশী করে অনির্দিষ্ট পরিমাণের এমন কি প্রায় অনন্ত পরিমাণ বা তীব্রতার প্রাণশক্তি অর্থাৎ প্রাণের স্ফুরন্ত শক্তির (dynamic force) অন্তঃপ্রবাহ ধারণে সক্ষম হবে। প্রকৃতিতে সাম্যের ভিত্তি হল প্রাণের এক সীমিত পরিমাণ ও শক্তির ব্যষ্টিভাবাপন্নতা; ব্যক্তিগত বা বংশগত অভ্যাস বশে ব্যষ্টি তার চেয়ে বেশী শক্তি ধারণ বা ব্যবহার বা আয়ত্ত করতে অক্ষম। হঠযোগে যে সাম্য আনা হয় তাতে দেহের মধ্যে আরো বেশী পরিমাণে বিশ্বশক্তির ক্রিয়া এনে, ধারণ করে, ব্যবহার ও আয়ত্ত করে ব্যষ্টিপ্রাণশক্তিকে বিশ্বভাবাপন্ন করার পথ উন্মুক্ত হয়।

হঠযোগের প্রধান প্রক্রিয়া হল আসন ও প্রাণায়াম। বিশ্বপ্রাণসমুদ্র থেকে যে সমস্ত প্রাণশক্তিধারা দেহের মধ্যে আসে সে সবকে কাজ কর্মে না ব্যয় করে তাদের ধারণ করার অক্ষমতার চিহ্ন স্বরূপ যে চাঞ্চল্য আসে হঠযোগ তা দূর করে বহুবিধ আসন অর্থাৎ নির্দিষ্ট অঙ্গবিন্যাসের সাহায্যে এবং দেহে আনে অসাধারণ স্বাস্থ্য, শক্তি ও নমনীয়তা, আর এইভাবে যে সব অভ্যাসের দরুন দেহ সাধারণ জড়প্রকৃতির বশীভূত ও তার সাধারণ কাজকর্মের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে সেগুলি থেকে তাকে মুক্ত করার প্রয়াস করে। এই যোগের প্রাচীন ঐতিহ্যে এই ধারণা রয়েছে যে এই জয়ের সীমানা এতদূর বিস্তৃত করা যায় যে তাতে এমন কি মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকেও পরাভূত করা সম্ভব। এর পর হঠযোগীর প্রয়াস হয় নানাবিধ গৌণ কিন্তু বিস্তারিত প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহের সকল প্রকার মলিনতা শুদ্ধ করা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের যে সমস্ত প্রক্রিয়া তার সব চেয়ে বড় সাধন যন্ত্র তাদের জন্য স্নায়ুমণ্ডলীকে মুক্ত রাখা। এর নাম প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের বা প্রাণের সংযম, কারণ শ্বাসপ্রশ্বাসই সব প্রাণশক্তির মুখ্য দৈহিক ক্রিয়া। প্রাণায়ামে হঠযোগীর দুটি উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। প্রথম, এতে দেহের সিদ্ধি সম্পূর্ণ হয়। জড়প্রকৃতির বহু সাধারণ রীতি থেকে প্রাণশক্তি মুক্তি পায়; লাভ হয় সতেজ স্বাস্থ্য, দীর্ঘস্থায়ী যৌবন ও প্রায়শঃই অসাধারণ আয়ু। অপরপক্ষে প্রাণায়ামের ফলে প্রাণকোষের মধ্যস্থিত প্রাণশক্তির কুণ্ডলিনী সর্পশক্তি জাগ্রত হয় আর যোগীর কাছে অপাবৃত হয় চেতনার এমন সব ক্ষেত্র, অনুভূতির এমন সব পর্যায় ও এমন সব অসাধারণ শক্তি যা থেকে সাধারণ মানবজীবন বঞ্চিত; আবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের সাধারণ সব শক্তি ও বৃত্তি বলশালী ও প্রখর হয়। হঠযোগী এসব সুবিধাকে আরো দৃঢ় ও প্রবল করে তার অন্যান্য গৌণ প্রক্রিয়ার দ্বারা।

সেজন্য হঠযোগের ফল চোখে চমক লাগায়, আর সাধারণ বা জড়াসক্ত মনকে সহজেই অভিভূত করে। কিন্তু তবু শেষে প্রশ্ন আসে, এত বিপুল পরিশ্রমের পর আমরা কি পেলাম? অবশ্য জড়প্রকৃতির যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ জড়জীবন রক্ষা, তার সর্বোচ্চসিদ্ধি ও আর এমন কি এক অর্থে জড়জীবনের অধিকতর সামর্থ্যলাভ তা অসাধারণ পরিমাণে সিদ্ধ হয়। কিন্তু হঠযোগের ত্রুটি এই যে ইহার শ্রমসাধ্য দুরূহ প্রক্রিয়াগুলিতে এত সময় ও শক্তি লাগে ও সেজন্য মানুষের সাধারণ জীবন যাত্রা থেকে হঠযোগীর বিচ্ছিন্নতা এত বেশী যে জাগতিক জীবনের পক্ষে এই যোগসাধনার ফল কাজে লাগান অসম্ভব, অথবা অসাধারণভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। যদি এই ক্ষতির বিনিময়ে আমরা অন্য কোন আন্তর জগতে, মনোলোকে বা প্রাণলোকে অন্য জীবন লাভ করি, তা হলেও সে সবই ফল আমরা পেতে পারি অন্যসব যোগপন্থায়, রাজযোগ বা তন্ত্রের মাধ্যমে, আর এর জন্য অত কষ্টকর পদ্ধতির দরকার হয় না বা অত

কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে যেতে হয় না। অপরপক্ষে হঠযোগে প্রভূত প্রাণ-শক্তি, দীর্ঘস্থায়ী যৌবন, স্বাস্থ্য ও আয়ু প্রভৃতি যে সব স্থূল ফল পাওয়া যায় সে সবকে যদি আমরা কৃপণের মত নিজেদের ব্যবহারের জন্য ধরে রাখি, জনজীবন থেকে তফাতে রেখে তাদের অন্য কোন উদ্দেশ্যে না লাগাই, জগতে সর্বসাধারণের জন্য তাদের কোন ব্যবহার না আসে তা হলে এসবের মূল্য এমন কি ? হঠযোগ ফল পায় প্রচুর, কিন্তু এর জন্য দাম দিতে হয় মাত্রাতিরিক্ত, আর তা একরকম নিরর্থক।

রাজযোগের ক্ষেত্র আরো উচ্চে। অন্নময় সত্তার মুক্তি ও সিদ্ধি এর লক্ষ্য নয়, এর লক্ষ্য মনোময় সত্তার মুক্তি ও সিদ্ধি, ভাবাবেগপ্রধান ও ইন্দ্রিয়গত জীবনের নিয়ন্ত্রণ এবং মনন ও চেতনার সমগ্র উপস্করের উপর কর্তৃত্ব। চিত্তে অর্থাৎ মানসচেতনার যে উপাদানে সব মানসক্রিয়ার উদয়, এর দৃষ্টি তাতে নিবদ্ধ এবং প্রথম কাজ—তাকে শুদ্ধ ও শান্ত করা; হঠযোগেরও এই চেষ্টা, তবে তার সহায় জড়ীয় উপাদান। মানুষের সাধারণ জীবন বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ, এমন এক রাজ্য যেখানে প্রজারা যে শুধু নিজেদের মধ্যেই সংগ্রামে লিপ্ত তা নয়, তারা কুশাসিত, কারণ রাজ্যেশ্বর, পুরুষ তার সব মন্ত্রীর অর্থাৎ শক্তির অধীন, এমন কি যারা তার প্রজা যেমন ইন্দ্রিয়সংবিৎ, ভাবাবেগ, ক্রিয়া ও উপভোগের করণ তাদেরও অধীন সে। এই পরাধীনতার বদলে আনতে হবে স্বারাজ্য, আত্ম-শাসন। সুতরাং প্রথম করণীয়—বিশৃঙ্খলার সব শক্তিকে পরাভূত করার জন্য শৃঙ্খলার শক্তিদের সাহায্যদান। রাজযোগের প্রথম কাজ হল সযত্ন আত্ম-সংযম; এর সাহায্যে সরাতে হবে সেইসব বিশৃঙ্খল কর্মকে যা হীন স্নায়ুসত্তাকে প্রশ্রয় দেয় ও এদের বদলে আনতে হবে মনের সদভ্যাস। সত্যানুশীলন, অহমাত্মক সকল প্রকার কামনা বর্জন, অহিংসা, পবিত্রতা, সতত ধ্যান এবং মানস-রাজ্যের প্রকৃত রাজা যে দিব্য পরম পুরুষ তার প্রতি অনুরাগ—এই সবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় মন ও হৃদয়ের শুদ্ধ, প্রসন্ন, ও স্বচ্ছ অবস্থা।

কিন্তু ইহা শুধু প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এর পর দরকার মন ও ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ক্রিয়াগুলিকে সম্পূর্ণ প্রশমিত করা যাতে অন্তঃপুরুষ চেতনার উচ্চতর স্তরে আরোহণ ক'রে পূর্ণমুক্তি ও আত্ম-কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে। কিন্তু রাজযোগ একথা ভোলে না যে সাধারণ মনের অক্ষমতার জন্য বহুলাংশে দায়ী স্নায়ুমণ্ডলী ও দেহের সব প্রতিক্রিয়ার উপর ইহার অধীনতা। সেজন্য ইহা হঠযোগের কাছ থেকে নেয় তার আসন ও প্রাণায়ামের কৌশল, তবে তাদের প্রতিক্ষেত্রের বহুবিধ ও বিস্তারিত প্রকার থেকে বেছে নেয় এমন এক পন্থা যা সবচেয়ে সরল, দ্রুত ও কার্যকরী ও তার নিজের অব্যবহিত উদ্দেশ্য পূরণের পক্ষে যথেষ্ট। এই ভাবে সে হঠযোগের জটিলতা ও ঝঞ্ঝাট থেকে নিস্তার পায়

অথচ দেহ ও প্রাণবৃত্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণের জন্য অনন্যসাধারণ গূঢ় শক্তিতে ভরা আন্তর স্ফুরত্তা বিকাশের জন্য অর্থাৎ যাকে যোগের ভাষায় বলা হয় কুণ্ড-লিনী সেই কুণ্ডলিত সুপ্তসর্প বা আন্তর শক্তির জাগরণের জন্য সে কাজে লাগায় হঠযোগের সব চেয়ে দ্রুত ও শক্তিশালী পদ্ধতি। এ কাজের পরের কাজ হল অস্থির মনের সম্পূর্ণ প্রশমন ও উচ্চতর স্তরে এর উন্নয়ন আর তার উপায়, ক্রমান্বয়ে মানসশক্তির একাগ্রতা যার পরিণাম সমাধি।

সমাধিতে মন তার সংকীর্ণ জাগ্রত সব ক্রিয়াধারা থেকে সরে চেতনার আরো মুক্ত ও উচ্চতর অবস্থায় যাবার সামর্থ্য লাভ করে; আর এই ভাবে রাজযোগের দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সমাধির প্রথম ফল, বহির্চেতনার বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত শুদ্ধ মানসিক ক্রিয়া লাভ ও সেখানে থেকে পরতর মানসোত্তর ভূমিতে উত্তরণ যেখানে জীব প্রবেশ করে তার প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবনে। কিন্তু এ ছাড়াও পাওয়া যায় বিষয়ের উপর চেতনার অবাধ ও একাগ্র শক্তিক্রিয়ার সামর্থ্য যা আমাদের দর্শনের কথায় আদি বিশ্বশক্তি ও জগতের উপর দিব্য ক্রিয়াপদ্ধতি। সমাধি অবস্থায় যোগী তো সর্বোচ্চ বিশ্বোত্তীর্ণ জ্ঞান ও অনুভূতির অধিকারী হন। এখন এই সামর্থ্য বলে তিনি জাগ্রত অবস্থাতেও পরাকবৃত্ত জগতে তাঁর কাজের জন্য সরাসরি প্রয়োজনীয় প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হন। কেন না শুধু স্বারাজ্য, আত্ম-শাসন বা প্রত্যক্-বৃত্ত সাম্রাজ্য অর্থাৎ প্রত্যক্‌বৃত্ত চেতনার দ্বারা তার স্বধামের অবস্থা ও কর্মের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যে প্রাচীন রাজযোগ পন্থার লক্ষ্য ছিল তা নয়, তার সাথে সাম্রাজ্য, বহির্সাম্রাজ্য, প্রত্যক্‌বৃত্ত চেতনার দ্বারা তার বাহিরের সব কর্ম ও পরিবেশের নিয়ন্ত্রণও তার লক্ষ্যেব অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমরা দেখি যে যদিও হঠযোগের কর্মক্ষেত্র প্রাণ ও দেহ, এবং তার লক্ষ্য শারীরিক জীবন ও তার সামর্থ্যের অনন্যসাধারণ সিদ্ধি, তবুও তা দিয়ে ইহা মনোময় জীবনের রাজ্যে প্রবেশ করে। তেমন যদিও রাজযোগের কাজ মন নিয়ে ও তার লক্ষ্য মনোময় জীবনের সামর্থ্যের অনন্যসাধারণ সিদ্ধি ও প্রসার, তথাপি ইহাও তা ছাড়িয়ে প্রবেশ করে অধ্যাত্ম জীবনের রাজ্যে। কিন্তু এই পন্থার ত্রুটি এই যে ইহা সমাধির বিভিন্ন অস্বাভাবিক অবস্থার উপর অত্যধিক নির্ভরশীল। এই সংকীর্ণতার দরুণ শারীরিক জীবন থেকে দূরে থাকার প্রবৃত্তি আসে অথচ ইহাই আমাদের ভিত্তি এবং এখানেই আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক লাভ আনা প্রয়োজন। বিশেষতঃ এই পন্থায় অধ্যাত্ম জীবন অতিরিক্ত পরিমাণে সমাধি অবস্থার সহিত জড়িত। আমাদের উদ্দেশ্য হল অধ্যাত্ম জীবন ও তার সব অনুভূতিকে জাগ্রত অবস্থায়, এমন কি সব শক্তির স্বাভাবিক ব্যবহারেও পূর্ণ সক্রিয় ও পূর্ণ কার্যকরী করা। কিন্তু রাজযোগে আধ্যাত্মিক জীবনের ঝোঁক হল সমগ্র জীবনের মধ্যে না নেমে ও

তাকে অধিগত না করে আমাদের স্বাভাবিক অনুভূতির পশ্চাতে এক গৌণ লোকে নিবৃত্ত হওয়া।

যে রাজ্য রাজযোগ তার এলাকার বাহিরে রাখে তা জয় করতে চেষ্টা করে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের ত্রিমার্গ। তবে রাজযোগ থেকে ইহার পার্থক্য এই যে ইহাতে সমগ্র মানসভূমির বিস্তারিত শিক্ষাকে সিদ্ধির সর্ত গণ্য করা হয় না ও ইহা তাতেই নিবদ্ধ থাকে না, কতকগুলি কেন্দ্রীয় তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি, হৃদয় ও সংকল্পকে অবলম্বন ক'রে তাদের সব স্বাভাবিক বৃত্তিকে তাদের সাধারণ বাহ্য আসক্তি ও কর্ম থেকে ফিরিয়ে ভগবানে একাগ্র ক'রে তাদের রূপান্তর করাই ইহার চেষ্টা। আর একটি পার্থক্য এই যে—আর পূর্ণ যোগের দিক থেকে ইহা এক ত্রুটি মনে হয়—ত্রিমার্গ, মানসিক ও দৈহিক সিদ্ধির প্রতি উদাসীন, ভগবদ্‌—উপলব্ধির সর্ত হিসাবে শুধু বিশুদ্ধতা সাধন ইহার লক্ষ্য। ইহা অখণ্ড ভগবদ্‌-উপলব্ধির মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয় ও সংকল্পের কোনো সমন্বয়ী সামঞ্জস্য না গড়ে তিনটি সমান্তরাল পথের যে কোন একটিকে নির্বাচন করে, আর অপর দুটিকে বাদ দেয় এক রকম তার বিরোধী বলে।

জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য অনন্য পরমাত্মার উপলব্ধি। এর সাধন প্রণালী হল বিচার অর্থাৎ বুদ্ধিগত ভাবনা, ও তা থেকে উপনীত হওয়া বিবেকে অর্থাৎ যথার্থ বিবেচনায়। ইহা আমাদের দৃশ্যমান বা প্রাতিভাসিক সত্তার বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ ও বিচার করে এবং প্রতিটি থেকে আমি পৃথক এই জ্ঞানে সেগুলিকে এক সামান্য সংজ্ঞার অর্থাৎ প্রকৃতির উপাদান, মায়ার অর্থাৎ প্রাতি-ভাসিক চেতনার সৃষ্টি গণ্য করে তাদের বাদ দিয়ে আলাদা করে দেয়। এই ভাবে ইহা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়, যে তার প্রকৃত স্বরূপ হল শুদ্ধ অদ্বিতীয় অনন্য পরমাত্মা যাঁর পরিবর্তন বা বিনাশ নেই ও যিনি কোন বিষয় বা বিষয়পুঞ্জের মধ্যে ধরা দেন না। সাধারণতঃ এখান থেকে যে ভাবে এই পন্থার অনুসরণ করা হয় তাতে যাত্রার অবসান হল চেতনা থেকে প্রাতি-ভাসিক সব জগৎকে বিভ্রম বলে বর্জন এবং পরব্রহ্মের মধ্যে জীবের এমন চূড়ান্ত নিমজ্জন যে "স "ন পুনরাবর্ততে", আর ফেরে না।

কিন্তু এই আত্যন্তিক পরিণতি জ্ঞানমার্গের একমাত্র বা অপরিহার্য ফল নয়। কেননা ব্যক্তিগত লক্ষ্যকে মুখ্য না করে আরো ব্যাপকভাবে এই পথ অনুসরণ করা হলে, এতে যেমন বিশ্বাতীতে পৌঁছান যায় তেমন ভগবানের জন্য বিশ্বজীবনকেও জয় করা সম্ভব হয়। প্রাচীন পথ থেকে এর পার্থক্য এই যে, এতে পরমাত্মাকে যে উপলব্ধি করা হয় তা শুধু নিজের সত্তায় নয়, সর্বভূতে তাঁর উপলব্ধি হয় ও পরিশেষে জগতের সব প্রাতিভাসিক বিভাবকেও দিব্য চেতনার স্বরূপের সম্পূর্ণ বিপরীত গণ্য না করে, তাদের উপলব্ধি করা

হয় দিব্যচেতনারই লীলারূপে। আবার এই উপলব্ধিকে ভিত্তি করে আরো বৃহৎ পরিণতি সম্ভব অর্থাৎ জ্ঞানের সকল প্রকারকেই—তা তারা যতই ঐহিক হোক না কেন, দিব্যচেতনার ক্রিয়াধারারূপে রূপান্তর করা সম্ভব, যাতে তারা জ্ঞানের এক ও অনন্য পরম বিষয়কে স্বরূপে ও তাঁর সকল রূপ ও প্রতীকের লীলার মধ্যে দর্শন করবার উপযোগী হয়। এই প্রণালীতে যে আর এক ফল পাওয়া যেতে পারে, তা হল মানুষের সমগ্র বুদ্ধি ও দৃষ্টির দিব্যস্তরে উন্নয়ন, তাদের আধ্যাত্মিকভাবাপন্নতা ও মানবজাতির মধ্যে দিব্যজ্ঞানের অভ্যুদয়ের জন্য বিশ্বপ্রকৃতির প্রচেষ্টার সার্থকতা সাধন।

ভক্তিমার্গের লক্ষ্য হ'লো পরম প্রেম ও আনন্দ উপভোগ। পরমেশ্বর তাঁর পরম ব্যক্তিরূপে দিব্য প্রেমিক ও বিশ্বভোক্তা—সাধারণতঃ এই ভাবনাকেই ইহা কাজে লাগায়। তখন উপলব্ধি হয় যে জগৎ ঈশ্বরের লীলা, আত্ম-গোপন ও আত্ম-প্রকাশের বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে এর গতি, আর মানবজীবন এর চরম পর্যায়। ভক্তিযোগের তত্ত্ব হল—মানবজীবনের ভাবাবেগপ্রধান সাধারণ সম্পর্কগুলিকে ব্যবহার করা, তবে এসবকে অনিত্য জাগতিক বিষয়ে আর প্রয়োগ না করে প্রয়োগ করা হয় পরমপ্রেমিক, পরম সুন্দর আনন্দঘন ভগবানের তৃপ্তি সাধনে। এতে উপাসনা ও ধ্যানেরও একমাত্র উদ্দেশ্য হল দিব্য সম্পর্ক গঠন ও তার তীব্রতা বৃদ্ধি। আর এই যোগ সর্বপ্রকার ভাবা-বেগপ্রধান সম্পর্কের ব্যবহার সম্বন্ধে এত উদার যে এমন কি ভগবানের প্রতি শত্রুতা ও বিরোধিতা যা প্রেমেরই এক তীব্র, অধীর ও বিকৃত রূপ হিসাবে পরিগণিত, তাকেও গণ্য করা হয় উপলব্ধি ও মুক্তির এক সম্ভবপর উপায় হিসাবে। সাধারণতঃ যে ভাবে এই পথের অনুশীলন হয় তাতে এরও পরিণতি —জগৎ জীবন থেকে অপসারণ এবং যিনি বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বের ঊর্ধ্বে তাঁতে সমাপত্তি, তবে এ সমাপত্তি অদ্বৈতবাদীর থেকে ভিন্ন প্রকারের।

কিন্তু এখানেও এই আত্যন্তিক ফল অপরিহার্য নয়। এই যোগের মধ্যেই এই ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা আছে, কারণ বলা হয় যে, দিব্য প্রেমলীলা শুধু পরম পুরুষ ও জীবের সম্পর্কের মধ্যেই সীমিত নয়, পরম প্রেম ও আনন্দের একই উপলব্ধি বিষয়ে যে ভক্তেরা মিলিত হন তাদের সাধারণ মনোভাব ও পারস্পরিক সমাদরও দিব্য প্রেমলীলার অন্তর্গত। আরো ব্যাপক যে একটি সংশোধনী ব্যবস্থা তা হল দিব্য প্রেমাস্পদকে উপলব্ধি করতে হবে সর্বভূতে, শুধু মানুষে নয়, সকল প্রাণীতে আবার এ সব ছাড়িয়ে সর্বরূপের মধ্যে। এখন বুঝতে পারা যায়, যে ভক্তিযোগের এই ব্যাপক প্রয়োগ এমন ভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে যে তাতে মানুষের সমগ্র ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও সৌন্দর্য-বোধের দিব্যস্তরে উন্নয়ন, তাদের অধ্যাত্মিকভাবাপন্নতা ও মানবজাতির মধ্যে প্রেম ও আনন্দ আনার জন্য বিশ্বপ্রকৃতির প্রচেষ্টার সার্থকতা সাধন সম্ভবপর।

কর্মযোগের লক্ষ্য—পরম সংকল্পের নিকট মানুষের সকল কর্মের উৎসর্গ। আমাদের কর্মের সকল রকম অহমাত্মক উদ্দেশ্য, স্বার্থসাধনের বা জাগতিক ফলপ্রাপ্তির জন্য কর্মপ্রচেষ্টা ত্যাগ করাই এই পথের প্রথম কথা। এই ত্যাগের দ্বারা আমাদের মন ও সংকল্প এরূপ শুদ্ধ হয় যে আমরা সহজেই জানতে পারি যে মহতী বিশ্বশক্তিই আমাদের সকল কর্মের কর্ত্রী, এবং সেই শক্তির অধীশ্বর তাদের শাসক ও পরিচালক আর জীব শুধু এক মুখোস, উপলক্ষ বা যন্ত্র বা আরো সদর্থক ভাবে ক্রিয়া ও প্রাতিভাসিক সম্পর্কের এক সচেতন কেন্দ্র। এই পরম সংকল্প ও বিশ্বশক্তির কাছে ক্রিয়ার নির্বাচন ও চালনা ক্রমশঃ আরো সচেতন ভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। অবশেষে এই "তৎ-স্বরূপেই" সমর্পিত হয় আমাদের সকল কর্ম ও সকল কর্মফল। ইহার উদ্দেশ্য হল দৃশ্যমান সব কিছুর এবং প্রাতিভাসিক কর্মের প্রতিক্রিয়ার বন্ধন থেকে পুরুষের মুক্তি। অন্যান্য যোগের মত কর্মযোগকেও ব্যবহার করা হয় প্রাতিভাসিক জীবন থেকে মুক্তি ও পরমের মাঝে মহাপ্রস্থান লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখানেও এই আত্যন্তিক ফল অপরিহার্য নয়। অন্যান্য যোগের মত এরও পরিণতি হতে পারে সকল শক্তিতে, সকল ঘটনায় সকল কর্মে ভগবদ্-উপলব্ধি এবং বিশ্বক্রিয়ায় পুরুষের মুক্ত ও অহং-শূন্য অংশ গ্রহণ। এই ভাবে আসে মানুষের সকল সংকল্প ও ক্রিয়ার দিব্যস্তরে উন্নয়ন, তাদের আধ্যাত্মিকভাবাপন্নতা ও মানুষের মধ্যে মুক্তি, শক্তি ও সিদ্ধির জন্য বিশ্বপ্রকৃতির প্রচেষ্টার সার্থকতাসাধন।

আমরা আরো দেখি যে সম্যক্দৃষ্টিতে এই তিন পথই এক। সাধারণতঃ দিব্য প্রেম থেকে নিবিড় অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে আসে পরম প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান, আর এইভাবেই এ হয় জ্ঞানমার্গ; আবার দিব্য সেবাও আসে যার ফলে এ হয় কর্মমার্গ। সেরূপ পূর্ণ জ্ঞান থেকে আসে পূর্ণ প্রেম ও আনন্দ এবং যে পরম 'তৎ'কে জানা যায় তাঁর সকল কর্মের পূর্ণ স্বীকৃতি; নিবেদিত কর্ম থেকে আসে যজ্ঞেশ্বরের প্রতি পরিপূর্ণ প্রেম এবং তাঁর পথ ও সত্তা সম্বন্ধে গভীরতম জ্ঞান। এই ত্রিমার্গেই আমরা অতি সহজেই পাই সর্বভূতে ও সমগ্র অভিব্যক্তির মধ্যে বিরাজমান পরম একের অনপেক্ষ জ্ঞান, প্রেম ও সেবা।

৫

সমন্বয়

প্রধান প্রধান যোগসম্প্রদায়ের প্রতিটি তার কাজের জন্য মানুষের জটিল অখণ্ড সত্তার একাংশকে গ্রহণ করে তার শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু তাদের প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে সে সবের মধ্যে এক সমন্বয়ের ব্যাপক ভাবনাকে কার্যে পরিণত করতে পারলে তা-ই পর্যবসিত হবে পূর্ণযোগে। কিন্তু প্রবণতার দিক থেকে তারা এত বিসদৃশ, তাদের রূপ এত বেশী বিশিষ্ট ও বিস্তারিত, তাদের ভাবনা ও পদ্ধতির পারস্পরিক বিরোধিতা এত সুদৃঢ় ও দীর্ঘকালব্যাপী যে কিভাবে তাদের মধ্যে যথাযথ মিলন সম্ভব তা সহজে জানা যায় না।

বাদবিচার না করে বিভিন্ন যোগগুলিকে পুরোপুরি নিয়ে তাদের একত্র সমাবেশ করার অর্থ সমন্বয় নয়, বিশৃঙ্খলা। আবার এই স্বল্পায়ু মনুষ্য-জীবনে ও সীমিত শক্তি নিয়ে ক্রমান্বয়ে প্রতিটির অনুশীলন সহজ নয়, এমন এক কষ্টকর প্রণালীতে পরিশ্রমের যে অপচয় হবে তার কথা না হয় নাই ধরা গেল। অবশ্য কখন কখন হঠযোগ ও রাজযোগের এইভাবে ক্রমান্বয়ে অনুশীলন হয়। আধুনিক কালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে যে অসাধারণ দৃষ্টান্ত রয়েছে তাতে দেখি এক বিরাট অধ্যাত্ম সামর্থ্য প্রথমেই ছুটেছে সোজা ভগবদ্‌—উপলব্ধির জন্য, যেন জোর করে স্বর্গরাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে এবং একটির পর একটি যোগপন্থা গ্রহণ করে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সহিত তা থেকে তার সার বার করে আবার সব কিছুর মর্মলোকে ফিরে এসেছে; অর্থাৎ প্রেমশক্তি বলে, বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে সহজাত আধ্যাত্মিকতা বিস্তৃত করে ও বোধিময় জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার দ্বারা ভগবানকে উপলব্ধি ও অধিগত করেছে। কিন্তু এরূপ উদাহরণ সর্বসাধারণের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সাময়িক ও বিশেষ ধরণের অর্থাৎ এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের মহতী ও নিশ্চিত অনুভূতির মাধ্যমে সেই সত্য প্রমাণ করা যা এখন মানবজাতির মধ্যে অত্যাবশ্যক এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শাখার সুদীর্ঘ দ্বন্দ্বে দীর্ণ এই জগৎ যার দিকে বহুবাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সে সত্য এই যে সকল সম্প্রদায়ই একই অখণ্ড সত্যের রূপ ও অংশ, আর সকল সাধন প্রণালীরই সাধ্য একই পরম অনুভূতি, তবে বিভিন্ন পথে। একমাত্র যা প্রয়োজনীয় তা ভগবানকে জানা, তা-ই হওয়া ও তাঁকে অধিগত করা। বাকী সব ইহার

মধ্যেই আছে অথবা ইহাই পরিণাম; এই একমাত্র নিঃশ্রেয়সই হবে সাধনার সাধ্য এবং তা সিদ্ধ হলে অবশিষ্ট সব কিছুই, সকল প্রয়োজনীয় রূপ ও অভিব্যক্তি আমরা পাব ভগবানের পরম সংকল্প অনুযায়ী।

সুতরাং যে সমন্বয় আমরা চাই তা অন্য সব যোগপন্থাকে একত্র জড়ো করে বা ক্রমান্বয় অনুশীলনের দ্বারা পাওয়া যায় না। এই সমন্বয় সাধনের উপায়—অন্যসব যৌগিক সাধন পদ্ধতির রূপ ও বহিরংগ উপেক্ষা করে বরং সে সবের সাধারণ এমন কোন কেন্দ্রীয় তত্ত্ব অবলম্বন করা যার মধ্যে তাদের বিশেষ তত্ত্বগুলি থাকবে ও যথার্থ স্থানে ও পরিমাণে কার্যকরী হবে; তাছাড়া এমন কোন কেন্দ্রীয় স্ফুরন্ত শক্তি ধরা চাই যা সে সবের বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ পন্থাগুলির সাধারণ গূঢ় রহস্য হবে এবং সেজন্য যার সাহায্যে এদের বিচিত্র শক্তি ও বিভিন্ন উপকারিতার মধ্যে থেকে কতকগুলিকে স্বাভাবিকভাবে বেছে তাদের যুক্ত করা সম্ভব। প্রকৃতির কার্যপ্রণালী ও যৌগিক পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনার সময় আমরা প্রথমেই এই লক্ষ্য তুলে ধরেছিলাম। বর্তমানে আমরা তাতেই ফিরে আসছি কোন নির্দিষ্ট সমাধানের সম্ভাবনার আশায়।

প্রথমেই আমাদের লক্ষ্যে পড়ে যে ভারতে এখনও এমন এক বিশিষ্ট যোগপন্থা প্রচলিত আছে যা স্বভাবতঃই সমন্বয়শীল এবং যার সুরু প্রকৃতির এক মহৎ কেন্দ্রীয় তত্ত্ব থেকে, প্রকৃতির মহতী স্ফুরন্তী শক্তি থেকে। কিন্তু ইহা এক স্বতন্ত্র যোগ, অন্য সব যোগের সমন্বয় নয়। এই সাধনা তন্ত্র-মার্গ। ইহার কোন কোন পরিণতির জন্য তন্ত্র অতান্ত্রিকদের কাছে নিন্দার বিষয় হয়েছে; এই নিন্দার জন্য বিশেষ দায়ী বামমার্গের পরিণতি যাতে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের সীমা ছাড়াবার পরও তাতে সন্তুষ্ট না থেকে এ সবের স্থলে ক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত যথার্থতা না এনে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং অসংযত সামাজিক দুর্নীতির পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও তন্ত্র আদিতে ছিল এক মহান বীর্যবন্ত পন্থা এবং এমন সব ভাবনার উপর ইহার প্রতিষ্ঠা যা সব অন্ততঃ আংশিক ভাবেও সত্য। এমন কি ইহার যে দুই ভাগ, দক্ষিণমার্গ ও বামমার্গ তাদেরও গোড়ায় আছে এক গভীর উপলব্ধি। প্রাচীন প্রতীক অর্থে দক্ষিণ ও বাম এই দুই পদের দ্বারা জ্ঞানমার্গ ও আনন্দমার্গের পার্থক্য সূচিত হ'ত; দক্ষিণ মার্গের কথা এই যে মানবের মধ্যস্থিত প্রকৃতি তার নিজের শক্তি, উপাদান ও যোগ্যতার সামর্থ্য ও ব্যবহারের মধ্যে যথার্থ সম্যক্ বিবেক বা বিচারের দ্বারা নিজেকে মুক্ত করে; আর বামমার্গে মানবের মধ্যস্থিত প্রকৃতি নিজেকে মুক্ত করে তার নিজের শক্তি, উপাদান ও যোগ্যতার সামর্থ্য ও ব্যবহারের সানন্দ স্বীকৃতি দ্বারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই মার্গেই দেখা দিল তত্ত্বের অজ্ঞতা, প্রতীকের বিকৃতি ও অধঃপতন।

কিন্তু এখানেও যদি আমরা বাস্তব পদ্ধতি ও ব্যবহার বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয়

তত্ত্বটি খুঁজি তাহলে আমরা প্রথম দেখি যে তন্ত্র স্পষ্টতঃই যোগের সব বৈদিক পদ্ধতি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রেখেছে। এক অর্থে বলা যায় আমরা এ পর্যন্ত যে সব যোগসম্প্রদায়ের কথা বলেছি সে সবই তত্ত্বের দিক থেকে বৈদান্তিক; জ্ঞানেই তাদের শক্তি, তাদের পদ্ধতিও জ্ঞানমূলক, তবে এ জ্ঞান যে সর্বদাই বুদ্ধির বিচার শক্তি তা নয়, এর বদলে তা হতে পারে প্রেম ও শ্রদ্ধায় পরিস্ফুট হৃদয়ের জ্ঞান বা কর্মের মধ্যে সক্রিয় সংকল্পের জ্ঞান। এ সবেতেই যোগের প্রভু হলেন পুরুষ, চিন্ময় পুরুষ যিনি জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, এবং আকর্ষণ ও শাসন করেন। কিন্তু তন্ত্রে প্রভু হলেন প্রকৃতি, প্রকৃতিগত পুরুষ, সক্রিয় শক্তি, বিশ্বের মধ্যে কার্যসাধক শক্তিগত সংকল্প। এই শক্তি-গত সংকল্পের, তার পদ্ধতির, ইহার তন্ত্রের অন্তরঙ্গ গূঢ় রহস্য জেনে ও তা প্রয়োগ করে তান্ত্রিক যোগী তাঁর সাধন-পদ্ধতির লক্ষ্যানুসরণ করতেন; তাঁর লক্ষ্য ছিল, প্রভুত্ব, সিদ্ধি, মুক্তি ও আনন্দ। ব্যক্ত প্রকৃতি ও তার বাধা থেকে সরে না এসে তিনি তাদের সম্মুখীন হতেন এবং তাদের আয়ত্তে এনে জয় করতেন। কিন্তু অবশেষে প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা অনুযায়ী তান্ত্রিক যোগের অধিকাংশ তত্ত্ব নষ্ট হয়ে গেল তার আচার পদ্ধতির মধ্যে, ইহা হয়ে উঠল কতকগুলি নিয়ম ও রহস্যপূর্ণ গোপন ক্রিয়ার যন্ত্র। অবশ্য ঠিক মত ব্যবহৃত হলে এসব তখনও শক্তিশালী ছিল, কিন্তু তখন আর তাদের আদি তাৎপর্যের স্বচ্ছতা ছিলনা।

তন্ত্রের কেন্দ্রীয় ভাবনা হল শক্তি-উপাসনা কারণ শক্তিই একমাত্র সর্বার্থ-সাধিকা। কিন্তু ইহা সত্যের এক দিক মাত্র। ইহার বিপরীত প্রান্ত হল বেদান্তর ভাবনা যে শক্তি ভ্রমাত্মক মায়াশক্তি, আর সক্রিয়-শক্তির ছলনা থেকে মুক্তি পাবার উপায়—নীরব নিষ্ক্রিয় পুরুষের অন্বেষণ। কিন্তু পূর্ণ অখন্ড ভাবনায় চিন্ময় পুরুষই ঈশ্বর, প্রকৃতিগত পুরুষ তাঁর কার্যসাধিকা শক্তি। পুরুষের স্বরূপ,-সৎ, চিন্ময় শুদ্ধ অনন্ত আত্ম-সত্তা; শক্তি বা প্রকৃতি চিৎ-স্বরূপা, ইহা পুরুষের আত্ম-সচেতন সত্তার শুদ্ধ ও অনন্ত শক্তি। বিরাম ও ক্রিয়া—এই দুই মেরুর মধ্যে এই দুয়ের সম্পর্ক। যখন শক্তি সচেতন আত্ম-সত্তার আনন্দে মগ্ন তখন বিরাম; যখন পুরুষ নিজ শক্তির ক্রিয়ায় নিজেকে বাহিরে ঢেলে দেন তখন ক্রিয়া, সৃষ্টি ও সম্ভূতির আনন্দ। কিন্তু যেহেতু আনন্দই সকল সম্ভূতির স্রষ্টা ও জনয়িতা, সেহেতু এর কার্য-প্রণালী হল তপঃ অর্থাৎ পুরুষের চিৎ-শক্তি যা সত্তার মধ্যে স্বীয় অনন্ত যোগ্যতায় অবস্থান করে ও যা থেকে ভাবনার সত্য অর্থাৎ ভাব-সৎ-এর, বিজ্ঞানের উদ্ভব, আর এই সব ভাব-সৎ সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম আত্ম-সত্তা থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তাদের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ধ্রুব এবং তাদের মধ্যেই বর্তমান রয়েছে মন, প্রাণ ও জড় সংজ্ঞায় তাদের স্বীয় সম্ভূতির প্রকৃতি ও ধর্ম। তপঃ-র

অন্তিম সর্বশক্তিমত্তা এবং বিজ্ঞানের অভ্রান্ত পূর্ণতাপ্রাপ্তি—ইহারাই সকল যোগের মূল ভিত্তি। মানুষের মধ্যে এই দুই শক্তির নাম দেওয়া হয় সংকল্প ও শ্রদ্ধা; শেষ পর্যন্ত এই সংকল্পের আত্মসার্থকতা নিশ্চিত কারণ ইহা জ্ঞানময়; আর যে সত্য বা বিজ্ঞান এখনও অভিব্যক্তিতে চরিতার্থ হয় নি নিম্নচেতনায় তার প্রতিবিম্ব হল শ্রদ্ধা। ভাবনার এই আত্ম-নিশ্চয়তারই কথা গীতায় এই ভাবে বলা হয়েছে, "যোযচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ—" মানুষের শ্রদ্ধা যেমন অর্থাৎ অন্তঃস্থ ধ্রুব ভাবনা যেমন, তেমন-ই সে হয়।

তাহলে দেখা গেল প্রকৃতির যে ভাবনা থেকে আমাদের সাধনার আরম্ভ মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সে ভাবনা কি; আর যোগ ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব বৈ আর কিছু নয়। স্বীয় শক্তির মাধ্যমে পুরুষের আত্ম-সার্থকতাই প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতির গতি দ্বিবিধ—পরা ও অপরা, অথবা আমরা এদের নাম দিতে পারি দিব্য ও অদিব্য। কিন্তু এই পার্থক্য শুধু ব্যবহারিক অর্থেই প্রযোজ্য কারণ এমন কিছু নেই যা দিব্য নয়, আর ব্যাপকতর দৃষ্টিতে এই পার্থক্য অর্থহীন যেমন প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক এই দুই পদের পার্থক্যও অর্থহীন কারণ যা কিছু সবই প্রাকৃতিক। সকল বিষয়ই প্রকৃতির মধ্যে আবার ভগবানের মধ্যেও। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে এক প্রকৃত পার্থক্য আছে। অপরা প্রকৃতি যাকে আমরা জানি, বর্তমানে আমরা যা, এবং যা আমরা থাকব যতদিন না আমাদের মধ্যস্থ শ্রদ্ধার পরিবর্তন হয়—সেই অপরা প্রকৃতির কাজ সীমা ও বিভাজনের মাধ্যমে, অবিদ্যা তার স্বরূপ এবং অহমাত্মক জীবন তার পরিণতি। কিন্তু যে পরাপ্রকৃতির পানে আমাদের অভীপ্সা তার কাজ একত্ব সাধন ও সীমার উত্তরণ, বিদ্যা তার স্বরূপ এবং পরিণতি দিব্য জীবন। যোগের লক্ষ্য,-অপরা প্রকৃতি থেকে পরাপ্রকৃতিতে উত্তরণ, আর এই উত্তরণের উপায়—হয় অপরা প্রকৃতির বর্জন ও পরাপ্রকৃতিতে পলায়ন যা সাধারণ মত; অথবা অপরা প্রকৃতির রূপান্তর ও পরাপ্রকৃতিতে তার উন্নয়ন। এই শেষ উপায়টিই পূর্ণ যোগের লক্ষ্য হতে হবে।

কিন্তু যে কোন উপায়ই আমরা অবলম্বন করি না কেন, সর্বদাই আমাদের নিম্নজীবনের মধ্যকার কিছু থেকেই উচ্চতর জীবনে উঠতে হবে। সাধন পথের কোন স্থান থেকে মহাপ্রস্থান হবে বা পলায়নের দ্বার কোনটি হবে তা বিভিন্ন যোগসম্প্রদায় নিজেরাই বিভিন্নভাবে ঠিক করে। তারা অপরা প্রকৃতির কোন কোন কাজকর্মকে বিশেষভাবে সাধনোপযোগী করে তাদের ভগবদ্মুখী করে। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়া এক অখণ্ড গতি যাতে আমাদের সকল উপাদানের সব জটিলতা যেমন প্রভাবিত হয় পরিবেশের দ্বারা, তেমন তারা পরিবেশকেও প্রভাবিত করে। সমগ্রজীবনই প্রকৃতির যোগ। যে যোগ আমাদের লক্ষ্য তাকে প্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ ক্রিয়াও

হতে হবে। আর যোগী ও প্রাকৃত মানুষের পার্থক্য এই যে যোগীর প্রয়াস হ'ল, অহং ও ভেদের মধ্যে ও এদের সাহায্যে অপরাপ্রকৃতির যে সর্বাঙ্গীণ ক্রিয়া তার মধ্যে চলে তা পরিবর্তন করে তার স্থলে ভগবান ও ঐক্যের মধ্যে ও তাদের সাহায্যে পরাপ্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ ক্রিয়া আনা। যথার্থতঃই শুধু জগৎ থেকে ভগবানের কাছে পলায়নই আমাদের উদ্দেশ্য হলে সমন্বয় নিষ্প্রয়োজন, ইহা সময়ের অপচয় মাত্র, কারণ তা হলে আমাদের একমাত্র কার্যকরী লক্ষ্য হবে ভগবানের কাছে যাবার সহস্র পথের মধ্যে কোন একটি অর্থাৎ হ্রস্ব পথগুলির মধ্যে সম্ভবপর হ্রস্বতমটিকে বেছে নেওয়া, আর অন্য যে সব বিভিন্ন পথে একই চরম লক্ষ্যে যাওয়া যায় তাদের অনুসন্ধানের জন্য বৃথা সময় ক্ষেপ না করা। কিন্তু যদি আমাদের লক্ষ্য হয় আমাদের সমগ্র সত্তার রূপান্তরসাধন ভগবদসত্তায়, তা হলে সমন্বয় প্রয়োজন।

অতএব আমাদের যে পদ্ধতি অনুযায়ী চলতে হবে তা হল সমগ্র সচেতন সত্তাকে ভগবানের সম্পর্কে ও সংস্পর্শে আনা এবং আমাদের সমগ্র সত্তাকে তাঁর সত্তায় রূপান্তর করার জন্য তাঁকে অন্তরে আহ্বান করা যাতে এক অর্থে আমাদের মধ্যেকার আসল ব্যক্তি অর্থাৎ ভগবান নিজেই সাধনা* সাধক আবার যজ্ঞের অধীশ্বর হতে পারেন। তিনিই আমাদের অবর ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করেন দিব্য রূপান্তরের কেন্দ্র ও আপন সিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে। কার্যতঃ আমাদের সমগ্র সত্তার উপর তপোশক্তির চাপ অর্থাৎ দিব্য প্রকৃতির ভাবনার মধ্যে বর্তমান আমাদের অন্তঃস্থ চিৎ-শক্তির চাপ তার নিজের সিদ্ধি নিজেই আনে। সর্বজ্ঞানময়ী সর্বসাধিকা দিব্য চিৎ-শক্তি নেমে আসেন সীমা ও অন্ধকারের উপর এবং সমগ্র অপরা প্রকৃতিকে উত্তরোত্তর দীপ্ত ও বীর্যবন্ত করে অবর মানুষী আলোক ও মর্ত্য কর্মের সকল সংজ্ঞার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করেন নিজের আপন ক্রিয়া।

মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের দিক থেকে, এই পদ্ধতির অর্থ এই যে ইহার সমগ্র ক্ষেত্র ও উপস্কর সমেত অহংকে উত্তরোত্তর সমর্পণ করতে হবে তাঁর কাছে যিনি অহং-এর অতীত এবং যাঁর ক্রিয়াধারা বিরাট, অপ্রমেয় ও সর্বদাই অনিবার্য। একথা ঠিক যে ইহা কোন সোজা পথ বা সহজ সাধনা নয়। ইহার জন্য দরকার অপরিসীম বিশ্বাস, পরম সাহস ও সর্বোপরি অকম্প ধৈর্য। কেন না ইহার তিনটি পর্যায়, আর তার মাত্র শেষেরটিতেই পুরো আনন্দ বা ক্ষিপ্রতা পাওয়া সম্ভব—ভগবানের সংস্পর্শে আসার জন্য অহং-এর প্রয়াস, পরাপ্রকৃতিকে গ্রহণ করা, তা-ই হওয়ার জন্য দিব্য ক্রিয়ার দ্বারা সমগ্র

---

* সাধনা, যে অনুশীলনে সিদ্ধিলাভ হয়; সাধক, যে যোগীর লক্ষ্য ঐ অনুশীলন দ্বারা সিদ্ধিলাভ।

অপরাপ্রকৃতির বিশাল, পূর্ণ ও সেজন্য শ্রমসঙ্কুল প্রস্তুতি এবং অন্তিম রূপান্তর। বস্তুতঃ দিব্য ক্ষমতা প্রায়শঃই অলক্ষিতে ও আড়াল থেকে আমাদের দুর্বলতার স্থান অধিকার করে; আমাদের বিশ্বাস, সাহস ও ধৈর্যের বিচ্যুতির মধ্যে ইহাই আমাদের অবলম্বন। ইহা অন্ধকে দৃষ্টি দেয়, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়। বুদ্ধি জানতে পারে এমন বিধান যার নির্বন্ধ হিতৈষীর মতো, এমন সহায় যা রক্ষা করে; হৃদয় বলে তাঁর কথা যিনি সর্বভূতেশ্বর, মানব-সুহৃৎ বা বিশ্বজনীন এবং সকল স্খলন থেকেও আমাদের তুলে ধরেন। সুতরাং এই পথ যুগপৎ যেমন অতি দুরূহ, কল্পনায় যত দুরূহ হতে পারে ইহা তত দুরূহ, অথচ ইহার উদ্দেশ্য ও প্রয়াসের বিশালতার পরিমাণে ইহা তেমনই সহজতম ও সুনিশ্চিত।

অপরা প্রকৃতির উপর পরা প্রকৃতির অখণ্ড কর্মের সময় তার ক্রিয়ার তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমতঃ অন্যান্য যোগের ক্রিয়াপদ্ধতি যেমন বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম ও পরম্পরার মধ্যে সীমাবদ্ধ, ইহার ক্রিয়াপদ্ধতি তেমন নয়; ইহার কাজ চলে এক রকম স্বাধীন ও বিক্ষিপ্তভাবে, তবে সাধকের স্বভাব, তার প্রকৃতির দেওয়া সহায়কর উপাদান এবং শুদ্ধিকরণ ও সিদ্ধির পথে তার প্রকৃতির আনা সব বাধা এইসব অনুযায়ী এই কাজ ক্রমশঃ হয়ে ওঠে তীব্র ও অর্থপূর্ণ। সুতরাং এক অর্থে এই পথের প্রত্যেকেরই যোগপদ্ধতি তার নিজস্ব। তথাপি ইহাতে এমন কতকগুলি সর্বজনপ্রযোজ্য সুস্পষ্ট কর্ম-প্রণালী থাকে যা থেকে একটি সাধনা রচনা করা সম্ভব; অবশ্য ইহা কোনো ছক্‌কাটা কার্যক্রম নয়, তবু ইহাই সমন্বয়ী যোগের এক রকম শাস্ত্র বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

দ্বিতীয়তঃ এই কার্যপ্রণালী অখণ্ড হওয়ায় ইহাতে অতীত পরিণামজনিত আমাদের প্রকৃতির বর্তমান গঠনকে স্বীকার করা হয় এবং মৌলিক কোন কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছুকেই বাধ্য করা হয় দিব্য পরিবর্তন সাধনে। এক শক্তিমান শিল্পী আমাদের প্রতি বিষয়টি তাঁর হাতে নেন এবং বর্তমানে এসব যে সত্য ফুটিয়ে তুলতে চায় বিশৃঙ্খলভাবে তিনি তাদের রূপান্তরিত করেন তারই সুস্পষ্ট প্রতিমূর্তিতে। সেই সদা-বর্ধমান অনুভূতিতে আমরা উপলব্ধি করতে শুরু করি এই অবর অভিব্যক্তির গঠন কিরূপ এবং ইহার মধ্যে প্রতিটি বিষয়ই তা সে যতই বিকৃত বা তুচ্ছ বা নীচ বলে প্রতীয়মান হোক না কেন দিব্য প্রকৃতির সুষমাস্থিত কোন উপাদান বা ক্রিয়ার অল্পবিস্তর বিকৃত বা অসম্পূর্ণ রূপ। কামারশালায় কর্মকার যেমন অশোধিত পিণ্ডকে পুড়িয়ে পিটিয়ে গড়ে তোলে, মানুষী পূর্বপিতৃগণ সেইভাবে দেবগণকে নির্মাণ ক'রছেন—বৈদিক ঋষিদের এই উক্তির তাৎপর্য এখন আমাদের বোধগম্য হয়।

তৃতীয়তঃ আমাদের অন্তঃস্থ দিব্যশক্তি সমগ্র জীবনকে ব্যবহার করে পূর্ণ-

যোগের উপায় রূপে। প্রতি অনুভূতি ও জাগতিক পরিবেশের সহিত প্রতিবাহ্য সংস্পর্শ, তা সে যতই তুচ্ছ বা বিপজ্জনক হোক না কেন ব্যবহৃত হয় এই কার্যের জন্য; আর প্রতি আন্তর অনুভূতি তা সে যতই দারুণ যন্ত্রণাময় বা সব চেয়ে অপমানকর অধঃপতনের অনুভূতি হোক না কেন— সিদ্ধির পথে সোপানস্বরূপ। এবং জগতের মধ্যে ভগবানের কার্যপদ্ধতি আমরা আমাদের মধ্যেই বুঝতে পারি উন্মীলিত চক্ষে; অন্ধকারের মধ্যে আলোতে, দুর্বল ও পতিতের মধ্যে শক্তিতে, দুঃখ ও দুর্দশাগ্রস্তের মধ্যে আনন্দেতে তাঁর কি উদ্দেশ্য তা-ও আমরা বুঝতে পারি। অপরা এবং পরা উভয় ক্রিয়াতেই আমরা দেখি একই দিব্য প্রণালী, তবে একটিতে এ চলে প্রকৃতির অবচেতনার মধ্যে, অজ্ঞানের অন্ধকারে মন্থরগতিতে; আর অন্যটিতে এ হয় দ্রুত ও আত্মসচেতন, আর সাধকযন্ত্র তার মধ্যে বোধ করে প্রভুর হস্ত। সমগ্র জীবন প্রকৃতির যোগ; ইহার প্রয়াস নিজের অন্তর্নিহিত ভগবানকে ব্যক্ত করা। যে পর্যায়ে এই সাধনা জীবের মধ্যে আত্ম-সচেতন এবং সেই কারণে যথাযথভাবে সম্পন্ন হবার সামর্থ্য লাভ করে তখনই তা যোগ। নিম্ন বিবর্তনে যে সব গতিবৃত্তি বিক্ষিপ্ত ও শিথিলভাবে যুক্ত সে সবের সমাহার ও একাগ্রতাই যোগ।

যেমন সাধনাপদ্ধতি অখণ্ড পূর্ণ, তেমন ফলও অখণ্ড পূর্ণ। প্রথম আসে ভাগবত সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি; পরম একের উপলব্ধি যে শুধু তাঁর ভেদহীন ঐক্যে হবে, তা নয়, তা হবে অসংখ্য বিভিন্ন বিভাবের মধ্যেও, কারণ সাপেক্ষ চেতনার দ্বারা তাঁর সম্যক্ জ্ঞানের জন্য এসবও প্রয়োজনীয়; শুধু আত্মার মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি নয়, অনন্ত প্রকারের ক্রিয়া, জগৎ ও সৃষ্টির জীব-সকলের মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি দরকার।

সেজন্য মুক্তিও হবে পূর্ণ, অখণ্ড। এ মুক্তি শুধু ভগবানের সহিত জীবের সর্বাংশে অবিচ্ছিন্ন সংস্পর্শজাত মুক্তি, সাযুজ্যমুক্তি নয় যাতে বিভেদ এমনকি দ্বন্দ্বের মধ্যেও জীব মুক্ত হয়, অথবা শুধু সালোক্য মুক্তি নয় যাতে সমগ্র সচেতন সত্তা ভগবদ্ সত্তার সেই একই পাদে, সচ্চিদানন্দের অবস্থায় বাস করে; এসব ছাড়াও, এ মুক্তি হল অবর সত্তাকে ভগবানের মানুষী প্রতি-মূর্তিতে রূপান্তরের দ্বারা দিব্য প্রকৃতি লাভ, সাধর্ম্য মুক্তি এবং সকল কিছুর সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত মুক্তি, অহং-এর অনিত্য ছাঁচ থেকে চেতনার মুক্তি এবং সেই এক পরম পুরুষের সহিত ইহার একাত্মতা লাভ, যিনি জগৎ ও জীব উভয়ের মধ্যে বিশ্বাত্মক আবার জগতের মধ্যে ও সকল বিশ্ব ছাড়িয়ে উভয়েই বিশ্বাতীত ভাবে এক।

এই অখণ্ড উপলব্ধি ও মুক্তির ফল হবে জ্ঞান প্রেম ও কর্মের পরিণতির মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য, কেননা অহং থেকে মুক্তি এবং সকলের অন্তরে ও সকলের বাহিরে বিরাজমান সেই পরম একের সহিত অভিন্নতা লাভ হয়েছে।

কিন্তু এই প্রাপ্তির মধ্যে গ্রহিষ্ণু চেতনা সীমাবদ্ধ থাকে না; সেজন্য আমরা পাই পরম আনন্দের মধ্যে ঐক্য এবং পরম প্রেমের মধ্যে সুষম বৈচিত্র্য, এবং এই ভাবে আমাদের সত্তার তুঙ্গে পরম প্রেমাস্পদের সহিত শাশ্বত একত্ব বজায় রেখেও আমাদের কাছে সম্ভব হয় লীলার সকল সম্পর্কই। চেতনার অনুরূপ ব্যাপ্তির ফলে আমরা চিৎপুরুষের মধ্যে এমন মুক্তিলাভে সমর্থ হই যাতে জীবন থেকে নিবৃত্ত হবার প্রয়োজন থাকে না, বরং যা জীবনকেও নিজের অন্তর্ভুক্ত করে আর অহমিকা, বন্ধন ও প্রতিক্রিয়া রহিত হয়ে আমরা আমাদের মন ও দেহে জগতের উপর দিব্য ক্রিয়ার অকুণ্ঠ কর্মপ্রবাহের প্রণালী হতে সমর্থ হই।

দিব্যজীবন শুধু যে মুক্ত তা নয়, ইহা বিশুদ্ধ, আনন্দময় ও সিদ্ধ। পূর্ণ বিশুদ্ধতা যেমন একদিকে আনে আমাদের মধ্যে ভাগবত সত্তার পূর্ণ প্রতিফলন, তেমন অন্যদিকে আনে আমাদের মধ্যে, এই জীবনের মধ্যে ও আমাদের বহিরংশে আমরা যে জটিল যন্ত্র তার যথাযথ ক্রিয়ার মাধ্যমে তার পরম সত্য ও বিধানের পরিপূর্ণ বর্ষণ, আর এই পূর্ণ বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে অখণ্ড স্বাধীনতা। এই বিশুদ্ধতার ফল, পূর্ণ আনন্দ যাতে জগতের সব কিছুকেই ভগবদ্-প্রতীক রূপে দেখে সে সবে আনন্দ এবং জগতের অতীত যা তাতেও আনন্দ উভয়ই এক সাথে সম্ভব। আর ইহাতে রচিত হয় মানুষী অভিব্যক্তির অবস্থার মধ্যে ভগবানের সদৃশ হিসাবে আমাদের মানবজাতির পূর্ণ সিদ্ধি যে সিদ্ধির প্রতিষ্ঠা সত্তা, প্রেম ও আনন্দের, এবং জ্ঞানের ক্রিয়ার এবং শক্তির মধ্যে সংকল্পের ও অহং-শূন্য কর্মের মধ্যে সংকল্পের ক্রিয়ার এক প্রকার স্বচ্ছন্দ বিশ্বভাব। এই অখণ্ড পূর্ণতালাভও পূর্ণযোগে সম্ভব।

মন ও দেহের সিদ্ধিও এই সিদ্ধির অন্তর্গত। সুতরাং মানবজাতিকে শেষ পর্যন্ত যে সমন্বয় করতে হবে তার ব্যাপকতম সূত্রের মধ্যে রাজযোগ ও হঠ যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধিও অন্তর্ভুক্ত হবে। যোগের মাধ্যমে মানবজাতির যে সকল সাধারণ মানসিক এবং শারীরিক শক্তি ও অনুভূতি লাভ হওয়া সম্ভব, অন্ততঃ সে সবের সম্পূর্ণ বিকাশ অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক অখণ্ড পূর্ণ পদ্ধতির মধ্যে। আবার এসবকে অখণ্ড মনোময় ও দৈহিক জীবনের জন্য ব্যবহার করা না হলে এদের অস্তিত্বের অর্থ থাকে না। এরূপ মনোময় ও দৈহিক জীবন স্বভাবতঃ হবে অধ্যাত্মজীবনের রূপায়ণ তার যথাযথ মানসিক ও দৈহিক মূল্যে। এইভাবে প্রকৃতির তিনটি ক্রমের ও মানবজীবনের যে তিনটি প্রকার সে ব্যক্ত করেছে বা করছে তাদের এক সমন্বয়ে আমরা উপনীত হব। আমাদের মুক্ত সত্তা ও সিদ্ধ ক্রিয়া প্রণালী সকলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে আমাদের ভিত্তিস্বরূপ জড়গত জীবন এবং আমাদের মধ্যবর্তী কারণ স্বরূপ মনোময় জীবন।

তাছাড়া যে পূর্ণতার পানে আমাদের আস্পৃহা তা যদি ব্যষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সে পূর্ণতা খাঁটি পূর্ণতা হবে না, এমন কি তা সম্ভবও হবে না। নিজেদের ও অপরের—উভয়ের মাধ্যমেই সত্তায়, প্রাণে ও প্রেমে আমাদের যে আত্মোপলব্ধি তা আমাদের ভগবদ্-সিদ্ধির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমাদের মুক্তি ও সিদ্ধির অপরিহার্য পরিণতি ও ব্যাপকতম উপকারিতা হবে অপরের মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা ও তার সব ফলের প্রসার। আর এই প্রসারের সতত ও স্বাভাবিক চেষ্টার লক্ষ্য হবে উত্তরোত্তর এবং পরিণামে সর্বাঙ্গীন ভাবে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও সিদ্ধি।

ব্যাপকভাবে সিদ্ধ অধ্যাত্মজীবনের এই অখণ্ডতা সাধনের দ্বারা যখন মানবের সাধারণ জড়গত জীবন এবং ব্যষ্টি ও জাতির মধ্যে মানসিক ও নৈতিক আত্মোৎকর্ষ-সাধনের জন্য তার মহান ব্যবহারিক প্রয়াস দিব্যভাবাপন্ন হবে তখন তা হবে আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি—উভয় সাধনারই বিজয় মুকুট। এই পরিণতির অর্থ অন্তরের স্বর্গরাজ্যের রূপায়ণ বাহিরের স্বর্গরাজ্যে; এবং জগতের সকল ধর্ম বিভিন্নভাবে যে মহান স্বপ্ন দেখে এসেছে ইহাই তার প্রকৃত সার্থকতা।

উৎসর্গীকৃত দৃষ্টিতে যাঁরা মানবজাতির মধ্যে ভগবানকে প্রচ্ছন্ন দেখেছেন তাঁদের সম্পূর্ণ যোগ্য ব্রত হল সিদ্ধির যে বিশালতম সমন্বয় মননে সম্ভব তার একান্ত সাধনা।

প্রথম পাদ

দিব্যকর্মযোগ

প্রথম অধ্যায়

সহায় চতুষ্টয়

যোগসিদ্ধি অর্থাৎ যে সিদ্ধি যোগসাধনের ফল তা পাবার সব চেয়ে বড় সহায় হল চারিটি মহৎ করণের মিলিত ক্রিয়া। প্রথম হল শাস্ত্র অর্থাৎ যে সব সত্য, তত্ত্ব, শক্তি ও প্রক্রিয়া উপলব্ধির বিধায়ক তাদের জ্ঞান। ইহার পর উৎসাহ অর্থাৎ শাস্ত্রানুযায়ী ধৈর্য সহকারে বিরামহীন সাধনা, আমাদের ব্যক্তিগত প্রযত্নের শক্তি। তৃতীয় সহায় গুরু, তাঁর সাক্ষাৎ উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও প্রভাব যার ফলে আমাদের জ্ঞান ও সাধনা উন্নীত হয় অধ্যাত্ম অনুভূতির স্তরে। সর্বশেষ করণ হল কাল, কেননা সকল বিষয়েরই ক্রিয়ার এক কালচক্র এবং দিব্যগতির এক পরিমিত সময় আছে।

*　　　*　　　*

পূর্ণ যোগের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র হল সনাতন বেদ যা প্রতি মননশীল প্রাণীর হৃদয়ে গুহাহিত থাকে। শাশ্বত জ্ঞান ও শাশ্বত সিদ্ধির শতদল আমাদেরই মধ্যে থাকে না-ফোঁটা মুদিত কুঁড়িরূপে। একবার মানুষের মন সনাতনের দিকে ফিরতে শুরু করলে, তার হৃদয় আর সসীমের আসক্তির মধ্যে সংকুচিত ও আবদ্ধ না থেকে অসীমের প্রেমে মুগ্ধ হলে—তা সে যে পরিমাণেই হ'ক না কেন—তার হৃদয়-শতদল দ্রুত বা ক্রমশঃ ফুটে ওঠে পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে, একটির পর একটি উপলব্ধি পেয়ে। সেই অবধি সকল জীবন, সকল মনন, সকল আন্তর শক্তির উদ্দীপন, নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় সকল অনুভূতি আঘাত দিয়ে অন্তঃ-পুরুষের আবরণ বিদীর্ণ ক'রে তার অনিবার্য বিকাশের সব বাধা অপসারণ করে। অনন্তকে যে বরণ করে, তাকে অনন্ত পূর্বেই বরণ করেছেন। যে দিব্যস্পর্শ ব্যতীত চিৎ-পুরুষের জাগরণ হয় না, উন্মীলন হয় না সেই দিব্যস্পর্শ সে পেয়েছে; একবার এই স্পর্শ পেলে সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত, তা সে মানুষের এক জন্মেই দ্রুত আসুক বা ব্যক্ত বিশ্বের মধ্যে বহু জন্মচক্র ধরে ধৈর্যসহকারে ধাপে-ধাপে অগ্রসর হবার পর আসুক।

মনকে এমন কিছুই শিক্ষা দেওয়া যায় না যা জীবের বিকাশমান অন্তঃ-পুরুষের মধ্যে যোগ্য জ্ঞানরূপে পূর্বেই প্রচ্ছন্ন নেই। সেইরূপ মানুষ যে সব বাহ্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ সে সব তারই মধ্যকার চিৎ-পুরুষের শাশ্বত সিদ্ধির বাস্তব উপলব্ধি মাত্র। আমরা ভগবানকে যে জানি, ভগবান যে হয়ে উঠি তার কারণ পূর্ব থেকেই আমাদের গূঢ় প্রকৃতিতে আমরা তা-ই। সকল

শিক্ষারই অর্থ প্রকাশ, সকল হওয়ার অর্থ উন্মীলন। আত্ম-প্রাপ্তিই গূঢ় কথা; আত্মজ্ঞান ও উপচীয়মান চেতনা তার উপায় ও কার্যপ্রণালী।

সাধারণতঃ যার সাহায্যে এই প্রকাশ হয় তা বাক্ বা শ্রুতবস্তু। এই বাক্ আসতে পারে আমাদের ভিতর থেকে; আবার বাহির থেকেও ইহা আসতে পারে। কিন্তু যে ভাবেই আসুক, ইহা গূঢ় জ্ঞানের ক্রিয়ারম্ভের সহায় মাত্র। ভিতরের বাক্ হয়তো আমাদের অন্তঃস্থ অন্তরতমপুরুষের বাণী, যে পুরুষ সর্বদাই ভগবানের দিকে উন্মুক্ত; আর না হয় ইহা সর্বভূতের হৃদিস্থিত গূঢ় বিশ্বগুরুর বাণী। অবশ্য ক্বচিৎ কোন ক্ষেত্রে অন্য কিছুর দরকার হয় না; কারণ যোগের বাকী সব কিছুই ঐ নিরবচ্ছিন্ন স্পর্শ ও দেশনার প্রভাবে আত্ম-উন্মীলন। যিনি হৃৎকমলে নিত্য অধিষ্ঠিত তাঁর ভাস্বর জ্যোতিঃপ্রভাবে জ্ঞানের শতদল ভিতর থেকে আপনা-আপনিই প্রস্ফুটিত হয়। এইভাবে ভিতর থেকে আসা আত্ম-জ্ঞান যাঁদের পক্ষে যথেষ্ট এবং যাঁদের কোন লিখিত গ্রন্থ বা জীবন্ত গুরুর ঈশান প্রভাবের অধীনে চলার দরকার হয় না তাঁরা বাস্তবিকই মহান, তবে তাঁদের সংখ্যা অল্প।

সাধারণতঃ আত্ম-উন্মীলন কার্যে সহায়তার জন্য ভগবানের প্রতিভূস্বরূপ কোন বাহিরের বাক্-এর প্রয়োজন হয়; হয়তো ইহা অতীতের কোন মহাবাক্য অথবা জীবন্ত গুরুর আরো শক্তিশালী বাণী। কখন কখন প্রতিভূস্বরূপ বাক্য আন্তরশক্তি জাগরণ ও অভিব্যক্তির উপলক্ষ মাত্র; এ যেন প্রকৃতির সর্বজনীন বিধানের কাছে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ভগবানের মান্যতা স্বীকার। এই ভাবেই উপনিষদে বলা হয়েছে যে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঋষি ঘোরের কাছ থেকে বাক্ পেয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেই রকম রামকৃষ্ণ স্বীয় আন্তর সাধনা বলে কেন্দ্রীয় দীপ্তি পাবার পর যোগের বিভিন্ন মার্গের সাধনায় কয়েকজন গুরু বরণ করেছিলেন; কিন্তু এই সব পন্থায় যত সহজে ও যত দ্রুত তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল তাতে বোঝা যায় যে তাঁর গুরুবরণের অর্থ সেই সাধারণ বিধির স্বীকৃতি যে গুরুর কাছ থেকেই শিষ্যকে সকল জ্ঞান লাভ করতে হয়।

কিন্তু সাধারণতঃ সাধকের জীবনে দিব্য প্রতিভূ গুরুর প্রভাবেরই স্থান বেশী। যদি কোন যোগের সাধনা করা হয় কোন পাওয়া লিখিত শাস্ত্র অর্থাৎ পূর্বতন যোগীদের অনুভূতির মূর্তিস্বরূপ অতীতের কোন মহাবাক্য অনুসারে তাহলে সে যোগের অনুশীলন শুধু নিজের প্রচেষ্টায় অথবা গুরুর সাহায্যে সম্ভব। তারপর উপদেশলব্ধ সব সত্যের ধ্যানধারণা দ্বারাই অধ্যাত্ম-জ্ঞান লাভ হয় এবং ব্যক্তিগত অনুভূতিতে সেই সব সত্য উপলব্ধি করে অধ্যাত্মজ্ঞানকে জীবন্ত ও সচেতন করে তোলা হয়; যোগ সাধনা অগ্রসর হয় কোন ধর্ম গ্রন্থের বা ঐতিহ্যের নির্দিষ্ট সব পদ্ধতির ফলানুযায়ী, যাদের

দৃঢ় ও উদ্ভাসিত করা হয় গুরুর উপদেশে। এরূপ সাধনা সংকীর্ণ তবে ইহার সীমার মধ্যে ইহা নিরাপদ ও ফলপ্রসূ কারণ ইহা চলে বহু ব্যবহৃত জানা পথ দিয়ে দূরবর্তী পরিচিত লক্ষ্যের দিকে।

কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের স্মরণ রাখা দরকার যে কোন লিখিত শাস্ত্র—তা যত বড়ই তার প্রামাণ্য হ'ক বা যত বৃহৎই তার আন্তরভাব হ'ক—শাশ্বত পরম জ্ঞানের আংশিক প্রকাশের বেশী হতে পারে না। সে তা ব্যবহার করবে, কিন্তু কখনো নিজেকে তা দিয়ে বাঁধবে না, এমন কি তা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হয় তা হলেও নয়। যে ধর্মগ্রন্থ গভীর, ব্যাপক ও উদারভাবাপন্ন সাধকের উপর তার প্রভাব হতে পারে পরমকল্যাণপ্রদ ও অমিত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেষ্ঠ সব সত্যের দিকে তার উদ্বুদ্ধ হওয়ার ও সর্বোচ্চ সব অনুভূতি উপলব্ধি করার সহিত ইহা বিজড়িত থাকবে তার অনুভূতির মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে তার যোগ সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এক বা পর পর বহু ধর্ম গ্রন্থ, যেমন হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারী যোগে গীতা, উপনিষদ, বেদ। আর না হয় ইহা তার বিকাশের এমন এক প্রধান অঙ্গ হবে যার উপাদানের মধ্যে থাকবে বহু ধর্মগ্রন্থের সত্যসমূহের সমৃদ্ধ বিভিন্ন অনুভূতি এবং যার সাহায্যে ভবিষ্যৎও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে অতীতের সর্বোত্তম সব কিছু নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে আত্মনির্ভর হতে হবে, কিন্তু আরো ভাল হয় যদি সে প্রথম থেকেই বাস করতে পারে তার অন্তরাত্মায়—লিখিত সত্য ছাড়িয়ে, "শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে" যা সে শুনেছে বা এখনও যা শুনতে বাকী আছে সে সব ছাড়িয়ে—"শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ" কারণ সে তো একটি বা বহু গ্রন্থের সাধক নয়, সে অনন্তের সাধক।

আর এক রকম শাস্ত্র আছে যা ধর্মগ্রন্থ নয়; সাধক যে যোগের পথ বেছে নেয় তার সত্য ও পদ্ধতি, কার্যকরী সব তত্ত্ব এবং কর্মপ্রণালী—এসবের বিবরণ এই শাস্ত্র। প্রতি যোগপন্থার নিজের শাস্ত্র আছে, এই শাস্ত্র হয় লিখিত, নয় পরম্পরাগত অর্থাৎ গুরু পরম্পরায় মুখে মুখে বহুদিন চলে আসছে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ এই লিখিত বা পরম্পরাগত শিক্ষাকে যথেষ্ট প্রামাণ্য, এমন কি বহু সম্মানও দেওয়া হয়। লোকের এই ধারণা যে যোগের সব সাধনধারা নির্দিষ্ট; আর যে গুরু পরম্পরায় এই শাস্ত্র পেয়েছেন এবং সাধনাবলে তার সত্য উপলব্ধি করেছেন তিনি শিষ্যকে চালনা করেন সেই স্মরণাতীত কালের পথ দিয়ে। নতুন কোন সাধন পন্থা বা যোগের নতুন কোন শিক্ষা বা কোন নতুন সূত্রের প্রচলনের বিরুদ্ধে প্রায়ই আপত্তি শোনা যায়, "ইহা শাস্ত্রানুমোদিত নয়"। কিন্তু যথার্থ তত্ত্বের দিক থেকে বা যোগীর বাস্তব সাধনার দিক থেকে নতুন সত্য, অভিনব প্রকাশ বা বিশালতর অনুভূতি আনার পথে লৌহকপাটের মত কোন কঠোর নিষেধ নেই। বহু শতাব্দীর

যে জ্ঞান ও অনুভূতিরাজি সুবিন্যস্ত ও সুসংহত ভাবে নতুন শিক্ষার্থীর উপযোগী করা হয়েছে তা-ই পাওয়া যায় লিখিত বা পরম্পরাগত শিক্ষায়। সুতরাং ইহার গুরুত্ব ও উপকারিতা প্রভূত। কিন্তু পরিবর্তন ও উন্নতি বিধানের প্রচুর স্বাধীনতা সর্বদাই কার্যতঃ সম্ভব। এমন কি রাজযোগের মত উচ্চ বৈজ্ঞানিক যোগপদ্ধতির ও অনুশীলন পতঞ্জলির সুসংহত প্রণালী ছাড়া অন্য প্রণালীতেও সম্ভব। ত্রিমার্গের * প্রতি পথ নানা উপপথে বিভক্ত, কিন্তু এসব আবার মিলিত হয় একই গন্তব্যস্থলে। যে সাধারণ জ্ঞানের উপর যোগ নির্ভরশীল তা নির্দিষ্ট কিন্তু তাদের বিন্যাস, অনুক্রম, প্রণালী ও রূপের কিছু অদলবদল অনুমোদন করা কর্তব্য, কারণ সর্বস্বীকৃত সব সত্য দৃঢ় ও অপরিবর্তিত থাকলেও ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও বিশেষ প্রেরণার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দরকার।

বিশেষ করে সমন্বয়মূলক পূর্ণযোগকে কোন লিখিত বা পরম্পরাপ্রাপ্ত শাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়; কারণ ইহা অতীতের সব জ্ঞানকে সাদরে গ্রহণ করলেও, ইহা চায় এই জ্ঞানকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য নতুন ভাবে সংহত করতে। ইহার আত্ম-গঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজন—অনুভূতি পাওয়ার ও নতুন সংজ্ঞায় ও নতুন সমবায়ে জ্ঞানের পুনর্বিবৃতি করার পূর্ণ স্বাধীনতা। পূর্ণ যোগ চায় সমগ্র জীবনকে নিজের পরিধির মধ্যে আনতে; সেজন্য ইহার সাধক তেমন তীর্থযাত্রী নয় যে রাজপথ দিয়ে গন্তব্যস্থলে অগ্রসর হবে, বরং সে হিসাবে সে পথিকৃৎ, অচিন বনের মধ্য দিয়ে তাকে পথ কেটে যেতে হয়। কারণ বহুকাল ধরে যোগ জীবন থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর আমাদের বৈদিক পূর্বতনদের মত যে সব প্রাচীন সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল জীবনকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা, তারা আজ আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে. সাধনার কথা তাঁরা যে সংজ্ঞায় বলেছেন তা আর বোধগম্য নয়, যে রূপে তাদের প্রয়োগ করা হ'ত এখন আর তা চলে না। শাশ্বত কালের স্রোতে মানবজাতি এখন অনেক দূর এগিয়ে এসেছে, সুতরাং সেই পুরনো সমস্যার দিকে আমাদের যাত্রারম্ভ করতে হবে নতুন স্থান থেকে।

এই যোগের দ্বারা আমরা যে শুধু অনন্তকে পেতে চাই তা নয়, আমরা অনন্তকে আবাহন করি যেন তিনি মানুষের জীবনের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করেন। সুতরাং আমাদের যোগশাস্ত্রে মানুষের গ্রহিষ্ণু অন্তরাত্মার অনন্ত স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়। বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীতকে নিজের মধ্যে নিজস্ব ধরনে ও নিজস্বভাবে নেবার অবাধ স্বাধীনতা জীবের থাকবে—ইহাই মানুষের পূর্ণ অধ্যাত্ম জীবনের যথার্থ অবস্থা। বিভিন্ন রূপের উত্তরোত্তর

---

* জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের ত্রিমার্গ

সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই সকল ধর্মের একত্ব প্রকাশ অনিবার্য—এই উক্তির পর বিবেকানন্দ এক সময় আরো বলেছিলেন, যে যখন প্রতিটি লোকের নিজস্ব ধর্ম থাকবে, আর যখন প্রত্যেকেই কোন সম্প্রদায়গত বা ঐতিহ্যগত ধর্মরূপের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে পরাৎপরের সহিত তার প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে ইহার স্বাধীন আত্ম-অভিযোজন অনুসরণ করবে তখনই হবে ধর্মের মূলগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা। সেইরূপ বলা যায় যে পূর্ণ যোগেরও পরাকাষ্ঠা তখনই হবে যখন প্রকৃতির ঊর্ধ্বে পরমার্থের দিকে উৎসরণে প্রত্যেকে আপন প্রকৃতির বিকাশ সাধনে নিজস্ব যোগপথ অনুসরণ করতে পারবে। কারণ স্বাধীনতাই চূড়ান্ত বিধান ও চরম পরিণতি।

তবে তারই মধ্যে সাধকের ভাবনা ও অনুশীলন ঠিক পথে চালনার সহায় হিসাবে কতকগুলি সর্বগ্রাহ্য নিয়ম রচনা আবশ্যক, তবে সে সব অবশ্য পালনীয় ছককাটা কার্যক্রমের মত বাঁধাধরা কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা হবে না, বরং যতদূর সম্ভব সেখানে থাকবে সর্বস্বীকৃত সত্যের কথা, তত্ত্বের সর্ব সাধারণ বিবৃতি এবং সাধনা ও উন্নতির সম্বন্ধে সব চেয়ে শক্তিশালী ব্যাপক নির্দেশ। অতীত অনুভূতি থেকেই সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং ভবিষ্যৎ অনুভূতির জন্যই তাদের প্রয়োজনীয়তা। ইহা অন্যতম সহায় ও আংশিক পথপ্রদর্শক। ইহাতে থাকে পথ নির্দেশের সংকেত এবং প্রধান সব পথের ও পূর্ব পরীক্ষিত স্থানসমূহের নাম যাতে পথিক জানতে পারে কোন দিকে ও কোন কোন পথ দিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছে।

অবশিষ্ট সব নির্ভর করে ব্যক্তিগত প্রযত্ন ও অনুভূতির উপর এবং দিশারীর সামর্থ্যের উপর।

* * *

যোগসাধনার প্রারম্ভে ও তারপরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রধানতঃ সাধকের আস্পৃহা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপরই নির্ভর করে তার অনুভূতির বিকাশ কত দ্রুত ও প্রসারিত হবে এবং তার ফল হবে কত তীব্র ও শক্তিশালী। যোগসাধনার অর্থ—বিষয়সমূহের বাহ্যরূপে ও আকর্ষণে তন্ময় অহমাত্মক চেতনাকে পিছনে ফেলে মানবাত্মার যাত্রারম্ভ এমন এক পরতর অবস্থার পানে যাতে বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক সত্তা জীবের আধারের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে তার রূপান্তর সাধন করতে পারেন। নতুন পথে আসার আগ্রহের তীব্রতা ও প্রত্যক্-আত্ম হবার নির্দেশের শক্তি—ইহারাই সিদ্ধির প্রাথমিক নির্ধারক। সাধকের আস্পৃহা কত প্রবল, তার সংকল্প কত জোরাল, মন কত একাগ্র ও সাধনার জন্য কত ধৈর্য ও দৃঢ়তাসহকারে উদ্যম করা হচ্ছে—এইসব হবে তীব্রতার পরিমাপ। বাইবেলের কথার প্রতিধ্বনি করে আদর্শ সাধকের বলা উচিত, "ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাই আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস

করেছে।”। প্রভুর জন্য এই উৎসাহ, ইহার সব দিব্য ফলের জন্য সমগ্র প্রকৃতির ব্যাকুলতা, ভগবানকে পাবার জন্য হৃদয়ের আগ্রহ—ইহাই অহংকে গ্রাস ক'রে ইহার তুচ্ছ সংকীর্ণ গন্ডী ভেঙে দেয় যাতে গ্রহণ করতে পারা যায় পূর্ণ ও বৃহৎ ভাবে অভীষ্টকে, তাকে যা বিশ্বাত্মক হওয়ায় বৃহত্তম ও সর্বোচ্চ ব্যষ্টি আত্মা ও প্রকৃতি অপেক্ষাও বৃহত্তর এবং বিশ্বাতীত হওয়ায় তাদের চেয়ে উচ্চতর।

কিন্তু এ শুধু সিদ্ধির জন্য সাধনশক্তির একদিক মাত্র। পূর্ণযোগ প্রণালীর তিনটি পর্যায়; অবশ্য এরা যে সুস্পষ্টভাবে পৃথক বা ভিন্ন তা নয়, তবে কিছুটা ক্রমিক। প্রথম পর্যায়ে আবশ্যক, অন্ততঃ প্রাথমিক ও শক্তিপ্রদ স্বোত্তরণ ও ভগবদ্-সংস্পর্শের জন্য প্রচেষ্টা; এরপর আবশ্যক—যা সর্বাতীত ও যার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে তাকে আমাদের মধ্যে গ্রহণ আমাদের সমগ্র সচেতন সত্তার রূপান্তর সাধনের জন্য; শেষ পর্যায়ে আসে জগতে দিব্যকেন্দ্ররূপে আমাদের রূপান্তরিত মনুষ্যত্বের নিয়োগ। যতক্ষণ না ভগবানের সহিত সংস্পর্শ বেশ কিছু পরিমাণে দৃঢ় হয়, যতক্ষণ না কিছু পরিমাণে স্থায়ী সাযুজ্য লাভ হয়, ততক্ষণ সাধারণতঃ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বেশী। কিন্তু যে পরিমাণে এই সংস্পর্শ দৃঢ় হয়, সাধক সেই পরিমাণে জানতে পারে যে তার মধ্যে এমন এক শক্তি সক্রিয় হয়েছে যা তার নিজের নয় এবং যা তার অহংগত প্রচেষ্টা ও সামর্থ্যের অতীত; আর এই শক্তির কাছে সে উত্তরোত্তর আত্ম-সমর্পণ করতে শেখে এবং তার যোগের ভার দেয় তার কাছেই। পরিশেষে তার নিজের সংকল্প ও শক্তি এক হয়ে যায় এই পরতর শক্তির সহিত; সে তাদের ডুবিয়ে দেয় দিব্য পরম সংকল্প ও ইহার বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক শক্তির মধ্যে। তখন থেকে সাধক বুঝতে পারে যে ইহাই তার মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্তার আবশ্যকীয় রূপান্তর সাধনের চালক এবং সে কাজ এত নিরপেক্ষ প্রজ্ঞা ও ফলোৎপাদনের দূরদৃষ্টির সহিত নিষ্পন্ন হচ্ছে যে উৎসুক ও স্বার্থপর অহংএর পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই একাত্মতা ও আত্ম-নিমজ্জন সম্পূর্ণ হলেই জগতে দিব্যকেন্দ্র প্রস্তুত হয়। শুদ্ধ, মুক্ত, নমনীয় ও জ্ঞানদীপ্ত এই কেন্দ্র তখন মানবত্ব বা অতিমানবত্বের, পৃথিবীর অধ্যাত্ম অগ্রসরতা বা তার রূপান্তর সাধনের বৃহত্তর যোগে এক পরম শক্তির সরাসরি ক্রিয়ার নিমিত্তস্বরূপ হওয়া শুরু করে।

বস্তুতঃ সর্বদাই যা কাজ করে তা এই পরতর শক্তি। অহংগত মনের ভ্রান্তভাবে ও অসম্পূর্ণরূপে নিজেকে দিব্যশক্তির কর্মধারার সহিত এক করার প্রয়াসের ফলেই ব্যক্তিগত উদ্যম ও আস্পৃহা বোধের উৎপত্তি। জগতে সাধারণ অনুভূতি সম্বন্ধে এই মন মানসিকতার যে সব সাধারণ সংজ্ঞা প্রয়োগ

করে সেগুলিকে সে অতিপ্রাকৃত স্তরের অনুভূতি সম্বন্ধেও প্রয়োগ করে চলে। জগতে আমরা কাজ করি অহমিকার ভাব নিয়ে; আমাদের মধ্যে যে সব বিশ্বশক্তি সক্রিয় সেগুলিকে আমরা দাবী করি নিজস্ব বলে; মন, প্রাণ ও দেহের এই আধারে বিশ্বাতীতের নির্বাচন, রূপায়ণ ও প্রগতিসাধনের ক্রিয়াকে আমরা দাবী করি আমাদের ব্যক্তিগত সংকল্প, জ্ঞান, শক্তি ও পুণ্যের ফল বলে। জ্ঞানদীপ্ত হলে আমরা বুঝি অহং এক যন্ত্র মাত্র; আমাদের এই বোধ ও অনুভব হতে শুরু করে যে এইসব বিষয় আমাদের নিজস্ব এই অর্থে যে ইহারা আমাদের পরম ও অখন্ড আত্মার নিজস্ব আর এই আত্মা বিশ্বাতীতের সহিত এক, সে সব যন্ত্রস্বরূপ অহং-এর নয়। কর্মধারায় আমাদের দান হল গন্ডি টানা ও বিকৃতি আনা, ইহার মধ্যে সত্যকার সামর্থ্য হল ভগবানের। যখন মানুষের অহং উপলব্ধি করে যে তার সংকল্প একটা যন্ত্র, তার জ্ঞান অজ্ঞানতা ও বালকের নির্বুদ্ধিতা, তার শক্তি শিশুর হাতড়ান, তার পুণ্য দাম্ভিক অপবিত্রতা আর যখন ইহা তার ঊর্ধ্বের শক্তিকে বিশ্বাস করে তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে শেখে তখনই তার পরিত্রাণ। আমাদের ব্যক্তিগত সত্তার যে আপাত স্বাধীনতা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রতি আমরা এত গভীরভাবে আসক্ত তা বাহ্যমাত্র; আমরা যে সহস্র রকমের আভাসন, সংবেগ ও শক্তিকে আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তির বাহিরে রেখেছি তাদের নিকৃষ্ট দাসত্বই তাদের প্রচ্ছন্ন আসল রূপ। আমাদের যে অহং স্বাধীনতার বড়াই করে সে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বপ্রকৃতির অগণিত সত্তা, সামর্থ্য, শক্তি ও প্রভাবের দাস, ক্রীড়নক ও খেলার পুতুল। ভগবানের মাঝে অহংএর আত্মবিসর্জনই তার আত্ম-সার্থকতা; তার অতীতে যা তার কাছে আত্ম-সমর্পণই বন্ধন ও সীমা থেকে তার মুক্তি, তার পূর্ণ স্বাধীনতা।

কিন্তু তবু কার্যতঃ আত্ম-বিকাশসাধনের তিনটি পর্যায়ের প্রতিটিরই প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা আছে এবং প্রত্যেককে তার উপযুক্ত সময় ও স্থান দিতে হবে। চরম ও সর্বোচ্চ অবস্থা থেকে সাধনা শুরু করা চলে না, আর তা নিরাপদ বা ফলপ্রসূও নয়। তাছাড়া অসময়ে একটি থেকে অন্যটিতে লাফ দিয়ে যাওয়াও সঠিক পন্থা হবে না। কেননা মনে ও হৃদয়ে পরতমকে স্বীকার করলেও, প্রকৃতিতে এমন সব উপাদান আছে যারা বহুকাল এই স্বীকৃতিকে উপলব্ধ সত্য হতে দেয় না। কিন্তু বিনা উপলব্ধিতে আমাদের মানসিক বিশ্বাস স্ফুরন্ত বাস্তব সত্য হতে পারে না; তখনও এ শুধু জ্ঞানের মূর্তি, সজীব সত্য নয়, একটা ভাবনা, তখনো কোন সামর্থ্য নয়। আর যদিই বা উপলব্ধি পাওয়া শুরু হয়, তা হলেও আমরা যে পুরোপুরি পরতমের হাতের মধ্যে বা তাঁর চালিত যন্ত্র তা বেশী তাড়াতাড়ি কল্পনা করা বা ধরে নেওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। এরূপ ভাবার দরুন

বিপজ্জনক মিথ্যার প্রবেশ সম্ভব; অসহায় নিশ্চেষ্টতার উৎপত্তি সম্ভব অথবা এই মনোভাব ভগবানের নাম দিয়ে অহংএর গতিবিধিকে বড় করায় যোগের সমগ্র ধারাই বিপজ্জনক ভাবে বিকৃত ও ধ্বংস হতে পারে। আন্তর প্রযত্ন ও সংগ্রামের একটা কম বেশী সুদীর্ঘ সময় আছে যাতে সাধকের নিজের সংকল্প বলে অপরা প্রকৃতির অন্ধকার ও বিকৃতি বর্জন করা এবং দিব্য জ্যোতির দিকে নিজেকে সবলে ও দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। মানসিক শক্তি, হৃদয়ের ভাবাবেগ, প্রাণের কামনা এমন কি শারীর সত্তাকেও জোর করে ফেরাতে হবে তাদের যথার্থ প্রবৃত্তির দিকে অথবা এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা সঠিক সব প্রভাবকে গ্রহণ ক'রে তাতে সাড়া দিতে পারে। একমাত্র তখনই, অর্থাৎ যখন একাজ ঠিক মত করা হয়েছে শুধু তখনই ঊর্ধ্বের নিকট নিম্নের আত্মসমর্পণ সম্ভব, কারণ তখন উৎসর্গ গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

সাধকের প্রথম করণীয়—ব্যক্তিগত সংকল্পশক্তি দিয়ে অহমাত্মক প্রবৃত্তি-গুলি ধরে তাদের ফেরানো আলোক ও সত্যের দিকে; একবার ফেরাবার পরও তাদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা সর্বদা তা-ই স্বীকার করে, সর্বদা তা-ই গ্রহণ করে, সর্বদা তা-ই অনুসরণ করে। এই ভাবে অগ্রসর হতে থাকাকালীন সে তখনও ব্যক্তিগত সংকল্প, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত শক্তিরপ্রয়োগে অহমাত্মক সব প্রবৃত্তিকে নিয়োগ করবে পরতর শক্তির প্রতিভূ হিসাবে ও সচেতন ভাবে পরতর প্রভাবের বশ্যতা স্বীকার ক'রে। আরো অগ্রসর হলে তার সংকল্প, প্রচেষ্টা ও শক্তি ব্যক্তিগত বা পৃথক কিছু আর থাকে না, এসব হয় সাধকের মধ্যে এই ক্রিয়াতে সেই পরতর শক্তির ও প্রভাবের বিভিন্ন কর্ম। কিন্তু তখনও দিব্য উৎস ও বহির্গামী মানুষী প্রবাহের মাঝে থাকে এক প্রকার বিশাল ব্যবধান, আর এই কারণে যাবার পথে আসে এক তমসাবৃত প্রণালী যা সব সময় নির্ভুল নয়, এমন কি কখন কখন যা অতীব বিভ্রান্তিকর। অগ্রসরের শেষ পর্বে, অহমিকা, অশুদ্ধতা ও অবিদ্যার উত্তরোত্তর তিরোভাবে এই শেষ ব্যবধানও লোপ পায়; তখন জীবের মধ্যে সব কিছুই হয়ে ওঠে দিব্যকর্মপ্রণালী।

* * *

পূর্ণযোগের পরম শাস্ত্র যেমন প্রতি মানুষের হৃদিস্থিত গূঢ় সনাতন বেদ, তেমন তার পরম দিশারী ও গুরু হলেন আমাদের অন্তর্গূঢ় আন্তর দিশারী জগদ্‌-গুরু। তিনিই আমাদের অন্ধকার দূর করেন তাঁর জ্ঞানের ভাস্বর জ্যোতিতে, আর সেই জ্যোতিই হয়ে ওঠে আমাদের মধ্যে তাঁর নিজের আত্ম-প্রকাশের প্রচীয়মান মহিমা। তিনি আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর প্রকট করেন মুক্তি, আনন্দ, প্রেম, শক্তি, অমৃতময় সত্তার আত্ম-প্রকৃতি। আমাদের

আদর্শ হিসাবে তিনি তুলে ধরেন আমাদের ঊর্ধ্বে তাঁর দিব্য দৃষ্টান্ত, এবং এই অবর জীবনকে রূপান্তরিত করেন তার ধ্যেয় বস্তুর প্রতিরূপে। আমাদের মধ্যে তাঁর নিজের প্রভাব ও উপস্থিতির অভিসিঞ্চন দ্বারা তিনি ব্যষ্টি সত্তাকে সামর্থ্য দেন বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীতের সহিত তাদাত্ম্যলাভে।

কি তাঁর পদ্ধতি কি তাঁর বিধান (system)? তাঁর কোন পদ্ধতি নেই, আবার সব পদ্ধতিই তাঁর পদ্ধতি। প্রকৃতি যে সব উচ্চতম প্রণালী ও গতিবৃত্তি লাভে সমর্থ সে সবকে স্বাভাবিক ভাবে সংহত করাই তাঁর বিধান। তাদের ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটি বিষয়ে পর্যন্ত এবং দৃশ্যতঃ যে কাজগুলি অতি নগণ্য সেগুলিতেও মহত্তমের মতই সযত্নে ও নিশ্ছিদ্র ভাবে নিজেদের প্রয়োগ ক'রে তারা পরিশেষে সব কিছুকেই উত্তোলন করে মহাজ্যোতিতে এবং সব কিছুই রূপান্তরিত করে। কারণ তাঁর যোগে ক্ষুদ্র এমন কিছু নেই যা ব্যবহারের অযোগ্য বা বড় এমন কিছু নেই যা সাধনার অতীত। মহাগুরুর দাস ও শিষ্যের যেমন অহংকার বা অহমিকার সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না, কারণ সকল কিছুই তার জন্য করা হয় ঊর্ধ্ব থেকে তেমন তাঁর ব্যক্তিগত ঊনতা বা তাঁর প্রকৃতির স্খলনের জন্য নিরুৎসাহ হবারও কোন অধিকার নেই। কারণ যে শক্তি তাঁর মধ্যে ক্রিয়ারত তা নৈর্ব্যক্তিক—বা অতিব্যক্তিক—এবং অসীম।

এই আন্তর দিশারী, যোগেশ্বর, সকল যজ্ঞ ও সাধনার প্রভু, আলোক, ভোক্তা ও লক্ষ্যকে পূর্ণভাবে স্বীকার করা অখণ্ড সিদ্ধির পথে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে তাঁকে যে ভাবেই দেখা যাক না কেন—সকল বিষয়ের পশ্চাতে নৈর্ব্যক্তিক প্রজ্ঞা, প্রেম ও শক্তি ভাবে, না হয় সাপেক্ষের মধ্যে অভিব্যক্ত ও তার আকর্ষক পরমার্থসৎ হিসাবে অথবা নিজেরই পরমাত্মা ও সকলের পরমাত্মা বলে বা আমাদের অন্তরে ও জগতের মধ্যে দিব্য ব্যক্তি রূপে, তাঁর বহুবিধ পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক আকার ও নামের যে কোন একটিতে অথবা মনোভাবিত কোন আদর্শ হিসাবে—যে ভাবেই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। পরিশেষে আমরা বুঝি যে তিনি সব কিছু এবং এইসব বিষয়ের সমষ্টিরও বেশী তিনি। তাঁর সম্বন্ধে ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করার মনের দ্বার অতীত পরিণাম ও বর্তমান প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন হতে বাধ্য।

প্রথম দিকে আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অতীত তীব্রতার জন্য এবং অহং নিজেতে ও তার সব লক্ষ্যে নিবিষ্ট থাকার দরুন এই আন্তর দিশারী প্রায়শঃই প্রচ্ছন্ন থাকেন। যতই আমরা স্বচ্ছতা লাভ করি, এবং অহমাত্মক বিক্ষোভের স্থলে আসে অধিকতর শান্ত আত্ম-জ্ঞান ততই আমরা চিনতে থাকি আমাদের অন্তঃস্থ বর্ধিষ্ণু আলোকের উৎসকে। আবার যখন আমরা উপলব্ধি করি

কিরূপে আমাদের সকল অজ্ঞানতাময় ও পরস্পর বিরোধী গতিবৃত্তি এমন এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিরূপিত হয়েছে যার কথা আমরা মাত্র এখনই জানতে পারছি এবং আরো উপলব্ধি করি কেমন করে আমরা যোগের পথে আসার পূর্বেও আমাদের জীবনের বিবর্তন তার সন্ধিক্ষণের জন্য পূর্ব কল্পিত ভাবে চালিত হয়েছে তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারি আমাদের অতীতের মধ্যেও। কেননা এই সময় আমরা বুঝতে শুরু করি আমাদের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা, সফলতা ও বিফলতার তাৎপর্য কি। পরিশেষে আমরা বুঝি আমাদের সব কঠোর পরীক্ষার ও দুঃখভোগের অর্থ কি এবং যে সব থেকে আমরা আঘাত ও বাধা পেয়েছি, সেগুলি আমাদের কত সহায় হয়েছে, এবং আমাদের পতন ও পদস্খলন কত উপকারে এসেছে তাও হৃদয়ংগম করতে সমর্থ হই। এই যে দিব্য চালনার কথা আমরা পরে বুঝতে পারি, তা শুধু অতীতের ঘটনা সম্বন্ধে নয়, অব্যবহিত বর্তমান কালেও আমরা বোধ করি যে এক অ-তিষ্ঠা দ্রষ্টার দ্বারা আমাদের সব মননের, এক সর্বগ্রাহী সামর্থ্যের দ্বারা আমাদের সংকল্প ও ক্রিয়ার, যে পরম আনন্দ ও প্রেম সকল কিছু আকর্ষণ করেন ও নিজের মধ্যে এক করে নেন তাঁর দ্বারা আমাদের ভাবপ্রধান জীবনের গঠন—এইসব বিষয়েও রয়েছে সেই দিব্য দেশনা। তাছাড়া এঁকে চিনি আমরা নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্কেও তাঁর প্রথম স্পর্শে অথবা অন্তিম গ্রহণে; অনুভব করি এক পরম প্রভু, বন্ধু, প্রেমিক, গুরুর চিরন্তন সান্নিধ্য। এক মহত্তর ও বিশালতর জীবনের সারূপ্যে ও একত্বে আমাদের সত্তা বিকশিত হওয়ার সময় আমরা এঁকে চিনি আমাদের সত্তারস্বরূপে, কারণ আমাদের উপলব্ধি হয় যে এই অত্যাশ্চর্য বিকাশ আমাদের নিজের প্রচেষ্টায় হয় নি, আমাদের গড়ে তুলছেন এক নিত্য পূর্ণ সত্তা তার নিজের প্রতিমূর্তিতে। যিনি যোগদর্শনের ঈশ্বর, সচেতন জীবের মাঝে চৈত্যগুরু বা অন্তর্যামী, মনীষীর পরমার্থসৎ, অজ্ঞেয়বাদীর অজ্ঞেয়তত্ত্ব, জড়বাদীর বিশ্বশক্তি, যিনি পরম পুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি, যিনি এক কিন্তু বিভিন্ন ধর্মে যাঁর নানা নাম ও নানা মূর্তি—তিনিই আমাদের যোগের অধীশ্বর।

আমাদের বিভিন্ন আন্তর আত্মায় ও সমগ্র বহির্প্রকৃতিতে এই পরম একেকে দেখা, জানা, তাঁর স্বরূপে রূপায়িত হওয়া ও তাঁকে সার্থক করা—চিরদিন ইহাই ছিল আমাদের দেহগত জীবনের গূঢ় লক্ষ্য আর এখন ইহাই হয় তার সচেতন উদ্দেশ্য। আমাদের ব্যষ্টি চেতনার পূর্ণতা হল আমাদের সত্তার সকল অংশে এবং বিভাজক মন যে সবকে আমাদের সত্তার বাহির বলে দেখে সে সবেও সমভাবে তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। নিজেদের মধ্যে ও সর্ব বিষয়ে তাঁর দ্বারা অধিগত হওয়া, ও তাঁকে অধিগত করা ইহাই সাম্রাজ্য ও ঈশিত্বের সংজ্ঞা। নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তা, শান্তি ও সামর্থ্য, ঐক্য

ও ভেদ—এই সকল কিছুর অনুভূতিতে তাঁকে ভোগ করাই সেই সুখ যার জন্য জগতে ব্যক্ত জীবের অজ্ঞানময় অন্বেষণ। বিশ্বপ্রকৃতি যে সত্য নিজের মধ্যে গোপন রেখেছে, এবং যা উদ্‌ঘাটন করার জন্য তার এত কষ্টভোগ সেই সত্যকে ব্যক্তিগত ভাবে অনুভব করা—ইহাই পূর্ণযোগের লক্ষ্যের সমগ্র বিবরণ। ইহার অর্থ মানবের অন্তঃপুরুষকে দিব্যপুরুষে, প্রাকৃত জীবনকে দিব্য জীবনধারায় রূপান্তরিত করা।

* * *

এই পূর্ণ সার্থকতা প্রাপ্তির নিশ্চিততম উপায় হল আমাদের অন্তরধিষ্ঠিত রহস্যের ঈশ্বরকে পাওয়া, অবিরত নিজেদের উন্মুক্ত রাখা দিব্যশক্তির কাছে, যা আবার দিব্য প্রজ্ঞা ও প্রেম—এবং রূপান্তর সাধনের জন্য তাঁকে বিশ্বাস করা। কিন্তু শুরুতে অহমাত্মক চেতনার পক্ষে আদৌ একাজ করা কঠিন। আর যদি আদৌ করা হয়, তাহলেও ইহা সুষ্ঠুভাবে এবং আমাদের প্রকৃতির প্রতি তন্ত্রীতে সাধন করা কঠিন। প্রথমে যে এই কাজ কঠিন তার কারণ আমাদের ভাবনা, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, বেদনার অহমাত্মক অভ্যাসগুলি আবশ্যকীয় উপলব্ধি লাভের সব পথ রুদ্ধ করে দেয়। আর পরে যে একাজ কঠিন তার কারণ অহং-আচ্ছন্ন অন্তঃপুরুষের পক্ষে এই পথের প্রয়োজনীয় বিশ্বাস, সমর্পণ ও সাহস সহজসাধ্য নয়। অহমাত্মক মন যে কর্মপ্রণালী কামনা বা অনুমোদন করে, দিব্যকর্মপ্রণালী তা নয় কারণ ইহা সত্য পাবার জন্য ব্যবহার করে ভ্রম, আনন্দ পাবার জন্য দুঃখ ভোগ, পূর্ণতা পাবার জন্য অপূর্ণতা। কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অহং তা দেখতে পায় না; সে চালনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তার আত্ম-প্রত্যয় ও সাহস লোপ পায়। কিন্তু এসব ত্রুটি-বিচ্যুতিতে কিছু আসে যায় না; কারণ অন্তঃস্থ দিব্য দিশারী আমাদের বিদ্রোহে রুষ্ট বা আমাদের বিশ্বাসের অভাবে নিরুৎসাহ হন না বা আমাদের দুর্বলতায় বিরক্ত হয়ে ফিরে যান না; তাঁর আছে মায়ের পরিপূর্ণ স্নেহ, ও শিক্ষকের অসীম ধৈর্য। কিন্তু তাঁর দেশনা থেকে সম্মতি প্রত্যাহার করার অর্থ ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে চেতনা থেকে বঞ্চিত হওয়া; অবশ্য বাস্তবপক্ষে ইহা পুরোপুরি নষ্ট হয় না, তাছাড়া শেষ পর্যন্ত ইহার ফল পাওয়া যায়ই। আর আমরা যে সম্মতি প্রত্যাহার করি তার কারণ এই যে তিনি যে অবর আত্মার মাধ্যমে তাঁর আত্ম-প্রকাশের আয়োজন করছেন তার সহিত আমাদের পরতর আত্মার পার্থক্য আমরা বুঝতে অক্ষম। যেমন জগতে, তেমন নিজে'দর মধ্যে আমরা ভগবানকে যে দেখতে পাই না তার কারণ তাঁর কর্মপ্রণালী, বিশেষতঃ তিনি আমাদের মধ্যে কাজ করেন আমাদের প্রকৃতির মাধ্যমে—যথেচ্ছভাবে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা দিয়ে নয়। বিশ্বাস পাবার জন্য মানুষ চায় অলৌকিক ঘটনা; সে চায় চোখ ঝলসে যাক তবে

যদি সে দেখতে পায়। আর এই অধৈর্য, এই অজ্ঞানতার পরিণতি হতে পারে "মহতী বিনষ্টিঃ" যদি এই দেশনার বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহে আমরা আমাদের সংবেগ ও কামনার আরো তৃপ্তিকর অন্য কোন বিকৃতিকারিণী শক্তিকে আহ্বান করি ও তাকে ভগবানের নাম দিয়ে বলি, "তুমিই আমাদের পথ দেখাও।"

নিজের অন্তরে অ-দেখা কিছুকে বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে কঠিন, অথচ অন্য কিছুকে নিজের বাহিরে কল্পনা ক'রে তাকে বিশ্বাস করা তার পক্ষে সহজ। বেশীর ভাগ মানুষের পক্ষেই অধ্যাত্ম অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন কোন বাহিরের অবলম্বন, বিশ্বাসের কোন বাহ্য পাত্র; ইহার প্রয়োজন হয় ভগবানের কোন বাহ্য প্রতিমূর্তি. নয় কোন মানুষী প্রতিভূ যেমন অবতার বা দিব্যবাণী প্রচারক বা গুরু; অথবা দুয়েরই প্রয়োজন ও দুই-ই পাওয়া যায়। কারণ মানুষের অন্তঃপুরুষের প্রয়োজন অনুযায়ী ভগবান নিজেকে ব্যক্ত করেন— হয় কোন দেবতারূপে নয় কোন মানব দেবতারূপে. আর না হয় সাদাসিধে মানবরূপেই; তাঁর দেশনা প্রেরণের উপায় হিসাবে তিনি এই পুরু ছদ্মবেশ ব্যবহার করেন যাতে দেবত্ব সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন থাকে।

অন্তঃপুরুষের এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাধনার ইষ্ট দেবতা, অবতার ও গুরুর ভাবনা। ইষ্ট দেবতার অর্থ কোন অবর শক্তি নয়, ইহা বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক পরম দেবতার কোন নাম ও রূপ। প্রায় সকল ধর্মই ভগবানের এইরূপ কোন নাম ও রূপকে হয় তাদের ভিত্তি-স্বরূপ স্বীকার করে, নয় তাদের ব্যবহার করে। মানুষের অন্তঃপুরুষের পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট। ভগবান সর্ব এবং সর্বেরও অতিরিক্ত। কিন্তু যা সর্বের অতিরিক্ত তার ধারণা মানুষের পক্ষে কি ভাবে সম্ভব? এমন কি প্রথমে সর্বও মানুষের পক্ষে অসাধ্য, কারণ মানুষ নিজেই তার সক্রিয় চেতনায় এক সসীম ও বিবিক্ত গঠন মাত্র এবং যা তার সসীম প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ শুধু তার কাছেই সে পারে নিজেকে উন্মুক্ত করতে। এই সর্বের মধ্যে এমন সব বিষয় আছে যা তার ধারণা শক্তির অগম্য, অথবা তারা এত ভয়ংকর যে তার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল ভাবাবেগ ও সংকোচশীল ইন্দ্রিয়-সংবিতের পক্ষে অসহনীয় মনে হয়। অথবা শুধু বলা যায়, তার অজ্ঞানতাময় বা আংশিক সব ভাবনার গণ্ডির বেশী বাহিরের কোন কিছুকেই ভগবানরূপে ধারণা করা বা তার দিকে অগ্রসর হওয়া বা তাকে চেনা তার পক্ষে অসম্ভব। তার পক্ষে দরকার তার নিজের প্রতিমূর্তিতে ভগবানকে ভাবনা করা বা এমন কোনরূপে ভাবনা করা যা তার অতীত অথচ তার উৎকৃষ্ট প্রবণতার সহিত সুসমঞ্জস এবং তার বেদনা (feeling) বা বুদ্ধির গ্রাহ্য। নতুবা ভগবানের সহিত তার সংযোগ ও মিলন সাধন তার পক্ষে দুরূহ হবে।

তবু তার প্রকৃতি চায় এক মানুষী মধ্যস্থ, যেন সে ভগবানকে অনুভব করতে পারে এমন কিছুতে যা তার নিজের মানবতার একান্তই নিকটে ও যার মানুষী প্রভাব ও দৃষ্টান্ত তার বোধগম্য। এই চাওয়া পূর্ণ হয় যখন ভগবান আবির্ভূত হন মানবরূপে অর্থাৎ অবতার হয়ে, কৃষ্ণ, খৃষ্ট, বা বুদ্ধ-রূপে। অথবা যদি এই ধারণাও তার পক্ষে অসাধ্য হয় তাহলে ভগবান নিজেকে প্রকট করেন কোন কম বিস্ময়কর মধ্যস্থ হিসাবে—যেমন দিব্যবাণী প্রচারক বা আচার্য হিসাবে কারণ এমন লোক আছে যারা নররূপী ভগবানের ধারণা করতে অক্ষম বা তাঁকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক অথচ মহত্তম মহাপুরুষের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করতে তারা প্রস্তুত। একে তারা অবতার বলে না, বলে জগদাচার্য বা ভগবানের প্রতিভূ।

কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নয়; মানুষের প্রয়োজন—এক জীবন্ত প্রভাব, এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত, সাক্ষাৎ উপদেশ। কারণ অতীত কালের আচার্য ও তাঁর দৃষ্টান্ত ও প্রভাবকে জীবনে জীবন্ত শক্তি করার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে। এই প্রয়োজনের জন্যও হিন্দুসাধনায় গুরু-শিষ্য সম্পর্কের ব্যবস্থা আছে। কখন কখন হয়ত গুরু নিজেই অবতার বা জগদাচার্য কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন তা এই যে তিনি শিষ্যের কাছে হবেন দিব্য প্রজ্ঞার প্রতীক, তার কাছে নিয়ে আসবেন দিব্য আদর্শের কিছুটা বা তাকে অনুভব করাবেন সনাতনের সহিত অন্তঃপুরুষের উপলব্ধ সম্বন্ধ।

পূর্ণ যোগের সাধক তার প্রকৃতি অনুযায়ী এই সকল সহায়গুলিকেই কাজে লাগাবে। কিন্তু তার কর্তব্য হল এসবের সংকীর্ণতা পরিহার করা; তাছাড়া অহমাত্মক মন যে ভাবে অন্য সব বাদ দিয়ে বলে; "আমার ভগবান, আমার অবতার, আমার নবী, আমার গুরু" এবং সাম্প্রদায়িকতার বা গোঁড়ামির বশে অন্যসব উপলব্ধিকে তার বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করে সে মনোভাব পূর্ণ-যোগের সাধকের দূর করা কর্তব্য। সকল রকম সাম্প্রদায়িকতা, সকল রকম গোঁড়ামি ত্যাগ করা চাই-ই; কারণ এসব দিব্য উপলব্ধির অখণ্ডতা বিরুদ্ধ।

অপরপক্ষে যতক্ষণ না পূর্ণযোগের সাধক নিজের ভাবনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে ভগবানের সকল নাম, সকল রূপ, নিজের ইষ্ট দেবতাকে দেখে অন্য সকল ইষ্টদেবতার মধ্যে, যতদিন না সে অবতারের মধ্যে অবতীর্ণ ভগবানের ঐক্যের মধ্যে এক করে অন্য সব অবতারকে, সকল শিক্ষার সত্যকে সংহত করে শাশ্বত প্রজ্ঞার সৌষম্যের মধ্যে—ততক্ষণ তার তৃপ্তি নাই।

তার একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে এই সব বাহ্য সহায়ের লক্ষ্য হল তার অন্তঃপুরুষকে উদ্বুদ্ধ করা তার অন্তঃস্থিত ভগবানের কাছে। যতদিন না একাজ সিদ্ধ হয় ততদিন সাধনার শেষ হয় না। বাহিরে কৃষ্ণ, খৃষ্ট, বুদ্ধকে পূজা করাই যথেষ্ট নয়, যদি আমাদের অন্তরের বুদ্ধ, খৃষ্ট বা কৃষ্ণের

প্রকাশ না হয়, যদি না তাঁরা রূপ গ্রহণ করেন অন্তরে। ঠিক এই মত অন্য সকল সহায়েরও অপর কোন উদ্দেশ্য নেই; ইহাদের প্রতিটি হল মানুষের অপরিবর্তিত অবস্থা ও তার অন্তঃস্থ ভগবানের প্রকাশের মধ্যকার সেতু-স্বরূপ।

*   *   *

পূর্ণযোগের গুরু যতদূর সম্ভব আমাদের অন্তঃস্থ গুরুর পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। তিনি শিষ্যকে চালনা করবেন শিষ্যের প্রকৃতির মাধ্যমে। শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, প্রভাব—এই তিনটি গুরুর যন্ত্র। কিন্তু প্রাজ্ঞ গুরু শিষ্যের গ্রহিষ্ণু মনের নিষ্ক্রিয় স্বীকৃতির উপর নিজেকে বা নিজের মতামতকে জোর করে চাপাতে চাইবেন না! তিনি শিষ্যের অন্তরে বীজাকারে নিক্ষেপ করবেন এমন কিছু যা নিশ্চিতভাবে ফলপ্রসূ এবং এই বীজ বর্ধিত হবে অন্তঃস্থ দিব্য পরিপোষণের আশ্রয়ে। উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা প্রবুদ্ধ করাই তাঁর লক্ষ্য; স্বাভাবিক প্রণালীও স্বচ্ছন্দ প্রসারের মাধ্যমে বিভিন্ন শক্তি ও অনুভূতির বিকাশই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি পদ্ধতির নির্দেশ দেবেন, কিন্তু তা সহায় হিসাবে, সাধনোপযোগী উপায় হিসাবে, ইহা কোন অলঙ্ঘনীয় সূত্র বা বাঁধা কার্যক্রম নয়। কিন্তু তাঁকে সতর্ক থাকতে হবে যেন উপায়টি বন্ধন না হয়, সাধন প্রণালী না পরিণত হয় যান্ত্রিক অনুষ্ঠানে। তাঁর একমাত্র কাজ হল দিব্য আলোকের উন্মেষ সাধন ও দিব্য শক্তিকে সক্রিয় করা, তিনি শুধু এদের উপায় ও সহায়, আধার বা প্রবাহ প্রণালী।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের শক্তি বেশী। কিন্তু যা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা বাহ্যকর্মের বা ব্যক্তিগত চরিত্রের দৃষ্টান্ত নয়। অবশ্য ইহাদেরও স্থান ও উপকারিতা আছে; কিন্তু অপরের মধ্যে আস্পৃহা জাগাবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ হল তাঁর অন্তঃস্থ দিব্য উপলব্ধি যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর সমগ্র জীবন ও আন্তর অবস্থা এবং সকল কর্ম। ইহাই সার্বভৌম মূল উপাদান, বাকী সব ব্যক্তি বিশেষ বা ঘটনা বিশেষের কথা। এই স্ফুরন্ত উপলব্ধিকেই অনুভব করা এবং নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী নিজের মধ্যে জাগিয়ে তোলা সাধকের কর্তব্য; বাহির থেকে অনুকরণের চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই, ইহাতে স্বাভাবিক ও সঠিক ফল পাওয়ার বদলে বরং সব কিছু হতে পারে নিষ্ফল।

দৃষ্টান্ত অপেক্ষা প্রভাব আরো গুরুত্বপূর্ণ। প্রভাবের অর্থ শিষ্যের উপর গুরুর বাহ্য কর্তৃত্ব নয়, ইহার অর্থ তাঁর সংস্পর্শের শক্তি, তাঁর উপস্থিতির শক্তি এবং অন্যের অন্তঃপুরুষের সহিত তাঁর অন্তঃপুরুষের সান্নিধ্যের শক্তি যার বলে তিনি স্বয়ং যা এবং যা কিছু তাঁর আছে তা তিনি সঞ্চারিত করেন শিষ্যের অন্তঃপুরুষের মধ্যে যদিও তা নীরবে। ইহাই গুরুর পরমোৎকৃষ্ট

চিহ্ন। কারণ শ্রেষ্ঠ গুরু হলেন আচার্য অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে উপস্থিতি যা তাঁর চারপাশের সকল গ্রহিষ্ণুদের মধ্যে বর্ষণ করে দিব্য চেতনা এবং ইহার উপাদান স্বরূপ আলোক, শক্তি, বিশুদ্ধতা ও আনন্দ।

পূর্ণযোগের গুরুর আর এক চিহ্ন এই যে তিনি মানুষী দম্ভ বা আত্ম-স্ভরিতার ভাব নিয়ে গুরুগিরি দাবী করেন না। যদি তাঁর কোন কাজ থাকে তা ঊর্ধ্ব থেকে ন্যস্ত হয়েছে, তিনি নিজে এক প্রণালী, এক পাত্র বা এক প্রতিভূ মাত্র। তিনি মানুষ, তাঁর ভাইদের সাহায্য করেন; বালক তিনি, অন্য বালকদের পথ দেখান; পরম বর্তিকা তিনি, অন্য বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেন, প্রবুদ্ধ পরম পুরুষ তিনি, অন্য সব অন্তঃপুরুষ প্রবুদ্ধ করেন; আর সর্বোপরি তিনি ভগবানের এক শক্তি বা উপস্থিতি যা ভগবানের অন্য সব শক্তিকে আহ্বান করে তাঁর নিকট।

* * *

এই সকল সহায়ই যে সাধক পায় তার লক্ষ্যপ্রাপ্তি ধ্রুব। পতনও তার পক্ষে উত্থানের উপায় মাত্র, মৃত্যু সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবার পথ। কেন না একবার সে যখন এই পথ ধরেছে, জন্ম ও মৃত্যু তার সত্তার বিকাশ সাধনের প্রণালী মাত্র, তার যাত্রাপথের বিভিন্ন পর্যায় মাত্র।

সাধন ধারায় ফলপ্রসূতার জন্য বাকী যে সহায় প্রয়োজন তা কাল। মানুষের প্রচেষ্টার কাছে কাল মনে হয় শত্রু বা মিত্র, বিঘ্ন, মাধ্যম বা যন্ত্রস্বরূপ। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা সর্বদাই অন্তঃপুরুষের সাধন যন্ত্র।

যে সকল ঘটনা ও শক্তি একত্র মিলে কাজ করার ফলে এক অগ্রসরতার উৎপত্তি হয়, কাল তাদের ক্ষেত্র ও গতিধারার পরিমাপক। অহং-এর নিকট ইহা উপদ্রব, বাধা, ভগবানের কাছে ইহা এক যন্ত্র। সুতরাং যতদিন আমাদের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত থাকবে, ততদিন মনে হবে কাল এক বাধা কারণ ইহা আমাদের নিকট আনয়ন করে আমাদের শক্তির বিরোধী বিভিন্ন শক্তির সব বিঘ্ন। যখন আমাদের চেতনায় মিলিত হয় দিব্যকর্মধারা ও ব্যক্তিগত কর্মধারা তখন মনে হয় ইহা মাধ্যম ও অবস্থা। এ দুই যখন এক হয়, তখন মনে হয় কাল ভৃত্য ও যন্ত্র।

কালের প্রতি সাধকের আদর্শ মনোভাব এই হবে যে তার ধৈর্য অসীম, যেন তার সার্থকতা সাধনের জন্য অনন্তকাল তার সম্মুখে, অথচ এমন শক্তিকে বিকশিত করা দরকার যা এখন বাস্তবে রূপায়িত হবে, আর যার ঈশিত্ব ও ক্ষিপ্রতার চাপ নিরন্তরই বাড়তে থাকবে যতদিন না ইহা উপনীত হয় পরম দিব্য রূপান্তরের অলৌকিক তৎক্ষণত্বে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মোৎসর্গ

যোগের যা প্রকৃতি তাতে ইহা এক নবজন্ম—মানবের সাধারণ মানসিক-ভাবাপন্ন জড়াসক্ত জীবন থেকে পরতর অধ্যাত্ম চেতনায় এবং মহত্তর ও দিব্যতর সত্তায় জন্ম পরিগ্রহ। বৃহত্তর অধ্যাত্ম জীবনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রবল ভাবে প্রবুদ্ধ না হলে কোন যোগেরই সফল আরম্ভ ও অনুশীলন সম্ভব নয়। এই গভীর ও বিরাট পরিবর্তনের জন্য যে অন্তঃপুরুষ আহবান পায় সে তার নতুন পথে যাত্রারম্ভের মোড়ে আসে নানা ভাবে। সে এখানে আসতে পারে তারই নিজস্ব স্বভাবের বিকাশ ধারায় যা তাকে তাব অজ্ঞাতসারেই নিয়ে যাচ্ছিল তার জাগরণের দিকে, নয় তো কোন ধর্মের প্রভাবে বা দর্শনের আকর্ষণে, অথবা মন্থর আন্তর দীপ্তির সাহায্যে সে ধীরে-ধীরে সেখানে পৌঁছয় বা হঠাৎ কোন স্পর্শ বা আঘাত পেয়ে সে তথায় যায় লাফ দিয়ে; না হয় বাহ্য অবস্থার চাপ বা কোন আন্তর প্রয়োজনীয়তা বা এমন একটি কথা যাতে তার মনের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয় বা সুদীর্ঘ চিন্তা বা এই পথের পূর্বগামী কাহারও দূরাগত দৃষ্টান্ত বা তার সংস্পর্শ ও প্রাত্যহিক প্রভাব তাকে সেখানে ঠেলে বা চালিয়ে আনতে পারে। সাধকের প্রকৃতি ও অবস্থা অনুযায়ীই আহবান আসবে।

কিন্তু যে ভাবেই এই আহবান আসুক না কেন, আবশ্যক হল মন ও সংকল্পের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং ইহার ফলস্বরূপ সম্পূর্ণ ও কার্যকরী আত্মোৎসর্গ। সত্তায় এক নতুন আধ্যাত্মিক ভাবনা-শক্তি গ্রহণ এবং ঊর্ধ্বপানে উন্মুখতা, এক দীপ্তি, সংকল্প ও হৃদয়ের আস্পৃহার দ্বারা উপলব্ধ এক পরাবর্তন বা রূপান্তর—ইহারই গুরুত্ব সমধিক, যোগ যা কিছু দিতে পারে সে সব ইহারই মধ্যে আছে যেমন সব ফল থাকে বীজের মধ্যে। ঊর্ধ্বতন কিছুর জন্য শুধু ভাবনা বা বুদ্ধিগত অন্বেষণ, তাতে মনের আগ্রহ যত প্রবলই হোক না কেন, নিষ্ফল হবে যদি না হৃদয় তাকে একমাত্র কাম্য এবং সংকল্প তাকে একমাত্র করণীয় ব'লে আঁকড়ে ধরে। কারণ পরম চিৎ-পুরুষের সত্য শুধু ভাবনার বিষয় হলে হবে না, সেই সত্যকে জীবনে রূপায়িত করা চাই, আর ইহার জন্য দরকার সত্তার একীভূত একচিত্ততা; যে মহাপরিবর্তন যোগ আনতে চায় তা বিভক্ত সংকল্পে বা অল্প শক্তি বা দ্বিধাগ্রস্ত মন দিয়ে সাধিত হয় না। যে ভগবানকে পেতে চায় তার উৎসর্গ করা চাই নিজেকে ভগবানের কাছে, আর তা একমাত্র ভগবানেরই কাছে।

যদি কোন দুর্বার প্রভাবের ফলে আকস্মিক ও চূড়ান্তভাবে এই পরিবর্তন আসে তা হলে আর কোন মৌলিক বা স্থায়ী প্রতিবন্ধ থাকে না। মননের পরে বা সাথে-সাথে সিদ্ধান্ত আসে, আর সিদ্ধান্তের পরে আসে আত্মোৎসর্গ। পথের উপর পা ঠিক পড়েছে যদিও প্রথমে মনে হয় অনিশ্চিতভাবে ঘোরাঘুরি হচ্ছে, এমনকি যদিও পথের দৃষ্টি অস্পষ্ট আর গন্তব্যস্থলের জ্ঞানও অসম্পূর্ণ। গোপন গুরু, আন্তর দিশারী কাজ আরম্ভ করেছেন, যদিও তিনি এখনো নিজেকে ব্যক্ত করেননি অথবা মানুষী প্রতিভূ-আকারে দেখা দেননি। যত কিছু বাধা বা দ্বিধা আসুক না কেন, অনুভূতির যে শক্তিতে জীবনের স্রোত ফিরেছে তার বিরুদ্ধে তারা শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবে না। যে ডাক একবার নিশ্চিতভাবে এসেছে তা যাবার নয়; যা জন্মেছে, শেষ পর্যন্ত তাকে বিনাশ করা যায় না। এমন কি যদি ঘটনা প্রভাবে নিয়মিত যাত্রা বা পূর্ণ বাস্তব আত্মোৎসর্গ প্রথম থেকে না হয়, তা হলেও মন নতুনের দিকে ফিরেছে, সে সেদিকেই ফিরে থাকে এবং তার মুখ্য কর্মে ফিরে আসে আর তার ফলও বাড়তে থাকে নিরন্তর। আন্তর পুরুষের অধ্যবসায় অমোঘ, আর তার বিরুদ্ধে সকল ঘটনাই শেষে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, প্রকৃতিস্থ কোন দুর্বলতাই দীর্ঘদিন বাধা হ'য়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু সব সময় সাধনার আরম্ভ যে এইভাবে হয় তা নয়। প্রায়শঃই সাধককে নিয়ে যাওয়া হয় ধীরে-ধীরে· মনের প্রথম ফেরার সময় থেকে যার দিকে সে ফিরেছে তাতে প্রকৃতির পূর্ণ সম্মতি দেওয়ার মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে। প্রথম দিকে থাকতে পারে শুধু বুদ্ধির এক দীপ্ত আগ্রহ, ভাবনার দিকে এক প্রবল আকর্ষণ এবং অনুশীলনের কোন অসম্পূর্ণ রূপ। অথবা হয়তো এমন চেষ্টা থাকে যাতে সমগ্র প্রকৃতির অনুমোদন নেই, এমন প্রতিজ্ঞা বা পরিবর্তন থাকে যার মূলে আছে বুদ্ধিগত প্রভাবের চাপ বা পরতমের নিকট উৎসর্গীকৃত এমন ভক্ত কাহারও প্রতি ব্যক্তিগত স্নেহ ও অনুরাগের প্রবল টান। এরূপক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী প্রস্তুতির প্রয়োজন হতে পারে তবেই যদি অপরিবর্তনীয় উৎসর্গ আসে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তা নাও আসতে পারে। হয়তো কিছু উন্নতি হয়, বা জোরাল প্রচেষ্টা হয়, এমন কি কেন্দ্রীয় বা পরম না হলেও বহুপরিমাণে বিশুদ্ধকরণ ও অনুভূতিও লাভ হয়, কিন্তু সমস্ত জীবন হয়তো প্রস্তুতিতেই কেটে যাবে অথবা একটা পর্যায়ে পৌঁছিবার পর মনের পিছনে চালনাশক্তি কম হওয়ায় মন তার চেষ্টার সীমায় এসে তুষ্ট হয়ে বসে থাকে। অথবা সাধককে এমন কি নিম্ন জীবনেও ফিরে আসতে হতে পারে, অর্থাৎ যোগের সাধারণ ভাষায় যাকে বলা হয় পতন তা হতে পারে। এরূপ পতন ঘটার কারণ মূল কেন্দ্রে কোন গলদ আছে। বুদ্ধি আগ্রহী ও হৃদয় আকৃষ্ট হয়েছে, সংকল্প সাধনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু

সমগ্র প্রকৃতি ভগবানের পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নি; আগ্রহে, আকর্ষণে বা চেষ্টায় ইহা শুধু সায় দিয়েছে। এক পরীক্ষণ করা হয়েছে, এমন কি তা সাগ্রহ পরীক্ষণ, কিন্তু অন্তঃপুরুষের কোন একান্ত দাবীর কাছে বা কোন অপরিত্যাজ্য আদর্শের কাছে সমগ্র আত্ম-দান হয় নি। এইরকম অসম্পূর্ণ যোগও নষ্ট হয় না, কেননা কোন ঊর্ধ্বমুখী প্রচেষ্টাই বৃথা যাবার নয়। এমন কি বর্তমানে ইহা বিফল হলেও বা শুধু কোন প্রস্তুতির পর্যায়ে এলে বা প্রাথমিক উপলব্ধি পেলেও, ইহার দ্বারা অন্তঃপুরুষেয ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছে।

কিন্তু এই জীবন আমাদের যে সুযোগ দিয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার যদি আমরা করতে চাই, যে আহ্বান আমরা পেয়েছি তাতে যদি পর্যাপ্তভাবে সাড়া দিই, যে লক্ষ্যের আভাস আমরা পেয়েছি তার দিকে শুধু একটু অগ্রসর হওয়া নয়, তাতে যদি আমরা পৌঁছতে চাই তা হলে নিঃশেষে আত্ম-দান অপরিহার্য। যোগে সাফল্যলাভের রহস্য এই যে ইহাকে জীবনে সাধ্য বহু লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম মনে করা নয়, মনে করতে হবে যে ইহাই সমগ্র জীবন।

* * *

যোগের সার হল—অধিকাংশ লোক যে সাধারণ জড়াসক্ত ও পশুজীবন যাপন করে তা থেকে, বা অল্প কিছু লোক যে অধিকতর মনোময় কিন্তু তবু সংকীর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তা থেকে মহত্তর অধ্যাত্ম জীবনে, দিব্য পথে ঘুরে দাঁড়ান; সুতরাং অবর জীবনের ভাব নিয়ে ঐ জীবনের জন্য যে শক্তি ব্যয় হয় তার প্রতি অংশ আমাদের লক্ষ্য ও আমাদের আত্মনিবেদনের পরিপন্থী। অপর পক্ষে যে পরিমাণ শক্তি বা কর্ম আমরা অবর জীবনের বশ্যতা থেকে মুক্ত করে পরতর জীবনের কাজে নিবেদন করতে পারি, সেই পরিমাণ আমাদের লাভ যোগের পথে, আর সেই পরিমাণ হ্রাস পাবে আমাদের উন্নতির বিরোধী সব শক্তির ক্ষমতা। সর্বাঙ্গীন রূপান্তরের এই কষ্টকরতাই যোগের পথে সকল পদস্থলনের কারণ। কেননা আমাদের সমগ্র প্রকৃতি ও তার পরিবেশ. আমাদের সমগ্র ব্যক্তিগত আত্মা ও সমগ্র বিশ্বজনীন আত্মা এমন সব অভ্যাস ও প্রভাবে পূর্ণ যারা আমাদের অধ্যাত্ম পুনর্জন্মের বিরোধী এবং আমরা যাতে সর্বান্তঃকরণে সাধনায় প্রবৃত্ত হতে না পারি তার জন্য সচেষ্ট। মানসিক, স্নায়বিক ও শারীরিক সব অভ্যাসের যে জটিল স্তূপ কতকগুলি নিয়ামক ভাবনা, কামনা ও সংসর্গের সূত্রে বাঁধা আছে অর্থাৎ কতিপয় বৃহৎ স্পন্দনের সহিত অনেকগুলি ক্ষুদ্র স্বয়ং-আবর্তনশীল সংমিশ্রণ যা,—আমরা এক অর্থে তা ছাড়া অন্য কিছু নই। আমাদের অতীত ও বর্তমানের যে গঠন সাধারণ জড়গত ও মনোময় মানুষের জীবন তা পুরোপুরি ভেঙে দেওয়া এবং আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করা দৃষ্টির এক নতুন কেন্দ্র, কর্মের এক নতুন বিশ্ব যা হবে দিব্য

মানবতা বা অতিমানবীয় প্রকৃতি—ইহাই আমাদের যোগের উদ্দেশ্য, এর চেয়ে কমকিছু নয়।

প্রথম প্রয়োজন হল ঃ মনের যে কেন্দ্রীয় বিশ্বাস ও দৃষ্টি মনের উন্নতি, তৃপ্তি ও স্বার্থসাধনে পুরানো বাহ্য বিষয় সমূহে মনকে একাগ্র করে তা ধ্বংস করা। এই উপরভাসা দৃষ্টিভঙ্গির বদলে একান্ত প্রয়োজন সেই গভীরতর বিশ্বাস ও দৃষ্টি যা শুধু ভগবানকে দেখে ও একমাত্র ভগবানকেই অন্বেষণ করে। পরবর্তী প্রয়োজন হল আমাদের সমগ্র অবর সত্তাকে এই নতুন বিশ্বাস ও মহত্তর দৃষ্টির নিকট প্রণত হতে বাধ্য করা। চাই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির অখন্ড সমর্পণ; ইহার প্রতি অংশে, প্রতি গতিবৃত্তিতে ইহা যেন নিজেকে নিবেদন করে তার কাছে যা অপ্রবুদ্ধ ইন্দ্রিয় মানসের কাছে জড় জগৎ ও তার বিভিন্ন বিষয় অপেক্ষা অনেক কম বাস্তব বলে মনে হয়। আমাদের সমগ্র সত্তাকে —অন্তঃপুরুষ, মন, ইন্দ্রিয় বোধ, হৃদয়, সংকল্প, প্রাণ, দেহ প্রত্যেককে নিজের সকল শক্তি উৎসর্গ করতে হবে এত নিঃশেষে ও এমন ভাবে যে ইহা যেন নিশ্চয়ই হয়ে ওঠে ভগবানের যোগ্য বাহন। এ কাজ সহজ নয়; কারণ জগতের সব কিছুই চলে দৃঢ় অভ্যাস অনুযায়ী আর ইহাই তার বিধান ও আমূল পরিবর্তনে বাধা দেয়। আর পূর্ণযোগে যে বিপ্লব আনার চেষ্টা হয় তার চেয়ে বেশী আমূল পরিবর্তন অন্য কিছু হতে পারে না। আমাদের মধ্যকার সব কিছুকেই নিরন্তর ফিরিয়ে আনতে হবে কেন্দ্রীয় বিশ্বাস ও সংকল্প ও দৃষ্টির দিকে। প্রতি মনন ও সংবেগকে উপনিষদের ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে"—তাকেই ব্রহ্ম বলে জেনো, মানুষ যাকে উপাসনা করে ইহা তা নয়। এতদিন যা সব তার জীবন বলে চিত্রিত হয়েছে সে সবের নিঃশেষ ত্যাগ স্বীকারে প্রাণের প্রতি তন্ত্রীকে বুঝিয়ে সম্মত করাতে হবে। মনকে মন হওয়া বন্ধ করে তার ঊর্ধ্বের কিছুর দ্বারা সমুজ্জ্বল হতে হবে। প্রাণকেও পরিবর্তিত হতে হবে বিরাট ও শান্ত এবং তীব্র ও শক্তিশালী কিছুতে যা তার পুরানো অন্ধ অধীর সংকীর্ণ আত্মা বা ক্ষুদ্র সংবেগ ও কামনাকে আর চিনতে পারবে না। এমন কি দেহকেও রাজী হ'তে হবে পরিবর্তনে; এখন যেমন সে অশান্ত পশু বা বাধাদায়ক মৃৎপিন্ড তেমন থাকা আর তার চলবে না; এর বদলে তাকে হতে হবে চিৎ-পুরুষের সচেতন সেবক, ভাস্বর যন্ত্র ও জীবন্ত রূপ।

এই কাজ এতই কঠিন যে স্বভাবতঃই সহজ ও কাটাছাঁটা সমাধানের পথই অবলম্বন করা হয়। বিভিন্ন ধর্মে ও যোগসম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রবৃত্তি জন্মেছে ও দৃঢ়মূল হয়েছে যে জাগতিক জীবনকে তফাৎ রাখা চাই আন্তর জীবন থেকে। তাদের ধারণা এই যে এই জগতের সব শক্তি ও তাদের বাস্তব ক্রিয়া আদৌ ভগবানের নয়, অথবা মায়া বা অন্য কিছু অজানা অবোধ্য কারণের

দরুন তারা দিব্য সত্যের তমসাপূর্ণ বিরোধী বস্তু। আর বিপরীত দিকে দেখা হয়, সত্যের সব শক্তি ও তাদের আদর্শ ক্রিয়াবলী চেতনার অন্য এক ভূমির অন্তর্ভুক্ত, পার্থিব জীবন যে অন্ধকারাচ্ছন্ন, অবিদ্যাময় সংবেগে ও শক্তিতে বিকৃত চেতনাভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত তা থেকে পৃথক এই সত্যের চেতনাভূমি। তখনই দেখা দেয় এক বিরোধ—ভগবানের উজ্জ্বল পবিত্র রাজ্য ও শয়তানের অন্ধকার অপবিত্র রাজ্য; এই হীন পার্থিব জন্ম-মৃত্যুর সহিত সমুন্নত অধ্যাত্ম দিব্য চেতনার বিরোধ আমরা অনুভব করি। আমরা সহজেই বিশ্বাস করি যে মায়াধীন জীবনের সহিত অন্তঃপুরুষের শুদ্ধ ব্রহ্মসত্তায় সমাহিত অবস্থার কোন মিল নেই। সহজতম উপায় হ'ল—যা সব একটির অন্তর্গত তা থেকে সরে অন্যটির নগ্ন উত্তুঙ্গ শিখরে পলায়ন। এই ভাবেই আত্যন্তিকভাবে একমাত্র ব্রহ্মেই অভিনিবিষ্ট হবার প্রতি আকর্ষণ ও প্রয়োজনীয়তার বোধ জাগে। বিশেষ কতকগুলি যোগের মধ্যে এরূপ অভিনিবেশকে বড় স্থান দেওয়া হয়েছে, কারণ এরূপ অভিনিবেশের সাহায্যে আমরা জগৎকে সম্পূর্ণ বর্জন করে আমাদের অভিনিবেশের বস্তু যে পরম এক তাঁর নিকট নিঃশেষে আত্মোৎসর্গ করতে সক্ষম হই। সকল অবর কর্মকে নতুন ও পরতর অধ্যাত্মজীবন লাভে কষ্ট করে স্বীকার করানতে ও তাদের ইহার কার্যসাধক ভৃত্য বা কার্যসাধিকা শক্তি হবার শিক্ষা দিতে আর আমাদের বাধ্যবাধকতা থাকে না। তখন তাদের বিনাশ বা উপশম সাধনই যথেষ্ট, অথবা বড় জোর একদিকে শরীর ধারণের জন্য ও অন্যদিকে ভগবানের সহিত সংযোগ রাখার জন্য যে অল্প কটি শক্তির প্রয়োজন, মাত্র সেইগুলিকে রক্ষা করা চলে।

কিন্তু পূর্ণযোগের যে লক্ষ্য ও ভাবনা তাতে এই সরল ও কষ্টকর উঁচু-সুরে বাঁধা প্রণালী অবলম্বন করা যায় না। আমাদের আশা অখণ্ড রূপান্তর, সুতরাং সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নেওয়া বা আমাদের সব প্রতিবন্ধকের বোঝা ফেলে দিয়ে দ্রুত যাত্রার সুবিধা করার জন্য নিজেদের লঘু করা আমাদের চলে না। কারণ আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য,—ভগবানের জন্য নিজেদের ও জগৎকে সর্বতোভাবে জয় করা। কেবলমাত্র দূরবর্তী স্বর্গে সুদূর গূঢ় ভগবদ্-সত্তার কাছে শুদ্ধ ও নগ্ন চিৎ-পুরুষকে রিক্ত নৈবেদ্য রূপে অর্পণ করা বা নিশ্চল পরমার্থসৎ-এর কাছে আহুতিতে আমাদের নিঃশেষে বিলোপ করা আমাদের লক্ষ্য নয়। সম্ভূতি ও সত্তা—উভয়ই তাঁকে দান করতে আমরা কৃত-সংকল্প। যে ভগবানের আমরা উপাসনা করি তিনি শুধু বিশ্বের বাহিরে সুদূরে কোন সদ্বস্তু নন, তিনি অর্ধপ্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তিরূপে এখানে, এই বিশ্বে আমাদের কাছেই সমুপস্থিত। যে দিব্য অভিব্যক্তি এখনও অসম্পূর্ণ তারই ক্ষেত্র এই জীবন। দরকার এখানে, এই জীবনে, পৃথিবীতে, এই শরীরে, উপনিষদ যেমন জোর দিয়ে বলে, "ইহৈব"—ভগবানকে প্রকট করা। তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ

মহত্ত্ব, জ্যোতি ও মাধুর্যকে এখানে, আমাদের চেতনায় বাস্তব করতে হবে আর তা অধিগত করে যতদূর সম্ভব বহিঃপ্রকাশ করতে হবে এখানেই। সুতরাং আমাদের যোগে আমরা জীবনকে স্বীকার করি তার পূর্ণ রূপান্তর সাধনের জন্য; এই স্বীকৃতির দরুন আমাদের সংগ্রামে যে নতুন বাধা আসবে সে সব এড়িয়ে চলা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এর বিনিময়ে আমরা এই পারিতোষিক পাব যে যদিও পথ অধিকতর বন্ধুর, প্রচেষ্টা আরো জটিল ও অতীব শ্রমসাধ্য, তথাপি কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আমাদের লাভও হয় প্রচুর। কারণ একবার আমাদের মন কেন্দ্রীয় দর্শনে সঙ্গত ভাবে নিবদ্ধ হলে এবং আমাদেব সংকল্প মোটের উপর একটি মাত্র সাধ্যের সাধনায় পরিবর্তিত হলে জীবন আমাদের সহায় হয়ে দাঁড়ায়। দৃঢ়চিত্ত, সতর্ক ও অখণ্ডভাবে সচেতন হয়ে আমরা জীবনের বিভিন্ন রূপের প্রতি খুঁটিনাটিকে, ইহার গতিবৃত্তির প্রতি ঘটনাকে গ্রহণ করতে সমর্থ হই আমাদের অন্তঃস্থ যজ্ঞাগ্নির সমিধরূপে। সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে আমরা স্বয়ং পৃথিবীকে বাধ্য করতে পারি আমাদের সিদ্ধির পথে সহায় হতে, এবং আমাদের বিরোধী সব শক্তির ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিয়ে সমৃদ্ধ করতে পারি আমাদের উপলব্ধিকে।

* * *

যোগের সাধারণ অনুশীলনে আর একটি দিক আছে যাতে পথটিকে সরল করে নেওয়া হয়, এতে সুবিধা আছে কিন্তু এই পথ সংকীর্ণ আর অখণ্ড লক্ষ্যের সাধকের পক্ষে তা স্বীকার করা চলে না। যোগ অনুশীলনের ফলে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় আমাদের নিজ সত্তার অসাধারণ জটিলতা, আমাদের ব্যাক্তিভাবনার উদ্দীপক অথচ বিব্রতকারী বহুত্ব ও প্রকৃতির বিচিত্র অন্তহীন বিশৃঙ্খলা। সাধারণ মানুষের জীবন তার জাগ্রত উপরভাসা চেতনার মধ্যেই নিবদ্ধ, আবরণের পশ্চাতে আত্মার গভীর ও বিস্তৃত সব স্তর সম্বন্ধে সে অজ্ঞ; এরূপ লোকের মনস্তাত্ত্বিক জীবন বেশ সরল। অল্পসংখ্যক তবে অশান্ত কিছু কামনা, বুদ্ধিগত সৌন্দর্যবোধের কিছু আকাঙ্ক্ষা, ও কিছু রুচি, অসম্বন্ধ বা মন্দসম্বন্ধ ও বহুলপরিমাণে তুচ্ছ মননের মহাস্রোতের মাঝে অল্প কিছু নিয়ামক বা প্রধান ভাবনা, প্রাণের কতকগুলি অল্পবিস্তর অবশ্য পালনীয় দাবী শারীরিক স্বাস্থ্য ও পীড়ার পালাপরিবর্তন, বিক্ষিপ্ত ও নিষ্ফল সুখদুঃখের ক্রমান্বয়, মন বা দেহের পুনঃ পুনঃ কতকগুলি ছোটখাট বিক্ষোভ ও বিপর্যয়ের ঘটনা, আর কদাচ কখন উঁচুধরণের অন্বেষণ ও উৎক্ষেপের আবির্ভাব, আর এই সবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি কিছুটা মনন ও সংকল্পের সাহায্যে, কিছুটা তাদের বিনা সাহায্যেই বা তাদের অগ্রাহ্য করে যে মোটামুটি কাজচলা ব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলায় ভরা মাঝামাঝি এক প্রকার শৃঙ্খলা আনে—তাই তার জীবনের উপাদান। অতীত কালের আদিম মানুষ তার বাহ্য

জীবনে যেমন অসংস্কৃত ও অনুন্নত ছিল, আজকের দিনেও সাধারণ মানুষ তার আন্তর জীবনে তেমন অসংস্কৃত ও অনুন্নত। কিন্তু যখনই আমরা আমাদের অন্তরের গহন পুরে যাই—আর যোগের অর্থ অন্তঃপুরুষের বিচিত্র গভীরতার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া—তখনই আমরা প্রত্যক্-বৃত্ত ভাবে (Subjectively) দেখি, যেমন মানুষ তার বিকাশের সময় পরাক্‌বৃত্ত ভাবে (Objectively) দেখেছিল, যে আমাদের চারিদিকে ঘিরে আছে এক জটিল জগৎ; আর একেই আমাদের জানা ও জয় করা কর্তব্য।

আর সব চেয়ে অস্বস্তিকর আবিষ্কার এই যে আমরা দেখি যে আমাদের প্রতি অংশের—বুদ্ধি, সংকল্প, ইন্দ্রিয়মানস, স্নায়বিক বা কামনাময় আত্মা, হৃদয়, দেহ—সবেরই যেন অন্যদের থেকে পৃথক নিজস্ব জটিল ব্যষ্টিত্ব ও স্বাভাবিক গঠন আছে; নিজের মধ্যেই প্রতিটির বৈষম্য, অপরের সহিতও বৈষম্য, আমাদের বাহ্য অবিদ্যার উপর কোন কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রস্থকারী আত্মার ছায়াস্বরূপ যে প্রতিভূ অহং তারও সহিত প্রত্যেকের বৈষম্য। আমরা দেখি যে আমাদের ব্যক্তিত্ব একটি নয়, অনেকগুলি, আর প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব দাবী ও ভিন্ন প্রকৃতি। আমাদের সত্তা এক স্থূল গঠনের বিশৃঙ্খলা যার মধ্যে দিব্য শৃঙ্খলার তত্ত্ব আনা আমাদের কর্তব্য। অধিকন্তু আমরা দেখি যে বাইরের মত অন্তরেও আমরা একা নই; আমাদের অহং-এর তীক্ষ্ম পৃথকত্ব এক প্রবল আরোপ ও ভ্রান্তি বৈ আর কিছু নয়; আমরা আপনাতে আপনি বাস করি না, বস্তুতঃ আমরা যে আন্তর গোপনীয়তা বা নির্জনতার মধ্যে আলাদা থাকি তা নয়। আমাদের মন গ্রহণ, উন্নত ও পরিবর্তন করার এমন এক যন্ত্র যার মধ্যে নিন্তর ক্ষণে ক্ষণে আসে এক অবিরাম বাহ্য প্রবাহ, বিসদৃশ উপাদানরাশির এক স্রোত, আর তা আসে ঊর্ধ্ব থেকে, নিম্ন থেকে, বাহির থেকে। আমাদের মনন ও বেদনার (feeling) অর্ধেকেরও বেশী যে আমাদের নয় তা এই অর্থে যে তারা আমাদের বাইরেই রূপ গ্রহণ করে; বলতে গেলে প্রায় এমন কিছুই নেই যা আমাদের প্রকৃতির সত্যকার আদি বস্তু। এক বড় অংশ আসে অন্যদের কাছ থেকে বা পরিবেশ থেকে, হয় কাঁচা মাল হিসাবে, নয় তৈরি করা আমদানী জিনিষ হিসাবে; কিন্তু আরো বেশী আসে এখানকার বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বা অন্যান্য জগৎ ও লোক এবং তাদের সত্তা ও শক্তি ও প্রভাব থেকে; কারণ আমাদের ঊর্ধ্বে ও চারিদিকে ঘিরে আছে চেতনার অন্যান্য লোক—মনোলোক, প্রাণ লোক, সূক্ষ্ম জড়লোক; এসব থেকেই আমাদের এখানকার জীবন ও ক্রিয়া খাদ্য পায় ও তাদের খাদ্য যোগায় আর এই সব লোক তাদের রূপ ও শক্তির অভিব্যক্তির জন্য এখানকার জীবন ও ক্রিয়ার উপর চাপ দেয়, প্রভাব বিস্তার করে ও কাজে লাগায়। এই জটিলতার দরুণ ও বিশ্বের অন্তঃপ্রবহমান শক্তিসমূহের নিকট নানাভাবে

উন্মুক্ত ও অধীন হওয়ার দরুন আমাদের একা একা পরিত্রাণ পাওয়া অত্যন্ত বেশী দুরূহ হয়ে পড়ে। এই সব কিছুকে আমাদের হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে ও তাদের নিয়ে কাজ করতে হবে; এবং জানতে হবে আমাদের প্রকৃতির গূঢ় মূল উপাদান কি এবং কি তার উপাদানজনিত ও উৎপন্ন গতি; আর এই-সবের মধ্যে সৃজন করা চাই এক দিব্য কেন্দ্র এবং সত্যকার সৌষম্য ও জ্যোতির্ময় শৃঙ্খলা।

যোগের সাধারণ পন্থাগুলিতে এই সব বৈষম্য-পূর্ণ উপাদান সম্বন্ধে সরল ও সরাসরি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আমাদের অন্তঃস্থ প্রধান মনস্তাত্ত্বিক শক্তির মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নেওয়া হয় ভগবদ্-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় হিসাবে, বাকী সব শক্তিকে হয় শান্ত করে নিঃসাড় করা হয়, নয় অভুক্ত রাখা হয় তাদেব ক্ষুদ্রতার মধ্যে। ভক্ত আশ্রয় নেয় তার সত্তার ভাবাবেগ-প্রধান শক্তিসমূহের ও হৃদয়ের বিভিন্ন তীব্র কর্মের এবং এদের সাহায্যে ভগবদ্-প্রেমে একাগ্রচিত্ত হয়ে বাস করে, সমাহিত হয়ে থাকে যেন অগ্নির একটি মাত্র একমুখী জিহ্বার মাঝে। মননের ক্রিয়া সম্বন্ধে সে উদা-সীন, যুক্তির নির্বন্ধকে সে পিছনে ফেলে, মনের জ্ঞানতৃষ্ণা তার কাছে মূল্য-হীন। যেটুকু জ্ঞান তার প্রয়োজন তা হল তার বিশ্বাস ও ভগবানের সহিত সংযুক্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত চিদাবেশ। যে সব কাজ পরম প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ পূজায় বা দেবমন্দিরের সেবায় লাগে না সে সবের এষণা তার কাছে নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞানী স্বেচ্ছায় নিজেকে আবদ্ধ করে বিচারশীল মনের সব শক্তি ও ক্রিয়ার মধ্যে, মুক্তির সন্ধান পায় মনের আন্তর-বৃত্ত প্রচেষ্টায়। সে আত্মার ভাবনায় একাগ্রচিত্ত হয়ে সূক্ষ্ম আন্তর বিচার শক্তির সাহায্যে প্রকৃতির আবরণকারী নানাবিধ কর্মের মাঝে আত্মার নীরব উপস্থিতি পৃথক করতে সমর্থ হয় এবং প্রত্যয়জ ভাবনার মাধ্যমে উপনীত হয় বাস্তব অধ্যাত্ম অনুভূতিতে। ভাবা-বেগের ঘাতপ্রতিঘাতে সে উদাসীন, বুভুক্ষু মনোবেগের আহ্বানে সে বধির, প্রাণের সব কর্মে সে নিস্পৃহ; যতশীঘ্র এসব তার মধ্য থেকে খসে যায়, এবং সে মুক্ত, শান্ত ও নীরব এবং চিরন্তন অকর্তা হয় ততই তার মঙ্গল। দেহ তার পথের অন্তরায়, প্রাণিক বৃত্তি তার শত্রু; তাদের দাবী সর্বনিম্ন সীমায় কমাতে পারাই তার মহাসৌভাগ্য। পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে যে সব অগণিত বাধা আসে তাদের সে প্রতিহত করে তাদের বিরুদ্ধে বাহ্য ভৌতিক ও আন্তর আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতার দৃঢ় প্রকার তুলে; আন্তর নীরবতার নিরাপদ দেওয়ালের পশ্চাতে সে থাকে নির্বিকার; জগৎ ও অপর কেউ তাকে স্পর্শ করে না। এই সব যোগের প্রবণতা হল নিজে নিজেই একলা থাকা, বা ভগবানের সহিত একলা থাকা, ভগবান ও তাঁর ভক্তের সহিত একান্তে বিচরণ করা, মনের অনন্য আত্ম-মুখী প্রচেষ্টার মধ্যে বা হৃদয়ের ভগবদ্‌মুখী প্রবল ভাবের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা।

একমাত্র নির্বাচিত প্রবর্তক শক্তির পিছনে যে একমাত্র কেন্দ্রীয় বাধা থাকে তা ছাড়া বাকী সব কিছু কেটে বাদ দিয়েই সমস্যার সমাধান করা হয়; আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন বৈষম্যপূর্ণ দাবীর মাঝে আত্যন্তিক একাগ্রতার তত্ত্ব হয় আমাদের পরিত্রাণের পরম সহায়।

কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের পথে এই আন্তর বা বাহ্য নিঃসঙ্গতা তার অধ্যাত্ম অগ্রগতির পথে শুধু হতে পারে সাময়িক ঘটনা বা অবস্থা। জীবনকে স্বীকার করার দরুন তাকে শুধু তার নিজের বোঝা বইতে হয় না, তার সঙ্গে জগতের বোঝারও এক বৃহৎ অংশ বইতে হয়; তার নিজের বোঝাই যথেষ্ট ভারী, এটি তার সাথে অতিরিক্ত কিছু ভার। সুতরাং অন্যান্যদের যোগের চেয়ে তার যোগের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে এক সংগ্রাম বিশেষ, আর এই সংগ্রাম শুধু ব্যক্তিগত সংগ্রাম নয়, ইহা এক বিস্তৃত ক্ষেত্রব্যাপী সমষ্টি সংগ্রাম। তাকে যে শুধু তার নিজের মধ্যে অহমাত্মক মিথ্যা ও বিশৃঙ্খলার সব শক্তিকে জয় করতে হবে তা নয়. এই সবকে তার জয় করতে হবে যেন ইহারা জগতের মধ্যে সেইসব বিরুদ্ধ ও অফুরন্ত শক্তির প্রতিভূ। প্রতিনিধি স্থানীয় হওয়ায় তাদের বাধাদানের সামর্থ্য অনেক বেশী দৃঢ়, পুনঃ পুনঃ আক্রমণের অধিকার একরূপ অসীম। প্রায়শঃই সে দেখে যে অধ্যবসায় সহকারে তার নিজের ব্যক্তিগত যুদ্ধ জেতার পরও, তাকে তা জয় করতে হয় বারবার, এ যুদ্ধের যেন শেষ নেই, কারণ তার আন্তরজীবন ইতিমধ্যে এত প্রসারিত হয়েছে যে তার মধ্যে শুধু যে তার নিজের সত্তা ও ইহার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ও অনুভূতি থাকে তা নয়, অপর সকলের সত্তারও সঙ্গে সে দৃঢ়ভাবে জড়িত কারণ তার নিজের মধ্যেই আছে সমগ্র বিশ্ব।

আবার, অখণ্ড সার্থকতার সাধককে তার নিজের বিভিন্ন আন্তর অঙ্গের বিরোধও যথেচ্ছভাবে সমাধান করতে দেওয়া হয় না। মননশীল জ্ঞানের সহিত সংশয়হীন বিশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধান করা তার চাই; চাই প্রেমের কোমল অন্তঃপুরুষের সহিত শক্তির দুর্ধর্ষ প্রয়োজনের সন্ধি; আর দরকার বিশ্বাতীত শান্তির মধ্যে নিশ্চিন্ত অন্তঃপুরুষের নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে দিব্যসহায়ক ও দিব্যযোদ্ধার সক্রিয়তার সম্মিলন। সকল চিৎ-পুরুষ-সাধকের মত তার কাছেও সমাধানের জন্য দেওয়া হয় যুক্তিবুদ্ধির সব বিরোধিতা, ইন্দ্রিয়সমূহের দৃঢ় আসক্তি, হৃদয়ের বিক্ষোভ, কামনার গোপন আক্রমণ ও দেহের প্রতিবন্ধক; কিন্তু এই সব পরস্পরবিরোধী আন্তরবৃত্তির সঙ্গে ও তার লক্ষ্যের পথে তাদের বাধার সঙ্গে তার মোকাবিলা করা চাই অন্যভাবে, কেননা এইসব বিদ্রোহী বস্তুর সঙ্গে কারবারে অনন্ত গুণ দুরূহ সিদ্ধিলাভ করা তার প্রয়োজন। এসবকে দিব্য উপলব্ধি ও অভিব্যক্তির কারণস্বরূপ স্বীকার করার পর তার কর্তব্য হল তাদের কর্কশ বিরোধের পরিবর্তনসাধন, তাদের ঘন অন্ধকারের উদ্ভাসন,

তদের নিজেদের মধ্যে ও পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য এনে তাদের পৃথক ভাবে ও সর্বসমেত রূপান্তর সাধন; আর একাজ করতে হবে সর্বাঙ্গীণ ভাবে যাতে কোন একটি ক্ষুদ্রকণা, বা সূত্র বা স্পন্দন বাদ না যায়, যেন কোথাও অসম্পূর্ণতার লেশমাত্রও থাকে না। তার জটিল কর্মে সে অবলম্বন করতেপারে একটি বিষয়ে অনন্য একাগ্রতা বা পর পর একটি বিষয়ে ঐরূপ একাগ্রতা, কিন্তু তা শুধু সাময়িক সুবিধার জন্য; কিন্তু ইহার কার্যকারিতা শেষ হওয়া মাত্রই ইহাকে পরিত্যাগ করা চাই। যে দুরূহ কর্মের জন্য তার চেষ্টা করা চাই তা হল এক সর্বগ্রাহী একাগ্রতা।

* * *

যে কোন যোগের প্রথম সর্তই হল একাগ্রতা কিন্তু পূর্ণযোগের বিশিষ্ট প্রকৃতি হল সর্বগ্রাহী একাগ্রতাসাধন। অবশ্য এখানেও একটি মাত্র ভাবনা, বিষয়, অবস্থা, আন্তরগতি বা তত্ত্বের প্রতি মনন বা ভাবাবেগ বা সংকল্পের পৃথক দৃঢ় অভিনিবেশ প্রায়ই আবশ্যক হয়, কিন্তু সে অভিনিবেশ এক গৌণ সহায় মাত্র। এই যোগের বৃহত্তর ক্রিয়া হল, যিনি পরম এক অথচ সর্ব তাঁর দিকে বিস্তৃতভাবে সবকিছুর উন্মুক্ততা, সমগ্র সত্তার সকল অংশে, সকল শক্তির মধ্যদিয়ে তাঁতেই সুসমঞ্জস একাগ্রতা। ইহা ছাড়া এই যোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। কারণ যে চেতনালাভ আমাদের আস্পৃহা তা পরম একে স্থিত হয়ে পরম সর্বে সক্রিয়; এই চেতনাকেই আমাদের সত্তার প্রতি উপাদানে, আমাদের প্রকৃতির প্রতি গতিতে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের ব্রত। এই বিস্তৃত ও একাগ্র সমগ্রতাই সাধনার মূল স্বভাব আর এই স্বভাবের দ্বারাই এর অনুশীলন নির্ধারিত হবে।

কিন্তু যদিও এ যোগের স্বরূপ ভগবানেই আমাদের সমগ্র সত্তার একাগ্রতা-সাধন, তা হলেও আমাদের সত্তা এত জটিল যে, যেমন গোটা পৃথিবীকে দুই হাতে নেওয়া অসম্ভব, যেমন ইহাকেও এক সঙ্গে সহজে নিয়ে ইহার সমস্ত কিছুকে পুরোপুরি একটি কাজে লাগান অসম্ভব। স্বোত্তরণের সাধনায় মানবকে সাধারণতঃ জটিল যন্ত্র স্বরূপ তার প্রকৃতির কোনো স্প্রিং (spring) বা শক্তিশালী উত্তোলন দণ্ডের (leverage) আশ্রয় নিতে হয়। অন্য অনেকগুলির মধ্য থেকে সে যে স্প্রিং বা উত্তোলন দণ্ড বেছে নেয় তাকেই সে তার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কাজে লাগায় যন্ত্রটিকে চালাবার জন্য। এই নির্বাচনে প্রকৃতিই সর্বদা তার দিশারী হওয়া উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে তা হবে তার অন্তঃস্থ উচ্চতম ও প্রশস্ততম প্রকৃতি, ইহা প্রকৃতির নিম্নতম পর্যায় বা সীমিত কোন ক্রিয়াতে আবদ্ধ প্রকৃতি নয়। অবর প্রাণিক কর্মে প্রকৃতি যে সব চেয়ে শক্তিশালী উত্তোলন দণ্ড ব্যবহার করে তা হল কামনা; কিন্তু মানুষের বিশিষ্ট স্বভাব এই যে সে মনোময় পুরুষ, শুধু প্রাণময় জীব নয়।

তার প্রাণের বিভিন্ন সংবেগকে সংযত ও সংশোধন করার জন্য যেমন সে তার চিন্তক মন ও সংকল্প প্রযোগ করতে পারে, তেমনই সে নিজের মধ্যে আনতে পারে আরো জ্যোতির্ময় মানসিক ক্রিয়া ও তার সাথে তার অন্তরতর অন্তঃপুরুষের; চৈত্যপুরুষের সহায় এবং এই সব মহত্তর ও শুদ্ধতর প্রবর্তক-শক্তির দ্বারা সে দূর করতে সমর্থ হয় কামনা নামে অভিহিত প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়বোধজশক্তির প্রবল প্রভাব। মানুষ কামনাকে সম্পূর্ণ জয় ক'রে বা তাকে রাজী করিয়ে রূপান্তরের জন্য ইহাকে নিবেদন করতে পারে ইহার দিব্য প্রভুর নিকট। ভগবান যে দুটি আকর্ষক যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের প্রকৃতিকে করায়ত্ত করতে পারেন তা হল মানুষের এই উত্তর মানসিকতা ও তার অন্তরতর অন্তঃপুরুষ অর্থাৎ তার চৈত্যসত্তা।

মানুষের উত্তর মানস এমন কিছু যা তার যুক্তি বুদ্ধি অর্থাৎ তর্ক বুদ্ধি নয়, ইহা অপেক্ষা আরো উন্নত, শুদ্ধ, বিশাল ও শক্তিশালী। পশু এক প্রাণময় ও ইন্দ্রিয়গত সত্তা। বলা হয় যে পশু থেকে মানুষের পার্থক্য এই যে মানুষের যুক্তিবুদ্ধি আছে। কিন্তু ইহাতো বিষয়কে খুব ছোট ক'রে বলা আর তাও অতি অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত বলা। কারণ যুক্তিবুদ্ধি এক বিশেষ ও সীমাবদ্ধ কার্যসাধক যান্ত্রিক কর্মশক্তি মাত্র যার উৎস তার চেয়ে অনেক মহত্তর কিছু, এমন এক শক্তি যার বাস আরো জ্যোতির্ময়, বিশাল ও অসীম ব্যোমে। আমাদের যে বুদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে, যুক্তিতর্ক, অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত করে তার অব্যবহিত বা মধ্যবর্তী গুরুত্ব অপেক্ষা যথার্থ ও চরম গুরুত্ব এই যে ইহা মানুষকে প্রস্তুত করে ঊর্ধ্ব থেকে আসা জ্যোতির যথাযথ গ্রহণ ও যথাযথ ক্রিয়ার জন্য; নিম্ন থেকে আসা যে অস্পষ্ট আলো পশুকে চালনা করে তার স্থান উত্তরোত্তর অধিকার করে এই ঊর্ধ্বের জ্যোতি। পশুরও প্রাথমিক যুক্তিযুক্তি, এক প্রকার মনন, অন্তঃপুরুষ, সংকল্প ও তীক্ষ্ণ ভাবাবেগ থাকে, মানুষের মতোই তার মনস্তত্ত্ব, যদিও তা কম পরিণত। কিন্তু পশুর এই সব শক্তির কাজ চলে আপনাআপনি, তারা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ, এমন কি প্রায় সব কিছুই নিম্ন স্নায়বিক সত্তা দ্বারা গঠিত। পশুর সকল প্রত্যয়, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, কাজকর্ম চালিত হয় স্নায়বিক ও প্রাণিক সব সংস্কার, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন ও তৃপ্তির দ্বারা, যেগুলি প্রাণের সংবেগ ও কামনার দ্বারা যুক্ত থাকে। প্রাণিক প্রকৃতির এই স্বয়ংক্রিয়ার মধ্যে মানুষও বদ্ধ তবে পশুর চেয়ে কম। মানুষ তার আত্ম-বিকাশের দুরূহ কাজে প্রয়োগ করতে পারে প্রদীপ্ত সংকল্প, প্রদীপ্ত মনন ও প্রদীপ্ত ভাবাবেগ; কামনার অবর ব্যাপারকে সে উত্তরোত্তর এই সব অধিকতর সচেতন ও বিচারশীল দিশারীর অধীনে আনতে সমর্থ হয়। যে পরিমাণে সে এই ভাবে তার অবর আত্মাকে বশীভূত ও প্রদীপ্ত করতে সমর্থ হয়, সেই পরিমাণে সে মানুষ, আর পশু নয়। যখন

সে কামনাকে সরিয়ে তার স্থলে আনতে শুরু করে মহত্তর মনন ও দৃষ্টি ও সংকল্প যা অনন্তের সহিত যুক্ত, সচেতনভাবে নিজের সংকল্প অপেক্ষা দিব্য-তর সংকল্পের অধীন ও আরো বিশ্বজনীন ও বিশ্বাতীত জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট তখন অতিমানবের পানে তার উদয়ন আরম্ভ হ'য়েছে, ভগবানের দিকে উত্তরায়ণের যাত্রী সে।

সুতরাং প্রথম দরকার হল আমাদের চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করা মনন ও জ্যোতি ও সংকল্পের উত্তম মনে বা গভীরতম বেদনা ও ভাবাবেগের অন্তর্হৃদয়ে —যে কোন একটিতে বা সমর্থ হলে উভয়েই একত্রে—এবং তা ব্যবহার করা আমাদের উত্তোলন দন্ড হিসাবে ভগবানের দিকে আমাদের প্রকৃতিকে পুরাপুরি তোলার উদ্দেশ্যে। আমাদের জ্ঞানের এক বিরাট লক্ষ্যের পানে, আমাদের ক্রিয়ার এক জ্যোতির্ময় অনন্ত উৎসের অভিমুখে, আমাদের ভাবাবেগের এক অবিনশ্বর বিষয়ের দিকে প্রদীপ্ত মনন, সংকল্প ও হৃদয়ের মিলিত একাগ্রতা নিবদ্ধ হওয়াই এই যোগের যাত্রারম্ভ। আর আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয় হল যে পরম জ্যোতি আমাদের অন্তরে বৃদ্ধি পাচ্ছে তারই উৎস, যে পরমাশক্তি আমরা আবাহন করি আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের চালনার জন্য তারই মূল, অন্য কিছু নয়। আমদের এক মাত্র উদ্দেশ্য হল স্বয়ং ভগবান, যাঁর প্রতি জ্ঞাতসারেই হ'ক বা অজ্ঞাতসারেই হ'ক, আমাদের গূঢ় প্রকৃতির মধ্যস্থিত কোন কিছুর আস্পৃহা নিরন্তর বর্তমান। অদ্বিতীয় ভগবানের ভাবনা, অনুভব, দর্শন, উদ্বোধক স্পর্শ, অন্তঃপুরুষের উপলব্ধি—এসবের মননের উপর বৃহৎ, বহু-মুখী অথচ অনন্য একাগ্রতা আবশ্যক। আবশ্যক পরম সর্ব ও সনাতনের প্রতি হৃদয়ে জ্বলন্ত একাগ্রতা, আর একবার তাঁর দেখা পেলে, পরম সর্ব-সুন্দরের আবেশ ও উল্লাসের মধ্যে গভীর অবগাহন ও নিমজ্জন। আর আবশ্যক ভগবান যা কিছু সব তা পাওয়ার ও সার্থক করার জন্য সংকল্পের প্রবল ও অবিচলিত একাগ্রতা এবং আমাদের মধ্যে যা ব্যক্ত করা তাঁর অভিপ্রায় সে সবের দিকে হৃদয়ের স্বচ্ছন্দ ও নমনীয় উন্মীলন। ইহাই এই যোগের ত্রিমার্গ।

* * *

কিন্তু যা আমরা এখনও জানি না তাতে আমরা একাগ্র হব কিভাবে? আবার ভগবানের উপর আমাদের সত্তার একাগ্রতা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে জানাও সম্ভব নয়। যোগে জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধনা বলতে আমরা বুঝি এমন একাগ্রতা যার পরিণতি হল আমাদের মধ্যে ও আমরা যা কিছু জানি সে সবের মধ্যে পরম একের উপস্থিতির জীবন্ত উপলব্ধি ও নিত্য বোধ। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের সাহায্যে বা দার্শনিক যুক্তিবিচারের প্রভাবে ভগবানের বুদ্ধিগত ধারণা পাবার জন্য আত্ম-নিয়োগ করাই যথেষ্ট নয়; কেননা

আমাদের দীর্ঘ মানসিক পরিশ্রমের পর সনাতন সম্বন্ধে যা সব বলা হয়েছে সে সব জানতে পারি, অনন্ত সম্বন্ধে যা চিন্তা করা যায় তা পেতে পারি, কিন্তু তবু তাঁকে আদৌ না জানতে পারি। বস্তুতঃ শক্তিশালী যোগে এই বুদ্ধিগত প্রস্তুতি প্রথম পর্যায় হতে পারে, কিন্তু ইহা অপরিহার্য নয়; সকলের পক্ষেই যে এ-ধাপের প্রয়োজন আছে তা নয়, বা সকলকেই ইহা নিতে বলা যায় না। কল্পনাশ্রয়ী বা প্রণিধানপর যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানে যে বুদ্ধিগত মুর্তি পাওয়া যায় তা-ই যদি যোগের অপরিহার্য সর্ত বা অবশ্যকরণীয় প্রাথমিক বিধান হয় তাহালে খুবই কম লোক ছাড়া, মানুষের পক্ষে যোগ-সাধন অসম্ভব হ'ত। ঊর্ধ্ব থেকে জ্যোতি তার কাজ আরম্ভ করার জন্য আমাদের কাছ থেকে যা চায় ত হল অন্তঃপুরুষের আহ্বান ও মনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তার সমর্থন। এই সমর্থন পাবার উপায় মননে ভগবানের আগ্রহ ভাবনা, স্ফুরন্ত সব অংশে অনুরূপ সংকল্প, হৃদয়ে আস্পৃহা, বিশ্বাস ও প্রয়োজনবোধ। যদি এই সব মিলিতভাবে বা সমছন্দে না আসে তাহলেও যে কোন একটি পুরোবর্তী বা প্রধান হতে পারে। ভাবনা অপ্রচুর হতে পারে, আর প্রারম্ভে তা হবেই; আস্পৃহা হতে পারে সংকীর্ণ ও অপূর্ণ, বিশ্বাস মন্দদীপ্ত বা এমন কি জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তা হতে পারে চঞ্চল ও অনিশ্চিত, সহজেই তা হ্রাস পায়, প্রায়শঃ তা নিভেও যেতে পারে এবং ঝটিকাসংকুল গিরিপথের মাঝে মশালের মত তাকে কষ্ট করে আবার জ্বালাতে হয়। কিন্তু একবার যদি অন্তরের গহন থেকে দৃঢ় আত্মোৎসর্গ করা হয়, যদি অন্তঃপুরুষের আহ্বানে জাগরণ হয়ে থাকে তাহলে এই সব অপ্রচুর বিষয়ও দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য উপযোগী যন্ত্র হতে পারে। সেজন্য ভগবানের দিকে যাবার বিভিন্ন পথের সংকোচ করতে জ্ঞানীরা সর্বদাই অনিচ্ছুক। সংকীর্ণতম দ্বার বা সব চেয়ে নীচু ও অন্ধ-কারময় পিছনের দরজা বা ক্ষুদ্রতম ফটক দিয়াও প্রবেশ তাঁরা বন্ধ করে দিতে চান না। যে কোন নাম, যে কোন রূপ, যে কোন প্রতীক, যে কোন অর্ঘ্যকে যথেষ্ট গণ্য করা হয় যদি তার সাথে থাকে উৎসর্গ; কারণ ব্রতীর হৃদয়ে ভগবান নিজেকে জানতে পারেন, এবং যজ্ঞ গ্রহণ করেন।

কিন্তু তবু উৎসর্গের পশ্চাতে চালিকা ভাবনা-শক্তি যতই মহত্তর ও প্রশস্ততর হবে, ততই সাধকের পক্ষে মঙ্গল, ততই তার প্রাপ্তি আরো পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হবার সম্ভাবনা। যদি পূর্ণযোগের সাধনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য হয় তা হলে ভগবানের যে ভাবনা অখণ্ড ও পূর্ণতা তা নিয়েই আরম্ভ করা ভাল। হৃদয়ের আস্পৃহা হওয়া চাই যথেষ্ট ব্যাপ্ত যাতে সর্বপ্রকার সীমা-বর্জিত উপলব্ধি সম্ভব। শুধু যে আমাদের সম্প্রদায়গত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করা উচিত তা নয়, যে সকল একদেশী দার্শনিক ভাবনায় অনির্ব-

চনীয়কে সংকীর্ণ মানসিক সূত্রের মধ্যে আবদ্ধ করার চেষ্টা হয় সে সবও আমাদের ত্যাগ করা কর্তব্য। যে স্ফুরন্ত ভাবনা বা প্রেরণাদায়ক বোধ নিয়ে আমাদের যোগ সর্বোত্তম ভাবে আরম্ভ করা যেতে পারে তা স্বভাবতঃই হবে এক চিন্ময় সর্বগ্রাহী কিন্তু সর্বাতিগ অনন্তের ভাবনা ও বোধ। আমাদের ঊর্ধ্বদৃষ্টি নিবদ্ধ করা চাই মুক্ত, সর্বশক্তিমান, পরিপূর্ণ ও আনন্দময় পরম এক ও একত্বে যাঁর মধ্যে সকল সত্তারই বাস ও বিচরণ এবং যাঁর মধ্য দিয়ে সকলেই মিলিত হয়ে এক হতে সমর্থ। এই সনাতন সত্তার আত্ম-প্রকাশে ও অন্তঃপুরুষের উপর তাঁর স্পর্শে তিনি হবেন যুগপৎ পুরুষবিধ ও নৈর্ব্যক্তিক। তিনি পুরুষবিধ কেননা তিনি সেই চিন্ময় ভগবান অনন্ত পরম পুরুষ যাঁর নিজের ভগ্ন প্রতিফলন নিক্ষিপ্ত হয় বিশ্বের অসংখ্য দিব্য ও অদিব্য ব্যক্তি-সত্ত্বের মধ্যে। তিনি নৈর্ব্যক্তিক, কেন না তিনি আমাদের কাছে প্রতীয়মান হন অনন্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপে এবং আরো এই কারণে যে তিনি সকল অস্তিত্ব ও শক্তির উৎস, ভিত্তি ও উপাদান, আমাদের সত্তা ও মন প্রাণ ও দেহের উপাদান তিনিই এবং তিনি আমাদের চিৎ-পুরুষ ও জড়তত্ত্ব। মনন তাঁতে একাগ্র হয়ে শুধু যে বুদ্ধিগত ভাবে এই মাত্র বুঝবে যে তিনি আছেন বা শুধু ভাববে তিনি এক আচ্ছিন্ন প্রত্যয় বা ন্যায়ানুগ অবশ্যকতা তা নয়; দৃষ্টি-সম্পন্ন মনন হয়ে তার দেখা চাই তাঁকে এখানে সকলের মধ্যে অধিষ্ঠাতা রূপে, আমাদের মধ্যে তাঁকে উপলব্ধি করা চাই এবং পর্যবেক্ষণ ও করায়ত্ত করা চাই তাঁর সব শক্তির গতিবৃত্তিকে। তিনিই এক পরম অস্তিত্ব : তিনি সেই আদি ও সার্বিক আনন্দ যা সকল কিছুর উপাদান ও সে সবের অতিরিক্ত; তিনিই এক অনন্ত পরম চেতনা যা দিয়ে সকল চেতনা গঠিত এবং যা তাদের সব গতিবৃত্তির মধ্যে অনুস্যূত; তিনিই এক অসীম পুরুষ যিনি সকল ক্রিয়া ও অনুভূতির পরিপোষক; বিষয়সমূহের যে লক্ষ্য ও পূর্ণতা এখনও অনুপলব্ধ কিন্তু অবশ্যম্ভাবী সেই দিকে তাদের ক্রম-পরিণাম চালনা করে তাঁরই সংকল্প। তাঁর কাছেই হৃদয় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে, যেতে পারে পরম প্রেমাস্পদ বলে, এবং স্পন্দন ও বিচরণ করতে পারে তাঁরই মধ্যে যেন বিশ্ব প্রেমের সর্বব্যাপী মাধুর্য ও পরমানন্দের জীবন্ত সাগরের মাঝে। কারণ সকল অনুভূতির মধ্য অন্তঃপুরুষের অবলম্বন হল তাঁরই নিগূঢ় আনন্দ এবং এমন কি ভ্রান্ত অহংকেও ইহা রক্ষা করে তার পরীক্ষা ও সংগ্রামের মধ্যে যতদিন না সকল দুঃখ কষ্টের অবসান হয়। যে অনন্ত দিব্য প্রেমিক সকল কিছুকে তাদের নিজ নিজ পথ দিয়ে তাঁর সুখময় একত্বের দিকে আকর্ষণ করছেন তাঁর পরম প্রেম ও আনন্দ তাঁরই। তাঁহাতেই সংকল্প অবিচলিত ভাবে নিবদ্ধ হতে পারে যেন তিনিই সেই অদৃশ্য শক্তি যা তাকে চালনা ও সার্থক

করে ও তার ক্ষমতার উৎস। নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে এই কার্যকরী শক্তি এমন এক আত্ম-দীপ্ত শক্তি যার মধ্যে সকল ফল নিহিত এবং যা শান্তভাবে কাজ করে যায় যতদিন না সিদ্ধিলাভ হয়; এবং ব্যক্তিসত্ত্বের মধ্যে ইহাই সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম যোগেশ্বর যিনি ব্যক্তিসত্ত্বকে তার লক্ষ্যে নিশ্চিত নিয়ে যাবেন, কোন কিছুই তাঁকে নিবারণ করতে পারে না। এই বিশ্বাস নিয়েই সাধককে তার অন্বেষণ ও সাধনা শুরু করতে হয়, কারণ এখানে তার সকল প্রযত্নেই এবং বিশেষতঃ অলখের পানে তার সাধনায়, মনোময় মানুষকে অগ্রসর হতে হবে বিশ্বাসের জোরেই। উপলব্ধি আসার পর এই বিশ্বাস দিব্যভাবে সার্থক ও পূর্ণ হয়ে রূপান্তরিত হয় জ্ঞানের শাশ্বত শিখায়।

* * *

আমাদের ঊর্ধ্বমুখী সকল প্রচেষ্টার মধ্যে স্বভাবতঃই প্রথমে প্রবেশ করবে কামনার অবর উপাদান। কারণ প্রদীপ্ত সংকল্প যাকে দেখে সাধ্য বলে এবং জয়যোগ্য মুকুট বলে যা পাবার জন্য ছোটে, হৃদয় যাকে আলিঙ্গন করে একমাত্র আনন্দময় বিষয় বলে, তাকেই চায় আমাদের মধ্যে যা নিজেকে সীমিত ও বিরুদ্ধ বলে অনুভব করে তার অহমাত্মক কামনার ক্ষুব্ধ প্রবল আবেগে, কারণ ইহা সীমিত হওয়ার দরুন আকাঙ্খা ও সংগ্রাম করাই তার স্বভাব। আমাদের অন্তঃস্থ বাসনাময় এই প্রাণশক্তিকে বা কাম-পুরুষকে প্রথমে স্বীকার করতে হয়, তবে তা শুধু তার রূপান্তর সাধনের জন্য। এমন কি গোড়া থেকেই তাকে শেখাতে হবে যে অন্য সকল কামনা তার ত্যাগ করা চাই ও তাকে একাগ্র হতে হবে ভগবানের প্রতি তীব্র অনুরাগের উপর। এই মুখ্য কাজ নিষ্পন্ন হলে একে শেখাতে হবে কামনা করতে, তবে নিজের জন্য পৃথকভাবে নয়,—জগতের মধ্যকার ভগবানের জন্য ও আমাদের মধ্যকার ভগবানের জন্য। আমাদের সম্ভাব্য সকল রকম আধ্যাত্মিক লাভ নিশ্চিত হলেও, কামপুরুষ যেন নিজের জন্য কোন আধ্যাত্মিক লাভে মন না দেয়, তাকে মন দিতে হবে আমাদের ও অপরের মধ্যে মহান করণীয় ব্রতের উপর, সেই আগামী উচ্চ অভিব্যক্তির উপর যা হবে জগতের মধ্যে ভগবানের গৌরবময় সার্থকতা, সেই পরম সত্যের উপর যা পেতে হবে, জীবনে রূপায়িত করতে হবে ও চির-দিনের জন্য অধিষ্ঠিত করতে হবে রাজাসনে। কিন্তু পরিশেষে তার যে শিক্ষা দরকার তা তার পক্ষে অতীব দুষ্কর, যথার্থ উদ্দেশ্য নিয়ে অন্বেষণ করাও অপেক্ষা দুষ্কর; এ শিক্ষা এই যে তার কামনা তার নিজের অহমাত্মকভাবে হবে না, তা হবে ভগবদ্-ভাবে। প্রবল বিভক্ত সংকল্প যেমন সর্বদাই জেদ করে, কামপুরুষের আর তেমন জেদ করা চলবে না; সার্থকতা প্রাপ্তি সম্বন্ধে তার নিজের ধারা, লাভ সম্বন্ধে তার নিজের স্বপ্ন, শ্রেয় ও প্রেয় সম্বন্ধ তার নিজের ভাবনা—এসব ত্যাগ করা চাই। তার আস্পৃহা হওয়া চাই এক বৃহত্তর

ও মহত্তর সংকল্পের সার্থকতার জন্য, এবং তার রাজী হওয়া চাই আরো কম স্বার্থপর ও কম অজ্ঞানময় দেশনার অধীন হতে। এই ভাবে শিক্ষা পেলে যে কামনা মানুষের অত্যন্ত অশান্ত, পীড়াদায়ক ও কষ্টকর উপাদান ও সকল প্রকার পদস্খলনের মূল তা যোগ্য হয়ে উঠবে তার দিব্য প্রতিরূপে রূপান্তরের জন্য। কারণ কামনা ও তীব্র আবেগেরও দিব্য রূপ আছে; সকল আকাঙ্ক্ষা ও শোকের ঊর্ধ্বে আছে অন্তঃপুরুষের চাওয়ার শুদ্ধ উল্লাস, আছে আনন্দের এমন সংকল্প যা পরম নিঃশ্রেয়সের অধিকারী ও মহিমোজ্জ্বল হয়ে সমাসীন।

একবার একাগ্রতার উদ্দিষ্ট বিষয় আমাদের তিনটি প্রধান করণকে অর্থাৎ মনন, হৃদয় ও সংকল্পকে অধিগত করলে ও এই তিনের দ্বারা অধিগত হলে—অবশ্য আমাদের কামপুরুষ দিব্যবিধানের কাছে সমর্পণ করার পরই এই পূর্ণতাসাধন পুরোপুরি সম্ভব—আমাদের রূপান্তরিত প্রকৃতিতে মন ও প্রাণ ও দেহের সিদ্ধি সফল ও সার্থক হতে পারে। অহংএর ব্যক্তিগত তৃপ্তির জন্য এ কাজ করা হবে না, এ-করা হবে যাতে সমগ্র সত্তা হতে পারে দিব্য উপস্থিতির উপযোগী মন্দির, দিব্য কর্মের জন্য নিখুঁৎ যন্ত্র। এই কাজ যথার্থভাবে সম্পন্ন হতে পারে তখনই যখন যন্ত্র উৎসর্গীকৃত ও সিদ্ধ হয়ে নিঃস্বার্থ ক্রিয়ার জন্য উপযোগী হয়ে উঠেছে--এবং তা হবে যখন ব্যক্তিগত কামনা ও অহমিকা লোপ পায়, তবে মুক্ত জীব নয়। ক্ষুদ্র অহং লোপ পাবার পরও সত্যকার অধ্যাত্ম ব্যক্তি তখনও থাকতে পারে; আর থাকতে পারে তার মধ্যে ভগবানের সংকল্প ও কর্ম ও আনন্দ এবং তার সিদ্ধি ও সার্থকতার অধ্যাত্ম ব্যবহার। তখন আমাদের সব কাজ হবে দিব্য এবং সে সব করা হবে দিব্যভাবে, ভগবানে নিয়োজিত আমাদের মন ও প্রাণ ও সংকল্প ব্যবহৃত হবে আমাদের মধ্যে প্রথম আমরা যা উপলব্ধি করেছি তা অপরের মধ্যে ও জগতের মধ্যে সার্থক করে তোলার চেষ্টায় অর্থাৎ চিৎ-পুরুষের পার্থিব অভিযানের লক্ষ্য যে মূর্ত ঐক্য, প্রেম, মুক্তি, ক্ষমতা, শক্তি, জ্যোতি, অমর আনন্দ, তাদের যে সব অভিব্যক্তি আমাদের দ্বারা সম্ভব তা-ই অপরের ও জগতের মধ্যে সার্থক করে তোলার চেষ্টায়।

যোগসাধনার শুরুতে এই সমগ্র একাগ্রতা পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা বা অন্ততঃ দৃঢ় সংকল্প অত্যাবশ্যক। পরতমের কাছে আমাদের সকল কিছু উৎসর্গের জন্য দৃঢ় ও অবিচলিত সংকল্প, সনাতন ও সর্বময়ের নিকট আমাদের সমগ্র সত্তা ও বহুকক্ষবিশিষ্ট প্রকৃতির অর্ঘ্যদান—ইহাই আমাদের কাছে যোগের দাবী। অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় যে একটি বিষয় তাতে আমাদের ঐকান্তিক একাগ্রতার ফলপ্রসূ পূর্ণতা দিয়েই মাপ করা হবে একমাত্র কাম্য পরম একের নিকট আমাদের আত্মোৎসর্গ। অবশ্য এইভাবে

বাদ দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে না, বাদ পড়ে শুধু জগৎ সম্বন্ধে আমাদের মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি ও আমাদের সংকল্পের অজ্ঞানতা। কেননা সনাতনের উপর আমাদের যে একাগ্রতা মনের দ্বারা তার পূর্ণতা সাধন হবে যখন আমরা নিরন্তর ভগবানকে দেখব স্বরূপে, নিজেদের মধ্যে এবং এ ছাড়াও ভগবানকে দেখব সকলবিষয়ে ও সত্তায় ও ঘটনায়। হৃদয়ের দ্বারা তার পূর্ণতা সাধন হবে যখন সকল ভাবাবেগ একীভূত হয় ভগবদ্-প্রেমে— এই প্রেম ভগবানের স্বরূপে, ও ভগবানেরই জন্য—এবং তাছাড়া বিশ্বের মধ্যে সকল সত্তা ও শক্তি ও ব্যক্তিসত্ত্ব ও রূপের মধ্যে যে ভগবান তাঁরও প্রতি প্রেমে। সংকল্পের দ্বারা একাগ্রতার পূর্ণতাসাধন হবে যখন আমরা দিব্য প্রবর্তনা অনুভব ও লাভ করি এবং শুধু তাকেই স্বীকার করি আমাদের একমাত্র প্রবর্তক শক্তি বলে, কিন্তু এর অর্থ এই যে অহমাত্মক প্রকৃতির সব বিক্ষিপ্ত ও বিদ্রোহী সংযোগের শেষটি পর্যন্ত ধ্বংস করে আমরা নিজেদের বিশ্বভাবাপন্ন করে তুলেছি এবং সর্ব বিষয়ে একমাত্র দিব্য কর্ম প্রণালীকে অবিচল আনন্দের সহিত স্বীকার করতে আমরা সমর্থ। ইহাই পূর্ণযোগের প্রথম মৌলিক সিদ্ধি।

ভগবানের কাছে জীবের পরম নিঃশেষ উৎসর্গের কথা যখন আমরা বলি তখন শেষ অবধি তার অর্থ ইহার চেয়ে কম কিছু নয়। কিন্তু নিরন্তর অগ্রসরতার উৎসর্গের এই পরম পূর্ণতা তখনই সম্ভব যখন জীবন থেকে কামনা রূপান্তরের দীর্ঘ ও দুরূহ সাধনধারা সম্পন্ন হয় অকুণ্ঠ মাত্রায়। পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গের অর্থ পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ।

* * *

কেন না এই অবস্থায় যোগের দুটি গতি, দুটি পর্ব, আর তাদের মাঝে আছে একটি থেকে অন্যটিতে যাবার এক পর্যায়—একটি আত্ম-সমর্পণের প্রণালী, অন্যটি তার চরম উৎকর্ষ ও পরিণতি। প্রথমটিতে জীব নিজেকে তৈরী করে ভগবানকে নেবার জন্য তার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে। এই প্রথম পর্ব ধরে বরাবরই তাকে কাজ করতে হয় অপরা প্রকৃতির সব যন্ত্র দিয়ে তবে ঊর্ধ্ব থেকে সে উত্তরোত্তর সহায় পায়। কিন্তু এই গতির শেষ পর্যায়ে অন্যটিতে যাবার পথে আমাদের ব্যক্তিগত প্রযত্ন যা ব্যক্তিগত হওয়ায় অনিবার্য-রূপে অজ্ঞানময়—ক্রমশঃ কমে আসে এবং এক পরতরা প্রকৃতি সক্রিয় হয়; সনাতনী শক্তি নেমে আসেন এই সীমিত মর্ত্য আধারে এবং তাকে উত্তরোত্তর অধিগত ও রূপান্তরিত করেন। দ্বিতীয় পর্বে পূর্বেকার প্রাথমিক ক্ষুদ্রতর ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ সরিয়ে তার স্থান নেয় মহত্তর গতি; কিন্তু আমাদের আত্ম-সমর্পণ সম্পূর্ণ হলেই তা করা সম্ভব। আমাদের মধ্যকার অহং-ব্যক্তি তার নিজের শক্তিতে বা সংকল্পে বা জ্ঞানে বা নিজের কোন গুণের সাহায্যে নিজেকে

ভগবানের প্রকৃতিতে রূপান্তর করতে অক্ষম, তার যা করবার ক্ষমতা তা এই যে সে রূপান্তরের জন্য নিজেকে যোগ্য করতে পারে, আর পারে সে যা হয়ে উঠতে চায় তার কাছে উত্তরোত্তর নিজেকে সমর্পণ করতে। যতদিন অহং আমাদের মধ্যে ক্রিয়ারত থাকে, ততদিন আমাদের ব্যক্তিগত ক্রিয়া স্বভাবতঃই সত্তার অবর পর্যায়ের অংশ ও সর্বদা তা হতে বাধ্য; এই ক্রিয়া তমসাচ্ছন্ন বা অর্ধদীপ্ত, তার ক্ষেত্র সীমিত ও ফলপ্রসূ শক্তি অতীব আংশিক। যদি অধ্যাত্ম রূপান্তর আদৌ করতে হয়, শুধু আমাদের প্রকৃতির আলো-করা পরিবর্তন নয়, তাহলে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল দিব্যশক্তিকে অন্তরে আহ্বান করা জীবের মধ্যে সেই অলৌকিক কর্ম সাধনের জন্য, কারণ একমাত্র তাঁরই আছে প্রয়োজনীয় শক্তি যা অমোঘ, সর্বজ্ঞ ও অপারিসীম। কিন্তু মানুষী ব্যক্তিগত ক্রিয়ার বদলে অবিলম্বে দিব্য ক্রিয়ার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পুরোপুরি সম্ভব নয়। নিম্ন থেকে আসা যে সব বাধা পরতর ক্রিয়ার সত্যকে মিথ্যা করতে চায়, প্রথম তাদের নিরুদ্ধ বা হীনবীর্য করা আবশ্যক; আর তা করা চাই আমাদের নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছায়। আমাদের কর্তব্য হল অপরাপ্রকৃতির সকল সংবেগ ও অসত্যকে অবিরত ও পুনঃপুনঃ অস্বীকার করা এবং আমাদের বিভিন্ন অঙ্গে প্রচীয়মান সত্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা; কেন না যে জ্যোতি, শুদ্ধতা ও শক্তি ভিতরে আসছে ও অনুস্যূত হচ্ছে তাকে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ও তার চূড়ান্ত সিদ্ধি আনতে হলে তার বিকাশ ও পরিপোষণের জন্য দরকার তাকে আমাদের স্বচ্ছন্দে স্বীকার করা ও তার বিরুদ্ধ, অবর বা অসঙ্গত যা সব সে সবকে দৃঢ়ভাবে বর্জন করা।

আত্ম-প্রস্তুতির প্রথমগতিতে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পর্বে আমাদের যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তা এই যে বাঞ্ছিত ভগবানের উপর সমগ্র সত্তার এইরূপ একাগ্রতা এবং তার অনুসিদ্ধান্তরূপ যা সব ভগবানের খাঁটি সত্য নয় সে সবের নিরন্তর বর্জন ও বহির্নিক্ষেপ। এই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফল হবে আমরা যা আছি, চিন্তা করি, অনুভব করি ও যে কর্ম করি সে সবের সম্পূর্ণ উৎসর্গ। আবার এই উৎসর্গের ধ্রুব পরিণতি হল সর্বোচ্চের নিকট অখণ্ড আত্মদান; কারণ, সমগ্র প্রকৃতির সর্বগ্রাহী একান্ত সমর্পণই উৎসর্গের সম্পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা ও নিদর্শন। যোগের দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষী ও দিব্য কর্ম প্রণালীর মধ্যবর্তী অবস্থায়, ঊর্ধ্ব থেকে আসবে ক্রম-বর্ধমান শুদ্ধীকৃত ও সতর্ক নিষ্ক্রিয়তা উত্তরোত্তর জ্যোতির্ময় দিব্য সাড়া ভাগবতী শক্তির দিকে—তবে অন্য কারোর দিকে নয়; এর ফলে ঊর্ধ্ব থেকে ভিতরে নেমে আসে এক মহান, ও সচেতন অলৌকিক কর্মের বর্ধিষ্ণু প্রবল ধারা। শেষ পর্বে আদৌ কোন প্রচেষ্টা থাকে না, থাকে না কোন বাঁধাধরা পদ্ধতি, কোন নির্দিষ্ট সাধনা; প্রয়াস ও তপস্যার স্থান নেবে শুদ্ধীকৃত ও সংসিদ্ধ পার্থিব

প্রকৃতির কুঁড়ি থেকে দিব্য প্রসূনের স্বাভাবিক সহজ শক্তিশালী ও সুখময় বিকাশ। যোগের ক্রিয়ার স্বাভাবিক অনুক্রম এই সব।

অবশ্য এই সব গতিধারা সর্বদাই ঠিক পর পর আসে না, বা তাদের পরম্পরা যে কঠোরভাবে নির্দিষ্ট তাও নয়। প্রথমটি শেষ হবার আংশিক ভাবে দ্বিতীয়টির শুরু হয়। দ্বিতীয়টি সংসিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রথমটি অংশতঃ বর্তমান থাকে; সর্বশেষ দিব্য কর্ম প্রণালী চূড়ান্ত ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রকৃতিতে স্বাভাবিক হবার পূর্বেই তা ভবিষ্যতের আশ্বাসরূপে সময় সময় ব্যক্ত হতে পারে। আর সর্বদাই থাকে জীবের চেয়ে পরতর ও মহত্তর কিছু যা তাকে চালনা করে এমন কি তার ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও প্রয়াসের মধ্যেও। প্রায়শঃই সে এই আড়ালে-থাকা মহত্তর দেশনা সম্বন্ধে পূর্ণসচেতন হয়ে কিছু সময় তা থাকতে পারে, এমন কি তার সত্তার কোন কোন অংশে স্থায়ীভাবেও সচেতন থাকতে পারে! আর তা ঘটতে পারে তার সমগ্র প্রকৃতি তার সকল অংশ সমেত অবর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুদ্ধ হবার বহু পূর্বে। এমন কি সে গোড়া থেকেই ঐরূপ সচেতন হতে পারে; অন্য কোন অঙ্গ না হলেও তার মন ও হৃদয় তার শক্তিশালী ও মর্মভেদী দেশনায় সাড়া দিতে পারে আর তাতে যোগের একেবারে শুরু থেকেই কিছু প্রাথমিক সম্পূর্ণতাও থাকে। কিন্তু মধ্যবর্তী অবস্থার বিশেষত্ব এই যে তা অগ্রসর হয়ে শেষ সীমায় পৌঁছান না পর্যন্ত মহান প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের অবিরত ও সম্পূর্ণ সমান ক্রিয়া বর্তমান থাকে। আমাদের ব্যক্তিগত কিছু নয় এই যে মহত্তর দিব্যতর দেশনা তার প্রাধান্যের অর্থ প্রকৃতি সমগ্র অধ্যাত্ম রূপান্তরের জন্য উত্তরোত্তর পরিণত হয়ে উঠছে। আত্মোৎসর্গ শুধু যে তত্ত্বতঃ স্বীকৃত হয়েছে তা নয়, ক্রিয়া ও শক্তিতেও যে ইহা সার্থক হয়েছে—তারই অভ্রান্ত নিদর্শন ইহা। পরতম তাঁর জ্যোতির্ময় হাত রেখেছেন তাঁর অলৌকিক পরম জ্যোতি, ও শক্তি ও আনন্দের মনোনীত মানুষী আধারের উপর।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মে আত্মসমর্পণ—গীতার পথ

জীবন,—কোন সুদূর নীরব বা ঊর্ধ্বে উত্তোলিত উল্লাসভরা পরপার নয়—একমাত্র জীবনই আমাদের যোগের ক্ষেত্র। ইহার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হওয়া চাই,—আমাদের চিন্তা, দৃষ্টি, অনুভব ও সত্তার বাহ্য সংকীর্ণ ও খণ্ড খণ্ড মানুষী ধারার রূপান্তর গভীর ও প্রসারিত অধ্যাত্ম চেতনায় এবং অখণ্ড আন্তর ও বাহ্য জীবনে, আর আমাদের সাধারণ মানুষী জীবনধারার রূপান্তর দিব্য জীবনধারায়। এই পরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হল ভগবানের নিকট আমাদের সমগ্র প্রকৃতির আত্ম-দান। সব কিছু দিতে হবে আমাদের অন্তঃস্থ ভগবানের কাছে, বিশ্বাত্মক সর্বের কাছে এবং বিশ্বোত্তীর্ণ পরাৎপরের কাছে। সেই এক ও বহুময় ভগবানে আমাদের সংকল্প, আমাদের হৃদয় ও আমাদের মননের একান্ত একাগ্রতা, একমাত্র ভগবানের কাছে আমাদের সমগ্র সত্তার অকুণ্ঠ আত্মোৎসর্গ—ইহাই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়: ইহার অর্থ, যে পরম 'তৎ' অহং-এর চেয়ে অনন্ত গুণ মহত্তর তার দিকে অহং-এর ফেরা, তার আত্মদান ও অপরিহার্য সমর্পণ।

মানুষ যে সাধারণ জীবন যাপন করে তার উপাদান হল কতকগুলি অতি অপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত মনন, ধারণা, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, ভাবাবেগ, কামনা ও ভোগ ও কর্মের অর্ধ-সংহত অর্ধ-শিথিল স্তূপ: এ সবের অধিকাংশই গতানুগতিক ও আপনা-আপনিই পুনঃ-পুনঃ আনাগোনা করে, মাত্র কিছু অংশ স্ফুরন্ত ও আত্ম-বিকাশশীল, কিন্তু সবগুলিরই কেন্দ্র বাহ্য অহং। এই সমস্ত কর্ম-ধারার সমষ্টিগত ফলে আসে এক আন্তর বৃদ্ধি যা অংশতঃ এই জীবনে দৃশ্যমান ও কার্যকরী এবং অংশতঃ পরবর্তী জীবনে প্রগতির বীজ স্বরূপ। সচেতন সত্তার এই বৃদ্ধি, তার বিভিন্ন অঙ্গের প্রসার, উপচীয়মান আত্ম-প্রকাশ, উত্তরোত্তর সুসংগত বিকাশ—ইহাই মনুষ্যজীবনের সমগ্র তাৎপর্য, সমস্ত সার। মানব, মনোময় পুরুষ যে জড়দেহে প্রবেশ করছে তার উদ্দেশ্য হল—মনন, সংকল্প, ভাবাবেগ, কামনা, ক্রিয়া ও অনুভূতির দ্বারা চেতনায় এই তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ যার শেষ পরিণতি পরম দিব্য আত্ম-আবিষ্কার। বাকি সব সহকারী ও গৌণ অথবা আকস্মিক ও নিষ্ফল; শুধু তা-ই প্রয়োজনীয় যা তার প্রকৃতির ক্রম-বিকাশের ও তার আত্মা ও চিৎ-পুরুষের বৃদ্ধির, বরং উত্তরোত্তর বিকাশ ও উপলব্ধির পরিপোষক ও সহায়।

আমাদের যোগের যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হল তার অর্থ—এখানে আমাদের জীবনের এই পরমার্থসাধনকে ত্বরান্বিত করা, তার কম কিছু নয়। প্রকৃতির বিবর্তনের মাধ্যমে ধীর ও বিশৃঙ্খল বৃদ্ধির সাধারণ বিলম্বিত পদ্ধতিকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হওয়াই এই যোগের প্রণালী। কারণ প্রাকৃতিক বিবর্তন বড় জোর আবরণের নীচে এক অনিশ্চিত বৃদ্ধি, যার কারণ কিছুটা লক্ষ্যহীন শিক্ষা ও এমন চেষ্টা যার উদ্দেশ্য ভাল ভাবে জানা নেই, এবং সুবিধাসমূহের এমন ব্যবহার যা আংশিক দীপ্ত ও অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় আর যার ভ্রম, প্রমাদ ও ও ত্রুটিবিচ্যুতি অনেক; এই বৃদ্ধির অধিকাংশই আপাতপ্রতীয়মান আকস্মিক ঘটনাবলী ও অবস্থা বিপর্যয় যদিও তাদের মধ্যে গূঢ় দিব্য শক্তিপাত ও দেশনা প্রচ্ছন্ন থাকে। যোগে আমরা এই বিশৃঙ্খল বক্র কর্কট গতি সরিয়ে তার স্থলে আনি দ্রুত সচেতন ও আত্ম-চালিত ক্রমবিকাশ যার সুকল্পিত উদ্দেশ্য হল যতদূর সম্ভব আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যের পানে নিয়ে যাওয়া সরল পথে। এক অর্থে অগ্রসরতার মাঝে কোথাও কোন গন্তব্যস্থানের কথা বলা ভুল কারণ এই অগ্রসরতা হতে পারে অনন্ত। তবু আমবা এক নিকট-বর্তী গন্তব্যের ভাবনা করতে পারি, ভাবতে পারি আমাদের বর্তমান পাওয়া ছাড়িয়ে এমন এক উত্তর উদ্দেশ্যের কথা যা মানবের অন্তঃপুরুষের আস্পৃহার যোগ্য। তার সম্মুখে আছে এক নবজন্মের সম্ভাবনা; সত্তার এক উচ্চতর ও বিশালতর লোকে উদয়ন ও তার বিভিন্ন অঙ্গের রূপান্তরের জন্য অবতরণও সম্ভব। আর সম্ভব এমন বৃহৎ ও দীপ্ত চেতনা যা তাকে পরিণত করবে এক মুক্ত চিৎ—পুরুষে ও সংসিদ্ধ শক্তিতে, আর সেই চেতনা যদি ব্যষ্টি ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয় তাহলে এমন কি এক দিব্য মানবজাতি, না হয় এক নতুন, অতিমানসিক সুতরাং অতিমানবীয় জাতিও গড়ে উঠতে পারে। এই নবজন্মকেই আমরা আমাদের লক্ষ্য করি; আমাদের যোগের সমগ্র অর্থ হল দিব্যচেতনায় পরিণতিলাভ, শুধু অন্তঃপুরুষের নয়, আমাদের প্রকৃতির সকল অংশেরও অখণ্ড পরিবর্তন দিব্যত্বে।

যোগে আমাদের উদ্দেশ্য হল সীমিত বহির্মুখী অহংকে নির্বাসন দিয়ে তার জায়গায় ভগবানকে অধিষ্ঠিত করা প্রকৃতির অন্তর্বাসী রাজা রূপে। এর অর্থ, প্রথমে কামনার সব দাবী নাকচ করা এবং আর স্বীকার না করা যে কামনার ভোগই মানুষের প্রধান প্রবর্তক শক্তি। অধ্যাত্ম জীবন তার পুষ্টি-সংগ্রহ করবে কামনা থেকে নয়, স্বরূপগত অস্তিত্বের শুদ্ধ ও স্বার্থশূন্য অধ্যাত্ম আনন্দ থেকে। আর শুধু আমাদের মধ্যে কামনাময় প্রাণিক প্রকৃতি নয়, মনোময় সত্তাকেও পেতে হবে নবজন্ম ও রূপান্তরকারী পরিবর্তন। আমাদের বিভক্ত, অহমাত্মক, সীমিত ও অজ্ঞানময় মনন ও বুদ্ধির অবসান চাই; তার স্থলে অন্তরে প্রবাহিত হবে ছায়াহীন দিব্য দীপ্তির সার্বভৌম ও নির্দোষ

লীলাস্রোত যার শেষ পরিণতি হবে অর্ধ-সত্যের অন্ধ অন্বেষণ ও স্খলনপূর্ণ ভ্রম থেকে নির্মুক্ত স্বাভাবিক স্বাধিষ্ঠিত ঋতচেতনা। আমাদের বিশৃঙ্খল ও অভিভূত অহং-কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র-অভিপ্রায়যুক্ত সংকল্প ও ক্রিয়া বন্ধ হওয়া চাই এবং তার স্থলে আসা চাই দ্রুত ও শক্তিশালী, প্রোজ্জ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত দিব্যপ্রেরিত ও দিব্যচালিত শক্তির সমগ্র কর্মপ্রণালী। আমাদের সকল কাজে প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় করা চাই এক পরম, নৈর্ব্যক্তিক, অকম্প ও স্খলনহীন সংকল্প যা ভগবানের পরম সংকল্পের সহিত এক সুরে স্বতঃস্ফূর্ত ও অক্ষুব্ধ-ভাবে গাঁথা। আমাদের ক্ষীণ অহমাত্মক সব ভাবাবেগের তৃপ্তিহীন বহির্লীলা উচ্ছেদ করে তার স্থলে প্রকট করা চাই তাদের পশ্চাতে শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষমাণ অন্তঃস্থ গূঢ় গভীর ও বিশাল চৈত্য হৃদয়; ভগবানের অধিষ্ঠান এই আন্তর হৃদয় দ্বারা প্রবর্তিত আমাদের সকল বেদনা (feelings) পরি-বর্তিত হবে দিব্যপ্রেম ও বহুধা পরমানন্দের যুগল মনোবেগের শান্ত ও তীব্র গতিধারায়। ইহাই দিব্য মানবজাতির বা অতিমানসিক জাতির সংজ্ঞা। আমাদের কাজ হল যোগের দ্বারা এইপ্রকার অতিমানব ব্যক্ত করা, মানুষী বুদ্ধি ও ক্রিয়ার অতিবর্ধিত বা এমন-কি ঊর্ধ্বায়িত কোন শক্তি নয়।

সাধারণ মানবজীবনে বহির্গামী ক্রিয়া স্পষ্টতঃই আমাদের জীবনের তিন-চতুর্থাংশ বা তারও বেশী। ইহার ব্যতিক্রম যে সাধুসন্ত, ঋষি, অসামান্য চিন্তাবিৎ, কবি ও শিল্পী তাঁরা আরো বেশী পরিমাণে নিজেদের অন্তরে বাস করতে পারেন; বস্তুতঃ তাঁরাই নিজেদের গড়ে তোলেন,—অন্ততঃ তাঁদের প্রকৃতির অন্তরতম অংশে—উপরভাসা কর্ম অপেক্ষা আরো বেশী পরিমাণে আন্তর মননে ও বেদনায়। কিন্তু যদি এদের কোন একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন না করে বরং আন্তর ও বহির্জীবনের সুষমাকে পূর্ণতার মধ্যে এক করে তাদের অতীত কিছুর লীলায় রূপান্তরিত করা যায়, তাতেই সৃষ্ট হবে সিদ্ধ জীবনধারার রূপ। সুতরাং কর্মযোগ, আমাদের সংকল্পে ও কর্মে ভগবানের সহিত মিলন—শুধু জ্ঞানে ও বেদনায় নয়—পূর্ণ যোগের এক অপরিহার্য ও প্রকাশাতীতভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদি আমাদের মনন ও বেদনার রূপান্তর হয়, কিন্তু তার সাথে অনুরূপভাবে আমাদের কর্মের ভাব ও গঠনের রূপান্তর না হয় তা হলে আমাদের সিদ্ধি হবে অপূর্ণ, হীনাঙ্গ।

কিন্তু এই সমগ্র রূপান্তর সাধনের জন্য ভগবানের কাছে যেমন আমাদের মন ও হৃদয়কে যেমন উৎসর্গ করা অত্যাবশ্যক, আমাদের সব ক্রিয়া ও বাহ্য গতিবৃত্তিকেও উৎসর্গ করা অত্যাবশ্যক। আমাদের পশ্চাতে এক মহত্তর শক্তির হাতে আমাদের সব কর্মসামর্থ্যের সমর্পণ স্বীকার ও উত্তরোত্তর সিদ্ধ করা চাই, আর চাই আমাদের কর্তা ও কর্মীর ভাবের অবসান। সম্মুখের দৃশ্যমান

রূপে যে দিব্য সংকল্পকে আড়াল করে রেখেছে তাঁর হাতে সব কিছু দিতে হবে আরো সরাসরি ব্যবহারের জন্য; কারণ একমাত্র সেই অনুমন্তা সংকল্প দ্বারাই আমাদের ক্রিয়া সম্ভব। এক প্রচ্ছন্ন শক্তিই আমাদের সকল ক্রিয়ার প্রকৃত ঈশ্বর ও নিয়ামক দ্রষ্টা, এবং আমাদের অহং যে সব অজ্ঞানতা ও বিকৃতি ও বৈরূপ্য আনে তাদের মধ্য দিয়ে একমাত্র তিনিই জানেন তাদের সমগ্র অর্থ ও চরম উদ্দেশ্য। যে মহত্তর দিব্য জীবন, সংকল্প ও শক্তি বর্তমানে আমাদের গূঢ়ভাবে ধারণ করে আছে তারই বৃহৎ ও সরাসরি বাহির্ধারায় সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন করা চাই আমাদের সীমিত ও বিকৃত অহমাত্মক জীবন ও কর্মের। এই মহত্তর সংকল্প ও শক্তিকে আমাদের মধ্যে সচেতন করতে হবে, তাকেই করতে হবে প্রভু; এখন যেমন ইহা শুধু অতিচেতন, ধারক ও অনুমন্তা শক্তিমাত্র, তেমন আর তার থাকা চলবে না। যে সর্বজ্ঞ শক্তি ও সর্বসমর্থ জ্ঞান এখন প্রচ্ছন্ন, আমাদের মধ্য দিয়ে তাঁরই সকল-জানা উদ্দেশ্য ও প্রণালীর অবিকৃত প্রবাহ সিদ্ধ করা চাই আর এর ফলে আমাদের সমগ্র রূপান্তরিত প্রকৃতি পরিণত হবে ইহার শুদ্ধ, অব্যাহত, সুসম্মত ও সহযোগী প্রণালীতে। এই সমগ্র উৎসর্গ ও সমর্পণ এবং তার ফলস্বরূপ এই সমগ্র রূপান্তর ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহ—ইহারাই পূর্ণকর্মযোগের সমগ্র মৌলিক উপায় ও চরম লক্ষ্য।

এমন কি যাদের প্রথম স্বাভাবিক ঝোঁক ও গতি হল মননশীল মন ও জ্ঞানের উৎসর্গ, সমর্পণ ও তার ফলস্বরূপ এ সবের সমগ্র রূপান্তর অথবা হৃদয় ও তার বিভিন্ন ভাবাবেগের সমগ্র উৎসর্গ, সমর্পণ ও রূপান্তর তাদের পক্ষেও কর্মোৎসর্গ সেই পরিবর্তনের এক আবশ্যকীয় উপাদান। অন্যথায় তারা ভগবানকে অন্য জীবনে পেলেও, এ জীবনে তারা ভগবানকে সার্থক করতে সক্ষম হবে না; তাদের কাছে জীবন হবে অর্থহীন, অদিব্য, অসম্বদ্ধ তুচ্ছ কিছু। যে আসল জয় আমাদের পার্থিব জীবনরহস্যের চাবিকাঠি হবে তা তারা পায় না; তাদের প্রেম সেই পরম প্রেম নয় যা আত্মাকে জয় করতে সমর্থ; তাদের জ্ঞান সমগ্র চেতনা ও সর্বগ্রাহী জ্ঞান হবে না। অবশ্য শুধু জ্ঞান বা ভগবদ্-মুখী ভাবাবেগ নিয়ে বা দুটিই একত্র নিয়ে যোগ শুরু করা সম্ভব, আর কর্মকে রেখে দেওয়া যেতে পারে যোগের শেষ সাধনার জন্য। কিন্তু ইহার অসুবিধা এই যে আমাদের ঝোঁক হবে অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে অন্তরেই একান্ত ভাবে থাকবার, প্রত্যক্‌বৃত্ত অনুভূতির মধ্যে সূক্ষ্মভাবাপন্ন হয়ে, আমাদের বিচ্ছিন্ন সব আন্তর অংশে আবদ্ধ থেকে; সেখানে নিজেদের অধ্যাত্ম নিঃসঙ্গতার কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন হওয়া সম্ভব, আর পরে বিজয়ী-রূপে বাহিরের দিকে নিজেদের ঢেলে দেওয়া ও পরাপ্রকৃতি থেকে যা লাভ করেছি তা জীবনে প্রয়োগ করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হতে পারে। আমাদের আন্তর বিজয়ের সাথে এই বাহিরের রাজ্য জয় করতে গেলে আমরা দেখব

যে আমরা বড় বেশী অভ্যস্ত হয়েছি কেবলমাত্র প্রত্যক্-বৃত্ত ক্রিয়াতে ও অশক্ত হয়ে পড়েছি জড়ের ক্ষেত্রে। বহিঃপ্রাণ ও দেহের রূপান্তর সাধন অতীব দুরূহ হবে। আর না হয় আমরা দেখব যে আন্তর জ্যোতির সঙ্গে আমাদের ক্রিয়ার মিল নেই; তখনো ক্রিয়া চলে পুরনো অভ্যস্ত ভ্রান্ত পথে, তখনো তা পুরনোর সাধারণ অপূর্ণ প্রভাবের অধীন। আমাদের অন্তঃস্থ সত্য বিচ্ছিন্ন রয়ে যায় আমাদের বহিঃপ্রকৃতির অবিদ্যাময় যান্ত্রিক কর্মপ্রণালী থেকে আর মাঝে থাকে এক যন্ত্রণাপূর্ণ ব্যবধান। এরূপ অনুভূতি প্রায়শঃই ঘটে, কারণ এরূপ প্রণালীতে জ্যোতি ও শক্তি নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে, জীবনে নিজে-দের প্রকাশ করতে বা পৃথিবী ও তার বিভিন্ন প্রণালীর জন্য নির্দিষ্ট সব স্থূল উপায় ব্যবহার করতে তারা অনিচ্ছুক। আমরা যেন বাস করি অন্য এক জগতে, এক বৃহত্তর ও সূক্ষ্মতর জগতে, আর জড় ও পার্থিব জীবনে আমাদের কোনই দিব্য প্রভাব নেই, হয়ত কোন প্রকারেরই প্রভাব একরূপ নেই।

কিন্তু তবু প্রত্যেককে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী চলতে হবে, বাধা সর্বদাই থাকে, তবে যোগের যে পথ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক তা-ই যদি আমরা অনু-সরণ করতে চাই তা হলে ঐ সব বাধা কিছু দিনের জন্য স্বীকার করতে হবে। মোটের উপর যোগ প্রধানতঃ আন্তর চেতনা ও প্রকৃতির পরিবর্তন; আর আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের সাম্য যদি এমন হয় যে কোন একটি বিশেষ অঙ্গ একান্তভাবে অবলম্বন করেই যোগসাধনা শুরু করতে হবে ও অন্যগুলিকে রেখে দিতে হবে ভবিষ্যতে নেবার জন্য, তা হলে এই প্রণালীর আপাত অপূর্ণতা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। তাহলেও পূর্ণযোগের আদর্শ কর্মপ্রণালী এমন এক গতিবৃত্তি হবে যার প্রণালী শুরু থেকেই অখণ্ড এবং অগ্রগতি সমগ্র ও বহুভঙ্গিম। সে যা হোক, আমাদের বর্তমান কাজের বিষয় হল এমন এক যোগ যা তার লক্ষ্য ও সম্পূর্ণ গতিবৃত্তিতে অখণ্ড কিন্তু যা শুরু করে কাজ থেকে ও অগ্রসর হয় কাজ দিয়ে, তবে প্রতি পদে তাকে উত্তরোত্তর চালনা করে এক সঞ্জীবনী দিব্য প্রেম ও উত্তরোত্তর দীপ্ত করে এক সাহায্যকারী দিব্য জ্ঞান।

*　　　*　　　*

জাতিকে এ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক কর্মের যে মহত্তম উপদেশবাণী দেওয়া হয়েছে, অতীত যুগের কর্মযোগের যে সর্বোৎকৃষ্ট বিধান মানুষের জানা আছে তা পাওয়া যাবে ভগবদ্গীতায়। মহাভারতের সেই প্রসিদ্ধ উপাখ্যানে কর্ম-যোগের মহান সূত্রগুলি চিরদিনের জন্য স্থাপিত হয়েছে অতুলনীয় দক্ষতার সহিত এবং নিশ্চিত অনুভূতির অভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে। একথা সত্য যে তাতে পূর্ণভাবে বলা হয়েছে শুধু পথের কথাই আর প্রাচীনেরা যে ভাবে দেখেছিলেন সেইভাবে; পরিপূর্ণ সার্থকতার কথা, সর্বোচ্চ রহস্যের কথা তেমন সুস্পষ্ট

ভাবে না বলে মাত্র তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে এক পরমতম রহস্যের অপ্রকাশিত অংশ হিসাবে। এই নীরবতার কারণ সুস্পষ্ট; কেননা একথা সত্য যে সার্থকতা অনুভূতির বিষয়, কোন শিক্ষার দ্বারা তার প্রকাশ সম্ভব নয়। যে মন জ্যোতির্ময় রূপান্তরকারী অনুভূতি পায় নি সে যাতে সত্য সত্যই বুঝতে পারে তেমন ভাবে তা বর্ণনা করা যায় না। আর যে অন্তঃপুরুষ বিভিন্ন উজ্জ্বল তোরণ পার হয়ে আন্তর জ্যোতির সুদীপ্তির মধ্যে দাঁড়িয়েছে তার কাছে মানসিক ও বাচনিক বর্ণনা যেমন অনাবশ্যক, অপ্রচুর ও ধৃষ্টতা তেমন অসার। মনোময় মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার উপযোগী করে যে ভাষা তৈরী হয়েছে, বাধ্য হয়ে তারই অযোগ্য ও ভ্রান্তিজনক সংজ্ঞায় দিব্য সিদ্ধির কথা চিত্রিত করতে হয়; আর সে ভাবে প্রকাশিত হলে তাদের অর্থ ঠিক মত বুঝতে পারে শুধু তারাই যারা আগেই তা জানে, আর জানে বলেই তারা এই সব তুচ্ছ বাহ্য সংজ্ঞাগুলির পরিবর্তিত, আন্তর ও রূপান্তরিত অর্থ দিতে সক্ষম। আদিতে যেমন বৈদিক ঋষিরা বলতেন, পরম জ্ঞানের কথা শুধু তাদেরই বোধগম্য যারা ইতিপূর্বেই জ্ঞান লাভ করেছে। যেরূপ রহস্যপূর্ণ ভাবে গীতার সমাপ্তি হয়েছে তাতে তার নীরবতা থেকে মনে হয় যে আমরা যে সমাধান চাইছি তার দ্বারপ্রান্তে এসে তা থেমে গিয়েছে: সর্বোচ্চ অধ্যাত্মমনের সীমানায় এসে ইহা নিবৃত্ত রয়েছে, সীমানা পার হয়ে অতিমানসিক জ্যোতির দ্যুতির মধ্যে প্রবেশ করে নি। কিন্তু তবু কেন্দ্রীয় গুহ্য কথা হল আন্তর উপস্থিতির সহিত তাদাত্ম্যের—শুধু স্থিতিশীল তাদাত্ম্যের নয়, স্ফুরন্ত তাদাত্ম্যেরও গুহ্য কথা এবং দিব্য দিশারীর নিকট নিঃশেষ সমর্পণের শ্রেষ্ঠ রহস্য। এই সমর্পণই অতিমানসিক রূপান্তরের অপরিহার্য সাধন, আবার অতিমানসিক রূপান্তরের মধ্য দিয়েই স্ফুরন্ত তাদাত্ম্যলাভ সম্ভব।

তাহলে গীতায় কর্মযোগের কি কি সব সূত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে? ইহার মূলতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক পদ্ধতির কথা সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বলা যায় যে ইহা সমত্ব ও একত্ব—চেতনার এই দুই বৃহত্তম ও উচ্চতম অবস্থা বা শক্তির মিলন। ইহার পদ্ধতির সার এই যে ভগবানকে অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করা চাই যেমন আমাদের আন্তর আত্মায় ও চিৎ-পুরুষে তেমন আমাদের জীবনে। ব্যক্তিগত কামনার আন্তর সন্ন্যাসের ফলে সমত্ব আসে, ভগবানের নিকট আমাদের সমগ্র সমর্পণ সিদ্ধ হয় এবং তার সাহায্যে বিভেদজনক অহং থেকে আমরা মুক্তি পাই; আর তার ফলে আমাদের লাভ হয় একত্ব। কিন্তু এই একত্ব হওয়া চাই স্ফুরন্ত শক্তিতে, শুধু স্থিতিশীল শান্তিতে বা নিষ্ক্রিয় নিঃশ্রেয়সে নয়। গীতা আমাদের এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে সকল কর্ম ও প্রকৃতির পূর্ণ শক্তিরাজির মধ্যেও চিৎ-পুরুষের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে যদি আমরা বিভেদ-

জনক ও সীমাকারী অহং-এর চেয়ে পরতরের নিকট আমাদের সমগ্র সত্তার অধীনতা স্বীকার করি। নিশ্চল নিষ্ক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড স্ফুরন্ত সক্রিয়তাই ইহার বক্তব্য; অচঞ্চল শান্তির উপর অপরিবর্তনীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত সম্ভব-মত বৃহত্তম ক্রিয়া, পরম আন্তরবৃত্ত নীরবতার মধ্য থেকে স্বচ্ছন্দ বহিঃপ্রকাশ—ইহাই তার রহস্য।

এখানকার সব কিছুই এক ও অবিভাজ্য সনাতন বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় ব্রহ্ম যিনি জীব ও বিষয়ের মধ্যে বিভক্তরূপে প্রতীয়মান। তিনি এই ভাবে মাত্র প্রতীয়মান, কারণ যথার্থতঃই তিনি সকল বিষয়ে, সকল জীবে সর্বদাই এক ও সম; বিভাজন শুধু এক উপরের প্রাতিভাসিক বিষয়। যতদিন আমরা এই অবিদ্যাময় প্রতীয়মানতার মধ্যে বাস করি, ততদিন আমরা অহং এবং প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের অধীন। প্রাতিভাসিকের দাসত্বে শৃঙ্খলিত, দ্বন্দ্ব-সমূহে আবদ্ধ, শুভ ও অশুভ, পাপ ও পুণ্য, হর্ষ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, সফলতা ও বিফলতার মধ্যে আন্দোলিত আমরা মায়ার লৌহচক্র বা স্বর্ণমণ্ডিত লৌহ চক্রের পাকে অসহায়ভাবে ঘুরি। বড় জোর আমাদের আছে মাত্র নগণ্য আপেক্ষিক স্বাধীনতা যাকে মানুষ না বুঝে বলে স্বাধীন ইচ্ছা। কিন্তু মূলতঃ এই ইচ্ছা অলীক, কারণ প্রকৃতির গুণসমূহই প্রকাশ পায় আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার মাধ্যমে; প্রকৃতির শক্তিকে আমরা করায়ত্ত করি না, তাহাই আমাদের করায়ত্ত করে, নির্ধারণ করে আমরা কি ইচ্ছা করব এবং কিভাবে ইচ্ছা করব। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমরা বিচার সম্মত সংকল্প বা বিবেচনাহীন সংবেগ যার দ্বারাই চালিত হয়ে যে বিষয় পেতে চাই তা নির্বাচন করে প্রকৃতি, কোন স্বাধীন অহং নয়।। অপর পক্ষে যদি আমরা ব্রহ্মের একত্ববিধায়ক সত্যতার মধ্যে বাস করি, তা হলে আমরা অহং ছাড়িয়ে যাই ও প্রকৃতিকেও অতিক্রম করি। কেন না তখন আমরা ফিরে যাই আমাদের প্রকৃত আত্মায় ও হয়ে উঠি চিৎ-পুরুষ; চিৎ-পুরুষেই আমরা প্রকৃতির তাড়নার ঊর্ধ্বে থাকি, তার গুণ ও শক্তির অধিপতি হই। অন্তঃপুরুষে, মনে ও হৃদয়ে পরিপূর্ণ সমত্ব পেয়ে আমরা উপলব্ধি করি আমাদের একত্বময় সত্যকার আত্মা যা সর্বভূতের সহিত এক এবং যা তাঁর সহিতও এক যিনি এই সবের মধ্যে এবং যা সব আমরা দেখি ও জানি সে সবেও নিজেকে প্রকাশ করেন। দিব্যসত্তা, দিব্য চেতনা ও দিব্য ক্রিয়ার জন্য এই সমত্ব ও এই একত্বের অপরিহার্য যুগল ভিত্তি আমাদের স্থাপন করা চাই' সকলের সহিত এক না হলে আমরা অধ্যাত্মভাবে দিব্য হই না। সকল বিষয়ে, ঘটনায় ও জীবে আমাদের অন্তঃপুরুষ সমভাবাপন্ন না হলে আমরা অধ্যাত্মভাবে দেখ্‌তে, দিব্যভাবে জানতে ও দিব্যভাবে অপরের প্রতি অনুভব করতে অসমর্থ হই। পরম শক্তি, একমাত্র সনাতন ও অনন্ত

সকল বিষয়ে ও সকল সত্তায় সম, এবং সম বলেই একান্ত প্রজ্ঞার সহিত তার কর্ম ও শক্তির সত্যানুযায়ী ও প্রতি বিষয়ের ও প্রতি প্রাণীর সত্যানুযায়ী ক্রিয়ায় ইহা সমর্থ।

আবার ইহাই একমাত্র প্রকৃত স্বাধীনতা যা মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব; কিন্তু এই স্বাধীনতা সে পেতে পারে না যতদিন না সে তার মানসিক বিভক্ততা অতিক্রম করে প্রকৃতির মধ্যে সচেতন অন্তঃপুরুষ হয়ে ওঠে। জগতে যে একটি মাত্র স্বাধীন ইচ্ছা আছে তা অখন্ড দিব্য সংকল্প, প্রকৃতি তাঁর কার্যসাধিকা; কেন না প্রকৃতি অপর সকল সংকল্পের অধিকর্ত্রী ও সৃষ্টিকর্ত্রী। এক অর্থে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা সত্য হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির গুণের অন্তর্গত সকল বিষয়ের মত ইহা শুধু আপেক্ষিক ভাবে সত্য। মন প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের আবর্তের উপর আরূঢ় হয়ে অনেকগুলি সম্ভাবনার মধ্যে একটি স্থিতিভঙ্গির উপর ভারসাম্য রাখে, এদিক ওদিক ঝুঁকে স্থির হয়, আর মনে করে সে নির্বাচন করেছে; কিন্তু যে শক্তি পিছন থেকে তার নির্বাচন নির্ধারণ করেছে তাকে সে দেখে না, এমন কি অস্পষ্টভাবেও তার কথা জানে না। মনের পক্ষে সে শক্তি দেখা সম্ভব নয়, কারণ ঐ শক্তি এমন কিছু যা সমগ্র ও আমাদের চক্ষে অব্যাকৃত। এই শক্তি যে সব বিশেষ ব্যাকৃতির জটিল বৈচিত্র্যের সাহায্যে তার বিভিন্ন অমিত উদ্দেশ্য সাধন করে, বড় জোর তাদের মধ্যে কতকগুলিকে মন চিনতে পারে মাত্র কিছুটা স্পষ্ট ও নির্ভুল ভাবে। মন নিজেই আংশিক, চাপেও যন্ত্রের একটি অংশের উপর, কাল ও পরিবেশের মধ্যে যে সব শক্তি যন্ত্রকে চালায় তাদের দশভাগের নয় ভাগই মনের অজ্ঞাত, যন্ত্রের অতীত প্রস্তুতি ও ভবিষ্যৎ গতির কথাও সে জানে না; কিন্তু যন্ত্রের উপর আরূঢ় বলেই সে মনে করে যে সে যন্ত্রটিকে চালাচ্ছে। এক অর্থে ইহার মূল্য আছে ঃ কারণ মনের এই যে সুস্পষ্ট ঝোঁক যাকে আমরা আমাদের সংকল্প বলি, তার যে দৃঢ় স্থিরতা আমাদের কাছে মনে হয় বিবেচিত নির্বাচন তা প্রকৃতির অতীব শক্তিশালী নির্ধারকসমূহের অন্যতম; কিন্তু ইহা কখনও স্বাধীন ও একক নয়। মানবসংকল্পের এই ক্ষুদ্র তটস্থ ক্রিয়ার পশ্চাতে এমন বিশাল ও শক্তিশালী ও শাশ্বত এমন কিছু আছে যা উপর থেকে ঝোঁকের প্রবণতা দেখে সংকল্পের মোড়ের উপর চাপ দেয়। আমাদের ব্যষ্টি-গত নির্বাচন অপেক্ষা মহত্তর এক সমগ্র সত্য প্রকৃতিতে আছে। আর এই সমগ্র সত্যের ভিতর, এমন কি তা ছাড়িয়েও তার পশ্চাতে এমন কিছু আছে যা সকল পরিণতির নির্ধারক; ইহার উপস্থিতি ও গূঢ় জ্ঞান প্রকৃতির কর্ম-প্রণালীর মধ্যে অবিচলিভাবে রক্ষা করে যথাযথ বিভিন্ন সম্বন্ধের স্ফুরন্ত, প্রায়—স্বয়ংক্রিয় বোধ, পরিবর্তনশীল বা দৃঢ় সব রীতি, গতিবৃত্তির অবশ্য-ম্ভাবী বিভিন্ন ক্রম। স্ফুরন্ত এক সনাতন ও অনন্ত, সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম গূঢ়

দিব্য সংকল্প বিদ্যমান যা নিজেকে প্রকাশিত করছে বিশ্বভাবের মধ্যে ও এই সব আপাত প্রতীয়মান অনিত্য ও সান্ত, অচেতন বা অর্ধ-সচেতন বিষয়ের প্রতি বিশেষের মধ্যে। গীতায় যে বলা হয়েছে যে সর্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর নিজ মায়ার দ্বারা সর্বপ্রাণীকে যন্ত্রারূঢ়বৎ ঘুরাচ্ছেন তার অর্থ এই শক্তি বা উপস্থিতি।

এই দিব্য সংকল্প আমাদের বাহিরের ভিন্ন কোন শক্তি বা উপস্থিতি নয়; ইহা আমাদের অন্তরঙ্গ এবং আমরা নিজেরা তার অংশ; কারণ আমাদেরই পরমাত্মা ইহার অধিকর্তা ও ভর্তা। তবে, ইহা আমাদের সচেতন মানসিক সংকল্প নয়; আমাদের সচেতন সংকল্প যা করে ইহা প্রায়শঃই তা প্রত্যাখান করে এবং আমাদের সংকল্প যা প্রত্যাখান করে ইহা তা গ্রহণ করে। কেননা এই গূঢ় পরম এক জানেন সব কিছু, প্রতি সমগ্র ও প্রত্যেক খুটিনাটি, অথচ আমাদের উপরভাসা মন জানে বিষয়সমূহের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমাদের সংকল্প মনের মধ্যে সচেতন, আর যা সে জানে তা জানে শুধু মননের দ্বারা; দিব্য সংকল্প আমাদের নিকট অতিচেতন কারণ স্বরূপতঃ ইহা অতিমানসিক আর ইহা সব কিছু জানে কেননা ইহাই সব কিছু। এই বিশ্বশক্তির অধিকর্তা ও ভর্তা আমাদের যে পরমাত্মা তিনি আমাদের অহং-আত্মা নন, আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি নন; ইনি বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক এমন কিছু যার ফেনা ও প্রবহমান উপরিভাগ মাত্র এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়। যদি আমরা আমাদের সচেতন সংকল্প সমর্পণ করে ইহাকে সনাতনের সংকল্পের সহিত এক করে দিতে রাজী হই, তা হলে, এবং শুধু এইভাবেই আমরা পাই প্রকৃত স্বাধীনতা; দিব্য স্বাধীনতার মধ্যে বাস করে আমরা আর এই শৃংখলাবদ্ধ তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছা আঁকড়ে থাকব না; এ স্বধীনতা পুতুলের স্বাধীনতা—অবিদ্যাময়, অলীক, আপেক্ষিক, নিজের সব স্বল্প প্রাণিক প্রেরণা ও মানসিক সংকেতের ভ্রান্তিতে আবদ্ধ।

* * *

এক পার্থক্যের বিষয় আমাদের চেতনায় দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করা চাই—তা হল যান্ত্রিক প্রকৃতি ও প্রকৃতির স্বাধীন প্রভুর মধ্যে, ঈশ্বর বা একমাত্র জ্যোতির্ময় দিব্য সংকল্প ও বিশ্বের নানা কার্যসাধক প্রকার ও শক্তির মধ্যে বিশিষ্ট পার্থক্য।

প্রকৃতি,—তবে তিনি স্বরূপতঃ তাঁর দিব্য সত্যে সনাতনের যে চিন্ময়ী শক্তি সে ভাবে নয়, অবিদ্যার মাঝে তিনি যেভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হন সেই ভাবে—এক কার্যসাধিকা শক্তি যার পদক্ষেপ যান্ত্রিক আর তার সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা তাতে ইহা সচেতনভাবে বুদ্ধিসম্পন্না নয়, যদিও তার সকল কর্মই এক পরম বুদ্ধির দ্বারা অনুস্যূত। নিজে ঈশানী না

হয়েও সে এমন এক আত্মবিৎ শক্তিতে'* পূর্ণ যার ঈশিত্ব অসীম এবং এই শক্তি তাকে চালায় বলে সে সকল কিছুর নিয়ন্ত্রী এবং ঈশ্বর তার মধ্যে যে কাজ অভিপ্রায় করেন তা সে সম্পন্ন করে সঠিকভাবে। সে ভোগ করে না, সে-ই ভোগ্যা আর নিজের মধ্যে সমস্ত ভোগসম্ভার বহন করে। নিসর্গ-রূপে এই প্রকৃতি এক অচেতন সক্রিয় শক্তি, কারণ সে সিদ্ধ করে তার উপর আরোপিত এক গতিবৃত্তিকে; কিন্তু তার মধ্যে আছেন জ্ঞাতা পরম এক,—সেখানে সমাসীন এক পরম সত্তা যিনি তার সকল গতি ও প্রণালীর কথা অবগত। প্রকৃতি কাজ করে তার সহিত যুক্ত বা তার অন্তরাসীন পুরুষের জ্ঞান, ঈশিত্ব, আনন্দের আধার হয়ে, কিন্তু যা তাকে পূর্ণ করে আছে তার অধীন হয়ে ও তাকে প্রতিফলিত করেই সে ঐসবের অংশভাগী হতে সমর্থ। পুরুষ জ্ঞাতা, এবং অচঞ্চল ও নিষ্ক্রিয়; তিনি তাঁর চেতনা ও জ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া ধারণ করেন ও তা ভোগ করেন। তিনি প্রকৃতির কর্মের অনুমতি দেন, এবং তিনি যা অনুমতি দেন প্রকৃতি তা-ই সিদ্ধ করে তাঁর তুষ্টির জন্য। পুরুষ নিজে কার্যসাধন করেন না; তিনি প্রকৃতিকে তার ক্রিয়ার মধ্যে ধারণ করেন এবং নিজের জ্ঞানে যা অনুভব করেন প্রকৃতিকে অনুমতি দেন তা ফুটিয়ে তুলতে শক্তিতে, প্রণালীতে ও সিদ্ধ পরিণতিতে। এই পার্থক্য করা হয়েছে সাংখ্য দর্শনে; এবং যদিও ইহা সমগ্র যথার্থ সত্য নয়, আর কোন প্রকারেই পুরুষ বা প্রকৃতি কাহারও পরতম সত্য নয়, তথাপি সৃষ্টির অপরার্ধে ইহা এক প্রামাণ্য ও অপরিহার্য ব্যবহারিক জ্ঞান।

এই জ্ঞাতা পুরুষ বা এই সক্রিয়া প্রকৃতির সহিত রূপের মধ্যস্থ ব্যষ্টি পুরুষ বা সচেতন সত্তা নিজেকে একাত্ম করতে সক্ষম। যদি সে প্রকৃতির সহিত নিজেকে একাত্ম করে তা হলে সে ঈশান, ভোক্তা ও জ্ঞাতা নয়, সে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ ও কর্মপ্রণালী প্রতিফলিত করে। এই একাত্মতার দ্বারা সে প্রকৃতির যা বৈশিষ্ট্য—অধীনতা ও যান্ত্রিক কর্মপ্রণালী তার মধ্যে প্রবেশ করে। এবং এমনকি প্রকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে মাটি ও ধাতুর ন্যায় তার বিভিন্ন রূপের মধ্যে সুপ্ত ও উদ্ভিদ জীবনের মধ্যে সুপ্ত—প্রায় থেকে এই অন্তঃপুরুষ হয়ে পড়ে নিশ্চেতন বা অচেতন। সেখানে সেই নিশ্চেতনার মধ্যে সে তমঃ-এর অধিকারভুক্ত, এই তমঃ অন্ধকার ও নিশ্চেষ্টতার তত্ত্ব, শক্তি, গুণগত প্রকার; সত্ত্ব ও রজঃ সেখানে থাকে, তবে তারা তমঃ-এর পুরু আবরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। চেতনার নিজস্ব যথাযথ প্রকৃতির মধ্যে উদ্বর্তনের অবস্থায়, কিন্তু তখনও প্রকৃতিতে তমঃ-এর আধিপত্য বড় বেশী থাকায় দেহগত সত্তা তখনও যথার্থতঃ

* এই শক্তি ঈশ্বরের সচেতন দিব্য শক্তি, ইনিই বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মিকা জননী।

সচেতন না হলেও উত্তরোত্তর রজঃ-এর অধীন হয়; এই রজঃ কামনা ও সহজাত সংস্কারের দ্বারা চালিত মনোবেগ ও ক্রিয়ার তত্ত্ব, শক্তি ও গুণগত প্রকার। এই অবস্থায় গঠিত ও পুষ্ট হয় পশুপ্রকৃতি যার চেতনা সংকীর্ণ, বুদ্ধি প্রাথমিক, প্রাণিক অভ্যাস ও সংবেগ রজসো-তামসিক। বিরাট নিশ্চেতনা থেকে অধ্যাত্মপাদের অভিমুখে আরো কিছুদূর উদ্‌বর্তনের অবস্থায় দেহগত সত্তা মুক্ত করে সত্ত্ব, আলোর প্রকার এবং লাভ করে আপেক্ষিক স্বাধীনতা ও ঈশিত্ব ও জ্ঞান এবং তার সাথে আন্তর তৃপ্তি ও সুখের সীমিত ও পরিচ্ছন্ন বোধ। মানুষ, স্থূলদেহের মধ্যে মনোময় সত্তা এই রকমেরই হওয়া উচিত, কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক অন্তঃপুরুষ-অধ্যুষিত দেহের মধ্যে অল্প সংখ্যকেরই মনোময় সত্তা ঐ রকমের। সাধারণতঃ তার মাঝে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথ্বী-নিশ্চেষ্টতা ও ক্লিষ্ট অবিদ্যাময় পাশব প্রাণশক্তির আধিক্য এত বেশী যে তার পক্ষে জ্যোতি ও আনন্দের অন্তঃপুরুষ বা এমন কি সুষম সংকল্প ও জ্ঞানের মনও হওয়া অসম্ভব। এখানে মানুষের মাঝে আছে মুক্ত, ঈশান, জ্ঞাতা ও ভোক্তা পুরুষের প্রকৃত স্বভাবের দিকে এক উৎক্রান্তি যা অসম্পূর্ণ ও এখনও বাধাগ্রস্ত ও ব্যাহত। কেন না, মানুষী ও পার্থিব অভিজ্ঞতায় এই সব গুণ আপেক্ষিক, কোনটিই তার একক ও অনপেক্ষ ফল দেয় না; সকলেই পরস্পরের সহিত মিশ্রিত, কোন স্থানেই কোনটিরই শুদ্ধ ক্রিয়া নেই। এই সবেরই বিশৃঙ্খলা ও চঞ্চল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয় প্রকৃতির অনিশ্চিত তুলাদণ্ডে দোলায়মান অহমাত্মক মানবচেতনার সব অনুভূতি।

প্রকৃতির মধ্যে দেহগত অন্তরপুরুষের নিমজ্জনের নিদর্শন হল অহং-এর সীমার মধ্যে চেতনার আবদ্ধতা। এই সীমিত চেতনার সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায় মন ও হৃদয়ের সতত অসমতায় এবং অনুভূতির সংস্পর্শে তাদের বিচিত্র সব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিশৃঙ্খল সংঘর্ষে ও বৈষম্যে। একদিকে প্রকৃতির কাছে অন্তঃপুরুষের অধীনতা ও অন্যদিকে ঈশনা ও ভোগের জন্য তার সংগ্রাম যা প্রায়শঃই তীব্র কিন্তু সংকীর্ণ এবং বেশীর ভাগই নিষ্ফল—এই দুয়ের দ্বারা সৃষ্ট দ্বন্দ্বসমূহের মাঝে মানুষের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সতত দোলায়মান। সফলতা ও বিফলতা, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, শুভ ও অশুভ, পাপ ও পুণ্য, হর্ষ ও বিষাদ, দুঃখ ও সুখ—প্রকৃতির এই সব লোভনীয় ও কষ্টকর বিপরীত দ্বন্দ্বের অন্তহীন পাকের মধ্যে আবর্তিত হয় অন্তঃপুরুষ। এই সব বিষয় থেকে সে মুক্ত হয়ে এই কার্যসাধিকা জগৎ-প্রকৃতির সহিত তার সঠিক সম্বন্ধের সন্ধান পায় কেবল তখনই যখন সে প্রকৃতির মাঝে তার নিমজ্জন থেকে জেগে উঠে অনুভব করে পরম একের সহিত তার একত্ব ও সর্বভূতের সহিত তার একত্ব। তখন প্রকৃতির সব অবর প্রকারে সে হয়ে ওঠে নির্বিকার, তার দ্বন্দ্বসমূহে সমচিত্ত আর পায় ঈশনা ও মুক্তির সামর্থ্য, স্বীয় শাশ্বত

সত্তার শান্ত প্রগাঢ় অবিমিশ্র আনন্দে পূর্ণ হয়ে সে সমাসীন হয় প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উচ্চ রাজাসনে অধিষ্ঠিত জ্ঞাতা ও সাক্ষীরূপে। দেহগত চিৎ-পুরুষ তার সব শক্তি প্রকাশ করতে থাকে ক্রিয়ার মধ্যে, কিন্তু আর সে অবিদ্যার মধ্যে আচ্ছন্ন নয়, আর সে তার কর্মের দ্বারা বদ্ধ নয়; তার মধ্যে আর তার ক্রিয়ার কোন ফল থাকে না, ফল শুধু বাহিরে, প্রকৃতিতে। তার অনুভূতিতে প্রকৃতির সমগ্র গতিধারা হয়ে ওঠে উপরে তরঙ্গের ওঠা পড়ার মত, কিন্তু তাতে কিছু-মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না তার নিজের অতলস্পর্শী গভীর শান্তি, তার ব্যাপ্ত আনন্দ, তার বিরাট বিশ্বব্যাপী সমত্ব বা নিঃসীম ভগবদ-জীবন। *

* * *

এইসব আমাদের সাধনার সর্ত আর তারা তার এমন এক আদর্শ নির্দেশ করে যা প্রকাশ করা যায় এই সকল বা অনুরূপ সূত্রাবলীতে।

ভগবানের মধ্যে বাস, অহং-এ নয়, বিশাল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বভূতের অন্তঃপুরুষ ও বিশ্বাতীতের চেতনায় বিচরণ, ক্ষুদ্র অহমাত্মক চেতনায় নয়।

সকল ঘটনা ও সকল সত্তায় পরিপূর্ণভাবে সম হওয়া এবং নিজের সহিত তারা এক ও ভগবানের সহিত তারা এক—এইভাবে দেখা ও অনুভব করা। অনুভব করা যে সব কিছুই নিজের মধ্যে ও সব কিছুই ভগবানের মধ্যে; অনুভব করা যে ভগবান সব কিছুর মধ্যে এবং নিজেও সব কিছুর মধ্যে।

কর্ম করা ভগবানের মধ্যে থেকে, অহং-এর মধ্যে নয়। এবং এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কর্ম নির্বাচন করা আমাদের ঊর্ধ্বের পরতম সত্যের আদেশ অনুযায়ী, ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও মান অনুসারে নয়। এরপর, আমরা অধ্যাত্ম চেতনায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র আর আমাদের পৃথক সংকল্প ও গতিবৃত্তিতে কাজ না করা, বরং যে দিব্য সংকল্প আমাদের ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে বিরাজমান উত্তরোত্তর তাঁর প্রবর্তনা ও দেশনার অধীনে ক্রিয়াকে ঘটতে ও বিকশিত হতে দেওয়া। এবং পরিশেষে, আর ইহাই পরম পরিণতি, জ্ঞানে, শক্তিতে, চেতনায়, কর্মে, জীবনের আনন্দে দিব্যশক্তির সহিত তাদাত্ম্যে উন্নীত হওয়া; এমন এক স্ফুরন্ত গতিবৃত্তি অনুভব করা যা মর্ত্য কামনার এবং প্রাণিক সহজ সংস্কার ও সংবেগের এবং অলীক মানসিক স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাবাধীন নয়, বরং যা অমর আত্ম-রতি ও অনন্ত আত্মজ্ঞানের

---

* গীতার দর্শনের সব কথা নির্বিবাদে স্বীকার করা কর্মযোগের পক্ষে অপরিহার্য নয়। ইচ্ছা করলে আমরা তাকে দেখতে পারি মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির এক বিবরণ বলে যা যোগের ব্যবহারিক ভিত্তি হিসাবে প্রয়োজনীয় ও এ হিসাবে ইহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক এবং এক উচ্চ ও ব্যাপ্ত অনুভূতির সহিত ইহার পূর্ণ সঙ্গতি আছে। এই কারণে আমি ইহার কথা এখানে বলা ভাল মনে করেছি, তবে যথাসম্ভব আধুনিক চিন্তার ভাষায়, আর যা সব মনো-বিজ্ঞানের অন্তর্গত না হয়ে তত্ত্ব বিদ্যার অন্তর্গত সে সব বাদ দিয়েছি।

মধ্যে দীপ্তভাবে ভাবিত ও ব্যক্ত। কারণ দিব্য পরমাত্মা ও সনাতন পরমচিৎ-পুরুষের মাঝে প্রাকৃত মানুষের সচেতন অধীনতা ও নিমজ্জনের দ্বারাই এই ক্রিয়ার উৎপত্তি; এই পরম চিৎপুরুষই চিরদিন জগৎপ্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়ে তাকে চালনা করেন।

* * *

কিন্তু আত্ম-শিক্ষার কি কি কার্যকরী উপায়ের সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধি-লাভে সমর্থ ?

স্পষ্টতঃ আমাদের বাঞ্ছিত সিদ্ধির চাবিকাঠি হল—সকল অহমাত্মক কর্মের ও তাদের ভিত্তি যে অহমাত্মক চেতনা তার বিলোপসাধন। এবং যেহেতু কর্মমার্গে ক্রিয়াই সেই গ্রন্থি যা আমাদের প্রথম মোচন করা চাই, সেহেতু আমাদের চেষ্টা করতে হবে এই গ্রন্থি মোচন করতে সেইখানে যেখানে ইহার কেন্দ্রীয় বাঁধন অর্থাৎ কামনায় ও অহং-এ; কারণ তা না হলে আমরা কাটব বিক্ষিপ্ত সব দড়ি মাত্র, বন্ধনের আসল জায়গা নয়। এই অবিদ্যাময় ও বিভক্ত প্রকৃতির নিকট আমাদের অধীনতার দুটি গ্রন্থি এই—কামনা ও অহংবোধ আর এ দুটির মধ্যে কামনার স্বধাম হল বিভিন্ন ভাবাবেগে ও ইন্দ্রিয় সংবিতে ও সহজ সংস্কারে আর সেখানে থেকে ইহা প্রভাবান্বিত করে মনন ও সংকল্পকে; অবশ্য এই সব গতিবৃত্তির মধ্যেই অহং-বোধের বাস কিন্তু ইহা চিন্তাশীল মন ও তার সংকল্পের মধ্যেও তার গভীর শিকড় বিস্তার করে এবং সেখানেই সে হয়ে ওঠে পূর্ণ আত্ম-সচেতন। মোহাচ্ছন্নকারী ও জগৎ-জোড়া অবিদ্যার এই যে দুই তামসী শক্তি তাদের দীপ্ত ও বিলুপ্ত করাই আমাদের কর্তব্য।

ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কামনার নানারূপ, কিন্তু এসবের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী হল আমাদের কর্মফলের জন্য প্রাণিক আত্মার লালসা বা আকাঙ্ক্ষা। যে ফল আমরা আকাঙ্ক্ষা করি তা হতে পারে আন্তরসুখের পুরস্কার; কোন ভাবনা যা আমরা বেশী পছন্দ করি বা কোন সংকল্প যা আমরা পোষণ করেছি তারও সিদ্ধি তা হতে পারে অথবা তা হতে পারে বিভিন্ন অহংমাত্মক ভাবাবেগের তৃপ্তি আর না হয় আমাদের সর্বোচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষার সাফল্যের গর্ব। অথবা এই ফল হতে পারে কোন বাহ্য পুরস্কার, সম্পূর্ণ জড়ীয় কোন ক্ষতিপূরণ—ধন, পদ, সম্মান, বিজয়, সৌভাগ্য অথবা প্রাণগত বা দেহগত অন্য কামনার তৃপ্তি। কিন্তু সবই এক রকমের; অহন্তা যে সব প্রলোভনের সাহায্যে আমাদের ধরে রাখে এরা তা-ই। প্রভুত্বের বোধ ও স্বাধীনতার ভাবনার সাহায্যে এই সব তৃপ্তি সর্বদাই আমাদের ভুলিয়ে রাখে, অথচ আসলে যে অন্ধ কামনা জগৎ চালায় তারই কোন স্থূল বা সূক্ষ্ম, মহৎ বা নীচ রূপ আমাদের আবদ্ধ ক'রে তার পথে নিয়ে যায় অথবা আমাদের উপর আরূঢ় হয়ে চাবুক মেরে

তাড়না ক'রে। সেজন্য গীতায় ক্রিয়ার যে প্রথম বিধি নির্দিষ্ট করা হল তা এই যে কর্মফলের জন্য কামনা শূন্য হয়ে কর্তব্য কর্ম করা চাই, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম সাধন।

এই বিধি দেখতে সহজ কিন্তু একান্ত সরলতা ও মুক্তিপ্রদ সমগ্রতার ভাব নিয়ে ইহা পালন করা কত কঠিন! আমাদের বেশীর ভাগ কাজেই আমরা এই নীতি আদৌ অনুসরণ করলে তা করি খুবই সামান্য এবং যেখানে অনুসরণ করা হয়, সেখানেও প্রধানতঃ তা করা হয় কামনার সাধারণ নীতির বিপরীত টান হিসাবে এবং ঐ উৎপীড়ক সংবেগের চরম মাত্রা উপশমের জন্য। বড় জোর, আমরা আমাদের অহন্তাকে কিছু সংশোধিত ও সংযত করি যাতে আমাদের সুনীতিবোধে খুব বেশী আঘাত না লাগে ও অপরের পক্ষে তা অত্যধিক পীড়াদায়ক না হয়, আর তাতেই আমরা তুষ্ট থাকি। আর আমাদের এই আংশিক আত্ম-শিক্ষাকে আমরা নানা নাম ও রূপ দিই; কর্তব্য-বোধ, নীতির প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা, সহিষ্ণু দার্শনিকের তিতিক্ষা বা ধর্মভাবযুক্ত নতিস্বীকার, ভগবদ্-অভিপ্রায়ের নিকট শান্ত ও উল্লাসভরা প্রপত্তি—এই সবে আমরা নিজেদের অভ্যস্ত করি অনুশীলনের দ্বারা। কিন্তু গীতার অভিপ্রেত বিষয় এই সব নয়, যদিও স্বস্থানে এদের উপকারিতা আছে, ইহার লক্ষ্য এমন কিছু যা অনপেক্ষ ন্যূনতাহীন, আপোসহীন, এমন এক ভঙ্গি, এমন মনোভাব যাতে অন্তঃপুরুষের সমগ্র স্থিতি পরিবর্তিত হয়। মনের দ্বারা প্রাণিক সংবেগের সংযম তার বিধি নয়, তার বিধি—অমর চিৎ-পুরুষের দৃঢ় অচল প্রতিষ্ঠা।

সকল পরিণতিতে, সকল প্রতিক্রিয়ায়, সকল ঘটনাতেই মন ও হৃদয়ের একান্ত সমত্বই গীতাবিহিত মান। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, মান অপমান, যশ অপবাদ, জয় ও পরাজয়, সুখের ঘটনা দুঃখের ঘটনা—এসকলে শুধু অবিচলিত থাকা নয়, সে সব যদি আমাদের স্পর্শ না করে, ভাবাবেগে কোন চাঞ্চল্য, স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় কোন কম্পন, দৃষ্টিতে কোন দাগ না আসে প্রকৃতির কোন অংশের সাড়ায় কিছুমাত্র বিক্ষোভ বা স্পন্দন না দেখা দেয় তা হলেই আমরা গীতা-প্রদর্শিত পরমা মুক্তির অধিকারী হই; অন্যথায় নয়। কোন ক্ষুদ্রতম প্রতিক্রিয়া হলে প্রমাণ হবে যে শিক্ষা অপূর্ণ রয়েছে এবং আমাদের কোন অংশ অবিদ্যা ও বন্ধনকে তার বিধান ব'লে স্বীকার ক'রে এখনও পুরণো প্রকৃতি আঁকড়ে আছে। আমাদের আত্ম-জয় মাত্র আংশিক সিদ্ধ হয়েছে; আমাদের প্রকৃতি-ভূমির কোন বিস্তীর্ণ ভাগ জুড়ে বা কোন অংশে বা সামান্যতম স্থানে ইহা এখনও অপূর্ণ বা অসিদ্ধ র'য়েছে। আর অপূর্ণতার সেই ক্ষুদ্র নুড়িটি ধূলিসাৎ ক'রতে পারে যোগের সমগ্র সিদ্ধি।

সমভাবের সদৃশ কতকগুলি ভাব আছে কিন্তু গীতা যে গভীর ও বিশাল

আধ্যাত্মিক সমত্ব শিক্ষা দিয়েছে তা'র সঙ্গে এ সবের ভুল করা অনুচিত। নৈরাশ্যজনিত নতি স্বীকার একপ্রকার সমত্ব, গর্ব এক প্রকার সমত্ব, কাঠিন্য ও উদাসীনতা আর একপ্রকার সমত্ব, কিন্তু এ সকলেরই প্রকৃতি অহমাত্মক। সাধনার পথে এদের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাদের হয় বর্জন, নয় যথার্থ প্রশান্তিতে রূপান্তরিত ক'রতে হবে। এরও উচ্চ স্তরের সমত্ব হ'ল স্তৈায়িক দার্শনিকের তিতিক্ষার সমত্ব, ভক্তের নতি বা জ্ঞানীর অনাসক্তির সমত্ব, সংসারে বিমুখ ও তার কর্মে উদাসীন অন্তঃপুরুষের সমত্ব। কিন্তু এ সবও যথেষ্ট নয়, চিৎ-পুরুষের যথার্থ ও পরম স্বাধিষ্ঠিত ব্যাপ্ত সম একত্বের মধ্যে আমাদের প্রবেশের জন্য তারা হ'তে পারে পথের অগ্রভাগ বা বড় জোর তারা শুধু অন্তঃ-পুরুষের আত্মবিকাশের প্রারম্ভিক অবস্থা বা অপূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি।

কারণ ইহা নিশ্চিত যে কোন পূর্ববর্তী পর্যায় ছাড়াই একেবারে অত বৃহৎ পরিণতি লাভ সম্ভব নয়। জগতের বিভিন্ন আঘাতে আমাদের উপর-ভাসা মন হৃদয়, প্রাণ প্রবলভাবে বিচলিত হলেও প্রথম আমাদের শিখতে হবে সে সব আঘাত সহ্য করতে, তবে আমাদের সত্তার কেন্দ্রীয় অংশ যেন নির্লিপ্ত ও নীরব থাকে। সেখানে আমাদের জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর অবিচলিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমাদের কর্তব্য হল আমাদের প্রকৃতির বাহ্য কর্মপ্রণালী থেকে অন্তঃপুরুষকে বিচ্ছিন্ন করা যে পিছন থেকে সব কিছু দেখছে বা নির্লিপ্ত হয়ে অন্তরের গভীরে বিরাজিত। ইহার পর বিচ্ছিন্ন অন্তঃপুরুষের এই নিষ্ঠা ও স্থিরতাকে তার বিভিন্ন করণে প্রসারিত করে জ্যোতির্ময় কেন্দ্র থেকে অন্ধকারময় পরিধি পর্যন্ত শান্তি বিকিরণ ধীরে ধীরে সম্ভব হয়ে উঠবে। এই কাজের ধারায় আমরা সাময়িকভাবে অনেক ছোট ছোট অবস্থার সাহায্য নিতে পারি; কিছু তিতিক্ষা, কিছু জ্ঞানীর প্রশান্তি, কিছু ধর্মীয় উচ্ছ্বাস আমাদের লক্ষ্যের কিছু কাছাকাছি ধরনের দিকে যাবার সহায় হ'তে পারে, অথবা এমন কি আমাদের মানসিক প্রকৃতির কম দৃঢ় ও উন্নত অথচ উপকারী বিভিন্ন শক্তির সাহায্যও নিতে পারি। পরিশেষে এই সব হয় বর্জন, নয় রূপান্তরিত করতে হবে এবং তার স্থলে পেতে হবে এক সমগ্র সমত্ব, অন্তরে এক সিদ্ধ স্বাধিষ্ঠিত শান্তি আর এমন কি আমাদের পক্ষে সম্ভব হলে আমাদের সকল অঙ্গে এক সমগ্র অখণ্ডনীয় আত্মস্থিত ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ।

কিন্তু ইহার পর আমরা আদৌ কাজ করতে থাকব কেমন করে? কারণ সাধারণতঃ মানুষ কাজ করে তার কোন কামনা থাকে বলে, অথবা সে কোন মানসিক, প্রাণিক বা শারীরিক অভাব বা প্রয়োজন অনুভব করে বলে; দেহের প্রয়োজন, ধন, মান বা যশের লালসা, মন বা হৃদয়ের ব্যক্তিগত তৃপ্তির তৃষ্ণা অথবা ক্ষমতা বা সুখের লিপ্সা—এই সবের দ্বারা সে চালিত হয়। অথবা

না হয় কোন নৈতিক প্রয়োজন বোধ কিংবা অন্ততঃ নিজের ভাবনা বা নিজের আদর্শ বা নিজের সংকল্প বা নিজের দল, নিজের দেশ বা নিজের দেবতাদের জগতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন বা কামনা তাকে পেয়ে বসে আর তাকে ঘুরিয়ে বেড়ায়। যদি এই সব কামনার কোনটিকেই বা অন্য কোন কামনাকে অমাদের ক্রিয়ার উদ্দীপক না করা হয় তা হলে মনে হয় যেন সকল প্রবৃত্তি বা প্রবর্তক শক্তি অপসারিত হয়েছে এবং সেহেতু ক্রিয়ারও অবসান অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে গীতার উত্তর পাওয়া যাবে দিব্যজীবন সম্বন্ধে তার তৃতীয় পরম রহস্যে। সকল কর্ম করা চাই উত্তরোত্তর ভগবদ্‌-অভিমুখী চেতনায় ও অবশেষে ভগবদ-অধিকৃত চেতনায়; আমাদের সকল কর্ম হবে ভগবানের নিকট যজ্ঞ; এবং পরিশেষে পরম একের নিকট আমাদের সকল সত্তা, মন, সংকল্প, হৃদয়, ইন্দ্রিয়বোধ, প্রাণ ও দেহের সমর্পণের ফলে ভগবদ্‌-প্রেম ও ভগবদ্‌-সেবাই হবে আমাদের একমাত্র প্রবর্তক শক্তি। কর্মের প্রবর্তক শক্তি ও তার মূল প্রকৃতির রূপান্তর সাধনই গীতার মূল তত্ত্ব; কর্ম, প্রেম ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ের ভিত্তি ইহাই। পরিশেষে কামনা নয়, সচেতনভাবে অনুভূত সনাতনের সংকল্পই থাকে আমাদের ক্রিয়ার একমাত্র চালক রূপে, ইহার আরম্ভের একমাত্র উৎস রূপে।'

সমত্ব, আমাদের কর্মফলের কামনা ত্যাগ এবং আমাদের প্রকৃতির ও সকল প্রকৃতির পরমেশ্বরের নিকট যজ্ঞরূপে ক্রিয়ানুষ্ঠান—এই তিনটিই গীতার কর্মযোগ পন্থায় ভগবানের দিকে যাবার প্রাথমিক পথ।

চতুর্থ অধ্যায়

যজ্ঞ, ত্রয়াত্মক মার্গ ও যজ্ঞেশ্বর

জগতের আদিতে যে সাধারণ দিব্যক্রিয়া জগতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বিশ্বের সংহতির প্রতীক হিসাবে তা যজ্ঞের বিধান। এই বিধানের আকর্ষণেই নেমে আসে এক দিব্যত্বসাধিকা উদ্ধারিনী শক্তি,—অহমাত্মক ও আত্ম-বিভক্ত সৃষ্টির সকল ভ্রান্তি সীমিত ও সংশোধিত ও ক্রমশঃ বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে। এই অবতরণ, পুরুষের এই যজ্ঞ, শক্তি ও জড়কে অনুস্যূত ও দীপ্ত করার জন্য তাদের নিকট দিব্য পুরুষের বশ্যতা স্বীকার—ইহাই অচিতি ও অবিদ্যার এই জগতের মুক্তির বীজ। কারণ, গীতার কথায় "প্রজাপতি এই সব জীব সৃষ্টি করেছিলেন যজ্ঞকে তাদের সাথী করে"। অহংএর পক্ষে এই যজ্ঞের বিধান স্বীকার করার অর্থ তার কার্যতঃ এই মেনে নেওয়া যে সে জগতে একলা নয় বা প্রধান নয়। ইহা তার এই স্বীকৃতি যে এই বহু খণ্ডিত জীবনেও তাকে ছাড়িয়ে ও তার পশ্চাতে এমন কিছু বর্তমান যা তার নিজের অহমাত্মক ব্যক্তি নয়, যা মহত্তর ও পূর্ণতর কিছু, এক দিব্যতর সর্ব যা তার কাছে দাবী করে আনুগত্য ও সেবা। বস্তুতঃ সার্বিক জগৎ-শক্তি যজ্ঞ আরোপিত করে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে জোর করে আদায় করে; যারা সজ্ঞানে এই বিধান স্বীকার করে না তাদের কাছ থেকেও সে ইহা আদায় করে, —অবশ্যম্ভাবী রূপে কারণ ইহা বিষয়সমূহের স্বাভাবিক প্রকৃতি। আমাদের অবিদ্যা বা জীবন সম্বন্ধে আমাদের মিথ্যা অহমাত্মক দৃষ্টি প্রকৃতির এই শাশ্বত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত সত্যের কোন ব্যতিক্রম করতে অসমর্থ। কেননা প্রকৃতির মধ্যে সত্য এই যে,—এই অহং যা নিজেকে মনে করে এক পৃথক স্বাধীন সত্তা এবং নিজেরই জন্য বাঁচার দাবী করে সে স্বাধীনও নয়, পৃথকও নয় আর তা হতেও পারে না, আবার এমন কি ইচ্ছা করলেও সে শুধু নিজেকে নিয়ে থাকতে পারে না, বরং সকল কিছুই এক নিগূঢ় একত্বের সূত্রে গাঁথা। প্রতি সত্তা বাধ্য হয়ে তার ভাণ্ডার থেকে অবিরত বাহিরে দিয়ে যাচ্ছে; প্রকৃতি থেকে তার মন যা পায় তা থেকে অথবা তার প্রাণ ও দেহের বিভব ও আহরণ ও সম্পত্তি থেকে স্রোত বয়ে যায় তার চারিদিককার সব কিছুর মধ্যে। আবার সর্বদাই সে তার পরিবেশ থেকে কিছু পায় তার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত দানের বিনিময়ে। কারণ কেবলমাত্র এই আদান প্রদানের দ্বারাই সে তার নিজের বিকাশসাধন করে আবার সেই সঙ্গে বিষয়সমূহের সমষ্টিকেও সাহায্য করে।

অবশেষে আমরা সচেতনভাবে যজ্ঞ করতে শিখি, যদিও প্রথম প্রথম তা হয় ধীরে ধীরে ও আংশিকভাবে; এমন কি শেষে আমরা আনন্দ পাই নিজেদের এবং যা কিছু নিজেদের বলে মনে করি সে সবও প্রেম ও ভক্তিভরে সমর্পণ করতে তৎ-এর কাছে যা সেই মুহূর্তে মনে হয় আমাদের ছাড়া অন্য কিছু এবং বাস্তবিকই আমাদের সব সীমিত ব্যক্তিভাবনা থেকে অন্য কিছু। তখন যজ্ঞকে ও আমাদের যজ্ঞের বিনিময়ে দিব্য প্রতিদানকে আমরা সানন্দে স্বীকার করি আমাদের চরম সিদ্ধিলাভের উপায় হিসাবে; কারণ এখন জানতে পারি যে শাশ্বত উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পথ ইহাই।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যজ্ঞ করা হয় অচেতনভাবে, অহমাত্মকভাবে এবং মহতী জগৎ-ক্রিয়ার অর্থ না জেনে বা স্বীকার না করে। অধিকাংশ পার্থিব জীবই তা করে এইভাবে, আর এইভাবে করা হয় বলে ব্যষ্টি পায় শুধু স্বাভাবিক অবশ্যম্ভাবী লাভের যান্ত্রিক ন্যূনতম মাত্রা এবং তা দিয়ে তার যে অগ্রগতি সাধিত হয় তা-ও মন্থর ও যন্ত্রণাপূর্ণ এবং অহং-এর ক্ষুদ্রতা ও দুঃখভোগের দ্বারা সীমিত ও প্রপীড়িত। যখন হৃদয়, সংকল্প ও জ্ঞানের মন বিধানের সহযোগী হয়ে সানন্দে তা অনুসরণ করে, কেবল তখনই আসতে পারে দিব্যযজ্ঞের গভীর আনন্দ ও সুখময় সফলতা। বিধান সম্বন্ধে মনের জ্ঞান ও তাতে হৃদয়ের আনন্দের পরিণতিতে এই অনুভূতি আসে যে আমরা দান করি তাঁর কাছে যিনি আমাদের নিজেদেরই পরমাত্মা ও পরম চিৎপুরুষ এবং সকলের এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ও পরম চিৎ-পুরুষ। আর এমন কি যখন আমাদের আত্ম-নিবেদন অপর মানুষের কাছে বা নিম্নতর শক্তি ও তত্ত্বের কাছে, পরতমের কাছে নয়, তখনও সে নিবেদন হয় পরমাত্মা ও পরম পুরুষের কাছে। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "পত্নী যে আমাদের কাছে প্রিয় তা পত্নীর জন্য নয়, আত্মার জন্য।" ব্যষ্টিআত্মার হীন অর্থে এই উক্তি অহমাত্মক প্রেমের রঙীন ও উদ্দাম-ভাবযুক্ত বাহ্য অঙ্গীকারের পিছনের রূঢ় সত্য; কিন্তু তার উচ্চতর অর্থে ইহা সেই প্রেমেরও অন্তর তাৎপর্য যা অহমাত্মক নয়, যা দিব্য। প্রাথমিক অহন্তা ও তার বিভক্ত প্রমাদ যে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সকল প্রকৃত প্রেম ও সকল যজ্ঞ স্বরূপতঃ তার প্রমাণ, এদের মাধ্যমেই প্রকৃতি চেষ্টা করে আবশ্যকীয় প্রাথমিক খণ্ডতা থেকে পুনর্লব্ধ একত্বের দিকে যাবার জন্য। বিভিন্ন জীবের মধ্যে সকল ঐক্য স্বরূপতঃ আত্মা-প্রাপ্তি, যা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি তার সহিত সম্মিলন এবং অপরের মধ্যে নিজ আত্মার আবিষ্কার।

কিন্তু একমাত্র দিব্য প্রেম ও ঐক্যই তা অধিগত করতে পারে আলোকের মধ্যে যা ঐ সবের মানুষীরূপ অন্বেষণ করে অন্ধকারের মধ্যে। কেননা জীবনের সাধারণ প্রয়োজনে মিলিত দেহস্থ কোষাণুগুলির মধ্যে যে সহযোগ

ও সমাবেশ দেখা যায়, প্রকৃত ঐক্য শুধু সেইরকম নয়; এমন কি ইহা ভাবগত অবধারণ, সমবেদনা, সংহতি বা একত্র সান্নিধ্যও নয়। প্রকৃতির বিভাজনের ফলে যে সব আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাদের সহিত আমরা প্রকৃত মিলিত হই কেবল তখনই যখন আমরা বিভাজন লোপ করে নিজেদের দেখতে পাই তার মধ্যে যা আমাদের মনে হ'ত আমরা নই। সহযোগ হল শুধু এক প্রাণিক ও শারীরিক ঐক্য; এখানে যজ্ঞের অর্থ পরস্পরের মধ্যে সাহায্য ও সুবিধাদান। সামীপ্য, সমবেদনা, সংহতি দ্বারা এক মানসিক, নৈতিক ও ভাবগত ঐক্যের সৃষ্টি হয়; তাদের যজ্ঞের অর্থ পরস্পরের পালন ও তুষ্টি। কিন্তু প্রকৃত ঐক্য আধ্যাত্মিক, তার যজ্ঞ পারস্পরিক আত্মদান, আমাদের আন্তর ধাতুর সংমিশ্রণ। এই সম্পূর্ণ ও অকুণ্ঠ আত্মদানই প্রকৃতির মধ্যে যজ্ঞবিধানের যাত্রার পরিণতি; ইহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় যজ্ঞের হোতা ও উদ্দিষ্টের মধ্যে একই সাধারণ আত্মার চেতনা। এমন কি যখন মানুষী প্রেম ও ভক্তি দিব্য হবার প্রয়াস করে তখন তারও পরাকাষ্ঠা যজ্ঞের এই পরিণতি; কারণ সেখানেও প্রেমের উত্তুংগ শিখর প্রবেশ করে সম্পূর্ণ পারস্পরিক আত্মদানের স্বর্গের মধ্যে, ইহার শীর্ষ, উল্লাসভরা মিলনের ফলে দুই পুরুষের এক হয়ে যাওয়া।

জগদ্‌ব্যাপী বিধানের এই গভীরতব ভাবনাই কর্ম সম্বন্ধে গীতার শিক্ষার মর্মকথা; যজ্ঞের দ্বারা পরতমের সহিত অধ্যাত্ম মিলন, সনাতনের নিকট অকুণ্ঠ আত্মদান—ইহাই গীতার শিক্ষার সার। যজ্ঞ সম্বন্ধে লৌকিক ধারণা এই যে ইহা যন্ত্রণাপূর্ণ আত্ম-বলিদান, কঠোর আত্মনিগ্রহ, দুরূহ আত্মলোপের ক্রিয়া; এমন কি এই রকম যজ্ঞে নিজের অংগহানি ও নিপীড়ন পর্যন্ত করা হতে পারে। মানুষের প্রাকৃত আত্মাকে অতিক্রম করার জন্য তার কঠোর সাধনায় এই সব সাময়িক ভাবে প্রয়োজনীয় হতে পারে; যদি তার প্রকৃতিতে অহন্তা উগ্র ও দুর্দম হয় তা হলে তা দমন করার জন্য প্রবল আত্মনিগ্রহ ও উগ্রতার প্রত্যাঘাত কখন কখন আবশ্যক হয়। কিন্তু গীতার উপদেশ নিজের উপর অতিরিক্ত উৎপীড়ন না করা; কারণ ভিতরেব আত্মা প্রকৃত পক্ষে বিকাশমান পরম দেবতা, ইনি কৃষ্ণ, ইনি ভগবান। জগতের অসুররা ইহার উপর যেমন উপদ্রব ও উৎপীড়ন করে তেমন উপদ্রব ও উৎপীড়ন ইহার উপর করা উচিত নয়, দরকার তার উত্তরোত্তর পালন, পুষ্টিসাধন এবং দিব্য জ্যোতি ও ক্ষমতা ও আনন্দ ও ব্যাপ্তির দিকে উন্মীলন। নিজের আত্মাকে নয়, চিৎ-পুরুষের আন্তর শত্রু বাহিনীকেই আমাদের দমন, নির্বাসন ও চিৎ-পুরুষের বৃদ্ধির বেদীমূলে বলিদান করা চাই; এই যে সব শত্রু, এদের নাম কামনা, ক্রোধ, অসমত্ব, লোভ, বাহ্য সুখ দুঃখের প্রতি আসক্তি; এরাই সেই সব দস্যুদানবের দল যারা মানুষকে জোর করে অধিকার ক'রে

অন্তঃপুরুষের প্রমাদ ও দুঃখ যন্ত্রণা সৃষ্টি করে; এই সবকেই নির্দয়ভাবে উচ্ছেদ করা যায়। ভাবতে হবে যে ইহারা আমাদের নিজেদের অংশ নয়, ইহারা অনধিকার প্রবেশকারী, ইহাদের কাজ আমাদের আত্মার আসল ও দিব্যতর প্রকৃতিকে বিকৃত করা; "বলি" কথাটির যে কঠোর অর্থ, সেই অর্থে এদের বলি দেওয়া চাই—যাবার সময় তারা সাধকের চেতনায় প্রতিফলনের দ্বারা যত যন্ত্রণাই ফেলে যাক না কেন।

কিন্তু যজ্ঞের সত্যকার সার আত্ম-বলি নয়, ইহা আত্ম-দান; ইহার উদ্দেশ্য আত্ম-লোপ নয়, আত্ম-সর্থকতা; ইহার প্রণালী আত্ম-নিগ্রহ নয়, বরং মহত্তর জীবন, নিজের অঙ্গহানি নয়, বরং আমাদের প্রাকৃত মানুষী অংশগুলিকে দিব্য অঙ্গে রূপান্তরসাধন, আত্মনিপীড়ন নয়, বরং অল্প তৃপ্তি থেকে মহত্তর আনন্দের মধ্যে যাত্রা। গোড়ায় শুধু একটি জিনিষ আছে যা উপরভাসা প্রকৃতির কাঁচা বা পঙ্কিল অংশের পক্ষে কণ্টকর; অপূর্ণ অহং-এর নিমজ্জনের জন্য যে অপরিহার্য শিক্ষা দাবী করা হয়, যে প্রত্যাখান আবশ্যক —ইহা তা-ই; কিন্তু তার বিনিময়ে পেতে পারা যায় দ্রুত ও প্রভূত ক্ষতিপূরণ —অপরের মধ্যে, সকল বিষয়ে, বিশ্বের একত্বে, বিশ্বাতীত আত্মা ও চিৎ-পুরুষের স্বাধীনতায়, ভগবদ্-স্পর্শের উল্লাসে যথার্থ মহত্তর বা চরম সম্পূর্ণতার সন্ধান। আমাদের যজ্ঞ এমন দান নয় অপর পক্ষ থেকে যার কোন প্রতিদান বা ফলপ্রদ গ্রহণ নেই; একদিকে দেহগত অন্তঃপুরুষ ও আমাদের মধ্যে সচেতন প্রকৃতি এবং অন্যদিকে সনাতন পরম চিৎ-পুরুষ, এই উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদান ইহা। কারণ যদিও কোন প্রতিদান দাবী করা হয় না, কিন্তু তবু আমাদের গভীর অন্তরে এই জ্ঞান থাকে যে এক পরমাশ্চর্য প্রতিদান অবশ্যম্ভাবী। অন্তঃপুরুষ জানে যে সে বৃথাই ভগবানের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে না; কিছু দাবী না করেই সে পায় দিব্য শক্তির ও সান্নিধ্যের অনন্ত সম্পদ।

পরিশেষে, বিবেচনা করতে হবে যজ্ঞগ্রহীতার কথা ও যজ্ঞের প্রণালীর কথা। যজ্ঞ নিবেদন করা যেতে পারে অপরের উদ্দেশে, বা বিভিন্ন দিব্য শক্তির উদ্দেশে; ইহা নিবেদিত হতে পারে বিশ্বব্যাপী সর্বের নিকট বা বিশ্বাতীত পরাৎপরের নিকট। পূজার আকারও নানাবিধ হতে পারে; একটি পত্র বা পুষ্প বা এক ঘটি জল বা এবং একমুঠি অন্ন বা একখানি রুটির নিবেদন থেকে আরম্ভ করে তা হতে পারে আমাদের যা কিছু আছে সে সবের উৎসর্গ, আমরা যা কিছু সে সবের সমর্পণ। গ্রহীতা যেই হোক, অর্ঘ্য যাই হোক আবার এমন কি অব্যবহিত গ্রহীতা অর্ঘ্য প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা করলেও, সে অর্ঘ্য গ্রহণ ও স্বীকার করেন পরাৎপর, যিনি সকল কিছুর মধ্যে সনাতন। কারণ পরাৎপর বিশ্বাতীত হয়েও এখানেও, যতই প্রচ্ছন্নভাবে হোক, বিরাজিত

আমাদের মধ্যে, জগতের মধ্যে, ইহার সকল ঘটনার মধ্যে। সেখানে তিনি আছেন আমাদের সকল কর্মের সর্বজ্ঞ দ্রষ্টা এবং গ্রহীতা ও তাদের গূঢ় অধীশ্বর রূপে। আমাদের সকল ক্রিয়া, সকল প্রচেষ্টা, এমন কি আমাদের পাপ ও পদস্খলন ও কষ্ট ভোগ ও সংগ্রাম তাদের শেষ পরিণতিতে নিয়ন্ত্রিত হয় পরম একের দ্বারাই, আর একথা হয় আমরা অস্পষ্ট ভাবে বা সচেতন ভাবে জানতে পারি ও দেখতে পারি, অথবা তা হয় আমাদের অজ্ঞাতে ও ছদ্মবেশে। তাঁর অগণিত রূপের মাঝে তাঁর উদ্দেশেই অর্ঘ্যের আয়োজন এবং সে সবের মাধ্যমে অর্ঘ্য নিবেদিত হয় সেই একক সর্বব্যাপীর নিকট। যে আকারে ও যে মনোভাবে আমরা তাঁর দিকে অগ্রসর হই, তিনি যজ্ঞ গ্রহণ করেন সেই আকারে ও সেই মনোভাবে।

আবার কর্মযজ্ঞের ফলও বিভিন্ন হয় কর্ম অনুযায়ী, কর্মের অভিপ্রায় অনুযায়ী এবং অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যে মনোভাব আছে তদনুযায়ী। কিন্তু অপর সকল যজ্ঞই আংশিক, অহমাত্মক, মিশ্র, ঐহিক, অপূর্ণ—এমন কি যা সব নিবেদিত হয় সর্বশ্রেষ্ঠ সব শক্তি ও নীতির উদ্দেশে সে সবও ঐ প্রকারেরঃ এ সব যজ্ঞের ফলও আংশিক, সীমিত, ঐহিক, প্রতিক্রিয়ায় মিশ্র, আর শুধু ক্ষুদ্র বা মধ্যবর্তী উদ্দেশ্যের পক্ষে কার্যকরী। একমাত্র সম্পূর্ণ গ্রহণীয় যজ্ঞ হল চরম ও সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ আত্মদান—ইহা সেই সমর্পণ যা করা হয় মুখোমুখি, ভক্তি ও জ্ঞানের সহিত, স্বচ্ছন্দে ও অকুণ্ঠ ভাবে সেই পরম একের কাছে যিনি এক সাথে আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মা, পরিবেষ্টন-কারী উপাদানস্বরূপ সর্ব, বর্তমান বা যে কোন অভিব্যক্তির অতীত পরম সদ্-বস্তু এবং যিনি নিগূঢ়ভাবে এই সব কিছু একত্রে, সর্বত্র প্রচ্ছন্ন, বিশ্বগত অতিস্থিত। কারণ যে অন্তঃ-পুরুষ তাঁর কাছে পুরোপুরি বিলিয়ে দেয়, ভগবানও তাঁর কাছে নিজেকে ধরা দেন পুরোপুরি। যে তার সমগ্র প্রকৃতিকে উৎসর্গ করে, একমাত্র সে-ই পায় পরমাত্মাকে। সর্বময় ভগবানকে সর্বত্র ভোগ করে কেবল সে-ই যে সব কিছু দিতে পারে। একমাত্র পরম আত্মোৎসর্গই পরাৎপর লাভের উপায়। আমরা যা সব, যজ্ঞের দ্বারা সেই সবের ঊর্ধ্বায়ন-বলেই আমরা সর্বোত্তমকে মূর্ত করে এখানে বাস করতে সমর্থ হই বিশ্বাতীত চিৎ-পুরুষের বিশ্বগত চেতনার মধ্যে।

* * *

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের কাছে এই দাবী করা হয় যে আমরা যেন আমাদের সমগ্র জীবনকে পরিণত করি এক সচেতন যজ্ঞে। আমাদের সত্তার প্রতি মুহূর্ত ও প্রতি গতিবৃত্তিকে পরিণত করতে হবে সনাতনের নিকট এক নিরবিচ্ছিন্ন ও দৃঢ়নিষ্ঠ আত্মদানে। আমাদের সকল ক্রিয়া—যেমন বৃহত্তম, অতি অসামান্য ও মহত্তম ক্রিয়া তেমনই ক্ষুদ্রতম ও অতি সাধারণ ও তুচ্ছতম

ক্রিয়া—সম্পাদন করা চাই উৎসর্গীকৃত কর্মরূপে। আমাদের অতীত ও আমাদের অহং অপেক্ষা মহত্তর এক পরম কিছুর নিকট নিবেদিত আন্তর ও বাহ্য গতিবৃত্তির একক চেতনার মধ্যে আমাদের ব্যষ্টিভাবাপন্ন প্রকৃতিকে বাস করতে হবে। আমাদের দানের বস্তু কি এবং কাকে ইহা দেওয়া হচ্ছে—এ সবে কিছু যায় আসে না। দেবার সময় এই চেতনা থাকা চাই যে আমরা তা দিচ্ছি সর্বভূতস্থিত অদ্বিতীয় ভাগবত পুরুষকে। আমাদের সামান্যতম বা অতি স্থূল জড় ক্রিয়াও এই ঊর্ধ্বায়িত প্রকারের হওয়া চাই; যখন আমরা আহার করি, তখন আমাদের সচেতন হ'তে হবে যে আমরা খাদ্য দিচ্ছি আমাদের অন্তঃস্থ পরম উপস্থিতিকে; একে হতে হবে দেবালয়ে পবিত্র নৈবেদ্য, ইহা শুধু দৈহিক প্রয়োজন বা আত্ম-তৃপ্তি এই বোধ আমাদের লুপ্ত হওয়া চাই। নিজেদের জন্য, অপরের জন্য বা জাতির জন্য যে কোন মহৎ কর্ম, উচ্চ সংযমশিক্ষা, দুরূহ বা মহান উদ্যম করা হোক না কেন, সে সব বিষয়ে শুধু জাতির, নিজেদের বা অপরের ভাবনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা আর সম্ভব হবে না। যে কাজ আমরা করছি তা কর্মযজ্ঞরূপে সচেতন ভাবে নিবেদন করা চাই —এদের কাছে নয়, তবে এদের মাধ্যমে বা সরাসরি সেই এক পরম দেবতার কাছে। যে দিব্য অন্তরাধিষ্ঠাতা এই সব মূর্তির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন তাঁকে আর আচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা চলবে না, তাঁর নিত্য উপস্থিতি দরকার আমাদের অন্তঃপুরুষ, আমাদের মন, আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট। আমাদের কর্মের ধারা ও পরিণতি তুলে দিতে হবে সেই পরম একেরই হাতে এই বোধ নিয়ে যে সেই পরম উপস্থিতিই অনন্ত ও সর্বোত্তম ও একমাত্র তাঁর দ্বারাই আমাদের শ্রম, আমাদের আস্পৃহা সম্ভব। কারণ সকল কিছু ঘটে তাঁরই সত্তায়; তাঁরই জন্য প্রকৃতি সকল শ্রম ও আস্পৃহা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিবেদন করে তাঁর বেদীমূলে। এমন কি যে বিষয়ে প্রকৃতি অতি স্পষ্টতঃ নিজেই কর্মী আর আমরা তার কর্ম প্রণালীর শুধু দ্রষ্টা ও ইহার আধার ও অবলম্বন সে সবেও থাকা উচিত কর্ম ও তার দিব্য অধীশ্বরের সেই সতত স্মৃতি ও সনির্বন্ধ চেতনা। আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে, আমাদের হৃদয়ের স্পন্দনকে পর্যন্ত বিশ্ব ছন্দ রূপে আমাদের মধ্যে সচেতন করা যায় এবং তা-ই করা চাই।

ইহা সুস্পষ্ট যে এই প্রকার ভাবনা এবং ইহার ফলপ্রসূ অনুশীলনের তিনটি ফল অবশ্যম্ভাবী, আর আমাদের অধ্যাত্ম আদর্শের পক্ষে ইহাদের গুরুত্ব সমধিক। স্পষ্টতঃ প্রথম ফল এই যে এরূপ সাধনার প্রারম্ভে ভক্তি না থাকলেও, ইহা সোজাসুজি ও অবশ্যম্ভাবীরূপ নিয়ে যায় সম্ভবপর সর্বোত্তম ভক্তির দিকে; কারণ স্বভাবতঃই ইহার গভীরতা বৃদ্ধি পেয়ে ইহা সম্ভাব্য পূর্ণতম অনুরাগে ও গভীরতম ভাগবদ্-প্রেমে পরিণত হতে বাধ্য।

ইহার সহিত জড়িত থাকে সর্ব বিষয়ে ভাগবদ্-উপস্থিতির উপচীয়মান বোধ, আমাদের সকল মননে, সংকল্পে ও ক্রিয়ায় এবং আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভগবানের সহিত উত্তরোত্তর নিবিড় সংযোগ, ভগবানের নিকট আমাদের সমগ্র সত্তার ক্রম-বর্ধমান সক্রিয় উৎসর্গ। কর্মযোগের এই সব অনুষঙ্গ পূর্ণ ও কেবলা ভক্তিরও সার। যে সাধক সাধনার দ্বারা এই সবকে জীবন্ত করে সে নিজের মধ্যে অবিরত তৈরী করে স্বরূপ-ভক্তিভাবের স্থির, সক্রিয় ও কার্যকরী প্রতিমূর্তি; আর ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আসে এই সেবার উদ্দিষ্ট সর্বোত্তমের প্রতি নিবিড়তম পূজা-নিবেদন। যে দিব্য উপস্থিতির সহিত উৎসর্গীকৃত কর্মী সদা-বর্ধমান অন্তরঙ্গ সামীপ্যবোধ করে তাঁর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় তার তন্ময় প্রেম। আর এই প্রেমের সাথে আরো জন্মায় বা তার মধ্যেই থাকে ভগবানের অধিষ্ঠান এই যে সব বিভিন্ন সত্তা, প্রাণী ও জীব তাদের সবার প্রতি এক বিশ্বজনীন প্রেম; এই প্রেম ভেদগত স্বল্পস্থায়ী, অস্থির, গ্রহিষ্ণু ভাবাবেগ নয়, ইহা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত স্বার্থশূন্য প্রেম যা একত্বের গভীরতর স্পন্দন। সাধকের ভক্তি ও সেবার যে এক পরম বিষয় তাঁকেই সে দেখতে শুরু করে সকলের মধ্যে। যজ্ঞের এই পথ দিয়ে কর্মের মোড় ফেরে ভক্তিমার্গের সহিত মেশবার জন্য; হৃদয়ের কামনা যত আকাঙ্খা করতে পারে, বা মনের মনোবেগ যত কল্পনা করতে সক্ষম তত সম্পূর্ণ, তত তন্ময়, তত অখণ্ড ভক্তি এই কর্মমার্গ নিজেই হতে পারে।

ইহার পর, এই যোগানুশীলনের জন্য দরকার অন্তরে একমাত্র কেন্দ্রীয় মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের সতত স্মরণ এবং তার সাথে এই স্মরণকে তীব্র করার উদ্দেশ্যে কর্মের মধ্যে তার সতত সক্রিয় বহিঃপ্রয়োগ। সকলের মধ্যেই এক পরমাত্মা, এক ভগবানই সব কিছু, সব কিছুই ভগবানের মধ্যে, সব কিছুই ভগবান, বিশ্বে অপর কিছু নেই—এই ভাবনা বা বিশ্বাসই কর্মীর চেতনার সমগ্র পটভূমিকা, যতদিন না ইহা হয়ে উঠে তার চেতনার সমগ্র উপাদান। এই প্রকারের স্মৃতি ও আত্ম-স্ফুরন্ত ধ্যানের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—এবং শেষে তা হয়ও—যাকে আমরা অত প্রবলভাবে স্মরণ করি বা যাকে আমরা অত সতত ধ্যান করি তার গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন দর্শন এবং জীবন্ত ও সর্বগ্রাহী চেতনা। কারণ এই ভাবে বাধ্য হয়ে আমাদের প্রতিমুহূর্তে সতত তাঁকেই লক্ষ্য করতে হয় যিনি সকল সত্তা ও সংকল্প ও ক্রিয়ার পরম উৎস; এবং সকল বিশেষ রূপ ও অবভাসকে আমরা যেমন আলিঙ্গন করি তেমন এক সাথে সে সব অতিক্রমও করি পরম 'তৎ'-এর মধ্যে যা থেকে তাদের উৎপত্তি এবং যা তাদের ধারণ করে। সর্বত্র বিশ্বাত্মক পুরুষের সব কর্ম জীবন্ত ও প্রাণবন্ত ভাবে না দেখা পর্যন্ত এই পথের অবসান নেই, আর সে দেখা স্থূলদৃষ্টির মতই বাস্তব, তবে তার পদ্ধতিতে। ইহার শীর্ষস্থানের উপর ইহার উদয়ন হয়

অতিমানসের, বিশ্বাতীতের সম্মুখে নিত্য অধিষ্ঠান ও মনন ও সংকল্প ও ক্রিয়ার মধ্যে। আমরা যা-কিছু দেখি ও শুনি, যা-কিছু স্পর্শ করি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানি, যে সব সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই—এ সবকেই আমাদের জানতে ও অনুভব করতে হবে আমাদের পূজা ও সেবার পাত্র বলে; সব কিছুকে পরিণত করতে হবে ভগবানের মূর্তিতে, অনুভব করতে হবে তার দেবতার অধিষ্ঠান রূপে, শাশ্বত সর্বব্যাপিতার দ্বারা সমাবৃত বলে। ইহার সমাপ্তিতে—যদি-না তার অনেক আগেই তা হয়ে থাকে—দিব্য উপস্থিতি, সংকল্প ও শক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগে এই কর্মমার্গ পরিণত হয় জ্ঞানের মার্গে; আর তুচ্ছ প্রাণী-বুদ্ধি যা রচনা করতে পারে বা ধী-শক্তির অন্বেষণ যা আবিষ্কার করতে সমর্থ তার চেয়ে আরো সম্পূর্ণ ও অখণ্ড এই জ্ঞান।

পরিশেষে, এই যজ্ঞ-যোগের অনুশীলনের ফলে আমরা বাধ্য হয়ে অহন্তার সকল আন্তর আশ্রয়কে আমাদের মন ও সংকল্প ও ক্রিয়া থেকে দূরে নিক্ষেপ করে তাদের বর্জন করি এবং আমাদের প্রকৃতি থেকে উচ্ছেদ করি অহন্তার বীজ, ইহার উপস্থিতি, ইহার প্রভাব। যা কিছু করা সে সব করা চাই ভগবানের জন্য, ভগবানেরই দিকে সবকিছুর মোড় ফেরাতে হবে। পৃথক সত্তা হিসাবে নিজেদের জন্য কিছু করতে যাওয়া চলবে না; আবার অপরের জন্যও, তা তারা প্রতিবেশী, বন্ধু, পরিজন, দেশ, মানবজাতি বা অন্য জীব হলেও, শুধু তারা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও মনন ও সমবেদনার সহিত সম্পর্কিত বলে বা অন্যদের চেয়ে তাদের কল্যাণের জন্য অহং-এর আগ্রহ বেশী বলে কিছু করা চলবে না। কাজের ও দেখার এই রীতিতে, সকল কর্ম সকল জীবন পরিণত হয় শুধু ভগবানেরই প্রাত্যহিক স্ফুরন্ত অর্চনা ও সেবায়, আর তা হয় তাঁরই নিজের বিরাট বিশ্বসত্তার নিঃসীম মন্দিরে। জীবন উত্তরোত্তর হয়ে ওঠে সনাতন অতিস্থিতির নিকট জীবের অন্তঃস্থ সনাতনের সতত আত্ম-নিবেদিত যজ্ঞ। এই যজ্ঞ নিবেদিত হয় সনাতন বিরাট পুরুষের ক্ষেত্রের ব্যাপ্ত যজ্ঞ ভূমিতে, আর যে শক্তি তা নিবেদন করে তা-ও সনাতনী শক্তি, সর্বব্যাপিনী মাতা। সুতরাং কর্মের দ্বারা এবং কর্ম করার ভাব ও জ্ঞানের দ্বারা মিলন ও নিবিড় সম্পর্কের এই যে পথ তা তেমনই সম্পূর্ণ ও অখণ্ড যেমন আমাদের ভগবদ্-অভিমুখী সংকল্প আশা করতে বা আমাদের অন্তঃপুরুষের শক্তি সাধন করতে সক্ষম।

কর্মমার্গের সকল শক্তিই এই যজ্ঞ-যোগের আছে অখণ্ড ও পরম ভাবে, কিন্তু দিব্য পরমাত্মার নিকট ইহার যজ্ঞ ও আত্ম-দানের বিধানের দরুন ইহার সাথে এক দিকে থাকে ভক্তিমার্গের সমগ্র শক্তি এবং অন্যদিকে থাকে জ্ঞান-মার্গের সমগ্র শক্তি। পরিশেষে এই তিন দিব্য শক্তির সব গুলিই একত্র

কাজ করে, পরস্পরের সহিত সম্মিলিত ও যুক্ত হয়ে, পরস্পরের দ্বারা পরিপূর্ণ ও সিদ্ধ হয়ে।

* * *

ভগবান, সনাতন আমাদের কর্মযজ্ঞের প্রভু এবং আমাদের সকল সত্তায় ও চেতনায় ও ইহার বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশশীল করণে তাঁর সহিত মিলনই যজ্ঞের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং কর্মযজ্ঞের ক্রমগুলির পরিমাপের জন্য প্রথম দেখতে হবে দিব্য প্রকৃতির আরো সন্নিকটে আমাদের নিয়ে যায় এমন কিছুর অভ্যুদয় আমাদের প্রকৃতির মধ্যে কি পরিমাণে হয়েছে; এবং এ ছাড়া দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে ভগবানের অনুভূতি, তাঁর উপস্থিতি, আমাদের নিকট তাঁর অভিব্যক্তি এবং সেই পরম উপস্থিতির সহিত উপচীয়মান সামীপ্য ও মিলন কতদূর সাধিত হয়েছে। কিন্তু ভগবান স্বরূপতঃ অনন্ত আর তাঁর অভি-ব্যক্তিও বহু বিচিত্ররূপে অনন্ত। তাই যদি হয় তবে শুধু একপ্রকার উপলব্ধিবলেই সত্তায় ও প্রকৃতিতে আমাদের সত্যকার সম্যক্ সিদ্ধি সম্ভব নয়; ইহার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন প্রকারের দিব্য অনুভূতির সমাহার। অন্য সব বাদ দিয়ে একমাত্র তাদাত্ম্যের পথে চরমোৎকর্ষ পর্যন্ত উন্নীত হলেও সম্যক্ সিদ্ধি লাভ হয় না। ইহার জন্য দরকার অনন্তের বহু বিভাবের সৌষম্যসাধন। আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য বহুবিধ স্ফুরন্ত অনুভূতি সমেত অখণ্ড চেতনা অত্যাবশ্যক।

অনন্তের সম্যক্ জ্ঞান বা বহুমুখী অনুভূতি লাভের জন্য যে মৌলিক অনুভূতি অপরিহার্য তা হল ভগবানের উপলব্ধি—তাঁর স্বরূপ আত্মায় ও সত্যে যা রূপ ও প্রতিভাসের দ্বারা পরিবর্তিত হয়নি। তা না হলে আমরা সম্ভবতঃ অবভাসের জালে আবদ্ধ থাকব, নয় নানাবিধ সামান্য বা বিশেষ বিভাবের বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াব; আর এই বিভ্রান্তি এড়াতে গেলে আমরা হয় কোন মানসিক সূত্রে বাঁধা পড়ব, নয় আবদ্ধ হব কোন সীমিত ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে। যে একমাত্র দৃঢ় ও সর্ব-সমন্বয়ী সত্য বিশ্বের ভিত্তিমূল তা এই—জীবন অ-সৃষ্ট পরমাত্মা ও পরম চিৎপুরুষের অভিব্যক্তি এবং এই পরম চিৎপুরুষের নিজের সৃষ্টি সর্বভূতের সহিত তাঁর নিজের সত্যকার সম্বন্ধই জীবনের প্রচ্ছন্ন রহস্যের চাবিকাঠি। এই সমগ্র জীবনের পশ্চাতে আছে সনাতন পুরুষের দৃষ্টি তাঁর বহু ও বিচিত্র সম্ভূতির উপর; চারিদিকে ও সর্বত্র আছে কালের মধ্যে অব্যক্ত কালাতীত সনাতন অভিব্যক্তির পরিবেষ্টন ও অনুপ্রবেশ। কিন্তু এই জ্ঞান যদি শুধু নিষ্প্রাণ, নিষ্ফল, বুদ্ধিগত ও দার্শনিক ধারণা হয়, তাহলে যোগসাধনায় তার কোন মূল্য নেই; সাধকের পক্ষে শুধু মানসিক উপলব্ধি যথেষ্ট নয়। কেন না যোগের লক্ষ্য শুধু মননের সত্য বা শুধু মনের সত্য নয়, সে চায় জীবন্ত

ও প্রকাশক অধ্যাত্ম অনুভূতির স্ফুরন্ত সত্য। আমাদের মধ্যে জাগা চাই সর্বদা ও সর্বত্র এক সত্যময় অনন্ত উপস্থিতির সুস্পষ্ট বোধ, এক নিবিড় বেদনা (feeling) ও অন্তরঙ্গ সংযোগ, বাস্তব ইন্দ্রিয়বোধ ও স্পর্শ আর এই বোধ যে ইহা সতত অন্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাদের পরিবেষ্টন করে আমাদের নিকটেই বর্তমান। এই উপস্থিতি আমাদের সঙ্গে থাকা চাই এমন এক জীবন্ত সর্বব্যাপী সদ্‌-বস্তুরূপে যার মধ্যে সকল কিছু ও আমরা থাকি, বিচরণ করি ও কাজ করি, এবং সর্বদা ও সর্বত্র ইহাকে আমাদের অনুভব করা চাই যে ইহা মূর্ত, দৃষ্টিগোচর, সর্ববিষয়ে অধিষ্ঠিত; আমরা ইহাকে জানব তাদের যথার্থ পরমাত্মা বলে, স্পর্শ করব তাদের অবিনাশী স্বরূপ বলে, নিবিড়ভাবে দেখব তাদের অন্তরতম পরম চিৎপুরুষ বলে। এই পরমাত্মা ও পরম চিৎপুরুষকে এখানে সর্বভূতের মধ্যে শুধু ভাবনা করা নয়, তাঁকে সর্বপ্রকারে দেখা, অনুভব করা ও তাঁর সংস্পর্শে আসা এবং ঐরূপ সুস্পষ্ট-ভাবে সর্বভূতকে এই পরমাত্মা ও পরম চিৎপুরুষের মধ্যে অনুভব করা—এই মৌলিক অনুভূতিই অপর সকল জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে থাকা চাই।

বিষয়সমূহের এই অনন্ত ও সনাতন পরমাত্মা এক সর্বব্যাপী সদ্‌বস্তু, সর্বত্র এক অখণ্ড সত্তা; ইহা অদ্বয় ও একত্বসাধক উপস্থিতি, বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন নয়; প্রতি অন্তঃপুরুষে বা বিশ্বের প্রতিটি রূপে সম্পূর্ণভাবেই তাঁর সাক্ষাৎলাভ বা তাঁর দর্শন বা অনুভব সম্ভব। কারণ ইহার আনন্ত্য আধ্যাত্মিক ও মৌলিক, শুধু দেশের মধ্যে সীমাহীনতা বা কালের মধ্যে অন্তহীনতা নয়, অগণিত যুগযুগান্তরের প্রসারের মধ্যে বা সৌরমণ্ডলাদির ব্যোমের বিস্ময়কর বিশালত্বের মধ্যে অনন্তকে যেমন সুনিশ্চিতভাবে অনুভব করা যায় তেমন সুনিশ্চিতভাবেই তাকে অনুভব করা যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর মধ্যে বা কালের একটি ক্ষণের মাঝে। ইহার জ্ঞান বা অনুভূতি শুরু হতে পারে যে কোন স্থানে আর তার প্রকাশ হতে পারে যে কোন বিষয়ের মধ্য দিয়ে; কারণ সব কিছুরই মধ্যে ভগবান এবং সব কিছুই ভগবান।

তথাপি বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্নভাবেই এই মৌলিক অনুভূতি আরম্ভ হবে, আর তার মধ্যে যে পরম সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে তাকে তার সহস্র বিভাবে বিকাশ করতেও দীর্ঘ সময় লাগবে। প্রথম হয়তো এই সনাতন উপস্থিতিকে আমি নিজের মধ্যে বা নিজ বলেই দেখি বা অনুভব করি এবং শুধু পরে আমার এই মহত্তর আত্মার দর্শন ও বোধকে প্রসারিত করি সকল জীবে। তখন আমি জগৎকে দেখি আমার মধ্যে বা আমার সহিত এক বলে। বিশ্বকে আমি দেখি আমার সত্তার মধ্যে এক দৃশ্য হিসাবে; ইহার গতির লীলাকে দেখি আমারই বিশ্ব চিৎ-পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন রূপের ও অন্তঃ-পুরুষের ও শক্তির গতিবৃত্তি বলে; আমি সর্বত্র দেখি স্বয়ং নিজেকে, অন্য

কাহাকে নয়। কিন্তু একথা বিশেষভাবে মনে রাখা চাই যে এই দেখা অসুরের, দৈত্যের প্রমাদপূর্ণ দেখা নয়, কারণ অসুর বাস করে নিজেরই অতিরিক্ত মাত্রায় বর্ধিত ছায়ার মধ্যে, অহংকে ভুল করে তার আত্মা ও চিৎ-পুরুষ ব'লে এবং চারি-পাশের সব কিছুর উপর নিজের খণ্ড ব্যক্তিভাবনাকে জোর করে চাপাতে চেষ্টা করে একমাত্র শ্রেষ্ঠ সত্তারূপে। কারণ ইতিপূর্বেই জ্ঞানলাভের পর আমি এই সত্য অধিগত করেছি যে আমার প্রকৃত আত্মা অনহং, অহং নয়; সেই রকম আমি অনুক্ষণ অনুভব করি যে আমার মহত্তর আত্মা হয় এক নৈর্ব্যক্তিক বৃহত্ত্ব, নয় এক মৌলিক পুরুষ যার মধ্যে অথচ বাহিরে সকল ব্যক্তিসত্ত্ব অবস্থিত, আথবা, এই উভয়ই একত্র অবস্থিত; ইহা যাই হোক, নৈর্ব্যক্তিক হোক বা অসীম পরম পুরুষবিধ বা একসাথে দুই-ই হোক, ইহা অহং ছাড়িয়ে এক অনন্ত। আমি যে প্রথম ইহাকে অপরের মধ্যে না পেয়ে বরং যে রূপকে 'আমি' বলি সেই রূপের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি, তার কারণ শুধু এই যে আমার চেতনার প্রত্যক্‌বৃত্ততার জন্য এখানেই ইহাকে পাওয়া ও তৎক্ষণাৎ জানা ও উপলব্ধি করা আমার পক্ষে সব চেয়ে সহজ। কিন্তু যদি এই পরমাত্মাকে দেখামাত্র সংকীর্ণ করণস্বরূপ অহং তাঁর মধ্যে বিলুপ্ত হতে না শুরু করে, যদি ক্ষুদ্র বাহ্য মনোগঠিত "আমি" সেই মহত্তর চিরস্থায়ী অ-সৃষ্ট অধ্যাত্ম "আমি"র মধ্যে অন্তর্হিত হতে অস্বীকার করে তাহলে আমার উপলব্ধি হয় খাঁটি নয়, আর না হয় মূলতঃ অপূর্ণ। আমার মধ্যে কোথাও না কোথাও অহমাত্মক বাধা আছে; আমার প্রকৃতির কোন অংশ নিজেকে পৃথক মনে করে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পরম চিৎপুরুষের সর্বগ্রাসী সত্যকে অস্বীকার করার বাধা এনেছে।

পক্ষান্তরে, আমি দিব্যসত্তাকে প্রথম দেখতে পারি আমার বাহিরে জগতের মধ্যে, আমার নিজের মধ্যে নয়, অপরের মধ্যে; আর কারো কারো পক্ষে এই পথই আরো সহজ। গোড়া থেকেই আমি সেখানে ইহাকে দেখি এমন এক অনন্তরূপে যা সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত অথচ যার মধ্যে সকল কিছু অবস্থিত, আবার এই যে সব রূপ, জীব ও শক্তিকে ইহা নিজের উপরিভাগে ধারণ করে তাদের সহিত ইহা জড়িত নয়। আর না হয় আমি ইহাকে দেখি ও অনুভব করি শুধু নিঃসঙ্গ পরমাত্মা ও পরম চিৎপুরুষ রূপে যা এই সব শক্তি ও সত্তার আধার, আর আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ সেই নীরব সর্বব্যাপিতার মধ্যে আমার অহং-বোধ অন্তর্হিত হয়। পরে ইহাই আমার করণ-স্বরূপ সত্তাকে ব্যাপ্ত ও অধিগত করতে শুরু করে এবং বোধ হতে থাকে যে তা থেকেই নিঃসৃত হয় আমার সকল কর্মপ্রবেগ, আমার মনন ও বাক্যের সকল আলোক, আমার চেতনার সকল গঠন এবং এই এক জগৎব্যাপী সৎ-এর অন্যান্য অন্তঃপুরুষ-রূপের সহিত এই চেতনার সকল সম্পর্ক ও সংঘাত; আর আমি

এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত আত্মা নই, আমি সেই পরম 'তৎ' যার কিছুটা সম্মুখে স্থাপিত হয়ে ধারণ করে বিশ্বের মধ্যে তার কর্ম প্রণালীর এক নির্বাচিত রূপ।

অন্য একটি ভিত্তিমূলক উপলব্ধি আছে যা সকল উপলব্ধির চরম; তবু ইহাও কখন কখন আসে উন্মীলনের প্রথম সন্ধিক্ষণে বা যোগের প্রাথমিক পর্যায়ে। ইহা এমন এক অনির্বচনীয় পরতর সর্বাতীত অজ্ঞেয়ের দিকে জাগরণ যা আমার ও আমি যে জগতে বিচরণ করি মনে হয় তারও ঊর্ধ্বে এক কাল ও দেশের অতীত অবস্থা বা সত্তা, আবার সেই সাথে ইহাই আমার অন্তঃস্থ মৌলিক চেতনার কাছে একমাত্র প্রবল সদ্‌বস্তু ও তার পক্ষে একরূপ সুনিশ্চিত ও অনস্বীকার্য। এই অনুভূতির সাথে সাধারণতঃ আর একটি অনস্বীকার্য বোধ আসে যাতে মনে হয় এখানকার সব কিছুই স্বপ্নের মত বা ছায়ার মত অলীক অথবা সে সব অনিত্য, গৌণ, ও অর্ধসত্য মাত্র। অন্ততঃ কিছু কালের জন্য আমার চারিদিককার সব কিছুকে মনে হতে পারে যেন তারা চলচ্চিত্রের ছায়া-মূর্তির বা বাহ্যরূপের খেলা আর আমার নিজের ক্রিয়াকে মনে হবে যে ইহা আমার ঊর্ধ্বে বা বাহিরে অবস্থিত কোন এখনো অ-ধরা বা সম্ভবতঃ "অগ্রাহ্যম্"—ধরা যায় না এমন উৎস থেকে নিঃসৃত এক তরল গঠন। এই চেতনায় থাকা, এই প্রারম্ভিক সূত্র অনুযায়ী চলা, বা বিষয় সমূহের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই প্রাথমিক আভাসন অনুসরণ করার অর্থ অজ্ঞেয়ের মধ্যে আত্মা ও জগতের লয়প্রাপ্তির দিকে অর্থাৎ মোক্ষ, নির্বাণের দিকে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু ইহাই এই পথের একমাত্র পরিণতি নয়; বরং আমার পক্ষে ততদিন অপেক্ষা করা সম্ভব যতদিন না কালাতীত শূন্যগর্ভ মুক্তির নীরবতার মধ্য থেকে আমার ও আমার সব ক্রিয়ার যে উৎস এখনও অ-ধরা রয়েছে তার সহিত আমার সম্পর্ক স্থাপন শুরু হয়। তখন আরম্ভ হয় শূন্যতার পূর্ণ হওয়া, তার মধ্য থেকে বাহির হয় বা তার মধ্যে বেগে প্রবেশ করে ভগবানের সকল বহুময় সত্য, ফুরন্ত অনন্তের সকল বিভাব ও অভিব্যক্তি এবং বহু পর্যায়। এই অনুভূতির ফলে প্রথমে মনের উপর, পরে আমাদের সমগ্র সত্তার উপর নেমে আসে এক পরম, অগাধ, প্রায় অতলস্পর্শী শান্তি ও নীরবতা। অভিভূত ও নির্জিত, শান্ত ও নিজ থেকে মুক্ত হয়ে মন এই নীরবতাকেই স্বীকার করে পরাৎপর বলে। কিন্তু তারপর সাধক দেখতে পায় যে তার জন্য সর্বকিছুই আছে সেখানে বা সর্বকিছুই নূতন তৈরী হয় সেই নীরবতার মধ্যে বা ইহার মধ্য দিয়ে সব কিছুই তার উপর নেমে আসে এক মহত্তর নিগূঢ় বিশ্বাতীত অস্তিত্ব থেকে। কারণ এই বিশ্বাতীত, এই নিরালম্ব শুধু অলক্ষণ শূন্যতার শান্তি নয়, ইহার নিজস্ব সম্পদ ও বৈভব অনন্ত, আমাদের যা কিছু তা ঐ সবের হীনার্থক ও স্বল্পার্থক। সকল বিষয়ের এই পরম

উৎস না থাকলে, বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হ'ত না; সকল শক্তি, সকল ক্রিয়াকর্ম অলীক হ'ত, অসম্ভব হ'ত সকল সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি।

এই যে তিন মৌলিক উপলব্ধি, ইহারা এতই মৌলিক যে জ্ঞানমার্গের যোগীর কাছে এসব মনে হয় চরম, স্বয়ং-পূর্ণ আর অন্য সব অতিক্রম করে তাদের স্থান অধিকার করাই তাদের ভবিষ্যৎ। তথাপি পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে এগুলি অন্যরূপ, অলৌকিক কৃপাবলে এ সব তাকে সহজে ও আকস্মিকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে দেওয়া হোক, বা দীর্ঘকাল সাধনার পথে উদ্যমের সহিত এগিয়ে যাওয়ার পর বহুকষ্টে এসব অর্জিত হোক, তার কাছে এসব একমাত্র সত্য নয় বা সনাতনের অখণ্ড সত্যের সম্পূর্ণ ও একমাত্র সূত্রও নয়, বরং এক মহত্তর দিব্য জ্ঞানের অপূর্ণ উপক্রম, বিরাট ভিত্তি তারা। অপর বিভিন্ন উপলব্ধি আছে যেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাদের সম্ভাবনার শেষ সীমা পর্যন্ত তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা চাই; আর যদিও তাদের কোন কোনটির বেলায় প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে তাদের দ্বারা শুধু সেই সব দিব্য বিভাব জানা যায় যেগুলি অস্তিত্বের সক্রিয়তার পক্ষে তটস্থ, ইহার স্বরূপে স্বগত তাহলেও তাদের শেষ পর্যন্ত সেই সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে ইহার শাশ্বত উৎস অবধি অনুসরণ করা হলে দেখা যাবে যে তার পরিণতিতে ভগবানের এমন এক প্রকাশ আসে যা না হলে বিষয় সমূহের পিছনের পরম সত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান রিক্ত ও অপূর্ণ রয়ে যাবে। এই সব আপাতপ্রতীয়মান তটস্থ বিষয় এমন এক গূঢ় তত্ত্বের চাবিকাঠি যা ছাড়া মৌলিক তত্ত্বরাজি তাদের সকল রহস্য উদ্ঘাটিত করে না। ভগবানের প্রকাশক সকল বিভাবকেই ধরা চাই পূর্ণযোগের বিস্তৃত জালে।

* * *

যদি সাধকের একমাত্র লক্ষ্য হ'ত জগৎ ও তার কার্জকর্ম থেকে প্রস্থান, এক পরমা মুক্তি ও অচঞ্চলতা তাহলে তার আধ্যাত্মিক জীবনের সার্থকতার জন্য এই তিন প্রধান মূল উপলব্ধিই যথেষ্ট। শুধু তাদের মধ্যেই একাগ্র হয়ে অন্য সব দিব্য বা ঐহিক জ্ঞানকে খসে পড়তে দিয়ে সে নিজে ভারমুক্ত হয়ে প্রবেশ করবে চিরন্তনী নীরবতার মধ্যে। কিন্তু জগৎ ও তার সব কাজ কর্মকেও তার হিসাবের মধ্যে ধরা চাই, জানা চাই তাদের পশ্চাতে কি দিব্য সত্য থাকতে পারে, আর অধিকাংশ অধ্যাত্ম অনুভূতির সূত্রপাত যে ব্যক্ত সৃষ্টির সহিত দিব্য সত্যের আপাত বিরোধিতা তার সমন্বয় সাধনও দরকার। এই পথগুলির মধ্যে যে পথেই সে অগ্রসর হ'ক না কেন, তার সম্মুখে আসে এক সতত দ্বৈত, অস্তিত্বের দুই সংজ্ঞার মধ্যে এক বিচ্ছিন্নতা, আর মনে হয় এই দুই সংজ্ঞা পরস্পর বিরোধী আর এই বিরুদ্ধতাই বিশ্বপ্রহেলিকার সঠিক মূল। পরে তার জানা সম্ভব হয় আর সে জানতেও পারে যে ইহারা এক অদ্বয়

পরম সত্তার দুই মেরু, ও এমন দুই যুগপৎ শক্তি প্রবাহের দ্বারা তারা যুক্ত যে দুটি পরস্পরের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক, এবং শুধু তাদের ঘাত প্রতিঘাতেই ঐ সত্তার মধ্যাস্থিত বিষয়ের অভিব্যক্তি সম্ভব; আর জীবনের বিভিন্ন বৈষম্যের সমন্বয় সাধনের ও সাধকের অভীপ্সিত পূর্ণ সত্য আবিষ্কারের নির্ধারিত উপায় হল তাদের পুনর্মিলন।

কারণ এক দিকে সে সর্বত্র বোধ করে এই পরম আত্মাকে, এই চিরস্থায়ী চিন্ময় পুরুষ-ধাতুকে—ব্রহ্মকে, সনাতনকে—সেই একই আত্ম-সৎকে যা এখানে কালের মধ্যে তার দেখা বা অনুভব করা প্রতি অবভাসের পশ্চাতে অবস্থিত আবার যা বিশ্বাতীত ও কালাতীত। এক পরমাত্মার প্রবল অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে সে উপলব্ধি করে যে ইহা আমাদের সীমিত অহং নয়, বা মন প্রাণ দেহও নয়, ইহা জগদ্ব্যাপী কিন্তু বাহ্যতঃ প্রাতিভাসিক নয়, অথচ তার অন্তঃস্থ কোন চিদ্-বোধের কাছে ইহা যে কোন রূপ বা প্রতি-ভাসের চেয়ে বেশী মূর্ত, ইহা বিশ্বাত্মক কিন্তু তার সত্তার জন্য ইহা বিশ্বের অন্তর্গত কোন কিছুর উপর বা বিশ্বের নিখিল সমগ্রতার উপর নির্ভরশীল নয়; যদি এই সব লোপ পায়, তা হলেও এসবের নাশে তার সতত অন্তরঙ্গ অনুভূতির সনাতনের কোন ইতরবিশেষ হবে না। তার নিজের ও সকল বিষয়ের স্বরূপ এক অপ্রকাশনীয় আত্ম-সত্তা সম্বন্ধে সে নিশ্চিত; এমন এক স্বরূপচেতনা সম্বন্ধে সে অন্তরঙ্গ ভাবে অবগত যার মাত্র আংশিক ও খর্বীকৃত রূপ হ'ল আমাদের চিন্তাশীল মন, প্রাণবোধ ও দেহবোধ, আবার এই চেতনার মধ্যে এমন অপরিসীম শক্তি আছে যে তা থেকেই সকল ক্রিয়া-শক্তির উৎপত্তি হয় অথচ যার ব্যাখ্যা বা হিসাব এই সকল ক্রিয়াশক্তির মিলিত সমষ্টি বা সামর্থ্য বা প্রকৃতির দ্বারা মেলে না; সে অনুভব করে যে সে বাস করে এমন এক অবিচ্ছেদ্য স্বাধিষ্ঠিত পরমানন্দের মাঝে যা এই তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী হর্ষ বা সুখ বা আমোদ আহ্লাদ নয়। এই দৃঢ় অনু-ভূতির লক্ষণ চারিটি—অপরিবর্তনীয় অবিনশ্বর আনন্ত্য, কালাতীত নিত্যতা, এমন এক আত্ম-সংবিৎ যা এই গ্রহিষ্ণু ও প্রতিক্রিয়াশীল বা ইতস্ততঃ অন্ধ অন্বেষণকারী মানসচেতনা নয়, বরং যা ইহার পশ্চাতে ও ঊর্ধ্বে ও নিম্নে অবস্থিত, এমন কি যাকে আমরা অচিতি বলি তার মধ্যেও ইহা বর্তমান, এবং এক একত্ব যার মধ্যে অন্য কোন অস্তিত্বের সম্ভাবনা নেই। আবার সাধক দেখে যে এই সনাতন আত্মসত্তাই চিন্ময় কাল-পুরুষ (Time-Spirit) রূপে সকল ঘটনা প্রবাহ বহন করেন, এক আত্ম-প্রসারিত অধ্যাত্মদেশরূপে সকল বিষয় ও সত্তাকে নিজের মধ্যে ধারণ করেন, এক চিন্ময়পুরুষ-ধাতুরূপে আপাতপ্রতীয়মান অনাধ্যাত্মিক, ক্ষণস্থায়ী ও সান্ত সব কিছুর নিজস্ব রূপ ও উপাদান হন। কারণ সাধক অনুভব করে যে ক্ষণস্থায়ী, ঐহিক, দেশগত,

সীমাবদ্ধ সব কিছুই তাদের ধাতু, ক্রিয়াশক্তি ও সামর্থ্যে সেই একম্, সনাতন, অনন্ত বৈ আর কিছু নয়।

কিন্তু তবু তার মধ্যে বা সম্মুখে শুধু যে এই সনাতন আত্মবিৎ সৎ, এই অধ্যাত্মচেতনা, আত্ম-দীপ্ত শক্তির এই আনন্ত্য, এই কালাতীত অন্তহীন নিঃশ্রেয়স থাকে তা নয়। আরো থাকে, আর তার অনুভূতিতে সততই থাকে পরিমেয় দেশ ও কালের মধ্যে এই বিশ্ব, যেন এক প্রকার পরিধীহীন সান্ত আর তার মধ্যে থাকে সব কিছু অনিত্য, সসীম, খন্ড খন্ড বহু সংখ্যক, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, বৈষম্য ও দুঃখকষ্টের অধীন; এই সবের মধ্যে আছে একত্বের কোন অনুলপব্ধ অথচ স্বগত সামঞ্জস্যের জন্য অস্পষ্ট আকূতি; তারা অচেতন বা অর্ধচেতন বা এমন কি যখন খুবই সচেতন তখনও আদি অবিদ্যা ও অচিতিতে আবদ্ধ। সাধক সর্বদাই শান্তি বা আনন্দে ধ্যানস্থ থাকে না, আর যদি থাকতও, তাতে সমস্যার কোন সমাধান হ'ত না কারণ সে জানে যে ধ্যানমগ্ন থাকলেও এ সব তার বাহিরে, অথচ তারই কোন বৃহত্তর আত্মার মধ্যে যেন চিরকাল চলতে থাকবে। কখন কখন তার চিৎপুরুষের এই দুই অবস্থা তার চেতনার অবস্থা অনুযায়ী পালাক্রমে তার জন্য বর্তমান থাকে বলে মনে হয়; অন্য সময় মনে হয় যে তারা যেন সত্তার দুটি অংশ, বিসদৃশ অথচ এমন যে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা দরকার—যেন তার জীবনের দুটি অর্ধ, একটি উপরের, অন্যটি নীচের অথবা একটি ভিতরের, অন্যটি বাহিরের অংশ। সে শীঘ্রই বুঝতে পারে যে তার চেতনার মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতার এক মহতী মুক্তিপ্রদায়িনী শক্তি আছে, কারণ এই বিচ্ছিন্নতার দরুন সে আর অবিদ্যা, অচিতিতে আবদ্ধ থাকে না; আর তার কাছে মনে হয় না যে এই বিচ্ছিন্নতা তার নিজের ও বিষয়সমূহের মূল স্বরূপ বরং মনে হয় যে ইহা এক বিভ্রম যা জয় করা যায় বা অন্ততঃ এক সাময়িক মিথ্যা আত্মানুভূতি, মায়া। ইহাকে ভগবানের একান্ত বিপরীত, এক অবোধ্য রহস্যের খেলা, অনন্তের মুখোস বা বিকৃতি মাত্র বলে দেখা লোভনীয় এবং সেজন্য সময় সময় তার অনুভূতিতে অনিবার্যরূপে বোধ হয় যে এক দিকে আছে ব্রহ্মের জ্যোতির্ময় সত্য আর অন্যদিকে মায়ার অন্ধকারময় বিভ্রম। কিন্তু তার অন্তঃস্থ কিছু এক তাকে এই ভাবে অস্তিত্বকে চিরদিনের মত দুই খন্ডে ভাগ করতে দেয় না; আরো নিবিষ্ট হয়ে দেখলে সে আবিষ্কার করে যে এই অর্ধ-আলোক বা আঁধারের মাঝেও রয়েছেন সনাতন,—ব্রহ্মই এখানে বিরাজিত মায়ার বেশে।

ইহা এক উপচীয়মান অধ্যাত্ম অনুভূতির উপক্রম; এই অনুভূতিতে উত্তরোত্তর প্রকাশ পায় যে সাধকের কাছে যা তামসী অবোধ্য মায়া বলে মনে হ'ত তা সকল সময়ই সনাতনের চিৎ-শক্তি বৈ আর কিছু নয় যা বিশ্বের অতীত কালাতীত ও অসীম কিন্তু এখানে প্রসারিত আলো-আঁধারের ছদ্মবেশে, মন

ও প্রাণ ও জড়ের মধ্যে ভগবানের অত্যাশ্চর্য মন্থর অভিব্যক্তির উদ্দেশ্যে। সমগ্র কালাতীতের প্রেষা কালের মধ্যে বিলাসের দিকে; আর কালের মধ্যে সব কিছুর প্রতিষ্ঠা কালাতীত পরম চিৎ-পুরুষেরই উপর ও তাঁরই চারিদিকে তাদের আবর্তন। যদি এই দুয়ের বিভক্ত অনুভূতি মুক্তিপ্রদ হয়, তা হলে এদের একাত্ম অনুভূতি স্ফুরন্ত ও কার্যকরী। কারণ এখন সাধক শুধু এই অনুভব করে না যে সে সনাতনের পুরুষ-ধাতুর অংশে, তার স্বরূপ আত্মায় ও চিৎ-পুরুষে সনাতনের সহিত সম্পূর্ণ এক, সে আরো অনুভব করে যে তার সক্রিয় প্রকৃতিতে সে সনাতনের সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম চিৎ-শক্তির করণব্যবস্থা। তার মধ্যে ইহার বর্তমান বিলাস যতই সীমাবন্ধ ও আপেক্ষিক হোক, সে তার মহত্তর ও আরো মহত্তর চেতনা ও সামর্থ্যের কাছে উন্মীলিত হতে পারে আর মনে হয় এই প্রসারতার কোন নির্ধারিত সীমা নেই। এমন কি, মনে হয় ঐ চিৎ-শক্তির এক অধ্যাত্ম ও অতিমানসিক স্তর তার ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রকাশিত করে আর সংযোগের জন্য আনত হয়, যেখানে এইসব বন্ধন ও সীমা নেই, আর ইহার সব শক্তিও কালের মধ্যে বিকাশের উপর চাপ দিচ্ছে সনাতনের মহত্তর অবতরণ এবং স্বল্প-প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি বা আদৌ প্রচ্ছন্ন নয় এমন অভিব্যক্তির আশ্বাসসহ। ব্রহ্ম-মায়ার যে দ্বৈতভাব আগে বিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন দ্বয়াত্মক তা সাধকের নিকট প্রকাশিত হয় সকল আত্মার পরমাত্মা, সকল সত্তার অধীশ্বর, জগৎ-যজ্ঞ ও তার নিজের যজ্ঞের প্রভুর প্রথম মহান স্ফুরন্ত বিভাব রূপে।

অন্য এক পথে অগ্রসর হলে, সাধকের অনুভূতিতে আর এক দ্বৈতভাব আসে। একদিকে সে জানতে পারে এক সাক্ষী, গ্রহীতা, দ্রষ্টা, জ্ঞাতারূপী চিৎ যা কর্ম করে বলে মনে হয় না, কিন্তু যার জন্য মনে হয় আমাদের ভিতরের ও বাহিরের এই সকল কাজকর্ম প্রবর্তিত হয় ও অনুষ্ঠিত হতে থাকে। অন্যদিকে ঐ একই সময়ে সে এমন এক কার্যসাধিকা শক্তি বা কর্ম-প্রবাহের ক্রিয়াশক্তিকে জানে যাকে দেখা যায় যে ইহা সকল ভাবনীয় ক্রিয়ার উপাদান, প্রেরণা ও পরিচালক, আমাদের দৃশ্য, অদৃশ্য অগণিত রূপের স্রষ্টা আর এগুলিকে ইহা ব্যবহার করে তার ক্রিয়া ও সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের স্থির অবলম্বনরূপে। অন্য সব বাদ দিয়ে একান্তভাবে এই সাক্ষী চেতনায় প্রবেশ করে সে হয়ে ওঠে নীরব, নির্লিপ্ত, নিশ্চল; দেখে যে এ পর্যন্ত সে প্রকৃতির সব গতিবৃত্তিকে নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত করে নিজস্ব করেছে আর এই প্রতিফলনের দ্বারাই এই সব গতিবৃত্তি আপাতিক অধ্যাত্ম মূল্য ও তাৎপর্য পেয়েছিল তার অন্তঃস্থ সাক্ষী পুরুষের কাছ থেকে। কিন্তু এখন সে এই আরোপ-জনিত বা প্রতিফলন-জনিত একাত্মতা প্রত্যাহার করে নিয়েছে; সে শুধু তার নীরব আত্মা সম্বন্ধে সচেতন, ইহার চারিদিককার গতিশীল সব

কিছু থেকে সে বিচ্ছিন্ন; সকল কাজকর্মই তার বাহিরে আর সঙ্গে সঙ্গে দেখে যে ইহারা আর আগের মত নিবিড় সত্য নেই; এখন মনে হয় এ সব যান্ত্রিক, আর তাদের বিচ্ছিন্ন ও শেষ করা সম্ভব। আবার অন্য সব বাদ দিয়ে একান্তভাবে শুধু সক্রিয় গতিবৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করলে, তার এক বিপরীত আত্ম-বোধ জাগে; তার নিজের অনুভূতিতে সে নিজেকে মনে করে ক্রিয়াবলীর এক স্তূপ, বিভিন্ন শক্তির এক রূপায়ণ ও পরিণতি: এ সবের মধ্যে যদি কোন সক্রিয় চেতনা, এমন কি কোন প্রকার গতিশীল সত্তা থাকে তা হলেও ইহার মধ্যে কোথাও কোন স্বাধীন অন্তঃপুরুষ আর নেই। সত্তার এই দুই বিভিন্ন ও বিপরীত অবস্থা তার মধ্যে পালাক্রমে আসে, অথবা দুইটিই একসাথে মুখোমুখি থাকে; আন্তর সত্তার মধ্যে একটি নীরব দ্রষ্টা, কিন্তু অচঞ্চল ও ক্রিয়ায় কোন অংশ নেয় না; অপরটি বাহিরের বা উপরকার আত্মায় সক্রিয় থেকে নিজের অভ্যাসগত গতিবৃত্তি অনুসরণ করে। সাধক তখন প্রবেশ করেছে পুরুষ প্রকৃতির, এক মহান দ্বৈতভাবের তীব্র বিভক্ত বোধের মধ্যে।

কিন্তু যেমন তার চেতনা গভীর হতে থাকে সে বুঝতে থাকে যে ইহা শুধু এক প্রাথমিক সম্মুখস্থ অবভাস। কারণ সে দেখে যে তার এই অন্তঃস্থ সাক্ষীপুরুষের নীরব সমর্থন, অনুমতি ও অনুমোদন বলেই এই কার্যসাধিকা প্রকৃতি তার সত্তার উপর অন্তরঙ্গভাবে বা অবিরাম কর্ম করতে সক্ষম; যদি এই পুরুষ তার অনুমোদন প্রত্যাহার করে তা হলে তার উপরে ও ভিতরে প্রকৃতির ক্রিয়ার গতিবৃত্তিগুলি পুরোপুরি যান্ত্রিক অনুবৃত্তি হয়ে ওঠে, অবশ্য প্রথমে তারা প্রবল থাকে, যেন তখনও তাদের চেষ্টা জোর করে তাদের প্রভাব বজায় রাখা কিন্তু পরে ক্রমশঃ তাদের স্ফুরত্তা ও বাস্তবতা হ্রাস পায়। এই অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের শক্তি আরো সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করে সে দেখে যে প্রকৃতির গতিবৃত্তি পরিবর্তন করতে সে সক্ষম, অবশ্য প্রথমে ধীরে ধীরে ও অনিশ্চিতভাবে, কিন্তু পরে আরো সুনিশ্চিত ভাবে। পরিশেষে এই সাক্ষী-পুরুষের মধ্যে বা পশ্চাতে তার নিকট প্রকাশিত হয় প্রকৃতির মধ্যকার এক জ্ঞাতা ও ঈশান সংকল্পের উপস্থিতি এবং ক্রমশঃ দেখা যায় যে প্রকৃতির অস্তিত্বের এই অধীশ্বর যা জানেন এবং যা সক্রিয়ভাবে সংকল্প করেন বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অনুমতি দেন তারই বহিঃপ্রকাশ হল প্রকৃতির যাবতীয় ক্রিয়া। এই সময় মনে হয় প্রকৃতি স্বয়ং শুধু তার কর্মপ্রণালীর সুনিয়ন্ত্রিত বাহ্য রূপে যান্ত্রিক, কিন্তু বস্তুতঃ সে চিন্ময়ী শক্তি, তার মধ্যে অন্তঃপুরুষ বর্তমান, তার আবর্তনে আছে আত্মসচেতন তাৎপর্য, তার পদক্ষেপ ও বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয় নিগূঢ় পরম জ্ঞান ও সংকল্প। এই দ্বৈতভাব দৃশ্যতঃ বিচ্ছিন্ন হলেও বস্তুতঃ অবিচ্ছেদ্য। যেখানে প্রকৃতি সেখানেই পুরুষ, আবার

যেখানে পুরুষ সেখানেই প্রকৃতি বর্তমান; এমন কি তাঁর নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে পুরুষ ধারণ করেন প্রকৃতির সকল স্থির শক্তি ও সক্রিয় শক্তি, তাদের প্রস্তুত রাখেন প্রক্ষেপের উদ্দেশ্যে; এমন কি তার ক্রিয়ার প্রবেগের মধ্যেও প্রকৃতি তার বিসৃষ্টির উদ্দেশ্যের অর্থ ও অবলম্বন হিসাবে পুরুষের সমগ্র সাক্ষী ও আদেশমূলক চেতনা নিজের সহিত বহন করে। আর একবার সাধকের অনুভূতিতে দেখা দেয় একই অদ্বয় পুরুষের অস্তিত্বের দুটি মেরু ও তাদের শক্তির দুটি রেখা বা প্রবাহ আর এই দুই পরস্পরের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতি-বাচক এবং তাদের যুগপৎ ক্রিয়াদ্বারা তারা ব্যক্ত করে তার অন্তঃস্থ সব কিছু। এখানেও সে দেখে যে এই বিভক্ত বিভাব মুক্তিপ্রদ; কেননা অবিদ্যার মধ্যে প্রকৃতির সংকীর্ণ কর্মধারার সহিত নিজেকে এক মনে করার বন্ধন থেকে ইহা তাকে মুক্তি দেয়। এই ঐক্য-বিধায়ক বিভাব স্ফুরন্ত ও কার্যকরী, কারণ ইহা সাধককে ঈশনা ও সিদ্ধিলাভে সমর্থ করে; প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু কম দিব্য বা আপাত অদিব্য সেগুলি বর্জন করে সে নিজের মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ও গতিবৃত্তিকে গঠন করতে পারে নতুন ভাবে আরো উন্নত আদর্শে ও মহত্তর জীবনের বিধান ও ছন্দে। এক বিশেষ অধ্যাত্ম ও অতিমানসিক স্তরে দ্বৈতভাব আরো পূর্ণভাবে হয়ে দাঁড়ায় দ্বৈতাদ্বৈত, একের মধ্যে দুই, অন্তরে চিন্ময়ী শক্তি সমেত ঈশান পুরুষ; আর ইহার যোগ্যতা কোন বাধা মানে না, বাহির হয়ে আসে সকল সীমা ভেঙে। পুরুষ-প্রকৃতির যে দ্বৈত-ভাব আগে বিভক্ত ছিল আর এখন দ্বয়াত্মক তা-ই এইভাবে সাধকের কাছে প্রকাশিত হয় তার সমগ্র সত্যে, সকল পুরুষের পরম পুরুষের, সৃষ্টির অধী-শ্বরের, যজ্ঞের প্রভুর দ্বিতীয় মহৎ তটস্থ ও কার্যকরী বিভাব রূপে।

আবার অপর আর একটি পথে অগ্রসর হলে সাধক দেখে আর এক দ্বৈতভাব যা অনুরূপ হয়েও বিভাবে বিভিন্ন, ইহাতে দ্বয়াত্মক ভাব আরো অব্যবহিত ভাবে প্রতীয়মান; ইহাই ঈশ্বর-শক্তির স্ফুরন্ত দ্বৈতভাব। এক-দিকে সে অনুভব করে সত্তার মধ্যে এক অনন্ত স্বয়ং-স্থ পরমদেবতা যিনি অস্তিত্বের অনির্বচনীয় যোগ্যতার মধ্যে সকল বিষয় ধারণ করে আছেন, সকল আত্মার পরমাত্মা, সকল পুরুষের পরমপুরুষ, সকল ধাতুর চিন্ময় ধাতু, এক নৈর্ব্যক্তিক অপ্রকাশনীয় সৎস্বরূপ অথচ একই সাথে এক অসীম পরম ব্যক্তি যাঁর আত্মরূপায়ণ এখানকার অগণিত ব্যক্তিসত্ত্ব, তিনি জ্ঞানের অধীশ্বর, প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্যের প্রভু, জগৎ সমূহের একমাত্র উৎস, তিনিই নিজেকে ব্যক্ত করেন, নিজেকে সৃজন করেন, তিনি বিরাট পুরুষ, বিশ্বমন, বিশ্বপ্রাণ, আবার যা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধে অচেতন প্রাণহীন জড় বলে প্রতীয়মান হয় তারও অবলম্বনস্বরূপ সচেতন জীবন্ত সদ্‌বস্তু তিনিই। অন্যদিকে সেই একই পরম দেবতাকে সে অনুভব করে কার্যকরী চেতনা ও

সামর্থ্যে; এই চেতনা ও সামর্থ্যই প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এমন এক আত্মসচেতন শক্তি-রূপে যা সকল কিছুকেই নিজের মধ্যে ধারণ ও বহন করে এবং যার নির্দিষ্ট কাজ হল এইসবকে সার্বিক কাল ও দেশের মধ্যে ব্যক্ত করা। সে সুস্পষ্ট বোঝে যে এক পরম পুরুষই আমাদের কাছে দেখা দেন তাঁর দুই বিভিন্ন, পরস্পরের বিপরীত দিকে। পরম দেবতারই মধ্যে তাঁর সত্তায় সব কিছু প্রস্তুত হয় অথবা পূর্ব থেকেই বর্তমান থাকে, এসব তাঁর থেকেই নিঃসৃত আর তাঁরই সংকল্প ও উপস্থিতির দ্বারা বিধৃত, সেই পরম দেবতাই শক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়ে সকল কিছু বাহিরে আনেন ও গতির মধ্যে সঞ্চালিত করেন, তাঁর দ্বারাই, তাঁর মধ্যেই সকল কিছুর পরিণতি ও সক্রিয়তা, আর এইভাবে তাদের ব্যষ্টিগত বা বিশ্বগত উদ্দেশ্যও বিকশিত হয়। আবার ইহা এমন এক দ্বৈতভাব যা অভিব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয়; জগতের কর্ম-প্রণালীর জন্য যে দুই শক্তির প্রবাহ সর্বদাই প্রয়োজনীয় মনে হয় তাদের সৃষ্টি ও কার্যক্ষম করে এই দ্বৈতভাব; এ দুই একই সত্তার দুই মেরু তবে এখানে তারা আরো কাছা-কাছি, এবং অতি স্পষ্টতঃ এদের প্রতিটি সর্বদাই তার স্বরূপে ও স্ফুরন্ত প্রকৃতিতে অপরের সব শক্তি বহন করে। দিব্য রহস্যের দুই প্রধান উপাদান —পুরুষবিধ ও নৈর্ব্যক্তিকতা এখানে সম্মিলিত হওয়ার দরুন পূর্ণ সত্যের সাধক তার পূর্ব অনুভূতির সাথে এই ঈশ্বর-শক্তির দ্বৈতভাবের মধ্যে দিব্য অতিস্থিতি ও অভিব্যক্তির এমন এক অন্তরঙ্গ ও চরম রহস্যের নিবিড়তা অনুভব করে যাহা সে অপর কোন অনুভূতিতে পায় না।

কারণ ঈশ্বরী শক্তি, দিব্য চিৎশক্তি ও জগন্মাতা হয়ে ওঠেন সনাতন একম্ ও ব্যক্ত বহুর মধ্যবর্তী। একদিকে তিনি পরম একের থেকে আনা ক্রিয়া-শক্তির বিলাসে নিজের প্রকাশশীল ধাতুর মধ্য থেকে অগণিত অবভাস সংবৃত্ত ও ক্রম-ব্যক্ত করে বহুময় ভগবানকে অভিব্যক্ত করেন বিশ্বের মধ্যে; অপরদিকে তিনি সেই সব শক্তিরই পুনরারোহী প্রবাহের দ্বারা সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যান তাদের উৎস তৎস্বরূপের অভিমুখে যাতে অন্তঃপুরুষ তার ক্রমবিকাশ-শীল অভিব্যক্তিতে উত্তরোত্তর প্রত্যাবর্তন করে সেখানে পরম দিব্যত্বের দিকে বা এখানেই লাভ করে তার দিব্য প্রকৃতি। যদিও তিনিই এই বিশ্বযন্ত্রের রচয়িত্রী তবু প্রকৃতি, নিসর্গশক্তির প্রথম আকৃতিতে যে নিশ্চেতন কার্য-সাধিকার রূপ আমরা দেখি সে রূপ তাঁর নয়; অথবা মায়া বলতে প্রথম আমরা যা বুঝি যে ইহা বিভ্রম বা অর্ধ-বিভ্রমের জননী, সেই অসত্যতার অর্থও তাঁর মধ্যে নেই। অনুভবকারী অন্তঃপুরুষ সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট বোঝে যে এই ঈশ্বরী শক্তি এক চিন্ময়ীশক্তি, তাঁর ধাতু ও প্রকৃতি তাঁর উৎস পরমেরই ধাতু ও প্রকৃতি। যদি মনে হয় যে তিনি আমাদের নিমজ্জিত করেছেন অবিদ্যা ও অচিতির মধ্যে এমন এক পরিকল্পনা অনুযায়ী যা আমরা এখনও বুঝতে

অক্ষম ও যদি তাঁর বিভিন্ন শক্তিকে আমরা দেখি বিশ্বের এই সব অনিশ্চিতার্থক শক্তিরূপে, তবু শীঘ্রই দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে দিব্য চেতনা বিকাশের জন্যই তিনি কর্মরতা, আর ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মানা তিনি আমাদের টেনে নিচ্ছেন তাঁর নিজের পরতর সত্তার দিকে আর আমাদের কাছে উত্তরোত্তর প্রকাশ করছেন দিব্যজ্ঞান, সংকল্প ও আনন্দের স্বরূপ। এমন কি অবিদ্যার গতি-বৃত্তির মধ্যেও সাধকের অন্তঃপুরুষ জানতে পারে যে তাঁরই সচেতন দেশনা তার পদক্ষেপের অবলম্বন স্বরূপ, এবং নিয়ে যাচ্ছে মন্থর বা দ্রুতগতিতে, সরল পথে বা আঁকাবাঁকা পথে, তমঃ থেকে মহত্তর চেতনার জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, অশুভ ও কষ্টভোগ থেকে এমন এক পরম শুভ ও সুখের দিকে যার শুধু এক অস্পষ্ট মূর্তি মানুষের মন এ পর্যন্ত গড়তে সক্ষম। সুতরাং তার শক্তি যুগপৎ মুক্তিপ্রদ ও স্ফুরন্ত, সৃজনক্ষম ও কার্যসাধক, বিষয় সমূহ এখন যেমন শুধু তা-ই নয়, ভবিষ্যতে যা হবে তা-ও ইহা সৃষ্টি করতে সক্ষম, কারণ সাধকের অবিদ্যার উপাদানে গঠিত অবর চেতনার কুটিল ও জটিল সব গতিবৃত্তি বাদ দিয়ে ইহা তার অন্তঃপুরুষ ও প্রকৃতিকে পুনর্গঠিত করে ও তাদের নবরূপ দেয় পরতরা দিব্য প্রকৃতির ধাতু ও শক্তিতে।

এই দ্বৈতভাবেও এক বিভক্ত অনুভূতি সম্ভব। ইহার এক মেরুতে সাধক শুধু জানতে পারে যে সৃষ্টির অধীশ্বর তার উপর তাঁর জ্ঞান, সামর্থ্য ও আনন্দের শক্তিপাত করেন তার মুক্তি ও দিব্যত্ব সাধনের উদ্দেশ্যে; তার কাছে (ঈশ্বর) শক্তি শুধু এই সমস্ত বিষয়ের প্রকাশক এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি বা ঈশ্বরের এক গুণ। অপর মেরুতে দেখা দিতে পারেন জগজ্জননী, বিশ্ব-সৃষ্টিকর্ত্রী যিনি নিজের চিৎ-ধাতু থেকে সৃষ্টি করেন বিভিন্ন দেবতা ও জগৎ এবং সকল বিষয় ও সত্তা। অথবা যদি সে দুই বিভাবই দেখে তা হলে সেই দৃষ্টিতে ইহারা বিষম ও পৃথক ভাবে দেখা দিতে পারে অর্থাৎ মনে হয় একটি অপরের গৌণ, শক্তিকে মনে করা হয় ঈশ্বরের দিকে যাবার এক উপায় মাত্র। ইহার ফল—একদিকে যাবার প্রবণতা বা সাম্যের অভাব, সুপ্রতিষ্ঠিত নয় এমন ফলপ্রদ শক্তি বা প্রকাশের এমন আলো যা সম্পূর্ণ স্ফুরন্ত নয়। এই দ্বৈতভাবের দুইটি দিকের সম্পূর্ণ মিলন সাধন ও তার দ্বারা তার চেতনা নিয়ন্ত্রিত হলেই সাধক উন্মুক্ত হতে শুরু করে এক পূর্ণতর শক্তির দিকে যা তাকে এখানকার ভাবনা ও শক্তির বিশৃঙ্খল সংঘর্ষ থেকে সম্পূর্ণ বাহিরে এনে নিয়ে যাবে এক পরতর সত্যের মধ্যে; আর ঐ সত্য যাতে এই অবিদ্যাময় জগৎকে দীপ্ত ও মুক্ত করে তার উপর একচ্ছত্রাধিপতিরূপে সক্রিয় হয় তার জন্য সেই সত্যের অবতরণ সম্ভব হবে এই শক্তির দ্বারা। এখন সে অখণ্ড রহস্যের নাগাল পেতে শুরু করে কিন্তু ইহাকে পুরোপুরি তার মুঠোর মধ্যে সে পায় তখনই যখন সে আদি অবিদ্যার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বিদ্যার

এই দ্বন্দ্বময় রাজ্যের ঊর্ধ্বে উঠে অতিক্রম করে সেই প্রান্তভূমি যেখানে অধ্যাত্ম-মন অন্তর্হিত হয় অতিমানসিক বিজ্ঞানের মাঝে। পরম একের এই তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা স্ফুরন্ত বিভাবের মাধ্যমেই সাধক শ্রেষ্ঠে অখন্ড সম্পূর্ণতার সহিত প্রবেশ করতে শুরু করে যজ্ঞেশ্বরের সত্তার গহনতম রহস্যের মধ্যে।

কারণ আপাতপ্রতীয়মান নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বের মাঝে ব্যক্তিসত্ত্বের উপস্থিতির রহস্যের পিছনেই প্রচ্ছন্ন আছে সৃষ্টির প্রহেলিকার সন্ধান, যেমন তা আছে নিশ্চেতনের মধ্য থেকে চেতনার, নিষ্প্রাণের মধ্য থেকে প্রাণের, অচেতন জড়ের মধ্য থেকে অন্তঃপুরুষের অভিব্যক্তির মাঝে। এখানে আবার আসে অপর একটি স্ফুরন্ত দ্বৈতভাব যা প্রথম দৃষ্টিতে জানার চেয়ে বেশী ব্যাপক এবং যা ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশমান শক্তির বিলাসের জন্য গভীরভাবে প্রয়োজনীয়। এই দ্বৈতের এক মেরুতে দাঁড়িয়ে সাধকের পক্ষে তার অধ্যাত্ম অনুভূতিতে সর্বত্র এক মৌলিক নৈর্ব্যক্তিকতা দেখার বিষয়ে মনকে অনুসরণ করা সম্ভব। জড় জগতের মধ্যে বিকাশমান অন্তঃপুরুষের যাত্রা শুরু হয় এক বিরাট নৈর্ব্যক্তিক অচিতি থেকে যার মধ্যে কিন্তু আমাদের আন্তর দৃষ্টি অনুভব করে এক আচ্ছন্ন অনন্ত চিৎ-পুরুষের উপস্থিতি; ইহার অগ্রগতির পথে আবির্ভূত হয় এক অনিশ্চিত চেতনা ও ব্যক্তিসত্ত্ব যা তাদের পূর্ণতম বিকাশেও মনে হয় এক অদ্ভুত ঘটনা কিন্তু এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলে এক নিরবচ্ছিন্ন ক্রমে; প্রাণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মন ছাড়িয়ে ইহা ঊর্ধ্বে ওঠে এক অনন্ত, নৈর্ব্যক্তিক ও পরম অতিচেতনার মাঝে যেখানে ব্যক্তিসত্ত্ব, মনশ্চেতনা, প্রাণ-চেতনা সব কিছু যেন লোপ পায় এক মুক্তিপ্রদ বিনাশ, নির্বাণের দ্বারা। এর চেয়ে এক নিম্নস্তরে সাধক অনুভব করে যে এই মৌলিক নৈর্ব্যক্তিকতা যেন এক সর্বব্যাপী বিশাল মুক্তিপ্রদা শক্তি। ইহা তার জ্ঞানকে মুক্ত করে ব্যক্তি-গত মনের সংকার্ণতা থেকে, তার সংকল্পকে ব্যক্তিগত কামনার কবল থেকে, তার হৃদয়কে ক্ষুদ্র অস্থির ভাবাবেগের বন্ধন থেকে, তার প্রাণকে ইহার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত পথ থেকে, তার অন্তঃপুরুষকে অহং থেকে; আর সেজন্য এদের সুবিধা হয় স্থিরতা, সমত্ব, ব্যাপ্তি, সার্বিকতা, ও আনন্ত্য লাভে। মনে হতে পারে যে পরম ব্যক্তিসত্ত্ব কর্মযোগের প্রধান অবলম্বন, প্রায় তার উৎস, কিন্তু এখানেও দেখা যায় যে নৈর্ব্যক্তিকতা শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদা শক্তি; এক ব্যাপ্ত অহংশূন্য নৈর্ব্যক্তিকতার মাধ্যমেই মুক্ত কর্মী ও দিব্য স্রষ্টা হওয়া সম্ভব। দ্বৈতভাবের নৈর্ব্যক্তিক মেরু থেকে এই অনুভূতির প্রবল শক্তিতে অভিভূত হয়ে জ্ঞানীরা যে ইহাকেই একমাত্র পথ এবং নৈর্ব্যক্তিক অতিচেতনকে সনা-তনের একমাত্র সত্য বলেছেন তাতে আশ্চর্য কিছু নেই।

কিন্তু তথাপি এই দ্বৈতভাবের বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান সাধকের নিকট অনুভূতির আর-একটি ধারা আসে যা হৃদয়ের পশ্চাতে ও আমাদের প্রাণ-

শক্তিরও মধ্যে গভীরভাবে অধিষ্ঠিত এই বোধিকে সমর্থন করে যে চেতনা, প্রাণ, অন্তঃপুরুষের মত ব্যক্তিসত্ত্বও নৈর্ব্যক্তিক শাশ্বততার মাঝে ক্ষণিকের অতিথি নয় বরং ইহারই মধ্যে আছে সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ। বিশ্ব-ক্রিয়াশক্তির এই মনোহর কুসুমের মাঝে আছে বিশ্ব-প্রকৃতির সাধনার লক্ষ্যের পূর্বাভাস, ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের আভাস। যেমন সাধকের মধ্যে গূঢ় দৃষ্টি খোলে, তেমন সে জানতে পারে পিছনের জগতের কথা যাতে চেতনা ও ব্যক্তিত্বের স্থান খুব বড়, তাদের মূল্যও সর্বাধিক; এমন কি এখানে, এই জড় জগতের মধ্যেও এই গূঢ় দৃষ্টিতে জানা যায় যে জড়ের নিশ্চেতনাকেও ভরে আছে এক গূঢ় ব্যাপক চেতনা, ইহার প্রাণহীনতা এক স্পন্দনময় প্রাণের আশ্রয়, ইহার যন্ত্র-পারিপাট্য এক অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞার কৌশল, আর ভগবান ও অন্তঃপুরুষ সর্বত্র বিরাজিত। সবার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন এক অনন্ত চিন্ময় পুরুষ যিনি নানারূপে নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করেছেন এই সকল জগতের মধ্যে; নৈর্ব্যক্তিকতা সেই প্রকাশের এক প্রথম উপায় মাত্র। বিভিন্ন তত্ত্ব ও শক্তির ক্ষেত্র ইহা, অভিব্যক্তির এক সম ভিত্তি কিন্তু এই সব শক্তি নিজেকে প্রকাশ করে বিভিন্ন সত্তার মাধ্যমে, বিভিন্ন চিৎপুরুষ তাদের চালক, আর তাদের উৎস যে পরম চিন্ময়পুরুষ তাঁর বিভূতি তারা। সেই পরম একের প্রকাশক এক বহুময় অগণিত ব্যক্তি-সত্ত্বই অভিব্যক্তির প্রকৃত অর্থ ও কেন্দ্রীয় লক্ষ্য; আর এখন যে ব্যক্তিসত্ত্বকে মনে হয় সংকীর্ণ, খণ্ড-খণ্ড, নিরুদ্ধ, তার একমাত্র কারণ এই যে, ইহা তার উৎসের নিকট উন্মুক্ত হয়নি অথবা সার্বিক ও অনন্তের সংগে যুক্ত হয়ে নিজের দিব্য সত্য ও পূর্ণতায় প্রস্ফুটিত হয়নি। সুতরাং এই জগৎ-সৃষ্টি আর অলীক বিভ্রম নয়, এক আকস্মিক যন্ত্রপারিপাট্য বা অপ্রয়োজনীয় কোন অভিনয় নয়, অথবা কোন পরিণতিহীন প্রবাহ নয়; চিন্ময় ও জীবন্ত সনাতনের অন্তরঙ্গ স্ফুরত্তা ইহা।

একই সৎস্বরূপের দুই প্রান্ত থেকে এই দুই একান্ত বিরোধী দৃষ্টি পূর্ণ-যোগের সাধকের কাছে কোন মৌলিক বাধা সৃষ্টি করে না; কারণ সেই অখণ্ড সৎস্বরূপের মধ্যস্থিত বিষয়ের অভিব্যক্তির জন্য এই দুই সংজ্ঞার ও পরস্পরের মধ্যে নেতিবাচক ও ইতিবাচক তাদের দুই শক্তিপ্রবাহের প্রয়োজনীয়তা তার সমগ্র উপলব্ধিতে জানা গিয়েছে। তার কাছে পরম ব্যক্তিসত্ত্ব ও নৈর্ব্যক্তিকতা তার অধ্যাত্ম উৎক্রান্তির দুই পক্ষ, আর সে এই ভবিষ্য দৃষ্টি পেয়েছে যে সে এমন উচ্চস্তরে উঠবে যেখানে এই দুয়ের সহায়কর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিণত হবে তাদের শক্তির সম্মিলনে, উদ্ঘাটিত করবে অখণ্ড সদ্-বস্তু এবং ভগবানের আদ্যাশক্তিকে মুক্ত করবে ক্রিয়ার মধ্যে। শুধু মৌলিক বিভাবে নয়, তার সাধনার সমগ্র ধারাতেই সে অনুভব করেছে তাদের যুগ্ম সত্য এবং পরস্পরের অনুপূরক কর্মপ্রণালী। এক নৈর্ব্যক্তিক সান্নিধ্য ঊর্ধ্ব

থেকে প্রভাব বিস্তার করেছে বা তার প্রকৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তা অধিগত করেছে; এক জ্যোতি নেমে এসে তার মন, প্রাণশক্তি ও দেহের কোষাণু পর্যন্ত পরিপ্লুত করে তাদের উদ্ভাসিত করেছে জ্ঞানালোকে, প্রকাশ করেছে তাকে নিজের কাছে—এমন কি নিম্নে তার একান্ত ভিন্নবেশী ও সম্পূর্ণ অজানা সব গতিবৃত্তি পর্যন্ত বাদ পড়েনি; আর যা কিছু অবিদ্যার অধিকারে ছিল সে সবের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে তাদের বিশুদ্ধ ও ধ্বংস করেছে বা তাদের মধ্যে এনেছে ভাস্বর পরিবর্তন। স্রোতের ধারায় বা সাগরের মত এক পরমাশক্তি তার মধ্যে নেমে এসে সক্রিয় হয়েছে তার সত্তায় ও প্রতি অঙ্গে এবং সর্বত্র ভেঙে নতুন ভাবে গড়েছে, নবরূপ দিয়েছে, রূপান্তরিত করেছে। এক পরম আনন্দ তার মধ্যে সবলে প্রবিষ্ট হয়ে দেখিয়েছে যে ইহা দুঃখ কষ্টকে অসম্ভব করে তুলতে ও যন্ত্রণাকেও দিব্যসুখে পরিণত করতে সমর্থ। এক অসীম প্রেম তাকে সকল প্রাণীর সহিত যুক্ত করেছে অথবা তার নিকট প্রকাশিত করেছে অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গতা ও অনির্বচনীয় মাধুর্যের ও সৌন্দর্যের এক জগৎ এবং পার্থিব জীবনের বৈষম্যের মধ্যেও আরোপ করতে শুরু করেছে তার পূর্ণতার বিধান ও পরমোল্লাস। এক অধ্যাত্ম সত্য ও ঋত প্রতিপন্ন করেছে যে এই জগতের শুভ ও অশুভ অপূর্ণ বা মিথ্যা এবং অনাবৃত করেছে এক পরম শুভ, সূক্ষ্ম সুষমা সম্বন্ধে ইহার সূত্র এবং ক্রিয়া ও বেদনা ও জ্ঞানের ঊর্ধ্বায়ন সম্বন্ধে ইহার সূত্র। কিন্তু এ সকলের পশ্চাতে ও তাদের মধ্যেও সে অনুভব করেছে এক পরম দেবকে যিনি সবই—জ্যোতি আনয়নকারী, দিশারী ও সর্বজ্ঞ, শক্তির অধীশ্বর, আনন্দদাতা, সুহৃৎ, সহায়, পিতা, মাতা, জগৎলীলায় খেলার সাথী, তার সত্তার পরমস্বামী, তার অন্তঃপুরুষের প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক। মানুষী ব্যক্তিভাবনায় যত সম্পর্ক জানা আছে সে সবই আছে ভগবানের সহিত অন্তঃপুরুষের সম্পর্কে; কিন্তু তাদের উত্তরায়ণ অতিমানবতার স্তরের দিকে, তারা সাধককে বাধ্য করে দিব্য প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হতে।

পূর্ণ যোগের লক্ষ্য হল সম্যক জ্ঞান, অখণ্ড শক্তি, সৃষ্টির পশ্চাতে অবস্থিত সর্বময় অনন্তের সহিত মিলনের সমগ্র সমৃদ্ধি। এই যোগের সাধকের পক্ষে কোন একটি মাত্র দিব্য বিভাব—যতই না ইহা মানুষের মনকে অভিভূত করুক, তার গ্রহণশক্তির পক্ষে ইহা যতই না পর্যাপ্ত হোক, যত সহজেই না ইহা একমাত্র বা চরম সদ্-বস্তু বলে গ্রহণীয় হোক—সনাতনের একমাত্র সত্য হতে পারে না। তার পক্ষে দিব্য বহুত্বের অনুভূতির পরিপূর্ণতা সাধনের দ্বারাই দিব্য একত্বের চরম অনুভূতি আরো গভীর, ব্যাপ্ত ও সমৃদ্ধ হয়। যেমন একেশ্বরবাদের তেমন বহুদেববাদের পশ্চাতে যা কিছু সত্য আছে তা-ও পূর্ণযোগীর লক্ষ্যের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু মানুষী মনের কাছে এ সবের

যে বাহ্য অর্থ তা ছাড়িয়ে সে ঊর্ধ্বে ওঠে ভগবানের মধ্যে তাদের রহস্যময় সত্যের সন্ধানে। বিভিন্ন বিবদমান সম্প্রদায় ও দর্শনের লক্ষ্য কি তা সে দেখে, ও সদ্‌বস্তুর প্রতি দিককে তার নিজের স্থানে স্বীকার করে কিন্তু এসবের সংকীর্ণতা ও প্রমাদ পরিহার করে সে আরো অগ্রসর হয় যতক্ষণ না সে আবিষ্কার করে তাদের সমন্বয়কারী এক পরম সত্যকে। ঈশ্বরকে মানুষ ভাবা, মানুষরূপে তার পূজা করা—এসব অপবাদে সে বিচলিত হয় না, কারণ সে দেখে এই সকল অজ্ঞানাচ্ছন্ন দাম্ভিক যুক্তিবুদ্ধির বিদ্বেষ, নিজেরই সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে বিয়োজনকারী মনের নিজস্ব আবর্তন। বর্তমানে আচরিত মানুষী সম্পর্কগুলি যদিও ক্ষুদ্রতা, দুষ্টতা ও অজ্ঞানতায় পূর্ণ তথাপি তারা ভগবানেরই মধ্যস্থিত কিছুর বিকৃত ছায়া; আর সাধক এ সবকে ভগবানের দিকে ফিরিয়ে তা-ই পায় যার ছায়া এই সব এবং তাকেই নামিয়ে আনে জীবনে অভিব্যক্তির জন্য। মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে পরম পূর্ণতার দিকে নিজেকে উন্মীলন করলে তার মধ্য দিয়েই এখানে ভগবানের আত্ম-অভিব্যক্তি সম্ভব কারণ ইহা অধ্যাত্ম বিবর্তনের গতি ও ধারার অবশ্য-ম্ভাবী পরিণতি সুতরাং মানুষের দেহে অধিষ্ঠিত, "মানুষী তনুম্‌ আশ্রিতম্‌" এই যুক্তিতে সে দেবতাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করবে না। ভগবান সম্বন্ধে সংকীর্ণ মানুষী ভাবনা অতিক্রম করে সে যাবে অদ্বিতীয় দিব্য সনাতনের কাছে, কিন্তু এ ছাড়াও সে তাঁকে দেখবে বিভিন্ন দেবতার আননে, তাঁর জগৎ-লীলার অবলম্বন স্বরূপ তাঁর বিভিন্ন বিশ্বব্যক্তিসত্ত্বে, তাঁকে চিনতে পারবে বিভিন্ন বিভূতি, দেহধারী জগৎশক্তি বা মানবনেতার মুখোসের অন্তরালে, তাঁকেই ভক্তি ও মান্য করবে গুরুমূর্তিতে, পূজা করবে অবতারের মধ্যে। ইহা এক অসামান্য সৌভাগ্য যদি সে এমন কারুর সাক্ষাৎ পায় যিনি তাঁর সাধনার সাধ্য পরম 'তৎ'-কে উপলব্ধি করেছেন বা তা-ই হয়ে উঠছেন আর যদি সে পরমের অভিব্যক্তি এই মানব আধারের মাঝে পরমের নিকট নিজেকে উন্মীলিত করে নিজেই পরমকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কারণ তাহাই উপচীয়মান পূর্ণতার স্পষ্টতম চিহ্ন, জড়ের মধ্যে যে উত্তরোত্তর দিব্য অবতরণ জড়সৃষ্টির গূঢ়মর্ম ও পার্থিব জীবনের সংগত ও সার্থক হেতু সেই পরম রহস্যের আশ্বাস তাহা।

এই ভাবেই যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞের অধ্বর গতিতে নিজেকে প্রকট করেন সাধকের কাছে। এই আত্ম-প্রকাশ আসতে পারে সাধনার যে কোন পর্যায়ে; কর্মের প্রভু যে কোন বিভাবে সাধকের অন্তরে কর্মের ভার নিতে পারেন এবং স্বীয় উপস্থিতি প্রকাশের জন্য ক্রমশঃ বেশী মাত্রায় চাপ দিতে পারেন সাধক ও কর্মের উপর। যথাসময়ে সকল বিভাবই আত্ম-প্রকাশ করে, প্রথমে পৃথক পৃথক ভাবে, কিন্তু সে সব মিলে, সম্মিলিত হয়ে পরে এক সাথে একীভূত হয়। পরিশেষে এই সকলের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয় পরম অখণ্ড সদ্‌-বস্তু;

অবিদ্যার অংশ এই মনের কাছে ইহা অজ্ঞেয় বটে, কিন্তু ইহা জ্ঞেয় কারণ অধ্যাত্ম চেতনা ও অতিমানসিক জ্ঞানের আলোকে ইহা স্বয়ং-প্রজ্ঞ।

* * *

যজ্ঞের প্রথম লক্ষ্য ও তার সাথে চরম সিদ্ধিরও সর্ত হল এক সর্বোত্তম সত্যের বা সর্বোত্তম সত্তা, চিৎ, শক্তি, আনন্দ ও প্রেমের এই প্রকাশ; ইহা যুগপৎ নৈর্ব্যক্তিক ও পুরুষ-বিধ হওয়ায় ইহা আমাদের সত্তার দুই দিকই অধিকার করে, কারণ আমাদের মধ্যেও আছে ব্যক্তি-পুরুষ ও নৈর্ব্যক্তিক বিভিন্ন স্তূপীকৃত তত্ত্ব ও শক্তির অজ্ঞানময় মিলন। যে তৎস্বরূপ এই ভাবে আমাদের দর্শন ও অনুভূতিতে ব্যক্ত হন তাঁর সহিত আমাদের আপন সত্তার মিলনের আকারেই যজ্ঞের সিদ্ধি প্রাপ্তি। এই মিলন তিন প্রকারের। একটি মিলন অধ্যাত্মস্বরূপে, তাদাত্ম্য বোধের দ্বারা; অপর একটি হল এই সর্বোত্তম সত্তা ও চেতনার মধ্যে আমাদের অন্তর পুরুষের আন্তর অধিষ্ঠানজনিত মিলন; তৃতীয় মিলন হল তৎস্বরূপ ও এখানে আমাদের তটস্থ সত্তার মধ্যে প্রকৃতি-গত সাদৃশ্য বা একত্বের স্ফুরন্ত মিলন। প্রথমটি হল অবিদ্যা থেকে মুক্তি ও পরম সৎ ও সনাতনের সহিত একাত্মবোধ, মোক্ষ, সাযুজ্য; ইহাই জ্ঞানযোগের বিশিষ্ট লক্ষ্য। দ্বিতীয়টি—ভগবানের সহিত বা মধ্যে অন্তঃপুরুষের নিবাস, সামীপ্য, সালোক্য; ইহা প্রেম ও আনন্দের সকল যোগের ঐকান্তিক আশা। তৃতীয়টি—প্রকৃতিগত তাদাত্ম্য, ভগবানের সহিত সাদৃশ্য, তৎস্বরূপ যেমন সিদ্ধ তেমন সিদ্ধ হওয়া সাধর্ম্য; ইহাই শক্তি ও সিদ্ধির অথবা দিব্য কর্ম ও সেবার সকল যোগের পরম উদ্দেশ্য। আত্ম-প্রকাশমান ভগবানের বহুময় ঐক্যের উপর এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই তিনটি একত্রে যে মিলিত সম্পূর্ণতা লাভ করে তাহাই পূর্ণযোগের সমগ্র পরিণতি, ত্রিমার্গের লক্ষ্য ও ত্রিবিধ যজ্ঞের ফল।

আমরাও পেতে পারি এই তাদাত্ম্য-মিলন অর্থাৎ সাযুজ্য,—আমাদের সত্তার ধাতু মুক্ত হয়ে রূপান্তরিত হবে পরম চিৎ-পুরুষের ধাতুতে, আমাদের চেতনা ঐ দিব্য চেতনায়, আমাদের অন্তঃপুরুষ-অবস্থা অধ্যাত্ম নিঃশ্রেয়সের উল্লাসে অথবা সত্তার শান্ত শাশ্বত আনন্দে। আমরাও পেতে পারি ভগবানের মধ্যে এমন ভাস্বর নিবাস যাতে অন্ধকার ও অবিদ্যার এই অবর চেতনার মধ্যে পতন বা নির্বাসনের কোন আশঙ্কা থাকে না, আর অন্তঃপুরুষ বিচরণ করতে পারে অবাধে ও নিঃসংশয়ে তার নিজের স্বাভাবিক জগতে—আলোক, আনন্দ, স্বাধীনতা ও একত্বের জগতে। আবার যেহেতু এই মিলন শুধু অন্য কোন পর জীবনে পেলে চলবে না, এখানেও তা সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করা দরকার, তখন তা করা চাই তার একমাত্র উপায়ে অর্থাৎ দিব্য সত্যের অবতরণের দ্বারা, দিব্য সত্যকে নামিয়ে এনে, এখানেই প্রতিষ্ঠা করে

অন্তঃপুরুষের আলো, আনন্দ, স্বাধীনতা, একত্বের স্বধাম। ভগবানের সহিত শুধু যে আমাদের অন্তঃপুরুষ ও চিৎ-পুরুষের মিলন হবে তা নয়, তাঁর সহিত আমাদের তটস্থ সত্তারও মিলন হবে আর ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে আমাদের অপূর্ণ প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে দিব্য প্রকৃতিরই সাদৃশ্যে ও প্রতি-মূর্তিতে; অপূর্ণ প্রকৃতিতে অবিদ্যার সব অন্ধ, বিকৃত, খণ্ডিত ও বিষম গতি-বৃত্তি পরিহার করে তাতে স্বগত করা চাই ঐ জ্যোতি, শান্তি, আনন্দ, সুষমা, সার্বিকতা, প্রভুত্ব, বিশুদ্ধতা, সিদ্ধি; ইহাকে পরিণত হতে হবে দিব্যজ্ঞানের আধারে, সত্তার দিব্য সংকল্প-সামর্থ্য ও শক্তির যন্ত্রে, দিব্য প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্যের প্রণালীতে। এই রূপান্তরই—আমরা এখন যা সব বা মনে হয় আমরা যা সব সে সবের অখণ্ড রূপান্তর—সাধন করা চাই সনাতন ও অনন্তের সহিত কালের মধ্যে সান্ত সত্তার মিলনের দ্বারা অর্থাৎ যোগের দ্বারা।

কিন্তু এই সমস্ত দুরূহ ফল পাওয়ার জন্য এক বিশাল পরিবর্তন, আমাদের চেতনার এক সামগ্রিক পরাবর্তন, প্রকৃতির অসাধারণ সম্পূর্ণ রূপান্তর অপরিহার্য। যা একান্তই আবশ্যক তা হল—আমাদের সমগ্র সত্তার উত্তরায়ণ, যে চিৎ-পুরুষ এখানে শৃঙ্খলিত, নিজের বিভিন্ন করণ ও পরিবেশের পাশে আবদ্ধ তার উত্তরায়ণ ঊর্ধ্বে শুদ্ধ মুক্ত পরম চিৎ-পুরুষে, অন্তঃ-পুরুষের উত্তরায়ণ কোন আনন্দময় অতি-পুরুষের দিকে, মনের উত্তরায়ণ কোন ভাস্বর-অতিমানসের পানে, প্রাণের উত্তরায়ণ কোন বিরাট অতিপ্রাণের অভি-মুখে, আমাদের জড়দেহেরও উত্তরায়ণ কোন শুদ্ধ ও নমনীয় চিৎ-পুরুষ-ধাতুর মধ্যে তার উৎসে যুক্ত হবার জন্য। ইহা ঊর্ধ্বে একটানা দ্রুত উড়ে যাওয়া হতে পারে না, ইহা বেদে বর্ণিত যজ্ঞের উদয়নের মত এক সানু থেকে অন্য সানুতে আরোহণ যাতে প্রতি সানু থেকে সাধক উপরে দেখতে পায় আরো কত উঁচু সানুতে তাকে উঠতে হবে। সেই সংগে ঊর্ধ্বে আমরা যা পেয়েছি তা নিম্নে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবতরণও আবশ্যক : এক-একটি শিখর জয় করার পর প্রতিটির বেলায় আমাদের ফেরা উচিত নিম্নের মর গতিবৃত্তিতে তার শক্তি ও দীপ্তি নামিয়ে আনার জন্য· একদিকে যেমন ঊর্ধ্বে নিত্য ভাস্বর জ্যোতির আবিষ্কার হবে তেমন অনুরূপভাবে মুক্ত হওয়া চাই সেই একই জ্যোতি যা প্রতি অংশে এমন কি অবচেতন প্রকৃতির গহনতম গুহাতেও পর্যন্ত নিগূঢ় রয়েছে। উত্তরায়ণের এই তীর্থযাত্রা এবং রূপান্তর সাধনের জন্য এই অবরোহণ এক যুদ্ধবিশেষ না হয়ে উপায় নেই—আমাদের নিজেদের সহিত এবং আমাদের চারি পাশের নানা বিরোধী শক্তির সহিত এক দীর্ঘ সংগ্রাম ইহা, আর ইহা এমন সংগ্রাম যে যতদিন ইহা চলে ততদিন মনে হয় যেন ইহার শেষ নেই। কারণ আমাদের তমসাচ্ছন্নত অবিদ্যাময় পুরনো প্রকৃতির সকল অংশই রূপান্তরকারী পরম প্রভাবকে পুনঃপুনঃ দৃঢ়ভাবে বাধা

দেবে আর তার এই মন্থরগতি, অনিচ্ছা বা প্রবল বাধাদানে সহায় হবে পরি-বেষ্টনকারিণী বিশ্বপ্রকৃতির অধিকাংশ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সব শক্তি; অবিদ্যার সব শক্তি ও অধিপতি ও শাসক সহজে তাদের সাম্রাজ্য ছাড়বে না।

প্রথমে যতদিন না আমাদের সমগ্র সত্তা এক মহত্তর সত্য ও জ্যোতি অথবা দিব্য প্রভাব ও সান্নিধ্যের দিকে উন্মীলনের জন্য প্রস্তুত ও উপযুক্ত হয় ততদিন হয়তো উদ্যোগ ও পরিশুদ্ধি পর্ব দীর্ঘ হবে আর প্রায়ই তা হয় ক্লান্তিকর ও কষ্টপূর্ণ। এমন কি কেন্দ্রে আমরা উপযুক্ত ও প্রস্তুত হলেও, উন্মীলনও আগে হলে আমাদের মন, প্রাণ ও দেহের সকল গতিবৃত্তি, এবং আমাদের ব্যক্তিভাবনার নানাবিধ বিবদমান অংগ ও উপাদান সম্মত হতে, অথবা সম্মত হলেও রূপান্তরের দুরূহ ও কঠিন সাধনা সহ্য করার উপযুক্ত হতে দীর্ঘ দিন কেটে যাবে। আবার আমাদের মধ্যকার যাবতীয় অংশ ইচ্ছুক হলেও বর্তমান চঞ্চল সৃষ্টির সহিত যুক্ত সকল বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের যে সংগ্রাম চালাতে হবে তা সবচেয়ে কঠিন হবে যখন তারা যেটুকু মাত্র সহজে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক—দীপ্ত অবিদ্যা মাত্র—তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আমরা চাইব চরম অতিমানসিক রূপান্তর ও চেতনার পরাবর্তন সাধন যার সাহায্যে দিব্য-সত্যকে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার পূর্ণ গরিমায়।

ইহারই জন্য আমাদের অতি-স্থিত 'তৎ'-এর নিকট সমর্পণ ও প্রপত্তি অপরিহার্য, তবেই তাঁর শক্তির পূর্ণ ও অবাধ ক্রিয়া সম্ভব। যতই আত্মদান অগ্রসর হবে, যজ্ঞকর্ম ততই আরো সহজ ও শক্তিশালী হবে, বিরোধী শক্তি-বর্গের বাধার ক্ষমতা, প্রবর্তনা ও গুরুত্বও তত হ্রাস পাবে। যা এখন মনে হয় দুরূহ বা অসাধ্য তাকে সম্ভব এমন কি নিশ্চিত করে তুলতে সব চেয়ে বেশী সহায় হয় দুটি আন্তর পরিবর্তন। সম্মুখে আবির্ভূত হয় ভিতরের নিগূঢ় অন্তরতম পুরুষ যাকে এতদিন ঢেকে রেখেছিল মনের অস্থির বৃত্তি, আমাদের প্রাণিক সংবেগের দুর্দমতা এবং শারীর চেতনার আচ্ছন্নতা অর্থাৎ সেই তিন শক্তি যাদের বিশৃঙ্খল সমাহারকে আমরা এখন বলি আমাদের আত্মা। ইহার ফলে কেন্দ্রে মুক্তিপ্রদ জ্যোতি ও ফলপ্রসূ শক্তিসমেত দিব্যসান্নিধ্যের বিকাশ ও আমাদের প্রকৃতির সকল সচেতন ও অবচেতন স্তরের মধ্যে তার বিচ্ছুরণ কম ব্যাহত হবে। দুইটি নিদর্শন ইহারাই, একটিতে সূচিত হয় মহান লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে আমাদের পরিবর্তন ও উৎসর্গের পূর্ণতা, অন্যটিতে ভগবান কর্তৃক আমাদের যজ্ঞের চরম স্বীকৃতি।

পঞ্চম অধ্যায়

যজ্ঞের উদয়ন (১)

জ্ঞানের বিভিন্ন কর্ম—চৈত্য পুরুষ

তাহলে যে পরতম ও অনন্তের নিকট আমরা আমাদের যজ্ঞ নিবেদন করি তাঁর সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের মূল কথাগুলি বলা হল, আর বলা হল এই যজ্ঞেরই প্রকৃতি সম্বন্ধে, তবে এই যজ্ঞের তিনটি বিভাব—কর্মযজ্ঞ, প্রেম ও অর্চনার যজ্ঞ এবং জ্ঞান যজ্ঞ। কারণ যখন আমারা শুধু কর্মযজ্ঞের কথা বলি তখনো আমরা মনে করি না যে আমরা শুধু বাহ্য কর্মগুলি নিবেদন করি, আমরা মনে করি যে আমাদের মধ্যে যা-কিছু সক্রিয় ও স্ফুরন্ত তা-ও নিবেদন করি; আমাদের বাহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের আন্তর গতিবৃত্তিকেও সমভাবে উৎসর্গ করা চাই একই বেদীতে। যে-সব কর্মকে আমরা যজ্ঞ করে তুলি সে সবেরই আন্তর মর্ম হল আত্ম-শিক্ষা ও আত্ম-সিদ্ধির সাধনা, আর ইহার দ্বারা আমরা আশা করি যে আমাদের মন, হৃদয়, সংকল্প, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও দেহের সকল গতিবৃত্তির মধ্যে ঊর্ধ্ব থেকে বর্ষিত এক আলোকের সাহায্যে আমরা হয়ে উঠব সচেতন ও দীপ্তিমান। দিব্য চেতনার উপচীয়মান আলোক অন্তঃপুরুষসত্তায় আমাদের সমীপস্থ করবে জগৎ-যজ্ঞের অধীশ্বরের সহিত এবং আমাদের অন্তরতম সত্তায় ও চিন্ময় ধাতুতে তাঁর সহিত এক করবে তাদাত্ম্য-বোধের দ্বারা—প্রাচীন বেদান্ত মতে ইহাই জীবনের পরমার্থ; উপরন্তু আমাদের প্রকৃতিকে ভগবানের সদৃশ করে সম্ভূতিতে তাঁর সহিত আমাদের এক করারও প্রবণতা তাতে থাকে; বৈদিক ঋষিদের নিগূঢ়ার্থ ভাষায় যজ্ঞপ্রতীকের রহস্যময় তাৎপর্য ইহাই।

কিন্তু ইহাই যদি মনোময় পুরুষ থেকে পূর্ণযোগের উদ্দিষ্ট অধ্যাত্ম-পুরুষে দ্রুত ক্রম-বিকাশের বিশিষ্ট লক্ষণ হয় তা হলে এমন এক প্রশ্ন ওঠে যা সমস্যাসঙ্কুল, তবে তার স্ফুরন্ত গুরুত্ব অনেক বেশী। আমাদের বর্তমান জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে, আমাদের এখনো অপরিবর্তিত মানুষী প্রকৃতির উপ-যোগী কাজকর্ম সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি হবে? এক মহত্তর চেতনার দিকে উৎক্রান্তি এবং তার শক্তির দ্বারা আমাদের মন, প্রাণ ও দেহকে অধিগত করা—ইহাই যোগের প্রধান উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে; অথচ বলা হচ্ছে

যে পরম চিৎ-পুরুষের ক্রিয়ার অব্যবহিতক্ষেত্র এখানকার জীবন, অন্যত্র অন্য কোন জীবন নয়; আর এই ক্রিয়া হল রূপান্তর, আমাদের করণগত সত্তা ও প্রকৃতির ধ্বংস সাধন নয়। তা হলে আমাদের সত্তার বর্তমান সব কাজকর্মের পরিণাম কি? অর্থাৎ জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানের প্রকাশের চেষ্টায় মনের কাজ, আমাদের ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির অংশগুলির কাজ, আমাদের বহির্মুখী আচরণ, সৃজন, উৎপাদন, এবং মানুষ, বিষয়, জীবন, জগৎ, নিসর্গ শক্তি-সমূহের উপর কর্তৃত্বপ্রয়াসী সংকল্পের কাজ—এ সবের কি পরিণাম? এই সব কি পরিত্যাগ করে তার জায়গায় আনতে হবে অন্য কোন জীবনপ্রণালী যাতে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন চেতনা সন্ধান পাবে তার যথার্থ বহিঃপ্রকাশ ও রূপ? না আমাদের কর্তব্য হবে তাদের বর্তমান বাহ্যরূপ বজায় রেখে কাজের মধ্যে আন্তরভাবের দ্বারা তাদের রূপান্তরিত করা বা চেতনার পরাবর্তনের দ্বারা তাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত ক'রে নতুন নতুন রূপের মধ্যে তাদের মুক্ত করা যেমন পৃথিবীতে হয়েছিল যখন মানুষ নিয়েছিল পশুর প্রাণিক কাজকর্ম, তাদের মধ্যে যুক্তি, চিন্তাশীল সংকল্প, পরিমার্জিত ভাবাবেগ, সুগঠিত বুদ্ধি মিলিয়ে তাদের মানসিকভাবাপন্ন, প্রসারিত ও রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে? অথবা আমাদের কি কর্তব্য কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু সেইগুলি রক্ষা করা যেগুলি অধ্যাত্ম পরিবর্তন গ্রহণে সমর্থ আর বাকী সকলের জন্য এমন এক নতুন জীবন সৃজন করা যা শুধু অন্তঃপ্রেরণা ও প্রবর্তক শক্তিতে নয় তার রূপেও সম-ভাবে প্রকাশ করবে মুক্ত পুরুষের ঐক্য, ব্যাপ্তি, শান্তি, হর্ষ ও সুষমা? এই সমস্যাই তাদের মনকে সব চেয়ে বেশী ভাবিয়েছে যারা যোগের দীর্ঘ যাত্রায় মানুষ থেকে ভগবানের দিকে যাবার পথ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছে।

সব রকম সমাধানের কথাই বলা হয়েছে: তাদের এক প্রান্তের কথা এই যে দেহের পক্ষে যতদূর সম্ভব সব কাজ ও জীবন পুরোপুরি বর্জন কর; আর অন্য প্রান্তের কথা—জীবন যেমন তেমন স্বীকার কর তবে তার মধ্যে এমন নতুন ভাব আন যাতে তার গতিবৃত্তি প্রাণবন্ত ও উত্তোলিত হয়, বাহ্যতঃ তারা দেখতে আগের মতই থাকবে কিন্তু তাদের পিছনের ভাব এবং ফলতঃ তাদের আন্তর তাৎপর্যও বদলে যাবে। সংসারত্যাগী বৈরাগী বা অন্তরাবৃত্ত রসোন্মত্ত আপনভোলা গূঢ়বাদীর চরম সমাধান স্পষ্টতঃ পূর্ণযোগের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত; কারণ যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় জগতের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করা তাহলে জগৎক্রিয়া ও ক্রিয়ামাত্রকেই পুরোপুরি পরিহার করে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। এর চেয়ে কম উঁচু সুরে ধার্মিক মন প্রাচীন কালে যে বিধান দিয়েছে তা এই যে শুধু সেই সব কাজ রাখা যেগুলি স্বভাবতঃ ভগবানের অন্বেষণ, সেবা বা পূজার অঙ্গ বা তার আনুষঙ্গিক, অথবা এসবের সহিত সেগুলিও রাখা যায় যেগুলি সাধারণ জীবন-যাত্রার

জন্য অপরিহার্য, তবে সেসব করা চাই ধর্মভাবে এবং ঐতিহ্যগত ধর্ম ও শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী। কিন্তু কর্মের মধ্যে মুক্ত পুরুষের চরিতার্থতার পক্ষে এই অনুষ্ঠানপর নিয়ম উপযোগী নয়; তাছাড়া ইহারাও একমাত্র চরম উদ্দেশ্য—এক পরপারের জীবন, স্বীকারই করা হয় যে এই জাগতিক জীবন থেকে ঐ জীবনে উত্তীর্ণ হবার জন্য ইহা শুধু এক সাময়িক সমাধান। বরং পূর্ণযোগের বেশী অনুকূল হল গীতার উদার নির্দেশ যে মুক্তপুরুষের উচিত সত্যের মধ্যে বাস করে জীবনের সকল কর্ম করা যাতে গূঢ় দিব্য দেশনায় পরিচালিত বিশ্ব বিবর্তনের পরিকল্পনা ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ না হয়। কিন্তু বর্তমানে অবিদ্যার মধ্যে যে সকল রূপে ও ধারায় কর্ম করা হয় যদি সেই-ভাবেই কর্ম করা হয় তাহলে আমাদের লাভ হবে শুধু অন্তরের দিকে, আর বিপদ এই যে আমাদের জীবন এমন এক অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক সূত্রে পরিণত হতে পারে যাতে আন্তর আলোকের কাজ হবে বাহ্য প্রদোষ-আলোকের কাজ, পূর্ণ পরম চিৎ-পুরুষ নিজেকে প্রকাশ করবেন তাঁর স্বীয় দিব্য প্রকৃতির বিস-দৃশ অপূর্ণতার আঁধারে। যদি কিছু কালের জন্য ইহার চেয়ে ভাল কিছু না করা যায়—আর সংক্রমণের অবস্থায় দীর্ঘ দিন এইরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী—তা হলে এই অবস্থাই চলতে থাকবে যতদিন না উদ্যোগ পর্ব শেষ হয় আর অন্তঃস্থ চিৎ-পুরুষ এমন শক্তিশালী হয় যাতে ইহা নিজস্ব রূপ আরোপ করতে পারে দেহ ও বাহিরের জগতের জীবনের উপর, তবে ইহাকে স্বীকার করা যায় শুধু সংক্রমণের পর্যায় হিসাবে, আমাদের অন্তঃপুরুষের আদর্শ বা পথের চরম সীমানা হিসাবে নয়।

একই কারণে সুনীতির সমাধানও যথেষ্ট নয়; কারণ নৈতিক অনুশাসন শুধু প্রকৃতির বন্য অশ্বগুলির মুখে কাঁটা-লাগাম পরিয়ে অতিকষ্টে তাদের কিছুটা বশে আনে, কিন্তু প্রকৃতি যাতে দিব্য আত্মজ্ঞানজাত বোধি সার্থক করে নিরাপদ ও স্বাধীনভাবে চলতে পারে তাকে তেমন রূপান্তরিত করার সামর্থ্য তার নেই। বড়জোর তার পদ্ধতি হল গন্ডীটানা, শয়তানকে জোর করে দমন করা আর আমাদের চারিদিকে নিরাপত্তার প্রাকার তোলা, তবে এ নিরাপত্তা আপেক্ষিক ও খুবই অনিশ্চিত। কি সাধারণ জীবনে, কি যোগে আত্ম রক্ষার এই কৌশল বা অনুরূপ অন্য কৌশলের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, তবে যোগে ইহা শুধু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাবার লক্ষণ। আমাদের লক্ষ্য হল মৌলিক রূপান্তর ও অধ্যাত্ম জীবনের বিশুদ্ধ ব্যাপ্তি; আর তার জন্য আমাদের পাওয়া দরকার আরো গভীর সমাধান, নীতির ঊর্ধ্বে আরো নিশ্চিত কোন স্ফুরন্ত তত্ত্ব। অন্তরে আধ্যাত্মিক ও বাহিরে নীতি-পরায়ণ হওয়া—ইহাই সাধারণ ধর্মীয় সমাধান, কিন্তু ইহা তো এক আপোস-রফা; আন্তর সত্তা ও বহির্জীবন এই উভয়কেই আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করা—

ইহাই আমাদের সাধনার লক্ষ্য, জীবন ও চিৎ-পুরুষের মধ্যে কোন আপোষ-রফা নয়। মানুষের যে ভ্রান্ত মূল্যায়নে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকবোধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না, বরং দাবী করা হয় যে নৈতিকবোধই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র সত্যকার অধ্যাত্ম উপাদান সে মূল্যায়ন আমাদের কোন কাজে লাগে না; কারণ নীতি এক মানসিক সংযম মাত্র, সীমিত প্রমাদী মন তো মুক্ত চিরদীপ্ত পরম চিৎ-পুরুষ নয়, আর তা হতেও পারে না। তেমনই সেই উপদেশও মানা অসম্ভব যা জীবনকেই একমাত্র লক্ষ্য করে তার বর্তমান উপাদানগুলিকেই মূল হিসাবে স্বীকার করে আর শুধু একে চকচকে ও রঙীন করার জন্য ডেকে নিয়ে আসে অর্ধ বা কৃত্রিম অধ্যাত্ম আলোক। তাছাড়া প্রায়শঃই চেষ্টা হয় প্রাণ ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে গোঁজামিল আনার—অন্তরে মরমীয়া অনুভূতির সঙ্গে বাহিরে থাকে তার অনুকূল সৌন্দর্যবোধে জারিত বুদ্ধিগত ও ইন্দ্রিয়পর প্রকৃতি উপাসনা বা উন্নত ধরনের ভোগসুখবাদ যা আধ্যাত্মিক সমর্থনের আভায় নিজের মধ্যে পরিতৃপ্ত থাকে· ইহাও পর্যাপ্ত নয় কেন না ইহাও এমন আপোষ-রফা যা অনিশ্চিত ও কখনো সফল হয় না এবং দিব্য সত্য ও অখণ্ডতা থেকে বহু দূরে যেমন দূরে ইহার বিপরীত, নীতিপরায়ণতা। উচ্চ আধ্যাত্মিক শিখরের সহিত নিম্ন স্তরের সাধারণ মন ও প্রাণের দাবী-দাওয়ার যোগ-সাধনের সূত্রের জন্য যে প্রমাদী মানব মন হাতড়ে বেড়ায়, এ সমস্ত তারই বিভ্রান্ত সমাধান। এদের পিছনে যেটুকু আংশিক সত্য গোপন রয়েছে তা কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা অধ্যাত্মস্তরে উন্নীত হয়ে পরিশুদ্ধ হবে পরম ঋত চেতনায় এবং মুক্ত হবে অবিদ্যার ক্ষেত্র ও প্রমাদ থেকে।

মোট কথা ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কোনই স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয় যতদিন-না পেঁছান যায় অতিমানসিক ঋত চেতনায় যার দ্বারা বিষয়সমূহের বাহ্য রূপের প্রকৃত স্থান নির্ণীত ও তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়, আর প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যকার সেই তত্ত্ব যা সরাসরি অধ্যাত্মস্বরূপ থেকে উদ্ভূত। ইতিমধ্যে আমাদের একমাত্র নিরাপদ উপায় হল অধ্যাত্ম অনুভূতির কোন নির্দেশক বিধান আবিষ্কার করা, আর না হয় অন্তরে এমন আলোক মুক্ত করা যা আমাদের যাত্রার দিশারী হবে যতদিন না সেই মহত্তর সাক্ষাৎ ঋতচেতনাকে আমরা লাভ করি ঊর্ধ্বে বা তা সঞ্জাত হয় আমাদের মধ্যে। কারণ আমাদের মধ্যে বাকী যা সব শুধু বাহ্য, যা সব অধ্যাত্ম বোধ বা দেখা নয়, বুদ্ধির রচনা, বর্ণনা বা সিদ্ধান্ত, প্রাণশক্তির ব্যঞ্জনা বা প্ররোচনা, জড়বস্তুর অনস্বীকার্য প্রয়োজনীয়তা—এ সকলই কখনো অর্ধ-আলো, কখনো মিথ্যা আলো যা বড় জোর কিছুদিনের জন্য বা অল্প পরিমাণে কাজে লাগে আর অন্য সময় হয় আমাদের বাধা দেয়, নয় বিভ্রান্ত করে। অধ্যাত্ম অনুভূতির নির্দেশক বিধান পাবার একমাত্র উপায় হল দিব্য চেতনার নিকট মানুষী চেতনার উন্মীলন;

সে সামর্থ্য থাকা চাই যাতে আমরা আমাদের মধ্যে নিতে পারি দিব্যশক্তির কর্মপ্রণালী ও আদেশ ও স্ফুরন্ত উপস্থিতি, আর নিজেদের সমর্পণ করতে পারি তাঁর নিয়ন্ত্রণের নিকট; ঐ সমর্পণ ও নিয়ন্ত্রণই নিয়ে আসে সেই দেশনা। কিন্তু এই সমর্পণ ধ্রুব হয় না, দেশনারও স্থির নিশ্চয়তা থাকে না যত-দিন আমরা অবরুদ্ধ থাকি মনের রূপায়ণ ও প্রাণের সংবেগ ও অহং-এর প্ররোচনার দ্বারা যাসব সহজেই আমাদের ফেলতে পারে মিথ্যা অনুভূতির ফাঁদে। এই বিপদ কাটবার একমাত্র উপায় হল আমাদের বর্তমান চৌদ্দআনা প্রচ্ছন্ন অন্তরতম পুরুষ বা চৈত্যপুরুষের উন্মীলন; এই চৈত্যপুরুষ আমাদের অন্তরে পূর্ব থেকেই আছে, কিন্তু সাধারণতঃ সক্রিয় নয়। এই আন্তর আলোককেই আমাদের মুক্ত করা চাই: কারণ যত দিন আমরা অবিদ্যার অবরোধের মধ্যে পথ চলি আর যত দিন না ঋতচেতনা আমাদের ভগবদ্‌অভিমুখী সাধনার ভার পুরোপুরি গ্রহণ করে ততদিন এই অন্তরতম পুরুষের আলোকই আমাদের একমাত্র ধ্রুব জ্যোতি। এক তো আমাদের মধ্যে দিব্যশক্তির ক্রিয়া চলে সংক্রমণের অবস্থার মধ্যে, উপরন্তু চৈত্যপুরুষের আলো আমাদের সর্বদাই পথ দেখায় যাতে আমরা অবিদ্যার শক্তিসমূহের দাবী ও প্ররোচনা থেকে সরে এসে সেই পরতর প্রচোদনার কাছে সজ্ঞানে ও চোখখুলে আনুগত্য স্বীকার করি; এই দুই মিলে সৃষ্টি করে আমাদের ক্রিয়ার এমন এক সদা অগ্রসরশীল আন্তর বিধান যা বর্তমান থাকে যতদিন-না আমাদের প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক বিধান। সংক্রমণের অবস্থায় হয়তো কিছুকাল ধরে আমরা সকল জীবন ও ক্রিয়া নিয়ে সে-সব ভগবানের কাছে নিবেদন করি শুদ্ধি ও পরিবর্তনের জন্য এবং তাদের মধ্যস্থিত সত্যের মুক্তির জন্য; আর এক সময় আসতে পারে যখন আমরা পিছিয়ে এসে আমাদের চারিদিকে এক আধ্যাত্মিক দেওয়াল তুলি আর তাদের প্রবেশ পথ দিয়ে শুধু সেই সব কাজ কর্ম আসতে দিই যেগুলি অধ্যাত্ম রূপান্তরের বিধান অনুযায়ী চলতে স্বীকার করে: আর এক তৃতীয়কাল আসতে পারে যখন আবার সম্ভব করা যায় স্বচ্ছন্দ ও সর্বগ্রাহী ক্রিয়া, তবে পরম চিৎ-পুরুষের পূর্ণ সত্যের উপযোগী নতুন রূপে। তবে এ সমস্ত কোন মানসিক বিধির দ্বারা স্থির হবে না, স্থির হবে আমাদের মধ্য-কার অন্তঃপুরুষের আলোকে এবং সেই দিব্য সামর্থ্যের নিয়ন্ত্রণী শক্তি ও বর্ধিষ্ণু দেশনার দ্বারা যা প্রথমে গূঢ়ভাবে বা প্রকাশ্যে প্রেরণা দেয়, পরে স্পষ্ট-ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করতে শুরু করে এবং পরিশেষে যোগের সকল ভার তুলে নেয় নিজের হাতে।

যোগের তিন বিভাব অনুযায়ী কর্মকেও আমরা ভাগ করতে পারি তিন শ্রেণীতে, জ্ঞানের কর্ম, প্রেমের কর্ম ও প্রাণে-সংকল্প-শক্তির কর্ম; আর আমরা দেখতে পারি এই আরো সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিধি কেমন কার্যকরী হয় প্রতি

বিভাগে এবং কেমন করে ইহা সাধন করে অপরা প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতিতে সংক্রমণ।

* * *

যোগের দিক থেকে মানবমনের জ্ঞানান্বেষণের বিভিন্ন কর্মকে দুই বর্গে ভাগ করা স্বাভাবিক। এক হল বুদ্ধির অতীত পরম জ্ঞান যা নিজেকে একাগ্র করে পরম এক ও অনন্তকে তাঁর অতিস্থিতিতে আবিষ্কার করতে বা চেষ্টা করে বোধি, ধ্যান, সরাসরি আন্তর সংযোগের দ্বারা প্রকৃতির অবভাসের পশ্চাতে সব চরম সত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে: অন্যটি হল অবর প্রাকৃত বিজ্ঞান যা নিজেকে ছড়িয়ে দেয় বিভিন্ন প্রতিভাসের বাহ্য জ্ঞানে, তবে এই সব প্রতিভাস পরম এক ও অনন্তেরই বিভিন্ন ছদ্মবেশ, এই বেশেই তিনি আমাদের কাছে প্রতিভাত হন আমাদের চারিদিককার জগদ্-অভিব্যক্তির আরো বাহিরের সব রূপের ভিতর ও মধ্য দিয়ে। এই দুই, পরার্ধ ও অপরার্ধ—অর্থাৎ যে আকারে মানুষ মনের অবিদ্যাচ্ছন্ন সীমার মধ্যে তাদের রচনা বা ভাবনা করেছে—তারা এমন কি সেখানেও তাদের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে নিজেদের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান গড়ে তুলেছে। দর্শন কখনো অধ্যাত্ম বা অন্ততঃ বোধিমূলক, কখনো আচ্ছিন্ন ও বুদ্ধিগত, কখনো বা অধ্যাত্ম অনুভূতিকে বুদ্ধির ছাঁচে ফেলেছে আবার কখনো ন্যায়যুক্তির সাহায্যে চিৎ-পুরুষের আবিষ্কারগুলিকে সমর্থন করেছে কিন্তু সব সময়ই সে দাবী করেছে যে চরম সত্য নির্ধারণের কাজ তারই এলাকাভুক্ত। কিন্তু বুদ্ধিগত দর্শন তার আচ্ছিন্নতাব অভ্যাসের দরুন জীবনের ক্ষেত্রে কদাচিৎ কোন প্রভাব বিস্তার করেছে—এমন কি যখন ইহা ব্যবহারিক জগৎ ও ক্ষণস্থায়ী বিষয় অন্বেষণের ক্ষেত্রে নিজেকে পৃথক না করে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চ শিখরে নিবদ্ধ থাকেনি, তখনো কোন প্রভাব ছিল না। অবশ্য কখনো কখনো তাব প্রভাব এসেছে ভাববিলাসপরায়ণ উচ্চ চিন্তার উপর যখন ভবিষ্যতের কোন উপকারিতা বা উদ্দেশ্য বিনাই মানসিক সত্য অন্বেষণ করা হয়েছে শুধু সত্যের জন্যই, কখনো এসেছে কথা ও ভাবনার কুয়াশাভরা উজ্জ্বল মেঘরাজ্যে মনের সূক্ষ্মক্রীড়াকৌশলের বিষয়ে। কিন্তু তার এই বিচরণ বা ক্রীড়াকৌশল ঘটেছে জীবনের আরো স্থূল বাস্তবতা থেকে বহু দূরে। ইওরোপে প্রাচীন দর্শন আরো স্ফুরন্ত ছিল কিন্তু মাত্র অল্প কয়েকজনের জন্য; ভারতবর্ষে ইহার যে সব রূপ আরো আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ছিল সেগুলির দ্বারা জাতির জীবন বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিল কিন্তু রূপান্তরিত হয়নি। তবে ধর্ম দর্শনের মত একলা উচ্চ শিখরে বাস করতে চেষ্টা করেনি; বরং তার লক্ষ্য ছিল মানুষের মনের অংশ অপেক্ষা প্রাণের সব অংশকে অধিকার করে তাদের আকর্ষণ করা ভগবানের দিকে, তার ব্যক্ত অভিপ্রায় ছিল অধ্যাত্ম সত্য এবং প্রাণিক ও জড়গত জীবনের মাঝে সেতু

নির্মাণ করা, সে চেষ্টা করেছিল যাতে নিম্নতনকে ঊর্ধ্বতনের অধীন করে তাদের মধ্যে মিল আনা, জীবনকে ভগবদ্-সেবার উপযোগী করা, পৃথিবীকে স্বর্গের অনুগত করা সম্ভব হয়। কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই প্রয়োজনীয় চেষ্টার ফল হয়েছে বিপরীত—স্বর্গের নামে পৃথিবীর কামনার অনুমোদন করা হয়েছে। কারণ সর্বদাই ধর্মের ভগবানকে পরিণত করা হয়েছে মানব-অহং-এর পূজা ও সেবার উপলক্ষস্বরূপ। ধর্ম বারবার তার অধ্যাত্ম অনুভূতির উজ্জ্বল মর্মলোক পরিহার করে সর্বদাই চেয়েছে প্রাণের সহিত অনিশ্চিত আপোষের পরিধি বৃদ্ধি করতে আর এইভাবে ইহা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে তার বিশাল আঁধারের মাঝে; চিন্তাশীল মনকে তুষ্ট করার চেষ্টায় ইহা বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে প্রপীড়িত বা শৃঙ্খলিত করেছে ধর্মশাস্ত্রের গোঁড়া মতবাদের স্তূপে; আবার মানুষের হৃদয়কে জয় করতে গিয়ে ইহা নিজেই পড়েছে ধর্মানুরাগের ভাবালুতা ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির গর্তে, মানুষের প্রাণিক প্রকৃতিকে বশে আনার জন্য তাকে নিজের এলাকায় আনতে গিয়ে ইহা নিজেই কলুষিত হয়ে পড়েছে; আর ধর্মান্ধতা, জিঘাংসার হিংস্রতা, কঠোর বা বর্বর অত্যাচার প্রবৃত্তি, রাশি রাশি মিথ্যাচার, অবিদ্যার প্রতি ঘোর আসক্তি প্রভৃতি যে সবের দিকে প্রাণিক প্রকৃতি প্রবণ তাদের কবলগ্রস্ত হয়েছে; ইহার ইচ্ছা ছিল মানুষের শারীর অংশকে ভগবানের দিকে নিতে, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে ইহা নিজেই আবদ্ধ হল যাজকের যান্ত্রিকতায়, অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠানে এবং নিষ্প্রাণ বিধি-ব্যবস্থার কঠোর বন্ধনে। উৎকৃষ্টের বিকৃতির ফল হল নিকৃষ্ট; ইহা প্রাণ-সামর্থ্যের এক বিচিত্র রসায়ন, এ যেমন মন্দ থেকে ভাল আনতে পারে তেমন ভাল থেকেও মন্দ আনে। সঙ্গে-সঙ্গে এই নিম্ন মুখী আকর্ষণ থেকে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টায় ধর্ম বাধ্য হল সৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করতে; জ্ঞান, কর্ম, কলা, ও জীবন পর্যন্ত ভাগ হল দুই বর্গে—অধ্যাত্ম ও জাগতিক, ধর্মীয় ও ঐহিক, পবিত্র ও অপবিত্র; কিন্তু এই আত্ম-রক্ষামূলক পার্থক্য নিজেই হয়ে পড়ল কৃত্রিম ও আচারগত, রোগ সারার চেয়ে বরং বেড়েই গেল। অপর পক্ষে প্রাকৃত বিজ্ঞান ও ললিত কলা প্রথমে ধর্মের অনুগত থাকলেও বা তার ছায়ায় বাস করলেও শেষে ধর্মের দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিঃসম্পর্ক বা বিরুদ্ধ হয়ে উঠল, অথবা তত্ত্ব-জ্ঞানমূলক দর্শন ও ধর্মের আদর্শকে প্রাণহীন, নিষ্ফল ও সুদূর অথবা অর্থহীন ভ্রান্তিপূর্ণ চরম অবাস্তব মনে করে তা থেকে এমন কি পিছিয়ে এসেছে উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা অবিশ্বাসভরে। মানবমনের একদেশী অসহিষ্ণুতার ফলে বিচ্ছেদ যত পুরোপুরি হতে পারে, এক সময় এদের মধ্যে বিচ্ছেদ তত পুরোপুরি হয়েছিল, আর এমন কি আশঙ্কা হল যে ইহার পরিণামে পরতর বা আরো বেশী অধ্যাত্ম বিদ্যা লাভের সকল চেষ্টা একেবারে নির্মূল হবে। কিন্তু তথাপি

পার্থিববিষয়াসক্ত জীবনেও পরা বিদ্যাই একমাত্র বিষয় যা বরাবর প্রয়োজনে লাগে, ইহার বিহনে বিভিন্ন অবর বিজ্ঞান ও বৃত্তি যতই ফলপ্রদ হ'ক-না কেন, তাদের সম্পদের প্রাচুর্য যতই বিচিত্র, অবাধ ও অত্যাশ্চর্য হ'ক-না কেন সে সব সহজেই এমন যজ্ঞ হয়ে ওঠে যা নিবেদিত হয় বিধিহীন ভাবে ও মিথ্যা দেবতার কাছে: মানুষের হৃদয়কে কলুষিত ও শেষে কঠিন করে, তার মনের দৃষ্টির পরিধিকে সংকুচিত করে সে সব মানুষকে আবদ্ধ করে জড়ের পাষাণ কারাগারে অথবা নিয়ে ফেলে এক চরম অভেদ্য অনিশ্চয়তা ও মোহভঙ্গের মাঝে। এই যে অর্ধ-জ্ঞান যা অবিদ্যা বৈ আর কিছু নয় তার উজ্জ্বল জোনাকি আলোর ঊর্ধ্বে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে নিষ্ফল অজ্ঞেয়বাদ।

যে যোগের লক্ষ্য পরাৎপরের সর্বগ্রাহী উপলব্ধি সে যোগ বিরাট পুরুষের কোন কাজই বা এমন কি স্বপ্নও—যদি তা আদৌ স্বপ্ন হয়—অবজ্ঞা করবে না অথবা মানুষের মাঝে যে গৌরবোজ্জ্বল দুরূহ কর্ম ও বহুমুখী জয় সাধন করা তার অভিপ্রায় তা থেকে সে পিছিয়ে আসবে না। কিন্তু এই উদারতার প্রথম সর্ত এই যে জগতে আমাদের সব কর্মও হবে যজ্ঞের অংশ যা নিবেদিত হবে সর্বোত্তমের নিকট, অন্য কারোর কাছে নয়, দিব্যশক্তির নিকট, অন্য কোন শক্তির কাছে নয় এবং তা করা চাই সঠিক মনোভাব ও সঠিক জ্ঞান নিয়ে স্বাধীন অন্তঃপুরুষের দ্বারা, জড়-প্রকৃতির সম্মোহিত ক্রীতদাসের দ্বারা নয়। কর্মের বিভাগ যদি করতেই হয় তবে সে বিভাগ হবে,—যে সব কর্ম পবিত্র অগ্নিশিখার হৃৎকেন্দ্রের অতি সমীপস্থ এবং যে সব আরো দূরে থাকায় শিখার স্পর্শ অল্প পেয়েছে বা তার দ্বারা স্বল্প আলোকিত হয়েছে—এই উভয়ের মধ্যে, অথবা ভাগ হবে যে সমিধের আগুন জোর ও গনগনে তার এবং যে সব মোটা মোটা কাঠ বেদীর উপর বেশী স্তূপীকৃত হলে তারা ভিজে, ভারী ও বেশী বেশী চারিদিকে ছড়ানো থাকার দরুন আগুনের তেজ জোর হতে পারে না তাদের —এ দুয়ের মধ্যে। তা না হলে এই বিভাগ ছাড়া, জ্ঞানের যে সকল কর্ম পরম সত্য খোঁজে বা প্রকাশ করে সে সবই পূর্ণ উপযুক্ত নিবেদনের উপাদান: এমন কিছু নেই যা বাদ দেওয়া প্রয়োজন বলে দিব্য জীবনের বিশাল কাঠামোর মধ্য থেকে বাদ দিতে হবে। সকল মনোবিজ্ঞান ও জড়-বিজ্ঞান যা বিষয়-সমূহের বিধান ও রূপ ও ধারা পরীক্ষা করে, সেই সব বিদ্যা যা মানুষ ও প্রাণীর জীবন সম্বন্ধে ব্যাপৃত, মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, ভাষা ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে এবং যাদের লক্ষ্য সেই সব প্রচেষ্টা ও কাজকর্ম জানা ও নিয়ন্ত্রণ করা যে-সবের সাহায্যে মানুষ জগৎ ও পরিবেশকে আয়ত্তে এনে কাজে লাগায়, আবার সব মহৎ ও সুন্দর কলাবিদ্যা যা যুগপৎ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়, কারণ প্রতি সুরচিত ও অর্থপূর্ণ কবিতা, চিত্র, প্রতিমা ও গৃহ সৃজনী বিদ্যারই কাজ, চেতনার জীবন্ত আবিষ্কার, সত্যের মূর্তি, মানসিক ও প্রাণিক আত্ম-প্রকাশ

বা জগৎ-প্রকাশের স্ফুরন্ত রূপ—অর্থাৎ যা সব সন্ধান করে, যা সব সন্ধান পায়, যা কিছু স্বর বা মূর্তির মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করে সে সমস্তই অনন্তের লীলার কিছুটার উপলব্ধি বিশেষ এবং তাদের সেই পরিমাণে ভগবদ্-উপলব্ধির বা দিব্য রূপায়ণের উপায় করা সম্ভব। কিন্তু যোগীকে দেখতে হবে যেন ইহা আর অবিদ্যাচ্ছন্ন মানসিক জীবনের অংশ হিসাবে না করা হয়; ইহা তার গ্রহণযোগ্য হবে কেবল তখনই যখন ইহার আন্তর অনুভূতি, স্মৃতি ও নিবেদনের সাহায্যে ইহা পরিণত হয় অধ্যাত্ম চেতনার গতিবৃত্তিতে এবং হয়ে ওঠে সেই চেতনার দ্বারা বিধৃত বৃহৎ ও ব্যাপক উদ্ভাসক জ্ঞানের অংশ।

কেন না সকল কিছু করা চাই যজ্ঞ হিসাবে, সকল কাজকর্মেরই উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় অর্থ হওয়া চাই অদ্বয় ভগবান। জ্ঞানান্বেষী বিভিন্ন প্রাকৃত বিজ্ঞানে যোগীর লক্ষ্য হওয়া উচিত—মানুষ ও ইতরপ্রাণী ও বিভিন্ন বিষয় ও শক্তির মধ্যে দিব্য চিৎ-শক্তির কর্মপ্রণালী, তাঁর সৃজনশীল তাৎপর্য, তাঁর বিভিন্ন রহস্যের সমাধান, অভিব্যক্তি বিন্যাসের সব প্রতীক আবিষ্কার ও প্রণিধান করা। মন ও স্থূলপদার্থ বা গূঢ় ও সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবহারিক বিজ্ঞানে যোগীর লক্ষ্য হওয়া উচিত ভগবানের কর্মপদ্ধতি ও ধারার মধ্যে প্রবেশ করা, আমাদের যে কর্ম দেওয়া হয়েছে তা করার উপাদান ও উপায় জানা যাতে আমরা সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারি চিৎ-পুরুষের প্রভুত্ব, আনন্দ ও আত্ম-সার্থকতার সচেতন ও নিখুঁৎ বহিঃপ্রকাশের জন্য। বিভিন্ন কারুকার্যে যোগীর লক্ষ্য যে শুধু সৌন্দর্য্যবোধ, মন ও প্রাণের তৃপ্তিসাধন তা নয়, তার লক্ষ্য হবে সর্বত্র ভগবানকে দেখা, তাঁর সকল কর্মের তাৎপর্য প্রকাশের সাথে তাঁকে পূজা করা, দেবতা ও মানুষ, প্রাণী ও বস্তু সকলের মধ্যে সেই অদ্বয় ভগবানকে প্রকাশ করা। যে মতবাদ ধর্মের আস্পৃহা এবং যথার্থতম ও মহত্তর শিল্পকলার মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ দেখতে পায় তা মূলতঃ সত্য; কিন্তু ধর্মের মিশ্রিত ও অনিশ্চিত প্রবর্তক শক্তির স্থলে আমাদের আনা চাই অধ্যাত্ম অভীপ্সা, অন্তর্দৃষ্টি ও অর্থবোধক অনুভূতি। কারণ দৃষ্টি যত বেশী বিস্তৃত ও ব্যাপক হবে যত বেশী তার মধ্যে থাকে মানব জাতি ও সকল বিষয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভগবানের অর্থ, আর বাহ্য ধার্মিকতা ছাড়িয়ে তা যত বেশী ওঠে অধ্যাত্ম-জীবনের মাঝে, তত বেশী দীপ্ত, নমনীয়, গভীর ও বীর্যবন্ত হবে সেই শিল্পকলা যার উৎস ঐ উন্নত প্রবর্তকশক্তি। অন্য মানুষ থেকে যোগীর পার্থক্য এই যে যোগী বাস করে এক উচ্চতর ও বৃহত্তর অধ্যাত্মচেতনায়; ইহাই তার সকল জ্ঞান, কর্ম বা সৃজন কর্মের উৎস; মন থেকে তা করা চলবে না—কারণ যোগীকে যা প্রকাশ করতে হবে তা মনোময় মানুষের সত্য ও অন্তর্দৃষ্টি অপেক্ষা মহত্তর, বরং বলা যায় এই মহত্তর সত্য ও দৃষ্টি চাপ দেয় যোগীর

মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে ও তার কর্ম গড়ে তুলতে; আর এই তার কর্ম তারে ব্যক্তিগত তৃপ্তির জন্য নয়, দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য।

আবার যে যোগী পরাৎপরকে জানে সে যে এই সব কাজ করে কোন প্রয়োজনবশে বা বাধ্যবাধকতায় তা নয়; কারণ তার কাছে এই সব কাজ কর্তব্য বা মনের প্রয়োজনীয় পেশা বা উঁচু ধরনের আমোদ নয়, বা এ সব যে মহত্তম মানবীয় উদ্দেশ্যের প্রেরণাতে করা হয় তা-ও নয়। কিছুতেই সে আসক্ত, বদ্ধ ও সীমিত হয় না: এই সব কাজে তার ব্যক্তিগত যশ, মহত্ত্ব বা তৃপ্তির কোন প্রশ্নই নেই: তার অন্তঃস্থ ভগবানের ইচ্ছা মত সে কাজ ছাড়তেও পারে বা করতেও পারে, তবে ভগবানের ইচ্ছা না হলে পরতর সম্যক্ জ্ঞানের অন্বেষণে তার কর্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। পরমাশক্তি যেমন ভাবে কাজ করেন, ও সৃষ্টি করেন, যোগীও এই সব কাজ করবে ঠিক সেই ভাবে —সৃষ্টি ও প্রকাশের আনন্দের জন্য বা ভগবানের কার্যকলাপের এই জগৎকে ধরে রাখার ও যথাযথ শাসন বা চালনার কাজে সাহায্য করার জন্য। গীতার শিক্ষা এই যে যারা এখনও অধ্যাত্ম চেতনা লাভ করেনি তাদের জ্ঞানী নিজের আচরণ দিয়ে শেখাবেন যে সকল কর্মেই প্রীতি ও অভ্যাস আনাই আদর্শ, যে সব কাজ স্বভাবতঃ পুণ্য বা ধর্মের বা তপস্যার বলে স্বীকার করা হয় শুধু তা-ই করা নয়: নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে মানুষকে জগৎ-ক্রিয়া থেকে সরিয়ে আনা তার উচিত নয়। কারণ মহান ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা-পথে জগৎকে অগ্রসর হতেই হবে: মানব ও জাতিকে যেন এমন ভাবে চালনা না করা হয় যে তারা এমন কি অবিদ্যাচ্ছন্ন কর্ম ধারা থেকেও বিচ্যুত হয়ে নৈষ্কর্ম্যের ঘোরতর অবিদ্যার মধ্যে পড়ে, অথবা তারা ডুবে যায় শোচনীয় বিশরণ ও ধ্বংসসোন্মুখতার মাঝে যা সম্প্রদায় বা জাতির উপর নেমে আসে তামসিক তত্ত্বের প্রাধান্য হলেই—তা সে তত্ত্ব অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও প্রমাদের হ'ক বা অবসাদ ও নিশ্চেষ্টতার হ'ক। গীতায় ভগবান বলেছেন "আমারও কোন কর্তব্য নেই, কারণ এমন কিছু নেই যা আমি পাই নি বা এখনো আমায় পেতে হবে কিন্তু তবু আমিও জগতে কাজ করি, কারণ আমি যদি কাজ না করি তা হলে সকল বিধান বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে, সকল জগৎ যাবে উৎসন্নের পথে আর আমি হব প্রজাদের বিনাশকর্তা।" একথা ঠিক নয় যে আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতার জন্য পরম অনির্বচনীয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে আগ্রহনাশ বা সকল বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও জীবনের মূলে কুঠারাঘাত প্রয়োজন। বরং পূর্ণ অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্মের যে পরিণাম বিশেষ সম্ভবপর তা হল—এই সবকে সংকীর্ণতা থেকে ঊর্ধ্বে তুলে সে সবে আমাদের মন যে অবিদ্যাচ্ছন্ন, সীমিত, কবোষ্ণ বা উদ্বেগচঞ্চল সুখ পায় তার স্থলে আনন্দের এমন মুক্ত ও তীব্র প্রেরণার প্রতিষ্ঠা করা যা ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় এবং এমন এক সৃজনশীল অধ্যাত্ম

সামর্থ্য ও দীপ্তির নতুন উৎস সঞ্চার করা যা ঐ সব বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও জীবনকে নিয়ে যেতে পারে জ্ঞানের মধ্যে তাদের পরম আলোকের দিকে, তাদের এখনো অচিন্তিত সম্ভাবনা এবং আধেয় ও রূপ ও ব্যবহারের সব স্ফুরন্ত ক্রিয়াশক্তির অভিমুখে। যে একটি বিষয় প্রয়োজনীয় তা-ই সাধন করা চাই সর্বপ্রথম ও সর্বসময়; কিন্তু বাকী সব কিছু তার সঙ্গে আসে তার ফল স্বরূপ; আর এ সব যে আসে তা আমাদের বাহির থেকে নতুন কিছুর আমদানী ততখানি নয় যতখানি আমরা তাদের ফিরে পাই সেই বিষয়ের আত্ম-আলোকে পুনর্গঠিত হয়ে এবং তার আত্মপ্রকাশশীল শক্তির অংশ হিসাবে।

* * *

তাহলে দিব্য ও মানুষী জ্ঞানের মধ্যে ইহাই সঠিক সম্বন্ধ, তাদের পার্থক্যের মূল কথা এই নয় যে তারা পবিত্র ও অপবিত্র এই দুটি বিসদৃশ ক্ষেত্রে বিভক্ত; তাদের কর্মধারার পশ্চাতে চেতনার রকমই মূল কথা। সেই সবই মানুষী জ্ঞান যাদের উৎপত্তি সাধারণ মানসিক চেতনা থেকে আর এই চেতনার আগ্রহ হবে বিষয় সমূহের বাহিরের ও উপরের স্তরে, প্রণালীতে, প্রতিভাস সমূহে এবং তাদের জন্যই বা কোন উপরভাসা উপকারিতার জন্য বা কামনা বা বুদ্ধির কোন মানসিক বা প্রাণিক তৃপ্তির জন্য। কিন্তু জ্ঞানের এই একই বৃত্তি যোগের অংগ হয়ে উঠতে পারে যদি তা আসে আধ্যাত্মিক বা আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন চেতনা থেকে যা সবের বাহির দেখে বা ভিতরে প্রবেশ করে সবেতেই খুঁজে সন্ধান পায় কালাতীত সনাতনের উপস্থিতি এবং কালের মধ্যে সনাতনের অভিব্যক্তির বিভিন্ন ধারা। ইহা স্পষ্ট যে অবিদ্যার রাজ্য থেকে বাহির হবার জন্য যে একাগ্রতা অপরিহার্য তা পাবার জন্য সাধকের কর্তব্য হবে তার সকল শক্তি সংহত করে শুধু তাতেই তা কেন্দ্রীভূত করা যা তার সংক্রমণের সহায় হবে এবং যা সব সাক্ষাৎ ভাবে এই একমাত্র উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল নয় সে সবকে ফেলে রাখা বা গৌণ করা। হয়ত সে দেখবে এ পর্যন্ত সে মনের বাহ্যশক্তি দিয়ে যে সব মানুষী জ্ঞানের ধারার অনুশীলনে অভ্যস্ত ছিল এখনো তার এই বা অন্যধারা এই প্রবৃত্তি বা অভ্যাসের বশে তাকে নিয়ে আসে ভিতরের গভীরতা থেকে বাহিরের উপরিভাগে বা যে উচ্চতায় সে উঠেছিল বা যার কাছে যাচ্ছিল তা থেকে নিম্নের ভূমিতে। তখন তার কর্তব্য হবে এসব কাজকর্ম স্থগিত বা সরিয়ে রাখা যতদিন না সে উচ্চতর চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এই চেতনার শক্তিকে প্রয়োগ করতে পারে সকল মানসিক ক্ষেত্রে; তখন সেই আলোকের অধীন বা তার অন্তর্ভূত হয়ে এই সব তার চেতনার রূপান্তরের দ্বারা পরিণত হয় অধ্যাত্ম ও দিব্যরাজ্যের অংশে। যে সবকে এই ভাবে রূপান্তরিত করা যাবে না বা যে সব দিব্য চেতনার অংশ হতে অস্বাকার করে সে সবকে সে পরি-

ত্যাগ করবে বিনা দ্বিধায়: এ সব শূন্যগর্ভ বা এত অনুপযোগী যে তারা নতুন আন্তর জীবনের অংগ হতে অক্ষম, আগে থাকতে তা ভেবে ও বিচার করে সে যেন তাদের বর্জন না করে। এই সব বিষয়ের জন্য পরীক্ষার কোন নির্দিষ্ট মানসিক নিকষ বা তত্ত্ব নেই: সুতরাং সাধক কোন অপরিবর্তনীয় বিধি অনুসরণ করবে না তবে সে মনের বৃত্তিকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করবে তার আন্তরবোধ, অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যতদিন না মহত্তর শক্তি ও জ্যোতি উপস্থিত হয় নিম্নের সব কিছুকে অভ্রান্তভাবে পরীক্ষা করে দেখতে এবং দিব্য কর্মের জন্য মানবীয় বিবর্তন যা তৈরী করেছে তা থেকে তাদের উপাদান নির্বাচন বা বর্জন করতে।

সঠিক কি ভাবে বা কি কি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এই উন্নতি ও পরিবর্তন আসবে তা নির্ভর করবে ব্যষ্টি প্রকৃতির রূপ, প্রয়োজন ও শক্তির উপর। অধ্যাত্ম রাজ্যে মূল বস্তু সর্বদাই এক কিন্তু তবু বৈচিত্র্যও অনন্ত: অন্ততঃ পূর্ণযোগে কোন বাঁধাধরা নির্দিষ্ট মানসিক বিধির কঠোর প্রয়োগ কদাচিৎ সম্ভব: কারণ এমন কি যখন সবাই এক দিকে চলে তখনো দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির সাধক ঠিক এক রেখায় সমান সমান পা ফেলে, বা উন্নতির সম্পূর্ণ এক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় না। তবু বলা যেতে পারে যে উন্নতির অবস্থার ন্যায়সম্মত অনুক্রম অনেকটা এই ভাবে হবে: প্রথমে এমন এক বৃহৎ পরিবর্তন আসে যাতে ব্যষ্টির প্রকৃতির অন্তর্গত স্বাভাবিক মানসিক বিভিন্ন বৃত্তিকে নেওয়া হয় উচ্চতর দৃষ্টির ভূমিতে বা দেখা হয় সেখান থেকে এবং আমাদের মধ্যকার অন্তঃপুরুষ, চৈত্যপুরুষ, যজ্ঞের পুরোধা সে সবকে নিবেদন করে দিব্য সেবায়: এর পর চেষ্টা হয় সত্তার উদয়ন, এবং এই উর্ধ্বমুখী চেষ্টার ফলে চেতনার যে নতুন উচ্চস্তর লাভ হয় সেখানকার উপযুক্ত আলোক ও শক্তিকে নামিয়ে আনারও চেষ্টা হয় জ্ঞানের সমগ্র ক্রিয়ার মধ্যে। এই সময় আসতে পারে চেতনার অন্তর্মুখী কেন্দ্রীয় পরিবর্তনের উপর তীব্র একাগ্রতা এবং বহির্গামী মানসিক জীবনের বৃহদংশের পরিহার, আর না হয় তাদের নির্বাসন ক্ষুদ্র ও গৌণ স্থানে। ইহাকে বা ইহার কোন কোন অংশকে আবার বিভিন্ন পর্যয়ে মাঝে মাঝে তুলে নেওয়া যেতে পারে এই দেখার জন্য যে এই গতি-বৃত্তির মধ্যে নতুন আন্তর চৈত্য ও অধ্যাত্ম চেতনা কতদূর আনা সম্ভব: যে স্বভাব বা প্রকৃতির বশে মানুষ এক বা অপর কাজ করতে বাধ্য হয় আর মনে করে ইহা জীবনের একরূপ অপরিহার্য অংশ সেই স্বভাব বা প্রকৃতির জোর হ্রাস পাবে, পরিশেষে তার কোন আসক্তি থাকবে না, কোথাও সে অনুভব করবে না কোন অবর বাধ্যবাধকতা বা প্রেরণাশক্তি। একমাত্র ভগবানই তার সাধ্য, শুধু ভগবানই তার সমগ্র সত্তার একমাত্র প্রয়োজন: যদি কর্মের পশ্চাতে কোন প্রেরণা থাকে, সে প্রেরণা অন্তর্নিহিত কামনার নয় বা প্রকৃতির শক্তির নয়, ইহা

কোন মহত্তর চিৎশক্তির দীপ্ত প্রেরণা যা উত্তরোত্তর হয়ে উঠেছে সমগ্র জীবনের একমাত্র প্রবর্তক শক্তি। অপর পক্ষে ইহাও সম্ভব যে আন্তর অধ্যাত্ম উন্নতির যে কোন পর্বে সাধক অনুভব করবে যে তার কাজকর্মের পরিধি সংকুচিত না হয়ে বরং প্রসারিত হয়েছে; যোগশক্তির আলৌকিক স্পর্শে মানসিক সৃজনের নব নব সামর্থ্য, জ্ঞানের নব নব ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে। সৌন্দর্যবোধ, এক বা একসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে কলাসৃষ্টির ক্ষমতা, সাহিত্যসৃষ্টির কুশলতা বা প্রতিভা, দার্শনিক চিন্তাশক্তি, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত বা মনের শক্তি এই সব যা কখনও দেখা যেত না তা ফুটে ওঠে। যে কাজকর্ম বা সৃষ্টির জন্য করণিক প্রকৃতি অভিপ্রেত প্রণালী বা রচয়িতা তার জন্য এই প্রকৃতিকে সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে অন্তঃস্থ ভগবান এই সব গূঢ় ঐশ্বর্যকে বাহিরে প্রকাশ করতে পারেন সত্তার গভীরতা থেকে যেখানে তারা প্রচ্ছন্ন ছিল অথবা ঊর্ধ্ব থেকে কোন শক্তি বর্ষণ করতে পারে তার বীর্য ধারা। কিন্তু যোগের প্রচ্ছন্ন অধীশ্বরের নির্বাচিত পদ্ধতি বা উন্নতির ধারা যাই হক না কেন, এই অবস্থার সাধারণ পরিণতি হল এই উপচীয়মান চেতনা যে ঊর্ধ্বের তিনিই মনেব সকল গতিবৃত্তির ও জ্ঞানের সকল কর্মের প্রবর্তক, নির্ধারক ও রূপকার।

অবিদ্যার ধারা থেকে মুক্ত চেতনার ধারায় সাধকের জ্ঞানের মন ও জ্ঞানের কর্মের যে রূপান্তর সাধন হয় পরম চিৎ-পুরুষের আলোকে প্রথমে আংশিক-ভাবে ও পরে সম্পূর্ণ ভাবে তার দুই লক্ষণ। প্রথমে আসে চেতনার কেন্দ্রীয় পরিবর্তন এবং পরাৎপর ও বিশ্বসত্তার, স্বরূপস্থ ভগবান ও সর্বভূতস্থ ভগ-বানের উপচীয়মান সাক্ষাৎ অনুভূতি, দর্শন ও বেদনা; মন প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ ইহাতেই ক্রমশঃ আরো বেশী অভিনিবিষ্ট হবে এবং অনুভব করবে যে সে উপচিত ও প্রসারিত হয়ে উত্তরোত্তর হয়ে উঠছে এই একমাত্র মৌলিক জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশের দীপ্ত সাধন। আবার কেন্দ্রীয় চেতনাও তার দিক থেকে ক্রমশঃ বেশী করে জ্ঞানের বাহ্য মানসিক ক্রিয়াধারাগুলিকে নিয়ে তাদের পরিণত করবে নিজের অংশে বা অধিকৃত রাজ্যে; এবং ইহা তাদের মধ্যে নিজের আরো সঠিক গতিবৃত্তি সঞ্চারিত করে বর্ধিষ্ণু আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ও দীপ্ত মনকে তার সাধন করবে যেমন নিজের গভীরতর অধ্যাত্মসাম্রাজ্যে, তেমন এই সব নতুন জয়-করা বাহিরের ক্ষেত্রেও। আর দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে,—আর ইহা কিছু পরি-মাণে সম্পূর্ণতা ও সিদ্ধিরও লক্ষণ বটে—ভগবান নিজেই জ্ঞাতা হয়েছেন এবং সকল আন্তর গতিবৃত্তি, এমনকি যেগুলি এক সময় শুধু মানুষী মানসিক ক্রিয়ার অন্তর্গত ছিল সেগুলিও তাঁর জ্ঞানের ক্ষেত্র হয়েছে। ক্রমশঃ ব্যক্তিগত নির্বাচন, মতামত, পছন্দ হ্রাস পাবে, আর হ্রাস পাবে বুদ্ধির কাজ, মানসিক বয়ন ও ক্রীতদাসের মত মস্তিষ্কের কঠোর পরিশ্রম; অন্তরের এক আলোক যা সব দেখবার তা দেখবে, যা সব জানবার তা জানবে, প্রকাশ করবে ,সৃষ্টি করবে,

সংহত করবে। ব্যষ্টির মুক্ত ও বিশ্বভাবাপন্ন মনে অন্তর জ্ঞাতাই করবেন সর্বগ্রাহী জ্ঞানের সকল কর্ম।

এই দুই পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে সাধনার এক প্রাথমিক ফল লাভ হয়েছে যাতে মানসিক প্রকৃতির সব ক্রিয়াধারাকে ঊর্ধ্বে তুলে আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন, ব্যাপ্ত, বিশ্বভাবাপন্ন ও মুক্ত করা হয় আর নিয়ে যাওয়া হয় এই চেতনায় যে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল কালগত বিশ্বের মধ্যে ভাগবদ্-অভিব্যক্তির সৃজন ও বিকাশের কাজে তারা ভগবানের উপায় মাত্র। কিন্তু ইহাই রূপান্তরের সমগ্র ক্ষেত্র হতে পারে না, কারণ এই সীমার মধ্যে যে পূর্ণযোগের সাধক তার উৎক্রান্তি থেকে বিরত হবে বা তার প্রকৃতির প্রসরণ আবদ্ধ রাখবে তা নয়। কেন না তাহলে জ্ঞান তখনও থেকে যাবে মনের এক কর্মপ্রণালী, অবশ্য এই মন মুক্ত, বিশ্বভাবাপন্ন, আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন, তবু তা তার মূল স্ফুরত্তাতে, যেমন সব মন হতে বাধ্য, অপেক্ষাকৃত সীমিত, আপেক্ষিক ও অপূর্ণ; ইহা পরম সত্যের বৃহৎ সব রচনাকে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত করবে কিন্তু যে রাজ্যে পরম সত্য সিদ্ধ, অপরোক্ষ, অপ্রতিহত ও স্বপ্রতিষ্ঠিত সেখানে ইহা বিচরণ করে না। এই উচ্চতা থেকে আরো এমন উৎক্রান্তি চাই যাতে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মন নিজকে ছাপিয়ে রূপান্তরিত হবে জ্ঞানের অতিমানসিক সামর্থ্যে। আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হবার ধারায় মন ইতিপূর্বেই মানুষী বুদ্ধির উজ্জ্বল দৈন্য ছাড়িয়ে উঠতে শুরু করেছে; ক্রমে সে আরো ঊর্ধ্বে উঠবে এক উত্তর মানসের বিশুদ্ধ বিস্তৃত ভূমিতে এবং তারপর যাবে ঊর্ধ্ব থেকে আসা আলোকে দীপ্ত আরো বেশী মুক্ত বুদ্ধির ভাস্বর প্রদেশে। এইখানে মন আরো মুক্ত ভাবে অনুভব করবে আর গ্রহণ করবে এক বোধির উজ্জ্বল সূচনা আর মনের মিশ্র প্রতিক্রিয়াও কম হবে; এই বোধি অন্য কিছুর দ্বারা দীপ্ত নয়, ইহা স্বয়ং-দীপ্ত, নিজেই সত্য; তাছাড়া তখন ইহা আর পুরোপুরি মানসিক নয় আর সেজন্য ইহাতে অজস্র প্রমাদের আক্রমণও সম্ভব নয়। কিন্তু ইহাও শেষ নয়, এ ছাড়িয়ে মনকে উঠতে হবে সেই অবিভক্ত বোধির স্বধামে, যে বোধি স্বরূপসত্তার আত্ম-সংবিৎ থেকে আসা প্রথম সরাসরি আলোক; আর ইহাও ছাড়িয়ে মনকে উঠতে হবে আলোকের উৎসে। কেন না বিশ্বমনের পশ্চাতে আছে অধিমানস; ইহা আরো আদি ও স্ফুরন্ত এক শক্তি যা বিশ্বমনকে ধারণ করে, একে দেখে নিজেরই স্তিমিত কিরণচ্ছটা বলে, ব্যবহার করে নীচে আসার অববাহিকা হিসাবে বা অবিদ্যার সব সৃষ্টির যন্ত্র হিসাবে। উৎক্রান্তির শেষ পদক্ষেপ হবে অধিমানসকেও অতিক্রম করা অথবা নিজের আরো মহত্তর উৎসে ফিরে যাওয়া, দিব্য বিজ্ঞানের অতিমানসিক আলোকে রূপান্তরিত হওয়া। কারণ এই অতিমানসিক আলোকের মধ্যেই আছে দিব্য ঋতচেতনার আসন, আর এই ঋতচেতনারই সেই সহজ শক্তি আছে—তার নিম্নের অন্য কোন

চেতনার নেই—যাতে ইহা এমন এক সত্যের কর্মধারা সংহত করতে সক্ষম যা বিশ্বব্যাপী অচিতি ও অবিদ্যার ছায়াসম্পাতে আর মলিন হয় না। সেখানে উপনীত হওয়া এবং সেখান থেকে এমন এক অতিমানসিক স্ফুরত্তা নিম্নে আনা যা অবিদ্যাকে রূপান্তর করতে সক্ষম,—ইহাই পূর্ণযোগের দূরবর্তী কিন্তু অবশ্যসাধ্য পরম লক্ষ্য।

এই সমস্ত পরতর শক্তির প্রত্যেকের আলো যেমন যেমন ফেলা হয় জ্ঞানের মানুষী ক্রিয়াধারার উপর, তেমন পবিত্র ও অপবিত্র, মানুষী ও দিব্য এই পার্থক্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে ও শেষ পর্যন্ত ইহা লোপ পায় নিরর্থক বলে: কারণ দিব্য বিজ্ঞান যা কিছু স্পর্শ করে ও তাতে পুরোপুরি আবিষ্ট হয় তা-ই অবর বুদ্ধির পঙ্কিলতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে রূপান্তরিত ও পরিণত হয় বিজ্ঞানের স্বীয় আলোক ও শক্তির গতিবৃত্তিতে। কতকগুলি ক্রিয়াধারাকে বিচ্ছিন্ন করা নয়, বরং সে সবকেই রূপান্তরিত করা অন্তর্গূঢ় চেতনার দ্বারা—ইহাই মুক্তির পথ, ইহাই জ্ঞানযজ্ঞের উদয়ন মহত্তর এবং সদা মহত্তর আলো ও শক্তিতে। মন ও বুদ্ধির সকল কাযকে প্রথমে উন্নত ও ব্যাপ্ত করা চাই, পরে তাদের দীপ্ত ও উন্নীত করতে হবে এক উত্তর বুদ্ধির রাজ্যে, ইহার পর তাদের পরিবর্তিত করতে হবে মহত্তর অ-মানসিক বোধির কর্ম প্রণালীতে; আবার তাদের রূপান্তরিত করতে হবে অধিমানসদীপ্তির স্ফুরন্ত বহির্বর্ষণ-ধারায় এবং এই সবের রূপান্তর চাই অতিমানসিক বিজ্ঞানের পূর্ণ আলোক ও আধিপত্যে। এ সবই রয়েছে পূর্বকল্পিত তবে সুপ্ত ভাবে জগতে চেতনার ক্রমবিকাশের মাঝে তার বীজে ও তার বিকাশধারার কণ্টকর তীব্র অভিপ্রায়ে: এবং যতদিন না পরম চিৎ-পুরুষের বর্তমান অপূর্ণ অভিব্যক্তির স্থলে পূর্ণ অভিব্যক্তির উপযোগী করণ সমূহ বিকশিত করা হয়, ততদিন এই ধারার, এই ক্রমবিকাশের সমাপ্তি সম্ভব নয়।

* * *

যদি জ্ঞান চেতনার সবচেয়ে ব্যাপ্ত শক্তি হয় আর তার কাজ, মুক্ত ও দীপ্ত করা তা হলে প্রেম হ'ল চেতনার সব চেয়ে গভীর ও তীব্র শক্তি আর ইহার বিশেষ অধিকার এই যে ইহাই দিব্যরহস্যের গভীরতম ও গূঢ়তম গহনে প্রবেশের চাবিকাঠি। মানুষ মনোময় পুরুষ ব'লে সে যাকে সব চেয়ে বড় স্থান দিতে চায় তা হ'ল—চিন্তাশীল মন আর মনের যুক্তিবুদ্ধি ও সংকল্প এবং সত্যের দিকে যাত্রা ও সত্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তার পদ্ধতি: এমন কি সে বলতে চায় যে অন্য কোনো পদ্ধতিই নেই। বুদ্ধির দৃষ্টিতে হৃদয় ও তার বিভিন্ন ভাবাবেগ ও অনির্দিষ্ট গতিবৃত্তি এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অনিশ্চিত শক্তি যা প্রায়ই বিপদে ফেলে ও বিপথে নিয়ে যায় আর একে সংযত রাখা দরকার যুক্তি এবং মানসিক সংকল্প ও বুদ্ধির দ্বারা। তবু হৃদয়ের

মধ্যে অথবা তার পশ্চাতে এমন এক রহস্যময় আলোক আছে যা আমরা যাকে বোধি বলি তা না হ'লেও—কারণ বোধি মনের অন্তর্গত না হলেও মনের মধ্য দিয়েই নেমে আসে—সরাসরি সত্যের স্পর্শ পায় আর জ্ঞানগর্বিত মানুষী বুদ্ধি অপেক্ষা ভগবানের অধিকতর নিকটবর্তী। প্রাচীন শিক্ষা অনুসারে বিশ্বগত ভগবানের, প্রচ্ছন্ন পুরুষের আসন রহস্যময় হৃদয়ে, গূঢ় হৃদয়-গুহাতে, উপনিষদের ভাষায় "হৃদয়ে গুহায়াম্", আর অনেক যোগীর অনুভূতি এই যে হৃদয়ের গহন থেকেই আসে আন্তর দিশারীর স্বর বা নিঃশ্বাস।

এই দ্ব্যর্থবোধ, গভীরতা ও অন্ধতার এই দুই বিপরীত রূপ—ইহাদের উৎপত্তির কারণ মানুষের ভাবাবেগজনক সত্তার দ্বিবিধ স্বভাব। কেন না মানুষের মধ্যে সামনে আছে এক প্রাণিক ভাবাবেগের হৃদয় যা পশু হৃদয়ের সদৃশ, অবশ্য তা নানাভাবে পুষ্ট হতে পারে: ইহার সব ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে অহমাত্মক মনোবেগ, অন্ধ সহজাত অনুরাগ এবং এমন সব প্রাণ সংবেগের সকল ক্রীড়া যা সব প্রায়শঃই ঘৃণ্য অপবর্যপূর্ণ—ইহা এমন হৃদয় যাকে চারিদিকে ঘিরে ও দখল ক'রে আছে তামস ও পতিত প্রাণ-শক্তির কাম, বাসনা, ক্রোধ, তীব্র বা প্রচণ্ড দাবী বা ছোট ছোট লুব্ধতা ও হীন তুচ্ছতা, আর এসব কলুষিত হয়ে পড়েছে সব রকম সংবেগেরই দাসত্ব ক'রে। ভাবাবেগজনক হৃদয় ও ইন্দ্রিয়পর বুভুক্ষু প্রাণ—উভয়ে মিলে মানুষের মাঝে সৃষ্টি ক'রে কামনার এক মেকী অন্তঃপুরুষ; ইহাই সেই অমার্জিত ও বিপজ্জনক উপাদান যাকে যুক্তি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই অবিশ্বাস করে ও দমন করা প্রয়োজন বলে অনুভব করে যদিও আমাদের অশুদ্ধ ও দুরাগ্রহী প্রাণ-প্রকৃতির উপর ইহার বাস্তব শাসন বা বরং দমন সর্বদা খুবই অনিশ্চিত ও ভ্রান্তিজনক। কিন্তু মানুষের আসল অন্তঃপুরুষের বাস সেখানে নয়, ইহার বাস সেই সত্যকার অদৃশ্য হৃদয়ে যা লুকানো থাকে প্রকৃতির এক জ্যোতির্ময় গুহায়: সেখানে যে দিব্য আলোক অনু-প্রবেশ করে তারই তলায় থাকে আমাদের অন্তঃপুরুষ, নীরব অন্তরতম সত্তা; ইহার কথা এক রকম কেউই জানে না, কেন না যদিও সকলেরই অন্তঃপুরুষ আছে, তবু সত্যকার অন্তঃপুরুষের সম্বন্ধে সচেতন বা তার প্রত্যক্ষ সংবেগ অনুভব করে এমন মানুষ খুবই কম। সেখানেই অধিষ্ঠিত ভগবানের ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ যা আমাদের প্রকৃতির এই তমসাচ্ছন্ন স্তূপ ধারণ করে এবং ইহারই চারিদিকে উপচিত হয় চৈত্যপুরুষ, গঠিত অন্তঃপুরুষ বা আমাদের অন্তঃস্থ আসল মানুষ। মানুষের এই অন্তঃস্থ চৈত্যপুরুষ যতই বৃদ্ধি পায়, যতই হৃদয়ের গতিবৃত্তি ইহার সব দিব্য প্রেরণা ও প্রচোদনাকে প্রতিফলিত করে ততই মানুষ উত্তরোত্তর অবগত হয় তার অন্তঃপুরুষের কথা, তখন আর সে উন্নত পশু নয়, তার অন্তঃস্থ দেবতার ক্ষণিক আভাসে জাগ্রত হয়ে ক্রমশঃ সে আরো বেশী মাত্রায় গ্রহণ করে গভীরতর জীবন

ও চেতনার সংবাদ এবং দিব্য বিষয় সমূহের প্রতি সংবেগ। পূর্ণযোগের ইহা এক সন্ধিক্ষণ যখন এই চৈত্যপুরুষকে মুক্ত ক'রে আবরণের পশ্চাত থেকে সম্মুখে আনা হয় আর ইহা ঢালতে পারে অজস্র ধারায় ইহার দিব্য প্রেরণা, দৃষ্টি ও প্রচোদনা মানুষের মন, প্রাণ ও দেহের উপর এবং শুরু করতে সমর্থ হয় পার্থিব প্রকৃতিতে দিব্যত্বগঠনের প্রস্তুতি।

জ্ঞানের কর্মের মতো হৃদয়ের সব কর্মপ্রণালী সম্বন্ধেও আমরা দুই প্রকার গতিবৃত্তির মধ্যে এক প্রাথমিক পার্থক্য ক'রতে বাধ্য হই—প্রথমতঃ যেগুলি আমাদের সত্যকার অন্তঃপুরুষ দ্বারা প্রবর্তিত বা প্রকৃতিতে তার মুক্তি ও শাসনের সহায়কর; এবং দ্বিতীয়তঃ যেগুলি আমাদের অসংস্কৃত প্রাণিক প্রকৃতির তৃপ্তি অভিলাষী। কিন্তু এই অর্থে সাধারণতঃ যে সব পার্থক্য করা হয় সে সব যোগের গভীর বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের পক্ষে কোনো কাজে লাগে না। একদিকে ধর্মীয় ভাবাবেগ ও অন্যদিকে সাংসারিক বেদনা (feeling)—এই ভবে এক প্রকার ভাগ করা যেতে পারে; আর অধ্যাত্মজীবনের এক অনুশাসন হিসাবে এই নির্দেশ দেওয়া যায় যে শুধু ধর্মীয় ভাবাবেগরই অনুশীলন কর্তব্য আর অন্য দিকে সকল জাগতিক বেদনা ও মনোবেগে বর্জন, এবং আমাদের জীবন থেকে তাদের তিরোধান অপরিহার্য। কার্যতঃ ইহার অর্থ এই যে সাধু বা ভক্তের ধর্মজীবন নিবদ্ধ থাকবে শুধু ভগবানেই, বা অপরের সহিত যুক্ত হবে শুধু সাধারণ ভগবদ্-প্রেমে বা বড়জোর বাহিরের জগতের উপর তা বর্ষণ করবে পবিত্র, ধর্মীয় বা ধর্মানুরাগীর প্রেমধারা। কিন্তু ধর্মীয় ভাবাবেগ নিজেই সর্বদা আক্রান্ত হয় প্রাণিক গতিবৃত্তির বিক্ষোভ ও তামসিকতার দ্বারা, আর প্রায়শঃই ইহা অশুদ্ধ, বা সংকীর্ণ বা ধর্মোন্মত্ত বা এমন সব গতিবৃত্তির সহিত মিশ্রিত যা চিৎ-পুরুষের সিদ্ধির লক্ষণ নয়। তাছাড়া ইহা সুস্পষ্ট যে ধর্মানুষ্ঠানের কঠোর শৃংখলে আবদ্ধ তীব্র মূর্তিমান সাধুত্বের চরমোৎকর্ষও পূর্ণযোগের বিশাল আদর্শ অপেক্ষা ভিন্ন। পূর্ণযোগের জন্য যা অবশ্য প্রয়োজনীয় তা হ'লো ভগবান ও জগতের সহিত এমন এক বৃহত্তর চৈত্য ও ভাবগত সম্পর্ক যা স্বরূপতঃ আরো বেশী গভীর ও সুনম্য, গতিবৃত্তিতে আরো ব্যাপ্ত ও গ্রহিষ্ণু এবং সমগ্র জীবনকে নিজের ছত্রতলে নিতে আরো সমর্থ।

এই ধর্মীয় অনুশাসনের চেয়ে আরো ব্যাপক সূত্র মানুষের ঐহিক মন দিয়েছে: ইহার ভিত্তি নীতিবোধ; কেন না ইহা যে পার্থক্য করে তার একদিকে আছে নীতিবোধের দ্বারা অনুমোদিত বিভিন্ন ভাবাবেগ ও অন্যদিকে সেইসব ভাবাবেগ যেগুলি অহমাত্মক ও স্বার্থপরতাদুষ্ট, সাধারণ ও পার্থিব। আমাদের আদর্শ হবে পরার্থপরতা, বিশ্বপ্রীতি, করুণা, বদান্যতা, মানবহিতাকাঙ্ক্ষা, সেবা এবং মানুষ ও সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য কর্মসাধন; এই মতবাদে আন্তর

বিকাশের পথ হ'ল অহমিকার নাগপাশ থেকে মুক্ত হ'য়ে আত্মত্যাগের এমন এক পুরুষ হ'য়ে ওঠা যার জীবন কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ "পরহিতায়" বা জগদ্ধিতায়।" অথবা যদি মনে হয় আদর্শ বড় বেশী ঐহিক ও মানসিক আর তাতে আমাদের সমগ্র সত্তার তৃপ্তি হয় না—আর না হওয়ার কারণ এই যে আমাদের মধ্যে যে গভীরতর ধর্মীয় ও অধ্যাত্ম সুর আছে তা এই মানবসেবার সূত্রে গণ্য করা হয় না—তা হলে এই মতের ভিত্তি করা যেতে পারে ধর্মমূলকনীতিবোধ; আর বস্তুতঃ নীতিবোধের আদি ভিত্তি এই রূপই ছিল। হৃদয়ের ভক্তির দ্বারা ভগবানের বা পরতমের আন্তর আরাধনার সাথে বা সর্বোত্তম জ্ঞানের পথে অনির্বচনীয় তত্ত্বের সাধনার সাথে যোগ করা যেতে পারে পরোপকারসাধনের মাধ্যমে আরাধনা অথবা মানবজাতি বা প্রতিবেশীর উদ্দেশে প্রেম, বদান্যতা ও সেবার কর্মের মাধ্যমে প্রস্তুতি। বস্তুতঃ বৈদান্তিক, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় আদর্শ যে বিশ্বমৈত্রী বা বিশ্বকরুণা বা প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম ও সেবার বিধান তার সৃষ্টি হয়েছিল এই ধর্মমূলক নীতিবোধ থেকেই; শুধু ইহার ধর্মীয় উপাদানের উত্তাপকে একরকম ঐহিক হিমস্পর্শে শীতল করে মানবসেবার আদর্শ নিজেকে ধর্মভাব থেকে মুক্ত ক'রে মানসিক ও নৈতিক সদাচারের ঐহিক বিধানের শীর্ষস্থানীয় হতে পেরেছে। কারণ ধর্মের ক্ষেত্রে কর্মের এই বিধান এক উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে তার আর প্রয়োজন থাকে না; অথবা ইহা এক গৌণ বিষয়; যে ধর্মানুষ্ঠানে ভগবানকে পূজা ও অন্বেষণ করা হয় ইহা তার অংশ বা নির্বাণের পথে আত্ম-বিলোপ সাধনের পূর্ববর্তী পদক্ষেপ। ঐহিক আদর্শে মানবসেবাকেই উদ্দেশ্য করে তোলা হয়েছে; ইহাই মানুষের নৈতিক চরমোৎকর্ষের নিদর্শন, অর না হয়, ইহা এক সর্ত বিশেষ যার জন্য জগতে মানুষের আরো সুখী হওয়া, আরো উন্নত সমাজ ব্যবস্থা, জাতির আরো একতাবদ্ধ জীবন সম্ভব। কিন্তু পূর্ণযোগে অন্তঃপুরুষের যে দাবী আমাদের সামনে রাখা হয়, তা এইসবের কোনোটাতেই মেটে না।

পরার্থপরতা, বিশ্বপ্রীতি, মানবহিতৈষণা, সেবা—এই সব মানসিক চেতনার কুসুম, এবং বড়জোর ইহারা বিশ্বজনীন দিব্য প্রেমের অধ্যাত্ম শিখার মনোসৃষ্ট শীতল ও ম্লান অনুকরণ। অহং-বোধ থেকে তারা যথার্থতঃ মুক্তি দেয় না, যতদূর সম্ভব ইহার পরিধি বিস্তার ক'রে তারা ইহার উচ্চতর ও বৃহত্তর পরিতৃপ্তি সাধন করে; মানুষের প্রাণিক জীবন ও প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করার ক্ষমতা তাদের নেই, তারা শুধু ইহার ক্রিয়াকে কিছু সংযত ও শান্ত রাখে, ইহার অপরিবর্তিত অহমাত্মক স্বরূপের উপর রঙের প্রলেপ দেয়। আর যদিই বা আমরা সম্পূর্ণ সাধু সংকল্প সমেত ঐকান্তিক ভাবে ঐ আদর্শ পালন করি তা করা হবে আমাদের প্রকৃতির এক দিকের অতিমাত্রায় বর্ধিত ও সম্প্রসারণের দ্বারা; কিন্তু ঐ অতিবৃদ্ধির মধ্যে বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত সনাতনের অভি-

মুখে আমাদের ব্যষ্টিভাবাপন্ন সত্তার বিভিন্ন বহু দিকের পূর্ণ ও সিদ্ধ দিব্য বিকাশের কোনো সূত্র থাকা অসম্ভব। তাছাড়া এই ধর্ম-নৈতিক আদর্শ উপযুক্ত পথপ্রদর্শক হ'তে পারে না কারণ ইহা ধর্মীয় প্রেরণা ও নৈতিক প্রেরণা এই দুয়ের মধ্যে তাদের পরস্পরের সহায়তার জন্য পরস্পরকে কিছু সুবিধাদানের আপোষ বা সন্ধি; ধর্মীয় প্রেরণা চায় সাধারণ মানব প্রকৃতির উচ্চতর প্রবৃত্তিগুলিকে নিজের মধ্যে নিয়ে পৃথিবীর উপর আরো ঘনিষ্ঠভাবে প্রভাব বিস্তার করতে, আর নৈতিক প্রেরণা আশা করে ধর্মীয় উত্তাপের কিছু স্পর্শে নিজের মানসিক কাঠিন্য ও শুষ্কতা থেকে নিজেকে ঊর্ধ্বে তুলতে। এই সন্ধি করায় ধর্ম নিজেকে নামিয়ে আনে মানসিক স্তরে আর গ্রহণ করে মনের স্বগত সব অপূর্ণতা ও জীবনের পরিবর্তন ও রূপান্তরসাধনে এর অক্ষমতা। মন দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র, কোনো অনপেক্ষ পরম সত্য পাওয়া তার সাধ্যাতীত, সে পেতে পারে শুধু আপেক্ষিক বা প্রমাদমিশ্রিত সত্য; ঠিক তেমনই কোনো অনপেক্ষ শুভ পাওয়াও তার সাধ্যাতীত; কারণ নৈতিক শুভের অস্তিত্ব অশুভের প্রতিরূপ ও সংশোধক হিসাবে; অশুভ শুভের নিত্যসহচর, তার ছায়া, পরিপূরক, প্রায় তার অস্তিত্বের হেতু। কিন্তু অধ্যাত্ম চেতনার স্থান মনোভূমি অপেক্ষা এক পরতর ভূমিতে, সেখানে সব দ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হয়; কারণ যে অনৃত এতদিন সত্যকে অন্যায়ভাবে অধিকার ক'রে তাকে মিথ্যা করে লাভবান হ'ত তার সামনে সত্য এসে দাঁড়ায় তার বিপক্ষ রূপে, আর অশুভের সম্মুখে আসে শুভ যার বিকৃতি বা ভয়ঙ্কর অনুকল্প ইহা; সেজন্য ইহারা পুষ্টির অভাবে ধ্বংস হয়, আর এই ভাবে তাদের সমাপ্তি ঘটে। মানসিক ও নৈতিক আদর্শের ভঙ্গুর উপাদানের উপর নির্ভর করতে অস্বীকার করে পূর্ণযোগ এক্ষেত্রে তার সমগ্র জোর দেয় তিনটি কেন্দ্রীয় স্ফুরন্ত সাধন ধারার উপর—কামনার মিথ্যা অন্তঃপুরুষের স্থলে সত্যকার অন্তঃপুরুষ বা চৈত্যপুরুষকে অধিষ্ঠিত করার জন্য তার উপচয়সাধন, মানুষী প্রেমের ঊর্ধ্বায়ন দিব্য প্রেমে, চেতনার উন্নয়ন তার মানসিক ভূমি থেকে তার অধ্যাত্ম ও অতিমানসিক ভূমিতে একমাত্র যার সামর্থ্যের দ্বারাই অবিদ্যার আবরণ ও অপলাপ থেকে অন্তঃপুরুষ ও প্রাণশক্তি, উভয়েরই পূর্ণ মুক্তি সম্ভব।

সূর্যমুখী ফুল যেমন ফেরে সূর্যের দিকে, অন্তঃপুরুষ বা চৈত্যপুরুষের স্বভাব হ'ল তেমন ফিরে থাকা দিব্য সত্যের দিকে; যা সব দিব্য বা দিব্যত্বের দিকে এগিয়ে চলে সে সবকে সে গ্রহণ করে ও আঁকড়ে থাকে। আর যা সব তার বিকৃতি বা অস্বীকৃতি, যা সব মিথ্যা ও অদিব্য সে সব থেকে সে সরে আসে। কিন্তু তবু অন্তঃপুরুষ প্রথমে একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র, আর তার পর ইহা হয় ঘোর অন্ধকারের মাঝে দেবতার এক ক্ষুদ্র জ্বলন্ত শিখা, বেশীর ভাগই ইহা ঢাকা থাকে তার আন্তর নিভৃত কক্ষে, আত্ম-প্রকাশ করতে হ'লে

তাকে ডাকতে হয় মন, প্রাণ-শক্তি ও শারীর চেতনাকে আর তাদের সাধ্য মতো তাকে প্রকাশ করার জন্য তাদের রাজী করাতে হয়; ইহা বড় জোর পারে তাদের বহির্মুখীনতাকে তার আন্তর আলোকে উপর-উপর আলোকিত করতে ও তার পাবনী সূক্ষ্মতার দ্বারা তাদের তামস আবিলতা বা অপেক্ষাকৃত স্থূল মিশ্রণকে কিছু বদলাতে। এমন কি যখন চৈত্যপুরুষ গঠিত হয় আর কিছুটা সাক্ষাৎভাবে জীবনের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় তখনও ইহা অল্প কয়েকজন ছাড়া অন্য সকলের মাঝে সত্তার অতি ক্ষুদ্র অংশ—প্রাচীন ঋষিরা যার সম্বন্ধে "শরীরের মাঝে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র" পুরুষের এই রূপক ব্যবহার করেছেন—আর শারীর চেতনার তামসিকতা ও ক্ষুদ্রতাকে, মনের ভ্রান্ত নিশ্চয়তাকে, প্রাণিক প্রকৃতির দম্ভ ও প্রচণ্ডতাকে যে ইহা সর্বদা জয় ক'রতে সমর্থ হয় তা নয়। এই অন্তঃপুরুষকে বাধ্য হ'য়ে স্বীকার করতে হয় মানুষের বর্তমান মানসিক, ভাবাবেগজনক ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিপূর্ণ জীবনকে, তার বিভিন্ন সম্বন্ধ ও কাজকর্মকে ও তার সব প্রিয় রূপ ও মূর্তিকে; অবিরাম ভ্রান্তিজনক প্রমাদমিশ্রিত এই সব আপেক্ষিক সত্য, পাশবদেহের সেবায় বা প্রাণিক অহং-এর তৃপ্তিসাধনে ব্যাপৃত এই প্রেম, এই যে সাধারণ মানুষের জীবন যাতে পরম দেবতার আভাস খুবই কম ও ক্ষীণ কিন্তু যা দানব ও পশুর বিভিন্ন তমসাছন্ন ভয়াল প্রবৃত্তিতে সমাকীর্ণ—এই সকলের মধ্যে যে দিব্য উপাদান আছে তাকে পৃথক ও পুষ্ট করার জন্য তাকে চেষ্টা ক'রতে হয়। নিজের মূল সংকল্প সম্বন্ধে ইহা অভ্রান্ত, কিন্তু তবু নিজের বিভিন্ন করণের চাপে ইহা প্রায়ই বাধ্য হ'য়ে মেনে নেয় ক্রিয়ার ভুল, বেদনার ভ্রান্ত প্রয়োগ লোক নির্বাচনে ভ্রম, তার সংকল্পের সঠিক রূপ ও অমোঘ আন্তর আদর্শের বহিঃপ্রকাশের প্রমাদ। কিন্তু তবু ইহার মধ্যে এমন এক অন্তর্দৃষ্টি আছে যার জন্য ইহা যুক্তিশক্তি বা এমন কি শ্রেষ্ঠ কামনা অপেক্ষাও আরো নিশ্চিত দিশারী এবং নিয়মনিষ্ঠ বুদ্ধি ও বিচারশীল মানসিক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা ইহার নির্দেশের চালনাই আরো শ্রেয়স্কর যদিও তা হয় আপাত অনেক প্রমাদ ও স্খলনের মধ্য দিয়ে। আমরা যাকে বিবেক বলি, অন্তঃপুরুষের এই বাণী তা নয়,—কারণ এই বিবেক শুধু এক মানসিক ও প্রায়শঃই আচারমূলক প্রমাদশীল অনুকল্প; অন্তঃপুরুষের আহ্বান আরো গভীর ও কদাচিৎ শোনা যায়; তবু শুনতে পেলে তার নির্দেশ মতো চলাই সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ; এমন কি যুক্তিবুদ্ধি ও বাহ্য নৈতিক উপদেষ্টার সহিত আপাত সরল পথে যাওয়ার চেয়ে নিজের অন্তঃপুরুষের আহ্বানে ঘুরে বেড়ানও শ্রেয়স্কর। কিন্তু যখন জীবন ভগবানের দিকে ফেরে, কেবল তখনই অন্তঃপুরুষ নিশ্চিতভাবে সামনে এসে বিভিন্ন বাহ্য অঙ্গের উপর নিজের শক্তি আরোপ ক'রতে সমর্থ হয়; কেন না ইহা নিজেই ভগবানের স্ফুলিঙ্গ হওয়ায়, ভগবানের দিকে শিখা

হ'য়ে বৃদ্ধি পাওয়াই ইহার সত্যকার জীবন ও ইহার অস্তিত্বের প্রকৃত কারণ।

যোগের এক পর্যায়ে যখন মনকে যথেষ্ট পরিমাণে শান্ত করা হ'য়েছে, তখন ইহা আর প্রতি পদে নিজের মানসিক সিদ্ধান্তের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে না, যখন প্রাণকে স্থির ও দমন করা হ'য়েছে তখন আর সে নিজের অবিবেচক সংকল্প, দাবী ও কামনাপূরণে সর্বদা জেদ করে না, যখন শরীর যথেষ্ট পরিবর্তিত হ'য়েছে যাতে তার বহির্মুখীনতা, তামসিকতা বা নিশ্চেষ্টতার স্তূপে আন্তর শিখা একেবারে চাপা পড়ে না তখন এক অন্তরতম সত্তা যা ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে, যাকে আমরা শুধু অনুভব করেছি তার বিরল প্রভাবের মাধ্যমে তা সম্মুখে এসে বাকী সবকে দীপ্ত ক'রে সাধনার ভার নিতে সমর্থ হয়। ইহার স্বভাবই হ'লো ভগবান ও সর্বোত্তমের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, ক্রিয়া ও গতিবৃত্তিতেও ইহা একমুখী তবে বুদ্ধির মতো ইহা নির্দেশের কঠোরতা বা একমুখী প্রাণিক শক্তির মতো প্রবল ভাবনা বা সংবেগের গোঁড়ামি তৈরী করে না: প্রতি মুহূর্তে ও সুনম্য নিশ্চয়তার সহিত ইহা পরম সত্যের দিকে পথ দেখায়, আপনা আপনিই সত্য ও মিথ্যা পদক্ষেপের পার্থক্য বোঝে, অবিদ্যার আঠাল মিশ্রণ থেকে দিব্য বা ভগবদ্-অভিমুখী গতিবৃত্তিকে মুক্ত করে। সার্চলাইটের মতো ইহার কাজ হলো প্রকৃতিতে যা সবের পরিবর্তন দরকার সে সব দেখিয়ে দেওয়া; ইহার মধ্যে সংকল্পের এমন এক জ্বলন্ত শিখা আছে যা সিদ্ধির জন্য, সকল আন্তর ও বহির্জীবনের রাসায়নিক রূপান্তরের জন্য সনির্বন্ধভাবে আগ্রহী। ইহা সর্বত্র দেখে দিব্য স্বরূপ, কিন্তু যা শুধু মুখোস, আবরিকা মূর্তি তা ইহা বর্জন করে। ইহা চায় সত্য, সংকল্প ও সামর্থ্য, প্রভুত্ব আনন্দ, প্রেম ও সৌন্দর্য, তবে স্থায়ী বিদ্যার সত্য যা অবিদ্যার তুচ্ছ ব্যবহারিক ক্ষণস্থায়ী সত্যের ঊর্ধ্বে, আন্তর-বৃত্ত আনন্দ শুধু প্রাণিক সুখ নয়: বরং যে সব ভোগতৃপ্তি মানুষকে হীন করে সে সবের চেয়ে তার প্রিয় সেই দুঃখ ও কষ্ট যা মানুষকে পবিত্র করে: তার কাম্য এমন প্রেম যা ঊর্ধ্বগগন-বিহারী, যা অহমাত্মক বাসনার খুঁটিতে আবদ্ধ নয় বা যার পা পাঁকে ডোবা নয়: ইহা চায় এমন সৌন্দর্য যা সনাতনের অর্থ প্রকাশের পবিত্র ব্রতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত: সামর্থ্য, সংকল্প ও প্রভুত্বও ইহা চায়, তবে পরম চিৎ-পুরুষের করণ হিসাবে, অহং-এর করণ হিসাবে নয়। ইহার সংকল্প জীবনের দিব্যত্ব সাধনের জন, তার মধ্য দিয়ে পরতর সত্যের বহিঃপ্রকাশের জন্য, ভগবান ও সনাতনের নিকট তার উৎসর্গের জন্য।

কিন্তু চৈত্যপুরুষের সব চেয়ে অন্তরঙ্গ স্বভাব হ'লো পবিত্র প্রেম, আনন্দ ও একত্বের মাধ্যমে ভগবানের দিকে তার প্রেষণা। দিব্য প্রেমই তার পরম সাধ্য, ভগবাদ্-প্রেমই তার প্রেরণা-শক্তি, তার চরম লক্ষ্য, আমাদের মধ্যে জাত-

প্রায় দেবতার জ্যোতির্ময় গুহার উপর বা নবজাত দেবতার এখনো তমসাচ্ছন্ন শয্যার উপর দীপ্তিমান সত্যের তারকা। তার উপচয় ও অপরিণত জীবনের প্রাথমিক দীর্ঘ পর্বে ইহা নির্ভর করে পার্থিব ভালোবাসা, স্নেহ, কোমলতা, শুভেচ্ছা, করুণা বদান্যতার উপর, সকল প্রকার সৌন্দর্য ও নম্রতা ও চারুতা ও আলোক ও বীর্য ও শৌর্যের উপর এবং মানুষী প্রকৃতির স্থূলতা ও তুচ্ছতাকে মার্জিত ও শুদ্ধ করার কাজে যা সব সহায়কর তাদের উপর; কিন্তু ইহা জানে যে এই সব মানুষী গতিবৃত্তি উৎকৃষ্ট অবস্থাতেও কত মিশ্রিত, এবং নিকৃষ্ট অবস্থাতে কত অধঃপতিত, আর অহং ও আত্মপ্রতারক কোমল-ভাবাপন্ন মিথ্যা এবং অন্তঃপুরুষের গতিবৃত্তির অনুকরণে লাভবান অবর আত্মার ছাপে কত দূষিত। আত্ম-প্রকাশ ক'রেই ইহা উদ্যত ও উৎসুক হয় পুরনো সকল বন্ধন, অপূর্ণ সকল ভাবপ্রবণ কর্মসূত্র ছিন্ন ক'রতে এবং তাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে প্রেম ও একত্বের মহত্তর অধ্যাত্ম সত্য। তখনো ইহা মানুষী বিভিন্ন রূপ ও গতিবৃত্তিকে স্থান দিতে পারে কিন্তু এই সর্তে যে তারা ফিরবে একমাত্র পরম একের দিকে। ইহা স্বীকার করে শুধু সেই সব বন্ধন যেগুলি সহায়কর, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভগবদ্-অন্বেষুদের সংঘ, অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব ও পশু জগৎ ও তার জীবকুলের উপর অধ্যাত্ম করুণা, সর্বত্র ভগবানের উপলব্ধি-জাত ও সুখ, হর্ষ এবং সৌন্দর্যের তৃপ্তি। ইহা প্রকৃতিকে ডুবিয়ে দেয় ভিতর দিকে অন্তঃস্থ ভগবানের সহিত হৃদয়ের গূঢ় কেন্দ্রে মিলনের অভিমুখে, আর যতক্ষণ সেই আহ্বান থাকে, অহন্তার কোনো অপবাদে, পরার্থপরতা বা কর্তব্য বা মানবপ্রীতি ও সেবার কোনো বাহিরের ডাকে ইহা ভুলবে না বা তার পবিত্র আকূতি এবং অন্তঃস্থ পরম দেবতার আকর্ষণে তার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা থেকে ফিরবে না। ইহা সত্তাকে ঊর্ধ্বে তোলে বিশ্বাতীত পরম উল্লাসের দিকে, এবং অদ্বয় সর্বোত্তমের দিকে উৎসর্পণে জগতের সব নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ তার পক্ষ থেকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়; কিন্তু ইহা এই বিশ্বাতীত প্রেম ও পরমানন্দকে নিম্নেও আহ্বান করে এই উদ্দেশ্যে যে ইহা যেন এই জগৎকে—ঘৃণা ও বিরোধ ও বিভেদ ও তমসা ও দ্বন্দ্বকীর্ণ অবিদ্যার এই জগৎকে মুক্ত ও রূপান্তরিত করে। সে নিজেকে খুলে ধরে এক বিশ্বজনীন দিব্য প্রেম, অগাধ করুণা, এক তীব্র ও বিশাল সংকল্পের নিকট—সকলের মঙ্গলের জন্য, সেই জগন্মাতার আলিঙ্গনের জন্য যিনি তাঁর সন্তানদের ঢেকে আছেন বা নিজের কাছে একত্র ক'রছেন,—ইনিই সেই দিব্য অনুরাগ যা রাত্রির মধ্যে নেমে এসেছে জগৎকে সর্বব্যাপী অবিদ্যা থেকে উদ্ধার করার জন্য। অস্তিত্বের এই যে সব গভীরে অধিষ্ঠিত মহৎ সত্য তাদের মানসিক অনুকরণে বা কোনো প্রাণিক অপব্যবহারে সে আকৃষ্ট হয় না বা বিপথে চলে না; এই সবকে সে খুঁজে বাহিরে প্রকাশ

করে তার সন্ধানী আলোক-রশ্মির সাহায্যে এবং দিব্য প্রেমের সমগ্র সত্যকে আবাহন ক'রে নীচে নামিয়ে আনে এই সব হীন গঠনের নিরাময়ের জন্যে, মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক প্রেমকে তাদের অপ্রচুরতা বা বিকৃতি থেকে মুক্ত করার জন্য এবং অন্তরঙ্গতা ও একত্ব ও আরোহ উল্লাস ও অবরোহ হর্ষাবেশের মধ্যে তাদের সুপ্রচুর অংশ প্রকাশ করার জন্য।

প্রেমের ও প্রেম কর্মের সকল খাঁটি সত্যই চৈত্যপুরুষ স্বীকার করে তাদের স্থানে; কিন্তু ইহার শিখা সর্বদাই ঊর্ধ্ব পানে উঠতে থাকে আর এই উৎ-ক্রান্তিকে সত্যের নিম্নতর পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য ইহা উৎসুক, কারণ ইহা জানে যে একমাত্র কোনো শ্রেষ্ঠ সত্যে আরোহণের এবং সেই শ্রেষ্ঠ সত্যের অবতরণের দ্বারাই প্রেমকে ক্রুশ থেকে মুক্ত ক'রে অধিষ্ঠিত করা যায় রাজাসনে; এই ক্রুশ এক বিশ্ববিকৃতির তির্যক রেখার দ্বারা নিবারিত ও দূষিত দিব্য অবতরণের নিদর্শন, আর এই বিশ্ববিকৃতি জীবনকে পরিণত করে কষ্ট ভোগ ও দুর্ভাগ্যের অবস্থায়। একমাত্র পরম আদি সত্যে উত্তরণের দ্বারাই এই বিকৃতির নিরাময় সম্ভব আর কেবল তখনই প্রেমের সকল কর্ম এবং জ্ঞানের ও প্রাণেরও সকল কর্ম দিব্য তাৎপর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে পরিণত হ'তে পারে এক অখণ্ড আধ্যাত্মিক জীবনের অংশে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যজ্ঞের উদয়ন (২)

প্রেমের কর্ম — প্রাণের কর্ম

সুতরাং চৈত্যপুরুষকে যজ্ঞের নেতা ও হোতা করে প্রেম, কর্ম ও জ্ঞানের যজ্ঞসাধনার মাধ্যমে সমগ্র জীবনকে রূপান্তরিত করা যায় তার নিজস্ব সত্যকার আধ্যাত্মিক মূর্তিতে। যদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত জ্ঞান-যজ্ঞ সর্বোত্তমের নিকট আমাদের সম্ভবপর বৃহত্তম ও শুদ্ধতম নিবেদন হয় তাহ'লে আমাদের অধ্যাত্ম সিদ্ধির জন্য প্রেমের যজ্ঞ আমাদের কম কর্তব্য নয়; এমন কি ইহার একমুখিতায় ইহা জ্ঞানযজ্ঞ অপেক্ষা আরো প্রগাঢ় ও সমৃদ্ধ এবং তারই মতো ইহাকে বিরাট ও বিশুদ্ধ করা যায়। প্রেমযজ্ঞের প্রগাঢ়তার মধ্যে এই বিশুদ্ধ পরিব্যাপ্তি তখনই আনা যায় যখন আমাদের সকল ক্রিয়াধারার মধ্যে নেমে আসে এক দিব্য অনন্ত আনন্দের ভাব ও শক্তির বর্ষণ এবং আমাদের জীবনের সকল পরিমন্ডল আপ্লুত হয় তাঁর একাগ্র আরাধনায় যিনি পরম এক অথচ সর্ব ও সর্বোত্তম। কারণ প্রেমের যজ্ঞ তখনই তার চরম পূর্ণতা লাভ করে যখন সর্বস্বরূপ ভগবানে নিবেদিত হয়ে ইহা হ'য়ে ওঠে অখন্ড, উদার ও সীমাহীন এবং যখন পরমের নিকট উন্নীত হয়ে ইহা আর সেই ক্ষীণ, উপরভাসা ও ক্ষণস্থায়ী বৃত্তি থাকে না যাকে মানুষ প্রেম বলে, ইহা পরিণত হয় বিশুদ্ধ ও মহান ও গভীর মিলন-সাধক আনন্দে।

যদিও পরম ও বিশ্বাত্মক ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেমই আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের বিধান হওয়া চাই তাহ'লেও সেজন্য সকল রকম ব্যক্তিগত প্রেম বা ব্যক্ত সৃষ্টিতে মানুষে বন্ধনের সূত্রগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করার কোনো প্রশ্ন নেই। যা অবশ্য কর্তব্য তা হলো—চৈত্যিক রূপান্তর, অবিদ্যার সকল মুখোস উন্মোচন ও যে সব অহমাত্মক, মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক গতিবৃত্তি পুরণো অবর চেতনাকে দীর্ঘস্থায়ী করে সে সবের বিশুদ্ধীকরণ; প্রেমের প্রতি গতি-বৃত্তি আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হ'য়ে আর তখন মানসিক রুচি, প্রাণিক বেগ বা শারীরিক লালসার উপর নির্ভর ক'রবে না, ইহার নির্ভরস্থল অন্তরাত্মায় অন্তরাত্মায় পরিচয়—ইহা সেই প্রেম যা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মৌলিক অধ্যাত্ম ও চৈতিক স্বরূপে আর মন, প্রাণ ও দেহ সেই মহত্তর একত্বকে অভিব্যক্ত করার যন্ত্র ও উপদান। এই পরিবর্তনে ব্যক্তিগত প্রেমও স্বাভাবিকভাবে উন্নীত

হ'য়ে রূপান্তরিত হয় সেই দিব্য অধিষ্ঠাতার প্রতি দিব্য প্রেমে যিনি সর্বভূত-স্থিত পরম একের দ্বারা অধিকৃত মন, অন্তঃপুরুষ ও দেহে প্রতিষ্ঠিত।

বস্তুতঃ যে সব প্রেম আরাধনা সে সবের পশ্চাতে থাকে এক অধ্যাত্মশক্তি; এমন কি যখন তা অজ্ঞানবশে কোনো সসীম বিষয়েও নিবেদিত হয় তখনও অনুষ্ঠানের দৈন্য ও পরিণামের ক্ষুদ্রতার মধ্য দিয়ে তার জ্যোতির কিছু প্রকাশ পায়। কারণ পূজাস্বরূপ প্রেম যুগপৎ অভীপ্সা ও প্রস্তুতি ঃ এমন কি অবিদ্যার মাঝে সেই প্রেমের ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে এমন এক উপলব্ধির আভাস পাওয়া যায় যা তখনো অল্পবিস্তর অন্ধ ও আংশিক হ'লেও অপরূপ; কারণ ক্ষণকালের জন্য হ'লেও সে সময়, আমরা নয়, পরম একই আমাদের মধ্যে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ হন এবং এই অনন্ত প্রেম ও প্রেমিকের ঈষৎ আভাসে মানুষী অনুরাগও হ'তে পারে উন্নত ও মহিমামন্ডিত। এজন্যই দেবপূজা, মূর্তিপূজা, আকর্ষণকারী কোনো মানুষ বা আদর্শের পূজাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়; কারণ এই সব ধাপের মধ্য দিয়েই মানবজাতি অগ্রসর হয় অনন্তের সেই আনন্দ-পূর্ণ অনুরাগ ও উল্লাসের দিকে; এই সমস্ত সেই অনন্তকে সীমাবদ্ধ করে বটে তথাপি প্রকৃতি আমাদের পায়ের জন্য যে সব নিম্ন ধাপ গড়েছে সে সব যখন আমাদের এখনও ব্যবহার ক'রতে হয় এবং অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায় আমাদের স্বীকার ক'রতে হয় তখন আমাদের অপূর্ণ দৃষ্টির নিকট সে সমস্ত সেই অনন্তেরই প্রতীক। আমাদের ভাবপ্রবণ সত্তার বিকাশের জন্য কোনো কোনো মূর্তিপূজা অপরিহার্য; আর মূর্তি যে সদ্‌বস্তুর প্রতীক সেই সদ্‌-বস্তুকে পূজারীর হৃদয়ে মূর্তির বদলে বসাতে না পারলে জ্ঞানী কখনো মূর্তি চূর্ণ করতে ব্যগ্র হবে না। তা ছাড়া তাদের এই বিকাশসাধনের শক্তি আছে কারণ তাদের মধ্যে সর্বদাই এমন কিছু থাকে যা তাদের বিভিন্ন রূপের চেয়ে মহত্তর এবং এমন কি যখন আমরা পূজার পরম স্তরেও পৌঁছাই তখনও সেই মহত্তর কিছু রয়ে যায় এবং হ'য়ে ওঠে তার এক বিস্তার বা তার উদার সমগ্রতার অংশ। সর্বরূপ ও অভিব্যক্তির অতীত তৎস্বরূপকে আমরা জানতে পারি কিন্তু তবুও আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, প্রেম অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে যতক্ষণ না আমরা ভগবানকে পাই প্রতি জীবে ও বস্তুতে, মানুষে, জাতিতে, পশুতে, গাছে, ফুলে, আমাদের হাতের কাজে, প্রকৃতি-শক্তিতে; তখন প্রকৃতিশক্তি আমাদের কাছে আর জড়যন্ত্রের অন্ধ ক্রিয়া থাকে না, তখন এ হয় বিশ্বশক্তির মুখ ও শক্তি ঃ কারণ এই সব বিষয়েও থাকে সনাতনের উপস্থিতি।

বিশ্বাতীত, সর্বোত্তম * অনুপাখ্যের নিকট আমরা যে চরম অনির্বচনীয় আরাধনা নিবেদন করি তা-ও পূর্ণ পূজা হয় না যদি না আমরা তা নিবেদন

---

* পরম্‌ ভাবম্‌

করি তাঁর সকল অভিব্যক্তিতে বা এমন কি সেখানেও যেখানে তিনি তাঁর দেবত্ব প্রচ্ছন্ন রেখেছেন—মানুষে† বস্তুতে ও প্রতি জীবে। একথা সত্য যে এক অবিদ্যা হৃদয়কে আবদ্ধ করে আছে তার বেদনাকে বিকৃত ক'রে ও তার নিবেদনের তাৎপর্যকে আচ্ছন্ন করে। সকল আংশিক পূজা, সকল ধর্ম যা কোনো মানসিক বা ভৌতিক মূর্তি স্থাপন করে তার ঝোঁক হ'লো অবিদ্যার এক আবরণ দিয়ে সত্যকে ঢেকে রক্ষা করা আর তারা সহজেই মূর্তির মধ্যে সত্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যে জ্ঞান নিজ বাদে অন্য সব কিছু নস্যাৎ করে তার দম্ভও এক সংকীর্ণতা, এক অন্তরায়। কারণ ব্যক্তিগত প্রেমের পিছনে লুকানো ও তার অজ্ঞ মানুষী মূর্তির দ্বারা আচ্ছন্ন এমন এক রহস্য আছে যা মন ধরতে অক্ষম; এই রহস্য দিব্য বিগ্রহের রহস্য, অনন্তের রহস্যময় রূপের গূঢ় তত্ত্ব যা পাবার একমাত্র পথ হ'লো হৃদয়ের উল্লাস এবং শুদ্ধ ও ঊর্ধ্বায়িত ইন্দ্রিয়ের গভীর বেগ; এবং তার যে আকর্ষণ দিব্য বংশীবাদকের আহ্বান, সর্বসুন্দরের সর্বজয়ী দুর্নিবার শক্তি তা আমরা ধরতে পারি, আমাদেরও ইহা ধরতে পারে একমাত্র গূঢ় প্রেম ও আকূতির মাধ্যমে; শেষে এই প্রেম ও আকূতিই রূপ ও অরূপকে এক করে, এবং পরম চিৎ-পুরুষ ও জড়কে অভিন্ন করে। এখানে অবিদ্যার অন্ধকারের মাঝে প্রেমাবিষ্ট চিৎ-পুরুষ তা-কেই খোঁজে এবং তারই সন্ধান সে পায় যখন ব্যক্তির মানুষী প্রেম রূপান্তরিত হয় জড়বিশ্বে আবির্ভূত বিশ্বগত ভগবানের প্রেমে।

ব্যক্তিগত প্রেমের বেলায় যে কথা, বিশ্বজনীন প্রেমের বেলাতেও সেই কথা; সববেদনা, মৈত্রী, বিশ্বজনীন বদান্যতা ও হিতসাধন, মানবপ্রেম, জীবপ্রেম, আমাদের চারিদিককার সকল রূপ ও উপস্থিতির আকর্ষণ—এই সবের মাধ্যমে আত্মার যে ব্যাপ্তিসাধনের দ্বারা মানুষ মন ও ভাবাবেগের দিক থেকে তার অহং-এর প্রাথমিক সব গন্ডী থেকে মুক্তি পায় সে সবকে নিতে হবে বিশ্বাত্মক ভগবানের প্রতি ঐক্যসাধক দিব্য প্রেমে। যে আরাধনা সার্থক হয় প্রেমে, যে প্রেম সার্থক হয় আনন্দে—তা-ই বিশ্বাতীত ভগবানে বিশ্বাতীত আনন্দের সেই সর্বাতিশয় প্রেম, আত্মবিভোর উল্লাস যা আমাদের জন্য থাকে ভক্তিমার্গের শেষে; ইহারই আরো ব্যাপ্ত পরিণাম হ'ল সর্বভূতে বিশ্বজনীন প্রেম, সব কিছুর আনন্দ; প্রতি আবরণের পশ্চাতে আমরা অনুভব করি ভগবানকে, সকল রূপের মধ্যে আধ্যাত্মভাবে আলিঙ্গন করি সর্ব-সুন্দরকে। আমাদের মধ্য দিয়ে বয়ে যায় তাঁর অন্তহীন অভিব্যক্তির এক বিশ্বজনীন আনন্দ, প্রতি রূপ ও গতিবৃত্তিকে তা নেয় তার উৎসবনে অথচ কোনো কিছুতেই ইহা আবদ্ধ বা স্তব্ধ হয় না, সর্বদাই ইহা এগিয়ে চলে আরো

---

† মানুষীম্ তনুম্ আশ্রিতম্

মহত্তর, আরো পূর্ণতর বহিঃপ্রকাশের দিকে। এই বিশ্বজনীন প্রেম মুক্তিপ্রদ এবং রূপান্তরের পক্ষে স্ফুরন্ত, কারণ সকল রূপ ও অবভাসের পশ্চাতে এক পরম সত্যকে যে হৃদয় অনুভব ক'রেছে এবং তাদের পূর্ণ তাৎপর্য বুঝেছে সে আর তাদের বিরোধে বিচলিত হয় না। দিব্য প্রেমের জাদুস্পর্শে স্বার্থশূন্য কর্মী ও জ্ঞানীর অন্তঃপুরুষের নিরপেক্ষ সমত্ব রূপান্তরিত হয় সবগ্রাহী উল্লাসে ও অনন্ত-তনু পরমানন্দে। দিব্য প্রেমাস্পদের এই অনন্ত প্রমোদনিকেতনে সকল বিষয়ই হ'য়ে ওঠে তাঁর দেহ, সকল গতিবৃত্তিই তাঁর খেলা। এমন কি যন্ত্রণারও পরিবর্তন হয়, আর যন্ত্রণাভরা সর্ববিষয়ের প্রতিক্রিয়া ও এমন কি স্বরূপও বদলে যায়; যন্ত্রণার বিভিন্ন রূপ খসে পড়ে আর তাদের স্থলে সৃষ্ট হয় আনন্দের বিভিন্ন রূপ।

ইহাই সেই চেতনা-রূপান্তরের মূল প্রকৃতি যা সমগ্র জীবনকে পরিণত করে ভগবদপ্রেম ও আনন্দের এক গৌরবময় ক্ষেত্রে। যখন সাধক সাধারণ স্তর থেকে অধ্যাত্মস্তরে যায় এবং জগৎ, নিজ ও অপরকে দেখে জ্যোতির্ময় দৃষ্টি ও অনুভূতির নতুন হৃদয় নিয়ে, তখনই সারতঃ এই পরিবর্তন শুরু হয়। ইহার চরম অবস্থা আসে যখন অধ্যাত্ম স্তর আবার হ'য়ে ওঠে অতিমানসিক স্তর আর সেখানেও ইহাকে যে শুধু স্বরূপে অনুভব করা সম্ভব তা নয়, ইহাকে সমগ্র আন্তর জীবন ও সমগ্র বহিজীবনের রূপান্তর সাধনের পরম শক্তি হিসাবেও স্ফুরন্তভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব।

* * *

প্রেমের আন্তরভাব ও প্রকৃতির এই যে রূপান্তর—বিমিশ্র ও সীমিত মানুষী আবেগ থেকে পরম ও সর্বগ্রাহী দিব্য আবেগে—তাকে বহু পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ মানুষী সংকল্পের পক্ষে স্বীকার করা দুরূহ হ'লেও মনের পক্ষে ত ধারণা করা যে একান্তই দুরূহ তা নয়। তবে প্রেমের কর্মের বেলায় কিছু সংশয় আসা সম্ভব। জ্ঞানমার্গের কোনো কোনো উচ্চ আতিশয্যের ধারায় যেমন করা হয় তেমন এখানেও সমস্যার গ্রন্থিছেদন সম্ভব অর্থাৎ জগৎ-ক্রিয়ার স্থূলতার সহিত প্রেমের স্বরূপের দুরূহ মিলনসাধনের সমস্যা থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব এই ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হ'য়ে; বাহ্যজীবন ও ক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে হৃদয়ের নীরবতার মাঝে ভগবানের আরাধনায় একলা থাকার পথ আমরা নিতে পারি। এও সম্ভব যে আমরা শুধু সেই সব কাজ ক'রব যে-গুলি হয় নিজেরাই ভগবানের প্রতি প্রেমের প্রকাশস্বরূপ যেমন প্রার্থনা, স্তুতি, পূজার প্রতীকধর্মী কর্ম, নয় সেই সব গৌণ কাজ করব যেগুলি এদের সহিত যুক্ত ও তাদের আন্তর ভবের দ্বারা অন্বিত হ'তে পারে, আর বাকী সব আমরা ফেলে দিতে পারি; সাধু ও ভক্তের বিভোর বা ভগবৎ-কেন্দ্রিক জীবন পাবার আন্তর আকূতি মেটাবার জন্য অন্তঃপুরুষ সব কিছু থেকে সরে আসে।

আবার ইহাও সম্ভব যে জীবনের দ্বার আরো বেশী উন্মুক্ত ক'রে আমাদের প্রতিবেশী ও জাতির সেবার কাজে আমরা ভগবানের প্রতি নিজেদের প্রেম নিয়োগ করব। তখন করা যায় বিশ্বপ্রীতি, বদান্যতা ও লোকহিতের কাজ, মানুষ, পশু ও সৃষ্টির প্রতি বিষয়ের প্রতি দাক্ষিণ্য ও সাহায্যের কাজ এবং এই সবের রূপান্তর সম্ভব এক প্রকার আধ্যাত্ম আবেগ দ্বারা, অন্ততঃ তাদের যে শুধু নৈতিক আকার তার মধ্যে আনা যায় অধ্যাত্ম প্রেরণার মহত্তর শক্তি। বস্তুতঃ এই শেষ সমাধানটিই আজকালকার ধার্মিক মন বেশী সমাদর করে আর দেখা যায় যে চারিদিকে দৃঢ়ভাবে বলা হয় যে ভগবদ্-অন্বেষুর বা দিব্য প্রেম ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত যার জীবন তার যথার্থ কর্মক্ষেত্র ইহাই। কিন্তু পূর্ণযোগের যাত্রা পার্থিব জীবনের সহিত ভগবানের সম্পূর্ণ মিলনের দিকে, এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষান্ত থাকা বা বিশ্বপ্রীতি ও হিতসাধনের নৈতিক অনুশাসনের স্বল্প পরিসরের মধ্যে এই মিলনকে সীমিত রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পূর্ণ-যোগে আমাদের কেবল প্রেম ও জনসেবার কর্ম নয়, আমাদের জ্ঞানের কর্ম, শক্তি উৎপাদন ও সৃষ্টির কর্ম, প্রীতি, সৌন্দর্য ও অন্তঃপুরুষের সুখকর কর্ম, আমাদের সংকল্প, প্রচেষ্টা ও বলের কর্ম অর্থাৎ সকল কর্মকেই করা চাই ভাগবত জীবনের অংগ। ইহাতে এই সব কর্মসাধনের পদ্ধতি বহির্মুখী ও মানসিক হবে না, তা হবে অন্তর্মুখী ও অধ্যাত্ম এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহা সকল কর্মের মধ্যেই—তা তারা যাই হ'ক না কেন—আনবে দিব্য প্রেমের ভাব, আরাধনা ও পূজার ভাব, ভগবানে ও ভগবৎ সৌন্দর্যে সুখের ভাব যাতে সমগ্র জীবনকে করা যায় ভগবানের প্রতি অন্তঃপুরুষের প্রেমের কর্মের যজ্ঞ, তার জীবনের অধীশ্বরের উদ্দেশে তার ধর্মানুষ্ঠান।

এইভাবে কর্মের আন্তরভাবের দ্বারা জীবনকে করা যায় পরাৎপরের আরাধনা; কেননা গীতা বলে, "হৃদয়ের ভক্তির সহিত যে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল অর্পণ করে আমি তার সেই ভক্তির উপহারকে গ্রহণ ক'রে তৃপ্তির সহিত ভোগ করি।" আর এইরূপ প্রেম ও ভক্তিভরে শুধু যে উৎসর্গীকৃত বাহ্য উপহার নিবেদন করা যায় তা নয়, আমাদের সকল মনন, সকল বেদনা ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ, আমাদের সকল বহির্মুখী ক্রিয়া ও তাদের রূপ ও বস্তু সনাতনের কাছে ঐ রূপ নিবেদিত উপহার হতে পারে। একথা ঠিক যে কোনো বিশেষ ক্রিয়া বা ক্রিয়ার বিশেষ রূপের নিজস্ব মূল্য আছে, এমন কি সে মূল্য বেশ বড়, কিন্তু ক্রিয়ার আন্তরভাবই মূল বিষয়; যে আন্তর ভাবের প্রতীক বা জড়ীয় বহিঃপ্রকাশ এই ক্রিয়া সেই আন্তরভাব থেকেই আসে ক্রিয়ার মূল্য, তাতেই নিরূপিত হয় তার তাৎপর্য। অথবা বলা যেতে পারে যে দিব্য প্রেম ও পূজার যে সম্পূর্ণ কর্ম তার তিনটি অংশ, ইহারা এক সমগ্রেরই প্রকাশ; প্রথম হ'ল কর্মের মাধ্যমে ভগবানকে হাতে কলমে পূজা করা, দ্বিতীয়—কোনো

আন্তর দর্শন ও আকৃতি বা ভগবানের সহিত কোনো সম্পর্ক প্রকাশ করে এমন কোনো কর্মের রূপে পূজার প্রতীক, আর তৃতীয়—হৃদয়, অন্তঃপুরুষ ও চিৎ-পুরুষে আন্তর আরাধনা ও একত্বের আকাঙ্ক্ষা বা একত্বের অনুভূতি। সেই রকম, জীবনকে পূজায় পরিবর্তিত করার উপায় হ'ল—তার পশ্চাতে বিশ্বাতীত ও বিশ্বজনীন প্রেমের, একত্বের এষণার, একত্বের বোধের আন্তর ভাব স্থাপন করা; প্রতি কর্মকে ভগবদ্-অভিমুখী ভাবাবেগের বা ভগবানের সহিত কোনো সম্পর্কের প্রতীক, বহিঃপ্রকাশ করা; আমরা যা করি সে সবকে পরিণত করা পূজার কর্মে, অন্তঃপুরুষের সংযোগের, মনের ধারণার, প্রাণের মান্যতার, হৃদয়ের সমর্পণের কর্মে।

যে কোনো ধর্মানুষ্ঠানে প্রতীক, তাৎপর্যপূর্ণ আচার বা ভাবব্যঞ্জক মূর্তি শুধু যে এক ভাবোদ্দীপক ও শ্রীবর্ধক সৌন্দর্যময় অঙ্গ তা নয়, ইহা এক স্থূল উপায় যার সাহায্যে মানুষ তার হৃদয়ের ভাবাবেগ ও আস্পৃহাকে বাহ্যতঃ স্পষ্ট, দৃঢ় ও স্ফুরন্ত ক'রতে শুরু করে। কারণ যদি এই হয় যে অধ্যাত্ম আস্পৃহাহীন পূজা অর্থশূন্য ও নিষ্ফল, তা হ'লে ক্রিয়া ও রূপ বর্জিত আস্পৃহাও এমন এক অমূর্তশক্তি যা জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে মানবজীবনের সকল রূপেরই নিয়তি হ'ল কঠিন হওয়া, কেবলমাত্র আচারসর্বস্ব হওয়া ও সেজন্য জীর্ণ হ'য়ে পড়া; অবশ্য যদিও যারা তখনও রূপ ও অনুষ্ঠানের অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রতে সক্ষম তাদের কাছে সে সবের শক্তি বরাবর বজায় থাকে, তা হ'লেও অধিকাংশ লোকই অনুষ্ঠানকে ব্যবহার করে এক যান্ত্রিক আচার হিসাবে, এবং প্রতীককে ব্যবহার করে এক প্রাণহীন চিহ্ন হিসাবে, আর তার ফলে ধর্মের আন্তর ভাব নষ্ট হওয়ায় শেষে অনুষ্ঠান ও রূপের পরিবর্তন অথবা তাদের সম্পূর্ণ পরিবর্জন প্রয়োজনীয় হ'য়ে ওঠে। এমন অনেক লোকও আছে যাদের কাছে এই কারণে ধর্মের সকল অনুষ্ঠান ও রূপ দূষণীয় ও ও বিরক্তিকর; কিন্তু খুব কম লোকই এই সব বাহ্য প্রতীকের সাহায্য না নিয়ে চলতে পারে, আর এমন কি মানবপ্রকৃতির মাঝে এমন এক দিব্য উপাদান আছে আছে যা সর্বদাই এই সব চায় অধ্যাত্ম তৃপ্তির সম্পূর্ণতার জন্য। যদি প্রতীক যথার্থ, অকৃত্রিম, সুন্দর ও আনন্দময় হয় তা হ'লে ইহা সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত এমনকি এ কথাও বলে চ'লে সে সৌন্দর্যবোধ বা ভাবাবেগবর্জিত অধ্যাত্মচেতনা পুরোপুরি বা অন্ততঃ অখণ্ডভাবে অধ্যাত্ম নয়। অধ্যাত্ম জীবনে প্রতি কর্মের ভিত্তি হ'ল এমন এক চিরন্তনী ও সঞ্জীবনী অধ্যাত্মচেতনা যার বেগ সর্বদাই নব নব রূপে আত্ম-প্রকাশ করে বা যা সর্বদাই আন্তরভাবের প্রবাহ দ্বারা রূপের সত্যকে নবজীবন দিতে সক্ষম, আর এই ভাবে নিজেকে প্রকাশ করা এবং প্রতি ক্রিয়াকে অন্তঃপুরুষের কোনো সত্যের জীবন্ত প্রতীক ক'রে তোলাই এই অধ্যাত্মচেতনার সৃজন-ক্ষম আন্তর দর্শন ও সংবেগের প্রকৃতি। অধ্যাত্ম

সাধকের কর্তব্য হবে—এইভাবে জীবনকে ব্যবহার করা, এইভাবে তার রূপ পরিবর্তিত ও তাকে তার স্বরূপে গৌরবময় করা।

পরম দিব্য প্রেম এক সৃজনী শক্তি, এবং যদিও এই শক্তি স্বরূপে নীরব ও অপরিবর্তনীয় থাকতে পারে, তবু বাহ্যরূপ ও বহিঃপ্রকাশের মধ্যেই তার আনন্দ; নির্বাক ও নিরাকার দেবতা থাকতে সে বাধ্য নয়। এমন কি একথাও বলা হয়েছে যে সৃষ্টি প্রেমেরই এক কর্ম বা অন্ততঃ পক্ষে এমন এক ক্ষেত্র-গঠন যার মধ্যে দিব্যপ্রেম নিজের বিভিন্ন সব প্রতীক উদ্ভাবন ক'রে নিজেকে সার্থক ক'রতে সক্ষম পারস্পরিক সহযোগিতা ও আত্মদানের কাজে: আর যদি ইহা সৃষ্টির প্রাথমিক প্রকৃতি না-ও হয় তা'হলেও ইহা তার চরম উদ্দেশ্য ও প্রেরণা। এখন যে এ রকম মনে হয় না তার কারণ যদিও দিব্যপ্রেমই এই জগতে বিভিন্ন সৃষ্ট বিষয়ের সকল ক্রম-অভিব্যক্তির ধারক তবু জীবনের ও তার ক্রিয়ার উপাদানের মালমশলা হ'ল অহমাত্মক রূপায়ণ, বিভাজন, আপাত উদাসীন, নির্দয়, এমন কি বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রাণহীন ও নিশ্চেতন জড় জগতে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণ ও চেতনার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বিশৃঙ্খলা ও অন্ধকারের মাঝে সকলেই নিক্ষিপ্ত হয় পরস্পরের বিরুদ্ধে, প্রত্যেকেরই সংকল্প, প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ নিজের জীবন প্রতিষ্ঠিত করা, আর শুধু অনুষঙ্গক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা অপরের মধ্যে এবং খুবই অংশিকভাবে অপরের জন্য; কেন না এমন কি মানুষের পরার্থপরতাও মূলতঃ অমোত্মক থাকে আর তা এরূপ থাকতে বাধ্য যতদিন না অন্তঃপুরুষ খুঁজে পায় দিব্য একত্বের রহস্য। এই রহস্যকে তার পরম উৎসে আবিষ্কার করা, ভিতর থেকে আনা ও জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা বিকিরণ করা—যোগসাধনার সাধ্য ইহাই। সকল ক্রিয়া, সকল সৃষ্টিকে পরিণত করা চাই ধর্মানুষ্ঠানের, পূজার, যজ্ঞের একরূপে এক প্রতীকে; ইহাতে এমন কিছু থাকা চাই যার জন্য তাতে এই ছাপ পড়ে যে ইহা নিবেদন, দিব্যচেতনার গ্রহণ ও রূপায়ণ, পরম প্রেমাস্পদের সেবা, আত্মদান, সমর্পণ। যেখানে সম্ভব সেখানেই ইহা করা চাই কর্মের বাহ্য দেহ ও রূপে; আর সর্বদাই ইহা করা চাই অন্তর্মুখী ভাবাবেগ ও প্রখরতায় যা থেকে বোঝাবে যে সনাতনের উদ্দেশে অন্তঃপুরুষ থেকে বহিঃপ্রবাহ ইহা।

কর্মের মধ্যে পূজার ভাব নিজেই এক মহান ও সম্পূর্ণ ও শক্তিশালী যজ্ঞ যার ঝোঁক নিজেকে বহুগুণিত ক'রে পরম একের আবিষ্কার সাধন করা ও ভগবানের বিকিরণ সম্ভব করা। কারণ কর্মের মধ্যে ভক্তি মূর্ত হ'লে তাতে শুধু যে তার নিজের পথ প্রশস্ত ও পূর্ণ ও স্ফুরন্ত হয় তা নয়, জগতে কর্মের আরো কঠিন পথে আনন্দ ও প্রেমের এমন এক দিব্যভাবপূর্ণ বেগ আসে যা প্রায়শঃই তার প্রারম্ভে থাকে না কারণ এই সময় থাকে শুধু কঠোর অধ্যাত্ম সংকল্প যা দুরারোহ উৎক্রান্তির পথে চলে এক প্রয়াসকর ঊর্ধ্বগ্রাহী

আত্মানে আর হৃদয় তখনো থাকে নিদ্রামগ্ন বা নীরবতায় বদ্ধ। যদি ইহার মধ্যে দিব্য প্রেমের ভাব আসে তা হ'লে পথের কঠোরতা হ্রাস পায়, প্রয়াসকর চাপ লঘু হয় আর বাধাবিঘ্ন ও সংগ্রামের মর্মস্থলেও মাধুর্য ও আনন্দ আসে। বস্তুতঃ পরমের নিকট আমাদের সংকল্প, কর্ম ও ক্রিয়াধারার যে সমর্পণ অপরিহার্য তা সিদ্ধ ও সর্বতোভাবে ফলপ্রসূ হয় কেবল তখনই যখন তা হয় প্রেমের সমর্পণ। যখন সমগ্র জীবন পরিণত হয় এই পূজায়, সকল কর্ম করা হয় ভগবানের প্রেমে, এবং জগৎ ও সৃষ্ট বিষয়সমূহের প্রতি প্রেমে আর এই বোধে, এই উপলব্ধিতে যে এই সব ভগবানেরই অভিব্যক্তি নানা ছদ্মবেশে তখন সেই কারণেই সকল জীবন, সকল কর্ম হ'য়ে ওঠে পূর্ণযোগের অংশ।

হৃদয়ের আরাধনার আন্তর নিবেদন যা প্রতীকের মধ্যে পূজার মূল তত্ত্ব, কর্মের মধ্যে পূজার আন্তর ভাব—ইহাই যজ্ঞের প্রাণ। যদি আমরা চাই যে নিবেদন সম্পূর্ণ ও সার্বিক হবে তাহ'লে আমাদের সকল ভাবাবেগকে ভগবদ্-অভিমুখী করা অত্যাবশ্যক। মানবহৃদয়কে বিশুদ্ধ করার সব চেয়ে জোরালো উপায় ইহাই, যে কোনো নীতিমূলক বা সৌন্দর্যবোধমূলক শুদ্ধির পন্থা তার সর্বশক্তি ও বাহ্য প্রভাবের বলে যত শক্তিশালী হ'তে পারে তার চেয়ে ইহা আরো শক্তিশালী। অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করা চাই এক চৈত্য অগ্নি যাতে নিক্ষেপ করা হয় সব কিছু যার উপর আছে দিব্য নাম। সেই অগ্নির মাঝে সকল ভাবাবেগ বাধ্য হ'য়ে বিসর্জন দেবে তাদের সব স্থূলতর উপাদান এবং যেগুলি অদিব্য বিকৃতি সেগুলি সম্পূর্ণ দগ্ধ হবে আর অন্যগুলির অপ্রচুরতা নিরাকৃত হবে, অবশেষে শিখা, ধূপ ও ধূপগন্ধের মধ্য থেকে উঠে আসে বৃহত্তম প্রেম ও নিষ্কলঙ্ক দিব্য আনন্দ। এই ভাবে যে দিব্য প্রেমের উদ্ভব হয় তা অন্তর্মুখী বেদনায় মানব ও সর্বভূতস্থিত ভগবানে সক্রিয় বিশ্বজনীন সমত্বে প্রসারিত হ'লে তা ভ্রাতৃত্বের নিষ্ফল শ্রেষ্ঠ মানসিক আদর্শ অপেক্ষা জীবনের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য আরো শক্তিশালী হবে এবং আরো বাস্তব যন্ত্র হবে। কর্মের মধ্যে একমাত্র এই দিব্য প্রেমের বর্ষণধারাই জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সকল প্রাণীর মধ্যে সত্যকার ঐক্য সৃজনে সমর্থ: এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য সকলেরই প্রয়াস নিষ্ফল হবে যতক্ষণ না দিব্য প্রেম আত্মপ্রকাশ করে পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অভিব্যক্তির হৃদয়রূপে।

এইখানে যজ্ঞের নেতা হিসাবে আমাদের মধ্যে নিগূঢ় চৈত্যপুরুষের আবির্ভাব সমধিক গুরুত্বপূর্ণ: কারণ একমাত্র এই অন্তরতম পুরুষই তার সহিত আনতে পারে কর্মের মধ্যকার আন্তরভাবের, প্রতীকের মধ্যকার মূল তত্ত্বের পূর্ণ শক্তি। এমন কি যতদিন অধ্যাত্মচেতনা অসম্পূর্ণ থাকে তখনও একমাত্র ইহাই প্রতীকের চিরনবীনতা, অকৃত্রিমতা ও সৌন্দর্য রক্ষা ক'রতে এবং

তাকে এক প্রাণহীন রূপে বা দূষিত ও দোষজনক জাদুতে পর্যবসিত হওয়া থেকে নিবারণ ক'রতে সমর্থ; কর্মের জন্য তার শক্তি ও তাৎপর্য বজায় রাখতে সক্ষম একমাত্র ইহাই। আমাদের সত্তার অপর সব অংগ—মন, প্রাণশক্তি, ভৌতিক বা শারীর চেতনা অবিদ্যার এত বশীভূত যে তারা পথপ্রদর্শক বা অভ্রান্ত সংবেগের উৎস হওয়া তো দূরের কথা, নিশ্চিত করণ হবার অযোগ্য। এই সব শক্তির প্রেরণা ও ক্রিয়ার অধিকাংশই সর্বদা আঁকড়ে থাকে প্রাচীন বিধান, ভ্রান্তিকর অনুশাসন ও প্রকৃতির বিভিন্ন দীর্ঘপুষ্ট অবর গতিবৃত্তি: আর যে সব স্বর ও শক্তি আমাদের আহ্বান করে, প্রেরণা দেয় যেন আমরা নিজেদের ছাপিয়ে রূপান্তর করি মহত্তর সত্তায় ও আরো ব্যাপ্ত প্রকৃতিতে সে সবকে তারা দেখে অনিচ্ছা, শংকা, বা বিদ্রোহ বা প্রতিবন্ধক নিশ্চেষ্টতার সহিত। তারা যে সাড়া দেয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় প্রতিরোধ, নয় সংকুচিত বা স্বার্থপ্রণোদিত সাময়িক সম্মতি; কেন না এমন কি যখন তারা আহ্বান মতো চলে তখনো তাদের ঝোঁক—সচেতনভাবে না হলেও গতানুগতিক অভ্যাস বশে—তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক অক্ষমতা ও প্রমাদ আনা অধ্যাত্ম ক্রিয়ার মধ্যে। প্রতি মুহূর্তেই তারা লুব্ধ হয় চৈত্য ও অধ্যাত্ম প্রভাব থেকে অহমাত্মক সুবিধা নিতে এবং লক্ষ্য ক'রলে দেখা যায় যে এই সব প্রভাব যে শক্তি আনন্দ ও আলো আমাদের মধ্যে আনে তাদের তারা ব্যবহার ক'রছে অবর জীবনের উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য। এর পরেও, এমন কি যখন সাধক নিজেকে খুলে ধরেছে বিশ্বাতীত, বিশ্বজনীন বা বিশ্বগত দিব্য প্রেমের নিকট তখনও যদি সে জীবনের মধ্যে সেই দিব্য প্রেম ঢালতে চেষ্টা করে তার সম্মুখে আসে এই সব অবর প্রকৃতি-শক্তির আচ্ছন্নতা ও বিকৃতির বাধা। এই সব শক্তি সর্বদাই নিয়ে যায় প্রচ্ছন্ন গহ্বরের দিকে, উচ্চতর তীব্রতার মাঝে ঢালে তাদের খর্ব-কারী উপাদান আর সেই অবতরণরত শক্তিকে নিজেদের জন্য ও নিজেদের স্বার্থের জন্য অধিকার ক'রে তাকে নামাতে চায় কামনা ও অহং-এর অতিস্ফীত, মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক উপায়ের হীন স্তরে। দিব্য প্রেমকে পরম সত্য ও আলোকের নতুন স্বর্গের, নতুন পৃথিবীর স্রষ্টারূপে গ্রহণ না ক'রে তারা তাকে এখানে বন্দী ক'রে রাখতে চায় এই উদ্দেশ্যে যে পুরনো পৃথিবীর কর্দমকে স্বর্ণাভ করার ও ভাববিলাসী প্রাণিক ও কল্পনার মানসিক আদর্শে গঠিত স্বপ্নরাজ্যের পুরনো ধূসর অবাস্তব আকাশকে গোলাপী ও নীল রঙে অনুরঞ্জিত করার কাজে দিব্য প্রেম হবে এক প্রচণ্ড সমর্থক ও ঊর্ধ্বায়নের এক গৌরবদায়িকা শক্তি। যদি এই মিথ্যার কাজকে চলতে দেওয়া হয় তা হ'লে পরতর আলোক শক্তি ও আনন্দ সরে যায়, তখন সাধক নেমে আসে নীচের স্তরে; আর না হয় উপলব্ধি এক বিপদসংকুল অর্ধপথে ও মিশ্রণে বদ্ধ থাকে অথবা সত্যকার আনন্দ নয় এমন এক অবর প্রমোদে ঢাকা পড়ে, এমন কি তার

মধ্যে ডুবে যায়। এইজন্য যে দিব্য প্রেম সকল সৃষ্টির হৃৎমূলে অবস্থিত এবং সকল পাবনী ও সৃজনী শক্তির মধ্যে প্রবলতম তা আজ পর্যন্ত পার্থিব-জীবনে খুব অল্পই সম্মুখে এসেছে, উদ্ধারসাধনে তার সাফল্য অতি অল্প, আর সৃজন কার্যও অতি সামান্য। সকল দিব্য ক্রিয়া-শক্তির মধ্যে ইহা সব চেয়ে প্রবল, বিশুদ্ধ, দুর্লভ ব'লেই মানবপ্রকৃতি ইহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় ধারণ করতে অসমর্থ হয়েছে; যা সামান্য ধরা সম্ভব হ'য়েছে তা-ও তৎক্ষণাৎ বিকৃত করা হ'য়েছে ধার্মিকতার এক প্রাণিক উত্তাপে, সমর্থনের অযোগ্য এক ধর্মীয় বা নৈতিক ভাববিলাসে, গোলাপী রঙে রঞ্জিত মনের বা উদ্দাম আবেগময় পঙ্কিল প্রাণ-সংবেগের ইন্দ্রিয়পর বা এমন কি ইন্দ্রিয়ভোগবিলাসী কামুকতাদুষ্ট রহস্যবাদে; যে রহস্যময় অগ্নিশিখা তার যজ্ঞীয় জিহ্বার দ্বারা জগৎকে পুনর্গঠিত ক'রতে পারত তাকে ধারণ করার অক্ষমতার দরুন সে, আসল জিনিষ না দেওয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়েছে এক নকল জিনিষ। একমাত্র অন্তরতম চৈত্যপুরুষই অনবগুণ্ঠিত হয়ে ও তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে বাহিরে এসে তীর্থযাত্রী যজ্ঞকে নিয়ে যেতে পারে অক্ষত অবস্থায় এই সব গুপ্ত আক্রমণ ও প্রচ্ছন্ন গহ্বরের মধ্য দিয়ে; প্রতি মুহূর্তে ইহা মনের ও প্রাণের অনৃতগুলি ধ'রে, বাহিরে প্রকাশ ক'রে তাদের প্রতিহত করে, দিব্য প্রেম ও আনন্দের সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং তাকে পৃথক করে মনের তীব্র অনুরাগের উত্তেজনা থেকে আর যে প্রাণ-শক্তি ভুল পথে চালায় তার অন্ধ উৎসাহ থেকে। কিন্তু মন, প্রাণ ও শরীরের মর্মলোকে যা কিছু সত্য সে সবকে ইহা মুক্ত ক'রে নিজের সাথে নিয়ে যায় তার যাত্রাপথে যতদিন না তারা এসে দাঁড়ায় উচ্চ শিখরে নব আন্তরভাবে ও মহিমময় মূর্তিতে।

কিন্তু তবু দেখা যায় যে এই অন্তরতম চৈত্যপুরুষের পরিচালনা পর্যাপ্ত হয় না যতদিন না ইহা নিজেকে তুলতে পারে এই অবর প্রকৃতির স্তূপ থেকে পরতম অধ্যাত্ম স্তরে, আর যে দিব্য স্ফুলিঙ্গ ও শিখা এখানে অবতরণ ক'রেছিল তা আবার নিজেদের যুক্ত করে তাদের মূল অগ্নিময় ব্যোমের সঙ্গে। কারণ সেখানে আর এমন অধ্যাত্ম চেতনা থাকে না যা তখনো অপূর্ণ এবং যা নিজের কাছে নিজের অর্ধেক হারিয়ে ফেলেছে মানুষের মন প্রাণ দেহের ঘন আবরণে: সেখানে বিরাজমান পূর্ণ অধ্যাত্ম চেতনা তার বিশুদ্ধতায়, স্বাধীনতায় ও ঘনব্যাপ্তিতে। সেখানে যেমন সনাতন পরম জ্ঞাতাই আমাদের মধ্যে জ্ঞাতা হ'য়ে সকল জ্ঞান প্রবর্তন ও ব্যবহার করেন, তেমন সনাতন সর্ব-আনন্দময়ই পরম আরাধ্য যিনি নিজের কাছে আকর্ষণ ক'রছেন তাঁর সত্তা ও আনন্দের সনাতন দিব্য অংশকে যা বিশ্ব-বিলাসে বাহির হ'য়েছিল, তিনিই অনন্ত পরম প্রেমিক যিনি সুখময় একত্বের মধ্যে নিজেকে বাহিরে ঢেলে দিচ্ছেন নিজেরই অভিব্যক্ত সব আত্মার বহুত্বের মধ্যে। জগতের সর্ব সৌন্দর্যই সেখানে পরম প্রেমাস্পদের

সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যের সকল রূপকেই দাঁড়াতে হয় সেই শাশ্বত সৌন্দর্যের আলোকতলায় এবং শরণ নিতে হয় অনবগুণ্ঠিতা দিব্য সিদ্ধির ঊর্ধ্বায়ন-সাধিকা ও রূপান্তরকারিণী শক্তির নিকট। সকল আনন্দ ও হর্ষ সেখানে সর্ব আনন্দময়েরই, এবং ভোগ, সুখ বা আমোদের সকল অবরূদ্ধ রূপের উপর আসে এই আনন্দময়েরই প্লাবনের বা স্রোত ধারার তীব্রতার অভিঘাত, আর ইহার দণ্ডদায়ী প্রভাবে তারা হয় ভেঙে খণ্ড হয় পর্যাপ্ত নয় ব'লে, অথবা বাধ্য হ'য়ে নিজেদের রূপান্তরিত করে দিব্য আনন্দের বিভিন্ন রূপে। এই-ভাবে ব্যষ্টি চেতনার পক্ষে এমন এক শক্তির অভিব্যক্তি হয় যা নিরঙ্কুশভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম অবিদ্যার ইষ্টার্থের হ্রস্বতা ও হীনমানতার সহিত। অবশেষে প্রেম ও হর্ষের যে বিশাল বাস্তবতা ও প্রগাঢ় মূর্ততা সনাতনের, তাকে নিম্নে জীবনের মধ্যেও আনা সম্ভব হতে থাকে। অথবা অন্ততঃ আমাদের অধ্যাত্মচেতনার পক্ষে নিজেকে মনের সীমানার বাহিরে অতিমানসিক আলোক ও শক্তি ও বৃহত্ত্বের মধ্যে তোলা সম্ভব হবে; সেথায় অতিমানস বিজ্ঞানের আলোক ও গূঢ় শক্তির মধ্যে আছে দিব্য আত্ম-প্রকাশ ও আত্ম-সংগঠনের সামর্থ্যের জ্যোতি ও হর্ষ যা অবিদ্যার জগৎকেও উদ্ধার ক'রে তাকে পুনর্গঠিত ক'রতে পারে পরম চিৎ-পুরুষের সত্যের মূর্তিতে।

সেথায় অতিমানসিক বিজ্ঞানে আছে আন্তর আরাধনার সার্থকতা, পরি-ণতির তুঙ্গতা, সর্বগ্রাহী পরিব্যাপ্তি, গভীর ও অখণ্ড মিলন, প্রেমের প্রদীপ্ত পক্ষ যা ঊর্ধ্বে ধারণ করে এক পরম জ্ঞানের শক্তি ও হর্ষ। কারণ অতিমানসিক প্রেম এমন এক সক্রিয় উল্লাস আনে যা মুক্ত মনের স্বর্গ যে রিক্ত নিষ্ক্রিয় শান্তি ও নিঃস্তব্ধতা তা ছাপিয়ে যায় অথচ তাতে অতিমানসিক নীরবতার সূত্রপাত যে গভীরতর মহত্তর স্থিরতা তা ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রেমের যে ঐক্য নিজের মধ্যে সকল বিভেদ ধারণ করতে পারে অথচ তাদের বর্তমান সব সংকীর্ণতা ও আপাত বেসুরের দ্বারা খর্ব বা বিনষ্ট হয় না তা তার পূর্ণ যোগ্যতায় উন্নীত হয় অতিমানসিক স্তরে। কারণ সেখানে ভগবানের সহিত অন্তঃপুরুষের গভীর একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বভূতের সহিত প্রগাঢ় একত্ব বিভিন্ন সম্পর্কের লীলার সহিত সঙ্গতি স্থাপনে সক্ষম, আর এই সব সম্পর্কের দরুণ একত্ব হয়ে ওঠে আরো পূর্ণ ও নিরালম্ব। অতি-মানসিক-ভাবাপন্ন প্রেমের শক্তি সকল জীবন্ত সম্পর্ককেই নিতে পারে নিঃসঙ্কোচে ও নিরাপদে এবং সে সবকে তাদের অমার্জিত, মিশ্রিত ও তুচ্ছ মানুষী নিবেশ থেকে মুক্ত ও দিব্য জীবনের সুখময় উপাদানে ঊর্ধ্বায়িত ক'রে ফেরাতে পারে ভগবানের দিকে। কেন না অতিমানসিক অনুভূতির স্বভাবই এই যে ইহা দিব্য মিলন বা অনন্ত একত্বকে বিসর্জন না দিয়ে বা বিন্দুমাত্র খর্ব না ক'রে ভেদের খেলাকে চিরদিন চলতে দিতে সক্ষম। মানুষ ও জগতের সকল

সংযোগকে পূত অগ্নিশিখা-শক্তিতে ও রূপান্তরিত তাৎপর্যে আলিঙ্গন করা অতিমানসিকভাবাপন্ন চেতনার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব; কেন না তখন অন্তঃপুরুষ সর্বদাই উপলব্ধি করবে যে প্রেম বা সৌন্দর্যের জন্য সকল আবেগের, সকল অন্বেষণের বিষয় সেই এক সনাতন, এবং সর্ববিষয়ে ও সর্বভূতে সেই এক ভগবানের সাক্ষাৎ পাবার ও তাঁর সহিত যুক্ত হবার জন্য ইহা অধ্যাত্মভাবে ব্যবহার করতে পারবে এক ব্যাপ্ত ও মুক্ত প্রাণ-প্রেষণা।

* * *

যজ্ঞ কর্মের তৃতীয় ও শেষ বর্গে নেওয়া যায় সেই সব কিছু যা কর্মযোগের জন্য সাক্ষাৎভাবে প্রশস্ত; কারণ ইহাই তার সংসাধনের ক্ষেত্র ও বৃহত্তর প্রদেশ। জীবনের যে সব কাজকর্ম আরো বেশী দৃষ্টিগোচর সে সবই ইহার অন্তর্ভূক্ত; জড় জীবনের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য যে প্রাণৈষণা নিজেকে বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করে তার বহুবিধ শক্তিও ইহার অন্তর্গত। এখানেই বৈরাগ্যনিষ্ঠ বা পরলোককামী আধ্যাত্মিকতা অনুভব করে তার সাধ্য পরম সত্যের এক অলংঘ্য অস্বীকার, আর বাধ্য হ'য়ে সে সরে যায় পার্থিব জীবন থেকে, ইহাকে প্রত্যাখ্যান করে এই ব'লে যে ইহা অশোধনীয় অবিদ্যার চিরন্তন তামস ক্রীড়াক্ষেত্র। তবু ঠিক এই সব কাজকর্মকেই পূর্ণযোগ চায় আধ্যাত্মিক বিজয় ও দিব্য রূপান্তরের জন্য। যে সব সাধনাপন্থা বেশী মাত্রায় বৈরাগ্যনিষ্ঠ তারা এই জীবনকে ত্যাগ করে একেবারে পুরোপুরি, অন্যেরা একে নেয় শুধু এক সাময়িক পরীক্ষা ক্ষেত্র হিসাবে বা প্রচ্ছন্ন চিৎ-পুরুষের ক্ষণস্থায়ী বাহ্য ও দুর্বোধ্য লীলাক্ষেত্র হিসাবে; কিন্তু পূর্ণ যোগের সাধক তাকে পরিপূর্ণ ভাবে আলিঙ্গন ও বরণ করে এই ব'লে যে ইহা সার্থকতা সাধনের ক্ষেত্র, দিব্য কর্মের ক্ষেত্র, প্রচ্ছন্ন ও অন্তরাধিষ্ঠিত পরম চিৎ-পুরুষের সমগ্র আত্ম-আবিষ্কারের ক্ষেত্র। নিজের মধ্যে পরম দেবতাকে আবিষ্কার করা তার প্রথম উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু জগতের পরিকল্পনা ও বিভিন্ন মূর্তির দ্বারা উপস্থাপিত আপাত অস্বীকৃতির পশ্চাতে জগতের মধ্যে তাঁকে সমগ্রভাবে আবিষ্কার করাও এক উদ্দেশ্য; আবার সর্বশেষ উদ্দেশ্য হ'ল কোনো বিশ্বাতীত সনাতনের স্ফুরত্তার সমগ্র আবিষ্কার; কারণ ইহার অবতরণবলেই এই জগৎ ও আত্মা এমন শক্তিমান হবে যে তারা তাদের ছদ্ম আবরণ বিদীর্ণ ক'রে দিব্য হ'য়ে উঠবে আত্মপ্রকাশরূপে ও অভিব্যক্তিশীল ধারায়, যেমন তারা এখন আছে গূঢ়ভাবে তাদের প্রচ্ছন্ন স্বরূপে।

পূর্ণযোগের এই উদ্দেশ্যকে সমগ্রভাবে স্বীকার করা পূর্ণযোগের সাধকদের অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু সিদ্ধির পথে যে বিশাল সব অন্তরায় আছে তা না জেনে যেন এই উদ্দেশ্য স্বীকার করা না হয়; অপর পক্ষে জাগতিক জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য যে ইহার মধ্যে ভগবানের আবিষ্কার এবং তা-ই যে আমাদের

অবশ্য কর্তব্য ইহা স্বীকার করা দূরের কথা, তা যে সম্ভব এ কথাও যে অন্য অনেক সাধনপন্থা অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল তার কারণ সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত হওয়া সাধকের অবশ্য কর্তব্য। কারণ এই জীবনের কর্মের মধ্যেই এই পার্থিব প্রকৃতিতে আছে এই বাধার মর্মস্থল যার জন্য দর্শন পালিয়েছে বিবিক্ততার চরমে আর এমন কি ধর্মেরও উৎসুক দৃষ্টি মরদেহে জন্মের ব্যাধি থেকে সরে নিবদ্ধ হ'য়েছে দূরস্থ স্বর্গে বা নির্বাণের নীরব শান্তিতে। আমাদের বিভিন্ন মর্ত্য ন্যূনতা ও অবিদ্যার সব প্রচ্ছন্ন গর্ত সত্ত্বেও শুদ্ধ জ্ঞানের পথ সাধকের চলার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ; শুদ্ধ ভক্তির পথে নানা বাধাবিপত্তি, দুঃখযন্ত্রণা ও পরীক্ষা থাকলেও ইহাও অন্যের সহিত তুলনায় উন্মুক্ত নীলাকাশে বিহঙ্গমের উড্ডয়নের মতো সহজ হ'তে পারে। কারণ জ্ঞান ও প্রেম স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ তবে তারা মিশ্রিত, ব্যাহত, দূষিত ও অবনমিত হয়ে ওঠে কেবল তখনই যখন তারা এসে পড়ে প্রাণশক্তির সন্দেহ-জনক সব গতিবৃত্তির মধ্যে আর এসব তাদের অধিকার করে বাহ্যজীবনের সব অশুদ্ধ গতিবৃত্তি ও সুদৃঢ় নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এই সকল শক্তির মধ্যে একমাত্র প্রাণ অথবা অন্ততঃপক্ষে কোনো প্রবল প্রাণ-সংকল্প আপাতদৃষ্টিতে এমন কিছু যা স্বরূপতঃ অশুদ্ধ, অভিশপ্ত বা অধঃপতিত। দিব্যশক্তিগুলিও ইহার সংস্পর্শে এসে তাব মলিন কোষে ঢাকা প'ড়ে অথবা তাব চকচকে জলাভূমিতে আবদ্ধ হ'য়ে সাধারণ ও কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে, আর নিম্নে আকৃষ্ট হয়ে বিকৃত এবং দানব ও অসুরের কবলিত হওয়ার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি থেকে কদাচ নিস্তার পায়। ইহার মূলে আছে এক তামস ও নিস্তেজ নিশ্চেষ্টতার তত্ত্ব; দেহ ও তার প্রয়োজন ও কামনা সব কিছুকে বেঁধে রাখে এক তুচ্ছ মনের কাছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা ও ভাবাবেগের এবং নগণ্য অসার সব প্রবৃত্তি, প্রয়োজন, উদ্বেগ, বৃত্তি, দুঃখ, সুখের অকিঞ্চিৎকর পুনরাবৃত্তির কাছে; এই সব নিজেদের ছাড়িয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যায় না, আর তাদের উপর এমন অবিদ্যার ছাপ আছে যা নিজের উৎপত্তির কারণ বা গতিবিধির লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই নিশ্চেষ্টতাপূর্ণ শারীর মন তার সব ক্ষুদ্র পার্থিব দেবতা ছাড়া অন্য কোনো দিব্যশক্তি বিশ্বাস করে না, হয়ত আরো বেশী আরাম, শৃঙ্খলা ও সুখের দিকে তার আস্পৃহা আছে, কিন্তু কোনো উন্নতি বা আধ্যাত্মিক মুক্তি সে চায় না। আমরা কেন্দ্রস্থলে দেখা পাই প্রাণের এক আরো বলশালী সংকল্প, ইহার ভোগের প্রবৃত্তি আরো বেশী প্রবল কিন্তু ইহা এক বিবেচনাহীন দেবতা, এক বিকৃত শক্তি, ইহার উল্লাস সেই সব জিনিষে যা জীবনকে করে তোলে দ্বন্দ্বময় বিশৃঙ্খলা ও দুঃখজনক জটিল অবস্থা। ইহা মানবীয় বা দানবীয় কামনার পুরুষ যা আঁকড়ে থাকে ভালো ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ, আলো ও আঁধার, মত্ত হর্ষ ও তিক্ত যন্ত্রণামিশ্রিত প্রবাহের

জমকালো রঙ, বিশৃঙ্খল কাব্য, প্রচণ্ড বিয়োগান্ত বা উত্তেজনাপূর্ণ মিলন-সূচক নাটক। এই সব জিনিসই ইহার প্রিয়, আরো বেশী করে ইহা এই সব পেতে চায় আর এমন কি কষ্ট পেয়ে এসবের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযোগ করেও ইহা অন্য কিছু নিতে পারে না বা আনন্দ পায় না; আরো উচ্চস্তরের সব জিনিসকে ইহা ঘৃণা করে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, আর যদি কোনো দিব্যতর শক্তি ধৃষ্টতাবশতঃ জীবনকে শুদ্ধ, প্রদীপ্ত ও সুখময় করতে এগিয়ে আসে আর তার মুখ থেকে উত্তেজক পদার্থে মিশ্রিত অগ্নিময় সুরা কেড়ে নিতে চায়—ইহা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে চাইবে তাকে পদদলিত, বিদীর্ণ বা ক্রুশবিদ্ধ করতে। আর এক প্রাণ-সংকল্প আছে যা উন্নতিকামী আদর্শগত মনকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত; এবং এই মন জীবনের মধ্য থেকে কিছু সুষমা, সৌন্দর্য, আলো, মহত্তর শৃঙ্খলা বাহির করতে চাইলে ইহা প্রলুব্ধ হয়; কিন্তু ইহা প্রাণিক প্রকৃতির এক আরো ক্ষুদ্র অংশ আর তার আরো প্রচণ্ড বা আরো তমসাচ্ছন্ন ও মলিন জোয়ালসঙ্গীরা তাকে সহজেই অভিভূত করতে সক্ষম; তাছাড়া মনের ঊর্ধ্বের কোনো ডাকে ইহা সহজে কাজ করতে চায় না যদি না সেই ডাক নিজেকে ব্যর্থ করে—যেমন ধর্ম সাধারণতঃ করে—তার দাবীকে আমাদের তমসাচ্ছন্ন প্রাণিক প্রকৃতির আরো বোধগম্য অবস্থায় নামিয়ে এনে। এই সব শক্তির উপস্থিতি অধ্যাত্ম সাধক নিজের মধ্যে ক্রমে অবগত হয়, তাদের সে দেখে তার চারিদিকে এবং তাদের মুষ্টিবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য ও তারা তার নিজের সত্তার উপর ও চারিদিককার মানবজীবনের উপর যে দীর্ঘকালব্যাপী সুরক্ষিত প্রভুত্ব খাটিয়ে এসেছে তা উৎখাত করার জন্য তাকে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সংগ্রাম করতে হয়। ইহা অতি দুরূহ সাধন, কারণ তাদের অধিকার এত শক্তিশালী, আপাতদৃষ্টিতে এত অজেয় যে অবজ্ঞাসূচক যে প্রবচনে মানব প্রকৃতিকে কুকুরের লেজের সহিত তুলনা করা হয়েছে তা যথার্থ ব'লেই প্রতিপন্ন হয়—কারণ, নীতি, ধর্ম, যুক্তি অথবা অন্য কোনো মুক্তিসূচক চেষ্টার দ্বারা তাকে যতই সোজা করা যাক না কেন তা আবার ফিরে আসে তার প্রকৃতিগত বক্র কুন্ডলীতে। যে প্রাণসংকল্প আরো বেশী মাত্রায় বিক্ষুব্ধ তার শক্তি, তার বদ্ধমুষ্টি এত প্রবল, তার মত্ত বেগ ও প্রমাদের বিপদ এত বিশাল, তার আক্রমণের প্রচন্ডতা বা তার বাধাবিঘ্নের ক্লান্তিকর প্রতিরোধ এত সূক্ষ্মভাবে সনির্বন্ধ বা অক্লান্তভাবে অন্তর্ভেদী, স্বর্গের দ্বার পর্যন্ত এত দুর্দম যে এমন কি সাধু ও যোগীও তার চক্রান্ত ও দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে নিজেদের মুক্ত বিশুদ্ধতা বা অনুশীলিত আত্ম-কর্তৃত্বের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'তে পারে না। সাধকের সংগ্রামরত সংকল্পের নিকট মনে হয় যে এই স্বাভাবিক বক্রতা দূর করার সকল পরিশ্রমই নিরর্থক; পলায়ন, সুখময় স্বর্গলোকে প্রয়াণ বা শান্তিময় লয় প্রাপ্তি—

ইহাদেরই কদর সহজে বাড়ে একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ হিসাবে: এবং পার্থিব জীবনের নিরানন্দ দাসত্ব বা হীন তুচ্ছ প্রলাপ বা অর্থহীন ও অনিশ্চিত সুখ ও সাফল্যের একমাত্র প্রতিবিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় পুনর্জন্ম-নিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন।

তবু একটা প্রতিবিধান থাকা উচিত এবং তা আছেও, এই বিক্ষুব্ধ প্রাণিক প্রকৃতির সংশোধনের উপায় আছে ও রূপান্তরের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহার জন্য উন্মার্গগমনের কারণ সন্ধান ও তার প্রতিকার সাধন করা চাই প্রাণেরই হৃৎমূলে এবং তার নিজেরই তত্ত্বের মধ্যে, কারণ প্রাণ বাস্তব দৃষ্টিতে যতই তমসাচ্ছন্ন বা বিকৃত মনে হ'ক ইহাও ভগবানের শক্তি, কোনো দুরাশয় দৈবের বা ঘোর দানবীয় সংবেগের সৃষ্টি নয়। প্রাণের মধ্যেই আছে তার নিজের পুনরুদ্ধারের বীজ, প্রাণশক্তি থেকেই আমাদের পেতে হ'বে উত্তোলনের শক্তি কারণ যদিও জ্ঞানের মধ্যে মুক্তিপ্রদ আলোক আছে, প্রেমের মধ্যে নিস্তারিণী রূপান্তরকারিণী শক্তি আছে, তবু এই সব এখানে ফলপ্রসূ হ'তে পারে না যদি না তারা প্রমাদশীল মানুষী প্রাণশক্তিকে দিব্য প্রাণশক্তিতে ঊর্ধ্বায়নের জন্য প্রাণের সম্মতি পায় ও ব্যবহার করতে পারে প্রাণের কেন্দ্রে কোনো মুক্ত শক্তি কার্যসাধনের সহায় হিসাবে। যজ্ঞের সব কর্মকে ভাগ ক'রে জোর করে সমস্যার শেষ করা সম্ভব নয়: যদি আমরা স্থির করি যে আমরা শুধু প্রেম ও জ্ঞানের কর্ম করব, আর সংকল্প ও শক্তি, অধিকার ও প্রাপ্তি, উৎপাদন ও সামর্থ্যের সকল প্রয়োগ, যুদ্ধ, বিজয় ও প্রভুত্ব প্রভৃতির সব কাজ ফেলে রাখি ও এই সব কাজ কামনা ও অহং-এর উপাদানে তৈরী এবং সেহেতু বৈষাম্য, শুধু বিরোধ ও বিশৃংখলার ক্ষেত্র হ'তে বাধ্য এই মনে ক'রে জীবনের বৃহত্তর অংশকেই বাদ দিই তা হ'লেও আমরা সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাব না। ইহার কারণ এই যে বাস্তব ক্ষেত্রে ঐ বিভাজন সম্ভব নয়; আর যদি আমরা তা চেষ্টা করি তা হ'লে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে কারণ তাতে আমরা জগৎ-সামর্থ্যের সমগ্র ক্রিয়া-শক্তি থেকে আলাদা হয়ে পড়ব আর অখন্ড প্রকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিবীর্য হবে অথচ এই অংশই একমাত্র সেই শক্তি যা জগতের যে কোনো সৃজনক্ষম উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়োজনীয় যন্ত্র। প্রাণ-শক্তি এক অপরিহার্য মধ্যবর্তী অঙ্গ, এখানে প্রকৃতির মধ্যে ইহাই কার্যসাধক উপাদান; যদি মনের সব কাজকে অমূর্ত উজ্জ্বল আন্তর রূপায়ণ রাখা না চ'লে তা হ'লে মনের পক্ষে প্রাণশক্তির মিত্রতা প্রয়োজন; চিৎ-পুরুষেরও একে দরকার তার অভিব্যক্ত সম্ভাবনাগুলিকে বাহ্যশক্তি ও রূপ দেবার জন্য এবং জড়ের মধ্যে রূপায়িত হয়ে আত্ম-প্রকাশকে সম্পূর্ণ করার জন্য। চিৎপুরুষের অন্যান্য ক্রিয়াধারায় যদি প্রাণ তার মধ্যবর্তী শক্তির সাহায্য দিতে অস্বীকার করে বা সাহায্য দিতে চাইলেও তা না নেওয়া হয় তা হলে এই সব কাজের ফল

এখানে যতদূর হওয়া সম্ভব তা হওয়ার বদলে তারা স্থাণু হ'য়ে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে অথবা পরিণত হয় স্বর্ণময় অক্ষমতায়; অথবা যদিই বা কিছু করা হয় তা হবে আমাদের যে সব কাজ পরাক্-বৃত্ত অপেক্ষা বেশী প্রত্যক্-বৃত্ত তাদের আংশিক বিচ্ছুরণ, তাতে হয়ত জীবন কিছু সংযত হয় কিন্তু জীবনকে রূপান্তর করার শক্তি তার নেই। অথচ যদি প্রাণ তার সব শক্তিকে অশুদ্ধ অবস্থায় পরম চিৎপুরুষের কাছে আনে তা হলে তার ফল আরো খারাপ হতে পারে কারণ সম্ভবতঃ প্রেম বা জ্ঞানের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকে প্রাণ পরিণত করবে স্তিমিত ও দূষিত গতিবৃত্তিতে অথবা তাদের করবে নিজের হীন বা বিকৃত কুকার্যের সহচর। সৃজনশীল আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সম্পূর্ণতার জন্য প্রাণ অপরিহার্য কিন্তু এই প্রাণ হওয়া চাই বন্ধনমুক্ত, রূপান্তরিত, উন্নীত; ইহা সাধারণ মানসিকভাবাপন্ন মানব-পশুর প্রাণ নয়, বা দানবীয় কি আসুরিক প্রাণ নয়, এমন কি দিব্য অদিব্য মেশানো প্রাণও নয়। অন্যান্য জগৎ-ত্যাগী বা স্বর্গকামী সাধনপন্থায় যা-ই করা হক না কেন, পূর্ণযোগে ইহাই দুরূহ কিন্তু অপরিহার্য সাধন; জীবনের সব বহির্মুখী কর্মের সমস্যার সমাধান না করে তার উপায় নেই, ইহাদের মধ্যে তার পাওয়া চাই ইহাদের স্বকীয় দিব্যত্ব এবং এই দিব্যত্বকে তার যুক্ত করা চাই দৃঢ়ভাবে ও চিরদিনের জন্য প্রেম ও জ্ঞানের বিদ্যুত্বের সহিত।

আবার, যতদিন না প্রেম ও জ্ঞান এত ক্রমোন্নত হয় যে তারা প্রাণ-শক্তিকে শুদ্ধ করার জন্য তার উপর অপ্রতিহত ও নিরাপদ আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় ততদিন জীবনের সব কর্মের সহিত কারবার স্থগিত রাখাও সমস্যার কোনো সমাধান নয়; কেন না আমরা দেখেছি যে ইহাদের প্রথম ওঠা চাই অমিত উচ্চতায় তবে যদি তারা নিরাপদ হতে পারে প্রাণিক বিকৃতি থেকে যা তাদের মুক্তিপ্রদ শক্তিকে ব্যাহত বা পঙ্গু করে। কিন্তু একবার যদি আমাদের চেতনা অতিমানসিক প্রকৃতির উত্তুঙ্গ শিখরে উঠতে পারত তা হ'লে নিশ্চয়ই এই সব অসামর্থ্যের অবসান হ'ত। কিন্তু এখানে আমরা এক উভয় সংকটে পড়ি;—একদিকে যেমন অশুদ্ধ প্রাণশক্তির বোঝা কাঁধে নিয়ে অতিমানসিক উচ্চতায় পৌঁছান অসম্ভব, অন্যদিকে তেমন অধ্যাত্ম ও অতিমানসিক স্তরের অভ্রান্ত আলোক ও অজেয় শক্তি না নামিয়ে আনলে প্রাণৈষণারও আমূল সংস্কার সমানই অসম্ভব। অতিমানসিক চেতনা শুধু জ্ঞান, আনন্দ, অন্তরঙ্গ প্রেম ও একত্ব নয়, অধিকন্তু ইহা সংকল্প, সামর্থ্য ও শক্তির তত্ত্ব, আর ইহার অবতরণ সম্ভব হয় না যতদিন না এই ব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যকার সংকল্প সামর্থ্য ও শক্তির উপাদান তাকে গ্রহণ ও ধারণ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত ও ঊর্ধ্বায়িত হয়। কিন্তু সংকল্প, সামর্থ্য ও শক্তি প্রাণশক্তিরই স্বকীয় ধাতু আর এই যে প্রাণ শুধু জ্ঞান ও প্রেমের প্রাধান্য স্বীকার ক'রতে

রাজী হয় না, এই যে ইহার তাড়না এমন কিছুর তৃপ্তি সাধনের দিকে যা অত্যধিক অবিবেচক, হঠকারী ও বিপজ্জনক, তার সমর্থনে যুক্তি এই যে ইহা আবার ভগবান ও পরব্রহ্মের দিকেও এগিয়ে যাবার সাহস রাখে তার নিজস্ব নির্ভীক ও ব্যগ্র পথে। প্রেম ও প্রজ্ঞাই ভগবানের একমাত্র বিভাব নয়, শক্তিও তার এক বিভাব। যেমন মন হাতড়ায় পরম জ্ঞানের জন্যে, যেমন হৃদয় খুঁজে বেড়ায় পরম প্রেমের জন্য, প্রাণশক্তিও তেমন,—তা সে যতই আনাড়ীর মতো বা ভয়ে ভয়ে হক—ভুল করতে করতে চলে পরম শক্তি ও শক্তি-দত্ত আধিপত্যের সন্ধানে। শক্তি স্বভাবতঃই দোষজনক ও অশুভ এই যুক্তিতে ইহা নেওয়া বা ইহা পাবার জন্য চেষ্টা করা অনুচিত ব'লে নৈতিক বা ধার্মিক মন যে ইহার নিন্দা করে তা ঠিক নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে এই নিন্দার সমর্থন পাওয়া গেলেও, মূলতঃ ইহা এক অন্ধ ও অযৌক্তিক পূর্ব-ধারণা। শক্তির বিকৃতি ও অপব্যবহার যতই হক না কেন—আর প্রেম ও জ্ঞানেরও তো বিকৃতি ও অপব্যবহার আছে—শক্তি দিব্যবস্তু, তাকে এখানে রাখা হয়েছে দিব্য ব্যবহারের জন্য। শক্তি, সংকল্প, সামর্থ্য—ইহাই সব জগৎ চালায়, আর তা জ্ঞান-শক্তি, বা প্রেম-শক্তি বা প্রাণ-শক্তি বা ক্রিয়া-শক্তি বা দেহ-শক্তি হ'ক ইহা সর্বদাই মূলতঃ আধ্যাত্মিক ও স্বভাবতঃ দিব্য। অবিদ্যার মধ্যে পশু, মানব বা অসুর ইহার যে ব্যবহার করে তা-ই বর্জন করা চাই, আর তার বদলে আনা চাই এমন এক মহত্তর স্বাভাবিক ক্রিয়া—আমাদের কাছে তা অতিসাধারণ হ'লেও—যা পরিচালিত হয় অনন্ত ও সনাতনের সহিত একসুরে বাঁধা অন্তর চেতনার দ্বারা। পূর্ণযোগ প্রাণের সব কর্ম বর্জন ক'রে শুধু আন্তরবৃত্ত অনুভূতিতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না; তাকে আন্তরবৃত্ত হ'তে হয় বাহিরকে পরিবর্তন করার জন্য আর এই পরিবর্তনের উপায় হ'লো প্রাণশক্তিকে সেই যোগশক্তির অংশ ও কর্মপ্রণালী করা যার যোগাযোগ আছে ভগবানের সহিত এবং দেশনাতে যা দিব্য।

প্রাণের সব কর্মকে আধ্যাত্মিকভাবে ব্যবহারের পথে এই যে সব বাধাবিপত্তি তার কারণ—প্রাণৈষণা অবিদ্যার মধ্যে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক রকম মিথ্যা কামপুরুষ সৃষ্টি ক'রেছে, আর তাকে বসিয়েছে সেই দিব্য স্ফুলিঙ্গের জায়গায় যা আসল চৈত্যসত্তা। এই কামনার পুরুষ দ্বারাই বর্তমানে আমাদের জীবনের সমস্ত বা অধিকাংশ কর্ম প্রবর্তিত বা দূষিত হয় বা মনে হয় তা হয়; এমন কি যে সব কাজ নৈতিক বা ধর্মীয়, এমন কি যেগুলি পরার্থপরতা মানবপ্রীতি, আত্মোৎসর্গ বা আত্ম-ত্যাগের ছদ্মবেশ ধারণ করে, তাদের মধ্যেও ইহার তৈরী সব সুতোর ঘন বুনন আছে। এই কামপুরুষ হ'ল অহং-এর এক বিভক্ত অন্তঃপুরুষ আর পৃথক আত্ম-প্রতিষ্ঠার দিকেই ইহার সহজাত সব প্রবৃত্তির ঝোঁক। হয় খোলাখুলি, নয় অল্পবিস্তর চকচকে মুখোসের

আড়ালে সে সর্বদা তাড়না করে নিজের বৃদ্ধির জন্য, অধিকার ও ভোগের জন্য, বিজয় ও সাম্রাজ্যের জন্য। যদি প্রাণ থেকে অশান্তি ও বৈষম্য ও বিকৃতির অভিশাপ তুলতে হয় তা হলে প্রকৃত অন্তঃপুরুষ, চৈত্যপুরুষকে বরণ করা চাই তার নেতৃত্ব পদে আর চাই কামনা ও অহং-এর এই মিথ্যা অন্তঃপুরুষের সম্পূর্ণ বিলোপ। কিন্তু ইহার এই অর্থ নয় যে স্বয়ং প্রাণকেই নিগৃহীত করতে হবে ও সার্থকতা সাধনের জন্য তার স্বাভাবিক ধারায় তাকে চলতে দেওয়া হবে না; কারণ এই বাহ্য কামপুরুষের পশ্চাতে আমাদের মধ্যে আছে এক আন্তর ও সত্যকার প্রাণময় পুরুষ যাকে ধ্বংস না ক'রে বরং তাকে সুপ্রকাশিত ক'রে মুক্ত করতে হবে তার আসল কর্মধারায় দিব্যপ্রকৃতির শক্তি হিসাবে। আমাদের অন্তঃস্থ প্রকৃত অন্তরতম পুরুষের অধীনে এই সত্যকার প্রাণময় পুরুষের সুপ্রকাশ হ'লেই প্রাণ-শক্তির উদ্দেশ্য সমূহের দিব্য সার্থকতা সম্ভব। এমন কি এই সব উদ্দেশ্য মূলতঃ একই থাকবে কিন্তু সে সব রূপান্তরিত হবে তাদের আন্তর প্রবর্তক শক্তিতে ও বাহ্য লক্ষণে। দিব্য প্রাণ-সামর্থ্যও হবে বৃদ্ধির সংকল্প, আত্ম-প্রতিষ্ঠার শক্তি কিন্তু তা হবে আমাদের মধ্যে ভগবানের প্রতিষ্ঠা, উপরভাসা ক্ষুদ্র সাময়িক ব্যক্তিসত্তার প্রতিষ্ঠা নয়—বৃদ্ধি হবে সত্যকার দিব্য ব্যষ্টি পুরুষে, কেন্দ্রীয় সত্তায়, গূঢ় অবিনশ্বর ব্যক্তিতে যার আবির্ভাবের একমাত্র উপায় হ'ল অহং-এর অবনমন ও তিরোভাব। ইহাই প্রাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য—বৃদ্ধি, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে চিৎ-পুরুষের শ্রীবৃদ্ধি, মনে, প্রাণে ও দেহে নিজের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশসাধন; অধিকার কিন্তু এই অধিকার সর্ব বিষয়ে ভগবানের দ্বারা ভগবানের অধিকার, অহং-এর কামনা দ্বারা বিষয়কে তার নিজের জন্য অধিকার নয়; ভোগ কিন্তু এভোগ বিশ্বের মধ্যে দিব্য আনন্দের ভোগ; সংগ্রাম, বিজয় ও সাম্রাজ্য কিন্তু ইহা তমসার বিভিন্ন শক্তির সহিত বিজয়ী সংঘর্ষ, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক আত্ম-শাসন ও আন্তর ও বাহ্য প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব-জ্ঞান, প্রেম ও দিব্য সংকল্পের দ্বারা অবিদ্যার রাজ্য জয়।

প্রাণের সব কর্মের দিব্য সম্পাদনের এবং ত্রিবিধ যজ্ঞের তৃতীয় অংগস্বরূপে তাদের উত্তরোত্তর রূপান্তর সাধনের বিধান এই সব এবং এই সব তাদের লক্ষ্যও হওয়া চাই। যোগের উদ্দেশ্য জীবনকে যুক্তি বিচার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা নয়, ইহাকে অতিমানসিক-ভাবাপন্ন করা, ইহাকে নীতিগত করা নয়, ইহাকে আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন করা। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য যে বাহ্য বিষয় বা উপরভাসা সব মনস্তাত্ত্বিক প্রবর্তক শক্তি নিয়ে কাজ করা তা নয় বরং জীবন ও তার ক্রিয়াকে তাদের গোপন দিব্য উপাদানের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা; কারণ একমাত্র জীবনের ঐরূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই সম্ভব হয় ইহার উপর আমাদের ঊর্ধ্বস্থ নিগূঢ় দিব্য শক্তির প্রত্যক্ষ শাসন এবং ইহার রূপান্তর পরম দেবতার

ব্যক্ত বহিঃপ্রকাশে,—এখনকার মতো সনাতন অভিনেতার ছদ্মবেশে ও বিকৃতিকারী মুখোসে নয়। প্রাণ এখন যা আছে তা থেকে তাকে অন্য কিছু করতে এবং তার বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত ও অবোধ্য মূর্তি থেকে তাকে উদ্ধার করতে যা সমর্থ তা একমাত্র চেতনার আধ্যাত্মিক মৌলিক পরিবর্তন,—মন ও যুক্তি-বুদ্ধির যে পদ্ধতি উপর উপর নাড়াচাড়া করে তা নয়।

*　　*　　*

তা হলে, যে উপায়ে পূর্ণযোগ জীবনকে প্রকৃতির উদ্বেগপূর্ণ ও অবিদ্যাচ্ছন্ন গতিবৃত্তি থেকে প্রদীপ্ত ও সুসমঞ্জস গতিবৃত্তিতে পরিবর্তিত করতে চায় তা তার প্রকাশের বাহ্য কুশল নাড়াচাড়া নয়, তা তার তত্ত্বমূলক রূপান্তরসাধন। এই কেন্দ্রীয় আন্তর বিপ্লব সাধন ও নবরূপ গঠনের জন্য তিনটি সর্ত পালন অপরিহার্য; ইহাদের কোনোটিই এককী এ কার্য-সাধনে সক্ষম নয়, তবে তাদের ত্রিবিধ যুক্ত শক্তিতে এই উন্নয়ন সম্ভব, আর সম্ভব তাদের রূপান্তর সাধন ও তা সম্পূর্ণভাবেই। কারণ প্রথমতঃ জীবন এখন যা তা কামনার গতিবৃত্তি, আর আমাদের মধ্যে ইহা তার কেন্দ্রস্বরূপ যে কামপুরুষ গঠন ক'রেছে তা জীবনের সকল গতিকেই নিজের ব'লে বিবেচনা ক'রে তাতে আরোপ করে তার নিজেরই রঙ ও যন্ত্রণা যা অবিদ্যাচ্ছন্ন, অর্ধ-আলোকিত, ব্যাহত চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত; দিব্য জীবনযাত্রার জন্য কামনার উচ্ছেদ অবশ্য কর্তব্য, আর তার স্থলে আনা চাই শুদ্ধতর, প্রবর্তক শক্তি, দরকার কামনার সন্তপ্ত পুরুষের বিলোপ আর তার স্থলে বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে সত্যকার প্রাণময় পুরুষ প্রচ্ছন্ন আছে তার স্থিরতা, ক্ষমতা ও সুখের অবির্ভাব। দ্বিতীয়তঃ এখন এই জীবনকে চালায় বা টেনে নিয়ে যায় কিছুটা প্রাণশক্তির সংবেগ আর কিছুটা মন যা প্রধানতঃ অজ্ঞানময় প্রাণ-সংবেগের দাস ও কুকার্যের সহায়ক কিন্তু যা কিছু পরিমাণে আবার ইহার দিশারী ও উপদেষ্টা কিন্তু এমন দিশারী ও উপদেষ্টা যা নিজেই উদ্বেগপূর্ণ ও যথেষ্ট দীপ্ত ও উপযুক্ত নয়। দিব্য জীবনের পক্ষে মন ও প্রাণ সংবেগ হবে শুধু যন্ত্র, এ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া তাদের আর চলবে না আর তাদের স্থলে অধিষ্ঠিত হওয়া চাই অন্তরতম চৈত্য পুরুষ,—পথের নেতা হিসাবে, দিব্য দেশনার নির্দেশক হিসাবে। সর্বশেষ, বর্তমান জীবনের লক্ষ্য বিভক্ত অহং-এর তৃপ্তি সাধন; অহং-এর অবসান চাই-ই আর তার স্থলে আনা চাই প্রকৃত অধ্যাত্ম ব্যক্তি, কেন্দ্রীয় সত্তা আর জীবনকে ফেরাতে হবে এই পার্থিব সৃষ্টিতে ভগবানের সার্থকতা সাধনের দিকে; ইহার অনুভব করা চাই যে ইহার মধ্যে এক দিব্যশক্তি জেগে উঠছে আর ইহাকে হয়ে উঠতে হবে এই শক্তির উদ্দেশ্যসাধনের এক বাধ্য যন্ত্র।

রূপান্তরকারী এই তিনটি আন্তর গতিবৃত্তির মধ্যে প্রথমটিতে এমন কিছু নেই যা প্রাচীন ও পরিচিত নয়; কারণ ইহা বরাবরই অধ্যাত্ম শিক্ষার প্রধান

সব উদ্দেশ্যের অন্যতম। গীতায় সুস্পষ্ট ভাষায় যে শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে তাতেও বলা হ'য়েছে যে অধ্যাত্ম পুরুষের সাধারণ অবস্থা হ'ল ক্রিয়ার প্রবর্তক শক্তি হিসাবে ফলাকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ ত্যাগ, স্বয়ং কামনারই সম্পূর্ণ লোপ ও সম্যক্‌ভাবে পূর্ণ সমত্ব সাধন। কামনা নিবৃত্তির একমাত্র সত্যকার অভ্রান্ত নিদর্শন হ'ল পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক সমত্ব—সর্ববিষয়ে সমচিত্ত হওয়া; সুখ ও দুঃখ, প্রিয় ও অপ্রিয়, সফলতা ও বিফলতা এ সবেই অবিচলিত থাকা; উচ্চ ও নীচ, মিত্র ও অমিত্র, পুণ্যবান ও পাপী সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখা : সর্বভূতে পরম একের বহুবিধ অভিব্যক্তি দেখা, সর্ব বিষয়ে মূর্ত পরম চিৎ-পুরুষের নানা বিচিত্র লীলা বা তাঁর মন্থর মুখোসপরা ক্রম-প্রকাশ দেখা। যে সমত্বর অবস্থা আমাদের লক্ষ্য তা কোনো মানসিক উদ্বেগশূন্যতা, উদাসীনতা, উপেক্ষা নয়, কোনো নিশ্চেষ্ট প্রাণিক উপশম নয়, শারীর চেতনার এমন কোনো নিষ্ক্রিয়তা নয় যা কোনো গতিবৃত্তিতেই সম্মতি দেয় না বা যে কোনো গতিবৃত্তি আসে তাতেই সম্মতি দেয়, যদিও কখনও কখনও এগুলিকেই এই অধ্যাত্ম অবস্থা ব'লে ভুল করা হয়; যে সমত্ব আমাদের লক্ষ্য তা প্রকৃতির পশ্চাতে সাক্ষী পুরুষের অবস্থার মতো এক পরিব্যাপ্ত সর্বগ্রাহী অবিচলিত বিশ্বজনীনতা। কেন না এখানে মনে হয় সব কিছুই বিভিন্ন শক্তির এক চঞ্চল অর্ধ-সুশৃঙ্খল, অর্ধ-বিশৃঙ্খল সংগঠন কিন্তু অনুভব করা যায় যে তার পশ্চাতে তাকে ধারণ করে আছে এমন শান্তি, নীরবতা, ব্যাপ্তি যা নিশ্চেষ্ট নয়, তবে স্থির, যা শক্তিহীন নয় বরং যোগ্যভাবে এমন সর্বশক্তিমান যে তার মধ্যে আছে বিশ্বের সকল গতি ধারণে সমর্থ এক ঘনীভূত স্থির নিশ্চল ক্রিয়া-শক্তি। পিছনের এই উপস্থিতি সর্ব বিষয়ে সমভাবাপন্ন ঃ যে ক্রিয়া-শক্তি ইহা ধাবণ করে তা যে কোনো ক্রিয়ার জন্য মুক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু সাক্ষীপুরুষের কোনো কামনার দ্বারা সে ক্রিয়ার নির্বাচন হবে না; এমন এক পরম সত্য কাজ করে যা ক্রিয়া বা তার আপাত সব রূপ ও সংবেগের অতীত ও তাদের চেয়ে মহত্তর, মন, প্রাণশক্তি বা দেহের অতীত ও তাদের চেয়ে মহত্তর যদিও ইহা তার অব্যবহিত উদ্দেশ্যের জন্য কোনো মানসিক, প্রাণিক বা শারীরিক আকার নিতে পারে। যখন এইভাবে কামনার মৃত্যু হয় আর চেতনার মধ্যে সর্বত্র বিরাজ করে এই শান্ত, সম ব্যাপ্তি তখনই আমাদের অন্তঃস্থ সত্যকার প্রাণময় পুরুষ আবরণ থেকে বাহিরে আসে আর প্রকাশ করে তার শান্ত, প্রগাঢ় শক্তিমান সান্নিধ্য। কারণ প্রাণময় পুরুষের সত্যকার প্রকৃতিই এইরূপ; ইহা প্রাণের মধ্যে দিব্য পুরুষের প্রক্ষেপ—অক্ষুব্ধ, সবল, প্রদীপ্ত, বহুবীর্যধারা-সমন্বিত, দিব্য সংকল্পের অনুগত, অহং-শূন্য অথচ, বরং সেই জন্যই সকল ক্রিয়া, সম্পাদনা, উচ্চতম বা বৃহত্তম দুষ্কর কর্মে সমর্থ। সত্যকার প্রাণশক্তিও তখন আত্ম-প্রকাশ করে, তবে আর এই উদ্বেগপূর্ণ ক্লিষ্ট, বিভক্ত, প্রয়াসী বাহ্য

ক্রিয়াশক্তি হিসাবে নয়—ইহা তখন এক মহান জ্যোতির্ময় দিব্য সামর্থ্য, ইহা শান্তি ও বল ও আনন্দে পূর্ণ, প্রাণের বিততপথ দেবদূত যা বিশ্বকে আবৃত করে রেখেছে তার বীর্যবন্ত পক্ষ দিয়ে।

কিন্তু তবু বিশাল বল ও সমত্বে এই রূপান্তরও যথেষ্ট নয়, কারণ ইহাতে দিব্য জীবন সাধনের পথ আমাদের কাছে উন্মুক্ত হ'লেও, ইহাতে তার প্রশাসন ও প্রবর্তনের কোনো ব্যবস্থা নেই। এইখানে মুক্ত চৈত্য পুরুষের উপস্থিতি সক্রিয় হয়; সর্বোৎকৃষ্ট প্রশাসন ও পরিচালনা ইহা দেয় না,—কেন না ইহা তার কাজ নয়—কিন্তু অবিদ্যা থেকে দিব্য বিদ্যার যাত্রাপথে ইহা আন্তর ও বাহ্য জীবন ও ক্রিয়ার জন্য ক্রমশঃ বেশী ক'রে নির্দেশ দেয়; প্রতি মুহূর্তে ইহা দেখিয়ে দেয় কি পদ্ধতিতে, কি পথে, কোন কোন ধাপ বেয়ে এমন সার্থক অধ্যাত্ম অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব যেখানে সর্বদা এক স্ফুরন্ত প্রেরণা উপস্থিত থেকে দিব্যভাবাপন্ন প্রাণশক্তির সর্ব কর্ম চালনা করতে থাকবে। ইহা যে আলো বিকিরণ করে তাতে প্রকৃতির অন্যান্য সেই সব অংশও আলোকিত হয় যেগুলি নিজেদের বিশৃংখল ও হাতড়ে-বেড়ানো সব শক্তি ছাড়া অন্য কোনো আরো উৎকৃষ্ট দেশনার অভাবে অবিদ্যার আবর্তে ঘুরে বেড়ায়; ইহা মনে আনে ভাবনা ও বোধ সম্বন্ধে এক সহজ অনুভূতি, প্রাণে জাগায় এমন এক বোধ যাতে অভ্রান্তভাবে জানা যায় কোন গতিবৃত্তিগুলি বিপথগামী, ব বিপথে নিতে প্রবণ আর কোনগুলির উৎপত্তি শুভ প্রেরণা থেকে; শান্ত দৈববাণীর মতো কিছু এক ভিতর থেকে দেখিয়ে দেয় আমাদের পদস্খলনের কারণ কি কি, সে সবের আর পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য সময় মতো সতর্ক করে, আর অভিজ্ঞতা ও বোধি থেকে বার করে আনে আমাদের কর্মের সঠিক চালনা, যথাযথ প্রণালী ও নির্ভুল সংবেগের এমন এক বিধান যা কঠোর নয়, বরং নমনীয়। এমন এক সংকল্পের সৃষ্টি হয় যা জিজ্ঞাসু প্রমাদের ঘূর্ণায়মান ও বিলম্বিত গোলকধাঁধা অপেক্ষা বরং বিকাশমান সত্যের সহিত বেশী সুসংগত। মানস বিচারের বাহ্য প্রখরতা ও প্রাণ-শক্তির সাগ্রহ ধারণের স্থলে আসতে শুরু করে ভবিষ্য মহত্তর আলোকের দিকে এক দৃঢ় উন্মুখতা, বিষয়সমূহের যথার্থ উপাদান, গতি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে অন্তঃপুরুষের সহজ সংস্কার, সূক্ষ্ম নিপুণতা ও অন্তর্দৃষ্টি যা সর্বদা অধ্যাত্ম দৃষ্টি এবং আন্তর সংযোগ, আন্তর দৃষ্টি, এমন কি তাদাত্ম্যবোধ দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানের ক্রমশঃ বেশী নিকটবর্তী হয়। প্রাণের কর্মগুলি নিজেদের সংশোধন ক'রে নেয়, বিশৃংখলা থেকে মুক্তি পায় এবং বুদ্ধির দ্বারা আরোপিত কৃত্রিম বা আইন সম্মত শৃংখলা ও কামনার স্বেচ্ছাচারী শাসনের স্থলে আনে অন্তঃপুরুষের আন্তর তীক্ষ্নদৃষ্টি এবং প্রবেশ করে পরম চিৎপুরুষের গভীর পথে। সর্বোপরি চৈত্যপুরুষ জীবনের উপর আরোপ করে তার সকল কর্মের

যজ্ঞের বিধান, এই সব হয় ভগবান ও সনাতনের নিকট অর্ঘ্য। প্রাণ হ'য়ে ওঠে প্রাণের অতীত যা তার দিকে আহ্বান; ইহার ক্ষুদ্রতম কাজও বৃহৎ হ'য়ে ওঠে অনন্তের বোধে।

যেমন আন্তর সমত্ব বৃদ্ধি পায় আর তার সাথে বৃদ্ধি পায় এই বোধ যে সত্যকার প্রাণময় পুরুষ অপেক্ষা ক'রে আছে তার পালনীয় মহত্তর নির্দেশের জন্য, যেমন আমাদের প্রকৃতির সকল অঙ্গের মধ্যে চৈত্য আহ্বান বৃদ্ধি পায়, তেমন সেই তৎস্বরূপ যাঁর উদ্দেশে এই আহ্বান, নিজেকে প্রকট ক'রতে শুরু করেন, নেমে আসেন জীবন ও তার বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তিকে অধিকার ক'রতে ও তাদের পূর্ণ করেন তার সান্নিধ্য ও উদ্দেশ্যের উচ্চতা, অন্তরংগতা ও বৃহত্ত্ব দিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্র না হ'লেও, অনেক ক্ষেত্রেই সমত্ব ও প্রকাশ্য চৈতিক প্রেরণা বা দেশনা আসবার আগেই ইহা নিজের কিছু ব্যক্ত করে। বাহ্য অবিদ্যারাশির দ্বারা নিপীড়িত, মুক্তির জন্য ব্যাকুল প্রচ্ছন্ন চৈতিক উপাদানের আহ্বান, সাগ্রহ ধ্যান ও জ্ঞানান্বেষণের চাপ, হৃদয়ের আকূতি, তখনো অবিদ্যাচ্ছন্ন হলেও অকপট বেগবান সংকল্প—এই সব সম্ভবতঃ ভেঙে দেবে অপরা প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতিকে আটক রাখা আচ্ছাদন ও উন্মুক্ত ক'রবে প্রবলপ্রবাহ-দ্বার। দিব্য পরম ব্যক্তির সামান্য কিছু হয়ত প্রকট ক'রবে নিজেকে অথবা অনন্তের মধ্য থেকে কিছু আলোক, শক্তি, আনন্দ, প্রেম। হ'তে পারে ইহা এমন এক ক্ষণিক প্রকাশ, আলোর এক ঝলক বা স্বল্পস্থায়ী প্রভা যা শীঘ্র সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে প্রকৃতির তৈরী হওয়ার জন্য; আবার ইহার পুনরাবৃত্তি, বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়াও সম্ভব। ইতিমধ্যে এক দীর্ঘ ও অতিব্যাপক কর্মধারা আরম্ভ হ'য়েছে, ইহা কখনো দীপ্ত বা তীব্র, কখনো আবার মন্থর ও অস্পষ্ট। সময়ে সময়ে এক দিব্য শক্তি সামনে এসে চালনা ও বাধ্য করে অথবা উপদেশ দিয়ে প্রবুদ্ধ করে; অন্য সময় ইহা পিছনে সরে যায়, মনে হয় যেন সত্তাকে ছেড়ে দিয়েছে তার নিজের সামর্থ্যের উপর। সত্তার মধ্যে যা সব অজ্ঞানময়, তমসাচ্ছন্ন, বিকৃত বা শুধু অপূর্ণ ও অবর সে সবকে সেই শক্তি তুলে ধরে, হয়ত তাদের চরম অবস্থায় নিয়ে আসে আর তাদের উপর কাজ ক'রে তাদের সংশোধিত ও নিস্তেজ করে, দেখায় এ সবের বিষম ফল কি আর তাদের বাধ্য করে এই চাইতে যে তাদের নিবৃত্তি বা রূপান্তর হ'ক বা অসার ও সংশোধনের অযোগ্য ব'লে প্রকৃতি থেকে বহিষ্কৃত হ'ক। এই কাজের ধারা বরাবর মসৃণ ও সমান হতে পারে না; পর্যায়ক্রমে আসে দিন ও রাত্রি, দীপ্তি ও অন্ধকার, স্থিরতা ও গঠন বা সংগ্রাম ও উৎক্ষেপ, বর্ধিষ্ণু দিব্য চেতনার উপস্থিতি বা অভাব, উত্তুংগ আশা বা অতলস্পর্শী নৈরাশ্য, পরম প্রেমাস্পদের আলিংগন বা তা না পাওয়ার যাতনা, বিরোধী শক্তিসমূহের অভিভূতকারী আক্রমণ,

দুর্বার প্রবঞ্চনা, প্রচণ্ড বাধা, শক্তিহারী বিদ্রূপ অথবা বিভিন্ন দেবতার ও ভগবদ্-দূতের সাহায্য, সান্তনা বা সহযোগ। প্রাণসমুদ্রে জোর ক'রে শুরু করা হয় এক বিরাট ও দীর্ঘ আলোড়ন ও মন্থন, যার ফলে প্রবলভাবে বাহির হয় সুধা ও গরল যতদিন না সব কিছু প্রস্তুত হয়, আর বর্ধিষ্ণু অবতরণ এমন এক সত্তা ও প্রকৃতি পায় যা তার সম্পূর্ণ শাসন ও সর্বব্যাপী উপস্থিতির জন্য উদ্যত ও উপযুক্ত। কিন্তু যদি ইহার সাথে সমত্ব ও চৈত্য আলোক ও সংকল্পও থাকে তা হ'লে এই ধারা পরিহার করা না গেলেও তাকে অনেক পরিমাণে লঘু ও সুগম করা যায়; সব চেয়ে দুস্তর বিপদগুলি কেটে যাবে, রূপান্তর সাধনে সকল বাধাবিপত্তি ও পরীক্ষার মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে আন্তর শান্তি, সুখ ও প্রত্যয় অবলম্বন হবে, আর প্রকৃতির পূর্ণ সম্মতি-পুষ্ট বর্ধিষ্ণু শক্তি দ্রুত বিরোধী শক্তিরাজির সামর্থ্য ক্ষীণ ও অপনীত করবে। বরাবর উপস্থিত থাকবে এক নিশ্চিত দেশনা ও আশ্রয়, কখনো তা থাকে সামনে, কখনো আবরণের আড়ালে, শেষের সামর্থ্য পূর্ব হ'তেই থাকে সাধনার প্রারম্ভে ও সুদীর্ঘ সব মধ্যবর্তী পর্যায়ে। কেন না সর্বদাই সাধক উপলব্ধি ক'রবে দিব্য দিশারী ও রক্ষকের উপস্থিতি বা পরমা মাতৃশক্তির কর্মধারা; সে জানবে সকল কিছুই করা হয় পরম মঙ্গলের জন্য, তার অগ্রগতি সুনিশ্চিত, বিজয় অনিবার্য। উভয় ক্ষেত্রেই প্রণালী একই ও অপরিহার্য—ইহাতে সমগ্র প্রকৃতি, সমগ্র জীবন, আন্তর ও বাহ্য সবই নেওয়া হয় যাতে ঊর্ধ্ব থেকে এক দিব্যতর প্রাণের চাপে ইহার বিভিন্ন শক্তি ও তাদের গতিবৃত্তিকে প্রকাশ, ব্যবহার ও রূপান্তরসাধন করা হয় যতদিন না এখানকার সব কিছু অধিগত হয় বিভিন্ন মহত্তর অধ্যাত্ম সব শক্তির দ্বারা এবং পরিণত হয় অধ্যাত্ম ক্রিয়ার ও দিব্য উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ে।

এই প্রণালীতে আর গোড়ার দিকেই ইহা সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে নিজেদের সম্বন্ধে, আমাদের বর্তমান সচেতন সত্তা সম্বন্ধে আমরা যা জানি তা প্রচ্ছন্ন সত্তার বিরাট স্তূপের এক প্রতিনিধিস্থানীয় গঠন, এক উপরভাসা কর্মধারা, এক পরিবর্তনশীল বাহ্য পরিণাম। আমাদের যে জীবন দৃষ্টিগোচর তা ও ইহার বিভিন্ন ক্রিয়া কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বহিঃপ্রকাশের বেশী কিছু নয়, কিন্তু যা প্রকাশ করার জন্য এসবের প্রয়াস তা উপরে থাকে না; এই যে আমাদের প্রকাশ্য সম্মুখস্থ সত্তা যাকে আমরা নিজ ব'লে মনে করি ও যাকে আমরা উপস্থাপিত করি আমাদের চারিদিককার জগতের কাছে তার চেয়ে অনেক বড় কিছু আমাদের সত্তা। এই সম্মুখস্থ ও বাহ্য সত্তা এমন সব মনোবৃত্তি, প্রাণের গতিবৃত্তি ও দৈহিক প্রবৃত্তির বিশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ যাদের বিভিন্ন অংশের অংশের ও যন্ত্রের পূর্ণ বিস্তারিত বিশ্লেষণেও সমগ্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই রহস্য আমরা জানতে পারি তখনই যখন আমরা যাই পশ্চাতে, নিম্নে,

ঊর্ধ্বে আমাদের সত্তার সব গোপন প্রদেশে। উপরভাসা পরীক্ষা ও নাড়াচাড়া যতই পুঙখানুপুঙখরূপে ও সূক্ষ্মভাবে করা হ'ক না কেন, তাতে আমাদের জীবন ও ইহার বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও কর্মধারা সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত ধারণা বা সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ শাসন সম্ভব হয় না; বস্তুতঃ যুক্তিশক্তি, নৈতিকতা ও অন্য সব বাহ্য ক্রিয়া মানবজাতির জীবনকে যে সংযত, মুক্ত ও সিদ্ধ ক'রতে অসমর্থ হয়েছে তার কারণ ঐ অক্ষমতা। কারণ আমাদের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন শারীর চেতনারও নিম্নে এক অবচেতন সত্তা আছে আর ইহার মধ্যে—যেন ঢাকা দেওয়া আশ্রয়স্বরূপ মাটির মধ্যে—আছে সকল প্রকার প্রচ্ছন্ন বীজ যেগুলি উপরে অংকুরিত হয়, তবে কেমন করে তা আমরা বুঝি না; আর এই সত্তার মধ্যে আমরা অনবরত নতুন বীজ ফেলি যা আমাদের অতীতকে বিস্তৃত করে ও ভবিষ্যৎকে প্রভাবান্বিত করবে; এই অবচেতন সত্তা অন্ধকারাচ্ছন্ন, তার সব গতিবৃত্তি ক্ষুদ্র, ইহা এমন অযৌক্তিক যে ইহা কোনো নিয়ম মানে না, চলে প্রায় খেয়ালখুসি মতো অথচ পৃথিবী-জীবনের পক্ষে ইহার গূঢ় শক্তি বিশাল। আবার আমাদের মন, আমাদের প্রাণ, আমাদের সচেতন শরীরের পশ্চাতে আছে এক বৃহৎ অধিচেতনা—আছে আন্তর মানসিক, আন্তর প্রাণিক, আন্তরসূক্ষ্মতর শারীর ক্ষেত্রসমূহ আর এ সবকে ধরে আছে এক অন্তরতম চৈত্য সত্তা যা বাকী সবের যোগসাধক অন্তঃপুরুষ; আর এই সব গোপন ভূমিতেও থাকে বহুবিধ পূর্বস্থিত ব্যক্তিভাবনার স্তূপ আর ইহাই জোগায় আমাদের বিকাশমান বাহ্য জীবনের উপাদান ও বিভিন্ন প্রবর্তক শক্তি ও প্রচোদনা। কেন না এখানে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক কেন্দ্রীয় ব্যক্তি ছাড়াও এমন অনেক অধস্তন ব্যক্তিসত্ত্ব থাকতে পারে যাদের সৃষ্টির কারণ—কেন্দ্রীয় সত্তার অভিব্যক্তির অতীত ইতিহাস অথবা এই বাহিরের জড়ীয় বিশ্বের মধ্যে তার বর্তমান খেলার আশ্রয়স্বরূপ আন্তর ভূমির উপর তার বহিঃপ্রকাশ। আমাদের উপরভাসা জীবনে আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন,—যোগ আছে শুধু বাহ্য মন ও ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ দ্বারা যা আমাদের অতি নগণ্য অংশই দেয় আমাদের জগতের কাছে অথবা আমাদের জগতের নগণ্য অংশমাত্র দেয় আমাদের কাছে, অথচ এই সব আন্তর প্রদেশে আমাদের ও অস্তিত্বের বাকী সবের মধ্যকার প্রাকার ক্ষীণ ও সহজেই ভেঙে যায়; সেখানে আমরা অনুভব করতে পারি—শুধু তাদের ফল থেকে যে অনুমান করি তা নয়, সরাসরি অনুভব করি—সেই সব গূঢ় জগৎ-শক্তির, মনোশক্তির, প্রাণশক্তির, সূক্ষ্ম শারীর শক্তির ক্রিয়া যা সব দিয়ে এই বিশ্ব জীবন ও ব্যষ্টি জীবন গঠিত; আর এমন কি এই যে সব জগৎ-শক্তি আমাদের উপর বা আমাদের চারিদিকে নিজে নিজে এসে পড়ে, তাদের আমরা —অবশ্য যদি আমরা সেই ভাবে নিজেদের শিক্ষা দিই—ধরতে পারব এবং

উত্তরোত্তর সমর্থ হব আমাদের ও অন্যদের উপর তাদের ক্রিয়া, তাদের গঠন, তাদের গতিবৃত্তি পর্যন্ত আয়ত্তে আনতে অথবা অন্ততঃ পক্ষে জোরালো ভাবে তাদের সংযত ক'রতে। আবার এমন কি আমাদের মানুষী মনের উপর তার অতিচেতন আরো মহত্তর প্রদেশ আছে এবং সেখান থেকে গূঢ় ভাবে নেমে আসে এমন সব প্রভাব, শক্তি ও স্পর্শ যা এখানকার বিষয়সমূহের আদি নির্ধারক, আর যদি তাদের নীচে আবাহন ক'রে আনা হ'ত তাদের পূর্ণ মহিমায় তারা সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারত এই জড়ীয় বিশ্বে জীবনের সমগ্র গঠন ও বিধান। এই সব সুপ্ত অনুভূতি ও জ্ঞানকে দিব্যশক্তি আমাদের কাছে প্রকাশ করে আমাদের উপর সক্রিয় হয়ে যখন আমরা পূর্ণযোগে তার কাছে নিজেদের খুলে ধরি এবং ইহা এ সবকে ব্যবহার করে ও তাদের পরিণামগুলিকে আরো ফুটিয়ে তোলে আমাদের সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতির রূপান্তরসাধনের উপায় ও সোপান হিসাবে। তখন থেকে আমাদের জীবন আর উপরকার এক ক্ষুদ্র ঘূর্ণায়মান তরঙ্গ থাকে না, বরং বিশ্বজীবনের সহিত একীভূত না হলেও তা ইহার সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। আমাদের চিৎ-পুরুষ, আমাদের আত্মা শুধু যে কোনো পরিব্যাপ্ত বিশ্বাত্মার সহিত আন্তর তাদাত্ম্যের মধ্যে উঠে যায় তা নয়, ইহা উঠে তারও কিছু সংস্পর্শে আসে যা বিশ্বাত্মার অতীত অথচ বিশ্ব ক্রিয়ার কথা অবগত ও তার অধিপতি।

এই ভাবে আমাদের বিভক্ত সত্তার অখণ্ডতা সাধনের দ্বারাই যোগমধ্যস্থ দিব্য শক্তি অগ্রসর হবে তার উদ্দেশ্যের অভিমুখে· কারণ এই অখণ্ডতা সাধনের উপরই নির্ভর করে মুক্তি, সিদ্ধি, কর্তৃত্ব, কেন না উপরিস্থ ক্ষুদ্র তরঙ্গের পক্ষে তার চারদিককার বিরাট জীবনের উপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ করতে পারা দূরের কথা, ইহা তার নিজের গতিবৃত্তিই নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। এই শক্তি যা অনন্ত ও সনাতনের সামর্থ্য আমাদের মধ্যে নেমে আসে, সক্রিয় হ'য়ে ভেঙে ফেলে আমাদের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ, প্রতি প্রাচীর চূর্ণ ক'রে ব্যাপ্তি ও মুক্তি আনে, সর্বদা আমাদের দেয় অন্তদর্শন, ভাবনা ও উপ-লব্ধির নবতর ও মহত্তর সব শক্তি এবং প্রাণের নবতর ও মহত্তর সব প্রবর্তক-শক্তি, ক্রমশঃ বেশী ক'রে অন্তঃপুরুষ ও তার বিভিন্ন করণকে প্রসারিত ও নব-ভাবে গঠন করে, প্রতি অপূর্ণতাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে তাদের দোষ দেখিয়ে বিনাশ করার জন্য, মহত্তর এক সিদ্ধির দিকে উন্মুক্ত করে, অল্প সময়ের মধ্যে বহু জন্ম বা যুগের কর্ম সাধন করে যাতে আমাদের মধ্যে সর্বদা উদ্‌ঘাটিত হয় নতুন নতুন জন্ম, নতুন নতুন দৃশ্য। এই শক্তির স্বভাবই হ'ল তার ক্রিয়ার পরিধি বিস্তার করা এবং সেজন্য ইহা চেতনাকে দেহের মধ্যে আটক অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়, ইহা তখন সমাধি বা সুষুপ্তি বা এমন কি জাগ্রত অবস্থাতেও বাহিরে যেতে বা অন্য সব লোকে বা এই

ইহালোকেরই অন্যান্য অঞ্চলে প্রবেশ ক'রে সেখানে কাজ করতে অথবা তার অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসতে পারে। ইহা বাহিরে ছড়িয়ে পড়ে, দেহকে মনে করে তার নিজের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এবং যা আগে তাকে ধারণ করতো তা-কেই সে ধারণ করতে শুরু করে; ইহা বিশ্বচেতনা লাভ করে এবং বিশ্বের সহিত সমপরিমাণ হবার জন্য নিজেকে প্রসারিত করে। তখন ইহা জগতের মধ্যে সক্রিয় সব শক্তিকে অন্তর্মুখী ভাবে ও সরাসরি জানতে শুরু করে—শুধু বাহ্য পর্যবেক্ষণ ও সন্নিকর্ষের দ্বারা নয়, তাদের গতিবৃত্তি অনুভব করে, তাদের ব্যাপ্রিয়া পৃথক করে, এবং বৈজ্ঞানিক যেমন জড়শক্তির উপর কাজ করে, ইহাও তেমন ঐ সব শক্তির উপর অব্যবহিতভাবে কাজ করতে সমর্থ হয়, আমাদের মন, প্রাণ, দেহের মধ্যে তাদের ক্রিয়া ও ফল গ্রহণ বা বর্জন বা কিছু অদলবদল, পরিবর্তন করতে পারে বা তাদের নতুন আকার দিতে পরে এবং প্রকৃতির পুরণো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপ্রিয়ার স্থলে সৃষ্টি করতে পারে বিভিন্ন নতুন বিশাল সামর্থ্য ও গতিবৃত্তি। আমরা বিশ্বমনের বিভিন্ন শক্তির কর্মপ্রণালীও অনুভব করতে শুরু করি আর জানতে শুরু করি কেমন করে ঐ কর্মপ্রণালী দ্বারা আমাদের সব মননের সৃষ্টি হয়, ভিতর থেকেই আমরা আমাদের সব অনুভূতির সত্য ও মিথ্যা পৃথক করতে, তাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত, এবং তাদের তাৎপর্য ব্যাপক ও দীপ্ত করতে, আমাদের নিজেদের মন ও ক্রিয়ার প্রভু হয়ে উঠতে এবং আমাদের চারিদিককার জগতের মধ্যস্থিত মনের গতিবৃত্তি গঠনে সমর্থ ও সক্রিয় হ'তে শুরু করি। আমরা অনুভব করতে শুরু করি বিভিন্ন বিশ্ব প্রাণশক্তির প্রবাহ ও উৎসবন, আর আমাদের সব বেদনা, ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়-সংবিৎ, মনোবেগের উৎপত্তি ও বিধানের সন্ধান পেতে: এই সবকে গ্রহণ বা বর্জন করার, নতুন সৃষ্টি কবার, প্রাণ-সামর্থ্যের উচ্চতর স্তরে উঠার স্বাধীনতা আমাদের থাকে। জড়-প্রহেলিকা সত্ত্বেও আমরা বুঝতে শুরু করি: ইহার উপর মন, প্রাণ ও চেতনার পারস্পরিক ক্রীড়া অনুসরণ করা এবং ইহার কারণিক ও পরিণামগত প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর আবিষ্কার করাও শুরু হয়, অবশেষে আমরা জড়ের এই শেষ রহস্যও সন্ধান পেতে শুরু করি যে জড় শুধু ক্রিয়া-শক্তির এক রূপ নয়, ইহা সংবৃত্ত ও অবরুদ্ধ অথবা অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সীমাবদ্ধ চেতনারও এক রূপ আর ইহাও দেখতে আরম্ভ করি যে ইহার মুক্তি সম্ভব ও পরতর সামর্থ্যের দিকে সাড়া দেওয়ার নমনীয়তাও সম্ভব, আবার ইহাও সম্ভব যে ইহা আর পরম চিৎ-পুরুষের অর্ধেকেরও বেশী নিশ্চেতন বিগ্রহ ও আত্মপ্রকাশ না হ'য়ে ইহা হবে তাঁর সচেতন বিগ্রহ ও আত্মপ্রকাশ। এই সব এবং আরো কিছু ক্রমশঃ বেশী ক'রে সম্ভব হয় যতই আমাদের মধ্যে দিব্যশক্তির কর্মধারা বাড়তে থাকে; আর আমাদের তমসাচ্ছন্ন চেতনার অনেক প্রতিরোধ বা সাড়া দেওয়ার কষ্ট সত্ত্বেও

এক অর্ধ-নিশ্চেতন ধাতুর চেতন ধাতুতে প্রগাঢ় রূপান্তরের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক সংগ্রামের এবং এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে আসা, আবার নতুন ক'রে এগিয়ে যাওয়া এই ভাবে চলার মধ্য দিয়ে দিব্যশক্তির কর্মধারা অগ্রসর হয় মহত্তর বিশুদ্ধতায়, সত্যে, উচ্চতায় ও প্রসারে। সব কিছু নির্ভর করে আমাদের মধ্যে চৈত্য জাগরণের উপর, আর দিব্যশক্তির নিকট আমাদের সাড়ার সম্পূর্ণতার উপর ও আমাদের বর্ধিষ্ণু সমর্পণের উপর।

কিন্তু এই সবের দ্বারা সম্ভব শুধু এক আন্তর জীবন গঠন যাতে বাহ্য ক্রিয়ার সম্ভাবনা আরো বৃহৎ; ইহা এক মধ্যবর্তী সিদ্ধি মাত্র; পূর্ণ রূপান্তর-সাধনের একমাত্র পন্থা হ'ল যজ্ঞের উদয়ন তার উত্তুঙ্গ শিখরে আর দিব্য অতিমানসিক বিজ্ঞানের শক্তি, আলোক ও পরমানন্দের সহিত জীবনের উপর তার ক্রিয়া। কারণ একমাত্র তখনই যে সব শক্তি বিভক্ত এবং জীবন ও তার সব কর্মের মধ্যে অপূর্ণ ভাবে নিজেদের প্রকাশ করে তারা উন্নীত হয় তাদের আদি ঐক্যে, সামঞ্জস্যে, একমাত্র সত্যে, সঠিক অনপেক্ষতায় ও পরিপূর্ণ তাৎপর্যে। সেখানে জ্ঞান ও সংকল্প এক, প্রেম ও শক্তি একটি মাত্র গতিবৃত্তি; যে সব দ্বন্দ্ব এখানে আমাদের পীড়া দেয় সে সব পর্যবসিত হয় তাদের সমন্বিত ঐক্যে; শুভের মধ্য থেকে বিকশিত হয় তার পরম শিব, আর অশুভ নিজেকে তার প্রমাদ থেকে মুক্ত ক'রে ফিরে যায় তার শুভে যা পিছনে ছিল; পাপ ও পুণ্য তিরোহিত হয় এক দিব্য পবিত্রতা ও অভ্রান্ত সত্য-ক্রিয়ার মধ্যে; সুখের অনিশ্চিত ক্ষণিকতা মিলিয়ে যায় এমন এক পরমানন্দের মাঝে যা শাশ্বত ও সুখময় আধ্যাত্মিক নিশ্চয়তার লীলা, আর দুঃখ বিনষ্ট হ'য়ে আবিষ্কার করে এমন আনন্দের স্পর্শ যা বিপথগামী হ'য়েছিল কোনো তমসাচ্ছন্ন বিকৃতির ও তা নিতে অচিতির সংকল্পের অসামর্থ্যের দ্বারা। এই যে সব জিনিস মনের কাছে কল্পনা বা রহস্য সে সব সুস্পষ্ট ও অনুভূতির যোগ্য হয়ে ওঠে যখন চেতনা উঠে যায় সীমাবদ্ধ দেহধারী জড়-মনের বাহিরে অতি-বুদ্ধির ঊর্ধ্বস্থিত উচ্চতর ও আরো উচ্চতর স্তরের স্বাতন্ত্র্য ও পরিপূর্ণতার মধ্যে; কিন্তু তারা পুরোপুরি সত্য ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে কেবল তখনই যখন অতিমানসিক হয়ে ওঠে প্রকৃতির বিধান।

সুতরাং যদি এই উদয়ন সিদ্ধ করা যায় ও এই সব উচ্চতম স্তর থেকে পূর্ণ স্ফুরত্তার অবতরণ সম্ভব হয় পৃথ্বী চেতনার মাঝে, তবেই বোঝা যায় প্রাণ, ইহার মুক্তি, রূপান্তরিত পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে দিব্য প্রাণে ইহার রূপান্তর—এসবের অর্থ ও সার্থকতা।

* * *

যে পূর্ণ যোগ সম্বন্ধে এইরূপ আমাদের ভাবনা বা যা সাধনের বিভিন্ন

সর্ত এই সব, যা অগ্রসর হয় এই সব আধ্যাত্মিক উপায়ে এবং প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তরকেই ভিত্তি ক'রে যার আবর্তন তার প্রকৃতি থেকেই জীবনের সাধারণ কাজকর্ম ও যোগে তাদের স্থান সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর স্বতঃই পাওয়া যায়।

তপস্বী বা ধ্যানী বা রহস্য সাধকের মতো জীবন ও কর্মের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ, অভিনিবিষ্ট ধ্যান ও নিষ্ক্রিয়তার শিক্ষা, প্রাণ-শক্তি ও ইহার ক্রিয়াধারার উচ্ছেদ বা নিন্দাবাদ, পৃথিবী প্রকৃতিতে অভিব্যক্তি বর্জন—এ সবের স্থান নেই, থাকতেও পারে না। অবশ্য যতদিন না কোনো বিশেষ আন্তর পরিবর্তন সাধিত হয় বা এমন কিছু পাওয়া যায় যার অভাবে জীবনের উপর আরো বেশী ফলপ্রসূ ক্রিয়া দুরূহ বা অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে ততদিন সাধকের পক্ষে যে কোনো সময় নিজের মধ্যে সরে গিয়ে তার আন্তর সত্তায় মগ্ন থাকা ও অবিদ্যার জীবনের কোলাহল ও উপদ্রব তার কাছে আসা বন্ধ করা প্রয়োজন হ'তে পারে। কিন্তু ইহা হতে পারে শুধু এক পর্ব বা আনুষঙ্গিক ঘটনা, সাময়িক প্রয়োজন বা প্রস্তুতিসূচক অধ্যাত্ম কৌশল; ইহা তার যোগের বিধি বা তত্ত্ব হতে পারে না।

ধর্ম বা নীতির ভিত্তিতে বা একসাথে উভয়েরই ভিত্তিতে মনুষ্যজীবনের কাজকর্মকে ভাগ করা, এসবকে শুধু পূজার কাজে বা মানবপ্রীতি ও পরোপকারের কাজে নিবদ্ধ রাখা পূর্ণ যোগের আন্তরভাবের বিরুদ্ধ। শুধু মানসিক কোন বিধি বা শুধু মানসিক স্বীকৃতি বা প্রত্যাখ্যান ইহার সাধনার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির পরিপন্থী। সব কিছুকে নেওয়া চাই আধ্যাত্মিক শিখরে, প্রতিষ্ঠিত করা চাই আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর, সমগ্র জীবনের উপর কেবলমাত্র জীবনের এক অংশের উপর নয়, জোর ক'রে আনা চাই এক আন্তর অধ্যাত্ম পরিবর্তন ও বাহ্য রূপান্তরের উপস্থিতি। যা সব এই পরিবর্তনের সহায়কর বা ইহা স্বীকার ক'রে নেয় সে সবের গ্রহণ আর যা কিছু অক্ষম বা অনুপযুক্ত বা এই রূপান্তরকারী গতিবৃত্তির প্রভাবে আসতে অস্বীকার করে সে সবের বর্জন অবশ্য কর্তব্য। বিষয় বা জীবনের কোনো রূপে, কোনো বস্তুতে, কোনো কাজকর্মে কোনো রকম আসক্তি থাকা চলবে না; যদি প্রয়োজন হয় সকল কিছু ত্যাগ ক'রতে হবে, আবার ভগবান দিব্য জীবনের জন্য উপাদান হিসাবে যা সব নির্বাচন করেন সে সবকে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু যা গ্রহণ বা বর্জন করে তা কখনই মন বা কামনার প্রকাশ্য বা ছদ্মবেশী প্রাণিকসংকল্প বা নৈতিকবোধ হবে না, তা হওয়া চাই চৈত্যপুরুষের নির্বন্ধ, যোগের দিব্য দিশারীর আদেশ, পরতর আত্মা বা চিৎ-পুরুষের দর্শন; ঈশ্বরের দীপ্ত দেশনা। চিৎ-পুরুষের পথ কোনো মানসিক পথ নয়; কোনো মানসিক বিধি বা মানসিক চেতনা ইহার নির্ধারক বা নেতা হ'তে পারে না।

সমভাবে, আধ্যাত্মিক ও মানসিক বা আধ্যাত্মিক ও প্রাণিক এই দুই রকম চেতনার সম্মিলন বা আপোষরফা, জীবনকে বাহিরে অপরিবর্তিত রেখে ভিতর থেকে শুধু তার ঊর্ধ্বায়ন,—যোগের বিধান বা লক্ষ্য হতে পারে না। সমগ্র জীবনকেই নেওয়া চাই কিন্তু সমগ্র জীবনের রূপান্তরও চাই: সকল কিছুরই হয়ে ওঠা চাই অতিমানসিক প্রকৃতির মধ্যে অধ্যাত্ম পুরুষের এক অংশ, একরূপ, এক পর্যাপ্ত বহিঃপ্রকাশ। জড়জগতে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ইহাই শিখর ও সার্থক অভিযান; যেমন প্রাণময় পশু থেকে মনোময় মানুষে পরিবর্তন প্রাণকে মৌলিক চেতনা, প্রসার ও তাৎপর্যে একেবারে অন্য জিনিষ করেছিল, তেমন জড়ভাবাপন্ন মনোময় পুরুষের অধ্যাত্ম ও অতিমানসিক পুরুষে পরিবর্তন জড়কে ব্যবহার ক'রে কিন্তু তার প্রভাবাধীন না হ'য়ে, প্রাণকে নিয়ে তাকে এমন এক জিনিষ করবে যা এই দোষত্রুটিভরা অপূর্ণ সীমাবদ্ধ প্রাণ থেকে একেবারে অন্যরূপ, তার মৌলিক চেতনা, প্রসার ও তাৎপর্যে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাণের যে সমস্ত রূপ এই পরিবর্তন সহ্য করতে অক্ষম তাদের বিদায় নিতে হবে, আর যা সব সহ্য করতে পারবে তারা টিকে গিয়ে প্রবেশ করবে পরম চিৎ-পুরুষের রাজ্যে। এক দিব্যশক্তি কর্মরতা, তিনি প্রতিমুহূর্তে নির্বাচন করবেন কি কর্তব্য বা কি কর্তব্য নয়, কি সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে নিতে হবে আর কি সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে ত্যাগ করতে হবে। কারণ যদি আমরা এই শক্তির স্থানে আমাদের কামনা বা অহং-কে না বসাই—আর তা না করার জন্য অন্তঃপুরুষকে সর্বদা জাগ্রত, সর্বদা সতর্ক ও দিব্য দেশনা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে আর আমাদের ভিতর বা বাহির থেকে অদিব্য ভুল পরিচালনাকে বাধা দিতে হবে- তা হলে সেই শক্তি পর্যাপ্ত ও একাই সক্ষম আর তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন সার্থকতায় এমন সব পথ দিয়ে, এমন সব উপায়ে যা এত বৃহৎ, এত আন্তরবৃত্ত, এত জটিল যে মনের পক্ষে সে সম্বন্ধে কিছু আদেশ দেওয়া তো দূরের কথা তা বোঝই তার পক্ষে অসম্ভব। এই পথ শ্রমসাধ্য ও দুরূহ ও বিপদ সঙ্কুল কিন্তু "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—আর কোনো পথ নেই।

দুটি বিধি আছে যাতে দুরূহতা কমে ও বিপদ দূরীভূত হয়। অহং থেকে, প্রাণিক কামনা থেকে, হামবড়া যুক্তিবুদ্ধির অক্ষমতা থেকে যা আসে তা বর্জন করা চাই এবং অবিদ্যার এই সকল প্রতিনিধির সহায়ক যা সব সেই সবও বর্জন করা চাই। সাধককে শিখতে হবে অন্তরতম পুরুষের বাণী গুরুর নির্দেশ, ঈশ্বরের আদেশ, ভগবতী মাতার কর্মপ্রণালী শুনতে ও অনুসরণ করতে। দেহের কামনা ও দুর্বলতা, বিক্ষুব্ধ অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাণের লালসা ও উচ্চণ্ড বেগ, মহত্তর জ্ঞানের দ্বারা নিঃস্তব্ধ ও দীপ্ত হয় নি এমন ব্যক্তিগত মনের নির্দেশ—এই সব যে আঁকড়ে থাকে সে প্রকৃত আন্তর বিধানের

সন্ধান পেতে পারে না, সে দিব্য সার্থকতার পথে স্তূপীকৃত করে বাধার রাশি। আর যে এই আচ্ছাদনকারী ক্রিয়া খুঁজে বার ক'রে সে সব ত্যাগ ক'রতে পারে আর সক্ষম হয় ভিতরের ও বাহিরের প্রকৃত দিশারীকে চিনে তাঁর অনুবর্তী হতে, সে-ই আবিষ্কার করবে আধ্যাত্মিক বিধান ও উপনীত হবে যোগের লক্ষ্যে।

চেতনার আমূল ও সমগ্র রূপান্তর পূর্ণযোগের শুধু যে সমগ্র অর্থ তা নয়, ইহা তার সমগ্র সাধন পদ্ধতিও, তবে এই সাধনা অগ্রসর হয় ধাপে ধাপে ও উপচীয়মান শক্তিতে।

সপ্তম অধ্যায়

আচরণের বিভিন্ন মান ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা

যে জ্ঞানের উপর কর্মযোগীর সকল ক্রিয়া ও বিকাশ প্রতিষ্ঠিত করা দরকার তার কাঠামোর নাভিকেন্দ্র হ'লো ঐক্যের উত্তরোত্তর বাস্তব উপলব্ধি, এক সর্ব-ব্যাপী একত্বের জীবন্ত বোধ: সকল জীবন এক অখণ্ড সমগ্র--এই উপচীয়মান চেতনার মধ্যেই তার বিচরণ ঃ সকল কর্মও এই দিব্য অখণ্ড সমগ্রের অংশ। এই সমূহের মধ্যে জীব নিজে যে পৃথক কিছু ও তার ব্যক্তি-গত ক্রিয়া ও ইহার বিভিন্ন পরিণাম যে তার অহমাত্মক "স্বাধীন" ইচ্ছা দ্বারা প্রধানতঃ বা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত—একথা তখন আর সত্য হ'তে পারে না বা বোধ হবে না। আমাদের সব কর্ম এক অখণ্ড বিশ্বক্রিয়ার অংগীভূত: সমগ্র থেকেই তাদের উৎপত্তি, তার মধ্যেই তাদের নিজ নিজ স্থানে রাখা হয়, অথবা আরো সঠিক ভাবে বলা যায় যে তারা নিজেরাই তাদের স্থান ক'রে নেয় তার মধ্যে আর তাদের ফল নিয়ন্ত্রিত হয় এমন সব শক্তির দ্বারা যা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। যে পরম এক এই বিশ্বের মধ্যে নিজেকে উত্তরোত্তর অভিব্যক্ত করছেন তাঁরই অখণ্ড গতিবৃত্তি এই জগৎ-ক্রিয়া—যেমন ইহার বিরাট সমগ্রতায়, তেমন ইহার প্রতি ক্ষুদ্র অংশে। মানুষও যতই বোধ করতে থাকে এই পরম একেক তার নিজের অন্তরে ও তার বাহিরে এবং প্রকৃতির গতির মধ্যে তাঁর বিভিন্ন শক্তির নিগূঢ়, অত্যাশ্চর্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ক্রিয়াধারাতে ততই সে উত্তরোত্তর জানতে পারে তার নিজের সত্য ও বিষয়সমূহের সত্য। এই যে ক্রিয়া, এই যে গতি-বৃত্তি, তার পরিসর—এমন কি আমাদের মধ্যে ও আমাদের চারিদিককার সবার মধ্যে যে ক্রিয়া ও গতিবৃত্তি তারও পরিসর—শুধু সেইটুকু নয় যেটুকু আমরা আমাদের বাহ্য চেতনায় বিশ্বের যাবতীয় কর্মের সামান্য অংশ সম্বন্ধে জানি; ইহাকে ধরে আছে এক বিশাল অধঃস্থিত পরিবেষ্টনকারী সত্তা যা আমাদের মনের কাছে অধিচেতন বা অবচেতন এবং ইহাকে আকর্ষণ করছে এক বিশাল অতি-স্থিত সত্তা যা আমাদের প্রকৃতির কাছে অতিচেতন। যেমন আমরা নিজেরা উদ্ভূত হয়েছি, তেমন আমাদের ক্রিয়াও উদ্ভূত হয় এক সার্বিকতা থেকে যার কথা আমরা জানি না, আমরা ইহার আকার গড়ি আমাদের ব্যক্তিগত স্বভাব, ব্যক্তিগত মন ও মননের সংকল্প অথবা সংবেগ বা কামনার শক্তি দিয়ে; কিন্তু বিষয়সমূহের প্রকৃত সত্য, ক্রিয়ার প্রকৃত বিধান এই সব ব্যক্তিগত ও মানুষী রূপায়ণের সীমা ছাড়িয়ে যায়। যে সব দৃষ্টিভংগিতে, যে সব মনুষ্য-

সৃষ্ট বিধিতে বিশ্ব-গতিবৃত্তির অখণ্ড সমগ্রতা উপেক্ষা করা হয় সে সবগুলি কার্যক্ষেত্রে যতই উপকারী হ'ক না কেন, অধ্যাত্ম সত্যের কাছে তাদের প্রতিটিই এক অপূর্ণ দৃষ্টি ও অবিদ্যার বিধান।

এমন কি যখন আমরা এই ভাবনার কিছু আভাস পেয়েছি বা ইহাকে মনের জ্ঞান হিসাবে ও তার ফলে অন্তঃপুরুষের এক ভাব হিসাবে আমাদের চেতনায় স্থায়ী করতে সফল হ'য়েছি তখনো আমাদের পক্ষে আমাদের বহির্মুখী অংশে ও সক্রিয় প্রকৃতিতে এই সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আমাদের ব্যক্তিগত মত, আমাদের ব্যক্তিগত সংকল্প, আমাদের ব্যক্তিগত ভাবাবেগ ও কামনার মিল আনা দুষ্কর। তখনো আমরা বাধ্য হয়ে এই অখণ্ড গতিবৃত্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করে চলি যেন ইহা নৈর্ব্যক্তিক উপাদানের এক স্তূপ আর আমাদের, অহং-এর, ব্যক্তির কাজ হ'ল আমাদের নিজেদের সংকল্প ও মানসিক অলীক কল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার দ্বারা এ থেকে কিছু কেটে বার করা। পরিবেশ সম্বন্ধে মানুষের সাধারণ মনোভাব ইহাই, কিন্তু এই মনোভাব প্রকৃতপক্ষে মিথ্যামূলক, কারণ আমাদের অহং ও ইহার সংকল্প বিভিন্ন বিশ্ব-শক্তির সৃষ্টি ও খেলার পুতুল; একমাত্র যখন আমরা অহং থেকে সরে এসে ঐসব শক্তির মধ্যে যে সনাতন কাজ করেন তাঁর দিব্য জ্ঞান-সংকল্পের চেতনার মধ্যে যেতে পারি তখনই আমরা এক প্রকার ঊর্ধ্ব থেকে নিযুক্ত হ'য়ে তাদের প্রভু হ'তে সমর্থ হই। কিন্তু যতদিন মানুষ তার ব্যষ্টিত্ব পোষণ করে আর ইহাকে পূর্ণভাবে বিকশিত না করে, ততদিন এই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষের সঠিক মনোভাব, করণ এই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবর্তক-শক্তি না থাকলে অহং-এর মধ্যে তার বৃদ্ধি হয় না, আর সে সমর্থও হয় না অবচেতন বা অর্ধ-চেতন বিশ্বজনীন সমষ্টি-সত্তা থেকে নিজেকে যথেষ্টভাবে বিকশিত ও পৃথক করতে।

কিন্তু যখন আর আমাদের বিকাশের এই বিভক্ত, ব্যষ্টিভাবাত্মক, আক্রমণশীল অবস্থার প্রয়োজন থাকে না, যখন আমরা চাই শিশু-অন্তঃপুরুষের এই ক্ষুদ্রতার আবশ্যকতা থেকে এগিয়ে যেতে ঐক্য ও সার্বিকতার দিকে, বিশ্ব-চেতনার দিকে, এবং তা-ও ছাড়িয়ে আমাদের বিশ্বাতীত চিৎ-পুরুষের উৎকর্ষের দিকে তখন আমাদের জীবনের সব কিছু অভ্যাসের উপর এই অহং-চেতনার দখল উচ্ছেদ করা দুঃসাধ্য। একথা সুস্পষ্টভাবে প্রণিধান না করে উপায় নেই—আর এ প্রণিধান শুধু আমাদের মননের ক্রিয়াতে হবে না তা হবে আমাদের অনুভূতির, ইন্দ্রিয়বোধের ও কর্মেরও ধারাতে—যে এই বিশ্বক্রিয়া শুধু সত্তার এমন এক অসহায় নৈর্ব্যক্তিক তরঙ্গ নয় যে তাকে নিয়ে অহং তার ক্ষমতা ও জিদ অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। ইহা এক বিশ্ব-পুরুষের গতিবিধি যিনি তাঁর ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহা এক পরম দেবতার পদক্ষেপ

যিনি স্বীয় প্রচীয়মান ক্রিয়া-শক্তির অধীশ্বর। এই গতিবিধি যেমন এক ও অখন্ড, তেমন যিনি ইহার মধ্যে বর্তমান তিনিও এক, অদ্বয় ও অখন্ড। শুধু যে সকল ফল তাঁর দ্বারা নির্ধারিত হয় তা নয়, সকল প্রবর্তনা, ক্রিয়া ও ধারা তাঁরই বিশ্বশক্তির গতির উপর নির্ভরশীল, তাদের উপর জীবের কর্তৃত্ব শুধু গৌণভাবে, শুধু তাদের রূপে।

কিন্তু তা হ'লে ব্যষ্টিকর্মীর আধ্যাত্মিক স্থান কোথায়? স্ফুরন্ত প্রকৃতির মধ্যে এই অদ্বয় বিশ্ব পুরুষের সহিত এবং এই অদ্বয় সমগ্র গতিবৃত্তির সহিত তার প্রকৃত সম্বন্ধ কি? সে এক কেন্দ্র মাত্র—অদ্বয় ব্যক্তিগত চেতনার বিকাশ-বৈচিত্র্যের এক কেন্দ্র, এক সমগ্র গতিবৃত্তির বিশেষ ধারার এক কেন্দ্র; তার ব্যক্তিসত্ত্ব হ'ল এক অবিশ্রান্ত ব্যষ্টিত্বধারার তরঙ্গে অদ্বয়, বিশ্বাত্মক পরম ব্যক্তির, বিশ্বাতীতের, সনাতনের প্রতিফলন। অবিদ্যার মধ্যে এই প্রতিফলন সর্বদাই আংশিক ও বিকৃত, কারণ তরঙ্গের চূড়া যা আমাদের সচেতন জাগ্রত আত্মা প্রতিফলিত করে তা দিব্য চিৎ-পুরুষের শুধু এক অপূর্ণ ও মিথ্যা সাদৃশ্য। এই ভগ্ন, প্রতিফলনকারী, বিকৃতকারী দর্পণে বিশ্বব্যাপী অগ্রসরমান সমগ্র ক্রিয়ার ও ভগবানের কোনো চরম আত্ম-প্রকাশের দিকে ইহার বহুমুখী গতিবৃত্তির কিছুটা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস হ'ল আমাদের বিভিন্ন মতামত, মান, রূপায়ণ ও তত্ত্ব। আমাদের মন যতটা পারে তার এমন এক প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলে, মূল বস্তুর সহিত যার সাদৃশ্য খুবই কম, তবে যতই তার মননের ব্যাপ্তি ও আলো ও সামর্থ্য বাড়তে থাকে ততই এই অপূর্ণতা কমে আসে; তবে এই প্রতিরূপ সর্বদাই এক কাছাকাছি সাদৃশ্য, কখনই তার এমন কি আসল আংশিক মূর্তি নয়। দিব্য সংকল্প যুগ যুগান্ত ধ'রে কর্মরত তার দিব্য রহস্যের ও অনন্তের প্রচ্ছন্ন সত্যের কিছু উত্তরোত্তর প্রকাশ করার জন্য,—তবে শুধু বিশ্বের ঐক্যের মধ্যে নয়, শুধু সজীব ও চিন্তাশীল প্রাণীর সমষ্টিতে নয়, প্রতি জীবেরই অন্তঃপুরুষের মধ্যে। সে জন্যই বিশ্বের মধ্যে, সমষ্টির মধ্যে, ব্যষ্টিজীবের মধ্যে এক বদ্ধমূল সহজ সংস্কার বা বিশ্বাস আছে যে তার নিজের পূর্ণতাসাধন সম্ভব, আর আছে এক অবিরাম প্রেরণা—সদা বর্ধমান, ও আরো পর্যাপ্ত আরো সুসমঞ্জস এমন আত্ম-বিকাশের দিকে যার অর্থ বিষয়সমূহের গূঢ় সত্যের আরো নিকটবর্তী হওয়া। মানুষের গঠনশীল মনের কাছে এই প্রচেষ্টাকে যে সব বিভিন্ন রূপ দেওয়া হয় তা হ'ল—জ্ঞানের, বেদনার, চরিত্রের, সৌন্দর্যবোধের ও ক্রিয়ার বিভিন্ন মান,—বিভিন্ন বিধি, আদর্শ নিয়ম ও বিধান—যেগুলিকে সে চেষ্টা করে বিভিন্ন সর্ব-জনপ্রযোজ্য ধর্মে পরিণত করতে।

* * *

যদি আমরা চাই পরম চিৎ-পুরুষের মধ্যে স্বাধীন হতে, অধীন থাকতে

একমাত্র পরমসত্যের নিকট তা হ'লে আমাদের এই ভাবনা পরিহার করা কর্তব্য যে অনন্তের উপর আমাদের বিভিন্ন মানসিক বা নৈতিক বিধানের কোনো বাধ্যবাধকতা আছে, অথবা এমন কি আমাদের বর্তমান সর্বোত্তম আচরণের ও মানের মধ্যে অলঙ্ঘনীয়, অনপেক্ষ বা শাশ্বত কিছু আছে। যতদিন প্রয়োজন আছে ততদিন উচ্চতর ও আরো উচ্চ সাময়িক মান তৈরী করার অর্থ ভগবানকে সেবা করা তাঁর জগৎ-প্রগতিতে; কিন্তু কঠোরভাবে কোনো অপরিবর্তনীয় মান স্থাপন করার অর্থ চিরন্তন প্রবাহধারার পথে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা। প্রকৃতি-বদ্ধ অন্তঃপুরুষ একবার এই সত্য উপলব্ধি করলে সে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পায়। কেন না যা সব জীব ও জগৎকে সাহায্য করে তাদের দিব্য পরিপূর্ণতার পথে সেই সবই শুভ আর যা সব ঐ বর্ধিষ্ণু সিদ্ধিকে ব্যাহত করে বা ভেঙে দেয় সে সব অশুভ। কিন্তু যেহেতু এই সিদ্ধি আসে উত্তরোত্তর পর্যায়ে, কালের মধ্যে ক্রম-বিকাশের ধারায়, শুভ ও অশুভের মান বদলে যায়, আর সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের অর্থ ও মূল্যেরও পরিবর্তন হয়। যে বিষয় এখন অশুভ এবং তার বর্তমান আকারে একান্তই বর্জনীয় তা-ই এক সময় ছিল সাধারণ ও ব্যষ্টির প্রগতির পক্ষে সহায়ক ও প্রয়োজনীয়। আর অপর যে বিষয়কে এখন আমরা মনে করি অশুভ তা হয়তো অন্য কোনো রূপে ও পরিবেশে কোনো ভবিষ্যৎ সিদ্ধির উপাদান হবে। আবার আধ্যাত্মিক স্তরে আমরা এই পার্থক্যকেও ছাড়িয়ে যাই, কারণ এই যে সব বিষয়কে আমরা শুভ ও অশুভ বলি আমরা তখন দেখতে পাই তাদের উদ্দেশ্য ও দিব্য উপ-কারিতা। তখন সকল বিষয়ের মধ্যকার—যেমন যা শুভ বলা হয় তার, তেমন যা অশুভ বলা হয় তারও—অসত্য এবং যা কিছু সব বিকৃত, অজ্ঞানময় ও তমসাচ্ছন্ন আমাদের বর্জন করা চাই। কারণ তখন আমাদের নিতে হবে শুধু সত্য ও দিব্যকে, শাশ্বত ধারাগুলির মধ্যে অন্য কোনো পার্থক্য করা চলবে না।

যারা কাজ ক'রতে সক্ষম শুধু এক কঠোর বাঁধা মানের উপর, যারা অনুভব ক'রতে সক্ষম শুধু মানুষী মূল্য, দিব্য মূল্য নয়, তাদের কাছে মনে হ'তে পারে যে ইহা এক বিপজ্জনক স্বীকৃতি যার ফলে নীতির মূল পর্যন্ত ধ্বংস হবে, সকল আচরণ বিপর্যস্ত হবে, স্থাপিত হবে এক চরম নৈরাজ্য। অবশ্য একথা ঠিক যে যদি বেছে নেওয়ার মাত্র দুটি পথ থাকে—একদিকে এক শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় নীতি এবং অন্যদিকে আদৌ কোনো নীতি না থাকা—তাহলে অজ্ঞানতার মধ্যে মানুষের পক্ষে সেই পরিণাম আসবে। কিন্তু মানুষীস্তরেও যদি আমাদের এতটা আলো ও এতটা নমনীয়তা থাকে যে আমরা বুঝতে পারি যে আচরণের কোনো মান সাময়িক হ'লেও সেই সময়ের পক্ষে তা প্রয়োজনীয় আর তার স্থলে আরো উন্নত মান না প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত ইহাই

নিষ্ঠার সহিত পালন করা উচিত, তা হ'লে আমাদের এরূপ কোনো ক্ষতি হয় না, হবে শুধু এক অপূর্ণ ও অসহিষ্ণু ধর্মের গোঁড়ামি নাশের ক্ষতি। তার স্থলে আমরা লাভ করি উন্মুক্ততা, অবিরত নৈতিক অগ্রসরতার সামর্থ্য, দাক্ষিণ্য, আর লাভ করি,—এই যে সব জীব কষ্ট ক'রছে, হোঁচট খেয়ে পড়ছে তাদের সহিত এক জ্ঞানমূলক সমবেদনাবোধের শক্তি আর সেই দাক্ষিণ্যবলে তাদের চলার পথে সাহায্য করার আরো উপযুক্ত অধিকার, আরো বেশী ক্ষমতা। পরিশেষে যেখানে মানুষীস্তর শেষ হয় আর দিব্যস্তর আরম্ভ হয়, যেখানে মানসিক চেতনা অন্তর্হিত হয় অতিমানসিক চেতনার মধ্যে আর সান্ত নিজেকে সজোরে নিক্ষেপ করে অনন্তের মধ্যে সেখানে সকল অশিব তিরোহিত হয় এক বিশ্বাতীত দিব্য পরম শিবের মধ্যে যা চেতনার যে স্তরই স্পর্শ করুক না কেন তাতে হ'য়ে ওঠে সর্বজনীন।

তা হ'লে আমাদের জন্য এই স্থির হ'ল যে যে সব মানের দ্বারা আমরা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে চাই সে সব শুধু আমাদের সাময়িক, অপূর্ণ ও ক্রমোন্নত চেষ্টা—নিজেদের কাছে এই দেখাবার জন্য যে প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন আত্মোপলব্ধির দিকে চলে তার মধ্যে আমাদের স্খলনপূর্ণ মানসিক প্রগতি কিরূপ। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধি ও ভঙ্গুর শুচিতা দিয়ে দিব্য অভিব্যক্তিকে বাঁধা যায় না; কারণ ইহার পিছনের চেতনা এত বৃহৎ যে এই সব বিষয়ের মধ্যে তাকে ধরা যায় না। একবার আমরা এই তথ্য ভালভাবে ধরতে পারলে—অবশ্য আমাদের যুক্তিবুদ্ধির একান্তবাদের পক্ষে তা নিতান্তই অপ্রীতিকর—আমরা বরং সমর্থ হব সেই সব ক্রমান্বয়ী মানগুলিকে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে তাদের যথাযথ স্থানে রাখতে যেগুলি ব্যষ্টির বিকাশ সাধনে ও মানবজাতির সমষ্টিগত প্রগতিতে বিভিন্ন পর্যায় নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক সেগুলির দিকে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে নজর দিতে পারি। কেন না আমাদের জানা চাই ইহাদের কি সম্বন্ধ সেই অপর মানাতীত আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক ক্রিয়াপ্রণালীর সহিত যার জন্য যোগের অন্বেষণ ও যার দিকে ইহা চলে দিব্য সংকল্পের কাছে ব্যষ্টি সংকল্পেব সমর্পণের দ্বারা এবং আরো ফলপ্রসূভাবে এই সমর্পণের দ্বাবা সেই মহত্তর চেতনায় তার উৎক্রান্তির মাধ্যমে যে চেতনাতে সম্ভব হ'য়ে ওঠে স্ফুরন্ত সনাতনের সহিত এক প্রকার তাদাত্ম্য।

*   *   *

উত্তরোত্তর পর্যায়ে মানব আচরণের চারিটি প্রধান মান। প্রথমটি হ'ল ব্যক্তিগত প্রয়োজন, পছন্দ, অপছন্দ ও কামনা; দ্বিতীয়টি সমষ্টির বিধান ও মঙ্গল; তৃতীয়টি আদর্শ নীতি; সর্বশেষ হ'ল প্রকৃতির সর্বোত্তম দিব্য বিধান।

মানুষ তার ক্রমবিকাশের দীর্ঘ পথে যাত্রা শুরু করে এই চারিটির শুধু

প্রথম দুটি নিয়ে তার পথের আলো ও নেতা হিসাবে; কারণ ইহারাই তার জান্তব ও প্রাণিক জীবনের বিধান আর দেহপ্রাণময় পশু-মানবরূপেই সে তার যাত্রা শুরু করে লক্ষ্যের দিকে। পৃথিবীতে মানুষের সত্যকার কাজ হ'ল মানবের জাতিরূপের মধ্যে ভগবানের বর্ধিষ্ণু প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলা; সে জানুক বা না জানুক, এই উদ্দেশ্যেই প্রকৃতি তার মধ্যে কর্মরতা তার আন্তর ও বাহ্যধারার ঘন আবরণের নীচে। কিন্তু জড়গত বা পশুসুলভ মানব জীবনের এই আন্তর লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ : সে জানে শুধু ইহার প্রয়োজন ও কামনার কথা, আর তার ফলে করণীয় কি সে বিষয়ে প্রয়োজন সম্বন্ধে তার নিজের বোধ কামনার তাড়না ও নির্দেশ ছাড়া তার আর অন্য কেনো দিশারী থাকে না। সুতরাং তার আচরণের প্রথম স্বাভাবিক বিধি হ'ল—সর্বাগ্রে তার শরীরের ও প্রাণের দাবী ও প্রয়োজন মেটানো এবং তারপরে তার মধ্যে যে সব ভাবপ্রবণ বা মানসিক আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনা বা স্ফুরন্ত ধারণা জেগে ওঠে সে সব পূরণ করা। একমাত্র যে সমীকারক ও অভিভবকারী বিধান এই জোরালো স্বাভাবিক দাবী বদলাতে বা খন্ডন ক'রতে পারে তা হ'ল সে যে বংশ, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী, যূথ বা দলের অন্তর্ভুক্ত তার ভাবনা, প্রয়োজন ও কামনার দাবী।

যদি মানুষ নিজেকে নিয়েই থাকতে পারত—আর সে ইহা ক'রতে পারত যদি ব্যষ্টির উন্নতিসাধনই জগতে ভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ত—তা হলে এই দ্বিতীয় বিধান কার্যকরী হওয়ার আদৌ কোনো প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু সকল জীবনের অগ্রগতির পদ্ধতি হ'ল—সমগ্র ও বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রয়োজন, গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীভুক্ত ব্যষ্টিসমূহের অন্যোন্যনির্ভরতা। ভারতীয় দর্শনের ভাষায় ভগবান সর্বদা নিজেকে প্রকট করেন "ব্যষ্টি" ও "সমষ্টি"—বিভক্ত ও সংহত, এই দুই রূপে। মানুষ আগ্রহী তার বিভক্ত ব্যষ্টিত্বের বৃদ্ধি ও পূর্ণতা ও স্বাধীনতার জন্য কিন্তু অন্য মানুষের সহযোগ বিনা সে এমন কি তার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও কামনাও পূরণ ক'রতে অক্ষম: সে নিজের মধ্যে এক সমগ্র কিন্তু তবু অন্য সবের বিহনে অসম্পূর্ণ। এই বাধ্যবাধকতার জন্য তার ব্যক্তিগত আচরণের বিধান গোষ্ঠীবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় আর এই গোষ্ঠীবিধানের উৎপত্তি হয় এক স্থায়ী গোষ্ঠী-সত্তার রূপায়ণ থেকে; এই গোষ্ঠীসত্তার নিজস্ব সমষ্টিগত মন ও প্রাণ আছে আর ব্যষ্টির নিজের দেহাশ্রয়ী মন ও প্রাণকে ইহার অধীনে করা হয় এক অস্থায়ী একক হিসাবে। কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অমর ও স্বাধীন এবং যা এই গোষ্ঠী-দেহে বাঁধা নয়; এই গোষ্ঠী দেহ ব্যষ্টির দেহাশ্রয়ী জীবনের চেয়ে বেশী স্থায়ী তবে ইহা যে মানুষের সনাতন চিৎ-পুরুষের চেয়ে

বেশী স্থায়ী হবে অথবা চাইবে যে নিজের বিধান দিয়ে তাকে বাঁধব তা হ'তে পারে না।

এই আপাত প্রতীয়মান বৃহত্তর ও প্রবলতর বিধানকে স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে ব্যষ্টি প্রাথমিক মানুষ যে প্রাণিক ও পাশব তত্ত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন ইহা তার বিস্তার ছাড়া আর কিছু নয়; ইহাই পশুর যূথ বা দলের বিধান। ব্যষ্টি তার জীবনকে আংশিকভাবে এক করে অপর কিছু সংখ্যক ব্যষ্টির জীবনের সহিত যাদের সহিত সে জন্মের দ্বারা, স্বেচ্ছায় বা ঘটনাপ্রবাহে মিলিত হয়েছে। আর ব্যষ্টির নিজের অস্তিত্ব ও তৃপ্তির জন্য গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রয়োজন ব'লে, প্রথম থেকে না হ'লেও কালক্রমে গোষ্ঠীর সংরক্ষণ, তার অভাব পূরণ, এবং যে সব সমষ্টিগত ধারণা, কামনা ও জীবন যাত্রার অভ্যাস ছাড়া গোষ্ঠী একতাবন্ধ থাকে না সে সবের চরিতার্থ সাধন—এ সবের স্থান মুখ্য হ'য়ে ওঠা অনিবার্য। ব্যক্তিগত ভাবনা, বেদনা, প্রয়োজন ও কামনা, প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের পরিতৃপ্তিসাধন সর্বদাই গৌণ করতে হয় সমগ্র সমাজের—এই বা অপর ব্যষ্টির বা কয়েক জনের নয়—ভাবনা ও বেদনা, প্রয়োজন ও কামনা,প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের নিকট, আর তা করতে হয় অবস্থার চাপে, কোনো নৈতিক বা পরার্থপরতামূলক উদ্দেশ্যে নয়। এই সামাজিক প্রয়োজনই নীতিবোধ ও মানুষের নৈতিক সংবেগের প্রচ্ছন্ন গর্ভাশয়।

কোনো কোনো পশুর মতো মানুষও যে কোনো আদিমকালে একাকী বা শুধু তার সঙ্গিনী নিয়ে থাকত—এ তথ্য জানা নেই। তার সম্বন্ধে সকল বিবরণ থেকে আমরা দেখি যে সে সামাজিক প্রাণী—কোনো বিচ্ছিন্ন দেহ ও চিৎ-পুরুষ নয়। সর্বদা যূথের বিধানই তার আত্ম-বিকাশের ব্যষ্টি বিধানকে নিয়ন্ত্রণ করেছে; মনে হয় চিরকাল সমূহের মধ্যে একক হিসাবে তার জন্ম, স্থিতি ও গঠন। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ন্যায়তঃ ও স্বভাবতঃ ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও কামনার বিধানই মুখ্য, সামাজিক বিধান এসেছে এক গৌণ শক্তি, জবরদখলকার হিসাবে। মানুষের মধ্যে দুটি পৃথক প্রধান সংবেগ আছে—একটি ব্যষ্টিগত, ও অপরটি সমষ্টিগত, একটি ব্যক্তিগত জীবন, অন্যটি সামাজিক জীবন, আচরণের একটি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য, অন্যটি সামাজিক উদ্দেশ্য। মানবসভ্যতার মূলে আছে এই দুয়ের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ও তাদের সমীকরণের প্রয়াস, আর যখন মানুষ প্রাণিক পশুর স্তর অতিক্রম ক'রে উচ্চ ব্যষ্টিভাবাপন্ন মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তরে যায় তখনো তা থাকে অন্য মূর্তিতে।

ব্যষ্টির বাহিরে সামাজিক বিধান থাকাতে, মানুষের মধ্যে দিব্যত্ব বিকাশের পক্ষে ইহাতে এক সময় প্রচুর সুবিধা হয়, আবার অন্য সময় অসুবিধাও হয়। প্রথমে যখন মানুষ অমার্জিত থাকে ও আত্ম-সংযম ও আত্ম-আবিষ্কারে অক্ষম,

তখন সামাজিক বিধান এক সহায়, কারণ ইহা মানুষের ব্যক্তিগত অহন্তা ছাড়া এমন এক শক্তি খাড়া করে যার মাধ্যমে ঐ অহন্তাকে বুঝিয়ে রাজী বা জোর ক'রে বাধ্য করা যেতে পারে তার বন্য দাবীদাওয়া কমাতে, তার অযৌক্তিক ও প্রায়শঃই উগ্র গতিবৃত্তি সংযত করতে এবং এমন কি কখনো কখনো নিজেকে হারিয়ে ফেলতে এক বৃহত্তর ও আরো কম ব্যক্তিগত অহন্তার মাঝে। কিন্তু যে পরিণত চিৎ-পুরুষ মানবত্ব অতিক্রম ক'রতে প্রস্তুত, তার কাছে ইহা অসুবিধাজনক, কারণ ইহা এক বাহ্য মান যা বাহির থেকে তার উপর চেপে বসতে চায় অথচ তার সিদ্ধির জন্য তাকে বিকশিত হ'তে হবে ভিতর থেকে আর বর্ধিষ্ণু স্বাধীনতার মধ্যে, তার সিদ্ধ ব্যষ্টিত্বকে দমন ক'রে নয়, তাকে অতিক্রম ক'রে; তার উপর চাপানো এমন কোনো বিধান দ্বারা এ কাজ আর হবে না যা তার বিভিন্ন অংগকে শিক্ষা দেবে ও সংযত করবে, তা হবে ভিতর থেকে অন্তঃপুরুষের দ্বারা যা সকল পূর্বতন রূপ ভেঙে ভেদ করে যাবে তার সব অংগকে নিজের আলো দিয়ে অধিগত ও রূপান্তরিত করার জন্য।

* * *

ব্যক্তির দাবীর সহিত সমাজের দাবীর সংঘর্ষে আমরা দেখি দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ আদর্শ ও একান্ত সমাধান। গোষ্ঠীর দাবী এই যে ব্যষ্টি কম বেশী সম্পূর্ণভাবে তার অধীন হ'ক বা এমন কি সমষ্টির মধ্যে তার স্বাধীন সত্তার বিনাশ হ'ক, ছোটকে বলি দিতে হবে বা আত্মোৎসর্গ ক'রতে হবে বড়র কাছে। সমাজের প্রয়োজনই তার নিজের প্রয়োজন, সমাজের কামনাই তার নিজের কামনা —এই তার স্বীকার করা চাই; তাকে বাঁচতে হবে নিজের জন্য নয়, যে গোষ্ঠী, কুল সংঘ (Commune) বা রাষ্ট্র-জাতির সে অন্তভূক্ত তার জন্য। ব্যষ্টির দিক থেকে আদর্শ ও একান্ত সমাধান এই যে সমাজের অস্তিত্ব তার নিজের নয়, অন্য সকলের উদ্দেশ্য নাকচ ক'রে নিজের সমষ্টিগত উদ্দেশ্যের জন্যে নয়, তার অস্তিত্ব ব্যষ্টির মংগল ও সার্থকতা সাধনের জন্য, তার অন্তর্ভূক্ত সকল ব্যক্তির মহত্তর ও পূর্ণতর জীবনের জন্য। যতদূর সম্ভব ইহা ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ আত্মার প্রতিভূ হ'য়ে তাকে সাহায্য ক'রবে তা বাস্তবে পরিণত ক'রতে আর এই কাজে ইহা তার সদস্যের প্রত্যেকের স্বাধীনতা সম্ভ্রমের সহিত মেনে নেবে, তার অস্তিত্ব রক্ষা করবে আইন ও শক্তির জোরে নয়, তার অন্তর্ভুক্ত সব ব্যক্তির স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদনে। এই যে দুই প্রকার আদর্শ সমাজ—তার কোনোটিই কোথাও নেই, আর যতদিন ব্যক্তি তার অহন্তাকেই আঁকড়ে থাকে তার জীবনের মুখ্য প্রবর্তক শক্তি হিসাবে ততদিন এরূপ সমাজ সৃষ্টি করা অতীব দুঃসাধ্য এবং আরো দুঃসাধ্য তার অনিশ্চিত জীবন রক্ষা করা। সহজতর উপায় হ'ল ব্যক্তির উপর সমাজের সাধারণ প্রভুত্ব, তবে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব নয় আর এই পন্থাই প্রকৃতি প্রথম থেকে সহজাত সংস্কার বশে অবলম্বন করে

এবং তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখে কঠোর বিধি-বিধান ও অবশ্য পালনীয় প্রথা দিয়ে ও যে মানব এখনো পরতন্ত্র ও অপরিণতবুদ্ধি তার সযত্ন শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে।

আদিম সমাজে ব্যষ্টির জীবন অধীন থাকে গোষ্ঠীর কঠোর ও অপরিবর্তনীয় প্রথা ও বিধির কাছে; ইহাই মানবযূথের সেই প্রাচীন বিধান যার ইচ্ছা শাশ্বত হওয়া ও যার অবিরত প্রয়াস হ'ল নিজেকে জাহির করা যে ইহাই অবিনাশী পুরুষের সনাতন অনুজ্ঞা, "এষ ধর্মঃ সনাতনঃ" (ইহাই সনাতন ধর্ম)। মানবমনে এই আদর্শ আজও মুছে যায়নি; মানবপ্রগতির সব চেয়ে আধুনিক প্রবণতা হ'ল মানবের চিৎ-পুরুষকে সমষ্টি জীবনের দাসত্বে বাঁধার এই প্রাচীন ব্যবস্থার এক বর্ধিত ও জমকালো সংস্করণ প্রতিষ্ঠিত করা। এক মহত্তর জীবন ও পৃথিবীর বুকে এক মহত্তর সত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনের পথে ইহা এক বিষম বিপত্তি। কারণ ব্যষ্টির সব কামনা ও স্বাধীন অন্বেষণ তাদের আশুরূপে যতই অহমাত্মক, যতই মিথ্যা বা বিকৃত হ'ক না কেন, তাদের তমাসাচ্ছন্ন কোষাণুর মধ্যে নিহিত আছে সমগ্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিকাশের বীজ; তার অন্বেষণ ও পদস্খলনের পশ্চাতে যে শক্তি আছে তাকে রক্ষা ক'রে রূপান্তরিত করতে হবে দিব্য ভাবনার প্রতিরূপে। সেই শক্তিকে প্রদীপ্ত ও শিক্ষিত করা দরকার, তাকে দমন করা বা একান্তভাবে সমাজের গুরুভার শকট টানবার জন্য নিযুক্ত করা চলবে না। চরম সিদ্ধির জন্য গোষ্ঠী-ভাবের পিছনকার শক্তি যেমন প্রয়োজনীয়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও তেমন প্রয়োজনীয়; ব্যষ্টির কন্ঠরোধের অর্থ হ'তে পারে মানুষের মাঝে দেবতার কণ্ঠরোধ। আর মানবজাতির বর্তমান স্থিতাবস্থায় অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে সমাজের গঠন ভেঙে দেবে তার কোনো বাস্তব বিপদ একরূপ নেই। বরং এ বিপদ সর্বদাই রয়েছে যে সামাজিক সমূহের অনালোকিত যান্ত্রিক গুরুভারের অত্যধিক চাপে ব্যষ্টি পুরুষের স্বাধীন বিকাশ দমিত বা অযথা স্তিমিত হবে। কারণ ব্যষ্টির মধ্যকার মানুষ আরো সহজে আলোকিত, সচেতন ও স্বচ্ছ প্রভাবের নিকট উন্মুক্ত হ'তে সক্ষম; সমূহের মধ্যকার মানুষ এখনো তমসাচ্ছন্ন ও অর্ধ-সচেতন, এমন সব বিশ্বশক্তির অধীন যা তার আয়ত্তের ও জ্ঞানের অতীত।

এই দমন ও অচলায়তনের বিরুদ্ধে ব্যষ্টির মধ্যস্থ প্রকৃতি প্রত্যাঘাত করে। এই প্রত্যাঘাত হতে পারে বিভিন্ন ধরণের বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ—দুষ্কর্মসাধনের সহজাত ও নৃশংস বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে নিঃসঙ্গ বৈরাগীর অস্বীকার পর্যন্ত। আবার ইহার অন্যরূপ হ'ল সামাজিক ভাবনায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভাব স্বীকার ক'রে গণচেতনার উপর তা আরোপ করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের দাবীর মধ্যে আপোষ আনা। কিন্তু আপোষ সমাধান নয়; ইহাতে সমস্যার

দুরূহতা কিছুকালের জন্য স্থগিত থাকে মাত্র, শেষ পর্যন্ত সমস্যার জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায়, ও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। এই দুই পরস্পর বিরোধী সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া তাদের চেয়ে উচ্চতর এমন এক নতুন তত্ত্ব আহ্বান করা দরকার যা এত শক্তিশালী যে ইহা এক সাথে তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনবে আবার তাদের মধ্যে মিলন সাধন ক'রবে। স্বাভাবিক ব্যক্তিগত বিধান আচরণের যে মান উপস্থাপিত করে তার অর্থ—আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন, রুচি ও কামনাপূরণ; আর স্বাভাবিক গোষ্ঠীগত বিধানে আচরণের যে আরো উন্নত মান আনা হয় তার অর্থ—সমগ্র গোষ্ঠীর প্রয়োজন রুচি ও কামনাপূরণ; এই দুয়ের অপেক্ষা উচ্চতর এমন এক আদর্শ নৈতিক বিধানের ভাবনার উৎপত্তি হ'তে হ'ল যা প্রয়োজন ও কামনা পূরণ নয়, ইহা বরং তাদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং এমন কি জোর কোরে তাদের দমন বা বাতিল করে এমন এক আদর্শ ব্যবস্থার প্রয়োজনে যা পাশব নয়, বা প্রাণিক ও শারীরিক নয়, পরন্তু যা মানসিক, যা আলো ও জ্ঞানের, সঠিক বিধি ও সঠিক গতিবৃত্তির ও সত্যকার ব্যবস্থার জন্য মনের অন্বেষণের সৃষ্টি। যে মুহূর্তে এই ভাবনা মানুষের মধ্যে প্রবল হ'য়ে ওঠে, তখনই সে যে প্রাণগত ও জড়গত জীবনে নিবিষ্ট ছিল তা ছেড়ে যেতে শুরু করে মনোময় জীবনের মধ্যে; সে প্রকৃতির ত্রিপর্বা ঊর্ধ্বারোহণের প্রথম পর্যায় থেকে উত্তীর্ণ হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে। তার সব প্রয়োজন ও কামনাও স্পর্শ পায় উদ্দেশ্যের এক আরো সমুন্নত আলোর, আর মানসিক প্রয়োজন, সৌন্দর্যবোধান্বিত, বুদ্ধিগত ও ভাবপ্রবণ কামনা শুরু করে শারীরিক ও প্রাণিক প্রকৃতির দাবীর উপর আধিপত্য ক'রতে।

* * *

আচরণের স্বাভাবিক বিধান অগ্রসর হয় বিভিন্ন শক্তি, প্রচোদনা ও কামনার সংঘর্ষ থেকে তাদের সাম্যাবস্থার দিকে; উচ্চতর নৈতিক বিধান অগ্রসর হয় মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতির বিকাশ দ্বারা এক নির্দিষ্ট আন্তর মানের দিকে, আর না হয় বিভিন্ন একান্ত গুণের এক আত্ম-গঠিত আদর্শের দিকে—ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার, প্রেম, সঠিক যুক্তিবুদ্ধি, যথার্থ শক্তি, সৌন্দর্য, আলোর দিকে। সুতরাং ইহা মূলতঃ এক ব্যক্তিগত মান; ইহা গণমনের কোনো সৃষ্টি নয়। ব্যষ্টিব্যক্তিই ভাবুক, সে-ই সে সবকে বাহির ক'রে রূপ দেয় যেগুলি অন্যথায় অমূর্ত সমগ্র মানবজাতির মধ্যে অবচেতন হ'য়ে থাকত। নৈতিক যোদ্ধাও ব্যষ্টি ব্যক্তি; যে আত্ম-সংযম করা হয় কোনো বাহ্য বিধানের চাপে নয়, বরং কোনো আন্তর আলোকের নির্দেশে তা-ও মূলতঃ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। তবে নিজের ব্যক্তিগত মানকে এক একান্ত নৈতিক আদর্শের রূপান্তর হিসাবে স্থাপন কোরে ভাবুক তা চাপিয়ে দেয় শুধু নিজের উপর নয়, সেই সব ব্যক্তিরও উপর যাদের কাছে তার মনন পেঁৗছায় ও ভিতরে প্রবেশ করে। আর

যেহেতু লোকেরা দলে দলে ইহাকে ক্রমশঃ বেশী ক'রে ভাবনায় গ্রহণ করে, ---অবশ্য কার্যতঃ তার প্রয়োগ অসম্পূর্ণ হয় বা আদৌ হয় না—সেহেতু সমাজও এই নতুন উন্মুখতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই ভাবনাগত প্রভাবকে ইহা নিজের মধ্যে নিয়ে চেষ্টা করে তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এমন নতুন রূপে পুনর্গঠন ক'রতে যা এই সব উচ্চতর আদর্শের স্পর্শ পেয়েছে; তবে একাজে যে ইহা দেখবার মতো সাফল্য লাভ করে তা নয়। কিন্তু সর্বদাই ইহার সহজাত প্রবৃত্তি হ'ল সে সবকে রূপান্তর করা অবশ্য পালনীয় বিধানে, আদর্শস্থানীয় রূপে, যান্ত্রিক প্রথায় ও তার মধ্যস্থিত সজীব এককদের উপর এক বাহ্য সামাজিক বাধ্যবাধকতায়।

কারণ যখন ব্যক্তি অংশতঃ স্বতন্ত্র হ'য়েছে, এমন এক নৈতিক প্রাণী হ'য়েছে যে সচেতনভাবে বৃদ্ধি পেতে সমর্থ, অন্তর্মুখী জীবন সম্বন্ধে সজাগ, অধ্যাত্ম উন্নতির জন্য উৎসুক তার পরে দীর্ঘ কাল পর্যন্ত সমাজ থাকে বহির্মুখী তার সব পদ্ধতিতে, এক জড়গত ও অথ নৈতিক সত্তা, যান্ত্রিক, এবং বৃদ্ধি ও আত্ম-পূর্ণতা অপেক্ষা স্থিতি ও আত্ম-সংরক্ষণে বেশী আগ্রহী। সহজাত প্রবৃত্তিচালিত স্থিতিশীল সমাজের উপর ভাবুক ও প্রগতিশীল ব্যক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক বিজয় এই যে সে তার মনন-সংকল্প দিয়ে পাওয়া শক্তি বলে এই সমাজকেও বাধ্য ক'রেছে চিন্তা ক'রতে, সামাজিক ন্যায়-বিচার ও সদাচার এবং গোষ্ঠীগত সমবেদনা ও পারস্পরিক করুণার ভাবনার নিকট উন্মুক্ত হ'তে, এই অনুভব ক'রতে যে তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিচারের নিরিখ অন্ধ প্রথা না হ'য়ে হওয়া উচিত যুক্তির বিধান এবং ইহাও স্বীকার ক'রতে যে তার বিভিন্ন বিধানের বৈধতার অন্ততঃ এক মূল উপাদান হ'ল তার অন্তর্গত সব ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক সম্মতি। গোষ্ঠীমানসে সম্প্রতি এই ধারণা আসতে শুরু করেছে যে অন্ততঃ আদর্শ হিসাবে গোষ্ঠী ব্যবস্থার আদেশের মূলে শক্তি অপেক্ষা আলোর প্রভাবই বেশী, এমন কি তার শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্য হ'ল নৈতিক বিকাশ সাধন, প্রতিহিংসা বা নিগ্রহ নয়। ভবিষ্যতে ভাবুকের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় হবে সেইদিন যেদিন তার কথায় ব্যষ্টি একক ও সমষ্টি সমগ্র তাদের জীবন-সম্বন্ধ ও ইহার মিলন ও স্থায়িত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবে স্বচ্ছন্দ ও সুসমঞ্জস সম্মতি ও আত্ম-অভিযোজনের উপর, বাহ্য রূপ ও কাঠামোর উৎপীড়নে আন্তর ভাবকে সংকুচিত করা অপেক্ষা বরং বাহিরকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ ক'রবে আন্তর সত্য দ্বারা।

কিন্তু এই যে সাফল্য সে লাভ করেছে ইহা তার বাস্তব সিদ্ধি অপেক্ষা বরং এমন কিছু, যার যোগ্যতা আছে আরো করার। ব্যষ্টির নৈতিক বিধান এবং তার সব প্রয়োজন ও কামনার বিধানের মধ্যে, আবার সমাজের জন্য প্রস্তাবিত নৈতিক বিধান এবং জাত, কুল, ধর্ম সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্রজাতির বিভিন্ন

প্রাণিক প্রয়োজন, কামনা প্রথা, দুরাগ্রহ, আগ্রহ, ও উচ্চণ্ড বেগের মধ্যে সর্বদাই বৈষম্য ও বিরোধ বর্তমান। নীতিবাদী যে তার একান্ত নৈতিক মান গঠন করে আর সকলকে উপদেশ দেয় যে ফলের দিকে না তাকিয়ে তা-ই পালন করা কর্তব্য—এসবই বৃথা। তার কাছে ব্যক্তির প্রয়োজন ও কামনা অবৈধ যদি সে সব নৈতিকবিধানের বিরুদ্ধ হয়; আর যদি সমাজবিধান এমন হয় যে ইহা তার ন্যায়বোধের বিরুদ্ধে এবং তার বিবেক তা স্বীকার করে না তা হ'লে সেই সমাজবিধান পালনে তার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। ব্যক্তির জন্য তার একান্ত সমাধান এই যে প্রেম, সত্য ও ন্যায়ের সহিত সংগতি নেই এমন কোনো কামনা ও দাবী পোষণ করা ব্যক্তির পক্ষে অনুচিত। সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রজাতির কাছে তার দাবী এই যে সত্য, ন্যায়, মানবতা ও শ্রেষ্ঠ জনকল্যাণের তুলনায় ইহা যেন সকল জিনিসকেই, এমন কি তার নিরাপত্তা ও পরম আগ্রহের বস্তুকেও তুচ্ছ বোধ করে।

তীব্রভাবের সময় ছাড়া কোনো ব্যক্তিই কোনো সময় এত উচ্চ শিখরে ওঠে না, এ পর্যন্ত এমন কোনো সমাজ সৃষ্ট হয় নি যা এই আদর্শ পালন ক'রেছে। আর নীতিবোধ ও মানববিকাশের বর্তমান অবস্থায় কাহারো পক্ষে তা পালন করা সম্ভব নয় বা উচিত নয়। প্রকৃতি তা করতে দেবে না, প্রকৃতি জানে যে তা করা উচিত নয়। প্রথম কারণ এই যে আমাদের নৈতিক আদর্শগুলিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিৎপুরুষের শাশ্বত সত্যের প্রতিলিপি অপেক্ষা বরং স্বল্পোন্নত, অবিদ্যাচ্ছন্ন ও ইচ্ছামতো মানসিক রচনা। এই সব আদর্শ আজ্ঞাসূচক ও যুক্তিহীন, তারা কাগজেকলমে কতকগুলি একান্ত মানের কথা বলে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রচলিত প্রতিটি নীতিশাস্ত্র হয় প্রয়োগের অযোগ্য অথবা যে একান্ত মানকে সেই আদর্শ গ্রহণ ক'রেছে ব'লে ভান করে বস্তুতঃ ইহা সর্বদাই তার নিম্নস্তরের। যদি আমাদের নীতিশাস্ত্র আপোষরফা বা জোড়াতালি হয় তাহোলে তা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় সমাজ ও ব্যক্তি তার সহিত যে তাড়াতাড়ি আরো সব নিষ্ফল আপোষ করে তার সমর্থনের যুক্তি কি। আর যদি নীতিবাদ আপোষহীন ভাবে দাবী করে যে একান্ত প্রেম, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যতাই অবশ্য পালনীয়, তাহোলে তা মানুষের নাগালের বাইরে যায়, মানুষ তাকে মুখে শ্রদ্ধা দেখালেও, কার্যতঃ অগ্রাহ্য করে। এমন কি দেখা যায় যে ইহাতে মানবের সেই সব অন্য উপাদানকে লক্ষ্য করা হয় না যেগুলি সমান জোরের সঙ্গে টিকে থাকতে চায় অথচ নীতিসূত্রের মধ্যে আসতে চায় না। কারণ যেমন কামনার ব্যষ্টি-বিধানের মধ্যে অনন্ত সমগ্রের এমন সব অমূল্য উপাদান থাকে যেগুলিকে সর্বগ্রাসী সামাজিক ভাবনার উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করা দরকার, তেমন ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মানুষের বিভিন্ন অন্তর্জাত সংবেগের মধ্যেও এমন

সব অমূল্য উপাদান থাকে যেগুলি এপর্যন্ত আবিষ্কৃত কোনো নৈতিক সূত্রের সীমার মধ্যে ধরা পড়ে না অথচ অন্তিম দিব্য সিদ্ধির পরিপূর্ণতা ও সামঞ্জস্যের জন্য প্রয়োজনীয়।

উপরন্তু, বিভ্রান্ত ও অপূর্ণ মানব যখন বর্তমানে একান্ত প্রেম, একান্ত ন্যায়পরায়ণতা ও একান্ত সদ্‌যুক্তি প্রয়োগ করে তখন সহজেই সে সব তত্ত্বের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। ন্যায়পরায়ণতা অনেক সময় যা চায়, প্রেম তা ঘৃণা করে। সদ্‌যুক্তি একটা সন্তোষজনক আদর্শ বা বিধানের সন্ধানে প্রকৃতির সব তথ্য ও মানুষের নানা সম্বন্ধ শান্ত ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখে যে একান্ত ন্যায়পরায়ণতা বা একান্ত প্রেমের শাসনকে বিনা পরিবর্তনে স্বীকার করা যায় না। আর বস্তুতঃ মানুষের একান্ত ন্যায়পরায়ণতা কার্যক্ষেত্রে সহজেই হয়ে দাঁড়ায় ঘোর অন্যায়; কারণ তার মন যা রচনা করে তা একদেশী ও কঠোর হয় বলে সে যে পরিকল্পনা বা মূর্তি খাড়া করে তা-ও একদেশী, আংশিক ও কঠোর হয় অথচ মন দাবী করে যে ইহা সমগ্র ও একান্ত, সে ইহাকে প্রয়োগ করতে চায় কিন্তু এই প্রয়োগে বিষয়সমূহের সূক্ষ্মতর সত্য ও জীবনের নমনীয়তা উপেক্ষা করা হয়। প্রয়োগের সময় আমাদের সকল মানই হয় আপোষরফার প্রবাহের উপর তাদের দৃঢ়তা হারায় আর না হয় এই আংশিকতা ও অনমনীয় গঠনের জন্য ভ্রমে পড়ে। মানব এক দিক থেকে অন্য দিকে দুলে বেড়ায়; জাতি বিভিন্ন বিরোধী দাবীর দ্বারা চালিত হ'য়ে অগ্রসর হয় আঁকাবাঁকা পথে এবং ইহা যা কামনা করে বা ন্যায়সঙ্গত মনে করে বা দেহধারী চিৎ-পুরুষের কাছে উপর থেকে সর্বোত্তম আলো যা দাবী করে সে সবের বদলে বরং প্রকৃতি যা চায় তা-ই সহজ সংস্কার বশে করে যায় তবে প্রভূত অপচয় ও দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে।

* * *

আসল কথা এই যে আমরা একান্ত নৈতিক গুণের মতবাদে এসে অবশ্য পালনীয় হিসাবে এক আদর্শ বিধান স্থাপন ক'রেছি ব'লেই যে আমাদের অন্বেষণ শেষ হয়েছে বা আমরা মুক্তিপ্রদ সত্যের স্পর্শ পেয়েছি তা নয়। একথা নিঃসন্দেহ যে এখানে এমন কিছু আছে যা আমাদের মধ্যকার দেহগত ও প্রাণগত মানুষের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে আমাদের সাহায্য করে, আর আছে জড়ের জীবন্ত শুক্তিকাতে প্রতিষ্ঠিত ও এখনো বদ্ধ মানবজাতির ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সব প্রয়োজন ও কামনার ঊর্ধ্বে ওঠার এক প্রবল নির্বন্ধ এবং এমন এক আস্পৃহা যা আমাদের মধ্যে মানসিক ও নৈতিক সত্তা বিকাশসাধনের সহায়কর : সুতরাং এই নতুন ঊর্ধ্বায়নকারী উপাদান আমাদের পক্ষে এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাভ; পার্থিব প্রকৃতির দুরূহ বিবর্তনে ইহার ক্রিয়াধারা অগ্রগতির এক বৃহৎ পদক্ষেপ। আবার এই সব নৈতিক ভাবনার অপ্রচুরতার পিছনে আরো কিছু প্রচ্ছন্ন আছে যা পরমসত্যের সহিত সংযুক্ত; এমন এক

আলো ও সামর্থ্যের ক্ষীণ আভা এখানে আছে যা এখনো অনধিগত দিব্যপ্রকৃতির অংশ। কিন্তু এই সব বিষয়ের মানসিক ভাবনা সে আলো নয়, তাদের নৈতিক রূপায়ণ সে সামর্থ্য নয়। যে মন দিব্য চিৎ-পুরুষকে মূর্ত ক'রতে অক্ষম তার শুধু প্রতিরূপ রচনা এই সব; তাদের অমোঘ সূত্রের মধ্যে এই পুরুষকে আটক রাখার জন্য তাদের চেষ্টা বৃথা। আমাদের মধ্যকার মানসিক ও নৈতিক-সত্তার ঊর্ধ্বে আছে এক মহত্তর দিব্য সত্তা যা আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক: কারণ যে বৃহৎ আধ্যাত্মিক লোকে মনের সব সূত্র সাক্ষাৎ অনুভূতির শুভ্র শিখায় বিলীন হয় তার মাধ্যমেই আমরা মন ছাড়িয়ে তার সব রচনা ফেলে যেতে পারি অতিমানসিক সব সদ্‌বস্তুর বৃহত্ত্বে ও স্বাধীনতায়। শুধু সেইখানেই আমরা পেতে পারি সেই সব দিব্য সামর্থ্যের সুসঙ্গতির স্পর্শ যেগুলি আমাদের মনে আসে বিকৃত প্রতিরূপ হ'য়ে বা নৈতিক বিধানের পরস্পর বিরুদ্ধ বা অস্থির উপাদানের মিথ্যা সূত্রের আকারে। শুধু এক-মাত্র সেখানেই, সেই অতিমানসিক চিৎ-পুরুষের মধ্যে যিনি যুগপৎ আমাদের মন, প্রাণ ও দেহের গূঢ় উৎস ও গন্তব্যস্থল—সম্ভব হ'য়ে ওঠে রূপান্তরিত প্রাণময়, অন্নময় ও দীপ্ত মনোময় মানুষের একত্বসাধন। একমাত্র সেখানেই সম্ভব একান্ত ন্যায়, প্রেম ও সত্যতা—তবে আমরা যা কল্পনা করি তা থেকে এ সব প্রভূত বিভিন্ন—আর এসব পরম দিব্য জ্ঞানের আলোকে পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। একমাত্র সেখানেই সম্ভব আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের বিরোধের মিলনসাধন।

অন্য কথায় এক এক বৃহৎ অসীম চেতনার এমন এক মহত্তর সত্য আছে যা সমাজের বাহ্যবিধান ও মানুষের নৈতিক বিধানের ঊর্ধ্বে এবং তাদের অতীত, অথচ ইহাদের মধ্যে কিছু একটা তাকেই পেতে চায়—অবশ্য ক্ষীণভাবে ও তাকে না জেনে; ইহা এক দিব্য-বিধান আর এই দুই অন্ধ ও স্থূল রূপায়ণ হ'লো পশুর প্রাকৃত বিধান ছেড়ে আরো উন্নত আলো বা বিশ্বজনীন বিধিতে যাবার চেষ্টায় সেই বিদ্য-বিধানের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হবার স্খলিত পদক্ষেপ। আমাদের অন্তঃস্থ দেবতা আমাদেরই চিৎপুরুষ যিনি নিজের প্রচ্ছন্ন সিদ্ধির দিকে চলেছেন, সুতরাং ঐ দিব্য মান নিশ্চয়ই আমাদের প্রকৃতির এক পরম আধ্যাত্মিক বিধান ও সত্য। আবার যেহেতু, আমরা জগতে সাধারণ জীবন ও প্রকৃতি বিশিষ্ট দেহধারী সত্তা, অথচ বিশ্বাতীতের সহিত সরাসরি সংস্পর্শলাভে সমর্থ ব্যষ্টি অন্তঃপুরুষ, সেহেতু আমাদের এই পরম সত্যেরও দুটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। ইহা নিশ্চয়ই এমন এক বিধান ও সত্য যা এক মহৎ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন সমষ্টিগত জীবনের নিখুঁত গতিবৃত্তি, সামঞ্জস্য ও ছন্দ আবিষ্কার করে আর সঠিকভাবে নির্ণয় করে প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ একত্বের মধ্যে প্রতি সত্তা ও সকল সত্তার সহিত আমাদের সম্পর্ক। সেই সঙ্গে ইহা এমন বিধান ও সত্য যা প্রতি মুহূর্তে আমাদের কাছে ব্যক্ত করে ব্যষ্টি জীবের

অন্তঃপুরুষ, মন, প্রাণ, দেহের মধ্যে ভগবানের সরাসরি প্রকাশের ছন্দ ও সঠিক ক্রমগুলি *। আর আমরা অনুভূতিতে দেখতে পাই যে এই পরম আলোক ও ক্রিয়াশক্তি তার সর্বোচ্চ প্রকাশে এক সাথে এক অমোঘ বিধান এবং একান্ত স্বাধীনতা। ইহা এক অমোঘ বিধান কেন না ইহা আমাদের প্রতি আন্তর ও বাহ্য গতিবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে এক অপরিবর্তনীয় সত্যের দ্বারা। অথচ প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি গতিবৃত্তিতে পরাৎপরের একান্ত স্বাধীনতা চালনা করে আমাদের সচেতন ও মুক্ত প্রকৃতির পূর্ণ নমনীয়তা।

নৈতিক আদর্শবাদী এই পরম বিধান আবিষ্কার ক'রতে চেষ্টা করে তার নিজের নীতিসম্বন্ধীয় তথ্যের মধ্যে, সেই সব অবর শক্তি ও উপাদানের মধ্যে যেগুলি মানসিক ও নৈতিক সূত্রের অন্তর্গত। এবং তার রক্ষণ ও সংহতির জন্য সে আচরণের এমন এক মৌলিক তত্ত্ব নির্বাচন করে যা মূলতঃ ত্রুটিপূর্ণ এবং বুদ্ধি, কার্যকারিতা, সুখবাদ, যুক্তিবিচার, বোধিময় বিবেক বা অন্য কোনো সাধারণ মান দ্বারা রচিত। এই সব চেষ্টা যে নিষ্ফল হ'তে বাধ্য তা জানা কথা। আমাদের আন্তর প্রকৃতি সনাতন পরম চিৎ-পুরুষের ক্রমোত্তর প্রকাশ, আর ইহা এমন এক জটিল শক্তি যাকে কোনো একটিমাত্র প্রবল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব দিয়ে বাঁধা যায় না। একমাত্র অতিমানসিক চেতনাই সক্ষম ইহার বিষম ও বিরোধপূর্ণ বিভিন্ন শক্তির নিকট তাদের আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করতে এবং তাদের সব বৈষম্য সুসংগত ক'রতে।

পরবর্তী বিভিন্ন ধর্মের চেষ্টা হ'লো আচরণের পরমসত্যের এক প্রতিরূপ নির্দিষ্ট করা, এক শাস্ত্র রচনা করা এবং অবতার বা ভগবদ্-প্রেরিত মহাপুরুষের মাধ্যমে ভগবদ্-বিধান ঘোষণা করা। শুষ্ক নৈতিক ভাবনা অপেক্ষা এই সব শাস্ত্র আরো শক্তিশালী ও স্ফুরন্ত বটে, তবু তাদের বেশীর ভাগই ধর্মভাব ও অতিমানবিক উৎসের ছাপ দিয়ে পবিত্র-করা নৈতিক তত্ত্বের আদর্শভাবাপন্ন মহিমাকীর্তন ছাড়া বেশী কিছু নয়। তাদের কোনো কোনোটিকে যেমন চরম খৃষ্টীয় নীতিকে, প্রকৃতি প্রত্যাখ্যান করে কারণ তারা এক অসাধ্য অন্তিম বিধি পালনের জন্য অন্যায়ভাবে জিদ করে। অন্যগুলিও শেষ পর্যন্ত ক্রমোন্নতিমূলক আপোষরফা হ'য়ে দাঁড়ায় এবং কালের অগ্রগতিতে অপ্রচলিত হ'য়ে পড়ে। এইসব মানসিক মেকি জিনিসের অন্য রূপ যে সত্যকার দিব্য বিধান তা এমন সব অনমনীয় নৈতিক অনুশাসনের শাস্ত্র হ'তে পারে না যা আমাদের সব প্রাণের গতিবৃত্তিকে তাদের লোহার ছাঁচের মধ্যে চেপে রাখে। দিব্য বিধান জীবনের সত্য, চিৎ-পুরুষের সত্য; আর আমাদের ক্রিয়ার প্রতি ধাপ ও আমাদের জীবন-সমস্যার সকল জটিলতাকে

---

* সুতরাং যে ধর্ম কথাটির অর্থ নৈতিকতা বা ইংরাজী "রিলিজিঅন্"-র বেশী কিছু, গীতায় তার সংজ্ঞা হ'ল আমাদের আত্মসত্তার স্বরূপ ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া।

ইহার নেওয়া চাই এক স্বচ্ছন্দ জীবন্ত নমনীয়তার সহিত এবং তাদের অনুপ্রাণিত করা চাই তার শাশ্বত আলোকের সাক্ষাৎ স্পর্শ দিয়ে। কোনো বিধি ও সূত্র হিসাবে ইহার কাজ করা চলবে না, ইহার কাজ করা চাই এক বেষ্টনকারী ও অন্তর্ভেদী সচেতন সান্নিধ্য হিসাবে যা তার অভ্রান্ত সামর্থ্য ও জ্ঞানবলে নির্ধারণ করে আমাদের সকল মনন, কাজকর্ম বেদনা, সংকল্পের প্রচোদনা।

প্রাচীন ধর্মগুলি স্থাপন ক'রেছিল তাদের জ্ঞানীর শাসন, মনু বা কনফিউসিয়াস কথিত তাদের বাণী, এক জটিল শাস্ত্র যার মধ্যে তাদের চেষ্টা ছিল সামাজিক বিধি ও নৈতিক বিধানকে আমাদের সর্বোত্তম প্রকৃতির কতকগুলি শাশ্বত তত্ত্বের সহিত যুক্ত ক'রে এক প্রকার ঐক্যসাধক মিশ্রণ তৈরী করা। এই তিনটিকে তারা দেখত সমান ভূমিতে যেন তিনটিই নিত্য সত্যের, "সনাতন ধর্মে"র সমান অভিব্যক্তি। কিন্তু এই উপাদানগুলির মধ্যে দুটি ক্রমোন্নতিশীল, সাময়িকভাবে সত্য, সনাতনের সংকল্পের মানসিক রচনা, মানুষী ভাষ্য, তৃতীয়টি কতকগুলি সামাজিক ও নৈতিক সূত্রের সহিত যুক্ত ও তাদের অধীন হওয়ায় তার সব রূপের যা দশা হ'লো তারও সেই দশা হ'লো। হয় এই শাস্ত্র অপ্রচলিত হ'য়ে পড়ে আর তাকে উত্তরোত্তর বদলাতে হয় বা শেষে একেবারে ফেলে দিতে হয়; আর না হয়, ব্যষ্টি ও জাতির আত্ম-বিকাশের পথে ইহা এক অনড় বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। শাস্ত্র খাড়া করে এক সমষ্টিগত বাহ্য মান; কিন্তু ইহাতে ব্যক্তির আন্তর স্বভাব তার অন্তঃস্থ গূঢ় আধ্যাত্মিক শক্তির অনির্ণেয় উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু ব্যক্তির স্বভাবকে উপেক্ষা করা যাবে না, তার দাবী রদ করা চলে না। তার বহির্মুখী সংবেগের অবাধ প্রশ্রয়ের ফলে আসে নৈরাজ্য ও বিনাশ, কিন্তু বাঁধাধরা যান্ত্রিক বিধির দ্বারা তার অন্তঃপুরুষের স্বাধীনতাকে দমন ও নিগ্রহ করার অর্থ নিশ্চলতা বা আন্তর মৃত্যু। তার যে পরম বিষয় আবিষ্কার করা চাই তা বাহির থেকে এইরূপ কোনো নিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণ নয়, তা হ'লো তার সর্বোত্তম চিৎ-পুরুষকে এবং এক শাশ্বত গতিবৃত্তির সত্যকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা।

উচ্চতর নৈতিক বিধানকে ব্যক্তিই আবিষ্কার করে তার মনে, ও সংকল্পে ও চৈত্য-বোধে, আর তার পর তা বিস্তৃত হয় জাতিতে। পরমবিধানকেও ব্যক্তিরই আবিষ্কার করা চাই তার চিৎপুরুষে। একমাত্র তখনই তা প্রসারিত করা যায় অপরের মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুভবের মাধ্যমে, মানসিক ভাবনা দিয়ে নয়। বিধি বা আদর্শ হিসাবে নৈতিক বিধান সেই সব ব্যক্তির উপর আরোপ করা যেতে পারে যারা চেতনার এমন স্তরে পেঁছায় নি বা মন ও সংকল্প ও চৈত্যবোধে তেমন সূক্ষ্ম হয়নি যাতে ইহা তাদের কাছে হ'য়ে উঠতে পারে বাস্তব সত্য বা জীবন্ত শক্তি। আদর্শ হিসাবে ইহাকে শ্রদ্ধা করা যায়, পালন করার প্রয়োজন নেই। বিধি হিসাবে ইহাকে পালন করা যায় ইহার বহিরঙ্গে, এমন কি আন্তর মর্ম একেবারে না বুঝলেও। অতিমানসিক ও

আধ্যাত্মিক জীবনকে এইভাবে যান্ত্রিক করা যায় না, ইহাকে কোনো মানসিক আদর্শে বা বাহ্য বিধিতে পরিণত করা সম্ভব নয়। ইহার নিজস্ব বিভিন্ন বৃহৎ গতিধারা আছে, কিন্তু এসবকে বাস্তব করা চাই, ইহাদের হওয়া চাই এমন এক সক্রিয় শক্তির কর্মপ্রণালী যাকে ব্যক্তির চেতনায় অনুভব করা হ'য়েছে, আর হওয়া চাই মন, প্রাণ ও দেহকে রূপান্তর ক'রতে সক্ষম এক সনাতন সত্যের প্রতিলিপি। আর ইহা এই রকম বাস্তব, কার্যকরী ও অমোঘ হওয়ায় অতি-মানসিক চেতনা ও আধ্যাত্মিক জীবনের সাবজনীনতাই একমাত্র শক্তি যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যে আনতে পারে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সিদ্ধি। দিব্য চেতনা ও ইহার অনপেক্ষ সত্যের সহিত আমাদের অবিরত সংস্পর্শে আসাই একমাত্র উপায় যা দিয়ে চিন্ময় ভগবানের, স্ফুরন্ত পরমার্থসৎ-এর কোনো রূপ আমাদের পৃথ্বী জীবনকে নিয়ে তার সংঘর্ষ, পদস্খলন, সব দুঃখকষ্ট ও মিথ্যাকে রূপান্তরিত ক'রতে পারে পরম আলোক, সামর্থ্য ও আনন্দের প্রতিমূর্তিতে।

পরতমের সহিত অন্তঃপুরুষের অবিরত সংস্পর্শের পরাকাষ্ঠা হলো সেই আত্ম-দান যাকে আমরা বলি দিব্যসংকল্পের নিকট সমর্পণ এবং সর্বময় পরম একের মধ্যে বিভক্ত অহং-এর নিমজ্জন। অতিমানসিক চেতনা ও আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি ও স্থায়ী অবস্থা হ'লো অন্তঃপুরুষের বিরাট বিশ্বজনীনতা, সকলের সহিত প্রগাঢ় ঐক্য। একমাত্র এই বিশ্বজনীনতা ও ঐক্যের মধ্যেই আমরা পেতে পারি দেহধারী চিৎ-পুরুষের জীবনে দিব্য অভিব্যক্তির পরম বিধান; একমাত্র তার মধ্যেই আমরা আবিষ্কার ক'রতে পারি আমাদের ব্যষ্টি প্রকৃতির পরম গতি ও সঠিক ক্রীড়া। একমাত্র তার মধ্যেই এইসব অধস্তন বৈষম্য তাদের বিরোধ ঘুচিয়ে পরিণত হ'তে পারে এই যে সব অভিব্যক্ত সত্তা এক পরম দেবতার অংশ, এক বিশ্বজননীর সন্তান তাদের সত্যকার বিভিন্ন সম্বন্ধের বিজয়ী সামঞ্জস্যে।

* * *

সকল আচরণ ও ক্রিয়া এমন এক পরম সামর্থ্য, শক্তির গতিবৃত্তির অংশ যা অনন্ত এবং উৎসে ও গূঢ় তাৎপর্যে ও সংকল্পে দিব্য যদিও তার যে সব রূপ আমরা দেখি সে সব মনে হয় নিশ্চেতন বা অজ্ঞানময়, জড়ীয়, প্রাণিক, মানসিক সান্ত; এই শক্তিই ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত প্রকৃতির অন্ধকারের মধ্যে ভগবান ও অনন্তের কিছু উত্তরোত্তর প্রকট করার জন্য কর্মরত। এই সামর্থ্যই নিয়ে যাচ্ছে পরম আলোকের দিকে, তবে এখনো অবিদ্যার মধ্য দিয়ে। ইহা মানুষকে নিয়ে যায় প্রথম তার বিভিন্ন প্রয়োজন ও কামনার মধ্য দিয়ে, পরে ইহা তাকে চালনা করে এমন সব প্রয়োজন ও কামনার মধ্য দিয়ে যেগুলির পরিধি আরো বৃহৎ ও যেগুলি মানসিক ও নৈতিক আদর্শ দ্বারা সংযত ও আলোকিত। এখন তার উদ্যোগ চলছে তাকে এমন এক আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে

নিয়ে যাবার জন্য যা এই সব জিনিসকে বাতিল ক'রে দেয়, অথচ আবার, তাদের সার্থক ও সুসঙ্গত করে যা সব তাদের আন্তর ভাব ও উদ্দেশ্যে দিব্য-ভাবে সত্য তাদের মধ্যে। প্রয়োজন ও কামনাকে ইহা রূপান্তরিত করে দিব্য সংকল্প ও আনন্দে। মানসিক ও নৈতিক আস্পৃহাকে ইহা রূপান্তরিত করে তাদের অতীত পরম সত্য ও সিদ্ধির সব শক্তিতে। ব্যষ্টি প্রকৃতির বিভক্ত কষ্টকর প্রয়াসের, পৃথক অহং-এর উচ্চণ্ড বেগ ও সংঘর্ষের বদলে ইহা আনে আমাদের অন্তঃস্থ বিশ্বভাবাপন্ন ব্যক্তির অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সত্তার, যে-চিৎ-পুরুষ পরম চিৎ-পুরুষের অংশ তার প্রশান্ত, গভীর, সুসংগত ও সুখময় বিধান। আমাদের অন্তঃস্থ এই সত্যকার ব্যক্তি বিশ্বাত্মক হওয়ায় সে নিজের পৃথক পরিতৃপ্তিসাধন চায় না, সে শুধু চায় প্রকৃতির মধ্যে তার বহির্মুখী প্রকাশে তার আসল উচ্চ অবস্থায় নিজের শ্রীবৃদ্ধি, তার আন্তর দিব্য আত্মার বহিঃপ্রকাশ, আর চায় নিজের মধ্যে সেই বিশ্বাতীত আধ্যাত্মিক সামর্থ্য ও সান্নিধ্য যা সকলের সহিত এক এবং প্রতি বিষয় ও জীবের সহিত এবং দিব্য সৃষ্টিতে সকল সমষ্টিগত ব্যক্তিসত্ত্ব ও বিভিন্ন শক্তির প্রতি সমবেদনাপূর্ণ, অথচ আবার ইহা এসবকে ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং কোনো জীব বা সমষ্টির অহন্তার দ্বারা আবদ্ধ নয় অথবা তাদের অপরা প্রকৃতির অজ্ঞানময় সব নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সীমিত নয়। ইহাই সেই উচ্চ উপলব্ধি যা আমাদের সকল অন্বেষণ ও উদ্যমের সম্মুখে থাকে আর ইহাই আমাদের প্রকৃতির সকল উপাদানের পূর্ণ সুসংগতি ও রূপান্তরের নিশ্চিত আশ্বাস দেয়। শুদ্ধ, সমগ্র ও নিখুঁত ক্রিয়া সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন উহা সাধিত হয়, আর আমরা উপনীত হ'য়েছি আমাদের এই অন্তঃস্থ গূঢ় দিব্যসত্তার উত্তুংগ শিখরে।

সিদ্ধ অতিমানসিক ক্রিয়া কোনো একটি মাত্র তত্ত্ব বা সীমিত বিধি অনুযায়ী চলবে না। ইহা যে অহমাত্মক ব্যক্তির বা কোনো সুগঠিত গোষ্ঠী-মানসের মান পূরণ ক'রবে তারও সম্ভাবনা নেই। সংসারের বস্তুবাদী কাজের লোক, বা ন্যায়নিষ্ঠ নীতিবাদী বা দেশপ্রেমিক বা ভাবালিবাসী মানবহিতৈষী বা আদর্শপরায়ণ দার্শনিক—ইহাদের কারোরই দাবী অনুযায়ী ইহা চলবে না। এক দীপ্ত ও উন্নত সত্তা, সংকল্প ও জ্ঞানের সমগ্রতার মধ্যে উচ্চ শিখরসমূহ থেকে স্বতঃপ্রবাহিত বহির্ধারার পথ ধরেই ইহা এগিয়ে যাবে, বুদ্ধিগত যুক্তি বা নীতিগত সংকল্পের দৌড় যে নির্বাচিত, হিসাব করা মানসম্মত ক্রিয়া সে অনুযায়ী নয়। ইহার একমাত্র লক্ষ্য হবে আমাদের মধ্যে যা দিব্য তার বহিঃ-প্রকাশ করা এবং জগৎ ও ভবিষ্যৎ পরমা অভিব্যক্তির দিকে তার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখা। এমন কি ইহা ততটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে না যতটা হবে সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত বিধান এবং দিব্য সত্যের আলোকে এবং ইহার স্বয়ংক্রিয় প্রভাবের দ্বারা ক্রিয়ার বোধিত নির্ধারণ। যেমন প্রকৃতির ক্রিয়ার উদ্ভব

হয় তার পশ্চাতে এক সমগ্র সংকল্প ও জ্ঞান থেকে, তেমন ইহারও উদ্ভব হবে সমগ্র সংকল্প ও জ্ঞান থেকে তবে এই সংকল্প ও জ্ঞান চিন্ময়ী পরা-প্রকৃতির দ্বারা আলোকিত, তখন আর তারা এই অবিদ্যাময়ী প্রকৃতির মধ্যে তমসাচ্ছন্ন নয়। ইহা এমন ক্রিয়া যা সব দ্বন্দ্বের দ্বারা আবদ্ধ না হ'য়ে হবে সৃষ্টিতে চিৎ-পুরুষের নিরপেক্ষ আনন্দের মধ্যে পূর্ণ ও বৃহৎ। আর্ত ও অবিদ্যাচ্ছন্ন অহং-এর সব বিমূঢ়তা ও ত্রুটিবিচ্যুতি সরিয়ে তার স্থলে আসবে এমন দিব্য সামর্থ্য ও প্রজ্ঞার সুখময় ও অনুপ্রাণিত সঞ্চরণ যা আমাদের দেয় পথের নির্দেশ, চলার বেগ।

যদি দিব্য শক্তিপাতের কোনো অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে এক সাথে এই স্তরে ওঠান সম্ভব হ'ত তা হ'লে আমরা পৃথিবীর উপর এমন কিছু পেতাম যা লোক-শ্রুতির স্বর্ণযুগ, সত্যযুগ অর্থাৎ সত্যময় জীবনের সদৃশ। কারণ সত্যযুগের লক্ষণ এই যে প্রতি জীবের মধ্যে পরম বিধান স্বতঃস্ফূর্ত ও সচেতন আর ইহা তার নিজের কাজ করে পূর্ণ সুসঙ্গতি ও স্বাধীনতার মধ্যে। জাতির চেতনার ভিত্তি হবে ঐক্য ও বিশ্বজনীনতা, কোনো ভেদগত বিভেদ নয়; প্রেম হবে একান্ত, সাম্য এমন হবে যা শ্রেণী বিভাগের সহিত সুসমঞ্জস, পার্থক্যের মধ্যেও পরিপূর্ণ; একান্ত ন্যায়পরায়ণতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে সত্তার এমন স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার দ্বারা যা বিষয়সমূহের সত্য ও নিজের ও অপর সবের সত্যের সহিত সুসঙ্গতিপূর্ণ এবং সেজন্য সত্যকার ও যথার্থ ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত; যে যথার্থ যুক্তিশক্তি আর মানসিক নয়, অতিমানসিক সে কৃত্রিম সব মান অনুসরণ ক'রে তৃপ্ত হবেনা, তার তৃপ্তি হবে যথার্থ সম্বন্ধের স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত বোধে এবং কার্যের মধ্যে তাদের অবশ্যম্ভাবী সম্পাদনায়। ব্যষ্টি ও সমাজের মধ্যে বিবাদ, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সর্বনাশা সংঘর্ষ--এসব থাকার কোন কারণ থাকবে না, দেহধারী সব সত্তার মধ্যে অন্তর্নিহিত বিশ্বচেতনার ফলে একত্বের মধ্যে সুসমঞ্জস বৈচিত্র্যের গঠিত হ সম্পূর্ণ সম্ভব হবে।

মানবজাতির বর্তমান অবস্থায় এই উচ্চস্তরে আরোহণের দায়িত্ব ব্যক্তিরই, পথিকৃৎ ও অগ্রদূত হিসাবে। সে যদি বিচ্ছিন্ন থাকে তা হ'লে তার সব বাহ্য কর্মের ধারা ও রূপ এমন হ'তে বাধ্য যা সচেতনভাবে দিব্য সমষ্টিগত ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তার সব কর্মের মূল যে আন্তর অবস্থা তা একই হবে, কিন্তু আসল কর্মগুলি অবিদ্যামুক্ত পৃথিবীতে যেমন হওয়া উচিত তা না হ'য়ে হ'তে পারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তবু তার চেতনা ও তার আচরণের দিব্য কর্মকৌশল--অবশ্য এমন মুক্ত বিষয় সম্বন্ধে যদি এরূপ পদের ব্যবহার সংগত হয়--এমন হবে যা আগে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমরা যাকে পাপ বলি সেই প্রাণিক অশুচিতা ও কামনা ও অনুচিত সংবেগের অধীনতা থেকে ইহা মুক্ত হবে, আমরা যাকে পুণ্য বলি সেই নির্দিষ্ট নৈতিক

সব সূত্রের শাসনের মধ্যে ইহা আবদ্ধ থাকবে না, ইহা হবে মনের চেতনা অপেক্ষা বৃহত্তর এক চেতনার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিশ্চিত ও শুদ্ধ পূর্ণ এবং তার সকল পদক্ষেপে তাকে নিয়ন্ত্রিণ করবে পরম চিৎ-পুরুষের আলোক ও সত্য। কিন্তু অতিমানসিক সিদ্ধিলাভ করেছে এমন সব ব্যক্তি নিয়ে যদি কোনো সমষ্টি বা গোষ্ঠী রচনা সম্ভব হয়, তা হ'লে বাস্তবিকই কোন দিব্য সৃষ্টির রূপ পরিগ্রহও সম্ভব হয়, আর ইহাও সম্ভব যে এক নতুন পৃথিবী নেমে আসবে আর তা হবে এক নতুন স্বর্গ, পার্থিব অবিদ্যার অন্ধকার সরে যেতে থাকবে আর তার মাঝে এখানে সৃষ্ট হবে এক অতিমানসিক আলোকের জগৎ।

অষ্টম অধ্যায়

পরম সংকল্প

যে পরম চিৎ-পুরুষ প্রথমে মনে হয় অবিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ আর পরে অনন্তের সামর্থ্য ও প্রজ্ঞায় স্বাধীন, তাঁর এই উত্তরোত্তর অভিব্যক্তির আলোকে আমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি কর্মযোগীর প্রতি গীতার মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুশাসন, "সকল ধর্ম, আচরণের সকল তত্ত্ব ও বিধান ও বিধি পরিত্যাগ ক'রে শরণ লও একমাত্র আমাতে।" সকল মান ও বিধি সাময়িক রচনা; জড় থেকে পরমচিৎ-পুরুষে অহং-এর সংক্রমণের পথে তার বিভিন্ন প্রয়োজনের উপরই সে সবের প্রতিষ্ঠা। এই সব সাময়িক কৌশল আপেক্ষিকভাবে অবশ্য পালনীয় যতদিন আমরা সংক্রমণের বিভিন্ন পর্যায়ে তৃপ্ত, শারীরিক ও প্রাণিক জীবনেই সন্তুষ্ট, মানসিক গতিবৃত্তিতে আসক্ত, বা এমন কি মনোলোকের যে সব স্তর আধ্যাত্মিক দীপ্তির স্পর্শ পেয়েছে তাদের মধ্যেও নিবদ্ধ থাকি। কিন্তু এসবের ওপারে আছে অতিমানসিক অনন্ত চেতনার অবারিত ব্যাপ্তি, আর সেখানে অবসান হয় সকল সাময়িক গঠনের। সর্বভূতের অধীশ্বর, জীবের সুহৃৎ-এর হাতে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ছেড়ে দেবার এবং আমাদের সব মানসিক সীমাবন্ধন ও মানদন্ড পুরোপুরি আমাদের পিছনে ফেলে যাবার উপযোগী বিশ্বাস ও সাহস আমাদের যদি না থাকে, তা হ'লে সনাতন ও অনন্তের আধ্যাত্মিক সত্যের মধ্যে পূর্ণ প্রবেশ সম্ভব হয় না। বিনা দ্বিধায়, বিনা কুণ্ঠায়, ভয়ে বা সঙ্কোচে কোন এক মুহূর্তে বিধানের পর আসে স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সাধারণ ও বিশ্বজনীন বিভিন্ন আমাদের ঝাঁপ দেওয়া চাই মুক্ত, অনন্ত, পরমার্থ সৎ-এর মহাসমুদ্রে। মানের পরে আছে মহত্তর কিছু, নৈর্ব্যক্তিক নমনীয়তা, দিব্য স্বাধীনতা, অতি-স্থিত শক্তি এবং স্বগীয় সংবেগ। উত্তরণের সংকীর্ণ পথের শেষে আছে শিখরের উপর বিস্তৃত সব সমতলক্ষেত্র।

উত্তরণের তিনটি পর্যায়—সর্বনিম্নে দেহগত জীবন যা প্রয়োজন ও কামনার দাসত্বের চাপে পিষ্ট; মধ্যে মানসিক উচ্চতর ভাবপ্রবণ ও চৈত্য রাজত্ব যা পেতে চায় সব মহত্তর স্বার্থ, আস্পৃহা, অনুভূতি, ভাবনা; আর শিখরসমূহে আছে প্রথম এক গভীরতর চৈত্য ও আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং তার পর এক অতি-মানসিক শাশ্বত চেতনা যার মধ্যে আমাদের সকল আস্পৃহা ও অন্বেষণ আবিষ্কার করে তাদের নিজস্ব অন্তরঙ্গ তাৎপর্য। দেহগত জীবনে প্রথমে প্রয়োজন ও কামনা এবং পরে ব্যষ্টি ও সমাজের ব্যবহারিক মঙ্গলই মুখ্য

বিবেচনার বিষয়, ইহারাই প্রবল শক্তি। মনোময় জীবনে ভাবনা ও আদর্শের প্রভাবই বেশী, কিন্তু ভাবনাগুলি সত্যের বেশধারী অর্ধ-আলোক, আদর্শগুলি মনের তৈরী—এক উপচীয়মান কিন্তু এখনো অপূর্ণ বোধে ও অনুভূতির ফলে। যখনই মনোময় জীবনের প্রভাব বাড়ে এবং দেহগত জীবনের পাশব দাবি কমে আসে তখনই মানুষ, মনোময় পুরুষ অনুভব করে যে মনোময় প্রকৃতির প্রেষণার তাড়নায় সে বাধ্য হ'চ্ছে ভাবনা বা আদর্শের তাৎপর্যে ব্যষ্টির জীবনকে নতুন রূপ দিতে; এবং পরিশেষে আরো অস্পষ্ট, আরো জটিল যে সমাজজীবন, এমন কি তা-ও বাধ্য হয় এই সূক্ষ্ম প্রণালী অনুযায়ী কাজ করতে। আধ্যাত্মিক জীবনে বা যখন মন অপেক্ষা কোনো উচ্চতর শক্তি ব্যক্ত হ'য়ে প্রকৃতিকে অধিগত করেছে তখন, এই সব সীমিত প্রবর্তক শক্তি সরে যায়, হ্রাস পায়, ধ্বংস হয়। একমাত্র আধ্যাত্মিক বা অতিমানসিক পরমাত্মা, দিব্য পরমপুরুষ, পরম ও সর্বগত সদ্-বস্তুই আমাদের অন্তঃস্থ প্রভু হওয়া চাই, আর চাই যে তিনিই যেন আমাদের চরম বিকাশ স্বচ্ছন্দে গঠন করেন আমাদের প্রকৃতির বিধানের সম্ভবপর সর্বাপেক্ষা উচ্চ, ব্যাপ্ত ও অখণ্ড বহিঃপ্রকাশ অনুযায়ী। পরিশেষে ঐ প্রকৃতি কাজ করে ষোড়শকল সত্য ও ইহার স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতার মধ্যে, কারণ ইহা একমাত্র পালন করে সনাতনের প্রদীপ্ত সামর্থ্যের নির্দেশ। জীবের আর কিছু পাবার থাকে না, পূরণের কোনো কামনাও থাকে না; সে হ'য়ে উঠেছে সনাতনের নৈর্ব্যক্তিকতার বা বিশ্বাত্মক ব্যক্তিসত্ত্বের অংশ। জীবনের মধ্যে দিব্য চিৎ-পুরুষের অভিব্যক্তি ও লীলা, এবং দিব্য লক্ষ্যের দিকে জগতের অগ্রগতিতে জগৎ পালন ও পরিচালনা করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করতে পারে না। মানসিক ভাবনা, মতামত, বচনা—এসব আর তার নয়, কারণ তার মন নিঃস্তব্ধ হ'য়ে পড়েছে, ইহা দিব্যজ্ঞানের আলোক ও সত্যের প্রবাহ প্রণালী মাত্র। তার চিৎ-পুরুষের বিশালতার পক্ষে আদর্শগুলি অতি সংকীর্ণ, অনন্তের মহাসমুদ্রই তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকে চালনা করে চিরকাল।

* * *

যে কেউ অকপটভাবে কর্মমার্গে প্রবেশ করে তার অবশ্য কর্তব্য হ'ল সেই পর্যায় পিছনে ফেলা যাতে প্রয়োজন ও কামনা আমাদের সব ক্রিয়ার প্রথম বিধান। কেন না যদি সে যোগের উচ্চ লক্ষ্য স্বীকার করে, তা হ'লে যে সব কামনা এখনো তার সত্তাকে কষ্ট দেয়, তার উচিত সে সবকে নিজ থেকে সরিয়ে আমাদের অন্তঃস্থ প্রভুর হাতে তুলে দেওয়া। পরমা শক্তি তাদের ব্যবহার করবেন সাধকের মঙ্গলের জন্য ও সকলের মঙ্গলের জন্য। বস্তুতঃ আমরা দেখি যে একবার এই সমর্পণ করা হ'লে—অবশ্য যদি বর্জন সর্বদাই অকপট হয়—অতীত প্রকৃতির এখনো বর্তমান সংবেগের বশে কিছুকাল কামনার অহমাত্মক তোষণের পুনরাবৃত্তি হতে পারে, কিন্তু তা হবে শুধু তার সঞ্চিত

বেগ নিঃশেষ করার জন্য এবং দেহধারী সত্তার যে অংশকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ তাকে অর্থাৎ তার স্নায়বিক, প্রাণিক ও ভাবপ্রবণ প্রকৃতিকে এই শিক্ষা দেবার জন্য যে অহমাত্মক কামনা মুক্তিকামী বা স্বীয় আদি দেব-প্রকৃতির অভীপ্সু অন্তঃপুরুষের বিধান নয়; আর এই শিক্ষা দেওয়া হয় কামনার সব প্রতিক্রিয়ার দ্বারা, ইহার ক্লেশ ও চাঞ্চল্যের দ্বারা যেগুলি অতীব তিক্ত লাগে তাদের বিপরীত যে উচ্চতর শান্তির প্রসন্ন মুহূর্তগুলি বা দিব্য আনন্দের অপরূপ সঞ্চরণ তাদের তুলনায়। পরে ঐ সব প্রচোদনার মধ্যকার কামনার উপাদান বাহিরে নিক্ষিপ্ত করা হবে বা অধ্যবসায়ের সহিত বাদ দেওয়া হবে তাকে অস্বীকার ও রূপান্তরসাধন করার অবিরাম চাপে। রাখা হবে একমাত্র তদের মধ্যকার শুদ্ধ কর্ম প্রবৃত্তি যার সমর্থনে থাকে ঊর্ধ্ব থেকে অনু-প্রাণিত বা আরোপিত সকল কর্ম ও ফলে সম আনন্দ আর তা থাকবে চরম সিদ্ধির সুখময় সমঞ্জস্যের মধ্যে। কাজ করা, ভোগ করা স্নায়বিক সত্তার সাধারণ বিধান ও অধিকার; কিন্তু ব্যক্তিগত কামনার দ্বারা ইহার ক্রিয়া ও ভোগ নির্বাচন করা শুধু ইহার অজ্ঞানময় সংকল্প, ইহার অধিকার নয়। নির্বাচন করবেন একমাত্র পরম ও বিশ্বজনীন সংকল্প; ক্রিয়ার পরিবর্তন দরকার ঐ সংকল্পের স্ফুরন্ত গতিবৃত্তিতে; ভোগের স্থলে আনা চাই শুধু আধ্যাত্মিক আনন্দের খেলা। সকল ব্যক্তিগত সংকল্প হয় উপর থেকে আসা এক সাময়িক নিয়োগ বা অজ্ঞানময় অসুরের অবৈধ আত্ম-সাৎ।

আমাদের অগ্রগতির দ্বিতীয় পর্যায় যে সামাজিক বিধান তা উন্নতির এক উপায়স্বরূপ; অহং-কে ইহার নিয়ন্ত্রণে আনা হয় যাতে ইহা এক বৃহত্তর সমষ্টিগত অহং-এর অধীন হ'য়ে আত্ম-সংযম শিখতে পারে।। এই বিধানের মধ্যে নীতির বিষয় কিছু না থাকতে পারে, হয়ত ইহা প্রকাশ করে সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন বা তার ধারণা অনুযায়ী তার বৈষয়িক মঙ্গল। অথবা হয়ত ইহা সেইসব প্রয়োজন ও সেই মঙ্গলই প্রকাশ করে তবে সেগুলিকে এক উচ্চতর নৈতিক বা আদর্শ বিধানের দ্বারা কিছু পরিবর্তিত, রঞ্জিত ও পরিবর্তিত ক'রে। যে ব্যক্তির বিকাশ চলছে কিন্তু যে এখনো সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নি তার পক্ষে সামাজিক কর্তব্য, পারিবারিক দায়, গোষ্ঠীগত বা জাতীয় দাবি হিসাবে এই সামাজিক বিধান পালন অবশ্য কর্তব্য যতদিন না ইহা এক পরতর ঋতের বর্ধিষ্ণু বোধের সংঘর্ষে আসে। কিন্তু ইহাকেও কর্ম-যোগের সাধক কর্মের প্রভুর কাছে সমর্পণ করবে। এই সমর্পণ করার পর তার সব সামাজিক সংবেগ ও সিদ্ধান্তকে ব্যবহার করা হবে,—তার সব কামনার মতোই,—শুধু তাদের নিঃশেষ করার জন্য অথবা যাতে সে তার নিম্নের মানসিক প্রকৃতিকে সমগ্র মানবজাতির বা মানবজাতির কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সব কাজে আশায় ও আস্পৃহায় এক করতে পারে সেজন্য তখনো দরকার থাকলে তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে কিছু সময়ের জন্য। কিন্তু এই স্বল্প

সময়ের পর তাদের সরিয়ে নেওয়া হবে, তখন দৃঢ়ভাবে বিরাজ করবে শুধু দিব্য প্রশাসন। ভগবানের সহিত ও অন্য সকলের সহিত সে এক হবে শুধু দিব্য চেতনার মাধ্যমে, মানসিক প্রকৃতির মাধ্যমে নয়।

কেন না মুক্ত হবার পরও সাধক জগতে থাকবে আর জগতে থাকার অর্থ কাজের মধ্যে থাকা। কিন্তু কামনাশূন্য হ'য়ে কাজে থাকার অর্থ সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য অথবা মানব বা জাতির অথবা পৃথিবীর উপর ক্রম-বিকশিত হবে এমন কোনো নতুন সৃষ্টির জন্য বা তার অন্তঃস্থ দিব্য সংকল্পের দ্বারা আরোপিত কোনো কর্মের জন্য কাজ করা। আর ইহা করা চাই,—হয় যে পরিবেশ বা সমাজের মধ্যে সে জন্মেছে বা স্থাপিত হয়েছে তার আবেষ্টনের মধ্যে অথবা এমন এক আবেষ্টনের মধ্যে যা তার জন্য নির্বাচন বা সৃষ্টি করা হ'য়েছে কোনো দিব্য নির্দেশে। সুতরাং যে মানব, গোষ্ঠী বা ভগবানের অন্য কোনো সমষ্টিগত প্রকাশকে চালনা, সাহায্য বা সেবা করার জন্য মনোময় পুরুষ অভিপ্রেত তার সহিত আমাদের সমবেদনা ও স্বচ্ছন্দ একাত্মতার বিরোধী বা নিবারণকারী কোনো কিছু তার মধ্যে থাকবে না আমাদের সিদ্ধির অবস্থাতে। কিন্তু পরিশেষে এই স্বচ্ছন্দ একাত্মতা গড়ে ওঠা চাই ভগবানের সহিত তাদাত্ম্যের মাধ্যমে, ইহা মিলনের এমন কোনো মানসিক বা নৈতিক বন্ধন নয় বা প্রাণিক সাহচর্য নয় যা কোনো ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতিগত, সম্প্রদায়গত বা ধর্মমতমূলক অহন্তার প্রভাবাধীন। যদি কোনো সামাজিক বিধান পালন করা হয় তা যে কোনো স্থূল প্রয়োজনের অথবা কোনো ব্যক্তিগত বা সাধারণ স্বার্থের বা সাময়িক সুবিধার জন্য বা পরিবেশের চাপে বা কর্তব্যবোধে করা হয় তা নয়, তা করা হয় একমাত্র কর্মের প্রভুর জন্য, আর এই কারণে যে অনুভব করা হয় বা জানা যায় যে ইহাই দিব্যসংকল্প যে সামাজিক বিধান বা বিধি বা সম্বন্ধ এখন যা আছে তাকে আন্তর জীবনের প্রতিরূপ হিসাবে এখনো রাখা যেতে পারে আর তা লঙ্ঘন ক'রে মানুষের মনকে বিক্ষুব্ধ করা উচিত নয়। অপর পক্ষে যদি কোনো সামাজিক বিধান বা বিধি বা সম্বন্ধ অগ্রাহ্য করা হয় তা-ও কামনা বা ব্যক্তিগত সংকল্প বা ব্যক্তিগত মতকে প্রশ্রয় দেওযার জন্য নয়, তা করা হবে এই কারণে যে পরম চিৎ-পুরুষের বিধান প্রকাশ করে এমন এক মহত্তর বিধি অনুভব করা হয় অথবা ইহা জানা যায় যে দিব্য সর্ব-সংকল্পের যাত্রার মধ্যে এমন এক গতিবৃত্তি আছে যার লক্ষ্য হ'লো জগতের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় এক আরো স্বচ্ছন্দ ও বৃহৎ জীবনের জন্য প্রচলিত সব বিধান ও রূপের পরিবর্তন, অতিক্রমণ বা বিলোপসাধন।

এখনো নৈতিক বিধান বা আদর্শ বিধানের কথা বাকী আছে; যারা নিজেদের স্বাধীন মনে করে, এমন কি তাদেরও অনেকের কাছে এইসব বিধান চির পবিত্র ও মানসিক ধারণার অতীত। কিন্তু সাধক তার দৃষ্টি সর্বদাই উচ্চশিখরের দিকে নিবদ্ধ রেখে এ সবকে সমর্পণ করে তাঁর কাছে যাঁকে

প্রকাশ করার জন্য সকল আদর্শ চেষ্টা করে অপূর্ণ ও খন্ড খন্ডভাবে; সকল নৈতিক গুণ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ও সীমাহীন পূর্ণতার দীন ও আড়ষ্ট বিকৃত অনুকরণ মাত্র। স্নায়বিক কামনা লোপের সাথে সাথে পাপ ও অশুভের বন্ধনেরও অবসান হয়; কারণ ইহা আমাদের প্রাণিক বেগ, প্রচোদনা ও প্রবৃত্তির তাড়নার অর্থাৎ রজোগুণের অন্তর্গত, আর প্রকৃতির ঐ গুণের রূপান্তরের সাথে সাথে ইহার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু আচারগত বা অভ্যাসগত অথবা মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা এমন কি কোনো উচ্চ বা নির্মল সাত্ত্বিক গুণের সোনালি বা স্বর্ণময় শৃঙ্খলে বাঁধা থাকাও অভীপ্সুর কর্তব্য নয়। তার স্থলে আসবে এমন কিছু যা মানুষ যাকে বলে সদ্‌গুণ (virtue) বলে সেই ক্ষুদ্র অপ্রচুর বিষয় অপেক্ষা আরো গভীর ও আরো মৌলিক। ইংরাজী পদটির আদি অর্থ ছিল "মনুষ্যত্ব" (manhood), ইহা নীতিগত মন ও তার রচিত বিষয় অপেক্ষা আরো অনেক বৃহৎ ও গভীর। কর্মযোগের চরম সিদ্ধি আরো এক উচ্চতর ও গভীরতর অবস্থা, ইহাকে হয়ত বলা যায় "অন্তঃপুরুষত্ব" ("Soulhood") কারণ অন্তঃপুরুষ মানুষ অপেক্ষা মহত্তর, মানুষী গুণের স্থলে আসবে স্বাধীন অন্তঃপুরুষত্ব যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হবে পরম সত্য ও প্রেমের সব কর্মে। কিন্তু এই পরম সত্যকে ব্যবহারিক যুক্তি-শক্তির ক্ষুদ্র গৃহে বাস করতে বাধ্য করা যায় না, অথবা যে বৃহত্তর ভাবনাপর যুক্তিশক্তি সীমিত মানুষী বুদ্ধির উপর তার সব প্রতিরূপ আরোপ করে শুদ্ধ সত্য ব'লে তার আরো সম্ভ্রমজনক যে সব অট্টালিকা এমন কি তাদের মধ্যেও পরম সত্যকে আটক রাখা যায় না। এই পরম প্রেমের অর্থ মানুষী আকর্ষণ, সমবেদনা ও অনুকম্পার আংশিক, দুর্বল, অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও ভাবাবেগ তাড়িত সব গতিবৃত্তি তো নয়ই ইহাদের সহিত তার যে কোনো সংগতি থাকবেই তা-ও নয়। ক্ষুদ্র বিধান বৃহত্তর গতিবৃত্তিকে বাঁধতে পারে না; অন্তঃপুরুষের চরম সার্থকতা সাধন সম্বন্ধে মনের আংশিক সিদ্ধি যে তার কোনো সর্ত আরোপ ক'রবে তা হ'তে পারে না।

প্রথমে পরতর প্রেম ও সত্য সাধকের মধ্যে ইহার গতিবৃত্তি সার্থক ক'রবে তার আপন প্রকৃতির মূল বিধান বা ধারা অনুযায়ী। কারণ তাহাই দিব্য প্রকৃতির বিশেষ দিক, পরমা শক্তির বিশেষ শক্তি যা থেকে তার অন্তঃপুরুষ বার হ'য়েছে লীলার মধ্যে তবে অবশ্য অন্তঃপুরুষ এই বিধান বা পথের কোনো রূপের মধ্যে সীমিত নয়, কারণ ইহা অনন্ত। কিন্তু তবু ইহার প্রকৃতিজাত উপাদানে সেই ছাপ থাকে, সেই সব ধারা অনুযায়ী স্বচ্ছন্দভাবে উপাদানের ক্রম-বিকাশ হয় বা তারই প্রবল প্রভাবের কম্বুরেখার পথে তা আবর্তিত হয়। সে দিব্য সত্যের গতিবৃত্তিকে ব্যক্ত ক'রবে জ্ঞানীর বা বীর-কেশরীর, বা প্রেমিক ও ভোক্তার বা কর্মী ও দাসের স্বভাব অনুসারে অথবা মূল গুণসকলের যে কোনো সমবায়ের আকারে যা তারই নিজস্ব

আন্তর প্রেরণা তার সত্তাকে দিয়েছে। তার সব কাজে এই আত্ম-প্রকৃতিরই স্বচ্ছন্দ খেলা লোকে দেখবে তার মধ্যে, কোনো নিম্নতর বিধি বা বাহিরের কোনো বিধানের দ্বারা গঠিত, নিরূপিত ও কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত কোনো আচরণ নয়।

কিন্তু এর চেয়েও পরতরা সিদ্ধি, আনন্ত্য আছে যার মধ্যে এমন কি এই শেষ গন্ডীও অতিক্রম করা হয়, কারণ প্রকৃতি চরম সার্থকতা পায়, তার সকল সীমারেখা লোপ পায়। সেখানে অন্তঃপুরুষ বাস করে সীমার বন্ধন রহিত হ'য়ে; কারণ সে সকল রূপ ও ছাঁচ ব্যবহার করে তার অন্তঃস্থ দিব্য সংকল্প অনুযায়ী, কিন্তু সে যে শক্তি বা রূপ ব্যবহার করে তাতে তার গতি রুদ্ধ হয় না, সে বাঁধা পড়ে না, তার মধ্যে সে আবদ্ধ থাকে না। ইহাই কর্মমার্গের চূড়ান্ত আর ইহাই কর্মের মধ্যে অন্তঃপুরুষের চরম স্বাধীনতা। বাস্তবিক-পক্ষে, সেখানে তার কোনো ক্রিয়া নেই; কারণ তার সকল কাজকর্মই পরাৎপরের ছন্দ এবং অপ্রতিহত স্বাধীনভাবে উৎসারিত হয় একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই অনন্তের মাঝ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতের মতো।

* * *

তা হ'লে কর্মযোগের পথ ও শেষ হ'ল—অহংগত প্রকৃতির সাধারণ কর্ম-প্রণালী সরিয়ে তার স্থলে এক পরম ও বিশ্বজনীন সংকল্পের নিকট আমাদের সকল ক্রিয়ার সমগ্র সমর্পণ, আমাদের অন্তঃস্থ শাশ্বত কিছুর প্রশাসনের নিকট আমাদের সকল কর্মের নিঃসর্ত ও মানাতীত সমর্পণ। কিন্তু এই দিব্য পরম সংকল্প কি আর কি ক'রেই বা আমাদের সব বিভ্রান্ত করণের ও আমাদের অন্ধ কারারুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে তাকে চেনা সম্ভব?

সাধাবণতঃ নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা এই যে আমরা বিশ্বের মধ্যে এক পৃথক "আমি", যা এক পৃথক দেহ ও মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতির শাসক, পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেই বেছে নেয় নিজের ইচ্ছানুযায়ী সব কাজ, অন্যের উপর নির্ভরশীল নয় এবং সেজন্য নিজের কাজের একমাত্র কর্তা ও ফলের জন্যও দায়ী সে। এই আপাতপ্রতীয়মান অহং ও তার সাম্রাজ্য ছাড়া আমাদের মধ্যে আরো সত্যকার, আরো গভীর ও শক্তিশালী কোনো কিছু যে কেমন ক'রে থাকতে পারে তা কল্পনা করা সাধারণ মনের পক্ষে, যে মন নিজের গঠন ও উপাদান সম্বন্ধে চিন্তাও করে নি, গভীরভাবে লক্ষ্যও করেনি তার পক্ষে সহজ নয়, এমন কি যে সব মন চিন্তা ক'রেছে কিন্তু যাদের কোনো আধ্যাত্মিক দর্শন ও অনুভূতি নেই তাদের পক্ষেও তা কল্পনা করা দুরূহ। কিন্তু বাহিরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভের পথের মতো আত্মজ্ঞান লাভের পথেরও প্রথম সোপান হ'লো বিষয়সমূহের আপাত সত্যের পিছনে গিয়ে তাদের সব বাহ্যরূপ যে প্রকৃত কিন্তু মুখোস দেওয়া মূল ও স্ফুরন্ত সত্য ঢেকে রাখে তা খুঁজে বার করা।

এই অহং বা "আমি" আমাদের মূল অংশ হওয়া দূরের কথা কোনো স্থায়ী সত্যও নয়; ইহা প্রকৃতির এক গঠন মাত্র, বিষয়গ্রাহী বিবেকী মনে মনন-কেন্দ্রীকরণের এক মানসিক রূপ, আমাদের প্রাণের বিভিন্ন অংশে বেদনা ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ কেন্দ্রীকরণের এক প্রাণিক রূপ, এমন শারীরিক সচেতন গ্রহণের রূপ যা আমাদের দেহের ধাতু ও ধাতুর ক্রিয়া কেন্দ্রীভূত করে। আন্তরভাবে আমরা যা সব তা অহং নয়, তা চেতনা, অন্তঃপুরুষ বা চিৎপুরুষ। বাহ্যতঃ ও উপরভাসাভাবে আমরা যা সব ও যা করি তা অহং নয়, প্রকৃতি। এক কার্যসাধিকা শক্তি আমাদের গঠন করে আর এইভাবে আমাদের যে স্বভাব, পরিবেশ বা মানসিকতা গঠিত হয় তাদের মধ্য দিয়ে, বিশ্বশক্তিসমূহের যে ব্যষ্টিভাবাপন্ন রূপায়ণ আমাদের তার মধ্য দিয়ে ইহা নির্ধারণ করে আমাদের সব কর্ম ও তাদের ফল। বস্তুতঃ আমরা চিন্তা করি না, বা সংকল্প করি না বা কাজ করি না, তবে চিন্তা আমাদের মধ্যে ঘটে, সংকল্প আমাদের মধ্যে ঘটে, সংবেগ ও কর্ম আমাদের মধ্যে ঘটে, আর প্রকৃতির এই সব কাজকর্মের প্রবাহকে আমাদের অহং-বোধ নিজের চারিদিকে একত্র করে আর নিজেকে মনে করে তাদের কারণ। যা মনন তৈরী করে, সংকল্প আরোপ করে, সংবেগ সঞ্চার করে তা বিশ্বশক্তি, প্রকৃতি। আমাদের দেহ, মন ও অহং সেই ক্রিয়ারও শক্তিসমূহের এক তরঙ্গ, তারা এই শক্তিকে শাসন করে না, বরং শক্তিই তাদের শাসন করে, চালনা করে। সত্য ও আত্ম-জ্ঞানের দিকে তার অগ্রগতির পথে সাধককে এমন এক স্থানে আসতে হবে যেখানে অন্তঃপুরুষ তার দর্শনের নেত্র খুলে অহং-এর এই সত্য, কর্মের এই সত্য স্বীকার করে। এক মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক "আমি" কাজ করে বা সব ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে—এই ভাবনা সে পরিহার করে, সে প্রণিধান করে যে যে প্রকৃতি, বিশ্ব-নিসর্গের শক্তি তার নির্দিষ্ট সব পদ্ধতি অনুসরণ করে—তাহাই তার মধ্যে ও সকল বিষয় ও জীবের মধ্যে একক ও একমাত্র কর্মী।

কিন্তু প্রকৃতির এইসব পদ্ধতি নির্দিষ্ট ক'রেছে কে? কে-ই বা শক্তি সঞ্চরণের উৎস ও শাসক? পিছনে এক চেতনা বা চিন্ময়সত্তা আছেন যিনি তার সকল কর্মের প্রভু, সাক্ষী, জ্ঞাতা, ভোক্তা, ধারক ও অনুমন্তা, এই চেতনাই পুরুষ। প্রকৃতি আমাদের মধ্যে ক্রিয়ার আকার দেয়; পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে বা পশ্চাতে থেকে সেই ক্রিয়া দেখেন, সম্মতি দেন, বহন ও ধারণ করেন। প্রকৃতি আমাদের মধ্যে মনন গঠন করে, পুরুষ তার মধ্যে বা পশ্চাতে থেকে সেই মনন ও তার মধ্যকার সত্য জানেন। প্রকৃতি ক্রিয়ার ফল নির্ধারণ করে, পুরুষ তার মধ্যে বা পশ্চাতে থেকে সেই আনন্দ বা কষ্ট ভোগ করেন। প্রকৃতি মন ও দেহ গঠন করে, তাদের নিয়ে কাজ করে, তাদের বিকাশ সাধন করে, পুরুষ এই গঠন ও বিবর্তনকে ধারণ করেন ও প্রকৃতির প্রতি ধাপ অনুমোদন করেন। প্রকৃতি সংকল্প-শক্তি প্রয়োগ করে আর ইহাই সকল বিষয় ও

মানুষের মধ্যে কাজ করে; এই সংকল্প-শক্তিকে পুরুষ কর্মে প্রবৃত্ত করেন কি করণীয় সে সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি বলে। এই পুরুষ আমাদের উপর-ভাসা অহং নয়, ইহা অহং-এর পশ্চাতে এক নীরব আত্মা, শক্তির উৎস, জ্ঞানের প্রবর্তক ও গ্রহীতা। আমাদের মানসিক আমি এই আত্মার এই শক্তির, এই জ্ঞানের এক মিথ্যা প্রতিবিম্ব মাত্র। সুতরাং এই পুরুষ বা অবলম্বনস্বরূপ চেতনাই প্রকৃতির সকল কর্মের কারণ, গ্রাহক ও অবলম্বন, কিন্তু নিজে কর্তা নয়। বিশ্বে যা কিছু করা হয় তার হেতু—সম্মুখে প্রকৃতি, নিসর্গ-শক্তি ও তার পশ্চাতে শক্তি, চিন্ময়ীশক্তি, পুরুষশক্তি, কেন না বিশ্বজননীর আন্তর ও বাহ্য আনন এই দুই। বিশ্ব জননী, প্রকৃতি-শক্তিই একক ও একমাত্র কর্মী।

পুরুষ-প্রকৃতি, চিৎ-শক্তি, প্রকৃতির সাথে তার অবলম্বন পুরুষ,—কারণ এই দুই তাদের বিচ্ছিন্নতাতেও এক ও অবিচ্ছেদ্য—যুগপৎ এক বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত শক্তি। কিন্তু জীবের মধ্যেও এমন কিছু আছে যা মানসিক অহং নয়, যা এই মহত্তর সদ্-বস্তুর সহিত স্বরূপে এক : ইহা অদ্বয় পুরুষের বিশুদ্ধ প্রতিবিম্ব বা অংশ ,ইহাই অন্তঃপুরুষ, পরম ব্যক্তি বা দেহধারী সত্তা, ব্যষ্টি আত্মা, জীবাত্মা; ইহাই সেই আত্মা যে মনে হয় তার শক্তি ও জ্ঞান সীমিত ক'রেছে এক বিশ্বাতীত ও বিশ্বজনীন প্রকৃতির ব্যষ্টি ক্রীড়াকে ধারণ করার জন্য। গভীরতম সত্য এই যে যিনি অনন্তবিধ এক তিনিই অনন্তবিধ বহু; আমরা যে শুধু তার প্রতিবিম্ব ও অংশ তা নয়, আমরা তা-ই; আমাদের অহং আমাদের বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত বিভাবের অন্তরায়, কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যষ্টিত্ব নয়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের মধ্যকার অন্তঃপুরুষ বা আত্মা প্রকৃতির মধ্যে ব্যষ্টিগঠনে আগ্রহী হ'য়ে অহং ভাবনা স্বীকার ক'রে স্বেচ্ছায় বিভ্রান্ত হয়েছে; তাকে এই অবিদ্যা দূর করতে হবে, জানতে হবে যে সে পরম ও বিশ্বাত্মক আত্মার প্রতিবিম্ব বা অংশ বা সত্তা আর জগৎ-ক্রিয়াতে তাঁর চেতনার এক কেন্দ্র মাত্র, আর কিছু নয়। কিন্তু যেমন অহং বা সাক্ষী ও জ্ঞাতার অবলম্বনস্বরূপ চেতনা কর্মের কর্তা নয়, এই জীব পুরুষও তেমন কর্মের কর্তা নয়। সর্বদাই বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক শক্তিই একমাত্র কর্ত্রী। কিন্তু তাঁর পিছনে আছেন অদ্বয় পরতম যিনি শক্তির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছেন পুরুষপ্রকৃতি, ঈশ্বরশক্তি * এই যুগল শক্তি

* ঈশ্বর শক্তি আর পুরুষপ্রকৃতি ঠিক এক নয়, কারণ পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক কিন্তু ঈশ্বর ও শক্তির প্রত্যেকেই অন্যের মধ্যে অবস্থিত। ঈশ্বর সেই পুরুষ যিনি প্রকৃতির আধার এবং শাসন করেন পুরুষের মধ্যস্থ শক্তির সামর্থ্যে। শক্তি সেই প্রকৃতি, যার মধ্যে পুরুষ বর্তমান, এই শক্তি কাজ করেন ঈশ্বরের সংকল্প বলে, এই সংকল্প তাঁর নিজেরই সংকল্প আর তিনি সর্বদাই তাঁর গতিবৃত্তিতে তাঁর সহিত বহন করেন ঈশ্বরের সান্নিধ্য। কর্মমার্গের সাধকের পক্ষে পুরুষ-প্রকৃতির উপলব্ধি তার সাধনায় প্রথম প্রয়োজনীয়, কারণ সচেতন পুরুষ ও ক্রিয়াশক্তির বিচ্ছিন্নতা এবং ক্রিয়াশক্তির কর্মপ্রণালীর নিকট পুরুষের বশ্যতা ইহারাই আমাদের অবিদ্যা ও অপূর্ণতার কার্যসাধক। কারণ; এই উপলব্ধি বলে

রূপে। পরতম স্ফুরন্ত হন শক্তিরূপে এবং তাঁর দ্বারাই তিনি হন বিশ্বে সকল কর্মের একমাত্র প্রবর্তক ও অধীশ্বর।

* * *

ইহাই যদি কর্মের সত্য হয় তা হ'লে সাধকের প্রথম কর্তব্য হ'লো কাজের বিভিন্ন অহমাত্মক রূপ থেকে সরে আসা এবং এক "আমি" কাজ করছে এই ভাব ত্যাগ করা। তার দেখা ও অনুভব করা চাই যে তার মধ্যে সব কিছুই ঘটে অধ্যাত্ম, মানসিক প্রাণিক ও জড়ীয় প্রকৃতির শক্তির দ্বারা চালিত তার সব মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রের নমনীয় চেতন. বা অবচেতন বা কখনো কখনো অতিচেতন স্বয়ংক্রিয়তার দ্বারা। তার উপরে এক ব্যক্তিসত্ত্ব আছে যা নির্বাচন ও সংকল্প করে. হার মানে আবার সংগ্রাম করে, প্রকৃতিকে সমর্থন বা তার উপর কর্তৃত্ব ক'রতে চেষ্টা করে, কিন্তু এই ব্যক্তিসত্ত্ব নিজেই প্রকৃতির এক রচনা, এবং তার এমন প্রভাবাধীন ও তার দ্বারা এমন তাড়িত ও নির্ধারিত যে ইহা স্বাধীন হ'তে পারে না। ইহা প্রকৃতির মধ্যে পরমাত্মার এক গঠন বা বহিঃপ্রকাশ. পরমাত্মার অপেক্ষা বরং প্রকৃতিরই এক আত্মা ইহা, পরমাত্মার প্রাকৃত ও গতিশীল সত্তা, তাঁর অধ্যাত্ম ও স্থায়ী সত্তা নয়, এক সাময়িক গঠিত ব্যক্তিসত্ত্ব. সত্যকার অমর পরম ব্যক্তি নয়। ঐ পরম ব্যক্তিই তার হওয়া চাই। তার অবশ্য কর্তব্য হ'লো—আন্তরভাবে শান্ত হ'য়ে বাহিরের সক্রিয় ব্যক্তিসত্ত্ব থেকে দ্রষ্টার মত বিচ্ছিন্ন থাকা এবং নিজের মধ্যে বিশ্বশক্তিরাজির খেলার বিভিন্ন পাক ও গতিবৃত্তির মধ্যে অন্ধের মতো নিবিষ্ট না হ'য়ে তা থেকে পিছনে সরে দাঁড়িয়ে সেই খেলার অর্থ উপলব্ধি করা। এইভাবে শান্ত, বিচ্ছিন্ন, আত্মসন্ধানী ও স্বীয় প্রকৃতির সাক্ষী হ'য়ে সে উপলব্ধি করে যে সে-ই ব্যষ্টিপুরুষ যে প্রকৃতির সব কাজ পর্যবেক্ষণ করে, তার সব ফলাফল শান্তভাবে গ্রহণ করে এবং তার বিভিন্ন ক্রিয়ার সংবেগের অনুমতি দেয় বা তা দেওয়া বন্ধ রাখে। বর্তমানে এই অন্তঃপুরুষ বা পুরুষ এক মৌন সম্মতিদাতা দ্রষ্টার বেশী কিছু নয়, হয়ত তার প্রচ্ছন্ন চেতনার চাপে সত্তার ক্রিয়া ও বিকাশ কিছু প্রভাবিত হয় কিন্তু প্রধানতঃ তার বিভিন্ন শক্তি বা তাদের কিছু অংশ সে বাহ্য ব্যক্তিসত্ত্বের কাছে ন্যস্ত করে অর্থাৎ বাস্তবিক-পক্ষে ন্যস্ত করে প্রকৃতির কাছে কারণ এই বাহ্য আত্মা প্রকৃতির প্রভু নয়, তার অধীন, "অনীশ"; কিন্তু একবার আচরণ উন্মোচিত হ'লে সে সক্ষম হয়

পুরুষ প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়া থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে স্বাধীন হ'তে পারে এবং প্রকৃতির উপর পেতে পারে এক প্রাথমিক আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণ। পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ ও ইহার অবিদ্যাময় ক্রিয়ার পশ্চাতে ঈশ্বরশক্তি দণ্ডায়মান, তিনিই এই ক্রিয়াকে কাজে লাগান বিবর্তনের উদ্দেশ্যে। ঈশ্বর-শক্তির উপলব্ধি বলে সম্ভব হয় এক পরতর স্ফুরত্তায়, দিব্য কর্ম-প্রণালীতে এবং এক অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে সত্তার সমগ্র ঐক্য ও সুসংগতিতে অংশ গ্রহণ।

তার অনুমোদন বা অস্বীকৃতিকে কার্যকরী ক'রতে, ক্রিয়ার অধীশ্বর হ'তে এবং অপ্রতিহত শক্তিতে প্রকৃতির রূপান্তরের নির্দেশ দিতে। এমন কি যদি দীর্ঘকাল পর্যন্ত পুরুষের বিনা সম্মতিতেই অভ্যস্ত গতিবৃত্তি চলতে থাকে শক্তির স্থায়ী সাহচর্য ও অতীত সঞ্চয়ের ফলস্বরূপ, এমন কি যে গতিবৃত্তি অনুমোদন করা হ'য়েছে প্রকৃতি যদি তা বারবার অস্বীকার করে পূর্বে তার এই অভ্যাস না থাকার দরুণ, তবু সে দেখতে পাবে যে শেষ পর্যন্ত তার সম্মতি বা অস্বীকারই জয়ী হয় আর প্রকৃতি নিজেকে ও তার কর্ম-প্রণালীকে পরিবর্তিত করে পুরুষের আন্তরদৃষ্টি বা সংকল্পের নির্দেশ অনুযায়ী পথে, তবে তা করে হয় ধীরে ধীরে অনেক বাধা দিয়ে, নয় তাড়াতাড়ি তার কারণ ও প্রবণতাগুলিকে নতুনের সহিত দ্রুত খাপ খাইয়ে। এইভাবে মানসিক সংযম বা অহমাত্মক সংকল্পের বদলে সে শিক্ষা করে আধ্যাত্মিক সংযম যার বলে সে তার মধ্যে যে সব প্রকৃতি-শক্তি কাজ করে সে সবের অধীশ্বর হয়, তাদের অচেতন যন্ত্র বা যন্ত্র-সদৃশ ক্রীতদাস নয়। তার ঊর্ধ্বে ও চারিদিকে আছেন পরমাশক্তি, বিশ্বজননী আর যদি তাঁর সব উপায় সম্বন্ধে তার সত্যকার জ্ঞান থাকে ও তাঁর মধ্যস্থিত দিব্য সংকল্পের নিকট সে প্রকৃত আত্ম-সমর্পণ করে তা হ'লেই সে তাঁর কাছ থেকে সব কিছুই পেতে পারে যা তার অন্তরতম পুরুষের প্রয়োজন ও অভীষ্ট। পরিশেষে সে জানতে পারে তার নিজের মধ্যকার ও প্রকৃতির মধ্যকার সেই সর্বোত্তম স্ফুরন্ত পরমাত্মাকে যিনি তার সকল দেখা ও জানার উৎস, অনুমোদনের উৎস, গ্রহণের উৎস ও বর্জনের উৎস। ইনিই প্রভু, পরতম সর্বভূতস্থিত এক, ঈশ্বর-শক্তি; আর জীবের অন্তঃপুরুষ ইঁহারই অংশ, তাঁর সত্তার এক সত্তা, তাঁর শক্তির এক শক্তি। কর্মের প্রভু যে সব বিভিন্ন উপায়ে জগতের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে তাঁর সংকল্প ব্যক্ত করেন ও সেসব সম্পাদন করেন বিশ্বাতীত ও বিশ্বজনীন শক্তির মাধ্যমে সেই সব উপায় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে আমাদের উন্নতির বাকী অংশ।

ঈশ্বর (প্রভু) তাঁর সর্বজ্ঞতায় দেখেন কি করা দরকার। এই দেখাই তাঁর সংকল্প, ইহা সৃজনক্ষম সামর্থ্যের এক রূপ, আর তিনি যা দেখেন সর্ব-চিন্ময়ী মা যিনি প্রভুর সহিত এক সে সব গ্রহণ করেন নিজের স্ফুরন্ত আত্মার মধ্যে এবং মূর্ত ক'রে তোলেন আর কার্যসাধিকা প্রকৃতি-শক্তি তা সম্পাদন করে তাঁদের সর্বক্ষম সর্বজ্ঞতার যন্ত্ররূপে। কিন্তু কি হবে ও সেহেতু কি করা চাই —এই সম্বন্ধে এই যে দর্শন তার উৎপত্তি ঈশ্বরেরই সত্তা থেকে, তা সরাসরি নিঝরিত হয় তাঁরই সৃষ্টির চেতনা ও আনন্দ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেমন আলো ঝরে সূর্য থেকে। প্রকৃতির ক্রিয়া ও উদ্দেশ্যের সত্য বা তার ন্যায্য দাবি দেখার জন্য আমাদের মরমানবের যে প্রয়াস ইহা তা নয়, কষ্ট ক'রে

আমাদের তা পাওয়া ইহা নয়। যখন ব্যষ্টি পুরুষ তার সত্তায় ও জ্ঞানে ঈশ্বরের সহিত পুরোপুরি এক হয় আর আদ্যাশক্তির, বিশ্বাতীতা জননীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে তখন আমাদেরও মধ্যে পরম সংকল্প উচ্চ দিব্যভাবে আসতে পারে এমন এক বিষয় হিসাবে যা প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হবেই আর হয়ও। তখন আর কোনো কামনা থাকে না, কোনো দায়িত্ব থাকে না, থাকে না কোনো প্রতিক্রিয়া; সব কিছু ঘটে ভগবানের শান্তি প্রসন্নতা আলো ও শক্তির মধ্যে যিনি আমাদের ধরে আছেন, ঢেকে আছেন ও অন্তরেও অধিষ্ঠিত।

তবে তাদাত্ম্যের দিকে সর্বোচ্চ অবস্থা পাবার পূর্বেও পরম সংকল্পের কিছুটা আমাদের মধ্যে ব্যক্ত হোতে পারে এক অবশ্যপালনীয় প্রচোদনা, এক ঈশ্বর চালিত কমরূপে; তখন আমরা কাজ করি এক স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির বলে কিন্তু অর্থ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আরো পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হয় শুধু পরে। অথবা ক্রিয়ার দিকে এক সংবেগ আসতে পারে চিদাবেশ বা বোধিরূপে তবে তা আসে মন অপেক্ষা বরং হৃদয় ও দেহে; এসময় এক কার্যকরী দৃষ্টি আসে কিন্তু সম্পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান তখনো স্থগিত থাকে আর যদি আদৌ আসে তা আসে পরে। কিন্তু ইহাও সম্ভব যে দিব্য সংকল্প অবতরণ করে সংকল্পের মধ্যে বা মননের মধ্যে এক প্রদীপ্ত একমাত্র আদেশ হিসাবে বা কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে এক সমগ্র বোধ বা বোধের অবিরাম স্রোতের রূপে অথবা তা আসে ঊর্ধ্ব থেকে এমন এক নির্দেশ রূপে যাকে অধস্তন সব অঙ্গ সার্থক করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যোগের অপূর্ণ অবস্থায় শুধু কোনো কোনো কাজ এই ভাবে করা যেতে পারে আর না হয় ঐভাবে এক সাধারণ ক্রিয়া হোতে পরে তবে তা হয় শুধু উন্নতি ও দীপ্তির সময়ে। কিন্তু যোগের পূর্ণ অবস্থায় সকল ক্রিয়াই এই প্রকৃতির হোয়ে ওঠে। বস্তুতঃ আমরা বর্ধিষ্ণু উন্নতির তিনটি অবস্থা পৃথক কোরে দেখতে পারি—প্রথম, ব্যক্তিগত সংকল্প মাঝে মাঝে বা প্রায়শঃই আলোকিত বা চালিত হয় তার অতীত এক পরম সংকল্প দ্বারা বা চিন্ময়ী শক্তিদ্বারা, পরে তার স্থলে অনবরত আসে ঐ দিব্য সামর্থ্য-ক্রিয়া এবং শেষে ইহার সহিত ব্যক্তিগত সংকল্প এক ও মগ্ন হোয়ে যায়। প্রথমটি সেই অবস্থা যখন আমরা তখনো বুদ্ধি, হৃদয় ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শাসনাধীন; ইহাদের কর্তব্য দিব্য প্রেরণা ও নির্দেশ সন্ধান করা বা তার জন্য অপেক্ষা করা, আর তারা সর্বদা তা খুঁজে পায় না বা গ্রহণ করে না। দ্বিতীয়টি সেই অবস্থা যখন মানুষী বুদ্ধির স্থলে উত্তরোত্তর আসে উচ্চ প্রভাস বা বোধিত আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মন, বাহ্য মানুষী হৃদয়ের স্থলে আসে আন্তর চৈত্য হৃদয়, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্থলে আসে পূত ও স্বার্থশূন্য প্রাণিক শক্তি। তৃতীয়টি সেই অবস্থা যখন আমরা এমনকি আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মন ছাড়িয়ে উঠি অতিমানসিক ভূমিসমূহে।

এই তিন অবস্থার সকলগুলিতে মুক্ত ক্রিয়ার মূল স্বভাব একই—প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রণালী, তবে তা আর অহং-এর মাধ্যমে বা তার জন্য নয়, তা পরম পুরুষের ইচ্ছাতে ও তাঁর আনন্দসম্ভোগের জন্য। আরো উচ্চ-স্তরে ইহা হোয়ে ওঠে অনপেক্ষ ও বিশ্বাত্মক পরতমের সত্য যা প্রকাশিত হয় ব্যষ্টি পুরুষের মাধ্যমে আর সম্পাদিত হয় সচেতনভাবে প্রকৃতির মাধ্যমে—তবে আমাদের মধ্যস্থ অপরা প্রকৃতির যে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ক্রিয়াশক্তি পদে পদে স্খলিত হয় ও সব কিছুকে বিকৃত করে তার দ্বারা ইহা আর অর্ধ-বোধের মাধ্যমে খর্ব বা বিকৃত ভাবে সম্পাদিত হয় না, ইহা সম্পাদিত হয় সর্বজ্ঞা বিশ্বাতীতা ও বিশ্বাত্মিকা জননীর দ্বারা। ঈশ্বর নিজেকে ও নিজের পরম প্রজ্ঞা ও শাশ্বত চেতনাকে আবৃত ক'রেছেন অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রকৃতি-শক্তির মাঝে আর এই শক্তিকে অনুমতি দেন ব্যষ্টি পুরুষকে তারই সহযোগে অহং-রূপে চালনা করার জন্য, এমনকি মহত্তর উদ্দেশ্য ও শুদ্ধতর আত্ম-জ্ঞানের জন্য মানুষের অর্ধ-আলোকিত অপূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃতির এই অবর ক্রিয়া প্রায়শঃই বলবতী হয়। আমাদের মধ্যে প্রকৃতির বিগত সব ক্রিয়ার শক্তি, তার বিগত বিভিন্ন রূপায়ণ, তার দীর্ঘদিনের বদ্ধমূল সব সাহচর্য,—এই সব কারণে সিদ্ধির জন্য আমাদের মানুষী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় বা অতি অসম্পূর্ণভাবে সফলতার দিকে অগ্রসর হয়; এক যথার্থ ও ঊর্ধ্বারোহী সাফল্যের পথে ইহা মোড় ফেরে কেবল তখনই যখন আমাদের চেয়ে এক মহত্তর জ্ঞান বা শক্তি আমাদের অবিদ্যার আবরণ ভেদ ক'রে আমাদের ব্যক্তিগত সংকল্পকে চালনা করে বা তার ভার নেয়। কারণ আমাদের মানুষী সংকল্প এমন এক বিপথে চালিত ইতঃস্ততঃ ভ্রাম্যমান কিরণ যা পরম সামর্থ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়েছে। এই অবর কর্মপ্রণালীর মধ্যে থেকে পরতর আলোক ও শুদ্ধতর শক্তির মধ্যে মন্থর উদ্বর্তনের সময়টিই সিদ্ধিপ্রয়াসী সাধকের পক্ষে মৃত্যুছায়ার উপত্যকা, ইহা এক ভয়ঙ্কর পথ, নানাপ্রকার পরীক্ষা, কষ্টভাগ, দুঃখ, অন্ধকার, পদস্খলন, প্রমাদ, প্রচ্ছন্ন গর্ততে পূর্ণ। এই অগ্নিপরীক্ষাকে সংক্ষিপ্ত ও লাঘব করার জন্য বা ইহাকে দিব্য আনন্দ দিয়ে ভেদ করার জন্য দরকার বিশ্বাস, দরকার ক্রমশঃ বেশী ক'রে মনের সমর্পণ সেই জ্ঞানের নিকট যা ভিতর থেকে নিজেকে আরোপ করে, আর সর্বোপরি দরকার সত্যকার আস্পৃহা এবং যথার্থ ও অবিচল ও অকপট অভ্যাস। গীতা বলে, "হৃদয়কে নৈরাশ্যমুক্ত কোরে অবিচলিত ভাবে যোগ অভ্যাস কর," কারণ যদিও পথের প্রথম অবস্থাতে আমরা পান করি আন্তর বিরোধ ও দুঃখকষ্টের চরম তিক্ত গরল, তবু এই পাত্রের শেষ আস্বাদন হোলো অমরত্ব-সুধার মাধুর্য, এক শাশ্বত আনন্দের মধুমদিরা।

নবম অধ্যায়

সমত্ব ও অহং-নাশ

নিঃশেষ আত্মোৎসর্গ, সম্পূর্ণ সমত্ব, নির্মম অহং-লোপ, নিজের অজ্ঞানাচ্ছন্ন সব ক্রিয়াধারা থেকে প্রকৃতির রূপান্তরকারী উদ্ধার—এইসব উপায়ে প্রস্তুত ও সিদ্ধ করা যায় দিব্য সংকল্পের নিকট সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতির সমর্পণ—সত্যকার সমগ্র ও অকুণ্ঠ আত্ম-দান। প্রথম প্রয়োজন হ'ল আমাদের সর্বকর্মে এক সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গভাব; পরাৎপরের নিকট এবং আমাদের মধ্যে ও সর্বভূতের মধ্যে ও বিশ্বের সকল কর্মপ্রণালীর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি অবস্থিত তাঁর নিকট যজ্ঞরূপে সকল কর্ম করার জন্য ঐ আত্মোৎসর্গভাব প্রথম হবে এক নিত্যজাগ্রত সংকল্প, পরে হবে সকল সত্তায় এক মজ্জাগত প্রয়োজন এবং সর্বশেষ ইহা হবে তার স্বয়ং-ক্রিয় তবে জীবন্ত ও সচেতন অভ্যাস, স্বপ্রতিষ্ঠ প্রবৃত্তি। এই যজ্ঞের বেদী হ'ল জীবন, আমাদের নৈবেদ্য হ'ল সর্বকর্ম; আর যে পরম দেবতাকে আমরা সর্ব কর্ম নিবেদন করি তিনি বিশ্বাতীত ও বিশ্বজনীন শক্তি ও সান্নিধ্য যাঁকে আমরা এ পর্যন্ত জানা বা দেখার চেয়ে বরং অনুভব করেছি বা যাঁর আভাস পেয়েছি। এই যজ্ঞ, এই আত্মোৎসর্গের দুটি দিক—প্রথম হ'ল কর্ম আর দ্বিতীয় হ'ল যে আন্তরভাবে ইহা করা হয় সেই আন্তরভাব, আমরা যা কিছু দেখি, চিন্তা বা অনুভব করি সে-সবেতেই কর্মাধ্যক্ষের প্রতি পূজার ভাব।

কর্ম প্রথম ঠিক করা হয় আমরা আমাদের অজ্ঞানতার মাঝে যে শ্রেষ্ঠ আলো পেতে পারি তার সাহায্যে। আমাদের ধারণায় ইহাই আমাদের করা উচিত। আমাদের কর্তব্যবোধ, বা মানুষ-ভাইদের প্রতি সমবেদনা, পরের মঙ্গল বা জগতের মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা বা এমন একজনের নির্দেশ যাঁকে আমরা মানুষী পরমগুরু ব'লে স্বীকার করি, যিনি আমাদের চেয়ে জ্ঞানী এবং সকল কর্মের যে অধীশ্বরকে আমরা বিশ্বাস করি অথচ যাঁকে আমরা এখনো জানি না তাঁর প্রতিভূ যিনি আমাদের কাছে—এই সবের মধ্যে যে কোনোটির দ্বারাই করণীয় কর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তৈরী হ'ক না কেন সকল ক্ষেত্রেই মূল নীতি এক। কর্মের মধ্যে থাকা চাই কর্মযজ্ঞের সার জিনিষ; এই সার হ'ল আমাদের "কর্মফলস্পৃহাত্যাগ", যে ফলের জন্য আমরা এখনো কর্ম করি তাতে সকল আসক্তি বর্জন। যতদিন আমরা ফলে আসক্তি নিয়ে কাজ করি, ততদিন যে যজ্ঞ নিবেদন হয় তা ভগবানের কাছে নয়, তা হয় আমাদের অহং-এর কাছে। আমরা হয়ত ভাবি তা নয়, কিন্তু তা

আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র, আদতে আছে অহমাত্মক তৃপ্তিসাধন ও অভিরুচি, কিন্তু তাদের ঢেকে রাখি ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা, আমাদের কর্তব্যবোধ, মানুষভাইদের জন্য সমবেদনা, অপরের বা জগতের মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা, এমন কি পরম অধীশ্বরের নির্দেশ পালন— এই সবের মুখোস দিয়ে, আর আমাদের প্রকৃতি থেকে কামনার মূলোচ্ছেদ করার জন্য আমাদের কাছে যে দাবি করা হয় তা চাপা দেবার জন্য এ সবকে ব্যবহার করি এক রমণীয় কিন্তু মিথ্যা যুক্তির আবরণ হিসাবে।

যোগের এই অবস্থায়, এমন কি যোগের সকল অবস্থাতেই যে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে অতন্দ্র মনোযোগ দিয়ে তা হ'ল কামনার এই রূপ, অহং-এর এই মূর্তি। যখন আমরা দেখতে পাই যে সে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে ও নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ ক'রছে তখন আমাদের নিরুৎসাহ হ'লে চলবে না, আমাদের উচিত তাকে তার সকল মুখোসের মধ্যে সযত্নে খুঁজে বার করা এবং কঠোর ভাবে তার প্রভাব দূর করা। এই পথে চলার জন্য আলোকদাত্রী মহতী বাণী হ'ল গীতার দৃঢ় মহাবাক্য— "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—শুধু কর্মেই তোমার অধিকার কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তার ফলে তোমার অধিকার নেই। কর্মফলের অধিকার একমাত্র কর্মের ঈশ্বরের; ফলের সহিত আমাদের সম্বন্ধ শুধু সযত্নে প্রকৃত ক্রিয়ার দ্বারা সাফল্য প্রস্তুত করা আর যদি তা আসে তা নিবেদন করা দিব্য অধীশ্বরের নিকট। ইহার পর দরকার ফলে আসক্তি ত্যাগের মতো কর্মেও আসক্তি ত্যাগ; আমাদের এমন প্রস্তুত হওয়া চাই যে অধীশ্বরের সুস্পষ্ট আদেশ পেলে আমরা যেন যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কর্ম, পথ বা কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন ক'রে নিতে পারি অন্য কর্ম, পথ বা ক্ষেত্র অথবা পরিত্যাগ ক'রতে পারি সকল কর্মই। তা না হ'লে আমাদের কাজ করা তাঁর জন্য হয় না, তা হয় কর্মে আমাদের তৃপ্তি ও সুখ আছে বোলে বা সক্রিয়া প্রকৃতির কর্মের প্রয়োজনবশে বা আমাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য; কিন্তু এ সবই অহং-এর আবাস ও আশ্রয়স্থল। আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রার জন্য এগুলি যতই প্রয়োজনীয় হ'ক না কেন, অধ্যাত্ম চেতনা বৃদ্ধিতে তাদের ত্যাগ ক'রে তাদের বদলে আনা চাই তাদের সব দিব্য প্রতিরূপ ঃ অনালোকিত প্রাণিক তৃপ্তি ও সুখকে দূরে নিক্ষেপ ক'রবে বা তাদের স্থানে আসবে আনন্দ, এক নৈর্ব্যক্তিক ও ভগবদ্-প্রেরিত আনন্দ, সক্রিয় প্রয়োজনের স্থানে আসবে দিব্য ক্রিয়া-শক্তির এক উল্লাসভরা প্রেরণা; প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা আর কোনো উদ্দেশ্য হবে না বা তার প্রয়োজনও থাকবে না, তার পরিবর্তে আসবে মুক্ত পুরুষ ও প্রদীপ্ত প্রকৃতির স্বাভাবিক স্ফুরন্ত সক্রিয় সত্যের মধ্যে দিয়ে দিব্য সংকল্পের পরিপূরণ। পরিশেষে যেমন হৃদয় থেকে কর্মফলে ও কর্মেও আসক্তি দূর করা হ'য়েছে তেমন আমরা কর্মের কর্তা বোলে আমাদের

ভাবনায় ও বোধে আমাদের যে শেষ আসক্তি তখনো আঁকড়ে থাকে তা-ও ত্যাগ করা চাই ঃ আমাদের ঊর্ধ্বে ও অন্তরে দিব্যশক্তিকে জানতে ও অনুভব ক'রতে হবে যে প্রকৃত ও একমাত্র কর্মী তিনিই।

*   *   *

কর্মে ও কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ থেকেই শুরু হয় এক বিশাল যাত্রা যার লক্ষ্য মনে ও অন্তঃপুরুষে একান্ত সমত্ব, আর যদি আমরা সিদ্ধ হ'তে চাই চিৎ-পুরুষের মধ্যে তা হ'লে সেই সমত্ব এমন হওয়া চাই যা সব কিছুকে ঢেকে রাখে। কারণ কর্মের অধীশ্বরের পূজার জন্য আমাদের আবশ্যক তাঁকে আমাদের মধ্যে, সর্ববিষয়ে ও সকল ঘটনায় সুস্পষ্ট ভাবে চেনা ও আনন্দের সহিত স্বীকার করা। সমত্ব এই আরাধনার চিহ্ন ঃ ইহাই অন্তঃপুরুষের ভূমি যার উপর সত্যকার যজ্ঞ ও পূজা করা সম্ভব। ঈশ্বর সর্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান; আপন ও পর, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, মিত্র ও শত্রু, মানুষ ও পশু, সাধু ও পাপী—এদের মধ্যে কোনো মৌলিক ভেদ করা আমাদের উচিত নয়। কারো প্রতি আমাদের ঘৃণা বা অবজ্ঞা থাকবে না, কারুর দিকে থেকেই আমরা মুখ ফিরিয়ে নেব না; কারণ সকলেরই মধ্যে আমাদের দেখা চাই পরম এককে যিনি তাঁর ইচ্ছামতো ভিন্নবেশ ধারণ করেন বা অভিব্যক্ত হন। কোথাও তিনি স্বল্প প্রকট, কোথাও বা বেশী প্রকট, অন্য কোথাও বা সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ বিকৃত; এরকম তিনি হন তাঁর ইচ্ছামতো এবং ইহাদের মধ্যে যে রূপ গ্রহণ করা ও ইহাদের প্রকৃতিতে কাজের মধ্যে যা করা তাঁর অভিপ্রায় তার পক্ষে যা সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর তার জ্ঞান অনুযায়ী। সকলই আমাদের আত্মা—এক আত্মা যিনি বহু আকার ধারণ ক'রেছেন। কোনো এক স্তরে ঘৃণা ও দ্বেষ, অবজ্ঞা ও তৃষ্ণা, মোহ, আসক্তি ও অভিরুচি স্বাভাবিক, প্রয়োজনীয় ও অবশ্যম্ভাবী ঃ প্রকৃতি আমাদের মধ্যে যা নির্বাচন করে তার পরিপোষক এই সব বা এই সব সেই নির্বাচন গঠন ও রক্ষণের সহায়ক। কিন্তু কর্মযোগীর কাছে ইহারা পুরাতনের শেষ জের, পথের বাধা, অবিদ্যার ধারা আর তার উন্নতির সাথে সাথে তার প্রকৃতি থেকে তারা খসে পড়ে। শিশু অন্তঃপুরুষের বৃদ্ধির জন্য এ সবের প্রয়োজন থাকে কিন্তু দিব্য সাধনায় যারা পরিণত তাদের কাছ থেকে এ সব চলে যায়। যে ভগবদ-প্রকৃতিতে আমাদের উন্নীত হওয়া চাই তার মধ্যে বজ্রতুল্য, এমন কি ধ্বংসসাধক কঠোরতা থাকা সম্ভব কিন্তু সম্ভব নয় ঘৃণা থাকা, দিব্য ব্যঙ্গ থাকতে পারে কিন্তু অবজ্ঞা নয়, শান্ত, স্বচ্ছদর্শী ও শক্তিশালী বর্জন থাকতে পারে কিন্তু জুগুপ্সা ও দ্বেষ নয়। এমন কি যা আমাদের ধ্বংস করতে হবে আমাদের কর্তব্য তা-কেও না ঘৃণা করা বা ইহা যে সনাতনেরই এক ভিন্নবেশী সাময়িক গতিবৃত্তি তা চিনতে না ভুল করা।

এবং যেহেতু সকল বিষয়ই এক পরমাত্মা তার অভিব্যক্তি বিভাবে, সেহেতু কুৎসিৎ ও সুন্দর, বিকলাঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ, মহৎ ও নীচ, প্রীতিকর ও অপ্রীতি-

কর, শুভ ও অশুভ সবেতেই আমাদের থাকা চাই অন্তঃপুরুষের সমত্ব। এখানেও কোনো ঘৃণা, অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা থাকবে না, বরং এসবের স্থলে থাকবে সেই সমদৃষ্টি যা সব বিষয়কেই দেখে তারা আসলে যা সেইভাবে এবং তাদের নির্দিষ্ট স্থানে। কারণ আমরা জানব যে সকল বিষয়ই প্রকাশ করে বা প্রচ্ছন্ন রাখে, বিকশিত বা বিকৃত করে ভগবানেরই এমন কোনো সত্য বা তথ্য, কোনো ক্রিয়া-শক্তি বা যোগ্যতা যা উত্তরোত্তর অভিব্যক্তির মধ্যে নিজের উপস্থিতির দ্বারা বিষয়সমূহের বর্তমান সমষ্টির সমগ্রতার পক্ষে এবং অন্তিম ফলের পূর্ণতার জন্য—উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়, আর তারা তা করে তাদের জন্য অভিপ্রেত পরিবেশের মধ্যে, তাদের প্রকৃতির অব্যবহিত অবস্থা বা ক্রিয়া বা ক্রমবিকাশের পক্ষে সম্ভবপর প্রণালীতে যথাসম্ভব সুচারুরূপে অথবা অপরিহার্য কোনো ত্রুটি সমেত। সেই সত্যকেই আমাদের অন্বেষণ ক'রে আবিষ্কার চাই অনিত্য প্রকাশের মধ্যে বাহ্যরূপে, বহিঃপ্রকাশের ন্যূনতা বা বিকৃতিতে নিবৃত্ত না হ'য়ে আমরা তখন পূজা করতে পারি ভগবানকে যিনি তাঁর মুখোসের অন্তরালে চিরনির্মল, চিরশুদ্ধ, চিরসুন্দর ও চিরপূর্ণ। বস্তুতঃ সব কিছুরই পরিবর্তন দরকার, যা কুৎসিৎ তাকে গ্রহণ করা নয়, নিতে হবে দিব্য সৌন্দর্যকে, অপূর্ণতাতে থেমে থাকলে চলবে না, পূর্ণতার জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে, পরম শিবকেই করা চাই সার্বজনীন লক্ষ্য, অশুভকে নয়। তবে আমরা যা করি তা করা চাই আধ্যাত্মিক বোধ ও জ্ঞানের দ্বারা আর দিব্য শিব, সুন্দর, পূর্ণতা, সুখকেই আমাদের অনুসরণ করা চাই, এ সবের কোনো মানুষী মান নয়। যদি আমাদের সমত্ব না থাকে, তা হ'লে বুঝতে হবে যে এখনো অবিদ্যা আমাদের পথের অনুচর, প্রকৃতপক্ষে আমরা কিছুই বুঝব না, আর খুব সম্ভব আমরা পুরাতন অপূর্ণতাকে বিনষ্ট ক'রে সৃষ্টি ক'রব অন্য অপূর্ণতা ঃ কারণ আমরা দিব্য মূল্যের স্থলে আনছি আমাদের মানুষী মনের ও কাম-পুরুষের মূল্যায়নকে।

সমত্বের অর্থ যে এক নতুন অজ্ঞান বা অন্ধতা তা নয়; দৃষ্টির ধূসরতা ও সকল বর্ণের অবসান সমত্বের কাম্য নয়, আর তা আনার প্রয়োজনও নেই। পার্থক্য আছে, প্রকাশের বৈচিত্র্য আছে আর এই বৈচিত্র্যের তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি ক'রব; আংশিক ও প্রমাদশীল প্রেম ও ঘৃণা, প্রশংসা ও অবজ্ঞা, সমবেদনা ও বিদ্বেষ, আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণা—এসবের দ্বারা যখন আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকত তখন যা উপলব্ধি করা সম্ভব হ'ত তার চেয়ে আরো সঠিক ভাবে বৈচিত্র্যের তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব হবে। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের পশ্চাতে আমরা সর্বদাই দেখব তার মধ্যে অধিষ্ঠিত পরম পূর্ণকে ও অক্ষরকে, আর কোনো বিশেষ অভিব্যক্তি আমাদের মানুষী মানের পক্ষে সুসংগত ও পূর্ণ হ'ক বা অমার্জিত ও অসম্পূর্ণ হ'ক বা এমন কি তা মিথ্যা ও অশুভ হ'ক আমরা তার জ্ঞানময় উদ্দেশ্য ও দিব্য প্রয়োজন অনুভব করব, জানব,

অথবা তা যদি আমাদের কাছ থেকে লুকান থাকে তাহ'লে অন্ততঃ তাতে বিশ্বাস রাখব।

আবার সেই রকম, মন ও অন্তঃপুরুষের একই সমত্ব আমরা পাব সকল ঘটনাতেই—অর্থাৎ দুঃখ বা সুখ, পরাভব ও সাফল্য, সম্মান ও অপমান সুযশ ও অপযশ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সবেতেই। কারণ সকল ঘটনাতেই আমরা দেখব সকল কর্ম ও ফলের অধীশ্বরের সংকল্প, ভগবানের ক্রম-বিকাশমান বহিঃপ্রকাশের মধ্যে একটি ধাপ। যাদের আন্তর নেত্র আছে—আর ইহাই তো দেখে—তাদের কাছে তিনি নিজেকে ব্যক্ত করেন যেমন সর্ব বিষয়ে ও সর্বভূতে, তেমন বিভিন্ন শক্তিতে ও তাদের লীলা ও পরিণামে। সব কিছুই চলেছে এক দিব্য ঘটনার দিকে; প্রতি অনুভূতিই—যেমন সুখ ও তৃপ্তি, তেমন কষ্টভোগ ও অভাব এক বিশ্ব-গতিবৃত্তির পরিচালনায় এক প্রয়োজনীয় সংযোগ আর আমাদের কাজ হ'ল এই গতিবৃত্তিকে প্রণিধান করা ও সাহায্য করা। বিদ্রোহ করা, নিন্দা করা; প্রতিবাদ করা—এসব আমাদের অসংশোধিত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন সহজাত প্রবৃত্তির সংবেগ। অন্য সব কিছুর মতো এই লীলার মধ্যে বিদ্রোহেরও উপকারিতা আছে আর এমন কি দিব্য বিকাশের জন্য তার নিজের সময়ে ও স্তরে ইহা আবশ্যক, সহায়কর ও ভগবদ্-নির্দিষ্ট। কিন্তু অজ্ঞানবশে বিদ্রোহ করা হয় অন্তঃপুরুষের শৈশবাবস্থায় বা তার অপরিণত যৌবনাবস্থায়। পরিণত অন্তঃপুরুষ নিন্দা করে না, সে চায় বুঝতে ও জয় করতে, সে প্রতিবাদ করে না, বরং গ্রহণ করে বা তার উন্নতি ও পূর্ণতাসাধনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ করে না বরং সে চেষ্টা করে তা পালন ক'রতে, সার্থক ও রূপান্তরিত ক'রিত। অতএব আমরা পরম অধীশ্বরের কাছ থেকে সকল বিষয়ই গ্রহণ ক'রব অন্তঃপুরুষের সমত্ব সহ। দিব্য বিজয়মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত আমরা সাফল্যেরই মতো বিফলতাকেও গ্রহণ করব শান্তভাবে জয়যাত্রার পথ হিসাবে। যদি দিব্য বিধান অনুসারে তীক্ষ্ণতম দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা আসে তা হ'লে আমাদের অন্তঃপুরুষ, মন ও দেহ সে সবে অবিচলিত থাকবে, আবার তীব্রতম সুখ ও হর্ষেও তারা অভিভূত হবে না। এইভাবে সব দোটানা জয় ক'রে একান্ত অবিচলিত থেকে আমরা আমাদের পথে অগ্রসর হ'তে থাকব দৃঢ়ভাবে, সর্ববিষয়কেই দেখব সম স্থিরতা সহ যতদিন না আমরা প্রস্তুত হই আরো উন্নত অবস্থার জন্য ও প্রবেশ ক'রতে পারি পরম ও বিশ্বজনীন আনন্দে।

* * *

সুদীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষা ও সহিষ্ণুতার সহিত আত্ম-সংযম শিক্ষা বিনা এই সমত্ব লাভ হয় না; যতদিন কামনা প্রবল থাকে ততদিন তার সাময়িক উপশম ও অবসন্নতার মুহূর্তগুলি ছাড়া সমত্ব আসা আদৌ সম্ভব নয়; আর তখনো যা আসে তা সত্যকার স্থিরতা ও বাস্তব আধ্যাত্মিক একত্ব অপেক্ষা বরং

অসাড় উদাসীনতা বা নিজ থেকে কামনার প্রতিনিবৃত্তি হওয়াই বেশী সম্ভব। উপরন্তু এই আত্ম-সংযম বা চিৎ-পুরুষের সমত্বে বিকশিত হওয়ার প্রয়োজনীয় কাল ও পর্যায় আছে। সাধারণতঃ আমাদের আরম্ভ ক'রতে হয় তিতিক্ষার পর্ব দিয়ে; কারণ আমাদের দরকার সকল সংস্পর্শের সম্মুখীন হওয়া, সে-সব সহ্য ক'রে ভোগ করা এবং নিজেদের অংগীভূত করা। আমাদের প্রতি স্নায়ুকে শিক্ষা দিতে হবে যে ইহা যেন কষ্টকর বা বিতৃষ্ণাজনক কোনো কিছু থেকে পালিয়ে না আসে, সুখকর ও লোভনীয় কিছুর দিকে সাগ্রহে ছুটে না যায় বরং ইহা যেন সে সব স্বীকার করে আর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের সহ্য ও জয় করে। আমাদের এমন সবল হওয়া দরকার যেন আমরা সক্ষম হই সকল স্পর্শ সহ্য ক'রতে, যেগুলি যথার্থতঃ আমাদের ও ব্যক্তিগত শুধু সেগুলি নয়, অপর সেই সব স্পর্শও সহ্য ক'রতে যে সব আমাদের চারিদিক-কার, উপরের বা নীচের বিভিন্ন জগৎ ও তাদের অধিবাসীদের প্রতি সম-বেদনা বা সংঘর্ষপ্রসূত। ধীরস্থিরভাবে আমরা সহ্য করব আমাদের উপর মানুষ ও বিষয় ও শক্তিসমূহের ক্রিয়া ও আঘাত, দেবতাদের চাপ ও অসুরদের আক্রমণ; অন্তঃপুরুষের অনন্ত অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে যা সবের আসা সম্ভব সে সবেরই মুখোমুখি হ'য়ে তাদের ডুবিয়ে দেব আমাদের চিৎ-পুরুষের অক্ষুব্ধ সমুদ্রে। ইহাই সমত্ব সাধনের কঠোর তিতিক্ষার অবস্থা, ইহার একেবারে আদি পর্ব কিন্তু তবু ইহাই তার শৌর্য পর্ব। কিন্তু দেহ, হৃদয় ও মনের এই অবিচলিত তিতিক্ষাকে দৃঢ় করা চাই দিব্য সংকল্পের নিকট আধ্যাত্মিক প্রপত্তির এক স্থায়ী বোধ দ্বারা; এই জীবন্ত মাটির কর্তব্য হ'ল যে দিব্য হস্ত তার সিদ্ধির জন্য আয়োজন করছেন তাঁর স্পর্শের কাছে শুধু কঠোর বা সাহসিক মৌন সম্মতি সহ ধরা দেওয়া নয়, চাই কষ্টভোগের মধ্যেও সজ্ঞানে বা বিনা ক্ষোভে ভগবদ্-বিধান শিরোধার্য করা। ভগবদ্-প্রেমিকের জ্ঞানময়, ভক্তিপূর্ণ বা এমন কি কোমল তিতিক্ষাও সম্ভব আর অবিশ্বাসীর শুধু আত্মনির্ভরশীল যে তিতিক্ষায় ভগবদ্-আধার অতিরিক্ত মাত্রায় কঠিন হ'য়ে উঠতে পারে তার চেয়ে শ্রেয়স্কর ভগবদ্-প্রেমিকের ঐসব তিতিক্ষা। ভগবদ্-প্রেমিকের তিতিক্ষা এমন এক ক্ষমতা গড়ে তোলে যা প্রজ্ঞা ও প্রেম উভয়ই পেতে সমর্থ; ইহার স্থৈর্য এমন এক গভীর হৃদয়স্পর্শী স্থিরতা যা সহজেই পরিণত হয় আনন্দে। এই নীতি ও তিতিক্ষার পর্যায়ে যা লাভ হয় তা হ'ল অন্তঃপুরুষের এমন ক্ষমতা যা সকল অভিঘাত ও সংস্পর্শ সহ্য করতে সক্ষম।

ইহার পর হ'ল উচ্চাসীন নিরপেক্ষতা ও উপেক্ষার পর্ব যখন অন্তঃ-পুরুষ অত্যধিক উল্লাস ও অবসাদশূন্য হ'য়ে যেমন মুক্তি পায় দুঃখ ও কষ্ট-ভোগের যন্ত্রণাময় তামস পাশ থেকে তেমন নিস্তার পায় সুখের অধীরতার ফাঁদ থেকে। সকল বিষয় ও ব্যক্তি ও শক্তিকে, নিজের ও তেমন অপরেরও

সকল মনন ও বেদনা ও ইন্দ্রিয়সংবিৎকে এমন এক চিৎ-পুরুষ ঊর্ধ্বে থেকে দেখে যা সর্বদাই অক্ষয় ও অক্ষর, এ সব বিষয়ের দ্বারা অবিক্ষুব্ধ। ইহাই সমত্ব সাধনের দার্শনিক পর্ব—এক বিশাল ও মহান উদ্যম। কিন্তু উপেক্ষা যেন কখনই না হ'য়ে দাঁড়ায় ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা থেকে এক অসাড় বিমুখতা; আবার তার পরিণতি যেন না হয় ক্লান্তি, বিরক্তি, ও বিরাগজনিত বিতৃষ্ণা, ব্যর্থ বা অতিতৃপ্ত কামনার প্রতিক্ষেপ, অথবা উচ্চণ্ড আবেগের লক্ষ্য থেকে প্রতিহত হয়েছে এমন বিফলকাম ও অসন্তুষ্ট অহং-ভাবের ক্ষোভ। অপরিণত অন্তঃপুরুষে এই সব প্রতিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী, আর অধীর কামনাতাড়িত প্রাণিক প্রকৃতিকে নিরুৎসাহ ক'রে তারা হয়ত উন্নতির এক প্রকার সহায় হয়, কিন্তু যে সিদ্ধি আমাদের সাধনার লক্ষ্য এসব তা নয়। যে উপেক্ষা বা নিরপেক্ষতার জন্য আমাদের সাধনা করা দরকার তা হ'ল বিষয়সমূহের বিভিন্ন সংস্পর্শে ঊর্ধ্বে উচ্চাসীন অন্তঃপুরুষের শান্ত শ্রেষ্ঠতা*; এ সবকে সে দেখে আর হয় গ্রহণ করে বা বর্জন করে কিন্তু বর্জন করেও চঞ্চল হয় না বা গ্রহণ ক'রেও তাদের অধীন হয় না। সে বোধ ক'রতে শুরু করে যে সে নিজে এমন এক নীরব পরমাত্মা ও পরম চিৎ-পুরুষের সমীপস্থ, সদৃশ ও তাঁর সহিত এক যিনি স্বপ্রতিষ্ঠ ও যিনি প্রকৃতির বিভিন্ন কর্মধারা ধারণ ও সম্ভব ক'রেও সে সব থেকে পৃথক, আর এমন এক অচঞ্চল শান্ত সদ্‌বস্তুর অংশ বা তার মধ্যে নিমগ্ন যা বিশ্বের গতি ও ক্রিয়ার অতিস্থিত। উচ্চ অতিস্থিতির এই সময়ের লাভ হ'ল অন্তঃপুরুষের এমন প্রশান্তি যা জগৎক্রিয়ার সুখময় ক্ষুদ্র তরঙ্গে অথবা ঝড়ে বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গেও অটল ও স্থির থাকে।

যদি আমরা আন্তর পরিবর্তনের এই দুই পর্যায় পার হতে পারি কোথাও নিবৃত্ত বা নিবিষ্ট না হ'য়ে, তা হ'লে আমরা এমন এক দিব্য সমত্বের মধ্যে প্রবেশ করি যাতে পাওয়া যেতে পারে অধ্যাত্ম উদ্দীপনা ও আনন্দের শান্ত প্রবেগ, সিদ্ধ অন্তঃপুরুষের এমন উল্লাসভরা সমত্ব যা সব কিছু বোঝে ও সব কিছু অধিকার করে, তার সত্তার এক প্রগাঢ় ও সমান সর্বগ্রাহী ব্যাপ্তি ও পূর্ণতা। ইহাই পরম পর্ব ও সেখানে পৌঁছাবার পথ হ'ল ভগবান ও বিশ্বজননীর কাছে সমগ্র আত্মদানের আনন্দের মধ্য দিয়ে। কারণ তখন ক্ষমতা ভূষিত হয় সুখময় আধিপত্যের বিজয় মুকুটে, প্রশান্তি গভীর হ'য়ে পরিণত হয় পরমানন্দে, দিব্য স্থিরতার অধিকার উন্নীত হ'য়ে পরিণত হয় দিব্য সঞ্চরণ লাভের প্রতিষ্ঠাভূমিতে। কিন্তু এই মহত্তর সিদ্ধি আসবার পূর্বে দরকার,—অন্তঃপুরুষের যে নিরপেক্ষ উদাসীনতা ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নে বিভিন্ন রূপ ও ব্যক্তিভাবনা ও গতিবৃত্তি ও শক্তির প্রবাহকে নিরীক্ষণ করে তার পরিবর্তন, ইহাকে পরিবর্তিত হ'তে হবে সবল ও শান্ত প্রপত্তির ও

* উদাসীন

শক্তিশালী ও প্রগাঢ় আত্ম-সমর্পণের নতুন বোধে। এই প্রপত্তি তখন আর আনতশির সম্মতি হবে না, তা হবে সানন্দ গ্রহণ, তখন আর এ বোধ থাকবে না যে আমি কষ্ট পাচ্ছি বা বোঝা বইছি বা অপরের দুঃখের ভার নিচ্ছি; প্রেম ও আনন্দ ও আত্ম-দানের সুখই তার সমুজ্জ্বল বুনন। আর এই সমর্পণও শুধু সেই দিব্য সংকল্পের নিকট হবে না যা আমরা বুঝতে পারি, স্বীকার করি ও পালন করি, তা হবে আবার সংকল্পের মধ্যে এক দিব্য প্রজ্ঞার নিকট যা আমরা প্রণিধান করি এবং তার মধ্যে এক দিব্য প্রেমের নিকট যা আমরা অনুভব করি ও উল্লাসের সহিত যার অধীন হই; এই প্রজ্ঞা ও প্রেম হ'ল আমাদের ও সকলের সেই পরম চিৎ-পুরুষ ও পরমাত্মার প্রজ্ঞা ও প্রেম যাঁর সহিত আমরা স্থাপন করতে পারি সুখময় ও পরিপূর্ণ ঐক্য। জ্ঞানীর দার্শনিক সমত্বের শেষ কথা হ'ল নিঃসংগ সামর্থ্য, প্রশান্তি ও নিঃস্তব্ধতা, কিন্তু অখণ্ড উপলব্ধির অধিকারী অন্তঃপুরুষ নিজের এই আত্ম-সৃষ্ট অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে প্রবেশ করে সনাতনের অনাদি অনন্ত নিঃশ্রেয়সের পরম ও সর্বগ্রাসী উল্লাসের সাগরে। তখন আমরা শেষ পর্যন্ত সমর্থ হই সকল সংস্পর্শ গ্রহণ ক'রতে আনন্দময় সমত্বের সহিত কারণ আমরা তাদের মধ্যে অনুভব করি অক্ষয় প্রেম ও আনন্দের স্পর্শ, অনপেক্ষ সুখ যা চিরদিন প্রচ্ছন্ন আছে বিষয়সমূহের অন্তরে। এই যে পরিণতি বিশ্বজনীন ও সম উল্লাসে, তাতে লাভ হয় অন্তঃপুরুষের আনন্দ, এবং যে পরম আনন্দ অনন্ত, যে পরম রভস সকল বোধের অতীত তাদের মধ্যে প্রবেশের প্রথম তোরণগুলি।

* * *

কামনা বিনাশ ও অন্তঃপুরুষের সমত্ব জয়ের এই সাধনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ ও ফলপ্রসূ হবার পূর্বে আধ্যাত্মিক প্রগতি এতদূর নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক যাতে অহং-বোধের বিলোপ সাধিত হয়। কিন্তু কর্মীর পক্ষে এই পরিবর্তনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ'ল ক্রিয়ার কর্তৃত্বাভিমানত্যাগ। কারণ যজ্ঞের অধীশ্বরের কাছে কর্মফল ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে রাজসিক কামনার অহংভাবকে বিদায় দিলেও, এমন হ'তে পারে যে তখনো আমাদের থেকে যায় কর্মীর অহংভাব। তখনো আমরা এই বোধের অধীন যে আমরাই কর্মের কর্তা, আমরাই তার উৎস, আবার আমরাই তার অনুমন্তা। তখনো "আমি"ই নির্বাচন ও নির্ধারণ করে, তখনো "আমি"ই দায়িত্ব নিয়ে দোষ, গুণ বোধ করে। আমাদের যোগের এক মূল লক্ষ্য হ'ল এই বিভক্ত অহং-বোধের সম্পূর্ণ অপসারণ। যদি আমাদের মধ্যে কোনো অহংকে কিছুদিনের জন্য থাকতে হয়, তা হ'লে তা হবে শুধু তার এমন এক রূপ যা নিজেকে এক রূপ ব'লে জানে এবং লোপ পেতে প্রস্তুত যখনই আমাদের মধ্যে ব্যক্ত বা গঠিত হয় চেতনার কোনো সত্যকার কেন্দ্র। সেই সত্যকার কেন্দ্র হ'ল অন্বয়

পরম চেতনারই এক প্রদীপ্ত রূপায়ণ এবং অদ্বয় সৎ-স্বরূপেরই শুদ্ধ প্রবাহ প্রণালী ও যন্ত্র। বিশ্ব-শক্তির ব্যষ্টি অভিব্যক্তি ও ক্রিয়ার আশ্রয়-স্বরূপ এই কেন্দ্র ক্রমশঃ তার পশ্চাতে প্রকাশ করে আমাদের মধ্যকার সত্যকার পরম ব্যক্তিকে—ইহাই কেন্দ্রীয় সত্তা, পরতমের সনাতন সত্তা, বিশ্বাতীতা শক্তির এক সামর্থ্য ও অংশ। *

এই যে ধারা যাতে অন্তঃপুরুষ ক্রমশঃ নিজ থেকে খুলে ফেলে অহং-এর তামস পরিচ্ছদ, তাতেও উন্নতি হয় সুস্পষ্ট পর্যায়ে। কারণ শুধু কর্মফলের অধিকারই যে একমাত্র অধীশ্বরের তা নয়, আমাদের সব কর্মও হ'তে হবে তাঁরই; আমাদের সব ফলের মতো আমাদের ক্রিয়ারও সত্যকার অধীশ্বর তিনি। শুধু চিন্তার মন দিয়ে ইহা দেখলে চলবে না, ইহা সম্পূর্ণ সত্য হ'য়ে ওঠা চাই আমাদের সমগ্র চেতনা ও সংকল্পের কাছে। সাধকের সব কাজ আদৌ তার নয়, পরম সৎস্বরূপ থেকেই সে সব আসছে তার মধ্য দিয়ে—একথা সাধকের শুধু ভাবলে ও জানলে চলবে না,—ইহা তার দেখা ও অনুভব করা চাই বাস্তবভাবে ও প্রগাঢ়ভাবে,—এমন কি কাজ করার মুহূর্তেও এবং তার প্রারম্ভে ও সমগ্র ধারায়। সর্বদাই তার এই বোধ থাকা চাই যে এক শক্তি, এক উপস্থিতি, এক সংকল্প তার ব্যষ্টি প্রকৃতির মধ্য দিয়ে কাজ করে। কিন্তু এইভাবে মোড় ফেরায় এই বিপদ যে সে নিজেরই ছদ্মবেশী বা ঊর্ধ্বায়িত অহং-কে বা কোনো অবরশক্তিকে অধীশ্বর ব'লে ভুল ক'রে তার সব দাবিকেই নিতে পারে পরম আদেশের স্থলে। হয়ত সে এই অপরা প্রকৃতির এক সাধারণ ফাঁদে প'ড়ে মনে ক'রবে যে সে কোনো পরতরা শক্তির নিকট সমর্পণ ক'রছে আর এই ধারণাকে ছুতো ক'রে বিকৃতভাবে নিজেরই জিদ এমন কি তার কামনা ও উদ্দাম সব আবেগেরও অতিমাত্রায় অসংযত প্রশ্রয় দেবে। তাই দাবি করা হয় ঐকান্তিক অকপটতা, আর তা শুধু সচেতন মনে আনলে চলবে না, বরং তা আরো বেশী ক'রে আনতে হবে আমাদের অধিচেতন অংশে যা নানা গুপ্ত গতিবৃত্তিতে পূর্ণ। কারণ সেখানেই, বিশেষতঃ আমাদের অধিচেতন প্রাণিক প্রকৃতিতে আছে এমন এক প্রতারক ও অভিনেতা যার সংশোধন অসম্ভব। কামনাবিলোপ এবং সকল কর্মপ্রণালীতে ও সকল বিষয়ে তার অন্তঃপুরুষের দৃঢ় সমত্ব প্রতিষ্ঠা—এই কাজে সাধককে প্রথম অনেক দূর এগোতে হবে, তবেই তার পক্ষে সম্ভব হবে তার কর্মের বোঝা পুরোপুরি ভগবানকে দেওয়া। সাধনার পথে এগোবার সময় তাকে প্রতিমুহূর্তে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে অহং-এর সব প্রবঞ্চনার উপর এবং বিপথে নিয়ে যায় সেই সব তামসশক্তির অতর্কিত আক্রমণের উপর যারা সর্বদাই নিজেদের জাহির করে

---

* অংশ সনাতনঃ, পরা প্রকৃতির্জীবভূতা

পরম আলোক ও সত্যের একমাত্র উৎস ব'লে এবং বিভিন্ন দিব্য মূর্তির অনুরূপ কপট রূপ গ্রহণ করে সাধকের অন্তঃপুরুষকে বন্দী করার জন্য।

তখনই তার কর্তব্য আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া—তা হ'ল নিজেকে সাক্ষীর স্থানে বসানো। প্রকৃতি থেকে পৃথক হ'য়ে, নৈর্ব্যক্তিক ও বীতরাগ হ'য়ে তার কর্তব্য হ'ল তার মধ্যে কার্যসাধিকা কর্মরতা প্রকৃতি-শক্তিকে নিরীক্ষণ করা এবং ইহার ক্রিয়া প্রণিধান করা; প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তার দরকার প্রকৃতির বিভিন্ন বিশ্ব-শক্তির খেলা চিনতে শেখা, আলো ও রাত্রি, দিব্য ও অদিব্য নিয়ে তার মিশ্র বুননে কোনটি কি তা বুঝতে শেখা এবং আরো দরকার প্রকৃতির যে সব দুর্ধর্ষ শক্তি ও সত্তা অবিদ্যাচ্ছন্ন মানবজীবকে ব্যবহার করে তাদের খুঁজে বার করতে শেখা। গীতায় বলা হ'য়েছে, প্রকৃতি আমাদের মধ্যে কাজ করে তার তিন গুণের মাধ্যমে—আলো ও শুভের গুণ, উচ্চন্ড আবেগ ও কামনার গুণ এবং অন্ধকার ও জড়তার গুণ। তার প্রকৃতির এই রাজ্যের মধ্যে যা সব ঘটে তাদের নিরপেক্ষ ও বিচারশীল সাক্ষী হ'য়ে সাধকের কর্তব্য হ'ল কোনটি এই সব গুণের পৃথক ক্রিয়া আর কোনটি তাদের মিশ্র ক্রিয়া তা বুঝতে শেখা; তার আরো উচিত—তার মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ব-শক্তির কর্মপ্রণালীগুলিকে তাদের সূক্ষ্ম অদেখা সব ধারা ও ছদ্মবেশের গহন প্রদেশের মধ্য দিয়ে অনুসরণ করে এই গোলকধাঁধার প্রতি রহস্য অবগত হওয়া। এই জ্ঞানের পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে সে সমর্থ হবে অনুমন্তা হ'য়ে উঠতে, আর তখন সে প্রকৃতির অজ্ঞানময় যন্ত্র থাকবে না। প্রথমে তার কর্তব্য হ'ল,—তার বিভিন্ন করণের উপর প্রকৃতি-শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রকৃতি-শক্তিকে শিক্ষা দেওয়া যেন সে নিম্নতর দুটি গুণের কর্মপ্রণালীকে দমন ক'রে তাদের আনে আলো ও শুভের গুণের অধীনে এবং পরে তার উচিত ইহাকেও রাজী করান নিজেকে নিবেদন করতে যাতে সব তিনটিই এক পরতরা শক্তির দ্বারা রূপান্তরিত হ'তে পারে তাদের দিব্য প্রতিরূপে—পরম বিশ্রাম ও স্থিরতায়, দিব্য জ্যোতি ও আনন্দে, শাশ্বত দিব্য স্ফুরত্তাতে, তপোশক্তিতে। এই শিক্ষা ও পরিবর্তনের প্রথম অংশটি তত্ত্বতঃ দৃঢ়ভাবে সাধিত হ'তে পারে আমাদের মধ্যে মনোময় পুরুষের সংকল্পের দ্বারা; কিন্তু ইহার পূর্ণ সম্পাদন ও পরবর্তী রূপান্তরসাধন কেবল তখনই সম্ভব যখন গভীরতর চৈত্য পুরুষ প্রকৃতির উপর তার প্রভাব আরো বাড়িয়ে তার অধিপতি হয় মনোময় পুরুষের স্থলে। আর যখন এই ঘটে, তখন সে প্রস্তুত হবে পরম সংকল্পের নিকট তার সকল কর্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ ক'রতে—আর তা যে শুধু আস্পৃহা ও অভিপ্রায় ও এক প্রাথমিক ও উত্তরোত্তর আত্ম-বিসর্জনের সহিত হবে তা নয়, তা হবে স্ফুরন্ত আত্মদানের প্রগাঢ়তম বাস্তবতার সহিত। ক্রমশঃ তার অপূর্ণ মানুষী বুদ্ধির মনকে সরিয়ে, আসবে এক অধ্যাত্ম ও প্রভাস মন, এবং শেষে ইহাই সমর্থ হবে অতিমানসিক সত্য-জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ ক'রতে; এই যে

তার অবিদ্যাময় প্রকৃতি যার তিন গুণের কাজ বিশৃংখল ও অপূর্ণ, তখন তা থেকে সে আর কাজ করবে না, সে কাজ করবে অধ্যাত্ম স্থিরতা, আলোক, শক্তি ও আনন্দের দিব্যতর প্রকৃতি থেকে। যে অজ্ঞানাচ্ছন্ন মন ও সংকল্পের সহিত মিশ্রিত থাকে আরো অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভাবাবেগের হৃদয়ের তাড়না ও প্রাণসত্তার কামনা ও দেহের প্রেরণা ও সহজাত প্রবৃত্তি তা থেকে সে কাজ করবে না, সে কাজ করবে প্রথম এক আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন আত্মা ও প্রকৃতি থেকে এবং শেষে এক অতিমানসিক ঋতচিৎ এবং ইহার পরা প্রকৃতির দিব্য শক্তি থেকে।

এইভাবে শেষ ধাপগুলি অতিক্রম করা সম্ভব হয়, তখন প্রকৃতির অবগুণ্ঠন সরে যায়, সাধক সামনা সামনি এসে দাঁড়ায় সকল সৃষ্টির অধীশ্বরের সম্মুখে, আর তার সকল কাজকর্ম ডুবে যায় এমন এক পরমা শক্তির ক্রিয়ায় যা চিরদিন শুদ্ধ, সত্যময়, পূর্ণ ও আনন্দময়। এইভাবে সে সক্ষম হয় অতিমানসিক পরা-শক্তির কাছে নিঃশেষে ত্যাগ করতে তার সকল কর্ম ও সকল কর্মফল আর কাজ ক'রতে সনাতন কর্মীর শুধু সচেতন যন্ত্র রূপে। তখন আর সে অনুমতি দেয় না, বরং সে তার সব করণের মধ্যে নেবে এক দিব্য আদেশ এবং তা পালন ক'রবে সেই পরা শক্তির হাতের মধ্যে থেকে। আর সে কাজ করে না, পরাশক্তি তাঁর অতন্দ্র শক্তি দিয়ে তার মাধ্যমে যে কর্ম সম্পাদন করেন, সে শুধু স্বীকার করবে সেই সম্পাদনা। আর সে নিজের বিভিন্ন মানসিক রচনার পরিপূরণ বা ভাবাবেগময় সব কামনার পরিতৃপ্তি চায় না, সে এমন এক সর্বক্ষম সংকল্পের অনুগামী ও সহযোগী হয় যা আবার সর্বদর্শী জ্ঞান এবং রহস্যময়, যাদুময়, অগাধ প্রেম এবং অস্তিত্বের শাশ্বত আনন্দের বিশাল অতল সাগর।

দশম অধ্যায়

প্রকৃতির গুণত্রয়

অন্তঃপুরুষকে নিজের আত্মায় স্বাধীন ও তার বিভিন্ন কর্মে স্বাধীন হ'তে হ'লে তার পক্ষে অপরিহার্য হ'ল অপরা প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়া অতিক্রম করা। এই বাস্তব বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট সুসংগত বশ্যতা, প্রাকৃত করণগুলির জন্য শুভ ও নিখুঁৎ কর্মের অবস্থা—ইহা অন্তঃপুরুষের আদর্শ নয়, অন্তঃপুরুষের বরং অধীন হওয়া উচিত ভগবানের ও তাঁর পরমাশক্তির কিন্তু প্রভু হওয়া উচিত আপন প্রকৃতির। মন, প্রাণ ও দেহ—এইসব প্রাকৃত করণের কর্মের জন্য প্রকৃতি যে ক্রিয়া-শক্তির ভান্ডার, পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থা, মিশ্র গতিবৃত্তির ছন্দ জোগায় তাদের কি ব্যবহার করা হবে তা অন্তঃ-পুরুষের নির্বাচন করা কর্তব্য পরম সংকল্পের প্রতিভূ বা প্রবাহপ্রণালী হিসাবে নিজের অন্তদর্শন ও অনুমতি বা অসম্মতির দ্বারা। কিন্তু এই অবর প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন আমরা তাকে অতিক্রম ক'রে ব্যবহার করি ঊর্ধ্ব থেকে। আর তা করা যায় একমাত্র তার ক্রিয়ার বিভিন্ন শক্তি, গুণ ও পদ্ধতির অতীত হ'য়ে; তা না হ'লে আমরা তার সব অবস্থার অধীন থেকে অসহায়ের মতো তার তাঁবেদার হই, চিৎ-পুরুষের মধ্যে স্বাধীন হই না।

প্রকৃতির তিনটি মৌলিক প্রকার বা গুণের ভাবনা হ'ল প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের সৃষ্টি আর ইহার সত্য প্রথমেই সুস্পষ্ট হয় না কারণ ইহা পাওয়া গিয়াছে দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষণ ও গভীর আভ্যন্তরীণ অনুভূতির ফল-স্বরূপ। সে জন্য দীর্ঘ আন্তর অনুভূতি, নিবিড় আত্ম-পর্যবেক্ষণ ও প্রকৃতি-শক্তিসমূহ সম্বন্ধে বোধিত উপলব্ধি না থাকলে সঠিকভাবে এই বিষয়টি ধারণ করা বা দৃঢ়ভাবে তা ব্যবহার করা দুরূহ। তবু কতকগুলি সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হ'লে কর্মমার্গের সাধকের পক্ষে সেগুলি সহায় হ'তে পারে তার নিজের প্রকৃতির বিভিন্ন সমবায় অবধারণ করায়, বিশ্লেষণ করায় ও তার সম্মতি বা অসম্মতি দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রিত করায়। ভারতীয় গ্রন্থে এই প্রকারগুলির সংজ্ঞা হ'ল 'গুণ' আর নাম দেওয়া হয়—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। সত্ত্ব সাম্যের শক্তি, তার প্রকাশ হয় শুভ ও সামঞ্জস্য ও সুখ ও আলোর গুণে; রজঃ গতির শক্তি আর তার প্রকাশ হয় সংঘর্ষ ও প্রচেষ্টা, উচ্চন্ড ভাবাবেগ ও ক্রিয়ার গুণে; তমঃ নিশ্চেতনা ও স্থিতির শক্তি আর তার প্রকাশ হয় অন্ধকার ও অসামর্থ্য ও নিষ্ক্রিয়তার গুণে। সাধারণতঃ এই বিভাগ ব্যবহার করা হয় মনস্তাত্ত্বিক

আত্ম-বিশ্লেষণের জন্য, তবে জড় প্রকৃতির ক্ষেত্রেও ইহারা প্রযোজ্য। অপরা প্রকৃতির প্রতি বিষয় ও প্রতি অস্তিত্বের মধ্যে এই তিন গুণ বর্তমান, আর ইহাদের শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই ঘটে প্রকৃতির ধারা ও স্ফুরন্ত রূপ।

সজীব বা নির্জীব—প্রতিটি বিষয়েরই রূপ হ'ল কতকগুলি গতিসম্পন্ন প্রাকৃতিক শক্তির এমন স্থিতি যা সর্বদাই একভাবে থাকে আর তার উপর আসে তার চারিদিককার অন্যান্য শক্তির সমবায় থেকে অনুকূল বা প্রতিকূল বা বিধ্বংসী সব সংস্পর্শের এক অবিরাম স্রোত। আমাদের নিজেদেরই মন, প্রাণ ও দেহের প্রকৃতি এইরূপ এক গঠনক্ষম সমবায় ও স্থিতি ছাড়া আর কিছু নয়। চারিদিককার বিভিন্ন সংস্পর্শ কেমনভাবে নেওয়া হয় ও প্রতিদানে তাদের উপর কি ক্রিয়া হয় তা থেকেই বোঝা যায় গুণত্রয়ের দ্বারা নির্ধারিত গ্রহীতার স্বভাব ও প্রতিক্রিয়ার ধরণ। নিশ্চেষ্ট ও অনুপযুক্ত হ'য়ে সে-গুলি সে নিতে বাধ্য হয় প্রত্যুত্তরে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া বা আত্ম-রক্ষার চেষ্টা না ক'রে অথবা নিজের অংগীভূত করায় বা নিজের সহিত খাপ খাওয়াতে অসমর্থ হ'য়ে; ইহাই তমোগুণ, স্থিতিধর্মিতার রীতি। তমোঃগুণের কলংকচিহ্ন হ'ল অন্ধতা ও অচৈতন্য, ও অসামর্থ্য ও নির্বুদ্ধিতা, জড়তা ও আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা আর যন্ত্রের মতো কার্যক্রম পালন, এবং মনের অসাড়তা ও প্রাণের সুপ্তি ও অন্তঃপুরুষের তন্দ্রা। যদি অন্য কোনো উপাদান দিয়ে এসবের সংশোধন না হয় তা হ'লে ইহার ফল হ'ল প্রকৃতির রূপ বা স্থিতির বিশরণ আর তা এমন যে যাতে নতুন কোনো সৃষ্টি বা নতুন সাম্য বা গতিশীল উন্নতিও হয় না। এই অসাড় শক্তিহীনতার মর্মস্থলে আছে অবিদ্যার তত্ত্ব এবং চারিদিককার সব শক্তির উদ্দীপক বা আক্রমণকারী সংস্পর্শ ও তাদের ব্যঞ্জনা এবং নতুন অভিজ্ঞতার জন্য তাদের প্রেরণা প্রণিধান, ধারণ ও পরি-চালনা করার অক্ষমতা বা নিশ্চেষ্ট অনিচ্ছা।

তবে অন্য প্রকারেও প্রকৃতির সংস্পর্শগুলি গ্রহণ করা সম্ভব, গ্রহীতা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির স্পর্শে উদ্দীপিত, আকৃষ্ট বা আক্রান্ত হ'য়ে তাদের চাপে অনুকূল সাড়া দিতে পারে অথবা বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। প্রকৃতিই তাকে সম্মতি, উৎসাহ ও প্রেরণা দেয় উদ্যোগী হ'তে, বাধা দিতে, চেষ্টা ক'রতে, তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে, তার সংকল্প প্রতিষ্ঠার এবং সংগ্রাম, সৃষ্টি ও জয়ের উদ্দেশ্যে। ইহাই রজোগুণ, উচ্চণ্ডভাবাবেগ ও ক্রিয়া এবং কামনা তৃষ্ণার রীতি। সংগ্রাম ও পরিবর্তন ও নব সৃজন, জয় ও পরাজয় এবং সুখ ও কষ্টভোগ, আশা ও নিরাশা—এসব তা-রই সন্তান, ইহারাই তৈরী করে জীবনের নানা রঙের রঙীন প্রিয় আবাস। কিন্তু ইহার জ্ঞান অপূর্ণ বা মিথ্যা জ্ঞান আর ইহার সাথী হ'ল অজ্ঞানময় প্রচেষ্টা, প্রমাদ, নিরন্তর অসংগতি, আসক্তির ব্যথা, ব্যর্থ কামনা, ক্ষতি ও বিফলতার বিষাদ। রজোগুণের দান সক্রিয় শক্তি, বীর্য, উদ্যম, এবং এমন

সামর্থ্য যা সৃষ্টি করে, কাজ করে ও পরাস্ত করতে সক্ষম; কিন্তু ইহার গতি অবিদ্যার ভ্রান্ত বা অর্ধ আলোকের মধ্যে; অসুর, রাক্ষস ও পিশাচের স্পর্শে ইহা বিকৃত হয়। মানবমনের উদ্ধত অজ্ঞানতা এবং ইহার সব আত্মতৃপ্ত বিকৃতি ও ধৃষ্ট প্রমাদ, গর্ব, আত্ম-গরিমা ও উচ্চাভিলাষ, নৃশংসতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং পাশব ক্রোধ ও অত্যাচার, স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রতা, ভণ্ডামি ও বিশ্বাস-ঘাতকতা ও ঘৃণ্য নীচতা, কাম ও লোভ ও লুণ্ঠন প্রবৃত্তি, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা ও চরম অকৃতজ্ঞতা—এই যে সব পৃথ্বী-প্রকৃতির কলঙ্ক তারা প্রকৃতির এই অপরিহার্য কিন্তু সবল ও বিপজ্জনক প্রবৃত্তির স্বভাবজাত সন্তান।

কিন্তু দেহধারী সত্তা প্রকৃতির এই দুই গুণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তার পক্ষে তার চারিদিককার সংঘাত ও জগৎ-শক্তির স্রোতকে আরো শ্রেয়স্কর ও প্রবুদ্ধভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। সে সবকে সে নিয়ে তাতে সাড়া দিতে পারে স্বচ্ছ অবধারণ, স্থৈর্য ও বিবেচনার সহিত। প্রাকৃত সত্তার এই রীতির এমন সামর্থ্য যে সে প্রণিধান করে ব'লে তার সমবেদনাও থাকে; সে প্রকৃতির প্রেরণা ও বিভিন্ন প্রণালীর আন্তর মর্মে প্রবেশ ক'রে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও বিকশিত করে : তার এমন এক বুদ্ধি আছে যা প্রকৃতির বিভিন্ন ধারা ও তাৎ-পর্যের গভীরে প্রবেশ ক'রে তাদের নিজের অঙ্গীভূত ক'রে কাজে লাগাতে সক্ষম; তার প্রতিক্রিয়া এমন স্বচ্ছ যে ইহা অভিভূত হয় না, বরং সব কিছুকে যথাস্থানে স্থাপন করে, তাদের ভুল সংশোধন করে, তাদের মধ্যে মিল আনে ও সব কিছুর মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা বাহিরে আনে। ইহাই সত্ত্ব গুণ, প্রকৃতির সেই প্রবৃত্তি যা আলোক ও স্থৈর্যে পূর্ণ, যার লক্ষ্য মঙ্গল ও জ্ঞান, আনন্দ ও সৌন্দর্য, সুখ, সঠিক বোধ, যথাযথ সাম্য ও যথার্থ শৃঙ্খলা, ইহার স্বভাব জ্ঞানের উজ্জ্বল স্বচ্ছতার সমৃদ্ধি এবং সমবেদনা ও নিবিড়তার দীপ্ত উষ্ণতা। সাত্ত্বিক প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ পরিণতি হ'ল সমগ্র সত্তার চারুতা ও প্রবুদ্ধতা, সুনিয়ন্ত্রিত শক্তি এবং সংসিদ্ধ সৌষম্য ও স্থৈর্য।

সৃষ্টির কোনো বিষয়ই বিশ্বশক্তির এই তিন গুণের কোনো একটি-মাত্রেরই ছাঁচে তৈরী হয় নি; প্রতি বিষয়ে ও সর্বত্র এই তিন গুণ বর্তমান। পরস্পরের মধ্যে তাদের সম্বন্ধ নিত্য পরিবর্তনশীল, একের প্রভাব অন্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সর্বদাই এই সব সম্পর্ক ও প্রভাবের সংযোগ ও বিয়োগ ঘটছে, প্রায়শঃই ঘটছে বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষ ও মল্লযুদ্ধ, পরস্পরকে বশে আনার জন্য সংগ্রাম। কম বা বেশী মাত্রায়,—হয়ত কখন কখন এত কম যে তা বোঝা যায় না—প্রত্যেকেরই মধ্যে আছে তাদের সাত্ত্বিক অবস্থা এবং আলোক, স্বচ্ছতা ও প্রসন্নতার, পরিবেশের সহিত সূক্ষ্ম অভিযোজনা ও সমবেদনার, বুদ্ধি, স্থৈর্য ও ঋজু মনের, সাধু সংকল্প বেদনা ও সংবেগের, সদ্‌গুণ ও সুশৃঙ্খলার সুস্পষ্ট ক্ষেত্র বা প্রাথমিক প্রবণতা। সকলেরই আছে বিভিন্ন রাজসিক প্রবৃত্তি ও সংবেগ এবং কামনা ও উচ্চণ্ডভাবাবেগ ও সংগ্রামের, বিকৃতি

ও মিথ্যা ও প্রমাদের, অসম সুখ ও দুঃখের, উৎকট কর্ম প্রবৃত্তির, অধীর সৃজনের এবং পরিবেশের চাপ ও জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি সবল বা নির্ভীক, উদ্দীপ্ত অথবা উগ্র প্রতিক্রিয়ার পঙ্কিল অংশ। সকলেরই আছে বিভিন্ন তামসিক অবস্থা, ও চির-অন্ধকার অংশ, অচৈতন্যের বিভিন্ন মুহূর্ত বা কেন্দ্র, ভগবদ্-বিধানের প্রতি তাদের ক্ষীণ আনুগত্য বা নিস্তেজ স্বীকৃতির দীর্ঘ অভ্যাস বা সাময়িক অক্ষম ইচ্ছা, তাদের স্বভাবজাত দুর্বলতা বা শ্রান্তি, অবহেলা ও আলস্যের প্রবৃত্তি, অজ্ঞানতা ও অসামর্থ্য, অবসাদ ও ভয়ের মধ্যে তাদের পতন, পরিবেশের নিকট বা মানুষ, ঘটনা ও শক্তিসমূহের চাপের নিকট কাপুরুষোচিত পশ্চাদপসরণ বা নতিস্বীকার। আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের প্রকৃতিগত শক্তির কোনো না কোনো দিকে, বা মনের বা চরিত্রের কোনো না কোনো অংশে সাত্ত্বিক, আবার অন্য কিছু দিকে বা অংশে রাজসিক এবং অন্য কিছু দিকে বা অংশে তামসিক। সাধারণ স্বভাবে, মনের ধরণে বা কর্মের প্রবৃত্তিতে যে এক বা অন্য গুণের প্রভাব বেশী সেই গুণ অনুযায়ী লোককে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক বলা হয়, কিন্তু সর্বদাই একই গুণ সম্পন্ন এমন লোক খুব অল্প, আর পুরোপুরি এক প্রকার গুণের লোক কেউই নয়। জ্ঞানী সর্বদাই বা পুরোপুরি জ্ঞানী নন, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ, সাধুর মধ্যেও অনেক অসাধু প্রবৃত্তি থাকে, তিনি সেগুলি দমন ক'রে রাখেন, আর অসাধুও পুরোপুরি দুষ্ট নয়; একান্ত নিস্তেজ লোকেরও অনেক অপ্রকাশিত বা অব্যবহৃত ও অপরিণত সামর্থ্য থাকে, অতি ভীরুও মাঝে মাঝে সাহস দেখায় বা নিজস্ব ধরণে সাহসের কাজ করে, অসহায় ও অতি দুর্বলেরও প্রকৃতিতে বলের কিছু সুপ্ত অংশ থাকে। প্রধান গুণগুলি দেহী জীবের অন্তঃপুরুষের মূল চরিত্র নয়, তাদের দ্বারা শুধু বোঝা যায় এই জীবনের জন্য বা এর বর্তমান জীবনের মধ্যে আর কালের মধ্যে তার ক্রম-বিকাশের এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে কি রূপায়ণ সে গড়ে তুলেছে।

* *

যখন সাধক তার মধ্যে বা তার উপর প্রকৃতির ক্রিয়া থেকে একবার পিছনে সরে দাঁড়িয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ, সংশোধন বা নিয়ন্ত্রণ বা নির্বাচন বা সিদ্ধান্ত না ক'রে তার খেলাকে চলতে দিয়ে সেই কর্মপ্রণালী বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করে তখন সে শীঘ্রই দেখতে পায় যে প্রকৃতির গুণগুলি আত্ম-নির্ভর এবং কোনো যন্ত্রকে একবার চালিয়ে দিলে যেমন ইহা নিজের গঠন ও সংচালিকা সব শক্তির বলে কাজ করে তারাও তেমনভাবেই কাজ করতে থাকে। শক্তি ও চালনা প্রকৃতি থেকে আসে, জীবের কাছ থেকে নয়। তখন সে উপলব্ধি করে যে তার মনই যে তার সব কর্মের কর্তা তার এ ধারণা কত ভুল; তার মন তার এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র এবং প্রকৃতির সৃষ্টি ও যন্ত্র। প্রকৃতিই সর্বক্ষণ নিজের পদ্ধতিতে কাজ করছিল তিনটি সাধারণ গুণকে চারিদিকে

চালিয়ে যেমন ছোট মেয়ে খেলা করে তার পুতুল নিয়ে। সাধকের অহং সব সময়ই ছিল এক উপকরণ ও খেলনা; তার চরিত্র এবং বুদ্ধি, তার সব নৈতিকগুণ ও মানসিক শক্তি, তার বিভিন্ন সৃজন ও কর্ম ও কীর্তিকলাপ, তার ক্রোধ ও সহিষ্ণুতা, তার নিষ্ঠুরতা ও দয়া, তার ভালোবাসা ও ঘৃণা, তার পাপ ও পুণ্য, তার আলো ও অন্ধকার, তার আনন্দের বেগ ও দুঃখের ব্যথা—এ-সকলই ছিল প্রকৃতির খেলা আর অন্তঃপুরুষ এই খেলায় আকৃষ্ট, পরাস্ত ও বশীভূত হ'য়ে তার নিষ্ক্রিয় সম্মতি দিয়েছিল তাতে। কিন্তু তবু প্রকৃতির বা শক্তির এই যান্ত্রিক নির্ধারণই সব নয়; এ বিষয়ে অন্তঃপুরুষেরও কিছু বলার আছে,—তবে তা গূঢ় অন্তঃপুরুষের, পুরুষের, তা মনের বা অহং-এর নয়, কারণ ইহারা স্বতন্ত্র সত্তা নয়, ইহারা প্রকৃতিরই অংশ। কারণ খেলার জন্য অন্তঃপুরুষের অনুমতি প্রয়োজনীয়, এবং প্রভু ও অনুমন্তা হিসাবে আন্তর নীরব সংকল্প দ্বারা ইহা খেলার তত্ত্ব নির্ধারণ ও তার বিভিন্ন সমবায়ে অংশগ্রহণ ক'রতে সক্ষম যদিও মনন ও সংকল্প, ক্রিয়া ও সংবেগের মধ্য দিয়া কর্ম সম্পাদন প্রকৃতিরই করণীয় ও তারই অধিকারভুক্ত। পুরুষ প্রকৃতিকে আদেশ দিতে পারে কোনো এক সংগতি গড়ে তুলতে, তবে তার ক্রিয়ায় হস্ত-ক্ষেপ না ক'রে, সে তা করে তার উপর এক সচেতন অবলোকনের দ্বারা আর প্রকৃতি ইহা রূপান্তরিত করে তখনই বা অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে অনুরূপ ভাবনায়, স্ফুরন্ত সংবেগে ও অর্থপূর্ণ মূর্তিতে।

যদি আমরা চাই আমাদের বর্তমান প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করতে দিব্য চেতনার সামর্থ্যে ও রূপে এবং তার সব শক্তির করণে, তা হ'লে অতি স্পষ্টতঃই দুই অবর গুণের ক্রিয়া থেকে নিস্তার পাওয়া আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। তমঃ দিব্যজ্ঞানের আলোককে আচ্ছাদন করে, তাকে আমাদের প্রকৃতির অন্ধকারময় নিষ্প্রভ অংশগুলির মধ্যে আসতে দেয় না। দিব্য সংবেগে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য, পরিবর্তনসাধনের বীর্য, উন্নতিসাধন ও মহত্তর শক্তির নিকট আমাদিগকে নমনীয় করার সংকল্প—এসবকে তমঃ অশক্ত করে, বিনষ্ট করে। রজঃ জ্ঞানকে বিকৃত করে, আমাদের যুক্তি-শক্তিকে করে মিথ্যার সহকর্মী ও প্রতিটি অন্যায় বৃত্তির প্ররোচক; ইহা আমাদের প্রাণশক্তি ও তার বিভিন্ন সংবেগের মধ্যে বৈষম্য ও জটিলতা আনে, শরীরের সমতা ও স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত করে। ঊর্ধ্বে জাত সকল ভাবনা ও উচ্চে আসীন সকল গতিবৃত্তিকে রজঃ অধিকার ক'রে তাদের ব্যবহার করে মিথ্যাময় অহমাত্মক কাজে; এমন কি দিব্য সত্য ও বিভিন্ন দিব্য প্রভাবও পার্থিব ভূমিতে নেমে এলে এই অপব্যবহার ও অধিকার থেকে নিস্তার পায় না। যতদিন তমঃ আলোকিত না হয়, রজঃ অপরিবর্তিত থাকে ততদিন কোনো দিব্য রূপান্তর বা কোনো দিব্য জীবন সম্ভব নয়।

মনে হ'তে পারে যে অপর দুটিকে বাদ দিয়ে শুধু সত্ত্বগুণের আশ্রয়

নেওয়াই উদ্ধারের পথ; কিন্তু মুস্কিল এই যে কোনো একটি গুণ নিজে তার দুটি সঙ্গী ও প্রতিযোগীকে পরাস্ত ক'রে জয়ী হতে অক্ষম। বিক্ষোভ, কষ্টভোগ, পাপ ও দুঃখের কারণ মনে ক'রে যদি আমরা কামনা ও উচ্চণ্ড ভাবাবেগের গুণকে শান্ত ও বশীভূত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি তা হ'লে রজোগুণ নীচে নামে বটে কিন্তু তমোগুণ উপরে ওঠে। কারণ সক্রিয়তার তত্ত্ব নিস্তেজ হ'লে তার স্থানে আসে নিশ্চেষ্টতা। অবশ্য আলোকের তত্ত্ব আনতে পারে অচঞ্চল শান্তি, সুখ, জ্ঞান, প্রেম, যথাযথ ভাব কিন্তু যদি রজঃ না থাকে বা তাকে সম্পূর্ণরূপে চেপে রাখা হয় তা হ'লে অন্তঃপুরুষের মধ্যকার শান্তির সম্ভাব্য পরিণাম হ'ল নিষ্ক্রিয়তার স্থৈর্য, ইহা আর স্ফুরন্ত পরিবর্তনের দৃঢ় ভূমি হয় না। প্রকৃতিতে সাধু চিন্তা, সাধু কর্মপ্রবৃত্তি আসতে পারে, ইহা সৎ, মৃদু ও বিক্ষোভহীন হ'তে পারে কিন্তু এ সব আঁকড়ো থাকে ব'লে প্রকৃতির স্ফুরন্ত অংশগুলি হ'য়ে ওঠে সত্ত্ব-তামসিক নিস্পৃহ, নিষ্প্রভ, সৃষ্টিশক্তিহীন বা সামর্থ্যরহিত। মানসিক ও নৈতিক আচ্ছন্নতা না থাকতে পারে কিন্তু তেমন আবার ক্রিয়ার তীব্র প্রেরণাসমূহ থাকে না, আর ইহাও এক প্রতিবন্ধক, সীমাবদ্ধতা, অন্যপ্রকারের অক্ষমতা। কারণ তমোতত্ত্বের কাজ দ্বিবিধ; ইহা রজঃকে খণ্ডন করে নিশ্চেষ্টতার দ্বারা আর সত্ত্বকে খণ্ডন করে সংকীর্ণতা, আচ্ছন্নতা ও অজ্ঞানতার দ্বারা, আর সত্ত্ব ও রজঃর মধ্যে যে কোনো একটিকে অবনত করা হ'লে তার স্থান পূরণ করার জন্য আসে তমসের প্রবাহ।

আবার যদি আমরা রজঃকে ডাকি এই ভুল সংশোধনের জন্য আর তাকে বলি সত্ত্বকে সাহায্য ক'রতে এবং যদি আমরা তাদের মিলিত শক্তির সাহায্যে তামসিক তত্ত্ব থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করি তা হ'লে আমরা দেখি যে আমাদের ক্রিয়াকে আমরা উপরে তুলেছি বটে কিন্তু আবার আমরা রাজসিক অধীরতা, উচ্চণ্ডভাবাবেগ, নৈরাশ্য, কষ্টভোগ ও ক্রোধের অধীন হ'য়েছি। এই বৃত্তিগুলির ক্ষেত্র ও আন্তরভাব ও ক্রিয়া আগের চেয়ে বেশী উন্নত হ'তে পারে কিন্তু যে শান্তি, স্বাধীনতা, সামর্থ্য আত্ম-কর্তৃত্বলাভ আমাদের কাম্য সে সব ইহারা নয়। যেখানেই কামনা ও অহং আশ্রয় নেয়, সেখানেই তাদের সঙ্গে উচ্চণ্ডভাবাবেগ ও চাঞ্চল্য আশ্রয় নিয়ে তাদের জীবনের অংশীদার হয়। আর যদি আমরা চেষ্টা করি সত্ত্বকে নেতা ও অন্য দুটিকে তার অধীন ক'রে তিনটি গুণের মধ্যে একটা আপোষ আনতে, তা হ'লেও তাতে আমরা শুধু পাই প্রকৃতির ক্রীড়ার এক আরো সংযত ক্রিয়া। তখন এক নতুন স্থৈর্য অধিগত হয় বটে কিন্তু অধ্যাত্ম স্বাধীনতা ও প্রভুত্বের দেখা মেলে না, অথবা তখনো তারা এক সুদূর প্রত্যাশামাত্র।

গুণগুলি থেকে আমাদের সরিয়ে এনে তাদের ঊর্ধ্বে আমাদের তোলার

জন্য দরকার অন্য এক প্রচেষ্টা যা মূলতঃ ভিন্ন ধরণের। যে প্রমাদে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ক্রিয়াকে স্বীকার করা হয় সে প্রমাদ দূর করা চাই; কেন না যতদিন এই স্বীকৃতি থাকবে ততদিন অন্তঃপুরুষও তাদের কাজের মধ্যে জড়িত হ'য়ে তাদের বিধানের অধীন থাকবে। রজঃ ও তমঃর মতো সত্ত্বেরও ঊর্ধ্বে ওঠা অত্যাবশ্যক। লৌহনিগড় ও মিশ্রধাতুর দাসত্ব-সূচক অলংকারের মতো স্বর্ণ-শৃংখলও ভাঙা চাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গীতায় আত্ম-শিক্ষার এক নতুন পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। এই পদ্ধতি হ'ল গুণের ক্রিয়া থেকে সরে এসে আত্মস্থ হ'য়ে থাকা এবং এই অস্থির প্রবাহকে দেখা প্রকৃতির সব শক্তির তরঙ্গের ঊর্ধ্বে সমাসীন দ্রষ্টার মতো। সে তখন এমন একজন যে পর্যবেক্ষণ করে কিন্তু নিরপেক্ষ ও উদাসীন, তাদের ভূমিতে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন আর স্বকীয় স্থানে তাদের অনেক ঊর্ধ্বে। প্রকৃতির শক্তির তরংগ-গুলি ওঠে, নামে, দ্রষ্টা চেয়ে থাকে, পর্যবেক্ষণ করে কিন্তু সে তাদের গ্রহণও করে না বা তখনকার মতো বাধাও দেয় না তাদের গতিপথে। প্রথম আসা চাই নৈর্ব্যক্তিক দ্রষ্টার স্বাধীনতা, তবেই পরে সম্ভব হয় প্রভুর, ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ।

* *

বিচ্ছিন্নতার এই প্রণালীর প্রথম সুবিধা এই যে সাধক বুঝতে শুরু করে নিজের আপন প্রকৃতি ও বিশ্ব-প্রকৃতি। বিচ্ছিন্ন সাক্ষীর দৃষ্টি অহং-ভাবের দ্বারা এতটুকুও ব্যাহত হয় না ব'লে সে সক্ষম হয় অবিদ্যাময় প্রকৃতির সব গুণের ক্রিয়াকে পুরোপুরি দেখতে এবং তাদের অনুসরণ ক'রতে তাদের সকল শাখা-প্রশাখা, সকল আবরণ ও সকল চাতুর্যের মধ্যে—কারণ এই খেলা চাতুরী ও ছদ্মবেশ ও ফাঁদ ও বিশ্বাসঘাতকতা ও কৌশলে পূর্ণ। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার শিক্ষা পেয়ে, সকল কর্ম ও অবস্থা যে গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল তা জেনে, তাদের সব প্রণালীর অর্থ বুঝে সাক্ষী আর তাদের আঘাতে অভিভূত হয় না, অতর্কিতে তাদের জালে আবদ্ধ হয় না বা প্রতারিত হয় না তাদের ছদ্মবেশে। সেই সঙ্গে সে দেখে যে অহং এক কৌশল ও তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারক এক গ্রন্থি ছাড়া আর কিছু নয় আর একথা বুঝতে পেরে সে অপরা অহমাত্মক প্রকৃতির ভ্রান্তি থেকে নিস্তার পায়। সে নিস্তার পায় পরোপকারী ও সাধুসন্ত ও ভাবুকের সাত্ত্বিক অহং-ভাব থেকে; তার প্রাণ-সংবেগের উপর স্বার্থান্বেষীর রাজসিক অহং-ভাবের যে নিয়ন্ত্রণ তা সে দূরে ফেলে, আর সে স্বার্থপূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে না বা উচ্চণ্ডভাবাবেগ ও কামনার আদুরে বন্দী বা একঘেয়ে ক্লান্তিকর খাটুনির ক্রীতদাস থাকে না; মানবজীবনের গতানুগতিক ধারায় আসক্ত অবিদ্যাচ্ছন্ন বা নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ, বুদ্ধিহীন সত্তার তামসিক অহংভাবকে সে বিনাশ করে জ্ঞানালোকের সাহায্যে।

আমাদের সকল ব্যক্তিগত ক্রিয়ায় অহং-বোধের মূল পাপ সম্বন্ধে নিশ্চিত ও সচেতন হ'য়ে সে আর রাজসিক বা সাত্ত্বিক অহং-এর মধ্যে আত্ম-সংশোধন ও আত্ম-মুক্তির উপায় খোঁজে না, বরং সে তাকায় ঊর্ধ্বে, কারণসমূহ ও প্রকৃতির কর্মধারার অতীত একমাত্র কর্মের অধীশ্বরের দিকে ও তাঁর পরমা শক্তি, পরা প্রকৃতির দিকে। একমাত্র সেখানেই সমগ্র সত্তা শুদ্ধ ও মুক্ত, সেখানেই সম্ভব দিব্য সত্যের রাজত্ব।

এই অগ্রসরতার প্রথম ধাপ হ'ল প্রকৃতির গুণত্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তাদের চেয়ে একপ্রকার শ্রেষ্ঠ হওয়া। অন্তঃপুরুষ আন্তরভাবে অপরা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত থাকে, তার পাকে আবদ্ধ হয় না, তার ঊর্ধ্বে থাকে উদাসীন ও হৃষ্ট হ'য়ে। প্রকৃতি তার পুরনো অভ্যাস মতো তিন গুণের আবর্তের মধ্য দিয়ে কাজ ক'রে চলতে থাকে- হৃদয়ে আসে কামনা, বিষাদ ও হর্ষের আক্রমণ, করণগুলি হ'য়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়, তমসাচ্ছন্ন ও ক্লান্ত হৃদয় ও মনে ও দেহে ফিরে আসে আলোক ও শান্তি, কিন্তু এসব পরিবর্তন অন্তঃপুরুষকে স্পর্শ করে না, তার কোনো পরিবর্তন হয় না। অধস্তন অংগসমূহের বিষাদ ও কামনা সে দেখে কিন্তু তাতে বিচলিত হয় না, তাদের হর্ষ ও পরিশ্রমে তার হাসি আসে, মননের ব্যর্থতা ও অন্ধকার, হৃদয় ও সব স্নায়ুর উদ্দামতা বা দুর্বলতা সে লক্ষ্য করে কিন্তু তাতে অভিভূত হয় না, মনের দীপ্তি ও আলোক ও প্রসন্নতা ফিরে আসায় তার স্বস্তি এবং আরাম বা সামর্থ্য বোধে সে বশীভূত বা আসক্ত হয় না, এসবের কোনোটিরই মধ্যে সে জড়িয়ে পড়ে না, বরং অচঞ্চল হ'য়ে অপেক্ষা করে পরতর সংকল্পের বার্তার জন্য এবং মহত্তর দীপ্ত জ্ঞানের বোধির জন্য। তার অবিরত এই আচরণের ফলে শেষ পর্যন্ত সে এমন কি তার স্ফুরন্ত অংশেও মুক্ত হয় গুণত্রয়ের বিরোধ থেকে এবং তাদের অপ্রচুর মূল্য ও সীমার গণ্ডী থেকে। কেন না এখন এই অপরা প্রকৃতি উত্তরোত্তর অনুভব করে এক পরতরা শক্তির নিয়ন্ত্রণ। যে সব পুরনো অভ্যাস সে আঁকড়ে থাকত সে সবের জন্য আর অনুমোদন পাওয়া যায় না, তাদের ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি ও শক্তি নিশ্চিতভাবে ক্রমশঃ কমে আসে। পরিশেষে সে বুঝতে পারে যে এক পরতর ক্রিয়া ও শ্রেয়স্কর অবস্থার জন্য সে উদ্দিষ্ট আর যতই মন্থরভাবে হ'ক, যতই অনিচ্ছা, যতই প্রাথমিক বা দীর্ঘস্থায়ী বিদ্বেষ ও বিচ্যুতিপূর্ণ অজ্ঞানতা থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে নতি স্বীকার করে ও ফিরে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে রূপান্তরের জন্য।

তখন অন্তঃপুরুষ আর শুধু সাক্ষী ও জ্ঞাতা নয়, তার নিশ্চল স্বাধীনতার বিজয়মণ্ডিত পরিণাম হ'ল প্রকৃতির স্ফুরন্ত রূপান্তর। আমাদের তিনটি করণের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়াশীল গুণত্রয়ের অবিরাম মিশ্রণ ও অসম কার্যের

ফলে যে সব সাধারণ বিশৃঙ্খল, উদ্বেগপূর্ণ ও অযথা ক্রিয়া ও গতিবৃত্তি জন্মায় সে সবের অবসান ঘটে। আর একটি ক্রিয়া সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে, ইহা শুরু হয়, বৃদ্ধি পায় ও চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে; এই কর্মপ্রণালী আরো যথার্থভাবে ঋজু, আরো প্রদীপ্ত, ইহা পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পরের গভীরতম দিব্য খেলার পক্ষে স্বাভাবিক ও সাধারণ যদিও আমাদের বর্তমান অপূর্ণ প্রকৃতির পক্ষে ইহা অতি-প্রাকৃত ও অসাধারণ। স্থূল মনের নিয়ন্তা দেহ সেই তামসিক নিশ্চেষ্টতার জন্য আর জিদ ধরে না যাতে সর্বদাই একই অজ্ঞানাচ্ছন্ন গতিবৃত্তির পুনরাবৃত্তি ঘটে; ইহা হ'য়ে ওঠে এক মহত্তর শক্তি ও আলোকের নিষ্ক্রিয় ক্ষেত্র ও করণ, চিৎ-পুরুষের শক্তির প্রতি দাবীতেই ইহা সাড়া দেয়, নব দিব্য অনুভূতির সকল বৈচিত্র্য ও তীব্রতাকে ইহা ধারণ করে। আমাদের সক্রিয় ও স্ফুরন্ত প্রাণিক অংশগুলির, আমাদের স্নায়ুগত ও ভাবাবেগপ্রধান ও ইন্দ্রিয়-অনুভূতিশীল ও সংকল্পপর সত্তার সামর্থ্যের প্রসার হয়, ইহাদের দ্বারা সম্ভব হয় ক্লান্তিহীন ক্রিয়া ও অনুভূতির আনন্দময় উপভোগ, তবে একই সঙ্গে তারা শেখে এক ব্যাপ্ত স্বাধিকৃত ও স্বরূপস্থিত স্থিরতার ভিত্তির উপর দাঁড়াতে, তখন তারা শক্তিতে মহিমময়, স্থৈর্যে দিব্য, তারা উল্লসিত বা উত্তেজিত বা দুঃখ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয় না, কামনা ও দুরাগ্রহী সব সংবেগ ইহাদের পীড়া দেয় না, অক্ষমতা ও আলস্য ইহাদের নিস্তেজ করে না। বুদ্ধি অর্থাৎ যে মন চিন্তা করে, বোঝে ও বিবেচনাশীল সে তার সাত্ত্বিক সব সংকীর্ণতা পরিহার ক'রে নিজেকে খুলে ধরে এক মৌলিক আলোক ও শান্তির কাছে। এক অনন্ত জ্ঞান আমাদের কাছে আনে তার জ্যোতির্ময় ভূমিগুলি—এমন এক জ্ঞান যা মানসিক রচনার দ্বারা গঠিত নয়, মত ও ভাবনার দ্বারা সীমিত নয়, প্রমাদপূর্ণ অনিশ্চিত ন্যায় এবং ইন্দ্রিয়ের তুচ্ছ সমর্থনের উপর নির্ভর করে না, বরং যা আত্ম-নিশ্চিত, স্বয়ং-সিদ্ধ, সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করে, সব কিছু প্রণিধান করে; আর তার সহিত আসে এক অশেষ আনন্দ ও শান্তি যা সৃজনক্ষম শক্তি ও স্ফুরন্ত ক্রিয়ার ব্যাহত উদ্যম থেকে মুক্তির উপর নির্ভর করে না, যা কতগুলি সীমিত সুখভোগের দ্বারা গঠিত নয় বরং যা স্বপ্রতিষ্ঠ এবং সর্বগ্রাহী; আর প্রকৃতিকে অধিগত করার জন্য এই জ্ঞান, শান্তি ও আনন্দ প্রবাহিত হয় নিত্য প্রসারশীল সব ক্ষেত্রের মধ্যে আর এমন সব প্রণালীর মধ্য দিয়ে যেগুলির বিস্তার ও সংখ্যা অনবরতই বৃদ্ধি পায়। মন ও প্রাণ ও দেহের অতীত এক উৎস থেকে আগত এক পরতর শক্তি, আনন্দ ও জ্ঞান তাদের অধিকার করে তাদের দিব্যতর প্রতিরূপে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে।

এইখানে অতিক্রম করা হয় আমাদের অবর জীবনের গুণত্রয়ের সব বৈষম্য আর শুরু হয় দিব্য প্রকৃতির মহত্তর ত্রিগুণ। তমঃ বা নিশ্চেষ্টতার অন্ধকার

থাকে না। তমসের স্থলে আসে এক দিব্য প্রশান্তি ও শান্ত শাশ্বত বিশ্রাম আর তা থেকে নির্ঝরিত হয় যেন স্থির একাগ্রতার পরম গর্ভাশয় থেকে ক্রিয়া ও জ্ঞানের খেলা। কোনো রাজসিক গতি থাকে না, থাকে না কোনো কামনা অথবা ক্রিয়া, সৃষ্টি বা অধিকারের জন্য সুখ ও দুঃখে ভরা প্রচেষ্টা, থাকে না উদ্বেগপূর্ণ সংবেগের ফলপ্রসূ নৈরাজ্য। রজসের স্থলে আসে স্বাধিকৃত সামর্থ্য ও শক্তির অপরিসীম ক্রিয়া কিন্তু ইহার প্রচণ্ডতম তীব্রতাতেও অন্তঃপুরুষের অচঞ্চল স্থৈর্য বিচলিত হয় না বা তার প্রশান্তির বিরাট ও গভীর আকাশে ও প্রদীপ্ত সব গহ্বরে কোনো কলঙ্ক রেখা পড়ে না। সত্যকে ধ'রে বন্দী করার জন্য জাল ফেলে বেড়ায় মনের এমন কোনো গঠনশীল আলোক থাকে না। সত্ত্বের স্থলে আসে এমন এক জ্যোতি ও অধ্যাত্ম আনন্দ যা অন্তঃপুরুষের গভীরতা ও অনন্ত অস্তিত্বের সহিত এক এবং নিগূঢ় সর্বজ্ঞতার প্রচ্ছন্ন মহিমা থেকে অব্যবহিতভাবে জাত এক অপরোক্ষ ও স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞানে অনুপ্রাণিত। ইহাই সেই মহত্তর চেতনা যাতে আমাদের অবর চেতনাকে রূপান্তরিত করা চাই, আর পরিবর্তিত করা চাই অবিদ্যার এই প্রকৃতিকে ও ত্রিগুণের অশান্ত বিষম সক্রিয়তাকে এই মহত্তরা জ্যোতির্ময়ী পরাপ্রকৃতিতে। প্রথমে তিনটি গুণের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা হই নিরাসক্ত ও অনুদ্বিগ্ন "নিস্ত্রৈগুণ্য": তবে ইহা হ'ল অন্তঃপুরুষের, আত্মার, চিৎপুরুষের স্বকীয় অবস্থার পুনঃপ্রাপ্তি-- যে পুরুষ মুক্ত হ'য়ে অবিদ্যাময়ী শক্তির মধ্যে প্রকৃতির গতিকে দেখে অবিচলিত স্থিরতার সহিত। যদি একে ভিত্তি ক'রে (জীবের) প্রকৃতিকেও, বিশ্ব-প্রকৃতির গতিকেও মুক্ত হ'তে হয় তবে তা হওয়া চাই এমন প্রদীপ্ত শান্তি ও নীরবতার মধ্যে ক্রিয়ার উপশমের দ্বারা যাতে আবশ্যকীয় সকল কর্মই করা হয় মনের বা প্রাণ-সত্তার সচেতন প্রতিক্রিয়া বা সহযোগ বা প্রবর্তন ছাড়াই আর তাতে থাকে না মননের কোনো ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা প্রাণিক অংশের সামান্য আবর্তও : ইহা করা চাই এক নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বশক্তি বা বিশ্বাতীত শক্তির প্রচোদনায়, প্রবর্তনায় ও পদ্ধতি অনুযায়ী। এক বিশ্বমন, বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বধাতুকেই কাজ করতে হবে, অথবা কাজ করতে হবে এমন এক শুদ্ধ বিশ্বাতীত আত্মা-শক্তি ও আনন্দকে যা আমাদের স্বকীয় ব্যক্তিগত সত্তা বা প্রকৃতির কোন গঠন থেকে ভিন্ন। এই যে মুক্তির অবস্থা তা কর্মযোগে আসতে পারে অহং ও কামনা ও ব্যক্তিগত প্রবর্তন ত্যাগের এবং বিশ্বাত্মা বা বিশ্বশক্তির কাছে সত্তার সমর্পণের মাধ্যমে; জ্ঞান যোগে তা আসতে পারে মননের নিবৃত্তি, মনের নীরবতা, বিশ্ব-চেতনা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্ফুরত্তা বা পরম সদ্‌বস্তুর নিকট সমগ্র সত্তার উন্মীলনের দ্বারা : ভক্তিযোগে তা আসতে পারে আমাদের জীবনের আরাধ্য ঈশ্বর-স্বরূপ সর্বানন্দময়ের হাতে আমাদের হৃদয় ও সমগ্র প্রকৃতির সমর্পণের মাধ্যমে। কিন্তু চরম পরিবর্তন আসে এক আরো সদর্থক ও স্ফুরন্ত অতি-

স্থিতির দ্বারা: এমন এক মহত্তর আধ্যাত্মিক অবস্থায়, "ত্রিগুণাতীত" অবস্থার সংক্রমণ বা রূপান্তর হয়—যার মধ্যে আমরা এক মহত্তর আধ্যাত্মিক স্ফুরত্তাতে অংশ লই; কেন না তিনটি অবর অসমগুণ পরিবর্তিত হয় এক সম ত্রিদল-গুণে—শাশ্বত শান্তি, আলোক ও শক্তিতে, দিব্য প্রকৃতির বিশ্রাম, গতি, জ্যোতিতে।

এই পরম সৌষম্য আসা সম্ভব নয় যতক্ষণ না অহমাত্মক সংকল্প ও রুচি ও কর্মের নিবৃত্তি হয় এবং আমাদের সীমিত বুদ্ধির উপশম হয়। ব্যষ্টি অহং-এর সচেষ্ট হওয়া বন্ধ হওয়া চাই, মনকে হ'তে হবে নীরব, কাম-সংকল্প যেন শেখে কোনো কিছু সূচনা না করতে। আমাদের ব্যক্তিভাবনাকে মিলিত হ'তে হবে তার উৎসের সহিত, আর সকল মনন ও প্রবর্তনা আসা চাই ঊর্ধ্ব থেকে। ধীরে ধীরে আমাদের নিকট অপাবৃত হবেন আমাদের ক্রিয়ারাজির নিগূঢ় অধীশ্বর এবং তিনি পরম সংকল্প ও জ্ঞানের নিশ্চিততা থেকে দিব্য শক্তিকে অনুমতি দেবেন; এই শক্তিই আমাদের মধ্যে সকল কর্ম সম্পাদন করবেন তাঁর করণস্বরূপ এক পবিত্র-করা উন্নীত প্রকৃতি নিয়ে: ব্যক্তিভাবনার ব্যষ্টি-কেন্দ্রটি হবে শুধু তাঁর এখানকার সকল কর্মের ধারক, তাদের গ্রহীতা ও প্রণালী, তাঁর সামর্থ্যের দর্পণ, এবং তাঁর আলোক, হর্ষ ও শক্তির জ্যোতির্ময় সহযোগী। কাজ করেও সে কাজ করবে না আর অপরা প্রকৃতির কোনো প্রতিক্রিয়াই তাকে স্পর্শ করবে না। এই পরিবর্তনের প্রথম অবস্থা হ'ল প্রকৃতির গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে ওঠা আর তার চূড়ান্ত ধাপ হ'ল তাদের রূপান্তর যার দ্বারা কর্মযোগ আমাদের তমসাবৃত মানুষী প্রকৃতির সংকীর্ণতার গর্ত থেকে বাহির হ'য়ে আরোহণ করে আমাদের ঊর্ধ্বে পরম সত্য ও পরম আলোকের অবাধ প্রসারের মধ্যে।

একাদশ অধ্যায়

কর্মের অধীশ্বর

আমাদের কর্মের অধীশ্বর ও চালক যিনি তিনি পরম এক, বিশ্বাত্মক ও পরাৎপর, সনাতন ও অনন্ত। তিনি বিশ্বাতীত অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় পরমার্থ-সৎ, আমাদের ঊর্ধ্বে অপ্রকাশিত ও অব্যক্ত অনির্বচনীয়; তবে তিনিই আবার সকল সত্তার পরমাত্মা, সকল জগতের অধীশ্বর, সকল জগতের অতীত, পরম আলোক ও দিশারী, সর্ব-সুন্দর ও সর্ব-আনন্দময়, প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক। তিনি বিরাট পুরুষ আর আমাদের চারিদিকের এইসব সৃজনশীলা শক্তি; তিনিই আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠাতা পুরুষ। যা-কিছু সব তিনি, আবার তিনি সবকিছুর অতিরিক্ত, আর আমরা না জানলেও, তাঁরই সত্তার সত্তা, তাঁরই শক্তির শক্তি আমরা, তাঁর চেতনা থেকে উৎপন্ন চেতনায় আমরা সচেতন; এমন কি আমাদের মর্ত্য-জীবন তাঁরই ধাতুতে নির্মিত, আর আমাদের মধ্যে অমর এমন কিছু আছে যা শাশ্বত আলোক ও আনন্দের স্ফুলিঙ্গ। যেভাবেই হ'ক—জ্ঞান, কর্ম, প্রেমের দ্বারা অথবা অন্য যে কোনো উপায়েই হ'ক আমাদের সত্তার এই সত্য জানা ও উপলব্ধি করা এবং এখানে বা অন্যত্র ইহাকে সার্থক করাই সকল যোগের উদ্দেশ্য।

* * *

কিন্তু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ও কঠোর পরিশ্রম করার পরই আমরা তাঁকে দেখতে পাই সত্যদর্শী চক্ষুতে, আর যদি আমরা চাই আমাদের পুনর্গঠন করতে তার সত্যকার প্রতিমূর্তিতে, তাহ'লে আমাদের সাধনা হ'তে হবে আরো দীর্ঘ, আরো কঠোর। কর্মের অধীশ্বর প্রথমেই সাধকের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন না। সর্বদা তাঁরই সামর্থ্য আবরণের পশ্চাতে সক্রিয় তবে ইহা ব্যক্ত হয় কেবল তখনই যখন আমরা পরিহার করি কর্মীর অহং-ভাব, আর যে পরিমাণে এই ত্যাগ আরো বেশী মাত্রায় বাস্তব হয়ে উঠতে থাকে, সেই পরিমাণে সেই সামর্থ্যের সাক্ষাৎ গতিও বাড়তে থাকে। তাঁর দিব্যশক্তির কাছে আমাদের সমর্পণ চরম একান্ত হ'লেই আমরা অধিকার পাই তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে থাকার। আর কেবল তখনই আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের কর্ম সহজ, স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠছে দিব্য-সংকল্পের ছাঁচে।

সুতরাং প্রকৃতির যে কোনো ভূমিতেই যেমন সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হবার পথে বিভিন্ন পর্যায় ও ক্রম থাকে, তেমন এই সিদ্ধির দিকেও আমাদের যাত্রা-পথে বিভিন্ন পর্যায় ও ক্রম থাকা অবশ্যম্ভাবী। সিদ্ধির পূর্বেই পূর্ণ

মহিমার দর্শন আমরা পেতে পারি অকস্মাৎ বা ধীরে ধীরে, একবার বা বহুবার কিন্তু যতক্ষণ না ভিত্তি সম্পূর্ণ হয়, ততদিন সে-দর্শন সংক্ষিপ্ত ও ঘনীভূত থাকে, ইহা কোনো দীর্ঘস্থায়ী ও সব-আবৃত-করা অনুভূতি নয়, বা কোনো চিরস্থায়ী সান্নিধ্যও নয়। দিব্য আত্মপ্রকাশের প্রাচুর্য, অনন্ত সমৃদ্ধি পরে আসে এবং তাদের সামর্থ্য ও তাদের তাৎপর্য উন্মুক্ত করে ক্রমে ক্রমে। অথবা এমন কি স্থির-দর্শনও আসা সম্ভব আমাদের প্রকৃতির শিখর-দেশে কিন্তু অধস্তন অঙ্গসমূহের সাড়া আসে শুধু ক্রমে ক্রমে। সকল যোগেই প্রথম প্রয়োজন হ'ল বিশ্বাস ও ধৈর্য। হৃদয়ের যে উদ্দীপনা ও অধীর সংকল্পের যে প্রচণ্ডতা স্বর্গের রাজত্বকে ছিনিয়ে নিতে চায় ঝড়ের মতো বেগে, তাদের প্রতিক্রিয়ার ফল বিষময় হতে পারে যদি এই সব দীন ও শান্ত সহায়কদের উপর তাদের উগ্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে উপেক্ষা করা হয়। আর এই দীর্ঘ ও দুরূহ পূর্ণযোগে অখণ্ড বিশ্বাস ও অবিচলিত ধৈর্য অপরিহার্য।

যোগের বন্ধুর ও সংকীর্ণ পথে এই বিশ্বাস ও দৃঢ়তা লাভ করা বা অভ্যাস করা দুরূহ, কারণ হৃদয় ও মন উভয়ই অধীর এবং আমাদের রাজসিক প্রকৃতির সংকল্পও উৎসুক কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত। মানুষের প্রাণময় প্রকৃতি সর্বদাই লালায়িত তার পরিশ্রমের ফলের জন্য, আর যদি দেখা যায় যে, ফল পাওয়া যাচ্ছে না বা অনেক দেরী হবে, তাহ'লে আদর্শে ও চালনায় তার বিশ্বাস আর থাকে না। কেননা তার মন সর্বদাই বিচার করে বিষয়ের বাহ্য রূপ দিয়ে, কারণ যে যুক্তিবুদ্ধিকে সে অতিমাত্রায় বিশ্বাস করে তার মজ্জাগত অভ্যাস ইহাই। যখন আমরা অনেকদিন কষ্টভোগ করি বা অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ি, তখন মনে মনে ভগবানকে দোষী করাই বা যে আদর্শ আমরা আমাদের সামনে রেখেছি, তা বর্জন করাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সহজ। কারণ আমরা বলি, "আমি সর্বশ্রেষ্ঠকে বিশ্বাস করেছি, কিন্তু তিনি আমাকে ফেলেছেন কষ্টভোগ, পাপ ও প্রমাদের মধ্যে।" আর না হয় বলি, "আমার সমস্ত জীবন আমি দিতে চেয়েছি এমন এক ভাবনার জন্য যা অভিজ্ঞতার রূঢ় ঘটনাবলীতে দেখা যায় ভুল ও নিরুৎসাহকর। অন্য সব মানুষ যেমন তাদের সব সংকীর্ণতা স্বীকার ক'রে সাধারণ অভিজ্ঞতার শক্ত মাটিতে বিচরণ করে, তা-ই করলেই আমার ভাল হ'ত।" এমন সব মুহূর্তে—আর এগুলি কখনো কখনো বারবার আসে, দীর্ঘকাল থাকে—সব উচ্চতর অনুভূতির কথা মানুষ ভুলে যায়, তার হৃদয় নিবদ্ধ থাকে শুধু তার তিক্ততায়। এই সমস্ত অন্ধকার পথের মধ্যেই সম্ভব হয় চিরদিনের মতো অধঃপতন বা দিব্য প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্তি।

কিন্তু যে সাধক দীর্ঘকাল দৃঢ়ভাবে এই পথে চলেছে, তার হৃদয়ের

বিশ্বাস বজায় থাকে প্রবলতম বিরুদ্ধ চাপেও; এমন কি যদি তা চাপা পড়ে বা মনে হয় পরাস্ত হ'য়েছে, তবু ইহা প্রথম সুযোগেই আবার দেখা দেয়। কারণ হীনতম বিচ্যুতি সত্ত্বেও, সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বিফলতার মধ্যেও হৃদয় বা বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্তর কিছু তাকে ধরে থাকে। কিন্তু এরূপ স্খলন বা মেঘাচ্ছন্নতাতে অভিজ্ঞ সাধকেরও উন্নতি ব্যাহত হয়, আর নবীনের পক্ষে তারা তো অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুতরাং প্রথম থেকেই দরকার পথের কঠিন দুরূহতার কথা প্রণিধান ক'রে তা স্বীকার করা, আর দরকার এমন বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যা ধীশক্তির কাছে মনে হ'তে পারে অন্ধ কিন্তু তবু যুক্তিবুদ্ধির চেয়ে যা বেশী জ্ঞানী। কারণ এই বিশ্বাস ঊর্ধ্ব থেকে পাওয়া এক অবলম্বন; বুদ্ধি ও ভাব সব তথ্য ছাড়িয়ে যে এক নিগূঢ় আলোক আছে, তারই প্রোজ্জ্বল ছায়া ইহা; ইহা এমন এক প্রচ্ছন্ন জ্ঞানের মর্ম যা অব্যবহিত বাহ্য ঘটনার অধীন নয়। যদি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় থাকে, তাহ'লে কর্মের মধ্যে তার সাফল্য পাওয়া যাবে এবং পরিশেষে ইহা উন্নীত ও রূপান্তরিত হবে এক দিব্য জ্ঞানের আত্মপ্রকাশে। গীতার এই আদেশ আমাদের সর্বদা পালন করা উচিত—"নিরুৎসাহ না হ'য়ে দৃঢ়চিত্তে অবিরত যোগাভ্যাস কর।" সংশয়ী বুদ্ধির কাছে সর্বদাই ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা আবৃত্তি করতে হবে, "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ"—আমি তোমাকে সকল পাপ ও অশুভ থেকে মুক্ত করব, শোক ক'রো না। পরিশেষে বিশ্বাসের চাঞ্চল্য বন্ধ হবে; কারণ আমরা দেখতে পাব তাঁর মুখ মণ্ডল, আর সর্বদা অনুভব করব দিব্য সান্নিধ্য।

* * *

আমাদের কর্মের অধীশ্বর আমাদের প্রকৃতির সহিত ব্যবহার করেন সমবেদনার সহিত, এমন কি যখন তিনি ইহার রূপান্তর সাধন করেন তখনও; তিনি সর্বদা কাজ করেন প্রকৃতির মধ্য দিয়েই, কোনো ইচ্ছামতো খামখেয়ালের দ্বারা নয়। আমাদের এই অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যেই আছে আমাদের পূর্ণতার সব উপাদান কিন্তু এই সব প্রাথমিক, বিকৃত, স্থানভ্রষ্ট ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিক্ষিপ্ত বা এমন এক শৃঙ্খলা থাকে যা সামান্য ও অপূর্ণ। ধৈর্যের সহিত এই সব উপাদানের সিদ্ধি, শুদ্ধি, পুনর্বিন্যাস, পুনর্গঠন ও রূপান্তর সাধন দরকার; শুধু জোর ক'রে, অস্বীকার করে তাঁদের টুকরো টুকরো ক'রে কেটে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া, বিনষ্ট বা বিকৃত বা নিশ্চিহ্ন করা চলবে না। এই যে জগৎ ও আমরা তার অধিবাসী—এসব তাঁরই সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি, আর তিনি এসবকে এমনভাবে ব্যবহার করেন, যা আমাদের সংকীর্ণ ও অজ্ঞান মন বুঝতে পারে না যদি না ইহা নীরব হ'য়ে দিব্য জ্ঞানের নিকট উন্মুক্ত হয়। আমাদের সব প্রমাদের মধ্যেও এমন এক সত্যের সারবস্তু আছে, যা আমাদের হাতড়ে

বেড়ানো বুদ্ধির কাছে তার অর্থ প্রকাশ করতে সচেষ্ট। মানুষী বুদ্ধি প্রমাদকে আর তার সাথে সত্যকে কেটে বাদ দেয়, আর তার স্থলে আনে এক অর্ধ-সত্য, অর্ধ-প্রমাদ, কিন্তু দিব্য প্রজ্ঞা জেনেও এসব ভুল চলতে দেন যতদিন না আমরা সেই সত্যে উপনীত হ'তে পারি যা সকল রকম মিথ্যা আবরণের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত থাকে। আমাদের সব পাপ এমন এক অন্বেষু সামর্থ্যের ভ্রান্ত পদক্ষেপ যার লক্ষ্য পাপ নয়, যার লক্ষ্য সিদ্ধি, এমন কিছু যাকে আমরা বলতে পারি দিব্য পুণ্য। অনেক সময় তারা এমন এক গুণের অবগুণ্ঠন যাকে রূপান্তরিত ক'রে মুক্ত করা চাই এই কুৎসিৎ ছদ্মবেশ থেকে, তা না হ'লে নিখুঁত বিশ্ব-বিধানের মধ্যে তাদের স্থান দেওয়া হ'ত না, বা স্থান হলেও বেশী দিন চলতে দেওয়া হ'ত না। আমাদের কর্মের অধীশ্বর ভুল-করা বোকা বা উদাসীন দ্রষ্টা নন বা অপ্রয়োজনীয় অমংগলের বিলাস ক'রে মজা দেখেন না। তিনি আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি থেকে, আমাদের পুণ্য থেকে বেশী বোঝেন।

আমাদের প্রকৃতি শুধু যে সংকল্পে ভ্রান্ত ও জ্ঞানে অবিদ্যাচ্ছন্ন তা নয়, সামর্থ্যেও ইহা দুর্বল, কিন্তু দিব্যশক্তি ঠিকই আছে এবং যদি আমরা ইহাতে বিশ্বাস রাখি তাহ'লে ইহা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ও আমাদের সব ত্রুটিকে ও আমাদের সামর্থ্যকে ব্যবহার করবে দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য। যদি আমাদের অব্যবহিত লক্ষ্য ব্যর্থ হয় তার কারণ তিনিই এই ব্যর্থতা চেয়েছেন অনেক সময় অব্যবহিত ও সম্পূর্ণ সাফল্যে আমরা যে সিদ্ধি লাভ করি তার চেয়ে আরো সত্যকার সিদ্ধি আসে আমাদের ব্যর্থতা বা মন্দ ফলের সঠিক পন্থায়। আমরা যদি কষ্ট পাই, তার কারণ আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে প্রস্তুত করা চাই সেই আনন্দের জন্য যা বিরল হলেও সম্ভব। যদি আমরা হোঁচট খাই, তার কারণ আমাদের শেষ পর্যন্ত শিখতে হবে আরো সুষ্ঠুভাবে চলার রহস্য। এমন কি শান্তি, শুদ্ধি ও সিদ্ধি পাবার জন্যও যেন আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় না তাড়াহুড়ো করি। শান্তি আমাদের চাই-ই কিন্তু কোনো রিক্ত বা বিধ্বস্ত প্রকৃতির শান্তি নয় বা এমন সব বিনষ্ট বা বিকৃত সামর্থ্যের শান্তি নয় যেগুলির তীব্রতা, তেজ ও শক্তি নষ্ট করায় তারা চঞ্চল হ'তে অক্ষম হ'য়ে পড়েছে। শুদ্ধি আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই কিন্তু কোনো শূন্যতা বা নিরানন্দ ও কঠোর শীতলতার শুদ্ধি নয়। সিদ্ধিলাভ আমাদের কর্তব্য কিন্তু এমন সিদ্ধি নয় যার অস্তিত্ব নির্ভর করে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার উপর বা অনন্তের সদা আত্ম-প্রসারশীল পটের যথেচ্ছ পূর্ণ বিরতির উপর। আমাদের উদ্দেশ্য দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া কিন্তু দিব্য প্রকৃতি কোনো মানসিক বা নৈতিক অবস্থা নয়, ইহা এক আধ্যাত্মিক অবস্থা যা সাধন করা দুরূহ, এমন কি বুদ্ধি দিয়ে যার ধারণা

করাও দুরূহ। কি করণীয় তা আমাদের কর্মের ও আমাদের যোগের অধীশ্বর জানেন, আর আমাদের উচিত তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া যাতে তিনি আমাদের মধ্য দিয়ে তা করেন নিজের উপায়ে ও নিজের ধারায়।

অবিদ্যার গতিবিধির মর্ম অহমাত্মক, আর যতদিন আমরা ব্যক্তিসত্ত্ব স্বীকার করি ও আমাদের সম্পূর্ণ প্রকৃতির অর্ধ-আলোক ও অর্ধ-শক্তির ক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকি ততদিন আমাদের পক্ষে অহং-ভাব ত্যাগ করার মতন দুরূহ আর কিছু নেই। কর্মের সংবেগ বর্জন করে অহংকে অভুক্ত রাখা বা আমাদের মধ্য থেকে ব্যক্তিসত্ত্বের সকল চেষ্টা ছিন্ন করে অহংকে বিনাশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রশান্তির ভাব-সমাধিতে বা দিব্য প্রেমের উল্লাসে নিমগ্ন আত্ম-বিস্মৃতির মধ্যে তার উন্নয়নও অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু আমাদের যে সমস্যা আরো দুরূহ, তা হ'লো সত্যকার ব্যক্তিকে মুক্ত করে এমন দিব্য মানবত্বলাভ, যে মানবত্ব হবে দিব্য-শক্তির বিশুদ্ধ আধার ও দিব্য-ক্রিয়ার নিখুঁত যন্ত্র। দৃঢ়ভাবে একটির পর একটি পদক্ষেপে এগুতে হবে, কষ্টের পর কষ্ট পুরোপুরি ভোগ করে সে সবকে সম্পূর্ণ জয় করতে হবে। একমাত্র দিব্য প্রজ্ঞা ও সামর্থ্যই সক্ষম আমাদের জন্য এই সব সাধন করতে আর ইহা এই সব করবেও যদি আমরা তার নিকট আত্মসমর্পণ করি পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এবং তার সব কর্মপ্রণালী অনুসরণ করি ও তাতে সম্মতি দিই অচঞ্চল সাহস ও ধৈর্যের সহিত।

এই দীর্ঘ পথে প্রথম পদক্ষেপ হ'ল আমাদের ও জগতের অন্তঃস্থ ভগবানের কাছে আমাদের সকল কর্ম যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা; ইহা মন ও হৃদয়ের এমন এক ভঙ্গি যা আরম্ভ করা তত দুরূহ নয় কিন্তু যাকে একান্ত-ভাবে অকপট ও সর্বব্যাপী করা অতি দুরূহ। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ল সর্বকর্ম-ফলত্যাগ; কারণ যজ্ঞের যে একমাত্র সত্যকার অবশ্যম্ভাবী ও পরম কাম্য ফল ও যা একমাত্র প্রয়োজনীয়, তা হ'ল আমাদের মধ্যে দিব্য সান্নিধ্য ও দিব্য চেতনা ও শক্তি; আর যদি ইহা পাওয়া যায়, তাহ'লে অন্য সব কিছুও তার সাথে যোগ হবে। ইহার অর্থ আমাদের প্রাণময় সত্তার, আমাদের কাম-পুরুষের ও কাম-প্রকৃতির মধ্যকার অহমাত্মক সংকল্পের রূপান্তর আর এই কাজ অপরটির চেয়ে অনেক বেশী দুরূহ। তৃতীয় পদক্ষেপ হ'ল কেন্দ্রীয় অহং-ভাব, এবং এমন কি কর্মীর অহং-বোধও ত্যাগ করা; এইটিই সর্বাপেক্ষা দুরূহ রূপান্তর আর ইহার নিখুঁত সাধন সম্ভব হয় না যদি প্রথম দুটি কাজ নিষ্পন্ন না হয়; কিন্তু এই প্রথম কাজগুলিও সম্পূর্ণ শেষ করা যায় না, যদি না তৃতীয়টি আসে সাধনার গতিকে বিজয়মণ্ডিত করতে আর যদি অহং-ভাবকে ধ্বংস ক'রে ইহা কামনার মূলোচ্ছেদ না করে। যখন প্রকৃতি থেকে অহং-বোধ উৎপাটিত হয়, কেবল তখনই সাধক জানতে পারে তার আসল

ব্যক্তিকে যে ঊর্ধ্বে অবস্থিত—ভগবানের অংশ ও সামর্থ্য হিসাবে, আর কেবল তখনই সে সক্ষম হয় দিব্য-শক্তির সংকল্প ছাড়া অন্য সকল প্রবর্তক-শক্তি বর্জন করতে।

* * *

এই সর্বশেষ অখণ্ডতাসাধিকা প্রচেষ্টার মধ্যেও বিভিন্ন পর্যায় আছে; কারণ ইহা সদ্য সদ্য বা দীর্ঘ পথ অতিক্রম না ক'রে নিষ্পন্ন করা যায় না, দীর্ঘ সাধনার পরই ক্রমশঃ লক্ষ্যের নিকটবর্তী হওয়া যায় এবং পরিশেষে তথায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। প্রথম যে মনোভাব নিতে হবে তা এই যে, আমরা যে কর্মী এই ধারণা যেন আমাদের আর না থাকে, আর দৃঢ়ভাবে এই উপলব্ধি করা দরকার যে, আমরা বিশ্বশক্তির এক যন্ত্র মাত্র। প্রথম মনে হয় যে একটি শক্তি নয়, বহু বিশ্বশক্তি আমাদের চালনা করছে; কিন্তু এই শক্তিগুলিকে অহং-এর পরিপোষক ক'রে তুলতে পারা যায়, এই দৃষ্টি মনকে মুক্ত করে, কিন্তু প্রকৃতির বাকী অংশকে নয়। এমন কি যখন আমরা সব কিছুকে একই বিশ্বশক্তির ক্রিয়া ব'লে জানতে পারি আর জানি যে তার পশ্চাতে ভগবান আছেন, তখনো তাতে মুক্তি না আসতে পারে। যদি কর্মীর অহং-ভাব দূর হয় তাহ'লে যন্ত্রের অহং-ভাব এসে তার স্থান নিতে পারে বা ছদ্মবেশে তাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে। জগতের ইতিহাসে এই রকম অহং-ভাবের দৃষ্টান্ত অনেক, আর অন্য প্রকার অহং-ভাব থেকে এই অহং-ভাব আরো নিবিড় ও বিশাল হ'তে পারে; যোগেও সেই একই বিপদ রয়েছে। কোনো লোক বড় বা ছোট পরিধির মধ্যে জননেতা বা প্রধান হ'য়ে ওঠে, আর অনুভব করে যে, এমন এক শক্তিতে সে পূর্ণ যা সে জানে তার অহং-শক্তির অতীত; সে হয়ত বুঝতে পারে যে, তার মধ্য দিয়ে কাজ করছে কোনো অদৃষ্ট বা অজ্ঞেয় রহস্যময় সংকল্প বা অন্তরে অতি সমুজ্জ্বল কোনো আলোক। তার মননের, ক্রিয়ার বা সৃজনশীল প্রতিভার ফলও হয় অসাধারণ। সে হয় কোনো প্রচণ্ড ধ্বংস সাধন করে যাতে মানবজাতির পথ পরিষ্কার হয়, নয় এমন মহান কিছু নির্মাণ করে যা ইহার সাময়িক বিশ্রামস্থান হয়। সে উৎপীড়ক, নয় আলোক ও শান্তিদাতা, সৌন্দর্যস্রষ্টা বা জ্ঞানের দূত হয়। অথবা যদি তার কর্ম ও ইহার পরিণাম নিম্ন ধরনের হয় ও তাদের পরিসরও সীমাবদ্ধ হয়, তবু এ-সবের সাথে তার এক দৃঢ় বোধ থাকে যে, সে এক যন্ত্র এবং তার ব্রত ও কার্যের জন্য তাকে নির্বাচন করা হ'য়েছে। যে সব ব্যক্তির এই নিয়তি ও এই সব সামর্থ্য থাকে, তারা সহজেই বিশ্বাস করে ও ঘোষণাও করে যে, তারা ভগবান বা অদৃষ্টের হাতে যন্ত্র মাত্র; কিন্তু এই ঘোষণার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই যে, এমন এক তীব্র ও অতিস্ফীত অহং-ভাব তাদের মধ্যে আসতে বা আশ্রয় নিতে পারে যা সাধারণ মানুষের জাহির করার সাহস নেই বা নিজেদের মধ্যে

ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। আর যদি এই রকমের লোকেরা ভগবানের কথা বলে তা হ'লে প্রায়শঃই তার অর্থ হ'ল, তাঁর এমন এক প্রতিমূর্তি খাড়া করা যা তাদের নিজেদের বা নিজেদের প্রকৃতির বৃহৎ ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়, যেন ইহা তাদের সংকল্প ও মনন, গুণ ও শক্তির সদৃশ লোকের পরিপোষক দেবতা-স্বরূপ। তারা যে অধীশ্বরের সেবা করে, তা তাদের অহং-এর এই বর্ধিত মূর্তি। যোগের পথে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে যখন প্রবল কিন্তু অশুদ্ধ সব প্রাণিক প্রকৃতি বা মন অতি সহজেই উন্নতি লাভ ক'রে তাদের মহত্ত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, গর্ব বা কামনাকে তাদের আধ্যাত্মিক অন্বেষণের মধ্যে প্রবেশ করতে দিয়ে ইহার উদ্দেশ্যের শুদ্ধতা দূষিত করে; তাদের ও তাদের প্রকৃত সত্তার মধ্যে এক বর্ধিত অহং এসে দাঁড়ায় আর দিব্য বা অদিব্য যে বৃহত্তর অ-দেখা শক্তি তাদের মাধ্যমে কাজ করে, যার অস্তিত্ব তারা অস্পষ্ট বা তীব্রভাবে বোধ করে, তার থেকে পাওয়া ক্ষমতাকে সেই অহং অধিকার করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে। আমাদের শক্তির চেয়ে এক বৃহত্তর শক্তি আছে আর আমরা তার দ্বারা চালিত হচ্ছি—এরূপ কোন বুদ্ধিগত অনুভূতি বা প্রাণিক বোধ অহং থেকে মুক্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

আমাদের মধ্যে বা ঊর্ধ্বে আমাদের চালক এক বৃহত্তর শক্তির এই অনুভূতি, এই বোধ কোনো ভ্রান্তি বা আত্মগরিমার উন্মাদনা নয়। যারা এরূপ বোধ করে ও দেখে, তাদের দৃষ্টি সাধারণের অপেক্ষা বৃহত্তর এবং তারা সীমিত দেহগত বুদ্ধি ছাড়িয়ে এক পা অগ্রসর হ'য়েছে বটে কিন্তু তারা পূর্ণদৃষ্টি বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি পায়নি। কেন না তারা মনে স্বচ্ছ নয়, অন্তঃপুরুষেও সচেতন নয়, তারা যে প্রবুদ্ধ হ'য়েছে তা তাদের প্রাণিক অংশেই বেশী, আত্মার অধ্যাত্ম ধাতুতে ততটা নয়; এই সব কারণে তারা ভগবানের সচেতন যন্ত্র হ'তে বা অধীশ্বরের সম্মুখে আসতে অক্ষম, তাদের ব্যবহার করা হয় তাদের প্রমাদশীল অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে। ভগবানকে বড়জোর তারা জানে এক অদৃষ্ট বা বিশ্বশক্তি বলে, আর না হয় কোনো সীমিত দেবতাকে ভগবান নামে অভিহিত করে, অথবা যা আরো খারাপ, এমন কোনো আসুরিক বা দানবীয় শক্তিকে তারা ভগবান বলে যা ভগবানকে ঢেকে রাখে। এমন কি কোনো কোনো ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতাও সাম্প্রদায়িক ভগবানের বা জাতীয় ভগবানের ব, ভয় ও শাস্তির শক্তির বা সাত্ত্বিক প্রেম ও করুণা ও পুণ্যের দেবতার মূর্তি খাড়া করেছে—মনে হয় তারা পরম এক ও সনাতনের দেখা পায়নি। ভগবানের যে মূর্তি তারা তৈরী করে ভগবান তা স্বীকার ক'রে নিয়ে তার মাধ্যমে তাদের মধ্যে নিজের কাজ করেন। কিন্তু যেহেতু সেই এক শক্তিকে অনুভব করা হয় আর তা কাজ করে তাদের অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে এবং অপরদের চেয়ে আরো বেশী তীব্র ভাবে, সেহেতু

অহং-ভাবের প্রবর্তক তত্ত্বও অপরদের অপেক্ষা তাদের মধ্যেই আরো বেশী তীব্র হ'তে পারে। তখনো এক উন্নত রাজসিক সাত্ত্বিক অহং তাদের অধিকার ক'রে রাখে এবং এসে দাঁড়ায় তাদের ও অখণ্ড সত্যের মাঝে। এমন কি ইহাও কিছু একটা, এক উপক্রম, যদিও প্রকৃত ও সিদ্ধ অনুভূতি থেকে ইহা অনেক দূরে। যারা মানুষী বন্ধনের কিছু ভেঙেছে কিন্তু শুদ্ধতা পায় নি, জ্ঞান পায় নি, তাদের ভাগ্যে আরো বেশী দুর্দশা আসার সম্ভাবনা, কারণ তারা যন্ত্র হ'তে পারে তবে ভগবানের যন্ত্র নয়; অধিকাংশ সময়ই তারা ভগবানের নাম নিয়ে অজ্ঞাতসারেই সেবা করে বৃত্রদের—ভগবানের সব মুখোসকে ও তাঁর তামসী সব বিপরীত শক্তিকে, তমসার সব সামর্থ্যকে।

আমাদের প্রকৃতি বিশ্বশক্তির আধার হবে বটে কিন্তু ইহার অবর দিকের বা রাজসিক কি সাত্ত্বিক গতির নয়; ইহা বিশ্বসংকল্প অনুযায়ী কাজ করবে তবে এক মহত্তর মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের আলোয়। যন্ত্রের মনোভাবে কোনো প্রকার অহং-ভাব থাকা চলবে না, এমন কি যখন আমরা আমাদের মধ্যে শক্তির মহত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হই, তখনো নয়। জ্ঞাতসারে হ'ক বা অজ্ঞাতসারে হ'ক, প্রতি মানুষটিই কোন না কোনো বিশ্বশক্তির যন্ত্র, আর আন্তর সান্নিধ্য বাদ দিলে, এক ক্রিয়ার সহিত অপর এক ক্রিয়ার, এক রকম উপায়ের সহিত অন্য রকম উপায়ের এমন কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই যাতে অহমাত্মক গর্বের মূর্খামিকে সংগত বলা যেতে পারে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে যা পার্থক্য তা পরম চিৎ-পুরুষের অনুগ্রহ; দিব্য-শক্তি প্রবাহিত হয় যেখানে খুসি সেখানে, আজ একজনকে, আগামীকাল অপর একজনকে পূর্ণ করে বাক্ বা শক্তি দিয়ে। যদি পাত্র-নির্মাতার তৈরী একটি পাত্র অপর একটির চেয়ে বেশী ভালো হয়, সে কৃতিত্ব পাত্রের নয়, পাত্র-নির্মাতার। আমাদের মনের ভাব কখনো এমন হবে না—"এই আমার ক্ষমতা" বা "দেখ আমার মধ্যে ভগবানের শক্তি।" বরং তা হবে—"এই মন ও দেহে এক দিব্য শক্তি কাজ করছে, আর ইহা সেই একই শক্তি যা কাজ করে সকল মানুষের মধ্যে ও প্রাণীর মধ্যে, উদ্ভিদে ও ধাতুতে, চেতন ও সজীব বিষয়ে এবং সেই সব বিষয়েও যেগুলি মনে হয় নিশ্চেতন ও নিষ্প্রাণ।" এই যে উদার দৃষ্টি যে পরম এক সকলের মধ্যে কর্মরত এবং সকল জগৎই দিব্য ক্রিয়া ও ক্রম-আত্ম-প্রকাশের সম যন্ত্র—ইহা যদি আমাদের সমগ্র অনুভূতি হয়, তাহ'লে ইহা আমাদের মধ্য থেকে রাজসিক অহং-ভাব দূর করার সহায় হবে, আর এমন কি আমাদের প্রকৃতি থেকে সাত্ত্বিক অহং-বোধও শুরু করবে বিলীন হ'তে।

অহং-এর এই রূপটির বিনাশের অনিবার্য পরিণাম হ'ল প্রকৃত যান্ত্রিক ক্রিয়া আর ইহাই পূর্ণ কর্মযোগের সার। কারণ যতদিন আমাদের মধ্যে যান্ত্রিক-অহং বজায় থাকে, ততদিন আমরা নিজেদের কাছে ভান করতে পারি

যে, আমরা ভগবানের সচেতন যন্ত্র কিন্তু আসলে আমাদের চেষ্টা হ'ল দিব্য-শক্তিকেই আমাদের নিজেদের সব কামনার বা অহমাত্মক উদ্দেশ্যের যন্ত্র করা। আর এমন কি যখন অহংকে বশে আনা হয় কিন্তু বাদ দেওয়া হয় না, তখন আমরা দিব্য-কর্মের যন্ত্র হ'তে পারি কিন্তু আমরা হব অপূর্ণ যন্ত্র আর আমাদের সব মানসিক প্রমাদ, প্রাণিক বিকৃতি বা দৈহিক প্রকৃতির বদ্ধমূল অসামর্থ্য দিয়ে বিচ্যুত বা ব্যাহত করব ক্রিয়ার ধারা। যদি এই অহং বিলীন হয়, তাহ'লে আমরা সত্যই শুধু যে এমন শুদ্ধ যন্ত্র হ'য়ে উঠতে পারি যা আমাদের চালক দিব্য হস্তের প্রতি নির্দেশে সচেতনভাবে সম্মতি দেয়, তা নয়, আমরা আরো জানতে পারি আমাদের আসল প্রকৃতি---জানব যে আমরা সেই এক সনাতন অনন্তের চিন্ময় অংশ যাকে পরমা শক্তি নিজের মধ্যে বাহিরে রেখেছেন নিজের কাজের জন্য।

* * *

দিব্য-শক্তির কাছে যান্ত্রিক অহং সমর্পণ করার পর দরকার আর একটি বৃহত্তর পদক্ষেপ নেওয়া। এই দিব্যশক্তি যে এক বিশ্বশক্তি যা মন, প্রাণ ও জড়ের ভূমিতে আমাদের ও সকল সৃষ্ট বিষয়কে পরিচালিত করে---এই জানাই যথেষ্ট নয়; কারণ ইহা অপরা প্রকৃতি এবং যদিও সেখানে দিব্য জ্ঞান, আলোক, সামর্থ্য প্রচ্ছন্ন থাকে এবং অবিদ্যার মধ্যে কর্মরত থেকে তার আবরণ আংশিকভাবে ছিন্ন ক'রে তাদের স্বরূপের কিছুটা ব্যক্ত করতে অথবা ঊর্ধ্ব থেকে নেমে এসে এই সব অবর ক্রিয়াধারাগুলিকে ঊর্ধে তুলতে সক্ষম তবু - এমন কি যদিও আমরা পরম এককে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনে, আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন প্রাণগতিতে, আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন শারীর চেতনায় উপলব্ধি করি তাহ'লেও---স্ফুরন্ত অংশগুলিতে অপূর্ণতা রয়ে যায়। পরম সামর্থ্যের দিকে সাড়াতে বিচ্যুতি থাকে, ভগবানের মুখের উপর আবরণ থাকে, সর্বদাই থাকে অবিদ্যার মিশ্রণ। যখন আমরা দিব্য-শক্তির নিকট উন্মুক্ত হই তাঁর সেই শক্তির সত্যের মধ্যে যা এই অপরা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে, কেবল তখনই আমরা সক্ষম হই তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিখুঁত যন্ত্র হ'তে।

কর্মযোগের যা লক্ষ্য হওয়া চাই তা শুধু মুক্তি নয়, সিদ্ধি। ভগবান কাজ করেন আমাদের প্রকৃতির মধ্য দিয়ে এবং আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী; যদি আমাদের প্রকৃতি অপূর্ণ হয়, তাহ'লে কর্মও হবে অপূর্ণ, মিশ্রিত, অপ্রচুর। এমন কি ইহা দূষিত হ'তে পারে নানাবিধ বিষম ভ্রান্তি, অনৃত নৈতিক দুর্বলতা, বিক্ষেপকারী প্রভাবের দ্বারা। এমন কি এখনো আমাদের মধ্যে ভগবানের কাজ হবে, তবে তা হবে আমাদের দুর্বলতা অনুযায়ী, তা ইহার উৎসের শক্তি ও বিশুদ্ধি অনুযায়ী হবে না। যদি আমাদের যোগ পূর্ণযোগ না হ'ত, যদি আমরা চাইতাম শুধু আমাদের মধ্যকার আত্মার মুক্তি বা প্রকৃতি

থেকে বিচ্ছিন্ন পুরুষের নিশ্চল স্থিতি, তাহ'লে এই স্ফুরন্ত অপূর্ণতাতে কিছু এসে যেত না। শান্ত ও অক্ষুব্ধ থেকে, অবসন্ন বা উৎফুল্ল না হ'য়ে, পূর্ণতা বা অপূর্ণতা, দোষ বা গুণ, পাপ বা পুণ্য—কোনো কিছুকেই আমাদের নিজেদের বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, এই মিশ্রণ যে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের ক্ষেত্রে তার গুণের ক্রিয়ার ফল তা বুঝে আমরা চিৎ-পুরুষের নীরবতার মধ্যে সরে গিয়ে প্রকৃতির সব ক্রিয়াকে দেখতে পারতাম শুদ্ধ ও নির্লিপ্ত ভাবে। কিন্তু এক অখন্ড উপলব্ধির মধ্যে ইহা হ'তে পারে পথের এক সোপান মাত্র, আমাদের শেষ বিশ্রামস্থান নয়। কারণ আমাদের লক্ষ্য ভগবানকে উপলব্ধি করা শুধু পরম চিৎ-পুরুষের নিশ্চলতায় নয়, প্রকৃতির গতিবৃত্তিরও মধ্যে। আর এই উপলব্ধি পূর্ণ হয় না যদি না আমরা ভগবানের সান্নিধ্য ও শক্তি অনুভব করি আমাদের কর্মের প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি গতিতে, প্রতি আকারে, আমাদের সংকল্পের প্রতি আবর্তনে, প্রতিটি মনন, বেদনা ও সংবেগে। অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে, এক অর্থে অবিদ্যার প্রকৃতির মধ্যেও আমরা তা অনুভব করতে পারি, কিন্তু তখন যে দিব্য শক্তি ও সান্নিধ্য অনুভব করব, তা তার ছদ্মবেশে, তার খর্ব ও অবর মূর্তিতে। আমাদের দাবী আরো মহত্তর, আমরা চাই যে, আমাদের প্রকৃতি ভগবানের সামর্থ্য হবে ভগবানের সত্যের মধ্যে, আলোকের মধ্যে, সনাতন আত্ম-সচেতন সংকল্পের শক্তির মধ্যে, শাশ্বত বিদ্যার প্রসারের মধ্যে।

অহং-এর আবরণ দূর হ'লে দূর হবে প্রকৃতি ও তার যে সব অবর গুণ আমাদের মন, প্রাণ ও দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের আবরণ। যে মুহূর্তে অহং-এর গন্ডী মিলিয়ে যেতে শুরু করে, তখনই আমরা দেখি কিভাবে ঐ আবরণ গঠিত আর আমাদের মধ্যে দেখতে পাই বিশ্ব-প্রকৃতির ক্রিয়া এবং বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতরে বা পশ্চাতে আমরা অনুভব করি বিশ্বাত্মার সান্নিধ্য ও জগদ্‌ব্যাপী ঈশ্বরের সব স্ফুরত্তা। এই সব ক্রিয়াধারার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছেন যন্ত্রের অধীশ্বর, আর এমন কি ক্রিয়াধারার মধ্যেও আছে তাঁর স্পর্শ এবং এক মহান নির্দেশক বা ব্যবস্থাপক প্রভাবের প্রেরণা। আর আমরা অহং বা অহং-শক্তির সেবা করি না, আমরা মান্য করি জগদীশ্বরকে ও তাঁর বিবর্তনের সংবেগকে। প্রতি পদে আমরা সংস্কৃত শ্লোকের ভাষায় বলি, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—[হে প্রভু, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হ'য়ে তুমি আমায় যেমন নিযুক্ত কর, আমি সেই মতো কাজ করি।] কিন্তু তবু এই ক্রিয়াটি দুইটি বিভিন্ন রকমের হ'তে পারে—একটি শুধু প্রদীপ্ত, অন্যটি মহত্তর পরাপ্রকৃতিতে রূপান্তরিত ও উন্নীত। কারণ আমরা ক্রিয়ার সেই পথ দিয়েই আগের মতো চলতে পারি, যে পথ আমাদের প্রকৃতি অনুমোদন ও অনুসরণ করত যখন আমরা তার

দ্বারা ও তার অহং-ভাবের ভ্রান্তির দ্বারা "যন্ত্রারূঢ়বৎ" আবর্তিত হ'তাম তবে এখন তা করি যন্ত্র-প্রণালীকে ও তার পশ্চাতে যে কর্মের অধীশ্বরকে আমরা অনুভব করি তাঁর দ্বারা তাঁর জগৎ-উদ্দেশ্যের জন্য ইহার ব্যবহারকে সম্যক্ প্রণিধান করে। বস্তুতঃ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনের স্তরে অনেক মহাযোগী যতদূর পৌঁছেছেন এই জ্ঞান তত দূরেরই জ্ঞান; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে শুধু যে ইহাই করা প্রয়োজন তা নয়, কারণ আরো মহত্তর অতিমানসিক সম্ভাবনা আছে। আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মন ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব, আর সম্ভব পরমা মাতার আদি দিব্য সত্য-শক্তির জীবন্ত সান্নিধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে কাজ করা। আমাদের গতি তাঁর গতির সহিত এক হয়ে তার মধ্যে মগ্ন হবে, আমাদের সংকল্প এক হবে তাঁর সংকল্পের সহিত, আমাদের ক্রিয়া-শক্তি নির্মুক্ত হবে তাঁর ক্রিয়া-শক্তির মধ্যে, আমরা অনুভব করব যে তিনি আমাদের মধ্য দিয়ে কাজ করছেন এক পরমা প্রজ্ঞা-শক্তিতে ব্যক্ত ভগবান রূপে। আর আমরা রূপান্তরিত মন, প্রাণ দেহকে জানব তাদের অতীত এমন এক পরমা জ্যোতি ও শক্তির প্রণালী হিসাবে যা তার পদক্ষেপে অভ্রান্ত কারণ ইহা অতিস্থিত এবং ইহার জ্ঞানে সমগ্র। এই জ্যোতি ও শক্তির শুধু যে গ্রহীতা, প্রণালী, যন্ত্র আমরা হব তা নয়, আমরা তার অংশও হব এক পরম উন্নীত স্থায়ী অনুভূতির মধ্যে।

এই শেষ সিদ্ধিলাভের আগেই আমরা ভগবানের সহিত কর্মে মিলিত হ'তে পারি, তাঁর পরম জ্যোতির্ময় শিখরসমূহে না হ'লেও তার চরম প্রসারের মধ্যে, কারণ তখন আর আমরা শুধু প্রকৃতি বা প্রকৃতির করণগুলি দেখি না, আমরা আমাদের বিভিন্ন দৈহিক সঞ্চালনের মধ্যে, আমাদের বিভিন্ন স্নায়বিক ও প্রাণিক প্রতিক্রিয়া ও আমাদের বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়াধারার মধ্যে এমন এক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হই যা আমাদের দেহ, প্রাণ ও মন অপেক্ষা মহত্তর এবং যা আমাদের সীমিত করণসমূহ অধিকার ক'রে চালনা করে তাদের সবগতিকে। তখন আর এ বোধ থাকে না যে আমরা চলছি, চিন্তা বা অনুভব করছি, বোধ করি যে আমাদের মধ্যে সেই শক্তিই চলছে, অনুভব ও চিন্তা করছে। এই যে শক্তি আমরা অনুভব করি তা ভগবানেরই বিশ্ব-শক্তি; ইহাই আবৃত বা অনাবৃত হয়ে কাজ করে—হয় সরাসরি, নয় বিশ্বের মধ্যে সকল সত্তাকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে, ইহাই সেই অদ্বয় ক্রিয়া-শক্তি একমাত্র যা অবস্থিত এবং একমাত্র যার দ্বারাই সম্ভব হয় সার্বিক ও ব্যষ্টি ক্রিয়া। কারণ এই শক্তি স্বয়ং ভগবান তাঁর সামর্থ্যের সমবায়ে; সকল কিছুই সেই কর্ম-সামর্থ্য, মনন ও জ্ঞানের সামর্থ্য, প্রভুত্ব ও ভোগের সামর্থ্য, প্রেমের সামর্থ্য। যে কর্মের অধীশ্বর নিজেই এই শক্তি, আর এই শক্তির মাধ্যমে সকল ভূত, সকল ঘটনা অধিগত, অধিষ্ঠান ও উপভোগ করছেন ও এই সব হ'চ্ছেন তাঁর সম্বন্ধে আমরা সর্বদাই ও সর্ববিষয়ে

আমাদের মধ্যে ও অপরের মধ্যে সচেতন হয়ে কর্মের মাধ্যমে উপনীত হব দিব্য মিলনে এবং কর্মে সেই সার্থকতার দ্বারা সেই সব কিছুই লাভ ক'রব যা অন্যেরা লাভ ক'রেছে পরা ভক্তির বা শুদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে। কিন্তু ইহার পরও আর এক পদক্ষেপ নেওয়া আমাদের কর্তব্য—এই বিশ্বের সহিত তাদাত্ম্য থেকে দিব্য অতিস্থিতির তাদাত্ম্যে উত্তরণ। কর্মের ও আমাদের অধীশ্বর শুধু যে আমাদের মধ্যে এক দেবতা বা শুধু যে এক বিরাট পুরুষ বা কোনো প্রকার বিশ্ব শক্তি তা নয়। এক ধরণের সর্বেশ্বরবাদ বিশ্বাস করাতে চাইলেও ভগবান ও জগৎ এক ও একই সমান বস্তু নয়। জগৎ একটা পুরঃক্ষেপ, প্রতিরূপ: ইহা এমন কিছুর উপর নির্ভর করে যা ইহার মধ্যে অভিব্যক্ত হয় কিন্তু ইহার দ্বারা সীমিত নয়ঃ ভগবান যে কেবল এখানেই আছেন তা নয়: ইহার অতীত কিছু আছে--এক সনাতন অতিস্থিতি। ব্যষ্টি সত্তাও তার আধ্যাত্মিক অংশে বিশ্ব অস্তিত্বের মধ্যে কোনো রূপায়ণ নয়—আমাদের অহং, আমাদের মন, আমাদের প্রাণ, আমাদের দেহ তা-ই; কিন্তু আমাদের অক্ষর চিৎ-পুরুষ, মধ্যকার অবাধ অন্তঃপুরুষ বাহির হ'য়ে এসেছে অতিস্থিতি থাকে।

* * *

এক অতিষ্ঠো (বিশ্বাতীত) যিনি সকল জগৎ ও সকল প্রকৃতির অতীত অথচ জগৎ ও ইহার প্রকৃতিকে অধিগত করেন, যিনি নিজের কিছু নিয়ে ইহার মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং ইহাকে এমন কিছুতে তৈরী করছেন যা ইহা এখনো হয় নি—তিনিই আমাদের সত্তার উৎস, আমাদের সকল কর্মের উৎস এবং তাদের অধীশ্বর। কিন্তু বিশ্বাতীত চেতনার আসন ঊর্ধ্বে দিব্য সন্মাত্রের একান্ততার মধ্যে—আর সেখানেও আছে সনাতনের একান্ত শক্তি, সত্য, আনন্দ,--যার সম্বন্ধে আমাদের মানসিকতা কোনো ধারণা করতে অক্ষম, এমন কি আমাদের মহত্তম আধ্যাত্মিক অনুভূতিও আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মন ও হৃদয়ে ইহার এক ক্ষীণ প্রতিফলন, অস্পষ্ট ছায়া, শীর্ণ সৃষ্টি। তবু ইহা থেকেই নিঃসৃত হয়েছে আলোক, সামর্থ্য, আনন্দ ও সত্যের এক প্রকার স্বর্ণমন জ্যোতির্মণ্ডল—প্রাচীন রহস্যবাদীদের অভিহিত দিব্য ঋতচেতনা এক অতি-মানস, এক পরম বিজ্ঞান যার সহিত অবিদ্যাজাত হ্রস্বতর চেতনার এই জগৎ গূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত: একমাত্র এই অতিমানসই জগৎকে পালন করে আর নিবারণ করে তার চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে নির্ঝাতির মধ্যে পতন। এখন যে সামর্থ্যগুলিকে আমরা বিজ্ঞান, বোধি বা জ্যোতি নাম দিয়ে তৃপ্ত তারা শুধু তাদের পূর্ণ ও জ্বলন্ত উৎস সেই অতিমানসেরই অস্পষ্টতর আলোক; আর সর্বোত্তম মানুষী বুদ্ধি ও ইহার মাঝখানে আছে ঊর্ধ্বগামী চেতনার নানা স্তর-- উত্তম মানসিক বা অধিমানসিক, আর এ সবকে আমাদের জয় করা চাই, তবেই যদি আমরা

তথায় উপনীত হ'তে পারি বা এখানে নামিয়ে আনতে পারে ইহার মহত্ত্ব ও মহিমাকে। তথাপি যতই দুরূহ হ'ক ঐ উত্তরণ, ঐ বিজয়ই মানবের চিৎ-পুরুষের নিয়তি আর দিব্যসত্যের ঐ জ্যোতির্ময় অবতরণ বা ইহাকে নিম্নে আনয়ন করাই পৃথ্বী-প্রকৃতির বিঘ্ন-সংকুল বিবর্তনের অনিবার্য পরিণাম; সেই অভিপ্রেত পরিণতিই ইহার ন্যায়সংগত তাৎপর্য, আমাদের চূড়ান্ত অবস্থা এবং আমাদের পার্থিব জীবনের ব্যাখ্যা। কারণ যদিও বিশ্বাতীত ভগবান পূর্ব থেকেই এখানে পুরুষোত্তমরূপে বিদ্যমান আমাদের রহস্যের গোপন হৃদয়ে, তবু তিনি তাঁর প্রহেলিকাপূর্ণ জগদ্‌ব্যাপী যোগমায়ার নানা-বিধ প্রলেপ ও ছদ্মবেশে সমাবৃত; এখানে, এই দেহের মধ্যেই অন্তঃপুরুষের উত্তরণ ও বিজয়ের দ্বারাই ছদ্মবেশগুলির অপসরণ সম্ভব আর সম্ভব যে অর্ধসত্য সৃজনক্ষম প্রমাদ হ'য়ে ওঠে তার জটিল বুননের স্থলে, অর্থাৎ এই যে উদ্‌বর্তনশীল বিদ্যা নিমজ্জিত হ'য়ে জড়ে নিশ্চেতনায় এবং নিজের দিকে তার মন্থর আংশিক প্রত্যাবর্তন দ্বারা কার্যকরী অবিদ্যায় পরিণত হয় তার স্থলে পরম সত্যের স্ফুরত্তার আগমন।

কারণ যদিও এখানে, এই জগতে বিজ্ঞান নিগূঢ়ভাবে সত্তার পশ্চাতে থাকে তবু যা কাজ করে তা বিজ্ঞান নয়, তা হ'ল বিদ্যা-অবিদ্যার এক প্রহেলিকা, এক অনির্ণেয় কিন্তু আপাতপ্রতীয়মান যান্ত্রিক অধিমানসী মায়া। এক দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা এখানে ভগবানকে মনে করি যে তিনি এক সম, নিষ্ক্রিয় ও নৈর্ব্যক্তিক সাক্ষী চিৎ-পুরুষ, এক অক্ষর সম্মতিদাতা পুরুষ যিনি গুণ বা দেশ বা কালের দ্বারা বদ্ধ নন, যাঁর সমর্থন বা অনুমতি নিরপেক্ষভাবে দেওয়া হয় সেই সকল ক্রিয়া ও শক্তির বিলাসে বিশ্বাতীত সংকল্প যাদের একবার অনুমতি ও ক্ষমতা দিয়েছেন বিনশ্বর মধ্য নিজেদের সার্থক করার জন্য। মনে হয় এই সাক্ষী পুরুষ, বিষয়সমূহের মধ্যে এই নিশ্চল আত্মা কিছুই সংকল্প করেন না, কিছুই নির্ধারণ করেন না; তবু আমরা জানতে পারি যে তাঁর নিষ্ক্রিয়তাই, তার নীরব উপস্থিতিই সকল বিষয়কে বাধ্য করে তাদের অজ্ঞানতার মধ্যেও দিব্য লক্ষ্যের দিকে চলতে আর বিভাজনের মাধ্যমে আকর্ষণ করে এক এখনো অনুপলব্ধ একত্বের দিকে। তথাপি মনে হয় কোনো পরম অভ্রান্ত দিব্যশক্তিই সেখানে নেই, আছে শুধু এক বিস্তৃতভাবে বিন্যস্ত বিশ্বশক্তি, অথবা এক যান্ত্রিক কার্যসাধিকা ধারা, প্রকৃতি। ইহা বিশ্বাত্মার এক দিক; অন্যদিকে দেখি তিনি এক বিশ্বাত্মক ভগবান, যিনি সত্তায় এক কিন্তু ব্যক্তিসত্ত্বে ও সামর্থ্যে বহু আর যখন আমরা তাঁর বিশ্বশক্তির চেতনার মধ্যে প্রবেশ করি তিনি আমাদের কাছে নিয়ে আসেন অনন্ত গুণ ও সংকল্প ও কর্মের বোধ এবং জগৎ-ব্যাপী জ্ঞান এবং এক অদ্বয় অথচ অসংখ্য রকমের আনন্দ; কারণ তাঁরই মাধ্যমে আমরা সর্বভূতের সহিত এক হ'য়ে উঠি—শুধু তাদের স্বরূপে

নয়, তাদের ক্রিয়ার বিলাসেও, নিজকে দেখি সকলের মধ্যে ও সকলকে দেখি নিজের মধ্যে, উপলব্ধি করি যে সকল জ্ঞান ও মনন ও বেদনা এক অদ্বয় মন ও হৃদয়ের গতি, সকল ক্রিয়া-শক্তি ও ক্রিয়া এক সর্বসমর্থ অদ্বয় সংকল্পের গতিবিধি, সকল জড় ও রূপ এক অদ্বয় দেহের কণিকা, সকল ব্যক্তিসত্ত্ব এক পরম ব্যক্তির পুরঃক্ষেপ, সকল অহং হ'ল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র এক আসল "আমি"র বিকৃত রূপায়ণ। তাঁর মধ্যে আর আমরা পৃথক থাকি না, আমাদের সক্রিয় অহং-এর বিনাশ হয় বিশ্বের গতিবৃত্তির মধ্যে,—যেমন বিনাশ হয় আমাদের নিষ্ক্রিয় অহং-এর বিশ্বশান্তির মধ্যে সেই পরম সাক্ষীদ্বারা যিনি নির্গুণ ও চিরদিন নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত।

কিন্তু তবু এক বিরোধ থেকে যায় এই দুই সংজ্ঞার মধ্যে—কূটস্থ দিব্য নীরবতা ও সর্বব্যাপী দিব্য ক্রিয়ার মধ্যে;—অবশ্য নিজেদের মধ্যে এই বিরোধকে কোনো একপ্রকারে, কিছু বেশী মাত্রাতেই মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব - মনে হতে পারে বিরোধ সম্পূর্ণ মিটেছে, কিন্তু এ মিল সম্পূর্ণ নয়, কারণ ইহা পুরোপুরি রূপান্তরসাধনে ও বিজয়লাভে অক্ষম। এক সার্বিক শান্তি, আলোক, শক্তি, আনন্দ আমরা পাই বটে কিন্তু ইহার সফল প্রকাশ যে ঋত-চেতনার, দিব্য বিজ্ঞানের তা নয়; যদিও ইহা আশ্চর্যকর ভাবে মুক্ত, উন্নীত ও প্রদীপ্ত, তবু ইহা শুধু বিরাট পুরুষের বর্তমান আত্ম-প্রকাশকে ধারণ করে, কিন্তু বিশ্বাতীতের অবতরণ যেমন এই অবিদ্যার জগতের সব দ্ব্যর্থবোধক প্রতীক ও প্রচ্ছন্ন রহস্যে রূপান্তরিত করতে সক্ষম, ইহা তেমন করে না। আমরা নিজেরা মুক্ত হই বটে কিন্তু পৃথ্বীচেতনা বন্ধনদশার মধ্যেই থেকে যায়: আরো উন্নত এক বিশ্বাতীতের উত্তরণ ও অবতরণই একমাত্র সক্ষম এই বিরোধ সম্পূর্ণ মেটাতে এবং রূপান্তর ও মুক্তি সাধনে।

কারণ এ ছাড়াও কর্মাধীশ্বরের এক তৃতীয় অতীব নিবিড় ও ব্যক্তিগত বিভাব আছে যা তাঁর সবচেয়ে মহিমময় প্রচ্ছন্ন রহস্য ও উল্লাসের চাবিকাঠি; কারণ তিনি প্রচ্ছন্ন অতিস্থিতির রহস্য ও বিশ্ব গতিবৃত্তির দুর্বোধ্য বিলাস থেকে বিচ্ছিন্ন করেন ভগবানের এক ব্যষ্টি সামর্থ্য যা দুটির মধ্যে মধ্যস্থতা ক'রে একটি থেকে অন্যটিতে আমাদের যাবার পথের সেতু হ'তে পারে। এই বিভাবে ভগবানের বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক ব্যক্তি আমাদের ব্যষ্টিভাবাপন্ন ব্যক্তিসত্ত্বের অনুরূপ হ'য়ে আমাদের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্বীকার করেন; একই সময় তিনি আমাদের সহিত এক হ'য়ে যান আমাদের পরমাত্মারূপে আবার তবু অন্তরঙ্গ ও ভিন্ন হন আমাদের প্রভু, সখা, প্রেমিক, গুরুরূপে, আমাদের পিতা ও আমাদের মাতারূপে, বৃহৎ জগৎ-লীলায় খেলার সাথীরূপে: তিনিই বরাবর নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন বন্ধু ও শত্রুর, সহায় ও বিরোধীব ছদ্ম-বেশে এবং যে সকল সম্পর্ক ও ক্রিয়াধারার সহিত আমরা যুক্ত তাদের মনধ্য

আমাদের নিয়ে গেছেন আমাদের সিদ্ধি ও আমাদের মুক্তির দিকে। এই আরো ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাতীত অনুভূতি লাভের সম্ভাবনা আসে; কারণ তাঁর মধ্যে আমরা পরম একের দেখা পাই শুধু যে এক মুক্ত নিস্তব্ধতা ও প্রশান্তির মধ্যে তা নয়, শুধু যে আমাদের কর্মের মধ্যে নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় প্রপত্তির সহিত তা নয়, অথবা আমাদের পূর্ণ করে, চালনা করে এমন যে সার্বিক বিদ্যা ও সামর্থ্য শুধু যে তাদের সহিত মিলন-রহস্যের মধ্য দিয়ে তা-ও নয়, বরং এমন মিলনের মধ্য দিয়ে যাতে থাকে সেই দিব্য প্রেম ও দিব্য আনন্দের উল্লাস যা নীরব সাক্ষী ও সক্রিয় জগৎ-সামর্থ্য ছাড়িয়ে বেগে উঠে যায় এক মহত্তর আনন্দঘন রহস্যের কিছু নিশ্চিত অলৌকিক উপলব্ধির দিকে। কারণ, যে জ্ঞান কোনো অনির্বচনীয় ব্রহ্মে নিয়ে যায় অথবা যে সব কর্ম জগৎ-ধারা ছাড়িয়ে আমাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে তার উৎস পরম জ্ঞাতা ও অধীশ্বরের কাছে সেই জ্ঞান বা কর্ম ততখানি নয়, যতখানি বরং এই আমাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অথচ বর্তমানে অতীব তমসাচ্ছন্ন বিষয় যা আমাদের জন্য তার আবেগময় অবগুন্ঠনের মধ্যে আবৃত রাখে বিশ্বাতীত পরমদেবতার গভীর ও উল্লাসভরা রহস্য এবং তাঁর সিদ্ধ সত্তা, তন্ময়করা পরম সুখ, রহস্যময় আনন্দের কিছু একান্ত নিশ্চয়তা।

কিন্তু ভগবানের সহিত ব্যষ্টি সম্পর্ক যে সব সময়ই বা শুরু থেকেই ব্যাপ্ততম প্রসার বা সর্বোচ্চ স্বোত্তরণ সক্রিয় করে তা নয়। এই যে পরম দেবতা আমাদের সত্তার সমীপস্থ বা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত তাঁকে প্রথম পরিপূর্ণভাবে অনুভব করা যায় শুধু আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও অনুভূতির পরিধির ভিতর, তিনি নেতা ও অধ্যক্ষ, দিশারী ও গুরু, সখা ও প্রেমিক, আর না হয় তিনি পরম চিৎ-পুরুষ, সামর্থ্য বা উপস্থিতি যিনি আমাদের ঊর্ধ্বমুখী ও প্রসারশীল গতিবিধি গঠন ও উত্তোলন করেন তাঁর সেই অন্তরঙ্গ সত্যের শক্তিদ্বারা যে সত্য হৃদয়ে বিরাজিত বা আমাদের সর্বোত্তম বুদ্ধিরও ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা। আমাদের ব্যক্তিগত ক্রম-বিকাশই তাঁর বড় কাজ, এক ব্যক্তিগত সম্পর্কই আমাদের হর্ষ ও সার্থকতা, আমাদের প্রকৃতিকে তাঁর দিব্য প্রতিমূর্তিতে গঠন করাই আমাদের আত্ম-প্রাপ্তি ও সিদ্ধি। মনে হয় বাহিরের জগৎ আছে শুধু এই বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের সরবরাহকারী রূপে অথবা বৃদ্ধির ক্রমিক পর্যায়ের জন্য সহায়কর ও বিরোধী শক্তিসমূহের ক্ষেত্র রূপে। এই জগতে আমরা যে সব কাজ করি সে সব তাঁরই কাজ, তবে যখন তারা কোনো সাময়িক বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য সাধন করে তখনো তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল এই সর্বগত ভগবানের সহিত আমাদের বিভিন্ন সম্পর্ককে বাহ্যতঃ স্ফুরন্ত করা বা তাদের অন্তরমুখী সামর্থ্য দেওয়া। অনেক সাধক ইহার বেশী চায়

না অথবা দেখে যে এই আধ্যাত্মিক প্রস্ফুটন চলছে ও সার্থক হ'চ্ছে শুধু জগদতীত দিব্যধামসমূহে; তাঁর সিদ্ধি, আনন্দ ও সৌন্দর্যের এক নিত্য অধিষ্ঠানে এই মিলন পূর্ণ ও শাশ্বত করা হয়। কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে ইহা যথেষ্ট নয়; যতই প্রগাঢ় ও সুন্দর হ'ক, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সিদ্ধি তার সমগ্র লক্ষ্য বা তার সমস্ত জীবন হ'তে পারে না। একটা সময় আসতে বাধ্য যখন ব্যক্তিগত সত্তা উন্মীলিত হয় বিশ্বসত্তার দিকে; আমাদের গোটা ব্যক্তিত্বই আধ্যাত্মিক, মানসিক, প্রাণিক ও এমন কি শারীরিক ব্যষ্টিত্বও বিশ্বভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠে; ইহাকে দেখা যায় তার বিশ্বশক্তি ও বিশ্ব চিৎ-পুরুষের সামর্থ্য হিসাবে, অথবা ইহা বিশ্বকে ধারণ করে সেই অনির্বচনীয় প্রসারতার মধ্যে যা ব্যষ্টিচেতনায় আসে যখন ইহা তার সব বন্ধন ভেঙে ঊর্ধ্বে প্রসারিত হয় বিশ্বাতীতের দিকে এবং সকল দিকে অনন্তের মধ্যে।

* * *

যে যোগজীবন পুরোপুরি আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনোময় ভূমিতেই নিবদ্ধ থাকে তাতে সম্ভবতঃ, এমন কি সাধারণতঃ ভগবানের এই তিনটি মৌলিক বিভাব -জীব বা ব্যষ্টিগত অন্তরাত্মা, বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত- পৃথক পৃথক উপলব্ধি। তখন মনে হয় প্রত্যেকটি একলাই সাধকের আকূতি পূরণের পক্ষে যথেষ্ট। অন্তর হৃদয়ের জ্যোতিদীপ্ত গোপন পুরে পুরুষোত্তম ভগবানের সহিত একলা থেকে সে তার সত্তাকে গঠন করতে পারে পরম প্রেমানন্দের মূর্তিতে এবং পতিত প্রকৃতির বাহিরে ঊর্ধ্বে উঠতে পারে তার সহিত পরম চিৎ-পুরুষের কোনো দিব্যধামে বাস করার জন্য। সে বিশ্ব ব্যাপ্তির মধ্যে নির্মুক্ত, অহং-এর বন্ধন-মুক্ত, তার ব্যক্তিসত্ত্ব পর্যবসিত হ'য়েছে বিশ্বশক্তির ক্রিয়াধারার এক কেন্দ্রে, সে নিজে বিশ্বজনীনতার মধ্যে শান্ত, মুক্ত ও দ্বন্দ্ব-হীন, সাক্ষী আত্মার মধ্যে নিশ্চল অথচ সে সময় সে অন্তহীন দেশ ও কালের মধ্যে সীমাহীনভাবে প্রসারিত -এই ভাবে সে জগতের মধ্যে ভোগ করতে পারে কালাতীতের মুক্তি। কোনো অনুপাখ্য অতিস্থিতির প্রতি একাগ্র হ'য়ে, তার ব্যক্তিসত্ত্ব বিসর্জন দিয়ে, নিজ থেকে বিশ্বব্যাপী স্ফুরত্তার পরিশ্রম ও উদ্বেগ বর্জন ক'রে সে পলায়ন করতে পারে এক অনির্বচনীয় নির্বাণের মধ্যে এবং সকল কিছু লোপ করে দিতে পারে অব্যবহার্যের মধ্যে পলায়নের অসীম উৎসাহে।

কিন্তু পূর্ণযোগের ব্যাপ্ত সম্পূর্ণতা যে চায় তার পক্ষে এই সব উপলব্ধির কোনটিই যথেষ্ট নয়। তার কাছে নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধি পর্যাপ্ত নয়; কারণ সে দেখতে পায় সে উন্মুক্ত হ'চ্ছে এমন এক বিশ্বচেতনার দিকে যা তার বিস্তার ও বিরাটত্বর দ্বারা সীমিত ব্যক্তিগত সার্থকতার আরো সংকীর্ণ তীব্রতা অনেক ছাড়িয়ে যায়। আর সে চেতনার আহ্বান অলঙ্ঘনীয়; ইহার বিপুল

প্রেরণার বশে সে বাধ্য হয় সকল পৃথক-করা সীমা ভেঙে ফেলে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে জগৎ প্রকৃতির মধ্যে ও বিশ্বকে ধারণ করতে নিজের মধ্যে। আবার ঊর্ধ্বেও তার উপর আছে এক সনির্বন্ধ স্ফুরন্ত উপলব্ধি যা পরাৎপর থেকে চাপ দেয় এই জীবকুলের জগতের উপর, আর যে জ্যোতির বর্ণন এখনো হয় নি তার অভিব্যক্তির ধারাকে এখানে মুক্ত করতে সক্ষম একমাত্র বিশ্বচেতনার একপ্রকার সর্বাবেষ্টন ও অতিক্রমণ। কিন্তু বিশ্বচেতনাও যথেষ্ট নয়; কারণ ইহা সমগ্র দিব্য সদ্‌বস্তু নয়, অখণ্ড নয়। ব্যষ্টিসত্ত্বের পশ্চাতে যে দিব্য রহস্য আছে তা তার আবিষ্কার করা চাই; সেখানে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে অতিস্থিতির মূর্তিমত্তার রহস্য কালের মধ্যে এখানে মুক্ত হবার জন্য। বিশ্বচেতনার শেষ প্রান্তে এমন এক পরমা বিদ্যার ভেদ, অসম সমীকরণ থেকে যায় যা মুক্তি দিতে পারে কিন্তু শক্তি দিয়ে কার্য সাধনে অক্ষম কারণ মনে হয় এই শক্তি সীমিত বিদ্যা ব্যবহার করে বা এক উপরভাসা অবিদ্যা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে এবং সেজন্য সে সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'লেও সৃষ্টি করে অপূর্ণতা বা এমন পূর্ণতা যা নশ্বর, সীমাবদ্ধ ও শৃংখলিত। এক দিকে আছে এক মুক্ত নিষ্ক্রিয় সাক্ষী আর অন্য দিকে এক বদ্ধ ক্রিয়া-নিষ্পাদিকা যাকে ক্রিয়ার সকল উপায় দেওয়া হয় নি। মনে হয় এই বিপরীত ও সঙ্গীদের মধ্যে মিলন সাধন সংবরণ ক'রে স্থগিত ও ধরে রাখা হ'য়েছে এখনো আমাদের অতীত এক অব্যক্তের মাঝে। কিন্তু আবার ইহাও সত্য যে কোনো একান্ত অতিস্থিতির মধ্যে শুধু পলায়নে ব্যষ্টিসত্ত্ব সার্থকতা পায় না, বিশ্বক্রিয়া অসমাপ্ত হয়, আর পূর্ণযোগের সাধক তাতে তৃপ্তি পায় না। তার অনুভব হয় যে শাশ্বত সত্য যেমন এক স্থির সত্তা তেমন এক শক্তি যা সৃষ্টি করে; একমাত্র ভ্রান্তিপূর্ণ বা অবিদ্যাচ্ছন্ন অভিব্যক্তির শক্তি ইহা নয়। শাশ্বত সত্য তার সব সত্যকে ব্যক্ত করতে পারে কালের মধ্যে; ইহা বিদ্যার মধ্যেও সৃষ্টি করতে সক্ষম, শুধু আচিৎ ও অবিদ্যার মধ্যে নয়। ভগবানে উত্তরণ যেমন সম্ভব, তেমনই সম্ভব ভগবানের অবতরণ; এক ভবিষ্যৎ সিদ্ধি ও এক বর্তমান মুক্তি নামিয়ে আনার প্রত্যাশা সম্মুখে অপেক্ষমান। যেমন তার জ্ঞানের বিস্তার হয় তেমন ইহা তার কাছে উত্তরোত্তর স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে এই জন্যই কর্মের অধীশ্বর তাঁর মধ্যকার অন্তঃপুরুষকে এখানে নিক্ষেপ করেছিলেন অন্ধকারের মধ্যে তাঁর অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো যাতে সে বৃদ্ধি পেয়ে হ'য়ে উঠতে পারে শাশ্বত আলোকের এক কেন্দ্র।

সমগ্র অভিব্যক্তিকে ঊর্ধ্ব তোরণের মত ঘিরে, নিম্নে তার ভিত্তি হ'য়ে ও ভিতরে অনুস্যূত হ'য়ে আছে তিন শক্তি— বিশ্বাতীত, বিশ্বাত্মক ও ব্যষ্টিগত; তত্ত্বত্রয়ের প্রথম ইহাই। চেতনার উন্মীলনেও এই তিনটি মূল কথা আর যদি

আমরা সৃষ্টির সমগ্র সত্যের উপলব্ধি পেতে চাই তা হ'লে ইহাদের কোনো-টিকেই অবহেলা করা চলে। না। জীবচেতনা থেকে আমরা জাগ্রত হই এক আরো বিরাট মুক্ত বিশ্বচেতনায়, বিভিন্ন রূপ ও শক্তির জটিল গ্রন্থিযুক্ত বিশ্বচেতনা থেকেও বাহির হয়ে আরো মহত্তর স্বোত্তরণের দ্বারা আমাদের প্রবেশ করা চাই এক অসীম চেতনার মধ্যে যা প্রতিষ্ঠিত পরমার্থ-সৎএর উপর। কিন্তু তবু এই উৎক্রান্তির মধ্যে আমরা যা ফেলে যাই মনে হয় সে সবকে বিলোপ করি না, বরং তাদের তুলে নিয়ে রূপান্তরিত করি। কারণ এমন এক উচ্চতা আছে যেখানে এই তিনটি চিরন্তন বাস করে পরস্পরের মধ্যে, সেই শিখরের উপর তারা পরমানন্দে মিলিত হ'য়ে আছে তার সুসংগত একত্বের বন্ধনে। কিন্তু সেই শিখর উচ্চতম ও বৃহত্তম আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মানসিকতার ঊর্ধ্বে যদিই বা এখানে তার কিছু প্রতিফলনের উপলব্ধি সম্ভব হয়। সেখানে যেতে হ'লে, বাস করতে হলে মনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হ'ল নিজেকে ছাপিয়ে গিয়ে রূপান্তরিত হওয়া অতিমানসিক বিজ্ঞানময় আলোক, সামর্থ্য ও ধাতুতে। অবশ্য এই অবর ক্ষীণ চেতনায় এক সুসংগতি স্থাপনের চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু ইহা সর্বদাই অপূর্ণ থাকতে বাধ্য: পরস্পরের মধ্যে এক শৃংখলা আনা সম্ভব, কিন্তু তাদেব পুরোপুরি মিশিয়ে একসাথে সার্থকতাসাধন সম্ভব নয়। যে কোনো মহত্তর উপলব্ধির জন্য মন ছাড়িয়ে উত্তরণ করা অবশ্য কর্তব্য। আর না হয় দরকার উত্তরণের সাথে বা তার পরিণামস্বরূপ সেই প্রতিষ্ঠিত সত্যের স্ফুরন্ত অবতরণ যে সত্য শাশ্বত, প্রাণ ও জড়ের অভিব্যক্তির পূর্বস্থ, নিজেরই আলোকেরই মধ্যে উন্নীত হ'য়ে সর্বদা অধিষ্ঠিত মনের ঊর্ধ্বে।

কারণ মন মায়া, সৎ-অসৎ; এমন এক ক্ষেত্র আছে যেখানে সত্য ও অনৃত, সৎ ও অসদ্ পরস্পরের আলিংগনবদ্ধ, আর এই দ্ব্যর্থবোধক ক্ষেত্রেই মন রাজত্ব করে ব'লে মনে হয়, কিন্তু এমনকি নিজের রাজত্বেও ইহা বস্তুতঃ এক ক্ষীণ চেতনা, সনাতনের আদি ও পরম উৎপাদক সামর্থ্যের অংশ হয়। এমনকি যদিই বা মন তার ধাতুতে স্বরূপ সত্যের কিছু মূর্তি প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়, তবু তার মধ্যে সত্যের স্ফুরন্ত শক্তি ও ক্রিয়া সর্বদাই মনে হয় ভগ্ন ও বিভক্ত। মন বড়জোর পারে টুকরোগুলিকে একত্র করে জোড়া দিতে বা একটি ঐক্য অনুমান ক'রতে, মনের সত্য শুধু এক অর্ধ-সত্য, অথবা এক ধাঁধাঁর অংশ। মানসিক জ্ঞান সর্বদাই আপেক্ষিক, আংশিক ও অনিশ্চিতার্থক আর তার বহির্গামী ক্রিয়া ও সৃষ্টি পদে পদে আরো বিশৃংখল হ'য়ে বাহিরে আসে অথবা যথাযথ হয় শুধু সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ও অপূর্ণ জোড়া অংশগুলিতে। এমন কি এই ক্ষীণ চেতনার মধ্যেও ভগবান ব্যক্ত হন মনোগত পরম চিৎ-পুরুষরূপে যেমন তিনি বিচরণ করেন প্রাণগত পরম চিৎ-পুরুষরূপে বা আরো আচ্ছন্ন হয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন জড়গত পরম চিৎ-পুরুষরূপে: কিন্তু এখানে

তাঁর পরিপূর্ণ স্ফুরন্ত প্রকাশ নেই, এখানে নেই সনাতনের সিদ্ধ ভাবারাজি। কেবল যখন আমরা সীমা পেরিয়ে প্রবেশ করব এক বৃহত্তর জ্যোতির্ময় চেতনা ও আত্ম-বিৎ ধাতুর মধ্যে যেখানে দিব্য সত্য আপনজন, অপরিচিত নয় তখন আমাদের কাছে প্রকাশিত হবেন আমাদের জীবনের অধীশ্বর তাঁর সত্তা ও তাঁর সব শক্তির ও ক্রিয়াধারার অব্যয় অখণ্ড সত্যে। উপরন্তু, কেবল সেখানেই আমাদের মধ্যে তাঁর সব কর্ম পাবে তাঁর অব্যর্থ অতিমানসিক উদ্দেশ্যের নিখুঁৎ গতি।

* * *

কিন্তু ইহা তো এক দীর্ঘ ও দুরূহ যাত্রার শেষ, তবে কর্মের অধীশ্বর যোগের পথে সাধককে দেখা দিতে এবং তার উপর ও তার আন্তর জীবন ও সব ক্রিয়ার উপর তার গোপন বা অর্ধ-প্রকট হাত রাখতে ততদিন অপেক্ষা করেন না। সকল কর্মের প্রবর্তক ও গ্রহীতারূপে তিনি পূর্ব থেকেই জগতে ছিলেন নিশ্চেতনার ঘন আবরণের পশ্চাতে, প্রাণের শক্তির মধ্যে ছদ্মবেশে, বিভিন্ন প্রতীক দেবতা ও মূর্তির মাধ্যমে মনের গোচর হ'য়ে। খুব সম্ভবতঃ এই সব ছদ্মবেশেই তিনি দেখা দেন পূর্ণযোগের পথে উদ্দিষ্ট অন্তঃপুরুষকে। অথবা এমনকি আরো বেশী অস্পষ্ট ছদ্মবেশে তিনি আমাদের ভাবনায় আসেন কোনো আদর্শ হিসেবে বা মানসপথে উদিত হন প্রেম, শিব, সুন্দর বা জ্ঞানের আচ্ছিন্ন শক্তি হিসাবে, অথবা হয়ত যখন আমরা তাঁর দিকে যাবার পথে ফিরি, তখন তিনি আসেন মানব জাতির আহ্বানের ছদ্মবেশে বা বিষয় সমূহের মধ্যে সেই সংকল্পের ছদ্ম-বেশে যে সংকল্পের প্রেরণা হ'ল অবিদ্যার প্রবল চতুঃশক্তির - অন্ধকার ও অনৃত ও মৃত্যু ও কষ্টভোগের কবল থেকে জগৎকে উদ্ধার করা। তারপর আমরা পথে প্রবেশ করার পর তিনি আমাদের আবৃত করেন ব্যাপ্ত ও শক্তিশালী মুক্তিপদ নৈর্ব্যক্তিকতার দ্বারা অথবা আমাদের কাছে আসেন এক ব্যক্তিদেবতার আনন ও আকার নিয়ে। আমাদের মধ্যে ও চারিদিকে আমরা অনুভব করি এমন এক সামর্থ্য যা ধারণ করে, রক্ষা ও পোষণ করে; আমরা এক স্বর শুনি যা আমাদের পথ দেখায়; আমাদের চেয়ে মহত্তর এক চিৎ-সংকল্প আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে; আমাদের মনন ও সব ক্রিয়া এবং আমাদের দেহ পর্যন্ত চালিত হয় এক অলঙ্ঘনীয় শক্তির দ্বারা; এক সদা-প্রসারী চেতনা আমাদের চেতনাকে আত্ম-সাৎ করে, জ্ঞানের এক প্রাণবন্ত আলোক আলোকিত করে ভিতরকার সব কিছু অথবা আমরা অভিভূত হই এক পরমানন্দের দ্বারা; ঊর্ধ্ব থেকে চাপ দেয় এক বাস্তব, বিশাল ও বিজয়ী পরাক্রম যা আমাদের প্রকৃতির উপাদানের মধ্যেও প্রবেশ ক'রে নিজেকে ঢেলে দেয়; সেখানে সমাসীন এক প্রশান্তি, এক আলোক, আনন্দ, বীর্য ও মহত্ব। অথবা তথায় আছে ব্যক্তিগত সব সম্পর্ক যারা জীবনের মতোই অন্তরঙ্গ, প্রেমের মতো মিষ্ট, আকাশের মতো সর্বব্যাপী, অগাধ সাগরের মতো

গভীর। আমাদের পাশে চলেন এক বন্ধু; আমাদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের গোপন পুরে থাকেন এক প্রেমিক; কর্মের ও অগ্নিপরীক্ষার অধীশ্বর আমাদের পথ দেখান, এক সর্বভূতস্রষ্টা আমাদের ব্যবহার করেন তাঁর যন্ত্ররূপে; আমরা থাকি এক সনাতনী জননীর ক্রোড়ে। এই যে সব আরো গ্রাহ্য বিভাবে অনুপাখ্য আমাদের দেখা দেন সে সব সত্য, সেগুলি শুধু সহায়কর প্রতীক বা উপকারী কল্পনা নয়; কিন্তু যতই আমরা অগ্রসর হই, ততই তাদের যে সব প্রাথমিক অপূর্ণ রূপায়ণ আমাদের অনুভূতিতে আসে সেগুলি সরে যেতে থাকে আর তাদের স্থানে আসে তাদের পশ্চাতে বিদ্যমান একমাত্র সত্যের বৃহত্তর দৃষ্টি। প্রতি পদক্ষেপে পরিত্যক্ত হয় তাদের সব মুখোস যেগুলি মানসিক মাত্র, আর তারা লাভ করে এমন এক তাৎপর্য যা আরো বৃহৎ, আরো গভীর, আরো অন্তরঙ্গ। অবশেষে অতিমানসিক সীমানায় এই সব দেবতারা তাঁদের বিভিন্ন রূপ একত্র করেন, আর আদৌ বিলুপ্ত না হ'য়ে তাঁরা একসঙ্গে মিশে যান। এই পথে যে সব দিব্য বিভাব আত্মপ্রকাশ করেছে তা যে শুধু বর্জন করা হবে ব'লে তা নয়; তারা কোনো সাময়িক আধ্যাত্মিক সুযোগ নয় অথবা কোনো ভ্রান্তিজনক চেতনার সহিত বা পরমার্থ সৎ-এর অব্যবহার্য অতিচেতনার দ্বারা আমাদের উপর রহস্যজনকভাবে নিক্ষিপ্ত সব স্বপ্নমূর্তির সহিত আপোষ নয়; অপরপক্ষে, যে পরম সত্য থেকে তাদের আবির্ভাব তারা যতই তার নিকটবর্তী হয়, ততই তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায় আর আত্মপ্রকাশ করে তাদের অনপেক্ষতা।

কেননা সেই অতিস্থিতি যা এখন অতিচেতন যেমন এক সন্মাত্র তেমন এক শক্তিও। অতিমানসিক অতিস্থিতি কোনো ফাঁকা আশ্চর্য নয়, এমন কিছু অনির্বচনীয় যে তাঁর থেকে আবির্ভূত সকল মূল বিষয়কেই তিনি তাঁর মধ্যে ধারণ করেন চিরদিন; তিনি তাদের ধারণ করেন তাদের পরম চিরস্থায়ী সত্যতায় এবং তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট অনপেক্ষ তত্ত্বে। যে হ্রস্বতা, বিভাজন, অপকর্ষ এখানে এক দুর্বোধ্য ধাঁধাঁর, এক মায়া রহস্যের বোধ সৃষ্টি করে তারা নিজেরাই আমাদের উৎক্রান্তিতে হ্রাস পেয়ে যায়, আর দিব্য সামর্থ্যগুলি তাদের সত্যময় রূপ গ্রহণ ক'রে উত্তরোত্তর প্রতিভাত হয় এখানে প্রকাশমান এক সত্যের সংজ্ঞা-রূপে। ভগবানের এক অন্তঃপুরুষ এখানে ধীরে ধীরে জেগে উঠছেন জড়ীয় নিশ্চেতনার মধ্যে তার নিগূহন ও প্রচ্ছন্নতা থেকে। আমাদের কর্মের অধীশ্বর প্রহেলিকার অধীশ্বর নন, বরং তিনি এক পরম সদ্-বস্তু আর যে সব আত্ম-প্রকাশশীল সদ্-বস্তুকে বিবর্তনমূলক অভিব্যক্তির উদ্দেশ্যে কিছুকালের জন্য সুপ্ত রাখা হয়েছিল অবিদ্যার গুটির মধ্যে, সেখান থেকে তাদের ধীরে ধীরে মুক্ত ক'রে তিনি তাদের ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ অতিমানসিক অতিস্থিতি এমন বিষয় নয়, যা আমাদের বর্তমান জীবন থেকে একান্তই পৃথক ও বিযুক্ত।

ইহা এক মহত্তের আলোক যা থেকে এই সব বাহির হ'য়ে এসেছে অন্তঃপুরুষের অভিযানের জন্য যে অন্তঃপুরুষ নিশ্চেতনার মধ্যে ভ্রষ্ট হ'য়ে আবার তা থেকে বাহিরে আসছে এবং যতদিন এই অভিযান চলে ততদিন ইহা অতিচেতন হ'য়ে আমাদের মনের ঊর্ধ্বে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না ইহা আমাদের মধ্যে সচেতন হয়ে ওঠে। ইহার পর ইহা নিজেকে আবরণমুক্ত করবে আর আবরণমুক্তির দ্বারা আমাদের কাছে প্রকাশ ক'রবে আমাদের নিজ সত্তা ও আমাদের সব কাজের পূর্ণ তাৎপর্য; কারণ ইহা ভগবানকেই ব্যক্ত করবে আর জগতে তাঁর আরো পূর্ণ অভিব্যক্তি মুক্ত ও সিদ্ধ ক'রবে সেই গোপন তাৎপর্য।

সেই প্রকাশের মধ্যে আমাদের কাছে উত্তরোত্তর জানান হবে যে বিশ্বাতীত ভগবান পরম সম্রাট এবং আমরা যা সব সে সবের সিদ্ধ উৎস; তবে সমভাবেই আমরা তাঁকে দেখব সব কর্ম ও সৃষ্টির অধীশ্বররূপে যিনি তাঁর অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্রমশঃ আরো বেশী ক'রে নিজকে ঢেলে দিতে উদ্যত। তখন আর মনে হবে না যে বিশ্বচেতনা ও ইহার ক্রিয়া এক বিশাল নিরঙ্কুশ যদৃচ্ছা, মনে হবে ইহা অভিব্যক্তির ক্ষেত্র; সেখানে ভগবানকে দেখা যায় এক অধিষ্ঠাতা ও বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষরূপে যিনি অভিস্থিতির মধ্য থেকে সব গ্রহণ করেন এবং যা অবতরণ করে তাকে ফুটিয়ে তোলেন এমন সব রূপে যেগুলি এখন অস্বচ্ছ ছদ্মবেশ অথবা অবোধ্য অর্ধছদ্মবেশ কিন্তু যেগুলির নিয়তি হ'ল স্বচ্ছ প্রকাশ হওয়া। জীবচেতনা ফিরে পাবে তার সত্তাকার অর্থ ও ক্রিয়া, কারণ ইহা তো পরাৎপর থেকে বাহিরে পাঠান এক অন্তপুরুষেরই রূপ আর এখন তার যে বেশই থাকুক না কেন, ইহা এক বীজস্বরূপ বা তরল উপাদান যার মধ্যে ভগবতী মাতৃশক্তি কর্মরতা কাল ও জড়ের মধ্যে কালাতীত ও নীরূপ ভগবানের বিভূতি মূর্তিনির্মাণের জন্য। আমাদের দৃষ্টি ও অনুভূতিতে ইহাই ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ ক'রবে কর্মের অধীশ্বরের সংকল্প রূপে ও তাদের নিজেদেরই চরম তাৎপর্য হিসাবে আর একমাত্র ইহাতেই পাওয়া যাবে জগৎ সৃষ্টির ও জগতের মধ্যে আমাদের ক্রিয়ার এক আলোক ও অর্থ। ঐ বিষয় উপলব্ধি করা ও ইহাকে সফল করার জন্য সাধনা করাই পূর্ণযোগে নিহিত কর্মমার্গের সমগ্র মূলকথা।

দ্বাদশ অধ্যায়

দিব্য কর্ম

যখন কর্মযোগের সাধকের সাধনা তার স্বাভাবিক পরিণতিতে আসে বা মনে হয় এসেছে তখন সাধকের একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে—মুক্তির পর অন্তঃপুরুষের জন্য কি কোনো কর্ম থাকে বা কী কর্ম থাকে ও কী তার উদ্দেশ্য? প্রকৃতিতে সমত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে অথবা সমগ্র প্রকৃতি সমত্বের শাসনাধীনে এসেছে; অহং-ভাবনা, ব্যাপক অহং-বোধ, অহং-এর সকল বেদনা ও প্রচোদনা এবং ইহার জিদ ও সব কামনা থেকে নিঃশেষে মুক্তি লাভ হ'য়েছে। পূর্ণ আত্মোৎসর্গ সাধিত হ'য়েছে, শুধু মননে ও হৃদয়ে নয়, সত্তার সকল গ্রন্থির মধ্যে। সুসংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা বা ত্রিগুণাতীত অবস্থা। অন্তঃপুরুষ তার কর্মের অধীশ্বরের দেখা পেয়ে হয় তাঁর সান্নিধ্যে বাস করে নয় তাকে সচেতনভাবে রাখা হয় তাঁর সত্তার মধ্যে অথবা তাঁর সহিত সে মিলিত হয় বা তাঁকে অনুভব করে হৃদয়ে বা ঊর্ধ্বে এবং পালন করে তাঁর আদেশ। সে তার প্রকৃত সত্তা জেনে অবিদ্যার অবগুণ্ঠন ফেলে দিয়েছে। তখন মানুষের মধ্যে কর্মীর জন্য কোন কর্ম থাকে, কি-ই বা তার প্রেরণা, কি-ই বা উদ্দেশ্য, কি আন্তর ভাব নিয়েই বা তা করা হবে?

*　　*　　*

এক উত্তর আছে যার সহিত ভারতে আমরা খুবই পরিচিত; আদৌ কোনো কর্ম থাকে না, কারণ বাকী সব উপশম। যখন অন্তঃপুরুষ পরাৎপরের শাশ্বত সান্নিধ্যে বাস ক'রতে সক্ষম হয় বা অনপেক্ষর সহিত মিলিত হয় তখনই নিবৃত্ত হয় জগতের মধ্যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য যদি অবশ্য বলা যায় যে জীবনের কোনো উদ্দেশ্য আছে। আত্ম-বিভাজন ও অবিদ্যার অভিশাপ হ'তে মুক্ত হ'লে মানুষ অপর কষ্ট যে কর্মের অভিশাপ তা থেকেও মুক্তি পায়। তখন সকল কর্ম হবে পরম অবস্থা থেকে এক পতন ও অবিদ্যার মধ্যে প্রবেশ। জীবন সম্বন্ধে এই মনোভাবের অনুকুলে যে ভাবনা তার মূলে আছে প্রাণিক প্রকৃতি সম্বন্ধে এই প্রমাদ যে কর্ম করা হয় শুধু এই তিনটি অবর প্রেরণার একটি বা বা সকলগুলিরই বশে—প্রয়োজন, চঞ্চল সহজাত বৃত্তি ও সংবেগ বা কামনা। যখন সহজাত বৃত্তি বা সংবেগ শান্ত হয়, কামনা নিভে যায়, তখন সেখানে কর্মের স্থান কোথায়? কিছু যান্ত্রিক কর্মের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু

অন্য কিছু নয় আর এমন কি তা-ও চিরদিনের মতো বন্ধ হ'য়ে যাবে শরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু একথা মেনে নিলেও, স্বীকার করতে হবে যে যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ ক্রিয়া অপরিহার্য। শুধু চিন্তা করা, অথবা চিন্তার অভাবে শুধু বেঁচে থাকাই একটা কাজ ও অনেক কার্যের কারণ। জগতে সকল কিছুই কর্ম, শক্তি, যোগ্যতা; আর কোনো কিছু থাকারই অর্থ সমগ্রের উপর তার স্ফুরন্ত ফল,—এমনকি মাটির ঢেলার নিঃসাড়তার, নির্বাণের দ্বারে অচঞ্চল বুদ্ধের নীরবতারও সম্বন্ধে এই কথা খাটে। শুধু প্রশ্ন হ'ল —ক্রিয়ার প্রণালী সম্বন্ধে, যে যন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয় বা নিজেরাই কাজ করে সেগুলির সম্বন্ধে ও কর্মীর আন্তর ভাব ও জ্ঞান সম্বন্ধে। কারণ আসলে কোনো মানুষই কাজ করে না, তার সধ্য দিয়ে কাজ করে প্রকৃতি ভিতরকার এমন এক শক্তির আত্ম-প্রকাশের জন্য যা আসে অনন্ত থেকে। এই কথা জানা এবং কামনা ও ব্যক্তিগত প্রেরণার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হ'য়ে প্রকৃতির অধীশ্বরের সান্নিধ্যে ও তাঁর সত্তায় বাস করা—ইহাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রকৃত মুক্তি ইহাই, ক্রিয়ার শারীরিক নিবৃত্তি নয়; কারণ তাতেই অচিরে বন্ধ হয় কর্মের বন্ধন। কোনো লোক চিরদিন স্থির ও নিশ্চল হ'য়ে বসে থাকতে পারে কিন্তু তবু পশু বা কীটপতঙ্গের মতোই সে থাকতে পারে অবিদ্যায় বদ্ধ হ'য়ে। কিন্তু যদি সে এই মহত্তর চেতনাকে নিজের মধ্যে স্ফুরিত করতে সক্ষম হয় তা হ'লে সকল জগতের সকল কর্ম তার মধ্য দিয়ে বয়ে গেলেও সে থাকে স্থির, পরম নিস্তব্ধ ও প্রশান্ত, সর্ব বন্ধনমুক্ত। জগতে আমাদের কর্ম দেওয়া হয় প্রথম আমাদের আত্ম-বিকাশ ও আত্মসার্থকতা সাধনের উপায় হিসাবে; কিন্তু এমনকি যদি এক সর্বশেষ সম্ভবপর দিব্য আত্ম-সম্পূর্ণতা লাভ করা যায় তা হ'লেও কর্ম তখনো থাকে জগতে দিব্য অভিপ্রায় পূরণের উপায় হিসেবে কর্ম থাকে বৃহত্তর বিশ্বাত্মার সার্থকতা সাধনের উপায় হিসেবে, যে বিশ্বাত্মার এক অংশ প্রতি জীব—এমন অংশ যা তার সহিত নিম্নে এসেছে অতিস্থিতি থেকে।

এক অর্থে যোগের এক বিশেষ পরিণত অবস্থায় মানুষের পক্ষে কর্মের অবসান হয়; কারণ তখন নিজের জন্য তার আর কর্মের প্রয়োজন থাকে না, সে যে কর্ম করছে এ বোধও থাকে না; কিন্তু কর্ম থেকে পালায়নের বা আনন্দ-পূর্ণ নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার কোনো দরকার নেই। কারণ এখন তার কাজ দিব্য সম্রাটের কাজের মতো—কোনো প্রয়োজনের বাধ্যবাধকতা নেই, নেই অবিদ্যার জুলুম। এমনকি কর্ম ক'রেও সে আদৌ কর্ম করে না; নিজ থেকে কোনো কাজ সে প্রবর্তন করে না। দিব্যশক্তিই কাজ করেন তার মধ্যে তার প্রকৃতির মাধ্যমে; তার ক্রিয়ার উপচয় হয় এক পরমাশক্তির স্বতঃস্ফূর্ততার মাধ্যমে; এই শক্তিই তার সব করণ অধিগত করেন, সে তাঁরই এক অংশ, তাঁর

সংকল্প ও সাধকের সংকল্প এক, সাধকের সামর্থ্য তাঁরই সামর্থ্য। তার অন্তঃস্থ চিৎ-পুরুষ এই ক্রিয়ার ধর্তা, ভর্তা ও দ্রষ্টা; ইহাই জ্ঞানের মধ্যে ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা কিন্তু ইহা আসক্তি বা প্রয়োজন বশে কর্মে লিপ্ত বা জড়িত হয় না, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা বদ্ধ নয়, অধীনও নয় কোনো গতিবৃত্তি বা সংবেগের।

সাধারণতঃ যে মনে করা হয় যে কামনা না থাকলে ক্রিয়া অসম্ভব অথবা অন্ততঃ অর্থশূন্য তা ভুল। বলা হয় যে কামনা বন্ধ হ'লে ক্রিয়াও বন্ধ হ'তে বাধ্য। কিন্তু এই কথাটি অন্যান্য অতি সরলকরা ব্যাপক চুম্বক কথার মতো মনের প্রিয় বটে, কেন না মন সব কিছু খণ্ড ক'রে সীমাবদ্ধ করে, কিন্তু আসলে ইহা তত সত্য নয়। বিশ্বে যে কাজ করা হয় তার বেশীর ভাগেই কামনার কোনো সংশ্রব নেই; ইহা চলে প্রকৃতির শান্ত আবশ্যকতা ও স্বতঃস্ফূর্ত বিধানে। এমনকি মানুষও নানাবিধ কর্ম করে স্বতঃস্ফূর্ত সংবেগ, বোধি, সংস্কার বশে, অথবা কাজের পিছনে থাকে বিভিন্ন শক্তির স্বাভাবিক রীতি ও বিধানের প্রেরণা, তাতে যে কোনো মানসিক পরিকল্পনা বা প্রাণের কোনো সচেতন সংকল্পের তাড়না বা ভাবাবেগময় কামনা থাকে তা-ও নয়। প্রায়শঃই তার কাজ হয় তার অভিপ্রায় বা কামনার বিপরীত; তার ভিতর থেকে কর্ম আসে—হয় কোনো প্রয়োজন বা বাধ্যবাধকতার চাপে, কোনো সংবেগের তাড়নায়, তার মধ্যে আত্ম-প্রকাশে সচেষ্ট কোনো শক্তির বশে অথবা সে সচেতন ভাবে কোনো উচ্চতর তত্ত্ব অনুসরণ করে ব'লে। কামনা একটি অতিরিক্ত প্রলোভন তার প্রকৃতি ইহাকে এক বড় অংশ দিয়েছে সজীব প্রাণীর জীবনে, যাতে তার মধ্যবর্তী উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় এক প্রকার রাজসিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহা তার একমাত্র যন্ত্র নয়, এমন কি প্রধান যন্ত্রও নয়। যতক্ষণ ইহা বর্তমান থাকে ততক্ষণ ইহার উপকারিতা অনেক; নিশ্চেষ্টতা থেকে উপর উঠতে ইহা আমাদের এক সহায়; অনেক তামসিক শক্তি ইহা খণ্ডন করে, তা না হ'লে এদের দ্বারা ক্রিয়া ব্যাহত হ'ত। কিন্তু যে সাধক কর্মমার্গে অনেক দূরে অগ্রসর হ'য়েছে সে এই যে মধ্যবর্তী অবস্থা যেখানে কামনা এক সহায়কর যন্ত্র তা অতিক্রম ক'রেছে। তার কাজের জন্য কামনার তাড়না আর অপরিহার্য নয়, বরং ইহা এক ভীষণ বাধা, এবং পদ-স্খলন, অপটুতা ও বিফলতার উৎস। অন্যেরা বাধ্য হ'য়ে ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রেরণার অনুবর্তী হয় কিন্তু তাকে কাজ করা শিখতে হবে নৈর্ব্যক্তিক বা সার্বিক মন নিয়ে বা এক অনন্ত পরম ব্যক্তির অংশ বা যন্ত্র হিসাবে। চাই এক শান্ত উদাসীন ভাব, সুখময় নিরপেক্ষতা অথবা দিব্য শক্তিতে সানন্দে সাড়া দেওয়া তা ইহার আদেশ যাই হ'কনা কেন—তবেই সম্ভব হবে তার সকল কর্ম সম্পাদন বা উপযুক্ত কর্মে ভার গ্রহণ। কামনা বা আসক্তি তার প্রেরণা হ'লে চলবে না, তার প্রেরণা হওয়া চাই এমন সংকল্প যা

এক দিব্য শান্তির মধ্যে সচল ,এমন জ্ঞান যা আসে বিশ্বাতীত আলোক থেকে, এমন উৎফুল্ল সংবেগ যা পরম আনন্দের শক্তি।

* * *

যোগের এক পরিণত অবস্থায়, সাধক তার ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী কি কাজ করবে বা না করবে,--এ প্রশ্ন অবান্তর, এমনকি সে আদৌ কাজ করবে কি না। ক'রবে তা-ও তার ব্যক্তিগত নির্বাচন বা তৃপ্তির দ্বারা ঠিক হবে না। যা কিছু পরম সত্যের সহিত সুসংগত বা ভগবান যা কিছু দাবী করেন তার প্রকৃতির মাধ্যমে সর্বদা তা-ই ক'রতে সে প্রবৃত্ত হয়। এ থেকে কখন কখন লোকে ভুল সিদ্ধান্ত করে যে আধ্যাত্মিক মানুষ অদৃষ্ট বা ভগবান বা তার অতীত কর্ম দ্বারা যে অবস্থায় পড়েছে তা-ই সে স্বীকার করে নেয়, জন্ম বা ঘটনাচক্রে বংশ, কুল, জাত, রাষ্ট্রগোতি, বৃত্তির যে ক্ষেত্র ও পদ সে পেয়েছে তাতে কাজ করতেই সে সন্তুষ্ট, সুতরাং সে এগুলি অতিক্রম করতে বা অন্য কোনো বৃহৎ পার্থিব লক্ষ্য অনুসরণ করতে চেষ্টা করবে না, আর এমন কি হয়ত এরূপ কোনো চেষ্টা করা উচিত হবে না। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে তার করার কোনো কাজ নেই, যেহেতু কর্ম যাই হ'ক না কেন, তার শরীর যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তার কর্তব্য হ'ল সব কর্ম ব্যবহার করা শুধু মুক্তি পাবার জন্য অথবা মুক্তি পাবার পর তার কর্তব্য,--শুধু পরম সংকল্পের অনুবর্তী হ'য়ে ইহা যা সব আদেশ দেয় সে সবই করা, সুতরাং যে বাস্তব ক্ষেত্র তাকে দেওয়া হয়েছে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। একবার মুক্ত হ'লে তার কর্তব্য হ'ল শুধু কাজ করে চলা সেই ক্ষেত্রে যা তাকে দেওয়া হ'য়েছে অদৃষ্ট ও ঘটনার দ্বারা যতক্ষণ না সেই পরম মুহূর্ত আসে যখন সে অবশেষে সক্ষম হয় অনন্তের মাঝে বিলীন হ'তে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য আগ্রহী হওয়ার বা কোনো বড় পার্থিব উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করার অর্থ কর্মের ভ্রান্তিতে পড়া; ইহার অর্থ এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা যে পার্থিব জীবনের কোনো বোধগম্য অভিপ্রায় আছে, এবং অনুসরণের অনেক যোগ্য বিষয়ও ইহাতে আছে। ইহাই সেই প্রবল মায়াবাদ যাতে কার্যতঃ জগতের মাঝে ভগবানকে অস্বীকার করা হয় যদিও তার ভাবনায় থাকে ভগবদ্-উপস্থিতির স্বীকৃতি। কিন্ত এখানে, এই জগতেই ভগবান আছেন- শুধু স্থিতিতে নয়, স্ফুরণাতেও, শুধু যে অধ্যাত্ম আত্মা ও সান্নিধ্যরূপে তা নয়, সামর্থ্য, শক্তি, ক্রিয়াশক্তিরূপেও, এবং সেহেতু জগতে দিব্য কর্ম সম্ভবপর।

কর্মযোগীর উপর কোনো সংকীর্ণ তত্ত্ব কোনো সীমাবদ্ধ কর্মের পরিসর তার বিধান বা ক্ষেত্র হিসাবে চাপান যায় না। এ কথা সত্য যে মুক্তির দিকে অগ্রগতির কাজে বা আত্ম-শিক্ষার জন্য সব রকম কাজই--তা সে কাজ মানুষের কল্পনায় ছোট হ'ক বা বড় হ'ক, তার পরিধি সংকীর্ণ বা বিস্তৃত হ'ক—

সমভাবে ব্যবহার করা যায়। এ কথাও সত্য যে মুক্তির পর মানুষ জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে ও যে কোনো প্রকার কাজের মধ্যে থেকে সেখানেই সার্থক ক'রে তুলতে পারে তার জীবন ভগবানের মধ্যে। পরম চিৎ-পুরুষ তাকে যে ভাবে চালান সেইভাবে সে থাকতে পারে জন্ম ও ঘটনাচক্রের দেওয়া ক্ষেত্রের মধ্যে অথবা সেই পরিবেষ্টন ভেঙে সে বাহিরে যেতে পারে অবাধ ক্রিয়ার মধ্যে যা হবে তার সমুন্নত চেতনা ও উচ্চতর জ্ঞানের যোগ্য ক্ষেত্র। লোকের বাহিশ্চক্ষুতে হয়ত মনে হয় যে আন্তর মুক্তির দ্বারা তার বাহিরের কাজে কোনো পার্থক্য হয় নি; অথবা বিপরীতভাবে এমন হয় যে অন্তরের স্বাধীনতা ও আনন্ত্য বাহিরে এরূপ বৃহৎ ও নতুন স্ফুরন্ত কর্মধারার মধ্যে প্রকাশ হতে পরে যে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তার অভিনব শক্তিতে। তার অন্তঃস্থ পরতমের অভিপ্রায় হ'লে মুক্ত পুরুষ সেই মতো তার পুরণো মানুষী পরিবেশের মধ্যেই সূক্ষ্ম ও সীমাবদ্ধ কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে আর সেই সব পরিবেশের বাহ্য রূপে পরিবর্তনের কোনো চেষ্টাও হবে না। আবার এমনও হতে পারে যে তাকে এমন কাজে ডাকা হবে যাতে শুধু যে তার নিজের বাহ্য জীবনের সব রূপ ও ক্ষেত্র বদলে যাবে তা নয়, তার চারিপাশের কোনো কিছুই অপরিবর্তিত বা অক্ষুণ্ণ থাকবে না, সৃষ্টি হবে এক নতুন জগৎ বা নতুন সমাজ।

* * *

এক প্রচলিত ভাবনা আমাদের স্বীকার করাতে চায় যে মুক্তির একমাত্র লক্ষ্য হ'ল বিশ্বের চপল জীবনের মধ্যে ব্যষ্টি-পুরুষকে দৈহিক পুনর্জন্ম থেকে নিস্তার দেওয়া। যদি এই নিস্তার একবার নিশ্চিত হয় তা হ'লে এখানে বা অন্যত্র জীবনে আর কোনো কাজ থাকে না বা মাত্র সেইটুকু থাকে যা তার আরো কিছুকাল শরীর ধারণের জন্য দরকার বা অতীত জীবনসমূহের কর্মের অসম্পূর্ণ ফল হিসাবে অবশ্যম্ভাবী। যো সামান্যটুকু থাকে তা-ও যোগাগ্নির দ্বারা শীঘ্র নিঃশেষিত বা দগ্ধ হয়ে বন্ধ হয়ে যায় দেহ থেকে মুক্ত পুরুষের প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে। অন্তঃপুরুষের পরমার্থরূপে পুনর্জন্ম থেকে নিস্তার প্রাপ্তির লক্ষ্য ভারতীয় মানসিকতায় এখন বহুদিন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর বহুধর্ম তাদের দিব্য প্রলোভন হিসাবে ওপারে যে স্বর্গসুখ ভোগকে ভক্তের মানসিকতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল ইহা তার স্থান নিয়েছে। যখন বৈদিক স্তোত্রের স্থূল বাহ্য ব্যাখ্যা প্রধান ধর্মমত ছিল তখন ভারতীয় ধর্মও ঐ পূর্বতন অবর প্রেরণাকে সমর্থন করেছে, এবং পরবর্তী কালে ভারতীয় দ্বৈতবাদীরাও তাকেই রেখেছে তাদের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক প্রেরণার অংশ হিসাবে। ইহা নিঃসন্দেহ যে স্বর্গে মানসিক সুখভোগের বা চিরকাল ধরে দৈহিক আমোদ করার আশ্বাস অপেক্ষা মন ও দেহের সসীমতা থেকে পরম চিৎ-পুরুষের শাশ্বত শান্তি, বিশ্রাম, নীরবতার মধ্যে মুক্তির আকর্ষণ আরো মহত্তর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত

ইহাও তো এক প্রলোভন; জগতের প্রতি মনের বৈরাগ্য, নতুন জন্মের অজানা রহস্য থেকে প্রাণ-সত্তার জুগুপ্সা—এই সবে ইহা যে জোর দেয় তাতে দুর্বলতার সুর বাজে, ইহা কখনো শ্রেষ্ঠ প্রেরণা হ'তে পারে না। ব্যক্তিগত মুক্তির কামনা যত উচ্চ রূপেরই হ'কনা কেন ইহা অহং-এরই পরিণাম; ইহার মূলে আছে আমাদের নিজেদের পৃথক ব্যষ্টিত্বের ভাবনা, এবং নিজের শুভ বা মঙ্গলের জন্য ইহাব কামনা, কষ্টভোগ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বা সম্ভূতির দুঃখযন্ত্রণার বিলোপের জন্য আকুল প্রার্থনা আর এ সবকেই ইহা করে আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। অহং-এর এই ভিত্তিকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্য দরকার ব্যক্তি-গত কামনার ঊর্ধ্বে আরোহণ। আমরা যদি ভগবানকে চাই, তাহ'লে তা হওয়া উচিত ভগবানের জন্য, অন্য কিছুর জন্য নয়, কারণ তাহাই আমাদের সত্তার পরম আকৃতি, চিৎ-পুরুষের গভীরতম সত্য। মুক্তি, অন্তঃপুরুষের স্বাধী-নতা, আমাদের প্রকৃত ও সর্বোত্তম আত্মার উপলব্ধি ও ভগবানের সহিত মিলন --এই সবের জন্য সাধনার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ এই যে ইহাই আমাদের প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বিধান, পরতমের দিকে আমাদের অবর অংশের আকর্ষণ ইহাই, ইহাই আমাদের মধ্যে দিব্যসংকল্প। এই কারণই যথেষ্ট, আর ইহাই একমাত্র সত্যকার যুক্তি,অন্য সব প্রেরণা অপ্রয়োজনীয় বাড়তি জিনিস, ক্ষুদ্র বা প্রাসঙ্গিক সত্য বা উপকারী প্রলোভন কিন্তু যে মুহূর্তে ইহাদের উপকারিতা শেষ হয় আর পরতমের ও সর্বভূতের সহিত একত্বের অবস্থা আমাদের সাধারণ চেতনা হ'য়ে ওঠে এবং সেই অবস্থার আনন্দ হ'য়ে ওঠে আমাদের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সে মুহূর্তে ঐ সবকে পরিত্যাগ করা অন্তঃপুরুষের অবশ্য কর্তব্য।

অনেক সময় আমরা দেখি যে ব্যক্তিগত মুক্তির এই কামনাকে অপর এক আকর্ষণ পরাভূত করেছে যা আমাদের প্রকৃতির উচ্চতর প্রবণতার অন্তর্গত আর ইহাতে বোঝা যায় মুক্ত পুরুষের যে কাজ করা উচিত তার মূল প্রকৃতি কি। অমিতাভ বুদ্ধ সম্বন্ধে মহান্ উপাখ্যানের তাৎপর্য ইহাই -যখন তার চিৎ-পুরুষ নির্বাণের দ্বারে উপস্থিত তখন বুদ্ধ সেখান থেকে ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা করলেন যে যতদিন একটি প্রাণীও দুঃখ ও অবিদ্যার মধ্যে থাকবে ততদিন তিনি কখনো সেই দ্বারসীমা অতিক্রম করবেন না। ইহাই ভাগবত পুরাণের সেই সুমহান শ্লোকের আন্তর অর্থ- "অষ্টসিদ্ধিযুক্ত পরম অবস্থা বা পুনর্জন্মের নিবৃত্তি আমার কাম্য নয়, আমি যেন সকল আর্তজনের দুঃখভার নিয়ে তাদের মধ্যে থাকতে পারি যাতে তারা দুঃখমুক্ত হয়।" স্বামী বিবেকানন্দের এক পত্রের এক অপূর্ব অংশের প্রেরণা ইহাই; সেই মহান্ বৈদান্তিক লিখে-ছিলেন, "আমার নিজের মুক্তির সকল ইচ্ছা চলে গেছে, আমি যেন বারবার জন্ম নিয়ে সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি যাতে আমি পূজা করতে পারি সেই একমাত্র বিদ্যমান ভগবানকে যে একমাত্র ভগবানে আমি বিশ্বাসী যিনি নিখিল পুরুষের

সমষ্টি—এবং সর্বোপরি পাপী নারায়ণ, তাপী নারায়ণ, সর্বজাতির, সকল শ্রেণীর দরিদ্র নারায়ণই আমার বিশেষ আরাধ্য। যিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট—সর্বরূপী সেই প্রত্যক্ষ, জ্ঞেয়, সত্য ও সর্বব্যাপীকে উপাসনা কর, অন্যসব প্রতিমা ভেঙে ফেল। যাঁর মধ্যে পূর্ব জীবন নেই, পরজন্ম নেই, মৃত্যু নেই, গমনাগমন নেই, যাঁর মধ্যে আমরা সর্বদা অখণ্ডত্ব লাভ করেছি ও ভবিষ্যতেও করব, তাঁর উপাসনা কর, অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।”

বস্তুতঃ এই শেষের দুটি বাক্যের মধ্যে বিষয়টির সমগ্র সার বর্তমান। যেমন প্রকৃত সন্ন্যাসের অর্থ শুধু বাহ্যভাবে পরিবারবর্গ ও সমাজ ত্যাগ নয়, তেমন প্রকৃত মোক্ষের বা পুনর্জন্মের শৃঙ্খল থেকে প্রকৃত মুক্তির অর্থ পার্থিব জীবন বর্জন নয় অথবা আধ্যাত্মিক আত্ম-বিলোপের দ্বারা জীবের পলায়ন নয়; ইহার অর্থ ভগবানের সহিত আন্তর তাদাত্ম্যতা যে ভগবানের মধ্যে পূর্ব জীবন ও পর-জন্মের সসীমতা নেই, তার স্থলে আছে অজাত পুরুষের শাশ্বত জীবন। গীতা বলে, যে আন্তর মুক্ত সে সব কর্ম করলেও আদৌ কিছু করে না; কারণ প্রকৃতিই তার মধ্যে কাজ করে প্রকৃতির প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন হ'য়ে। সমভাবে বলা যায় যে যদি সে শতবার দেহধারণ করে তবু সে জন্মের শৃঙ্খল বা জীবনের যান্ত্রিক চক্র থেকে মুক্ত, কারণ সে বাস করে অজ ও অমর চিৎ-পুরুষের মধ্যে, দেহগত জীবনে নয়। সুতরাং পুনর্জন্ম থেকে নিস্তার পাওয়ার আসক্তি এমন এক প্রতিমা যা অন্য যে কেউ রাখুক না কেন পূর্ণযোগের সাধকের কর্তব্য তা ভেঙে তার কাছ থেকে ফেলে দেওয়া। কারণ তার যোগ শুধু ব্যষ্টি পুরুষের দ্বারা সকল জগতের অতীত বিশ্বাতীতের উপলব্ধিতেই সীমিত নয়, বিশ্বাত্মকের "নিখিল পুরুষের সমষ্টি"র উপলব্ধিও ইহার অন্তর্গত; সুতরাং তার যোগকে ব্যক্তিগত মুক্তি ও নিস্তার পাওয়ার সাধনাতেই নিবদ্ধ রাখা চলে না। এমন কি বিশ্বের সকল সীমার ঊর্ধ্বে তার অতিস্থিতিতেও সে তখনো ভগবানের মধ্যে সকলের সহিত এক; তার জন্য থাকে বিশ্বের দিব্য কর্ম।

* * *

ঐ কর্ম কোনো মনগড়া নিয়ম বা মানুষী মান দিয়ে নির্ধারিত করা যায় না; কারণ তার চেতনা চলে গেছে মানুষী বিধান ও সীমার গণ্ডি ছাড়িয়ে দিব্য স্বাধীনতার মধ্যে, বাহ্য ও অনিত্যের শাসন ছাড়িয়ে আন্তর ও নিত্যের আত্ম-শাসনের মধ্যে, সান্তের রূপের বন্ধন থেকে অনন্তের আত্ম-নিরূপণের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে। গীতা বলে, "যে ভাবেই সে বাস ও কর্ম করুক, সে বাস ও কর্ম করে আমারই মধ্যে।" মানুষের বুদ্ধি যে সব নিয়ম ব্যবস্থা করে মুক্ত পুরুষের পক্ষে সে সব খাটে না—যে সব বাহ্য মাপকাঠি ও নিরিখ তার সব মানসিক সংস্কার ও পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রচিত, সে সবের দ্বারা এরূপ লোকের বিচার চলেনা; এই সব ভ্রমপ্রবণ বিচারালয়ের সংকীর্ণ এলাকার বাহিরে তিনি।

তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন, না গৃহীর পূর্ণ জীবন যাপন করেন; তিনি দিন কাটান তথাকথিত পুণ্য কর্মে, না জগতের বহুমুখী কাজকর্মে; বুদ্ধ, খৃষ্ট বা শংকরের মতো তিনি মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে আলোকের দিকে নিয়ে যাবার কার্যে আত্ম-নিয়োগ করেন, না জনকের মতো রাজ্য শাসন করেন, না শ্রীকৃষ্ণের মতো রাজনীতিবিদ্‌ বা সেনানায়ক হ'য়ে জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়ান; —এসবে কিছু আসে যায় না। তাঁর খাদ্য বা পানীয় কি, কি কি তাঁর অভ্যাস বা কি কি তাঁর কাজ, তিনি বিফল, না সফল হয়েছেন, তাঁর কাজ কি গঠনের না ধ্বংসের, তিনি কি পুরণো সমাজ রক্ষা করেন, না ইহাকে পুনঃস্থাপন করেন, না চেষ্টা করেন ইহার পরিবর্তে নতুন সমাজ গড়তে, তাঁর সংগী-সাথীরা কি সেই সব লোক যাদের জনসাধারণ সানন্দে সম্মান করে না সেইসব লোক যারা তাদের উচ্চতর ন্যায়নিষ্ঠতাবোধে পতিত ও পাপাসক্ত, সমকালীন লোকেরা কি তাঁর জীবন ও কার্য অনুমোদন করে, না তাঁকে নিন্দা করে এই বলে যে তিনি জনসাধারণকে বিপথে নেন, প্রচলিত ধর্ম, নীতি বা সমাজের বিরুদ্ধ মতের প্ররোচনা দেন—এই সব প্রশ্নও অর্থশূন্য। সাধারণ মানুষের বিচার বা অজ্ঞানীর তৈরী বিধান অনুযায়ী তিনি চলেন না, তিনি চলেন আন্তর বাণীর নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁকে চালায় এক অদৃশ্য শক্তি। তাঁর প্রকৃত জীবন অন্তরে, আর তার পরিচয় এই যে তিনি বাস করেন, বিচরণ করেন, কার্য করেন ভগবানের মধ্যে, দিব্য চেতনার মধ্যে, অনন্তের মধ্যে।

কিন্তু তাঁর ক্রিয়া কোনো বাহ্য বিধির নিয়ন্ত্রণাধীন না হ'লেও, ইহা এমন এক বিধি অনুযায়ী চলে যা বাহ্য নয়; ইহার মূলে কোনো ব্যক্তিগত কামনা বা লক্ষ্যের প্রেরণা থাকবে না; ইহা হবে জগতের মধ্যে এক সচেতন দিব্যকর্ম-প্রণালীর অংশ যে প্রণালী স্বনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত। গীতা বলে,—মুক্তপুরুষের ক্রিয়া কামনার দ্বারা চালিত হবে না, তার লক্ষ্য হবে "লোকসংগ্রহ"—জগৎকে একত্র রাখা, এবং তার নির্ধারিত পথে তাকে চলার নির্দেশ ও বেগ দেওয়া ও রক্ষা করা। গীতার এই অনুচ্ছেদকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে যেহেতু জগৎ এক মায়া এবং বেশীর ভাগ লোকই মুক্তির অনুপযুক্ত ব'লে তাদের সেই মায়ার মধ্যেই বাধ্য হয়ে রাখা দরকার, সেহেতু মুক্ত পুরুষের উচিত বাহ্যতঃ এমন কাজ করা যাতে সামাজিক বিধানে নির্দিষ্ট বিভিন্ন প্রচলিত কর্মের প্রতি তাদের আসক্তি বজায় থাকে। এই ব্যাখ্যা সত্য হ'লে, অনুজ্ঞাটি এমন এক নগণ্য ও ক্ষুদ্র বিধি হবে যা উন্নত সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই প্রত্যাখ্যান করবে, সে বরং অনুসরণ করবে অমিতাভ বুদ্ধের প্রতিজ্ঞা, ভাগবতের মহতী প্রার্থনা, বিবেকানন্দের আবেগময়ী আস্পৃহা। কিন্তু যদি আমরা এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করি যে জগৎ হ'ল প্রকৃতির এমন এক ভগবদ্‌-চালিত গতিধারা যা মানবের মধ্যে প্রকট হ'য়ে ভগবদ্‌-অভিমুখে চলেছে আর ইহা যদি সেই কর্ম হয় যাতে,

গীতায় ভগবান বলেছেন, তিনি সর্বদাই ব্যাপৃত যদিও তাঁর নিজের অপ্রাপ্য এমন কিছু নেই যা তাকে এখনো পেতে হবে তাহ'লে আমরা এই মহতী অনুজ্ঞার এক গভীর ও প্রকৃত অর্থ পাব। এই দিব্য কর্মে সহযোগী হওয়া, ভগবানের জন্য জগতে বাস করা—ইহাই হবে কর্মযোগীর নিয়ম; ভগবানের জন্য কাজ করা চাই, সুতরাং এমন ভাবে কাজ করা চাই যে ভগবান যেন উত্তরোত্তর নিজেকে ব্যক্ত করতে পারেন আর যে পথেই হ'ক না কেন জগৎ যেন এগিয়ে যায় তার অজানা তীর্থ যাত্রায় এবং ক্রমশঃ নিকটবর্তী হয় দিব্য আদর্শের।

কেমন ভাবে তিনি ইহা করবেন, কি বিশেষ উপায়েই বা তা করা হবে—ইহা কোনো সাধারণ নিয়মে স্থির করা যায় না। ভিতর থেকেই ইহা নিজে নিজে ফুটে উঠবে বা আকার নেবে; এই সিদ্ধান্তের ভার ভগবান ও আমাদের আত্মার উপর, পরমাত্মা ও যে ব্যষ্টি আত্মা কর্মের যন্ত্র তাদের উপর; এমন কি মুক্তির পূর্বেও যখনই আমরা আন্তর আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হই তখনই আসে এই পথের অনুমোদন, আধ্যাত্মভাবে নির্ধারিত নির্বাচন। করণীয় কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আসা চাই সম্পূর্ণ অন্তর থেকেই। এমন কোনো বিশেষ কর্ম, কোনো বিধান বা রূপ বা বাহ্যভাবে নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয় কর্মপন্থা নেই যার সম্বন্ধে বলা যায় যে ইহাই মুক্ত পুরুষের কর্ম বা বিধান ইত্যাদি। এই করণীয় কর্ম প্রকাশ করতে গীতায় যে কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ এই করা হয়েছে যে আমাদের উচিত কর্তব্য কর্ম করা ফলের দিকে না তাকিয়ে। কিন্তু এই ধারণা ইওরোপীয় সংস্কৃতির ফল, যে সংস্কৃতির ভাবনাগুলি আধ্যাত্মিক অপেক্ষা নৈতিক, আন্তরভাবে গভীর অপেক্ষা বরং বাহ্য। কর্তব্য কর্ম বলে কোনো সর্বজনীন বিষয় নেই; আমাদের আছে শুধু বিভিন্ন কর্তব্য কর্ম আর প্রায়শই ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকে, আর এই সব কর্ম নির্ধারিত হয় আমাদের পরিবেশ, আমাদের সামাজিক সম্পর্ক ও জীবনে আমাদের বাহ্য মর্যাদার দ্বারা। অপরিণত নৈতিক প্রকৃতিকে শিক্ষা দেওয়ার কাজে এবং স্বার্থপর কামনার ক্রিয়াকে নিরুৎসাহ করে এমন মান স্থাপন করায় ইহাদের মূল্য অনেক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে যতদিন সাধক কোনো আন্তর আলোক না পায় ততদিন তাকে চলতে হবে তার যে সর্বোত্তম আলোক আছে তা দিয়েই আর যে সব মান সে সাময়িকভাবে খাড়া ক'রে পালন করতে পারে তাদের মধ্যে আছে কর্তব্য কর্ম, নীতি, মহান উদ্দেশ্য। কিন্তু যতই এইসব কর্তব্য কর্ম মূল্যবান হ'ক ইহারা বাহ্য বিষয়, ইহারা অন্তঃপুরুষের উপাদান নয়, এই পথের ক্রিয়ার চরম মান হওয়ার অনুপযুক্ত ইহারা। সৈনিকের কর্তব্য হ'ল আদেশ পালন করে যুদ্ধ করা, এমনকি নিজের আত্মীয় স্বজনের ওপর গুলি করা; কিন্তু এরূপ কোনো মান বা অনুরূপ কিছু মুক্ত পুরুষের উপর চাপান

যাওয়া যায় না। অপর পক্ষে ভালোবাসা বা করুণা করা, আমাদের সত্তার শ্রেষ্ঠ সত্যের অনুবর্তী হওয়া, ভগবানের আদেশ পালন করা—এই সব কর্তব্য কর্ম নয়, প্রকৃতি যখন ভগবানের দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় তখনকার প্রকৃতির বিধান এই সব, ইহারা অন্তঃপুরুষের কোনো বিশেষ অবস্থা থেকে ক্রিয়ার বহিঃপ্রবাহ, চিৎ-পুরুষের উচ্চ সত্যতা। মুক্ত কর্মীরও ক্রিয়া হওয়া চাই অন্তঃপুরুষ থেকে এইরূপ এক বহিঃপ্রবাহ, ভগবানের সহিত তার অধ্যাত্ম মিলনের স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপ তার নিকট ইহার আসা বা তার মধ্য হ'তে বাহির হওয়া চাই; মানসিক মনন ও সংকল্পের ব্যবহারিক যুক্তি বুদ্ধি বা সামাজিক বোধের কোনো উৎকৃষ্ট রচনার দ্বারা ইহার সৃষ্টি হ'লে চলবে না। সাধারণ জীবনে কোনো ব্যক্তিগত বা সামাজিক, বা ঐতিহ্যগত কৃত্রিম নিয়ম, মান বা আদর্শই আমাদের পথপ্রদর্শক, কিন্তু একবার আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা শুরু হলে ইহার স্থলে আনা চাই এমন এক আন্তর বা বাহ্য বিধি বা জীবন ধারা যা আমাদের আত্ম-শিক্ষা, মুক্তি ও সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়, এমন এক জীবনধারা যা আমাদের অনুসরণ করা পথের উপযোগী অথবা আধ্যাত্ম দিশারী ও অধীশ্বর গুরুর দ্বারা বিহিত আর না হয় আমাদের অন্তঃস্থ পরম দিশারীর দ্বারা নির্দিষ্ট। কিন্তু অন্তঃপুরুষের আনন্ত্য ও মুক্তির চরম অবস্থায় সকল বাহ্য মান সরিয়ে ফেলা হয় বা পাশে রাখা হয় আর অবশিষ্ট থাকে শুধু আমরা যে ভগবানের সহিত মিলিত তার প্রতি এক স্বতঃস্ফূর্ত ও অখণ্ড মান্যতা আর থাকে এমন ক্রিয়া যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সার্থক করে আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির অখণ্ড আধ্যাত্মিক সত্য।

* * *

এই গভীরতর অর্থেই আমাদের নেওয়া উচিত গীতার নির্দেশ যে স্বভাব দ্বারা নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াই হওয়া উচিত আমাদের কর্মের বিধান। ইহা ঠিকই যে "স্বভাব" কথাটির অর্থ বাহ্য মেজাজ বা চরিত্র বা অভ্যাসগত সংবেগ নয়, সংস্কৃত পদটির যে আক্ষরিক অর্থ ইহা তা-ই—আমাদের "আপন সত্তা", আমাদের মূল প্রকৃতি, আমাদের সব অন্তঃপুরুষের দিব্য উপাদান। যা কিছুর উৎপত্তি এই মূল থেকে বা প্রবাহ এইসব উৎস থেকে তাহাই গভীর, মৌলিক, যথার্থ; বাকীসব যেমন মতামত, বিভিন্ন সংবেগ, অভ্যাস, কামনা—হয়ত সত্তার শুধু উপরভাসা বিভিন্ন রূপায়ণ বা ক্ষণিক খেয়াল বা বাহির থেকে আরোপ। তারা আসা যাওয়া করে, তাদের পরিবর্তন হয় কিন্তু এই যে স্বভাব তা স্থির থাকে। প্রকৃতি আমাদের মধ্যে যে কার্য সাধনের রূপ নেয় সেগুলি আমরা নই অথবা আমাদের স্থায়ী, স্থির, এবং প্রকাশশীল বিভিন্ন আকারও আমরা নই, আমাদের মধ্যে যে অধ্যাত্ম সত্তা—আর অন্তঃপুরুষরূপে

ইহার যে সম্ভূতি তা-ও এই সত্তার অন্তর্গত—বিশ্বে কালের মধ্যে চিরস্থায়ী তাহাই আমাদের আপন সত্তা।

অবশ্য আমাদের সত্তার এই সত্যকার আন্তর ধর্মকে সহজে অন্য সব থেকে বুঝতে পারা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; যতক্ষণ হৃদয় ও বুদ্ধি অহংভাব থেকে মুক্ত না হ'য়ে অশুদ্ধ থাকে ততদিন ইহাকে আমাদের কাছ থেকে আড়ালে রাখা হয়; ততদিন আমরা আমাদের পরিবেশ-থেকে-আসা সকল রকম বাহ্য ও চঞ্চল ভাবনা, সংবেগ, কামনা, আভাসন ও আরোপ অনুযায়ী চলি অথবা ফুটিয়ে তুলি আমাদের সাময়িক মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক ব্যক্তিভাবনার বিভিন্ন রূপায়ণগুলি—যে ব্যক্তিভাবনা এমন এক অস্থায়ী পরীক্ষামূলক আত্মা, যা আমাদের জন্য গঠিত হয়েছে একদিকে আমাদের সত্তা ও অন্য দিকে অপরা বিশ্ব প্রকৃতির চাপ এই দুয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ। যে পরিমাণে আমরা শুদ্ধ হ'য়ে উঠি সেই পরিমাণে আমাদের ভিতরকার আসল সত্তা নিজেকে প্রকট করে; আমাদের সংকল্প বাহির-থেকে-আসা আভাসনগুলির মধ্যে কম জড়িত হয় বা আমাদের নিজস্ব বাহ্য মানসিক রচনাসমূহের মধ্যে কম আবদ্ধ থাকে। অহংভাব বর্জিত হ'লে, প্রকৃতি শুদ্ধ হ'লে ক্রিয়া আসবে অন্তঃপুরুষের নির্দেশ থেকে, চিৎ-পুরুষের গহন বা উচ্চ স্তর থেকে আর না হয় প্রকাশ্য-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে ভগবানের দ্বারা যিনি সকল সময়ই গূঢ়ভাবে সমাসীন ছিলেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। যোগীর প্রতি গীতার পরম ও চরম বাণী এই যে তার কর্তব্য বিশ্বাস ও ক্রিয়ার সকল প্রচলিত সূত্র, আচরণের সকল নির্দিষ্ট বা বাহ্য বিধি, বহির্মুখী উপরভাসা প্রকৃতির সকল রচনা, "সর্বধর্ম" পরিত্যাগ ক'রে শরণ লওয়া একমাত্র ভগবানের। সে কামনা ও আসক্তি থেকে মুক্ত ও সর্বভূতের সহিত এক হয়ে বাস করে অনন্ত সত্য ও বিশুদ্ধির মধ্যে ও কাজ করে তার আন্তর চেতনার গহনতম অন্তঃস্থল থেকে, নিয়ন্ত্রিত হয় তার অমর দিব্য ও সর্বোত্তম আত্মার দ্বারা; সেজন্য তার সকল কর্ম চালিত হবে ভিতরের পরম শক্তির দ্বারা আমাদের অন্তঃস্থ সেই মূল চিৎ-পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যা জেনে, যুদ্ধ করে, কাজ ক'রে, ভালবেসে, সেবা ক'রে সর্বদাই দিব্য আর এই সব কর্মের লক্ষ্য হ'ল জগতের মধ্যে ভগবানের সার্থকতা, কালের মধ্যে সনাতনের বহিঃপ্রকাশ।

এই পূর্ণ কর্মযোগের চরম অবস্থা হ'ল এমন এক দিব্য ক্রিয়া যা স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে, স্বচ্ছন্দে ও অভ্রান্তভাবে উদ্গত হয় ভগবানের সহিত যুক্ত আমাদের চিন্ময় আত্মার আলোক ও শক্তি থেকে। মুক্তি সন্ধান করা আমাদের যে দরকার তার সব চেয়ে যথার্থ কারণ জগতের দুঃখতাপ থেকে একক ভাবে মুক্ত হওয়া নয়, যদিও এই মুক্তিও আমাদের দেওয়া হবে,—আমাদের মুক্তি প্রচেষ্টার দরকার এই জন্য যে আমরা যেন এক হ'তে পারি ভগবান, পরাৎপর, সনাতনের সহিত।

সিদ্ধি, পরম অবস্থা, শুদ্ধি, জ্ঞান, ক্ষমতা, প্রেম ও সামর্থ্য যে কেন আমাদের সন্ধান করা দরকার তার যথার্থতম কারণ এই নয় যে আমরা ব্যক্তিগতভাবে দিব্য প্রকৃতি ভোগ ক'রতে বা এমনকি দেবতাদের মতো হতে পারব--যদিও সে ভোগও আমাদের হবে, তার সত্য কারণ এই যে এই মুক্তি ও সিদ্ধি আমাদের মধ্যে দিব্য সংকল্প, প্রকৃতির মধ্যে আমাদের আত্মার শ্রেষ্ঠ সত্য, বিশ্বের মধ্যে উত্তরোত্তর অভিব্যক্তির চির-অভিপ্রেত লক্ষ্য। মুক্ত ও সিদ্ধ ও আনন্দময় দিব্য প্রকৃতিকে জীবের মধ্যে ব্যক্ত করা অবশ্য কর্তব্য তবেই তো সম্ভব হবে জগতের মধ্যে ইহার অভিব্যক্তি। এমনকি অবিদ্যার মধ্যেও জীব প্রকৃত পক্ষে বাস করে বিশ্বাত্মকের মধ্যে এবং বিশ্বজনীন উদ্দেশ্যের জন্য; কেননা তার অহং-এর সব উদ্দেশ্য ও কামনার পশ্চাতে ছোটার কাজেও প্রকৃতি তাকে বাধ্য করে তার অহমাত্মক কাজ দিয়ে জগৎসমূহের মধ্যে প্রকৃতির কাজ ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করতে; কিন্তু এই সহায়তা সে জেনে শুনে ইচ্ছা ক'রে করেনা, আর যা করে তা-ও অসম্পূর্ণভাবে ও প্রকৃতির অর্ধ-বিকশিত ও অর্ধ-চেতন, তার অপূর্ণ ও অশুদ্ধ ক্রিয়াধারাতে। অহং থেকে নিস্তার পেয়ে ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়াই এক সাথে তার ব্যষ্টিত্বের মুক্তি ও পূর্ণতা; এইভাবে মুক্ত, শুদ্ধ ও সিদ্ধ হ'য়ে জীব, দিব্যপুরুষ সচেতন ভাবে ও পুরো-পুরি বাস করে—যেমন প্রথম থেকেই অভিপ্রেত ছিল,—বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত ভগবানের মধ্যে ও তাঁর জন্য এবং বিশ্বের মধ্যে তাঁর সংকল্পের জন্য।

জ্ঞানমার্গে আমাদের এমন এক স্থানে পৌঁছান সম্ভব যেখান থেকে আমরা সমর্থ হই ব্যক্তিসত্ত্ব ও বিশ্ব থেকে বাহিরে লাফ দিয়ে সকল মনন ও সংকল্প ও ক্রিয়া ও প্রকৃতির সকল ব্যাপার থেকে নিস্তার পেতে এবং শাশ্বতত্বের মধ্যে অঙ্গীভূত ও গৃহীত হ'য়ে আমরা সমর্থ হই মগ্ন হ'তে অতিস্থিতির মধ্যে; আর ভগবদ্‌জ্ঞাতার পক্ষে বাধ্যতামূলক না হ'লেও তাহাই হতে পারে অন্তঃ-পুরুষের সিদ্ধান্ত, আমাদের অন্তঃস্থ আত্মার যাত্রার শেষ সীমা। ভক্তিমার্গে আমাদের পক্ষে সম্ভব ভক্তি ও আনন্দের তীব্রতার মধ্য দিয়ে পরম প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হওয়া এবং একমাত্র তাঁতেই একাগ্রচিত্ত হ'য়ে তাঁর সহিত একই আনন্দধামে অন্তরঙ্গভাবে অনন্তকাল তাঁর সান্নিধ্যের উল্লাসে থাকা; তখন তাহাই হবে আমাদের সত্তার প্রচোদনা, ইহার আধ্যাত্মিক নির্বাচন। কিন্তু কর্ম-মার্গে অন্য এক সম্ভাবনার পথ খুলে যায়; কেননা এই পথ অনুসরণ ক'রে আমরা সনাতনের সহিত প্রকৃতির বিধান ও সামর্থ্যে এক হ'য়ে সমর্থ হই মুক্তি ও সিদ্ধি পেতে; আমরা তাঁর সহিত একাত্ম হতে পারি যেমন আমাদের আধ্যা-ত্মিক পাদে তেমন আমাদের সংকল্প ও স্ফুরন্ত আত্মায়; এই মিলনের স্বাভা-বিক পরিণতিই হবে এক দিব্য কর্ম পন্থা; আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মধ্যে দিব্য জীবনযাপনই হবে ইহার আত্ম-প্রকাশের মূর্তি। পূর্ণযোগে এই তিন পথ তাদের

স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে পরস্পরের সহিত মিশে এক হয় অথবা পরস্পরের মধ্য থেকে বাহির হয়; আত্মার উপর মনের আচ্ছাদন থেকে মুক্ত হ'য়ে আমরা বাস করি অতি-স্থিতির মধ্যে, হৃদয়ের ভক্তির দ্বারা প্রবেশ করি পরম প্রেম ও আনন্দের একত্বের মধ্যে আবার আমাদের সত্তার সকল শক্তি এক মহা শক্তিতে উন্নীত এবং আমাদের সংকল্প ও সব কর্ম এক অখণ্ড সংকল্প ও সামর্থ্যে সমর্পিত হওয়ার ফলে আমরা লাভ করি দিব্য প্রকৃতির স্ফুরন্ত সিদ্ধি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়*

অতিমানস ও কর্মযোগ

পূর্ণযোগের সমগ্র ও চরম লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত এক অত্যাবশকীয় ও অপরিহার্য উপাদান হ'ল সমগ্র সত্তার পরিবর্তন এক পরতর আধ্যাত্মিক চেতনায় ও এক বৃহত্তর দিব্য সত্তায়। আমাদের সংকল্প ও ক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ, আমাদের জ্ঞানের বিভিন্ন অংশ, আমাদের চিন্তাশীল সত্তা, আমাদের ভাবাবেগময় সত্তা, আমাদের প্রাণের সত্তা, আমাদের সকল আত্মা ও প্রকৃতি এ সকলেরই অবশ্য কর্তব্য হ'ল ভগবানকে চাওয়া, অনন্তের মধ্যে প্রবেশ করা, সনাতনের সহিত যুক্ত হওয়া। কিন্তু মানুষের বর্তমান প্রকৃতি সীমিত, বিভক্ত, অসম -তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহজ হ'ল তার সত্তার প্রবলতম অংশে একাগ্র হ'য়ে তার প্রকৃতির উপযোগী উন্নতির কোনো নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করা। একেবারে সোজা দিব্য আনন্ত্যের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা আছে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং কারো কারোর পক্ষে যাত্রার সূচনা হিসাবে মননের একাগ্রতা, বা ধ্যান বা মনের একমুখিতা নির্বাচন করা দরকার যাতে তারা নিজেদের মধ্যে সন্ধান পায় পরমাত্মার শাশ্বত সত্যতা; অন্যদের পক্ষে আরো সহজ হ'ল হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে ভগবানের সনাতনের সাক্ষাৎ পাওয়া : এছাড়া অপর কিছু লোক আছে যারা প্রধানতঃ স্ফুরন্ত ও সক্রিয়, এদের পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ হ'ল সংকল্পে নিজেদের কেন্দ্রীভূত ক'রে কর্মের মাধ্যমে তাদের সত্তাকে বৃহৎ করা। যিনি পরমাত্মা ও সকল কিছুর উৎস তাঁর আনন্ত্যের মধ্যে নিজেদের সংকল্প সমর্পণ ক'রে তাঁর সহিত যুক্ত হ'য়ে, অন্তঃস্থ গূঢ় পরমদেবতার দ্বারা তাদের সকল কর্মে চালিত হ'য়ে, তাদের মনন, বেদনা, কার্যের সকল ক্রিয়া-শক্তির অধীশ্বর ও প্রবর্তক হিসাবে বিশ্ব ক্রিয়ার অধীশ্বরের কাছে আত্ম-সমর্পণ ক'রে, সত্তার বৃহত্ত্বের দ্বারা স্বার্থশূন্য ও বিশ্বজনীন হ'য়ে তারা কর্মের মাধ্যমে পেতে সমর্থ হয় এক আধ্যাত্মিক অবস্থার কিছু প্রাথমিক পরিপূর্ণতা। কিন্তু যেখান থেকেই সাধনা শুরু করা হ'ক না কেন প্রত্যেক সাধন পথকেই তার সংকীর্ণতা থেকে বার হ'য়ে প্রবেশ করতে হবে বিশালতর রাজ্যে; অবশেষে ইহাকে অগ্রসর হ'তে হবে

---

*গ্রন্থকার এই গ্রন্থের যে আরো বিস্তার সাধন মনস্থ করেছিলেন কিন্তু শেষ করেন নি তারই এক অংশ ইহা। এইখানে তার প্রথম প্রকাশ।

পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, ভাবাবেগ, স্ফুরন্ত ক্রিয়ার সংকল্প এবং সত্তার ও সম্পূর্ণ প্রকৃতির সিদ্ধির সমগ্রতার মাধ্যমে। অতিমানসিক চেতনায়, অতিমানসিক জীবনস্তরে, এই অখণ্ডতা সাধন পরিপূর্ণ হয়, সেখানে জ্ঞান, সংকল্প, ভাবাবেগ, আত্মা এবং স্ফুরন্ত প্রকৃতির সিদ্ধির প্রত্যেকটি তার নিজস্ব একান্তে ওঠে আর সকলে পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ সুসংগত ভাবে সম্মিলিত হ'য়ে উত্থিত হয় দিব্য অখণ্ডতায়, দিব্য সিদ্ধিতে। কারণ অতিমানস এমন এক ঋতচেতনা যার মধ্যে দিব্য সদবস্তু সম্পূর্ণ ব্যক্ত, ইহা আর অবিদ্যাকে যন্ত্র ক'রে কাজ করে না; সত্তার স্থিতির যে এক সত্য একান্ত স্ফুরন্ত তা হ'য়ে ওঠে সত্তার ক্রিয়াশক্তি ও সক্রিয়তার এমন এক সত্যের মধ্যে যা স্বপ্রতিষ্ঠ ও সিদ্ধ। সেখানে প্রতি গতিবৃত্তিটি ভগবানের আত্ম-চিৎ সত্যের গতিবৃত্তি এবং প্রত্যেক অংশই সমগ্রের সহিত সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। এমন কি সর্বাপেক্ষা সীমিত ও সান্ত ক্রিয়াও ঋতচেতনার মধ্যে সনাতন ও অনন্তেরই গতি এবং সনাতন ও অনন্তের স্বগত একান্ততা ও সিদ্ধির অধিকারী। অতিমানসিক সত্যের মধ্যে উত্তরণের ফলে শুধু যে আমাদের আধ্যাত্মিক ও মৌলিক চেতনা সেই উচ্চতায় উন্নীত হয় তা নয়, এই আলোক ও সত্যের অবতরণও সাধিত হয় আমাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে ও আমাদের প্রকৃতির সকল অংশের ভিতর। তখন সকল কিছুই হ'য়ে ওঠে দিব্য সত্যের অংশ, পরম মিলন ও একত্বের উপাদান ও উপায়; সুতরাং এই উত্তরণ ও অবতরণ যে এই যোগের এক চরম লক্ষ্য হবে তা নিশ্চিত।

আমাদের সত্তা ও সর্বসত্তার দিব্য সদ্-বস্তুর সহিত মিলনই যোগের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য। ইহা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন; আমাদের স্মরণ রাখা চাই যে শুধু অতিমানসলাভের জন্য যোগসাধন করা হয় না, যোগসাধন করা হয় ভগবানের জন্য; আমরা যে অতিমানস চাই তা তার আনন্দ ও মহত্ত্বের জন্য নয়, আমরা অতিমানস চাই মিলনকে একান্ত ও সম্পূর্ণ ক'রতে, তাকে অনুভব করতে, অধিগত ও স্ফুরন্ত করতে আমাদের সত্তার সকল রকম সম্ভবপর প্রণালীতে, তার উচ্চতম তীব্রতায়, বৃহত্তম প্রসারতায় এবং আমাদের প্রকৃতির প্রতি স্তরে, প্রতি বাঁকে, প্রতি কোণে ও নিভৃত স্থানে। ইহা মনে করা ভুল যেমন অনেকে সহজেই মনে ক'রতে পারে, যে অতিমানসিক যোগের উদ্দেশ্য—অতিমানবত্বের বিশাল মহিমা লাভ, এক দিব্য সামর্থ্য ও মহত্ব, এক স্ফীত ব্যষ্টি ব্যক্তিসত্ত্বের আত্ম-সার্থকতা লাভ। কিন্তু এই ভাবনা মিথ্যা ও বিপজ্জনক—বিপজ্জনক কারণ ইহার ফলে দেখা দিতে পারে আমাদের রাজসিক প্রাণিক মনের দর্প, দম্ভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর এদের দমন ও অতিক্রম না করে হ'লে আধ্যাত্মিক পতন অনিবার্য হ'য়ে ওঠে; আর ইহা মিথ্যা এই জন্য যে ইহা এক অহমাত্মক ভাবনা অথচ অতিমানসিক রূপান্তরের প্রথম সর্তই হ'ল অহং-নাশ। দৃঢ়সংকল্প কর্মতৎপর লোকের সক্রিয় ও স্ফুরন্ত

প্রকৃতির পক্ষে ইহা অতীব বিপজ্জনক কারণ ইহা সহজেই ক্ষমতার সন্ধানে পথভ্রষ্ট হতে পারে। অতিমানসিক রূপান্তরের এক অনিবার্য ফল হ'ল ক্ষমতা, সুষ্ঠু ক্রিয়ার জন্য ইহা থাকা চাই-ই : কিন্তু যা আসে আর প্রকৃতি ও জীবনকে অধিগত করে তা দিব্যশক্তি, পরম একের সামর্থ্য যা অধ্যাত্ম জীবের মাধ্যমে সক্রিয়; ইহা ব্যক্তিগত শক্তির মহোন্নতি নয় বা বিভক্ত মানসিক ও প্রাণিক অহং-এর চরম পূর্ণতার মুকুটমণি নয়। আত্ম-পূর্ণতা যোগের অন্যতম ফল বটে কিন্তু ইহার লক্ষ্য ব্যষ্টির মহত্ব নয়। একমাত্র লক্ষ্য হ'ল অধ্যাত্ম সিদ্ধি, প্রকৃত আত্মার সন্ধান লাভ এবং দিব্য চেতনা ও প্রকৃতি* লাভ ক'রে ভগবানের সহিত মিলন। বাকীসব ইহারই মধ্যকার খুঁটিনাটি ও আনুষঙ্গিক অবস্থা। অহং-কেন্দ্রিক সংবেগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা ও মহত্বের কামনা, আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রেরণা—এসবের স্থান এই মহত্তর চেতনায় নেই, আর এসব এমন এক অনতি-ক্রমণীয় বাধা যে তাতে অতিমানসিক রূপান্তরের ধারেও যাবার সম্ভাবনা থাকে না। মহত্তর আত্মাকে পেতে হ'লে পরিহার করা চাই নিজের ক্ষুদ্র অবর আত্মাকে। সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হবে ভগবানের সহিত মিলন; এমন কি নিজের সত্তার ও সর্বসত্তার সত্যের আবিষ্কার সেই সত্য ও ইহার মহত্তর চেতনার মধ্যে জীবন, প্রকৃতির সিদ্ধি—এই সব সেই প্রচেষ্টার স্বাভাবিক ফল মাত্র। ইহারা এই প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ সিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য বিধান বটে কিন্তু ইহারা কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের অংশ শুধু এই কারণে যে তারা এক প্রয়োজনীয় বিকাশ ও এক প্রধান ফল।

একথাও মনে রাখা চাই যে অতিমানসিক রূপান্তর দুরূহ, দূরবর্তী, এক চরম পর্যায়; মনে রাখতে হবে যে ইহা এক সুদূর দীর্ঘ পথের শেষ প্রান্ত; ইহা যে কোনো প্রাথমিক লক্ষ্য বা সতত দেখা যায় এমন কোনো গন্তব্যস্থান বা অব্যবহিত উদ্দেশ্য তা হ'তে পারে না আর তা করাও উচিত নয়। কারণ ইহাকে পাবার সম্ভাবনা আমরা শুধু দেখতে পাই অনেক দুষ্কর আত্ম-জয় ও স্বোত্ত-রণের পর, প্রকৃতির দুরূহ আত্ম-বিবর্তনের বহু দীর্ঘ ও কষ্টকর অবস্থা পার হবার শেষে। সাধকের প্রথম দরকার এক আন্তব যৌগিক চেতনা লাভ এবং বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ দৃষ্টি, স্বাভাবিক গতিবিধি, জীবনের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের স্থলে ইহার প্রতিষ্ঠা; চাই আমাদের সত্তার বর্তমান গঠনের সর্বত্রই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পরে আমাদের আরো গভীরে গিয়ে আবি-ষ্কার করা চাই আমাদের প্রচ্ছন্ন চৈত্য সত্তাকে আর দরকার তার আলোকে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আমাদের আন্তর ও বাহ্য অংশগুলিকে চৈত্যভাবাপন্ন করা এবং মন-প্রকৃতি, প্রাণ-প্রকৃতি, দেহ-প্রকৃতি ও আমাদের সকল মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়া, অবস্থা ও গতিবিধিকে পরিণত করা অন্তঃপুরুষের সচেতন

* সাধর্ম্য মুক্তি

যন্ত্রে। পরে বা সংগে সংগে আমাদের কর্তব্য হ'ল সত্তার সকল অংশকেই আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করা দিব্য আলোক, শক্তি, শুদ্ধতা, জ্ঞান, স্বাধীনতা ও প্রসারতার অবতরণের দ্বারা। ব্যক্তিগত মন, প্রাণ ও দৈহিকতার বন্ধন ভেঙে, অহংকে বিলীন ক'রে বিশ্বচেতনায় প্রবেশ করা প্রয়োজন, আর প্রয়োজন আত্মার উপলব্ধি এবং এক আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও বিশ্বভাবাপন্ন মন ও হৃদয়, প্রাণ-শক্তি ও শারীরিক চেতনা অর্জন। কেবল তখনই অতিমানসিক চেতনায় প্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দেয়, কিন্তু তখনো বাকী থাকে এক দুরূহ আরোহণ আর ইহার প্রতি পর্যায়েই এক পৃথক দুষ্কর সিদ্ধি। সত্তার দ্রুত ও একাগ্র সচেতন বিকাশই যোগ কিন্তু ইহা যত দ্রুতই হ'ক, এমন কি তটস্থ প্রকৃতিতে যা সাধন করতে বহু শতাব্দী বা সহস্র বৎসর, এমনকি শত শত জীবন লাগে, যোগ যদি তা সাধন করে মাত্র এক জীবনের মধ্যে, তা হ'লেও সকল বিবর্তনকেই চলতে হবে ক্রম অনুযায়ী, এমন কি গতির সর্বাপেক্ষা দ্রুত ও একাগ্র অবস্থাতেও ক্রমগুলি লোপ করা সম্ভব নয়, অথবা সম্ভব হয় না স্বাভাবিক ধারাকে উজানে লওয়া, শেষকে শুরুর নিকট আনা। অতিব্যস্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন মন, অতি আগ্রহী শক্তি এই রীতির কথা সহজেই ভুলে যায়; অতিমানসকে অব্যবহিত লক্ষ্য ক'রতে তারা বেগে এগিয়ে চলে আর আশা করে তাকে কাঁটা দিয়ে নীচে টেনে আনবে অনন্তের উচ্চতম সব শীর্ষস্থান থেকে। ইহা যে শুধু এক অসংগত আশা তা নয়, ইহাতে বিপদও অনেক। কারণ প্রাণের কামনা এমন সব তামস বা প্রবল প্রাণিক শক্তিকে সক্রিয় ক'রে তোলে যা তাকে অবিলম্বে তার অসম্ভব চাহিদা পূরণের আশ্বাস দেয়; ইহার সম্ভাব্য ফল হ'ল নানাবিধ আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে নিমজ্জন, তামসশক্তিবর্গের মিথ্যা ও প্রলোভনের নিকট আত্মসমর্পণ, অনন্যসাধারণ শক্তির জন্য অন্বেষণ; তাছাড়া সাধক দিব্য প্রকৃতি থেকে সরে আসতে পারে আসুরিক প্রকৃতিতে আর নিজেকে মারাত্মকভাবে স্ফীত ক'রে পরিণত হ'তে পারে এক অস্বাভাবিক, অমানুষিক ও অদিব্য অতিকায় অহং-এ। অবশ্য সত্তা ক্ষুদ্র হ'লে, প্রকৃতি দুর্বল ও অসমর্থ হ'লে এই রকম বড় দুর্দশা হয় না; তবে যে সব অবাঞ্ছিত ফল আসতে পারে তা হ'ল ভারসাম্যের হানি, মনের শিথিলতা ও অযৌক্তিক হ'য়ে পড়া অথবা প্রাণের শিথিলতা ও তার পরিণামস্বরূপ নৈতিক স্খলন অথবা প্রকৃতি বিকৃত হ'য়ে একরকম অসুস্থ অস্বাভাবিক হ'য়ে পড়তে পারে। এই যোগে আত্ম-সার্থকতা বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপায় হিসাবে কোনো প্রকার অস্বাভাবিক-তার—এমন কি কোনো উন্নত অস্বাভাবিকতারও স্থান নেই। এমন কি যুক্তি বুদ্ধির অতীত অনন্যসাধারণ অনুভূতি পেলেও স্থৈর্যের মধ্যে কোনরূপ বিক্ষোভ আসা উচিত নয়, সমগ্র চেতনাতেই--শিখর থেকে তলদেশ পর্যন্ত স্থৈর্যকে রাখা চাই অটল, অচল; যে চেতনায় অনুভূতি আসে তাতে রাখা চাই

শান্ত সাম্য, দৃষ্টির অটুট স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা, এক প্রকার ঊর্ধ্বায়িত কাণ্ডজ্ঞান, আত্ম-সমালোচনার অব্যর্থ শক্তি, সব বিষয় যথাযথ ভাবে বিচার করার ক্ষমতা, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন ও তাদের সম্বন্ধে দৃঢ় অন্তর্দৃষ্টি; সেখানে সর্বদা থাকা চাই তথ্যের উপর বিবেচনাপূর্ণ অধিকার ও এক উচ্চ আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন বাস্তববোধ। অযৌক্তিক বা অবযৌক্তিক হ'য়ে কেউ সাধারণ প্রকৃতি ছাড়িয়ে পরাপ্রকৃতিতে যেতে পারে না; সেখানে যেতে হ'লে যুক্তিশক্তির মধ্য দিয়ে মহত্তর যুক্তিশক্তির বৃহত্তর আলোকের প্রবেশ করা দরকার। এই মহত্তর যুক্তিশক্তি সাধারণ যুক্তিশক্তির মধ্যে নেমে এসে তাকে নিয়ে যায় উচ্চতর সব স্তরে, যদিও তখন তার সব সীমা ভেঙে যায়; এই যুক্তিশক্তি নষ্ট হয় না, বরং ইহা পরিবর্তিত হ'য়ে পরিণত হয় স্বকীয় সত্যকার অসীম আত্মাতে, পরা-প্রকৃতির সমন্বয়সাধক সামর্থ্যে।

আর একটি প্রমাদ সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার, আর এ প্রমাদটিও মানসিকতা সহজেই করতে চায়; এই ভুল হ'ল কোনো উচ্চতর মধ্যবর্তী চেতনাকে বা এমন কি যে কোনো রকমের অনন্যসাধারণ চেতনাকেই অতিমানস ব'লে গ্রহণ করা। অতিমানসলাভের জন্য মানুষী মনের সাধারণ গতিবৃত্তির ঊর্ধ্বে যাওয়াই যথেষ্ট নয়, কোনো মহত্তর আলোক, মহত্তর শক্তি, মহত্তর আনন্দ পাওয়া বা মানুষের সাধারণ স্তরের উপরের জ্ঞান, দৃষ্টি, কার্যক্ষম সংকল্পের সামর্থ্য বিকাশ করাও যথেষ্ট নয়। সকল আলোকই চিৎ-পুরুষের আলোক নয়, আর চিৎপুরুষের আলোক অতিমানসের আলোক হওয়ার সম্ভাবনা আরো কম; মন, প্রাণ দেহেরও নিজের নিজের বিভিন্ন আলোক আছে, এগুলি এখনো প্রচ্ছন্ন কিন্তু এগুলিরও প্রেরণা ও শিক্ষা দেবার এবং উন্নতি আনার ক্ষমতা যথেষ্ট আর তাদের কার্যসাধিকা শক্তিও প্রচুর। বিশ্ব চেতনার মধ্যে প্রবেশ করলে চেতনা ও শক্তিরও বিশাল প্রসারতা আসে। আন্তর মন, আন্তর প্রাণ আন্তর শরীর, অধিচেতনার যে কোনো স্তরে উন্মিষিত হ'লে জ্ঞান, ক্রিয়া বা অনুভূতির অস্বাভাবিক বা অনন্যসাধারণ সর্বশক্তির এমন সক্রিয়তা মুক্ত হ'তে পারে যেগুলিকে অবোধ মন সহজেই ভুল ক'রতে পারে আধ্যাত্মিক প্রকাশ, চিদাবেশ, বোধি ব'লে। উপরের দিকে উচ্চতর মানস সত্তার বৃহত্তর ক্ষেত্রের মধ্যে উন্মীলন নিম্নে এতবেশী আলোক ও শক্তি আনতে পারে যে তাতে বোধিভাবাপন্ন মন ও প্রাণ-সামর্থ্যের তীব্র ক্রিয়া সৃষ্টি হয় অথবা এই সব ক্ষেত্রে আরোহণ করার ফলে এমন এক সত্যকার কিন্তু এখনো অসম্পূর্ণ আলোক আসতে পারে যা সহজেই অন্য বিষয়ের সহিত মিশ্রিত হ'তে পারে; এই আলোকের উৎস আধ্যাত্মিক যদিও ইহা যখন নিম্নে অপরা প্রকৃতির মধ্যে আসে তখন তার সক্রিয়তায় ইহা সর্বদা আধ্যাত্মিক থাকে না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনোটিই অতিমানসিক আলোক নয়, অতিমানসিক শক্তি নয়; তাহাকে দেখা ও

ধরা কেবল তখনই সম্ভব যখন আমরা মনোময় সত্তার শিখরে পেঁছে অধি-মানসে প্রবেশ ক'রে দণ্ডায়মান হই এক আধ্যাত্মিক জীবনের বৃহত্তর পরার্ধের সীমানায়। এই যে অবিদ্যা, অচিতি, আদি তমসাপূর্ণ নির্জ্ঞান যা এক অর্ধ-বিদ্যার দিকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে, এবং জড় প্রকৃতির ভিত্তি ও আমাদের মন ও প্রাণের সকল শক্তিকে ঘিরে থাকে, তাদের মধ্যে প্রবেশ করে ও তাদের প্রবলভাবে সীমাবদ্ধ করে—এই সব সেখানে একেবারে বিলুপ্ত হয়; কেননা সেখানে এক অবিমিশ্র ও অবিকৃত ঋত-চেতনা সর্বসত্তার ধাতু, ইহার শুদ্ধ আধ্যাত্মিক বুনন। অবিদ্যার প্রবৃত্তির মধ্যে থাকাকালীন, তা সে অবিদ্যা আলোকিত বা দীপ্ত হলেও—যদি আমরা ভাবি যে আমরা এইরূপ অবস্থায় এসেছি তা হ'লে সে ভাবার অর্থ এই যে আমরা নিজেরাই উদাত্ত হই দুর্দশা-গ্রস্ত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হ'তে, নয় সত্তার বিকাশ রুদ্ধ করতে। কারণ যদি আমরা কোনো অবর অবস্থাকে অতিমানস বলে ভুল করি তাহ'লে আমাদের সেই সব বিপদের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আসে যেগুলি আমরা দেখেছি সিদ্ধি লাভের জন্য ধৃষ্ট অহং-এর অতিব্যস্ততার পরিণাম। আর যদি আমরা উচ্চতর অবস্থার কোনো একটিকে সর্বোচ্চ বলে মনে করি তাহ'লে অনেক কিছু লাভ করলেও আমাদের সত্তার বৃহত্তর ও পূর্ণতর লক্ষ্য থেকে আমরা দূরে থাকব: কারণ সিদ্ধির সদৃশ কিছু পেয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকব, পরম রূপান্তর লাভ আর হবে না। এমন কি সম্পূর্ণ আন্তরমুক্তি এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনাও সে পরম রূপান্তর নয়: কারণ সেই সিদ্ধি, সেই অবস্থা যা নিজের মধ্যে সিদ্ধ তা পেলেও তখনো আমাদের স্ফুরন্ত অংশগুলি তাদের কর্মে প্রবুদ্ধ ও আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনের অন্তর্গত থাকতে পারে এবং সেজন্য সকল মনের মতো ত্রুটিপূর্ণ হ'তে পারে এমন কি তার মহত্তর সামর্থ্য ও জ্ঞানেও আর তখনো সেগুলি থাকতে পারে সংকীর্ণকারী আদি নির্জ্ঞানের দ্বারা আংশিক বা স্থানীয় তমসাচ্ছন্নতার বা কোনো সীমাবদ্ধতার অধীন।

দ্বিতীয় খণ্ড

পূর্ণজ্ঞান যোগ

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানের বিষয়

সকল আধ্যাত্মিক অন্বেষণেরই গতি হ'ল এমন এক জ্ঞানের বিষয়ের দিকে যার প্রতি সাধারণতঃ মানুষ মনের চক্ষু ফেরায় না; ইহা এমন কেহ বা এমন কিছু যা সনাতন, অনন্ত, পরমার্থসৎ যা আমাদের জানা সব ঐহিক বিষয় বা শক্তি নয়, যদিও তিনি বা ইহা এসবের মধ্যে বা পশ্চাতে থাকতে পারেন অথবা তাদের উৎস বা স্রষ্টা হ'তে পারেন। ইহার লক্ষ্য—এমন এক জ্ঞানের অবস্থা যা দিয়ে আমরা এই সনাতন, অনন্ত ও পরমার্থসৎকে স্পর্শ করতে পারি, তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারি অথবা তাদাত্ম্যের দ্বারা তা জানতে পারি, এমন এক চেতনা যা ভাবনা ও রূপ ও বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ চেতনা থেকে ভিন্ন, এমন জ্ঞান যা আমরা যাকে জ্ঞান বলি তা নয় বরং এমন কিছু যা স্বাধিষ্ঠিত, চিরস্থায়ী ও অনন্ত। আর যেহেতু মানব মানসিক জীব সেহেতু এই অন্বেষণ আরম্ভ হ'তে পারে, অথবা এমনকি আরম্ভ হ'তে বাধ্য আমাদের জ্ঞানের সাধারণ করণগুলি থেকে, অথচ তাহ'লেও ইহাকে সেসব ছাড়িয়ে যেতে হবেই এবং অতীন্দ্রিয় ও অতিমানসিক উপায় ও শক্তি ব্যবহার করতে হবে, কারণ ইহা এমন কিছু অন্বেষণ করছে যা নিজেই অতীন্দ্রিয় ও অতিমানসিক এবং মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের নাগালের বাহিরে, যদিও মন ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ইহার এক প্রাথমিক আভাস বা প্রতিফলিত মূর্তি আসা সম্ভব।

চিরাচরিত সাধনপন্থাগুলির মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন তারা সকলেই এই বিশ্বাস বা বোধ নিয়ে চলে যে সনাতন ও পরমার্থসৎ শুধু হবে বা অন্ততঃ তার বাস হবে এক বিশ্বশূন্য অস্তিত্বের বিশ্বাতীত অবস্থা অথবা না হয় এক অসৎ। সকল বিশ্বজনীন অস্তিত্ব অথবা যা কিছু আমরা অস্তিত্ব বলি সেসব এক অজ্ঞানতার অবস্থা। এমনকি সর্বোত্তম ব্যক্তিগত সিদ্ধি, এমনকি আনন্দময় বিশ্বজনীন অবস্থাও পরম অজ্ঞানতার বেশী কিছু নয়। যাসব ব্যক্তিগত, যাসব বিশ্বজনীন, সে সবকে নির্মমভাবে বর্জন করাই পরম সত্যান্বেষুর কর্তব্য। পরম শান্ত আত্মা, আর না হয় একান্ত অসৎই একমাত্র সত্য, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একমাত্র বিষয়। যে

জ্ঞানের অবস্থা, এই ঐহিক চেতনা ছাড়া যে চেতনা আমাদের লাভ করা চাই তা হ'ল নির্বাণ, অহং-লয়, সকল মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়ার নিবৃত্তি, যে কোন কর্মই হ'ক না কেন তাদের অবসান, এক পরম দীপ্ত শান্ত অবস্থা, এক নৈর্ব্যক্তিক আত্ম-নিমগ্ন ও অনির্বচনীয় শান্ত অবস্থার শুদ্ধ আনন্দ। আর এই সাধনের উপায় হ'ল ধ্যান, অন্য সকল বিষয় বাদ দিয়ে তাতেই একাগ্রতা, বিষয় সময় সম্বন্ধে মনের সম্পূর্ণ নাশ। তবে শুধু অন্বেষণের প্রথম অবস্থায় সাধকের শুদ্ধির জন্য এবং তাকে জ্ঞানের জন্য নৈতিকভাবে ও স্বভাবের দিক থেকে যোগ্য আধার করার উদ্দেশ্যে কর্ম করা যেতে পারে। এমনকি এই কর্মকেও নিবদ্ধ রাখতে হবে হিন্দুশাস্ত্রের দ্বারা কঠোরভাবে বিহিত পূজার অনুষ্ঠান পালনে ও জীবনের নির্দিষ্ট কর্তব্যকার্যে অথবা যেমন বৌদ্ধ নিয়মানুযায়ী কর্ম করা চাই অষ্টবিধ মার্গ অনুযায়ী যাতে করুণাকর্মের পরম অনুশীলনের দ্বারা লাভ করা যায় অপরের মঙ্গলের মধ্যে কার্যতঃ আত্ম-নাশ। পরিশেষে যে কোন কঠোর ও শুদ্ধ জ্ঞানযোগে সকল কর্ম ত্যাগ করা চাই সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থার জন্য। কর্ম মোক্ষলাভের সহায়ক মাত্র, ইহাতে মোক্ষ আসে না। কর্মে প্রবৃত্ত হ'য়ে থাকলে তা চরম উন্নতির পরিপন্থী হবে এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্যপ্রাপ্তির পক্ষে অলঙ্ঘনীয় বাধা হ'তে পারে। পরম শান্ত অবস্থা ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং যারা কর্মে প্রবৃত্ত থাকে তারা তা পায় না। আর এমনকি ভক্তি, প্রেম ও পূজা অপক্ব পুরুষের পক্ষে সংযমশিক্ষা, বড়জোর ইহারা অজ্ঞানতার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। কারণ ইহাদের নিবেদন করা হয় এমন কিছুর উদ্দেশে যা আমাদের নিজেদের অপেক্ষা ভিন্ন, উচ্চতর ও মহত্তর; কিন্তু পরম জ্ঞানে এরূপ কোন বিষয় থাকতে পারে না, যেহেতু হয় একই আত্মা আছে, না হয় আদৌ কোন আত্মাই নেই এবং সেহেতু হয় পূজা করার বা প্রেম ও ভক্তি নিবেদন করার কেউ নেই, না হয়, তা নেবার কেউ নেই। তাদাত্ম্যের অথবা শূন্যতার একক চেতনার মধ্যে এমনকি মনন-ক্রিয়াও লোপ পাবে এবং নিজের উপশমের দ্বারা সমগ্র প্রকৃতির উপশম আনবে।

এই শুদ্ধ জ্ঞানযোগ ধী-শক্তি দিয়ে আসে যদিও ইহার পরিণতি হ'ল ধীশক্তির ও ইহার সব ক্রিয়া প্রণালীর অতীত অবস্থা। আমাদের মধ্যে যে চিন্তক সে আমরা প্রাতিভাসিকরূপে যা সেই বাকী সব থেকে নিজেকে পৃথক করে, হৃদয় বর্জন করে, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে সরে আসে, দেহ থেকে পৃথক হয় তবে যদি সে উপনীত হ'তে পারে সে নিজে স্বয়ং

যা তার এবং তার ক্রিয়ার অতীত কিছুর মধ্যে স্বীয় সর্বব্যতিরেকী সার্থকতায়। এই মনোভাবের পিছনে যেমন এক সত্য আছে তেমন এক অনুভবও আছে যা মনে হয় ইহাকে সমর্থন করে। এমন এক স্বরূপ-অবস্থা আছে যার প্রকৃতি হ'ল উপশম, এক পরম নীরবতা সেই পুরুষের মধ্যে যিনি নিজের আপন বিকাশ ও সব পরিবর্তনের অতীত, অক্ষর এবং সেহেতু সকল কাজকর্ম অপেক্ষা মহত্তর; বড় জোর তিনি এই সব কাজ-কর্মের এক সাক্ষী মাত্র। আর আমাদের চিত্তবৃত্তির ক্রম-পরম্পরায় মননই একপ্রকার এই আত্মার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, অন্ততঃ ইহার সর্ব-বিৎ জ্ঞাতার বিভাবের নিকটতম যে জ্ঞাতা সকল ক্রিয়া অবলোকন করেন তবে সেসব থেকে সরে থাকতে সমর্থ। হৃদয়, সংকল্প ও আমাদের অন্যান্য সব আন্তর শক্তি মূলতঃ সক্রিয়, স্বভাবতঃই তারা ক্রিয়ার দিকেই ফেরে, তাতেই তাদের সার্থকতা পায়––যদিও তাদেরও স্বতঃই একরকম উপশম পাওয়া সম্ভব তাদের বিভিন্ন কাজের তৃপ্তির পূর্ণতার দ্বারা, আর না হয় বিপরীত ধারায় অনবরত নৈরাশ্য ও অতৃপ্তিজনিত অবসাদের দ্বারা। মননও এক সক্রিয় শক্তি কিন্তু ইহার পক্ষে তার নিজের পছন্দ ও সংকল্প দ্বারাই শান্ত হওয়াই বেশী সহজ। এই যে নীরব সাক্ষী আত্মা আমাদের সকল ক্রিয়া অপেক্ষা পরতর, তাঁর প্রদীপ্ত বুদ্ধিগত বোধেই মনন আরো সহজে সন্তুষ্ট হয় এবং সেই নিশ্চল চিৎ-পুরুষকে একবার দেখা গেলে মনন তার সত্য-অন্বেষণের ব্রত উদ্‌-যাপিত হ'য়েছে মনে ক'রে নিজেই নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল হ'য়ে উঠতে উদ্যত হয়। কারণ তার যা সবচেয়ে বিশিষ্ট বৃত্তি, তাতে কর্মে আগ্রহের সহিত যোগ দিয়ে উদগ্র কর্মী হওয়া অপেক্ষা বিষয়-সমূহের নিস্পৃহ সাক্ষী, বিচারক ও পর্যবেক্ষক হওয়াতেই তার প্রবণতা বেশী এবং অতি সহজেই সে সক্ষম হয় এক আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক শান্তি এবং বিচ্ছিন্ন বিবিক্ততালাভে। এবং যেহেতু মানুষ মনোময় জীব, সেহেতু তার অজ্ঞানতাকে প্রবুদ্ধ করার পক্ষে মনন বাস্তবিকপক্ষে তার উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ সাধন না হ'লেও, ইহা অন্ততঃ তার সব চেয়ে ধ্রুব, সাধারণ ও ফল-প্রসূ সাধন। তথ্যসংগ্রহ ও বিচার, ধ্যান, স্থির চিন্তন, বিষয়ে মনের তন্ময় অভিনিবেশ অর্থাৎ শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন––এই সব বৃত্তি সম্পন্ন হওয়ায় মনন আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তির এক অপরিহার্য সহায় হিসাবে শ্রেষ্ঠ আর ইহার যে দাবী যে ইহাই যাত্রার নেতা, একমাত্র উপযোগী দিশারী অথবা অন্ততঃ মন্দিরের সোজাসুজি সবচেয়ে আন্তর দ্বার, তাতে আশ্চর্য

হবার কিছু নেই।

বস্তুতঃ মনন শুধু পথের খোঁজ দেয় ও অগ্রণী হ'য়ে চলে; ইহা পথের নির্দেশ দিতে পারে কিন্তু আদেশদানে বা কার্যসাধনে অক্ষম। যাত্রার নেতা, অভিযানের নায়ক, আমাদের যজ্ঞের প্রথম ও প্রাচীনতম পুরোহিত হ'ল সংকল্প, ক্রতু। হৃদয়ের যে অভিলাষ বা মনের যে দাবী বা অভিরুচিকে আমরা প্রায়ই সংকল্প বলি, এই সংকল্প তা নয়। ইহা আমাদের সত্তার ও সর্বসত্তার সেই অন্তরতম প্রবল চিৎ-শক্তি যা প্রায়ই প্রচ্ছন্ন থাকে—তপঃ, শক্তি, শ্রদ্ধা; ইহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ দিক্-নির্ণায়ক আর হৃদয় ও বুদ্ধি ইহার কম বেশী অন্ধ ও স্বয়ং-ক্রিয় ভৃত্য ও যন্ত্র। যে আত্মা শান্ত, নিষ্ক্রিয়, 'অলক্ষণ' (বিষয় ও ঘটনারহিত) তাহা প্রপঞ্চের অবলম্বন ও পশ্চাদ্‌ভূমি, পরমতম কিছুর নীরব প্রণালী বা সারবস্তু: ইহা স্বয়ং একমাত্র পূর্ণ অস্তিত্ব নয়, স্বয়ং পরমতম নয়। সনাতন, পরমসৎই পরমেশ্বর, সর্বপ্রভব চিৎ-পুরুষ। তিনি সকল ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে, ইহাদের কোনোটির দ্বারাই তিনি বদ্ধ নন, অথচ তিনিই সকল ক্রিয়ার উৎস, অনুমতি, উপাদান, নিমিত্ত সামর্থ্য ও অধ্যক্ষ। এই পরমাত্মা থেকেই সকল কর্মের উদ্ভব, তাঁর দ্বারা এসব নির্ধারিত; সবই তাঁর ক্রিয়া, তাঁরই নিজের চিৎ-শক্তির ধারা, পরমাত্মার বিসদৃশ কিছুর নয়, এই চিৎ-পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো সামর্থ্যের নয়। এই সব কর্মের মধ্যে প্রকট হয় চিৎ-পুরুষের চিন্ময় সংকল্প বা শক্তি, যে চিৎ-পুরুষ প্রবৃত্ত হন তাঁর সত্তাকে অনন্তভাবে ব্যক্ত করতে: এই সংকল্প বা সামর্থ্য অজ্ঞানাচ্ছন্ন নয়, বরং নিজের আত্মজ্ঞানের সহিত ও যা সব প্রকট ক'রতে ইহা প্রযুক্ত হয় সে সব সম্বন্ধে তার জ্ঞানের সহিত এক। এবং আমাদের মধ্যে এই সামর্থ্যের এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সংকল্প ও অন্তঃপুরুষ-শ্রদ্ধা, আমাদের প্রকৃতির প্রধান প্রচ্ছন্ন শক্তিই ব্যষ্টিযন্ত্র, পরমসৎ-এর সহিত ইহার যোগাযোগ আরো নিকটতর, আর একবার ইহাকে পেয়ে অধিগত ক'রতে পারলে, ইহাই হয় আমাদের ধ্রুবতর দিশারী ও প্রবুদ্ধকারক, কারণ ইহা আমাদের বিভিন্ন মনন সামর্থ্যের সব উপরভাসা ক্রিয়াসমূহ অপেক্ষা গভীরতর এবং "একম্" ও পরমার্থ-সৎ-এর আরো অন্তরঙ্গভাবে নিকট। সেই সংকল্পকে আমাদের নিজেদের মধ্যে ও বিশ্বের মধ্যে জানা এবং তার সব দিব্য পরিণতি পর্যন্ত তার অনুবর্তী হওয়া—তা সেসব পরিণতি যাই হ'ক না কেন,—তাহাই জীবনসাধকের পক্ষে, যোগসাধকের পক্ষে যেমন কর্ম, তেমন জ্ঞানের জন্য, সম্ভবতঃ হবে, নিশ্চয়ই

হ'তে হবে শ্রেষ্ঠ পন্থা, যথার্থতম পরাকাষ্ঠা।

মনন প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বা বলবত্তম অংশ নয়, এমনকি ইহা সত্যের একমাত্র বা গভীরতম নির্দেশকও নয়; সুতরাং অন্য সব বাদ দিয়ে শুধু নিজের তৃপ্তিসাধনে তৎপর হওয়া অথবা এই তৃপ্তিকেই পরমজ্ঞান প্রাপ্তির চিহ্ন বলে স্বীকার করা তার পক্ষে অনুচিত। কিছুদূর পর্যন্ত ইহা এখানে হৃদয়, প্রাণ ও অন্যান্য অঙ্গের দিশারীস্বরূপ, কিন্তু তাদের স্থলাভিষিক্ত হ'তে ইহা অক্ষম; নিজের চরম তৃপ্তি সাধন কি শুধু এই দেখাই তার কাজ নয়, তার আরো দেখা দরকার এই সব অন্যান্য অঙ্গের কিছু চরম তৃপ্তি আছে কিনা। যদি বিশ্বের মধ্যে পরম সংকল্পের উদ্দেশ্য শুধু এই হ'তে যে ইহা দৃষ্টিনাশক যন্ত্ররূপী অবরোধক মনের দ্বারা মিথ্যা ভাবনা ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এর মাধ্যমে চালিত হ'য়ে অজ্ঞানের ক্রিয়ার মধ্যে অবতরণ ক'রবে এবং সমভাবে আলোকদাতা পরিত্রাতারূপী মনের দ্বারা সঠিক মননের মাধ্যমে জ্ঞানোপশমের মধ্যে উত্তরণ ক'রবে--আর ইহার বেশী অন্য উদ্দেশ্য না থাকত--তাহলে আচ্ছিন্ন মননের এই সর্বব্যতিরেকী পন্থা সঙ্গত হ'ত। কিন্তু সম্ভবতঃ জগতে এমন এক লক্ষ্য আছে যা ইহা অপেক্ষা কম অযৌ-ক্তিক ও কম উদ্দেশ্যহীন, পরমার্থসৎ-এর দিকে এমন এক সংবেগ যা কম শুষ্ক ও কম আচ্ছিন্ন, জগতের এমন এক সত্য আছে যা আরো বৃহৎ ও জটিল, অনন্তের এমন উচ্চতা আছে যা আরো অন্তহীন সমৃদ্ধ। একথা নিশ্চিত যে প্রাচীন দর্শনের মতো আচ্ছিন্ন তর্কশাস্ত্রের ধ্রুব পরিণতি হ'ল এক অনন্তশূন্য "নাস্তি" অথবা ঐরূপ সমানই রিক্ত অনন্ত "অস্তি" কারণ আচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহার টান সর্বদাই এক আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের দিকে, আর শুধু এই দুটি আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ই সম্পূর্ণ অনপেক্ষ। কিন্তু সংকীর্ণ ও অযোগ্য মানবমনের ধৃষ্ট আচ্ছিন্ন যুক্তি অপেক্ষা যে বাস্তব প্রজ্ঞা অনন্ত অনুভূতির বর্ধিষ্ণু সমৃদ্ধির ফলস্বরূপ এবং সর্বদা গভীর হ'তে থাকে তাহাই সম্ভবতঃ দিব্য অতিমান-বীয় জ্ঞানের চাবিকাঠি। মননের মতোই হৃদয়, সংকল্প, প্রাণ এবং এমনকি দেহও দিব্য চিন্ময় পুরুষের অংশ এবং মহান্ তাৎপর্যের নির্দেশক। ইহা-দেরও এমন সব সামর্থ্য আছে যাদের দ্বারা অন্তঃপুরুষ ফিরে পেতে পারে তার সম্পূর্ণ আত্ম-সংবিৎ অথবা তাদের এমন সব সাধন আছে যাদের দ্বারা অন্তঃপুরুষ তা উপভোগ ক'রতে পারে। সম্ভবতঃ পরম সংকল্পের উদ্দেশ্য এমন এক চরম পরিণতি যাতে সমগ্র সত্তারই তার দিব্য পরিতৃপ্তিলাভ অভিপ্রেত, উচ্চ শিখরসমূহ আলোকিত করবে গভীর তলদেশ, আর পরম

অতিচেতনার স্পর্শে জড়ীয় নিশ্চেতন নিজের কাছে প্রকাশিত হবে ভগবান-রূপে।

চিরাচরিত জ্ঞানমার্গের সাধনা চলে বর্জনের পথে; শান্ত পরমাত্মা বা পরম শূন্য বা অলক্ষিত পরমার্থসৎ-এ নিমজ্জিত হবার উদ্দেশ্যে পর পর বর্জন করা হয় দেহ, প্রাণ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, হৃদয় ও এমনকি মননকেও। পূর্ণ জ্ঞানমার্গে ধরে নেওয়া হয় যে এক সর্বাঙ্গীণ আত্ম-সার্থকতা লাভই আমাদের নিয়তি আর যে একটিমাত্র বিষয় বাদ দিতে হবে তা হ'ল আমাদের নিজেদের অচেতনতা, অবিদ্যা এবং অবিদ্যার সব ফল। অহং-রূপী সত্তার অসত্যতা বাদ দাও; তাহ'লে আমাদের মধ্যে প্রকট হবে আমাদের সত্যকার সত্তা। যে প্রাণকে দেখা যায় শুধু প্রাণিক লালসা ও দৈহিক জীবনের যান্ত্রিক আবর্তনরূপে তার অসত্যতা বাদ দাও, তখন আবির্ভূত হবে পরমেশ্বরের সামর্থ্য ও অনন্তের হর্ষের মধ্যে অবস্থিত আমাদের সত্যকার প্রাণ। জড়ীয় দৃশ্য ও দ্বন্দ্বাত্মক সব ইন্দ্রিয়-সংবিৎ-এর বশীভূত ইন্দ্রিয়গ্রামের অসত্যতা দূর কর; আমাদের মধ্যে এক মহত্তর ইন্দ্রিয় আছে যা ঐসব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উন্মুক্ত হতে পারে বিষয়সমূহের মধ্যস্থিত ভগবানের কাছে এবং তাঁর কাছে উত্তরও দিতে পারে দিব্যভাবে। নানাবিধ পঙ্কিল উগ্র ভাবাবেগ ও কামনা এবং দ্বন্দ্বাত্মক ভাবাবেগযুক্ত হৃদয়ের অসত্যতা দূর কর; আমাদের মধ্যে উন্মুক্ত হতে পারে এক গভীরতর হৃদয় যাতে আছে সর্ববিষয়ের প্রতি তার দিব্য প্রেম ও পরম অনন্তের সাড়ার জন্য তার অসীম তীব্র আবেগ ও আকূতি। দূর কর মননের অসত্যতা, তার সব অপূর্ণ মানসিক রচনার, তার উদ্ধত স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির, তার সীমিত ও অন্যব্যতিরেকী একাগ্রতার অসত্যতা; পিছনে আছে বিদ্যার এক মহত্তর শক্তি যা উন্মুক্ত হ'তে পারে ভগবান ও অন্তঃপুরুষ এবং প্রকৃতি ও বিশ্বের যথার্থ সত্যের কাছে। সবাঙ্গীণ আত্ম-সার্থকতার অর্থ---হৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতির জন্য, প্রেম, হর্ষ ভক্তি ও পূজার প্রতি তার সহজ-প্রবৃত্তির জন্য পরমার্থতা, পরাকাষ্ঠা; ইন্দ্রিয়গ্রামের জন্য বিষয়-সমূহের বিভিন্ন রূপের মধ্যে দিব্য সৌন্দর্য, শুভ ও আনন্দের অন্বেষণের জন্য পরমার্থতা, পরাকাষ্ঠা; প্রাণের জন্য, কর্ম এবং দিব্য সামর্থ্য, প্রভুত্ব ও সিদ্ধির জন্য তার যে প্রচেষ্টা তার জন্য পরমার্থতা, পরাকাষ্ঠা; মননের জন্য, সত্য ও আলোক এবং দিব্য প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রতি তার বুভুক্ষার জন্য তার সীমার অতীত পরমার্থতা, পরাকাষ্ঠা। যাদের থেকে এই সব

পরিত্যাগ করা হয় তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কিছু যে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এই সব বিষয়ের পরিণাম তা নয়, বরং তাদের পরিণাম এমন কিছু পরম বস্তু যার মধ্যে তারা অবিলম্বে নিজেদের অতিক্রম ক'রে লাভ করে তাদের নিজ নিজ পরমার্থতা ও অনন্ততা, তাদের অপরিমেয় সব সৌষম্য।

চিরাচরিত জ্ঞানমার্গের পিছনে এবং ইহার এই যে বর্জন ও অপসরণের মনন প্রণালী তার সমর্থনে আছে এক প্রবল শক্তিশালী অধ্যাত্ম অনুভূতি। যারা সক্রিয় মনঃস্তরের কিছু সীমা পার হ'য়ে দিগন্তহীন আন্তর দেশে প্রবেশ ক'রেছে, তাদের সকলের কাছেই এই সাধারণ অনুভূতি গভীর, তীব্র ও সুনিশ্চিত, ইহাই মুক্তির মহান্ অনুভব, আমাদের ভিতরে এমন কিছুর চেতনা যা বিশ্ব এবং ইহার সকল রূপ, আগ্রহ, লক্ষ্য, প্রসঙ্গ ও ঘটনার পশ্চাতে ও বাহিরে অবস্থিত, এবং যা শান্ত, নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, অসীম, নিশ্চল ও মুক্ত, ইহা আমাদের ঊর্ধ্বে এমন কিছুর দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি যা অনির্বচনীয় ও "অগ্রাহ্য" এবং যার মধ্যে আমরা প্রবেশ ক'রতে সক্ষম আমাদের ব্যক্তি-সত্ত্ব লোপ ক'রে, ইহা এক সর্বব্যাপী নিত্য সাক্ষী পুরুষের সান্নিধ্য, এমন এক আনন্ত্য বা কালাতীততার বোধ যা আমাদের সকল জীবনের এক মহনীয়া অস্বীকৃতি থেকে নিম্নে আমাদের দিকে অবলোকন করে এবং যা একাই একমাত্র সদ্‌বস্তু। যে আধ্যাত্মিক মন তার নিজের সত্তার অতীতে, দৃঢ়ভাবে তাকায় তার সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বায়ন এই অনুভূতি। যে এই মুক্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়নি সে মন ও ইহার সব পাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে অক্ষম, তবে কেহই চিরদিনের মতো এই অনুভূতির মধ্যেই অবস্থান ক'রতে বাধ্য নয়। যদিও এই অনুভূতি বিশাল তবু ইহা মনের নিজের ও তার সকল ভাবনার অতীত কিছু সম্বন্ধে শুধু মনের এক অতি প্রবল অনুভূতি। ইহা এক পরম অসদর্থক অনুভূতি কিন্তু ইহারও উজানে আছে এক অনন্ত চেতনার, এক অসীম জ্ঞানের, এক সদর্থক একান্ত উপস্থিতির বিপুল আলোক।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয় হ'ল পরমসৎ, ভগবান অনন্ত, পরমার্থসৎ। এই পরমসৎ-এর সম্বন্ধ আছে আমাদের ব্যষ্টি সত্তার সহিত, এবং বিশ্বেরও সহিত তাঁর সম্বন্ধ আছে আর অন্তঃপুরুষ ও বিশ্ব--উভয়েরই অতীত তিনি। বিশ্ব বা জীব--কেহই যথার্থতঃ তা নয় যা তারা প্রতীয়মান হয় কারণ এদের সম্বন্ধে আমাদের মন ও আমাদের সব ইন্দ্রিয় যে বিবরণ দেয়, সে বিবরণ--যতদিন মন ও ইন্দ্রিয় পরতর অতিমানসিক ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের

শক্তির দ্বারা প্রবুদ্ধ না হয় ততদিন---এক মিথ্যা বিবরণ, এক অপূর্ণ রচনা এবং এক ক্ষীণ ও প্রমাদপূর্ণ সংকেত। অথচ তবু বিশ্ব ও জীব যা প্রতীয়মান হয় তা তারা বস্তুতঃ যা তার এক সংকেত, এমন এক সংকেত যা নিজেকে ছাড়িয়ে নির্দেশ করে তার পশ্চাতে অবস্থিত সদ্‌বস্তুকে। আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় ইহার যে অর্থ আমাদের দেয় তা সংশোধন করেই সত্য উদিত হয়; ইহার প্রথম পর্যায় আসে উচ্চতর বুদ্ধির ক্রিয়ার দ্বারা যাতে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়মানসের ও সীমিত স্থূল বুদ্ধির সিদ্ধান্তগুলি যথা-সম্ভব আলোকিত ও সংশোধিত হয়; ইহাই সকল মানবীয় জ্ঞান ও প্রাকৃত-বিজ্ঞানের পদ্ধতি। কিন্তু ইহাকে ছাড়িয়ে এমন এক জ্ঞান, এক ঋতচেতনা আছে, যা আমাদের বুদ্ধিশক্তির অতীত এবং আমাদের নিয়ে যায় সত্যকার আলোকের মধ্যে; এই আলোকেরই এক বক্রীভূত রশ্মি আমাদের বুদ্ধি-শক্তি। সেখানে সাত্ত্বিকী বুদ্ধির আচ্ছিন্ন সংজ্ঞাগুলি ও মনের সব রচনা অন্তর্হিত হয়, অথবা পরিণত হয় অন্তঃপুরুষের বাস্তব দৃষ্টিতে এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিপুল যথার্থতায়। এই জ্ঞান অনপেক্ষ সনাতনের দিকে ফিরে অন্তঃপুরুষ ও বিশ্বের দৃষ্টি হারাতে পারে; কিন্তু ইহা ঐ সৃষ্টিকে দেখতেও পারে সনাতন থেকে। যখন তা-ই করা হয়, তখন আমরা দেখি যে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের অবিদ্যা ও মানবজীবনের আপাত সব বিফলতা চিন্ময় পুরুষের নিরর্থক আমোদ ভ্রমণ নয়, কোনো অলস ভ্রম নয়। তারা এখানে পরিকল্পিত হয়েছিল অনন্ত থেকে আসা পরম পুরুষের আত্ম-অভিব্যক্তির বন্ধুর ভূমি হিসাবে, বিশ্বের সংজ্ঞায় তার আত্ম-বিকাশ ও আত্ম-অধিকারের জড়ীয় ভিত্তি হিসাবে। একথা সত্য যে নিজেদের মধ্যে তাদের এবং এখানে যা সব আছে সেসবেরও কোনো তাৎপর্য নেই, আর তাদের জন্য পৃথক তাৎপর্য রচনা করার অর্থ ভ্রান্তির মধ্যে, মায়ার মধ্যে বাস করা; কিন্তু পরমসৎ-এর মধ্যে তাদের এক পরম তাৎপর্য আছে, পরমার্থসৎ-এর মধ্যে তাদের এক একান্ত সামর্থ্য আছে এবং ইহাই নির্দিষ্ট করে তাদের বর্তমান আপেক্ষিক অর্থ, আর এদের যুক্ত করে সেই পরমসত্যের সহিত। এই যে অনুভূতি সকল কিছুকে যুক্ত করে, ইহাই গভীরতম অখণ্ড ও সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ আত্ম-জ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞানের ভিত্তি।

জীবের সহিত সম্বন্ধে, পরমসৎ আমাদের আপন সত্যকার ও পরতম আত্মা, আমরা চরম অবস্থায় স্বরূপতঃ যা তা-ই পরমসৎ, আমাদের ব্যক্ত

প্রকৃতিতে আমরা তাঁরই অন্তর্ভূক্ত। যেমন চিরাচরিত জ্ঞানমার্গ সকল ভ্রান্তিজনক প্রাতিভাসিক বর্জন করে, তেমন যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমাদের অন্তঃস্থ প্রকৃত আত্মাকে পেতে প্রবৃত্ত হয় তারও বর্জন করা চাই সকল ভ্রান্তিজনক প্রাতিভাসিক। ইহার আবিষ্কার করা চাই যে দেহ আমাদের আত্মা নয়, আমাদের জীবনের প্রতিষ্ঠা নয়; ইহা অনন্তের এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। যে অনুভূতিতে জড়ই জগতের একমাত্র প্রতিষ্ঠা, স্থূল মস্তিষ্ক ও সব স্নায়ু, ও কোষ ও পরমাণু আমাদের মধ্যে সকল বিষয়ের একমাত্র সত্য, সেই যে অনুভূতি জড়বাদের গুরুভার অনুপযুক্ত ভিত্তি তা ভ্রমপূর্ণ, ইহা এক অর্ধ-দৃষ্টি যাকে নেওয়া হয় সমগ্র দৃষ্টি বোলে, বিষয়সমূহের অন্ধকারময় তলদেশ বা ছায়া যাকে ভুল ক'রে মনে হয় জ্যোতির্ময় সারবস্তু বোলে, শূন্যের কার্যকরী আকার পূর্ণাঙ্কের বদলে। জড়বাদীর ভাবনায় সৃষ্টিকে ভুল করা হয় সৃজনশীল সামর্থ্য বোলে, প্রকাশের উপায়কে ভুল করা হয় যে ইহাই তৎস্বরূপ যিনি প্রকাশিত হচ্ছেন ও প্রকাশ করছেন। এই যে জড় ও আমাদের স্থূল মস্তিষ্ক ও স্নায়ুজাল ও দেহ—এসব এমন প্রাণিক শক্তির এক ক্রিয়ার ক্ষেত্র ও ভিত্তি যার কাজ হ'ল আত্মাকে যুক্ত করা ইহার সব কাজের রূপের সঙ্গে এবং যা তাদের রক্ষা করে তার প্রত্যক্ষ স্ফুরত্তা দ্বারা। জড়ীয় সব গতিবৃত্তি এক বাহ্য সংকেত, যার দ্বারা অন্তঃপুরুষ অনন্তের কতকগুলি সত্য সম্বন্ধে তার সব বোধকে প্রকাশ করে এবং সে সবকে কার্যকরী করে ধাতুর সংজ্ঞায়। এইসব বিষয় এক ভাষা, সংকেত, চিত্রলিপি, প্রতীকপদ্ধতি, যেসব বিষয়ের কথা তারা জানায় তাদের গভীরতম সত্যতম অর্থ তারা নিজেরা নয়।

সেইরকম প্রাণতত্ত্বও অর্থাৎ প্রাণ-শক্তি, মস্তিষ্কে, স্নায়ুজালে ও দেহে সক্রিয় শক্তিও আমাদের আত্মা নয়, প্রাণ অনন্তের এক সামর্থ্য কিন্তু সমগ্র সামর্থ্য নয়। এক অনুভূতি আছে যাতে প্রাণ-শক্তিই জড়কে করণরূপে ব্যবহার করে এবং সকল বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, উৎস ও সত্যকার সারাংশ ইহা প্রাণাত্মবাদের কম্পমান অস্থির ভিত্তি, কিন্তু এই অনুভূতিও ভ্রমপূর্ণ, এক অর্ধ-দৃষ্টি যাকে নেওয়া হয় সমগ্র দৃষ্টি ব'লে ইহা নিকটস্থ তীরের উপর জোয়ারের প্লাবন ব'লে ভুল করা হয় সমগ্র মহাসাগর ও তার বারিরাশি ব'লে। প্রাণবাদীর ভাবনায় এক শক্তিশালী কিন্তু বাহ্য কিছুকে নেওয়া হয় সার হিসাবে। প্রাণ-শক্তি এমন এক চেতনার স্ফুরত্তভাব যা ইহাকে অতিক্রম করে যায়। ঐ চেতনাকে অনুভব করা হয়, ইহা কার্য

করে কিন্তু যতক্ষণ না আমরা উপনীত হই ইহার উচ্চতর সংজ্ঞায় অর্থাৎ মনে যা বর্তমানে আমাদের সর্বোচ্চ অবস্থা ততক্ষণ ইহা আমাদের বুদ্ধিতে সত্য হিসাবে সিদ্ধ হয় না। এখানে মনে হয় মন যেন প্রাণের এক সৃষ্টি কিন্তু বস্তুতঃ ইহা প্রাণেরই এবং ইহার পশ্চাতে যা আছে তার এক উত্তর তাৎপর্য কিন্তু অন্তিম তাৎপর্য নয় এবং তার রহস্যের এক আরো সচেতন রূপায়ণ; মন প্রাণের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং ইহা এমন কিছুর বহিঃপ্রকাশ যার আরো কম দীপ্ত বহিঃপ্রকাশ প্রাণ স্বয়ং।

কিন্তু মনও অর্থাৎ আমাদের মানসিকতা, আমাদের চিন্তার ও বোধের অংশও আমাদের আত্মা নয়, ইহা 'তৎ' নয়, আদিও নয়, অন্তও নয়, ইহা অনন্ত থেকে নিক্ষিপ্ত এক অর্ধ-আলোক। যে অনুভূতিতে মন সকল রূপ ও বিষয়ের স্রষ্টা এবং এইসব রূপ ও বিষয় শুধু মনেই অবস্থিত, যা বিজ্ঞানবাদের শীর্ণ সূক্ষ্মভিত্তি তা-ও এক ভ্রম, এক অর্ধ-দৃষ্টি যাকে সমগ্র বলে নেওয়া হয়, এক ম্লান বক্রীভূত আলো যাকে ভাবা হয় সূর্যের জ্বলন্ত দেহ ও তার জ্যোতি বোলে। এই বিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টিও সত্তার স্বরূপে উপনীত হয় না, এমনকি শুধু প্রকৃতির এক অবর ক্রিয়া ছাড়া তাকে স্পর্শও করে না। মন এমন এক চিন্ময় সত্তার অস্পষ্ট বাহ্য উপচ্ছায়া যা মানসিকতার মধ্যে আটক থাকে না, তাকে ছাড়িয়ে যায়। যে চিরাচরিত জ্ঞানমার্গের পদ্ধতিতে এইসব কিছু বর্জন করা হয় তাতে এমন এক শুদ্ধ চিন্ময় সত্তার ভাবনা ও উপলব্ধি আসে যা আত্ম-বিৎ, আত্ম-আনন্দময়, মন ও প্রাণ ও দেহের অনপেক্ষ, আর ইহার চরম সদর্থক উপলব্ধিতে ইহা আত্মা, আমাদের অস্তিত্বের মূল ও স্বরূপপ্রকৃতি। অবশেষে এখানেই পাওয়া যায় এমন কিছু যা কেন্দ্রীয়ভাবে সত্য কিন্তু এই সত্যে পৌছবার তাড়ায় এই জ্ঞান ধরে নেয় যে চিন্তাশীল মন ও সর্বোত্তমের মাঝ-খানে কিছু নেই, "বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ" আর সমাধিতে তার চোখ বুজে মাঝখানে যাসব থাকে সেগুলির মধ্য দিয়ে ছুটে চলে যেতে চেষ্টা করে এমনকি তাকায়ও না পরম চিৎপুরুষের এইসব মহান্ জ্যোতির্ময় রাজ্যের দিকে। হয়ত ইহা তার লক্ষ্যে পৌছায় কিন্তু তা শুধু অনন্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য। অথবা যদি ইহা জেগে থাকে, সে জাগা পরমসৎ-এর সর্বোত্তম অনুভূতির মধ্যে যার মধ্যে আত্ম-বিনাশী মন প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু পরাৎপরের মধ্যে নয়। মন আত্মাকে জানতে পারে শুধু এক মানসিক-ভাবাপন্ন আধ্যাত্মিক শীর্ণতার মধ্যে, জানে শুধু মনে প্রতিফলিত সচ্চিদা-

নন্দকে। সর্বোত্তম সত্য, অখণ্ড পূর্ণ আত্মজ্ঞান পাবার উপায় এইভাবে নিজেকে অন্ধকারে পরমার্থসৎ-এর মধ্যে লাফ দেওয়া নয়, তা পেতে হ'লে ধৈর্যের সহিত যেতে হবে মন ছাড়িয়ে ঋতচেতনার মধ্যে যেখানে অনন্তকে জানা যাবে, অনুভব করা যাবে, দেখা যাবে, উপলব্ধি করা যাবে তার অফুরন্ত ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণতায়। আর সেখানে আমরা আবিষ্কার করি যে আমরা যে আত্মা তা শুধু এক স্থিতিক শীর্ণ শূন্য আত্মা নয়, ইহা এক মহান্ স্ফুরন্ত চিৎ-পুরুষও যা ব্যষ্টিগত, বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত। ঐ আত্মা ও চিৎ-পুরুষকে মনের আচ্ছিন্ন সামান্য ভাবনার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; ঋষি ও মরমীয়াদের সকল আন্তর-উচ্ছ্বসিত বর্ণনাও তার ভাণ্ডার ও মহিমা শেষ করতে অক্ষম।

বিশ্বের সহিত সম্বন্ধে পরমসৎ,—ব্রহ্ম, একমাত্র সদ্‌বস্তু যা শুধু যে বিশ্বের সকল ভাবনা ও শক্তি ও রূপের আধ্যাত্মিক, জড়ীয় ও চিন্ময় ধাতু তা নয় বরং তাদের মূল, আশ্রয় ও অধিকারী বিরাট পুরুষ ও বিশ্বাতীত পুরুষ। বিশ্বকে আমরা যেসব চরম সংজ্ঞায় আনতে পারি যেমন শক্তি ও জড়, নাম ও রূপ, পুরুষ ও প্রকৃতি সেসব তবুও বিশ্ব বস্তুতঃ স্বরূপে বা প্রকৃতিতে যা তা পুরোপুরি নয়। যেমন আমরা যা কিছু সে সবই এমন এক পরমাত্মার খেলা ও রূপ, মানসিক, চৈত্য, প্রাণিক ও শারীরিক বহিঃ-প্রকাশ যা মন ও প্রাণ ও শরীরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তেমন বিশ্বও এমন এক পরম সন্মাত্রের খেলা ও রূপ, জাগতিক পুরুষ-প্রকাশ ও প্রকৃতি-প্রকাশ যা শক্তি ও জড়ের অনপেক্ষ, ভাবনা ও নাম ও রূপের অনপেক্ষ, পুরুষ ও প্রকৃতির মৌলিক পার্থক্যেরও অনপেক্ষ। আমাদের পরমাত্মা এবং এই পরমসন্মাত্র যা এই বিশ্ব হয়েছে—ইহারা একই চিৎ-পুরুষ, একই আত্মা ও একই সত্তা। জীব প্রকৃতিতে বিশ্বাত্মক পুরুষের এক প্রকাশ, আর চিৎ-পুরুষে সে অতি-স্থিতির এক পুরঃক্ষেপ। কারণ যদি সে তার আত্মার সন্ধান পায় সে এও দেখে যে তার নিজের সত্যকার আত্মা এই প্রাকৃত ব্যক্তিসত্ত্ব নয়, এই সৃষ্ট ব্যষ্টিত্ব নয়, বরং ইহা অপর সকলের ও প্রকৃতির সহিত তার সম্বন্ধে এক বিশ্বজনীন সত্তা, আবার তার ঊর্ধ্বগামী সংজ্ঞায় পরম সর্বাতিরিক্ত চিৎ-পুরুষের অংশ বা জীবন্ত অগ্রভাগ।

এই পরম সন্মাত্র জীব বা বিশ্বের অনপেক্ষ। সুতরাং এক অধ্যাত্ম-জ্ঞানে পরমচিৎপুরুষের এই দুই শক্তিকে অতিক্রম বা এমনকি বাদ দিয়ে এমন কিছুর ভাবনায় উপনীত হওয়া যায় যা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাতীত,

অব্যপদেশ্য, ও মনের পক্ষে অজ্ঞেয়, শুদ্ধ পরমার্থসৎ। চিরাচরিত জ্ঞানমার্গ জীব ও বিশ্বকে বাদ দেয়। ইহা যে পরমার্থসৎ অন্বেষণ করে তা অলক্ষণ, অনির্দেশ্য, অসঙ্গ, ইহা নয়, ইহা নয়, নেতি নেতি। আবার তবু আমরা ইহার সম্বন্ধে বলতে পারি যে ইহা এক, ইহা অনন্ত, ইহা অনির্বচনীয় আনন্দ, চিৎ, সৎ। যদিও মনের কাছে অজ্ঞেয় তবু আমরা আমাদের ব্যষ্টিসত্তা এবং বিশ্বের সব নাম ও রূপের মধ্য দিয়ে পরমাত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মের উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হ'তে পারি, আর এই আত্মার উপলব্ধির দ্বারা আমরা এই শুদ্ধ পরমার্থসৎ-এর একপ্রকার উপলব্ধি পাই; আমাদের প্রকৃত আত্মা আমাদের চেতনার মধ্যে এই পরমার্থসৎ-এর স্বরূপ। যদি মানবমন নিজের কাছে এক বিশ্বাতীত ও নিরালম্ব পরমার্থসৎ-এর আদৌ কোনো ভাবনা গঠন করতে চায় তাহ'লে সে বাধ্য হয় এই সব কৌশল অবলম্বন করতে। তার নিজের সব পরিচ্ছিন্নতা ও সীমিত অনুভূতি থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে এই নেতিবাচক পদ্ধতি তার পক্ষে অপরিহার্য; এক অস্পষ্ট অলক্ষিতের মধ্য দিয়েই সে বাধ্য হ'য়ে পলায়ন করে অনন্তের মধ্যে। কেননা তার বাস বিভিন্ন রচনা ও প্রতিরূপের বদ্ধ কারাগারের মধ্যে; এসব তার ক্রিয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় কিন্তু জড় বা প্রাণ বা মন বা চিৎ-পুরুষ কারুরই স্বপ্রতিষ্ঠ সত্য তারা নয়। কিন্তু যদি আমরা একবার সমর্থ হই মনের সীমান্তের ক্ষীণ আলোক ছাড়িয়ে অতিমানসিক জ্ঞানের বৃহৎ লোকে প্রবেশ করতে, তাহ'লে এই সব কৌশল আর অপরিহার্য থাকে না। পরম অনন্ত সম্বন্ধে অতিমানসের সম্পূর্ণ অন্য এক সদর্থক ও প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত অনুভূতি আছে। পরমার্থসৎ ব্যক্তিসত্ত্বের অতীত, নৈর্ব্যক্তিকতার অতীত, আবার তবু ইহা একসাথে নৈর্ব্যক্তিক ও পরমব্যক্তি ও সকল ব্যক্তি। পরমার্থসৎ ঐক্য ও বহুত্বের পার্থক্যের অতীত, আবার তবু ইহাই এক ও সকল বিশ্বসমূহে অগণিত বহু। ইহা গুণের সকল সীমাবদ্ধতার অতীত, আবার তবু ইহা নির্গুণ শূন্য দ্বারাও সীমাবদ্ধ নয়, সকল অনন্ত-গুণও ইহা। ইহাই ব্যষ্টির অন্তঃপুরুষ ও সকল অন্তঃপুরুষ এবং এসবের অতিরিক্ত; ইহা নীরূপ ব্রহ্ম ও বিশ্ব। ইহাই বিরাট পুরুষ ও বিশ্বাতীত চিৎ-পুরুষ, পরম প্রভু, পরম আত্মা, পরম পুরুষ ও পরমাশক্তি, নিত্য অজাত যিনি অন্তহীন ভাবে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই অনন্ত যিনি অগণিত-ভাবে সান্ত, বহুময় এক, জটিলতাময় সরল, বহুমুখী একমাত্র, অনির্বচনীয় নীরবতার বাক্, নৈর্ব্যক্তিক সর্বব্যাপী পুরুষ, পরম রহস্য যা নিজের চিৎ-

পুরুষের কাছে উত্তম চেতনায় সুস্পষ্ট অথচ ক্ষীণতর চেতনার কাছে নিজের অতিরিক্ত আলোর দ্বারা আবৃত ও চিরদিনের জন্য অভেদ্য। পরিমাণাত্মক মনের কাছে এইসব এমন পরস্পরবিরোধী যে তাদের মধ্যে সমন্বয় অসম্ভব, কিন্তু ঋতচেতনার স্থির দর্শন ও অনুভূতিতে তারা এত সহজ ও অনিবার্য-রূপে পরস্পরের আন্তর প্রকৃতি যে তাদের বিপরীত ব'লে ভাবাও অকল্পনীয় ও অসঙ্গত। পরিমাপক ও বিভেদকারী বুদ্ধিশক্তির দ্বারা গঠিত সব প্রাচীর বিলুপ্ত হয়েছে, আর সত্য প্রকাশিত হয় তার সরলতায় ও সৌন্দর্যে আর সব কিছুকে পরিণত করে তার সামঞ্জস্য, ঐক্য ও আলোকের সংজ্ঞায়। বিভিন্ন পরিমাণ ও পার্থক্য থাকে কিন্তু তা থাকে ব্যবহারের উপযোগী সংকেত হিসাবে, আত্ম-ভোলা চিৎ-পুরুষের বিভেদকারী কারাগার হিসাবে নয়।

যে চেতনায় বিশ্বাতীত পরমার্থসৎকে জানা যায় আর জানা যায় যে জীব ও বিশ্ব তাঁরই পরিণাম—সেই চেতনাই সবশেষ শাশ্বত জ্ঞান। এই জ্ঞানকে আমাদের মন নানাভাবে ব্যবহার করতে পারে, ইহার উপর বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী দর্শনশাস্ত্র রচনা করা সম্ভব, জ্ঞানের বিভিন্ন দিক সংকুচিত বা পরিবর্তিত ক'রতে পারে বা কোনোটির উপর বেশী গুরুত্ব ও কোনোটির উপর কম গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব, তা থেকে সত্য বা মিথ্যা সিদ্ধান্ত করাও সম্ভব; কিন্তু আমাদের বুদ্ধিগত সব পার্থক্য ও অপূর্ণ বিবরণ সত্ত্বেও এই চরম তথ্য সমানই থাকে যে মনন ও অনুভূতিকে তাদের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হ'লে তাদের পরিণতি হয় এই জ্ঞানেই। এই সনাতন সদ্‌বস্তু, এই পরমাত্মা, এই ব্রহ্ম, এই বিশ্বাতীত যিনি সকলের ঊর্ধ্বে ও সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত, জীবের মধ্যে ব্যক্ত অথচ গূঢ়, বিশ্বের মধ্যে ব্যক্ত তবে ছদ্মবেশে—তিনি ছাড়া আর কোনো বিষয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগের কাম্য হ'তে পারে না।

জ্ঞানমার্গের চূড়ান্ত পরিণতিতে যে প্রপঞ্চের লয় অনিবার্য তা নয়। কারণ যে পরমসৎ-এর অঙ্গীভূত আমরা হই, যে পরমার্থসৎ ও বিশ্বাতীতের মধ্যে আমরা প্রবেশ করি, তার সর্বদাই সেই সম্পূর্ণ ও চরম চেতনা বর্তমান থাকে যা আমরা পেতে চাই, আর তবু ইহার দ্বারাই তিনি তাঁর এই জগৎ-লীলাকে ধারণ করেন। আমরা এই বিশ্বাস ক'রতেও বাধ্য নই যে জ্ঞান-লাভের দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য বা সিদ্ধি পূর্ণ হওয়ায় ইহার পর এখানে আমাদের জন্য আর কিছু থাকে না। কেননা এই জ্ঞানলাভজনিত মুক্তি

ও অপরিমেয় নীরবতা ও অচঞ্চলতার সহিত আমরা প্রথম যা লাভ করি তা হ'ল শুধু জীবের দ্বারা তার চিন্ময় সত্তার স্বরূপের মধ্যে আত্মোপলব্ধি; কিন্তু তখনো এই নীরবতার দ্বারা নিরাকৃত না হ'য়ে, মুক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের সহিত এক হয়ে সেই প্রতিষ্ঠার উপর থাকবে ব্রহ্মের আত্ম-পূর্ণতা সাধনের অনন্তবিধ প্রবৃত্তি, জীবের মধ্যে এবং তার উপস্থিতি, দৃষ্টান্ত ও ক্রিয়ার দ্বারা অপর সকলের ও সারা বিশ্বের মধ্যে ব্রহ্মের স্ফুরন্ত দিব্য অভিব্যক্তি; আর ইহাই সেই কর্ম যা সাধনের জন্য মহাপুরুষগণ থাকেন। যতদিন আমরা অহমাত্মক চেতনার মধ্যে, প্রদীপ-আলোকিত মানস-অন্ধকারের মধ্যে, বন্ধন-অবস্থার মধ্যে থাকি, ততদিন আমাদের স্ফুরন্ত আত্ম-চরিতার্থতা সাধন সম্ভব হয় না। আমাদের বর্তমান সীমিত চেতনা শুধু এক প্রস্তুতির ক্ষেত্র হ'তে পারে, কিন্তু কিছু সিদ্ধ করার ক্ষমতা ইহার নেই; কারণ ইহা যা সব ব্যক্ত করে সে সব সম্পূর্ণভাবে অহং-চালিত অজ্ঞান ও প্রমাদের দ্বারা কলুষিত। অভিব্যক্তির মধ্যে ব্রহ্মের প্রকৃত ও দিব্য আত্ম-চরিতার্থতা-সাধনের একমাত্র উপায় হ'ল ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করা ব্রহ্মচেতনার উপর; সুতরাং সেজন্য দরকার মুক্ত পুরুষের দ্বারা, জীবন্মুক্তের দ্বারা জীবন স্বীকার যার মাধ্যমে তা সম্পন্ন হ'বে।

ইহাই পূর্ণ জ্ঞান কারণ আমরা জানি যে সর্বত্র এবং সকল অবস্থাতে যে চোখ দেখে তার কাছে সব কিছুই "একম্", দিব্য অনুভূতিতে সকল কিছুই ভগবানের এক অখণ্ড পিণ্ড। শুধু আমাদের মনই চেষ্টা করে তার নিজের মনন ও আস্পৃহার সাময়িক সুবিধার জন্য শাশ্বত একত্বের এক দিক ও অন্য দিকের মধ্যে কঠোর বিভাজনের কৃত্রিম রেখা টানতে এবং তাদের মধ্যে চিরন্তন অসঙ্গতির এক মিথ্যা রচনা ক'রতে। বদ্ধ জীব ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনের মতোই মুক্ত জ্ঞাতাও জগতের মধ্যে থাকেন ও কাজ করেন কিন্তু পার্থক্য এই যে তিনি থাকেন সর্বকর্মে ব্যাপৃত হ'য়ে, "সর্বকৃৎ", তবে প্রকৃত জ্ঞান ও মহত্তর সচেতন সামর্থ্যের সহিত। আর এইভাবে কাজ ক'রে তিনি যেমন পরম ঐক্য হারান না, তেমন বিচ্যুত হন না পরম চেতনা ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান থেকে। কারণ পরম সৎ এখন আমাদের কাছে যতই প্রচ্ছন্ন থাকুন না কেন তিনি এখানে জগতের মধ্যে তেমন সমানই আছেন যেমন তিনি থাকতে পারেন একান্ত চরম অনির্বচনীয় আত্ম-লয়ের মধ্যে, সর্বাপেক্ষা অসহিষ্ণু নির্বাণের মধ্যে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্ঞানের পাদ

দেখা গেল যে পরমাত্মা, ভগবান, পরম সদ্‌বস্তু, 'সর্বং', বিশ্বাতীত-- এই সকল বিভাবের মধ্যে "একম্‌"--একই যৌগিক জ্ঞানের বিষয়। সাধারণ বিষয়সমূহ, প্রাণ ও জড়ের বাহ্য সব রূপ, আমাদের সব মনন ও ক্রিয়ার মনস্তত্ত্ব, প্রাতিভাসিক জগতের বিভিন্ন শক্তির বোধ--এইসব এই জ্ঞানের অঙ্গ হ'তে পারে, তবে শুধু পরম একের অভিব্যক্তির অংশ হিসাবে। একথা সহজেই বোঝা যায় যে যোগসাধনার লক্ষ্য যে জ্ঞান তা জ্ঞান ব'লতে লোকে সাধারণতঃ যা বোঝে তা থেকে ভিন্ন। যা কেননা সাধারণতঃ আমরা জ্ঞান ব'লতে বুঝি প্রাণ, মন ও জড়ের বিভিন্ন তথ্যের এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করে যেসব নিয়ম তাদের এক বুদ্ধিগত বিবেচনা। এই জ্ঞানের ভিত্তি হ'ল আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়বোধ থেকে যুক্তি এবং এই জ্ঞানার্জনের চেষ্টার উদ্দেশ্য--কিছুটা বুদ্ধির শুদ্ধ তৃপ্তি এবং কিছুটা সেই ব্যবহারিক কুশলতা ও অধিকতর শক্তি যা এই জ্ঞান থেকে পাওয়া যায় আমাদের ও অন্য সকলের জীবনযাত্রা নির্বাহ ক'রতে, মানুষের স্বার্থে প্রকৃতির প্রকট বা গূঢ় শক্তিসমূহকে কাজে লাগাতে আর আমাদের মানবভাইদের সাহায্য বা ক্ষতি করতে, উদ্ধার ও উন্নত করতে অথবা উৎপীড়ন ও ধ্বংস করতে। বস্তুতঃ যোগ সমগ্র জীবনের সমব্যাপক এবং এই সকল বিষয় ও উদ্দেশ্যই তার অন্তর্ভূক্ত হ'তে পারে। এমনকি এক যোগ[১] আছে যা ব্যবহার করা যায় যেমন আত্ম-জয়ের জন্য তেমন আত্ম-প্রশ্রয়ের জন্য, যেমন অপরের মোক্ষের জন্য তেমন তাদের অনিষ্ট-সাধনের জন্য। কিন্তু "সমগ্রজীবনের" অর্থ শুধু যে মানবজাতি এখন যে জীবন যাপন করে সেই জীবন তা নয়, এমনকি প্রধানতঃও সে জীবন

১ যোগের দ্বারা শক্তির বিকাশ হয়, এমনকি আমরা তা না চাইলেও বা তা সচেতনভাবে আমাদের লক্ষ্য না হ'লেও, শক্তির বিকাশ যোগের এক ফল; আর শক্তি এমন এক অস্ত্র যা দুদিকেই ধারালো, ইহাকে যেমন সাহায্য ও উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করা যায়, তেমন অনিষ্ট বা ধ্বংস সাধনেও ব্যবহার করা যায়। ইহাও মনে রাখা ভাল যে সকল ধ্বংসই অশুভ নয়।

নয়। বরং ইহা কল্পনা করে ও মনে করে যে ইহার একমাত্র আসল উদ্দেশ্য হ'ল এক পরতর প্রকৃতই সচেতন জীবন যা আমাদের অর্ধচেতন মানবজাতি এখনো পায়নি আর যা ইহা পেতে পারে শুধু এমন এক আধ্যাত্মিক উৎক্রান্তির দ্বারা যাতে নিজেকে অতিক্রম করা যায়। এই মহত্তর চেতনা ও পরতর জীবনই যোগসাধনার বিশিষ্ট ও উপযুক্ত সাধ্য।

এই মহত্তর চেতনা, এই পরতর জীবন এমন কোনো প্রবুদ্ধ বা প্রদীপ্ত মানসিকতা নয় যা এক মহত্তর স্ফুরন্তশক্তির উপর নির্ভরশীল বা যার উপর শুদ্ধতর নৈতিক জীবন ও চরিত্র নির্ভরশীল। সাধারণ মানবচেতনা অপেক্ষা তাদের যে শ্রেষ্ঠতা তা মাত্রায় নয়, তা হ'ল প্রকারে ও সারে। আমাদের সত্তার শুধু যে উপরভাসা অংশের বা তটস্থ ধারার পরিবর্তন হয় তা নয়, ইহার সমগ্র ভিত্তি ও স্ফুরন্ত নীতিই পরিবর্তিত হয়। যৌগিক জ্ঞানের প্রয়াস এমন এক মানসোত্তর গূঢ় চেতনার মধ্যে প্রবেশ করা যা এখানে শুধু নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত সর্বসত্তার ভিত্তিতে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে। কারণ একমাত্র এই চেতনার জ্ঞানই সত্য এবং শুধু তাকে পেলেই আমরা ভগবানকে পেতে পারি আর সঠিক ভাবে জানতে পারি জগতকে আর তার আসল প্রকৃতি ও সব গূঢ় শক্তিকে। এই যে সমগ্র জগৎ আমরা দেখতে পাই বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানতে পারি এবং ইহার মধ্যে সে সবও যা আমরা দেখতে পাই না--এসব এক মানসোত্তর ও অতীন্দ্রিয় কিছুর শুধু প্রাতিভাসিক বহিঃপ্রকাশ। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং তাদের দেওয়া সব তথ্য থেকে যুক্তিবুদ্ধি যে জ্ঞান আমাদের দেয় তা প্রকৃত জ্ঞান নয়; ইহা বিভিন্ন বাহ্যরূপের প্রাকৃত বিজ্ঞান। আবার এমনকি বাহ্যরূপগুলিরও সঠিক জ্ঞান সম্ভব হয় না যতক্ষণ না আমরা প্রথম জানি সদ্‌বস্তুকে যার প্রতিমূর্তি তারা। এই সদ্‌বস্তুই তাদের আত্মা এবং তাদের সকলেরই এক আত্মা; যখন এই সদ্‌বস্তুকে ধরা যায় তখন অপর সকল বিষয়কে জানা যায় তাদের সত্যরূপে, তখন আর এখনকার মতো শুধু তাদের বাহ্যরূপে নয়।

স্পষ্টতঃই, ভৌতিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব বিষয়কে আমরা যতই বিশ্লেষণ করি না কেন আমরা সেই উপায়ে আত্মা সম্বন্ধে বা নিজেদের সম্বন্ধে বা যাকে আমরা ভগবান বলি তার সম্বন্ধে বিদ্যা লাভে সমর্থ হই না। দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, লঘুছুরিকা, বকযন্ত্র, পাতনপাত্র--এইসব যন্ত্রের দৌড় ভৌতিকের বাইরে নয়, যদিও তাদের সাহায্যে ভৌতিক সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও তাদের স্থূল উপকরণগুলি

আমাদের কাছে যা প্রকাশ করে শুধু তাতেই যদি আমরা আবদ্ধ থাকি আর গোড়া থেকেই অন্য কোনো সদ্‌বস্তুর বা অপর কোনো জ্ঞানের উপায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করি তাহ'লে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই যে ভৌতিক ছাড়া আর কিছুই বাস্তব নয়, আমাদের মধ্যে বা বিশ্বের মধ্যে কোনো আত্মা নেই, ভিতরে কি বাহিরে কোনো ভগবান নেই, এমনকি আমরাও মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডলী ও দেহের এই সমাহার ছাড়া অন্য কিছু নই। কিন্তু এই যে সিদ্ধান্ত তা আমাদের কাছে অনিবার্য হয় শুধু এই কারণে যে আমরা গোড়া থেকেই তা স্বীকার করে নিয়েছি এবং সেজন্য সেই মূল স্বীকৃতির চারিদিকে ঘুরে বেড়ান ছাড়া আর উপায় থাকে না।

সুতরাং যদি ইন্দ্রিয়গোচর নয় এমন কোনো আত্মা, সদ্‌বস্তু থাকে তাহ'লে ভৌতিক বিজ্ঞানের করণ থেকে ভিন্ন করণ দিয়ে তাকে খোঁজা ও জানা দরকার। বুদ্ধি সেই করণ নয়। ইহা নিঃসন্দেহ যে বুদ্ধি তার নিজের প্রণালীতে অনেক অতীন্দ্রিয় সত্য পেতে ও সেগুলিকে বুদ্ধিগত প্রত্যয় হিসাবে অনুভব ক'রে তাদের বিবরণ দিতে সমর্থ। উদাহরণস্বরূপ, যে শক্তির কথা প্রাকৃত বিজ্ঞান অত জোর দিয়ে বলে সে-ও এমন এক ভাবনা, এমন এক সত্য যা শুধু বুদ্ধিই পেতে সমর্থ হয় তার সব তথ্যে ছাড়িয়ে গিয়ে; কারণ এই বিশ্বশক্তিকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানি না, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানি শুধু তার বিভিন্ন ফলগুলি আর শক্তিকে আমরা অনুমান করি এই সব ফলের আবশ্যকীয় কারণ রূপে। সেইভাবেই বুদ্ধি কঠোর বিশ্লেষণের এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে আত্মা সম্বন্ধে এক বুদ্ধিগত ভাবনা ও বুদ্ধিগত বিশ্বাসলাভে সমর্থ হয় আর এই বিশ্বাস অন্য সকল ও মহত্তর সব বিষয়ের শুরু হিসাবে অতীব বাস্তব, অতীব প্রোজ্জ্বল, অতীব শক্তিশালী হ'তে পারে। তবু শুধু বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ দিয়ে পাওয়া যেতে পারে শুধু কতকগুলি স্বচ্ছ প্রত্যয়ের বিন্যাস, হয়ত এগুলি সঠিক প্রত্যয়ের যথার্থ বিন্যাস কিন্তু যোগ যে জ্ঞান পেতে চায় ইহা তা নয়। কারণ ইহা নিজে কোনো ফলপ্রসূ জ্ঞান নয়। কোনো লোক এই জ্ঞানে সিদ্ধ হ'তে পারে, কিন্তু তবু সে আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই থাকতে পারে—শুধু এই পার্থক্য যে তার বুদ্ধি আরো বেশী পরিমাণে দীপ্ত হ'য়েছে। কিন্তু যোগের যা লক্ষ্য—আমাদের সত্তার পরিবর্তন তা আদৌ না ঘটতে পারে।

একথা সত্য যে বুদ্ধিগত বিবেচনা ও সঠিক বিচার জ্ঞানযোগের এক প্রধান অঙ্গ; কিন্তু এই পথের অন্তিম ও সদর্থক ফল পাওয়া অপেক্ষা বরং

তার এক বাধা দূর করাই তাদের উদ্দেশ্য। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিজ ভাবনাগুলি জ্ঞানের পথে অন্তরায়স্বরূপ; কারণ তারা সব ইন্দ্রিয়ের প্রমাদের অধীন আর তাদের মূলে এই ধারণা বর্তমান যে জড় ও শরীর সদ্‌বস্তু, প্রাণ ও শক্তি সদ্‌বস্তু, উগ্র আবেগ ও ভাবাবেগ সদ্‌বস্তু, মনন ও ইন্দ্রিয়বোধ সদ্‌বস্তু; আর এইসব বিষয়ের সহিত আমরা নিজেদের এক মনে করি আর তাদের সহিত নিজেদের এক করি ব'লে আমরা সত্যকার আত্মাতে উপনীত হতে পারি না। সুতরাং জ্ঞান-সাধকের পক্ষে এই অন্তরায় দূর করা দরকার আর দরকার তার নিজের ও জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা লাভ করা; কারণ প্রকৃত আত্মা কি সে সম্বন্ধে যদি আমাদের কোনো ধারণা না থাকে বরং এমন সব ভাবনায় আমরা বোঝাই থাকি যেগুলি সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তাহ'লে কেমন করে জ্ঞানের দ্বারা আমাদের আত্ম-অন্বেষণ সম্ভব হবে? সুতরাং পূর্বসাধন হিসাবে সঠিক মনন আবশ্যক আর একবার যদি ইন্দ্রিয়-প্রমাদ ও কামনা ও পূর্বসংস্কার ও বুদ্ধিজ পূর্বনির্ণয় থেকে মুক্ত সঠিক মননের অভ্যাস গঠিত হয় তাহ'লে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় আর তা থেকে জ্ঞানের পরবর্তী প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকাণ্ড বাধা আসে না। তবু, সঠিক মনন ফলপ্রসূ হয় কেবল তখনই যখন শুদ্ধকরা বুদ্ধিতে অন্যান্য সব ক্রিয়া, দর্শন, অনুভূতি, উপলব্ধিও আসে ঐ মননের পিছু পিছু।

কি কি এইসব ক্রিয়া? তারা শুধু মনস্তাত্ত্বিক আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-নিরীক্ষণ নয়। সঠিক মননের মতো এরূপ বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণের মূল্য প্রচুর এবং কার্যকরী পন্থা হিসাবে তারা অপরিহার্য। এমনকি যদি এগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় তাহ'লে এইভাবে এমন এক যথার্থ মনন আসে যার শক্তি ও কার্যকারিতা প্রচুর। ধ্যানপর মনন প্রণালীর দ্বারা বুদ্ধিগত বিচারের মতো তাদের থেকেও শুদ্ধি আসবে, তারাও আনবে একপ্রকার আত্মজ্ঞান এবং অন্তঃপুরুষ, হৃদয় ও এমনকি বুদ্ধিরও মধ্যে সব বিশৃঙ্খলার সঙ্গতি। নিজ সম্বন্ধে সকল প্রকারেরই জ্ঞান প্রকৃত আত্মার জ্ঞানের সঠিক উপক্রমণিকা স্বরূপ। উপনিষদ আমাদের বলে যে অন্তঃপুরুষের দ্বারগুলি স্বয়ম্ভূ স্থাপন করেছেন বহির্মুখীভাবে আর বেশীর ভাগ লোকই তাকায় বাহিরের দিকে সব বিষয়ের বাহ্যরূপের প্রতি; শুধু ধীর মনন ও স্থির প্রজ্ঞার জন্য উপযুক্ত বিরল পুরুষই অন্তরের দিকে চোখ ফিরিয়ে আত্মাকে দর্শন করেন ও অমৃতত্ব লাভ করেন। এইভাবে অন্তর্মুখী হবার

কাজে মনস্তাত্ত্বিক আত্ম-নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ এক গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী উপক্রম। আমাদের বাহিরের সব বিষয়ের ভিতর দেখা অপেক্ষা আমাদের নিজেদের ভিতরে দেখা আমাদের পক্ষে বেশী সহজ কারণ আমাদের বাহিরের সব বিষয় সম্বন্ধে আমরা প্রথমতঃ বিব্রত হই তাদের রূপের দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ তাদের মধ্যে তাদের ভৌতিক ধাতু ছাড়া অন্য কিছু যে আছে সে সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবতঃই কোনো পূর্ব জ্ঞান নেই। শুদ্ধকরা বা শান্ত-করা মনে জগতের মধ্যে ভগবানের, প্রকৃতির মধ্যে আত্মার প্রতিফলন আসা বা প্রবল একাগ্রতার দ্বারা তাদের জানা সম্ভব হ'তে পারে—— এমনকি আমাদের নিজেদের মধ্যে সে উপলব্ধি হবার আগেই,——কিন্তু এরূপ সচরাচর হয় না এবং হওয়া কঠিন।[১] আর শুধু আমাদের নিজেদের মধ্যেই আমরা পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারি আত্মার সম্ভূতি ধারা আবার অনুসরণ করতে পারি তার আত্ম-সত্তার মধ্যে নিবৃত্তির ধারা। সুতরাং সেই প্রাচীন উপদেশ "আত্মানং বিদ্ধি" (নিজেকে জান) চিরকাল বর্তমান থাকবে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে চলার নির্দেশক প্রথম মন্ত্র রূপে। তথাপি মনস্তাত্ত্বিক আত্ম-জ্ঞান শুধু আত্মার বৃত্তির অনুভূতিমাত্র, ইহা শুদ্ধ সত্তায় স্থিত আত্মার উপলব্ধি নয়।

সুতরাং জ্ঞানের যে পাদের দিকে যোগের দৃষ্টি নিবদ্ধ তা শুধু সত্যের এক বুদ্ধিগত প্রত্যয় বা স্বচ্ছ বিচার নয় অথবা আমাদের সত্তার বৃত্তির কোনো প্রবুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিও নয়। ইহা এক বাস্তব উপলব্ধি (realisation), (ইংরাজী) পদটির পূর্ণ অর্থে; ইহার অর্থ আত্মাকে, বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক ভগবানকে আমাদের নিজেদের কাছে ও আমাদের নিজেদের মধ্যে বাস্তব (real) করা, আর এই করা যেন সত্তার বৃত্তিগুলিকে আত্মার আলোয় ছাড়া দেখা অসম্ভব হয় এবং সেগুলি যে আমাদের জগৎ-জীবনের মনস্তাত্ত্বিক ও ভৌতিক অবস্থার মধ্যে আত্মারই সম্ভূতির প্রবাহ, এই হিসাবে তাদের সত্যকার রূপে দেখা ছাড়া অন্যভাবে দেখাও অসম্ভব হয়। এই উপলব্ধির তিনটি পর পর পর্যায় আছে——অন্তদর্শন, সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও তাদাত্ম্য।

১ কিন্তু এক হিসাবে ইহা আরো সহজ, কারণ বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা সংকীর্ণ অহং-বোধের দ্বারা ততটা বাধাগ্রস্ত হই না যতটা হই নিজেদের আন্তর বিষয় সম্বন্ধে; সুতরাং ভগবদ্-উপলব্ধির একটি বাধা দূর হয়।

এই অন্তর্দর্শন বা 'দৃষ্টি' অর্থাৎ যে শক্তি প্রাচীন জ্ঞানীদের কাছে এত বেশী মূল্যবান ছিল, যে শক্তি বলে মানব ঋষি বা কবি হ'ত, আর শুধু মনীষী থাকত না সেই দৃষ্টি অন্তঃপুরুষের মধ্যকার এমন একপ্রকার আলো যার সাহায্যে অদেখা সব বিষয় তার কাছে--অন্তঃপুরুষের কাছে, শুধু বুদ্ধির কাছে নয়--স্থূল চোখে দেখা সব বিষয়ের মতোই স্পষ্ট ও বাস্তব হয়। ভৌতিক জগতে সর্বদাই দুই প্রকার জ্ঞান আছে--প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, চোখের সামনে উপস্থিত বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান আর আমাদের দৃষ্টির দূরে ও অতীতে অবস্থিত সব বিষয়ের জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান। বিষয়টি দৃষ্টির অতীত হ'লে আমরা বাধ্য হ'য়ে তার এক ভাবনায় আসি অনুমান, কল্পনা বা উপমানের সাহায্যে, যারা দেখেছে তাদের বর্ণনা শুনে, অথবা পাওয়া গেলে তাদের ছবি বা অন্যরূপ প্রতিকৃতি আলোচনা ক'রে। এইসব সহায় একত্র করে আমরা অবশ্য বিষয়টি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর একটি পর্যাপ্ত ভাবনা বা ব্যঞ্জনাশীল প্রতিমূর্তি পেতে পারি কিন্তু স্বয়ং বস্তুটিকে আমরা বাস্তবে পাই না; তখনো ইহা আমাদের কাছে আয়ত্তাধীন সদ্‌বস্তু নয়, এক সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে ইহা আমাদের প্রত্যয়গত প্রতিরূপ মাত্র। কিন্তু একবার যদি আমরা ইহাকে চোখে দেখি--কারণ অন্য কোনো ইন্দ্রিয় পর্যাপ্ত নয়--তাহ'লে আমরা তাকে অধিগত করি, বাস্তবে উপলব্ধি করি; ইহা আমাদের তৃপ্ত সত্তার মধ্যে সুরক্ষিত হ'য়ে থাকে আমাদেরই জ্ঞানগত অঙ্গ হ'য়ে। সব আধ্যাত্মিক বিষয় ও আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক এই একই নিয়ম খাটে। দার্শনিক বা শিক্ষক বা প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আমরা আত্মা সম্বন্ধে অনেক প্রাঞ্জল ও জ্ঞানদীপ্ত শিক্ষা পেতে পারি; মনন, অনুমান, কল্পনা, উপমান বা অন্য কোনো উপযোগী উপায়ে আমরা ইহার এক মানসিক মূর্তি বা প্রত্যয় গঠনের চেষ্টা করতে পারি; আরো পারি আমরা ঐ প্রত্যয়কে আমাদের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে ধ'রে ইহাকে এক সমগ্র ও অনন্য একাগ্রতার দ্বারা নিবদ্ধ করতে[১]; কিন্তু তখনো আমরা ইহাকে বাস্তবে উপলব্ধি করিনি, আমরা ভগবানকে দেখি নি। কেবল যখন দীর্ঘ ও অক্লান্ত একাগ্রতার পর বা অন্য কোনো উপায়ে মনের আবরণ বিদীর্ণ বা দূরে অপসারিত হয়, কেবল যখন প্রবুদ্ধ মানসিকতার উপর নেমে আসে এক আলোর

১ জ্ঞানযোগের যে তিনটি প্রক্রিয়া--শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাদের অর্থ ইহাই--শোনা, চিন্তা করা বা মনন করা এবং একাগ্রতায় নিবদ্ধ করা।

বন্যা, "জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম", আর প্রত্যয়ের স্থলে আসে এমন এক জ্ঞান-দৃষ্টি যাতে আত্মা স্থূল চক্ষুর কাছে স্থূল বিষয়ের মতোই প্রত্যক্ষ, বাস্তব ও মূর্ত, তখনই কেবল আমরা তাকে পাই জ্ঞানের মধ্যে; কারণ আমরা তাকে দেখতে পেয়েছি। ঐ সত্যদর্শনের পর আলোর নিষ্প্রভতা যা-ই হ'ক না কেন, যতবারই না অন্ধকার ক্লিষ্ট করুক অন্তঃপুরুষকে, একবার যাকে ইহা ধরেছে, তাকে আর ইহা চিরদিনের মতো হারাতে পারে না।এই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি অনিবার্য, এবং তা ক্রমশঃ দ্রুত হ'তে বাধ্য যতক্ষণ না ইহা স্থায়ী হয়; কবে ও কতশীঘ্র এই স্থায়িত্ব আসে তা নির্ভর করে সাধনপথে চলায় ও আমাদের সংকল্প ও আমাদের ভালবাসা দিয়ে প্রচ্ছন্ন দেবতাকে ঘিরে রাখায় আমাদের ভক্তি ও অধ্যবসায়ের নিষ্ঠার উপর।

এই অন্তর্দৃষ্টি একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি; কিন্তু ইহা শুধু ঐ দেখার মধ্যেই আবদ্ধ নয়; দৃষ্টি শুধু উন্মুক্ত করে, ইহা আলিঙ্গন করে না। যেমন চক্ষু উপলব্ধির প্রাথমিক বোধ আনতে একলাই পর্যাপ্ত হ'লেও, তাকে স্পর্শ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও অনুভূতির সাহায্য নিতে হয়, তেমন আত্মার দর্শনকেও সম্পূর্ণ করা উচিত আমাদের সকল অঙ্গের মধ্যে তার অনুভূতির দ্বারা। শুধু আমাদের ভাস্বর জ্ঞান-নেত্র নয়, আমাদের সমগ্র সত্তারই উচিত ভগবানকে পেতে দাবী করা। কারণ যেহেতু আমাদের মধ্যকার প্রতি তত্ত্বটিই আত্মার এক অভিব্যক্তিমাত্র, সেহেতু প্রত্যেকেই সমর্থ আপন সদ্‌বস্তুতে ফিরে গিয়ে তার অনুভূতি পেতে। আত্মার এক মানসিক অনুভূতি পেতে আমরা সমর্থ হই আর সমর্থ হই সেই সব আপাত আচ্ছিন্ন বিষয়গুলিকে মূর্ত সদ্‌বস্তু হিসাবে ধরতে যেগুলি মনের কাছে সত্তাস্বরূপ—চেতনা, শক্তি, আনন্দ এবং তাদের নানাবিধ রূপ ও ক্রিয়া: এইভাবে মন তুষ্ট হয় ভগবান সম্বন্ধে। আত্মার এক ভাবগত অনুভূতি পেতে আমরা সমর্থ হই প্রেমের মাধ্যমে ও ভাবগত আনন্দের মাধ্যমে, আমাদের অন্তঃস্থ আত্মার, বিশ্বভাবের মধ্যস্থিত আত্মার এবং যাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক আছে সেই সকলের মধ্যস্থিত আত্মার প্রেম ও আনন্দের মাধ্যমে: এইভাবে হৃদয় তুষ্ট হয় ভগবান সম্বন্ধে। আমরা আত্মার এক কান্ত অনুভূতি পেতে পারি সৌন্দর্যের মধ্যে, পেতে পারি সেই অনপেক্ষ সদ্‌বস্তুর আনন্দবোধ ও আস্বাদন যিনি আমাদের বা প্রকৃতির সৃষ্ট সব কিছুর মধ্যে রসগ্রাহী মন ও সব ইন্দ্রিয়ের বোধে সর্বসুন্দর; ভগবান সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় তুষ্ট হয় এই ভাবে। এমনকি আমরা পেতে পারি আত্মার প্রাণিক, স্নায়বিক অনুভূতি

ও কার্যতঃ শারীরিক বোধও সকল জীবন ও রূপায়ণে এবং আমাদের বা অন্যদের মধ্য দিয়ে বা জগতে যেসব সামর্থ্য, শক্তি বা ক্রিয়াশক্তি ক্রিয়াশীল তাদের সকল কর্মপ্রণালীর মধ্যে; এইভাবে প্রাণ ও দেহ তুষ্ট হয় ভগবান সম্বন্ধে।

এই সব জ্ঞান ও অনুভূতি হ'ল তাদাত্ম্যে পৌঁছবার এবং তা অধিগত করার প্রাথমিক উপায়। আমাদের আত্মাকেই আমরা দেখি ও অনুভব করি, সুতরাং আমাদের দর্শন ও অনুভূতি অসম্পূর্ণ রয়ে যায় যদি না তাদের পরিসমাপ্তি হয় তাদাত্ম্যে, যদি না আমরা সমর্থ হই আমাদের সমগ্র সত্তায় জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করতে সেই পরম বৈদান্তিক জ্ঞান, "সোঽহমস্মি" ---আমিই তিনি। আমাদের যে শুধু ভগবানকে দেখা ও আলিঙ্গন করা দরকার তা নয়, পরন্তু আমাদের দরকার সেই সদ্-বস্তু হওয়া। অহং ও তার অন্তর্ভুক্ত সব কিছুকে তাদের প্রভব তৎস্বরূপের মধ্যে পরিণত, ঊর্ধ্বায়িত ও স্ব-নির্মুক্ত ক'রে আমাদের এক হওয়া চাই আত্মার সহিত সকল রূপ ও অভিব্যক্তির অতীত ইহার অতিস্থিতিতে, আবার তেমনই হওয়া চাই সেই আত্মা ইহার সকল ব্যক্ত সত্তা ও সম্ভূতির মধ্যে যাতে ইহার সহিত এক হই অনন্ত সত্তায়, চেতনায়, শান্তিতে, আনন্দে যেসবের দ্বারা ইহা আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে এবং এক হই ইহার সহিত কর্মে, রূপায়ণে ও আত্ম-বিভাবনার লীলায় যা দিয়ে ইহা নিজেকে আচ্ছাদন করে জগতের মধ্যে।

আধুনিক মনের কাছে একথা বোঝা কঠিন আত্মা বা ভগবান সম্বন্ধে বুদ্ধিগত ভাবনার বেশী কিছু করা কিভাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব; কিন্তু এই দর্শন, অনুভূতি ও হওয়ার এক ছায়া সে নিতে পারে প্রকৃতির প্রতি সেই আন্তর জাগরণ থেকে যা এক বড় ইংরাজ কবি বাস্তব করেছেন ইউরোপীয় কল্পনার কাছে। যে কবিতাগুলিতে Wordsworth(ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ) প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ ক'রেছেন আমরা যদি সেগুলি পড়ি তাহ'লে উপলব্ধি কি সে সম্বন্ধে আমরা এক দূরবর্তী ভাবনা পেতে পারি। কারণ প্রথমতঃ আমরা দেখি যে তিনি জগতের মধ্যে এমন কিছুর দর্শন পেয়েছিলেন যা ইহার মধ্যস্থিত সকল কিছুরই প্রকৃত আত্মা এবং যা ইহার বিভিন্ন রূপের অতিরিক্ত এক সচেতন শক্তি ও সান্নিধ্য অথচ যা বিভিন্ন রূপের কারণ ও তাদের মধ্যে অভিব্যক্ত। আমরা দেখি, তিনি যে শুধু এই আত্মার এবং ইহার সান্নিধ্য জনিত হর্ষ ও শান্তি ও বিশ্বভাবের

দর্শন পেয়েছিলেন তা নয়, ইহার এক মানসিক, কান্ত, প্রাণিক ও শারীরিক বোধও পেয়েছিলেন; তিনি যে শুধু নিজের সত্তায় আত্মার এই বোধ ও দর্শন পেয়েছিলেন তা নয়, তিনি তা পেয়েছিলেন নিকটতম পুষ্পে, সরলতম মানুষে ও অচল প্রস্তরে; আর সর্বশেষ দেখি যে, তিনি মাঝে মাঝে পেয়েছিলেন সেই ঐক্য, নিজের উৎসর্গের বিষয়ের সহিত একাত্মতা যার একটি দিক জোরালো ও গভীরভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে তাঁর এই কবিতায়, "A slumber did my spirit seal" (তন্দ্রাঘোরে স্তব্ধ হ'ল আমার চেতনা); এখানে তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি তাঁর সত্তায় পৃথিবীর সহিত এক হ'য়ে "আবর্তন করিনু তার প্রতি দিনের পথে—পাদপ, প্রস্তর স্থাণু ল'য়ে মোর সাথে"। এই উপলব্ধিকে ভৌতিক প্রকৃতির চেয়ে গভীরতর আত্মায় উন্নয়ন করলে আমরা পাই যৌগিক জ্ঞানের উপাদান। কিন্তু যে বিশ্বাতীত তাঁর সকল বিভাবের অতীত তাঁর অতীন্দ্রিয় অতিমানসিক উপলব্ধির শুধু বহির্দ্বার মাত্র এই সব অনুভূতি, আর জ্ঞানের চরম পরাকাষ্ঠা পাবার একমাত্র উপায় হ'ল অতিচেতনার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেখানে অন্য সকল অনুভূতি নিমজ্জন ক'রে দেওয়া অনুপাখ্যের স্বর্গীয় ঐক্যের মধ্যে। ইহাই সকল দিব্য জানার পরিণতি; ইহাই আবার সকল আনন্দ ও দিব্য জীবনযাত্রার উৎস।

অতএব জ্ঞানের ঐ পাদই (ব্রাহ্মীস্থিতিই) এই পথের এবং বস্তুতঃ সকল পথেরই চরম প্রান্তের লক্ষ্য; আর এই লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য বুদ্ধিগত বিচার ও প্রত্যয়, এবং সকল একাগ্রতা ও মনস্তাত্ত্বিক আত্ম-জ্ঞান এবং প্রেমের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের, সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়সমূহের, সামর্থ্য ও কর্মের মাধ্যমে সংকল্পের, শান্তি ও হর্ষের মাধ্যমে অন্তঃপুরুষের সকল এষণা সেই উত্তরণ পথের শুধু চাবিকাঠি, বীথি, প্রাথমিক প্রবেশ পথ ও উপক্রম যে পথ ধ'রে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না পাওয়া যায় বিস্তীর্ণ ও অনন্ত সব স্তর আর দিব্য দ্বার উদ্ঘাটিত করে অনন্ত আলোক।

তৃতীয় অধ্যায়

শোধিত বদ্ধি

জ্ঞানের যে পাদ আমরা আস্পৃহা করি তার বর্ণনা থেকেই নির্ধারিত হয় আমরা জ্ঞানের কি সাধন ব্যবহার করব। সংক্ষেপে বলা যায় যে ঐ জ্ঞানের পাদ এমন এক অতিমানসিক উপলব্ধি যা তৈরী হয় মানসিক সব প্রতিরূপ দ্বারা আমাদের অন্তঃস্থ নানাবিধ মানসিক তত্ত্বের মাধ্যমে এবং একবার তা পাওয়া গেলে তা আরো ভালো করে ফুটে ওঠে সত্তার সকল অঙ্গে। ইহার অর্থ বিষয়সমূহের বাহ্য রূপের এবং আমাদের বাহ্য সত্তার বহিরঙ্গের অধীনতা থেকে মুক্ত হ'য়ে আমাদের সমগ্র জীবনকে নতুন করে দেখা এবং সেজন্য তাকে পুনর্গঠন করা ভগবান, ও পরম এক ও সনাতনের আলোয়।

এই যে অতিক্রমণ মানুষী থেকে দিব্যে বিভক্ত ও বিষম থেকে পরম একে, প্রাতিভাসিক থেকে শাশ্বত সত্যে, অন্তঃপুরুষের এরূপ এক সম্পূর্ণ পুনর্জন্ম বা নবজন্ম---ইহার দুটি পর্যায় অপরিহার্য---একটি উদ্যোগপর্ব যাতে অন্তঃপুরুষ ও ইহার করণগুলি উপযুক্ত হ'য়ে ওঠা দরকার, আর অন্যটিতে আসে প্রস্তুত অন্তঃপুরুষের মধ্যে তার সব যোগ্য করণের মাধ্যমে বাস্তব উদ্ভাসন ও উপলব্ধি। অবশ্য এই দুই পর্যায়ের মধ্যে কালের পর-ম্পরায় কোনো কঠোর সীমারেখা নেই; বরং প্রত্যেকেই অপরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং দুটিই একসঙ্গে চলতে থাকে। কারণ যে অনুপাতে অন্তঃ-পুরুষ যোগ্য হয় সেই অনুপাতে ইহা বেশী বেশী দীপ্তি পায় এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর, পূর্ণ থেকে পূর্ণতর উপলব্ধিতে ওঠে, আবার যে অনুপাতে এই সব দীপ্তি ও উপলব্ধি বৃদ্ধি পায়, সেই অনুপাতে অন্তঃপুরুষ যোগ্য হয় আর তার সব করণ তাদের কার্যের পক্ষে আরো সমর্থ হয়। অন্তঃ-পুরুষের এমন সব সময় আসে যখন শুধু প্রস্তুতি চলে, দীপ্তি থাকে না, আবার অন্য সময় সে দীপ্তি পায় ও বিকশিত হয়, এমন সব চরম মুহূর্ত আসে যেগুলি অল্পবিস্তর দীর্ঘস্থায়ী দীপ্ত প্রাপ্তিতে ভরা, এমন কতক মুহূর্তও আসে যেগুলি বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তাতেই সমগ্র আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত হয় আবার এমন সব মুহূর্তও আসে যে-

গুলিতে মানুষী মানের বহু ঘন্টা, দিন ও সপ্তাহ ব্যেপে থাকে সত্যসূর্যের নিরন্তর আলোক বা তীব্র প্রভা। আর এই সকলের মধ্য দিয়ে অন্তঃপুরুষ একবার ভগবদ্‌মুখী হ'লে সে বিকশিত হ'তে থাকে তার নব জন্ম ও প্রকৃত জীবনের চিরস্থায়িত্ব ও সিদ্ধির দিকে।

প্রস্তুতির অবস্থায় প্রথম প্রয়োজন হ'ল আমাদের সত্তার সকল অঙ্গকেই শুদ্ধ করা; বিশেষ করে, জ্ঞানমার্গের পক্ষে বুদ্ধির শুদ্ধি করণ প্রথম প্রয়োজনীয় কারণ ইহাই সেই চাবিকাঠি যাতে সত্যের দ্বার খোলা যাবে; কিন্তু শোধিত বুদ্ধি সম্ভব হয় না অন্য সব অঙ্গের শুদ্ধি বিনা। অশুদ্ধ হৃদয়, অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়, অশুদ্ধ প্রাণ বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, তার সব তথ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনে, তার সিদ্ধান্ত বিকৃত করে, দৃষ্টিকে আঁধার দিয়ে ঢাকে, জ্ঞানকে ব্যবহার করে অন্যায় ভাবে; অশুদ্ধ শরীর ইহার ক্রিয়াকে রুদ্ধ বা ব্যাহত করে। সুতরাং সর্বাঙ্গীণ শুদ্ধি চাই-ই। এখানে এক অন্যোন্যনির্ভরতা দেখা যায়; কারণ যে কোনো একটিকে নির্মল করা হ'লে অন্যগুলির শুদ্ধি সহজ হয়; উদাহরণস্বরূপ ভাবগত হৃদয়ের উত্তরোত্তর অচঞ্চলতাসাধন বুদ্ধির শুদ্ধির সহায় হয় আবার সমভাবেই শোধিত বুদ্ধি শান্তি ও আনন্দ আনে এখনো অশুদ্ধ সব ভাবাবেগের পঙ্কিল ও তমসাচ্ছন্ন ক্রিয়াধারার উপর। এমনকি একথা বলা যায় যে যদিও আমাদের সত্তার প্রতি অঙ্গেরই শুদ্ধি সম্বন্ধে তার নিজস্ব উপযোগী তত্ত্ব আছে, তবু মানুষের মধ্যে শোধিত বুদ্ধিই তার পঙ্কিল ও বিশৃঙ্খল সত্তার সবচেয়ে শক্তিশালী পাবক এবং সবচেয়ে দৃপ্তভাবে আরোপ ক'রে তাদের সঠিক ক্রিয়াধারা তার অপর সব অঙ্গের উপর। গীতা বলে, "জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র কিছু নেই।" সকল স্বচ্ছতা ও সঙ্গতির উৎস যেমন আলো, তেমন আমাদের সকল বিচ্যুতির কারণ অজ্ঞানতার অন্ধকার। উদাহরণস্বরূপ প্রেম হৃদয়কে শুদ্ধ করে, আর আমাদের সব ভাবাবেগ যদি পরিণত হয় দিব্য প্রেমের রূপে তাহ'লে হৃদয় তার পূর্ণতা ও চরিতার্থতা পায়; তবু প্রেমের নিজেরও দরকার দিব্য জ্ঞানের দ্বারা নির্মল হওয়া। ভগবানের প্রতি হৃদয়ের প্রেম অন্ধ, সংকীর্ণ ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন হ'তে পারে, তার ফলে আসতে পারে ধর্মান্ধতা ও জ্ঞানের প্রতি বিদ্বেষ; এমনকি অন্য প্রকারে শুদ্ধ হ'লেও ইহা ভগবানকে সীমিত ব্যক্তিরূপে ছাড়া দেখতে অস্বীকার ক'রে এবং সত্য ও অনন্ত দর্শন থেকে প্রতিনিবৃত্ত হ'য়ে আমাদের সিদ্ধিকে গণ্ডীবদ্ধ ক'রতে পারে। সমভাবে মানবের প্রতি হৃদয়ের প্রেমের পরিণতিতে বেদনায়, ক্রিয়ায় ও

জ্ঞানে বিকৃতি ও আতিশয্য আসা সম্ভব আর এসবকে সংশোধন ও নিবারণ করা দরকার বুদ্ধির শুদ্ধিকরণ দ্বারা।

কিন্তু আমাদের গভীর ও স্বচ্ছভাবে বিবেচনা করা দরকার যে ইংরাজী পদ understanding (বুদ্ধি) ও তার শুদ্ধিকরণ বলতে আমরা কি বুঝি। এই ইংরাজী কথাটি আমরা ব্যবহার করি সংস্কৃত দার্শনিক পদ 'বুদ্ধির' নিকটতম সমার্থক পদ হিসাবে; সুতরাং তা থেকে আমরা ইন্দ্রিয়মানসের ক্রিয়া বাদ দিই যাতে শুধু সকল প্রকার বোধই পার্থক্য না করে লিপিবদ্ধ করা হয়—তা তারা যথার্থ বা মিথ্যা, সত্য বা শুধু অলকে প্রাতিভাসিক, সূক্ষ্মভেদী বা বাহ্য হ'ক না কেন। আমরা সেই বিশৃঙ্খল প্রত্যয়রাশিও বাদ দিই যা এই বোধগুলির শুধু সামান্যীকরণ আর তাদের মতোই বিচার বিবেচনার উচ্চতর তত্ত্ববিহীন। তাছাড়া অভ্যাসগত মননের সেই অবিরত লম্ফমান স্রোতকেও তার মধ্যে ধরা যায় না যদিও সাধারণ চিন্তা-না-করা মানবের মনে তাহাই বুদ্ধির কাজ করে, কিন্তু ইহা শুধু অভ্যাসগত সাহচর্য, কামনা, পক্ষপাত, পূর্বনির্ণয়, অন্য থেকে পাওয়া বা বংশানুগত অভিরুচি প্রভৃতির অবিরত পুনরাবৃত্তি যদিও সম্ভবতঃ ইহা সর্বদাই সমৃদ্ধ হচ্ছে পরিবেশ থেকে স্রোতের মতো আসা এমন সব নতুন নতুন ভাবনার দ্বারা যেগুলি নেওয়া হয় শক্তিশালী বিবেচনাশীল যুক্তির দ্বারা পরীক্ষা না করেই। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহ যে পশু থেকে মানবের বিকাশে এই প্রকার বুদ্ধি অনেক কাজে লেগেছে; কিন্তু ইহা শুধু পশুমনের এক ধাপ উপরে; ইহা এক অর্ধ-পাশবিক যুক্তিবুদ্ধি যা অভ্যাস, কামনা ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দাস আর যা কি বৈজ্ঞানিক কি দার্শনিক কি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্বেষণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ইহাকে অতিক্রম ক'রে যাওয়া চাই; ইহাকে শুদ্ধ করার একমাত্র উপায়—হয় ইহাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন বা নিস্তব্ধ করা, নয় ইহাকে প্রকৃত বুদ্ধিতে রূপান্তরিত করা।

বুদ্ধি (understanding) ব'লতে আমরা সেই জিনিস বুঝি যা একসঙ্গে দেখে, বিচার ও বিবেচনা করে, মানুষের সেই সত্যকার যুক্তিবুদ্ধি যা ইন্দ্রিয়সমূহের, কামনার বা অভ্যাসের অন্ধশক্তির দাস নয়, বরং যা প্রভুত্বের জন্য, জ্ঞানের জন্য নিজের অধিকারেই কাজ করে। ইহা নিঃসন্দেহ যে বর্তমানে মানুষ যা তাতে তার শ্রেষ্ঠ যুক্তিবুদ্ধিও এইরূপ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অপ্রতিহতভাবে কাজ করে না; কিন্তু তার এই বিফলতার কারণ এই যে প্রথমতঃ ইহা এখনো নিম্ন অর্ধ-পাশবিক ক্রিয়ার সহিত মিশ্রিত থাকে,

আর দ্বিতীয়তঃ ইহা অশুদ্ধ ও সর্বদাই বাধাগ্রস্ত ও নিজের বিশিষ্ট ক্রিয়া থেকে ইহাকে নিম্নে টেনে আনা হয়। শুদ্ধ অবস্থায় ইহার উচিত নয় এই সব নিম্ন গতিবৃত্তিতে জড়িত হওয়া, বরং ইহার উচিত বিষয় থেকে সরে এসে নিস্পৃহভাবে পর্যবেক্ষণ করা, সদৃশ ও বিসদৃশের সহিত তুলনা ও উপমানের শক্তির দ্বারা সমগ্রের মধ্যে তাকে সঠিক স্থানে স্থাপন করা, অবরোহ ও আরোহক্রমে অনুমানের দ্বারা সুনিরীক্ষিত সব তথ্য থেকে বিচার করা এবং সব কিছুকে স্মৃতিতে রেখে এবং পরিশুদ্ধ ও সুপরিচালিত কল্পনার দ্বারা সে সবকে সমৃদ্ধ ক'রে সব কিছুকে দেখা শিক্ষিত ও সংযত সিদ্ধান্তের আলোয়। ইহাই শুদ্ধ মানসিক বুদ্ধি, আর নিঃস্বার্থ অবেক্ষা, সিদ্ধান্ত ও অনুমান ইহার বিধান ও বিশিষ্ট ক্রিয়া।

কিন্তু 'বুদ্ধি' কথাটি অন্য এক ও গভীরতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানসিক বুদ্ধি শুধু অবর বুদ্ধি, অন্য এক পরা বুদ্ধি আছে যা মানসিক বুদ্ধি নয়, বরং এক দর্শন, ইহা জ্ঞানের নিম্নস্থানীয় নয়, বরং ঊর্ধ্বে অবস্থিত[১], জ্ঞানের জন্য ইহা অন্বেষণ করে না বা দেখা তথ্যের উপর ইহার জ্ঞানলাভ নির্ভর করে না; বরং তার পূর্বেই সত্য এই বুদ্ধির অধিগত, ইহা সত্যকে শুধু বাহিরে আনে এক প্রকাশক ও বোধিসম্পন্ন মননের সংজ্ঞায়। এই ঋতচিৎ জ্ঞানের যে নিকটতম অবস্থা মানবমন পেতে পারে তা এমন এক জ্যোতির্ময় প্রাপ্তির অপূর্ণ ক্রিয়া যা আসে যখন মননের এক প্রবল চাপ হয় এবং ধীশক্তি আবরণের পিছন থেকে অভ্রান্ত স্ফুরণের দ্বারা তেজঃপূর্ণ হ'য়ে এক উচ্চতর উদ্দীপনার বশে ভিতরে গ্রহণ করে জ্ঞানের বোধিত ও চিদাবিষ্ট শক্তির প্রচুর প্রবাহ। কারণ মানবের মধ্যে এক বোধিতমন আছে যা অতিমানসিক শক্তি থেকে আসা এইসব অন্তঃপ্রবাহধারার গ্রহীতা ও প্রণালী স্বরূপ। তবে আমাদের মধ্যে বোধি ও চিদাবেশের কার্য যেমন প্রকৃতিতে অপূর্ণ তেমন ক্রিয়ায় সবিরাম; সাধারণতঃ ইহা আসে অনলস ও সচেষ্ট হৃদয় বা ধীশক্তির দাবীর উত্তরে আর এমনকি তার সব দান সচেতন মনে আসার আগেই তারা তাদের উদ্দেশে উত্থিত মনন ও আস্পৃহার দ্বারা ইতিপূর্বেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং আর শুদ্ধ থাকে না বরং হৃদয় ও ধীশক্তির প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত হয়, আবার তারা সচেতন মনে

১ ভাগবত পুরুষকে বলা হয় অধ্যক্ষ, অর্থাৎ যিনি সকল কিছুর ঊর্ধ্বে পরম ব্যোমে সমাসীন হ'য়ে সে সব দেখেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন ঊর্ধ্ব থেকে।

প্রবেশ করার পর তারা তৎক্ষণাৎ মানসিক বুদ্ধি দ্বারা অধিকৃত হ'য়ে বিকীর্ণ বা ছিন্নভিন্ন হয় যাতে তারা আমাদের অপূর্ণ সাধারণ বুদ্ধিগত জ্ঞানের সহিত মিলতে পারে অথবা তারা হৃদয়ের কবলে এসে তার দ্বারা এমনভাবে পুনর্গঠিত হয় যাতে তারা আমাদের অন্ধ বা অর্ধ-অন্ধ ভাবময় সব তৃষ্ণা ও অভিরুচির উপযোগী হয় অথবা এমনকি তারা হীন সব লালসার আয়ত্তাধীন হ'য়ে বিকৃত হয় আমাদের বুভুক্ষা ও প্রচণ্ড সব আবেগের উগ্র ব্যবহারে।

যদি এই পরা বুদ্ধি এই সব অবর অঙ্গের প্রভাব মুক্ত হ'য়ে কাজ ক'রতে পারে তাহ'লে ইহা সত্যের শুদ্ধ রূপ দিতে সক্ষম; এমন এক অন্তর্দর্শন পর্যবেক্ষণকে তার প্রভাবাধীন ক'রবে বা পর্যবেক্ষণের স্থলাভিষিক্ত হবে যা ইন্দ্রিয়মানস ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর দাসসুলভ নির্ভরতা-শূন্য হ'য়েই দেখতে সক্ষম; কল্পনার স্থলে আসবে সত্যের এক স্বয়ং-নিশ্চিত চিদাবেশ, যুক্তিবিচারের স্থলে আসে বিভিন্ন সম্বন্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বোধ এবং যুক্তিবিচার থেকে সিদ্ধান্তের স্থলে আসে এমন এক বোধি যার মধ্যে ঐসব সম্বন্ধ নিহিত, যা ঐসবের উপর কষ্ট করে কিছু নির্মাণ করে না, নির্ণয়ের স্থলে আসে এমন এক মনন-দর্শন যার আলোয় সত্য প্রকট হবে তার বর্তমান ব্যবহৃত যে আবরণকে আমাদের বুদ্ধিগত নির্ণয় ভেদ করতে হয় তা থেকে মুক্ত হ'য়ে; আবার স্মৃতিও নেবে তার ব্যাপকতর অর্থ যা সে পেয়েছিল গ্রীসীয় ভাবনায়, ব্যক্তি তার বর্তমান জীবনে যে ভাণ্ডার গঠন করে তা থেকে এক তুচ্ছ নির্বাচন ইহা আর হবে না, বরং ইহা হবে এমন এক জ্ঞান যা সব কিছুকে লিপিবদ্ধ ক'রে নিগূঢ়ভাবে ধরে রাখে, এবং সর্বদাই নিজ থেকে সব কিছু দেয় অথচ এখন যা আমরা মনে করি আমরা কষ্ট ক'রে আহরণ করি কিন্তু যা বাস্তবিকই আমরা এই অর্থে স্মরণ করি, এমন জ্ঞান যার মধ্যে অতীতের মতো ভবিষ্যৎ[১] ও নিহিত থাকে। এ কথা নিশ্চিত যে ঋত-চিৎ জ্ঞানের এই উচ্চতর শক্তি গ্রহণে সক্ষম হবার জন্য বিকশিত হওয়াই আমাদের জীবনের তাৎপর্য কিন্তু এখনো পর্যন্ত ইহার পূর্ণ ও অনাবৃত প্রয়োগ দেবতাদের বিশিষ্ট অধিকার, আমাদের বর্তমান মানবীয় উচ্চতার অতীত।

তাহ'লে আমরা দেখি আমরা সঠিক কি বুঝি বুদ্ধি ব'লতে এবং কি

১ এই অর্থে ভবিষ্যদ্-বাণীর সামর্থ্যকে ঠিকই বলা হয় ভবিষ্যতের স্মৃতি।

বুঝি সেই উচ্চতর শক্তি ব'লতে যাকে আমরা সুবিধার জন্য নাম দিতে পারি আদর্শ শক্তি এবং যার সহিত বিকশিত ধীশক্তির অনেকপরিমাণে তেমন সম্বন্ধ যেমন ধীশক্তির সম্বন্ধ অবিকশিত মানবের অর্ধপাশব যুক্তিবুদ্ধির সহিত। ইহাও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে যথার্থ জ্ঞানলাভের বিষয়ে বুদ্ধি তার কাজ ঠিক মতো করতে সক্ষম হবার পূর্বে কি প্রকার শুদ্ধিকরণ আবশ্যক। সকল অশুদ্ধতাই কর্মপ্রণালীর বিশৃঙ্খলা, বিষয়সমূহের ধর্ম থেকে অর্থাৎ তাদের উচিত ও স্বকীয় যথার্থ ক্রিয়া থেকে বিচ্যুতি অথচ বিষয়গুলি তাদের সঠিক ক্রিয়ায় শুদ্ধ এবং আমাদের সিদ্ধির সহায়কর; সাধারণতঃ এই বিচ্যুতি ঘটে বিভিন্ন ধর্মের অজ্ঞানময় 'সংকর' থেকে যাতে বৃত্তির ক্রিয়া চলে অপর এমন সব প্রবণতার দাবী অনুযায়ী যেগুলি যথার্থতঃ তার নিজের নয়।

বুদ্ধিতে অশুদ্ধির প্রথম কারণ হ'ল চিন্তাবৃত্তিতে কামনার সংমিশ্রণ, আর কামনা স্বয়ং আমাদের সত্তার প্রাণিক ও ভাবাবেগময় অংশের মধ্যে জড়িত সংকল্পের এক অশুদ্ধি। যখন প্রাণিক ও ভাবাবেগময় সব কামনা শুদ্ধ জ্ঞানৈষণাকে বাধা দেয় তখন মননবৃত্তি তাদের অধীন হ'য়ে পড়ে, তার যোগ্য উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য সব উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয় আর তার সব বোধ রুদ্ধ ও বিশৃঙ্খল হয়। কামনা ও ভাবাবেগের আক্রমণের অতীতে নিজেকে উত্তোলন করা বুদ্ধির অবশ্য কর্তব্য আর যাতে ইহা সম্পূর্ণভাবে তাদের প্রভাবমুক্ত হ'তে পারে সেজন্য ইহার কর্তব্য সব প্রাণিক অংশ ও ভাবাবেগকেই শুদ্ধ করা। ভোগ করা প্রাণসত্তার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কিন্তু ভোগের নির্বাচন বা অনুসরণ করা নয়; এসব নিরূপণ ও অর্জন করা চাই উচ্চতর বৃত্তির দ্বারা; সুতরাং প্রাণসত্তাকে এই শিক্ষা দেওয়া চাই যে তার উচিত শুধু সেই লাভ বা ভোগ স্বীকার করা যা তার কাছে আসে দিব্য সংকল্পের কর্মপ্রণালী অনুযায়ী প্রাণের যথার্থ ব্যাপ্রিয়াতে; আরো উচিত নিজেকে লালসা ও আসক্তি থেকে মুক্ত করা। সেইরূপ হৃদয়কে মুক্ত করা চাই প্রাণ-তত্ত্ব ও সব ইন্দ্রিয়ের লালসার বশ্যতা থেকে এবং এইভাবে হৃদয়ের কর্তব্য ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা, কাম প্রভৃতি যে মিথ্যা ভাবাবেগগুলি হৃদয়ের প্রধান অশুদ্ধি সেসব থেকে নিজেকে মুক্ত করা। প্রেমের সংকল্প হৃদয়ের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রেমের নির্বাচন ও তা পাবার চেষ্টা ত্যাগ করা বা শান্ত করা চাই; হৃদয়কে অবশ্যই শেখান চাই গভীর ও তীব্রভাবে ভালবাসতে কিন্তু সে গভীরতা হবে শান্ত, সে তীব্রতা হবে

সুস্থির ও সম, তা বিক্ষুব্ধ ও বিশৃঙ্খল হবে না। বুদ্ধিকে প্রমাদ, অজ্ঞান ও কুটিলতার প্রভাব থেকে মুক্ত করার প্রথম সর্তই হ'ল ঐ সব অঙ্গকে শান্ত ও বশীভূত করা[১]। এই শুদ্ধির ফলে স্নায়বিক সত্তা ও হৃদয়ের উপর সম্পূর্ণ সমত্ব বিরাজ করে; সুতরাং সমত্ব যেমন কর্মমার্গের প্রথম কথা তেমন ইহা জ্ঞানমার্গেরও প্রথম কথা।

বুদ্ধিতে অশুদ্ধির দ্বিতীয় কারণ হ'ল ইন্দ্রিয়সমূহের ভ্রান্তি এবং চিন্তা-বৃত্তির মধ্যে ইন্দ্রিয়মানসের সংমিশ্রণ। এমন কোনো জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান হ'তে পারে না যা ইন্দ্রিয়সমূহের অধীন অথবা সেসবকে প্রথম নির্দেশক ছাড়া অন্যভাবে ব্যবহার করে কারণ তাদের দেওয়া সব তথ্যকে সর্বদাই সংশোধন ও অতিক্রম করা দরকার। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিশ্বশক্তির কর্মপ্রণালীগুলিকে যে সব আপাতরূপে চিত্রিত করে তাদের মূলে যেসব সত্য আছে সেসবের পরীক্ষাতেই শুরু হয় প্রাকৃত বিজ্ঞান; আর বিষয়-সমূহের যেসব তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় সেগুলির পরীক্ষাতে শুরু হয় দর্শনশাস্ত্র; আর অধ্যাত্ম জ্ঞান শুরু হয় যখন আমরা ইন্দ্রিয়পর জীবনের সব সংকীর্ণতাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করতে অথবা দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহকে সদ্‌বস্তুর প্রাতিভাসিকের বেশী কিছু ব'লতে অস্বীকার করি।

সমভাবে ইন্দ্রিয়মানসকে নিস্তব্ধ করা চাই আর তাকে শেখান চাই যে তার কর্তব্য মননের ব্যাপারকে মনের হাতে ছেড়ে দেওয়া কারণ মনই বিচার করে ও বোঝে। যখন আমাদের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়মানসের ক্রিয়া থেকে পিছিয়ে দাঁড়িয়ে তার মিশ্রণকে প্রতিহত করে তখন ইন্দ্রিয়মানস বুদ্ধি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আর তখন দেখা সম্ভব হয় যে ইহা পৃথকভাবে কর্মরত। তখন তার যে স্বরূপ ইহা প্রকট করে তাতে দেখা যায় যে ইহা অভ্যাসগত সব প্রত্যয়, সাহচর্য, বোধ, কামনার এমন এক অশ্রান্ত ঘূর্ণায়-মান ও আবর্তনশীল নিম্নস্রোত যার মধ্যে কোনো প্রকৃত পরম্পরা, শৃঙ্খলা বা আলোর তত্ত্ব থাকে না। ইহা বৃত্তাকারে এক অবিরাম পুনরাবৃত্তি — নির্বোধ ও নিরর্থক। সাধারণতঃ মানববুদ্ধি এই নিম্নস্রোতকে স্বীকার ক'রে চেষ্টা করে তার মধ্যে কিছুটা শৃঙ্খলা ও পরম্পরা গড়তে; কিন্তু এইভাবে কাজ করায় ইহা নিজেই তার অধীন হয়ে পড়ে আর তার নিজের

১ শম ও দম

মধ্যেই আসে বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা, অভ্যাসের নিকট নির্বোধ দাসত্ব এবং অন্ধ উদ্দেশ্যহীন পুনরাবৃত্তি; তার ফলে সাধারণ মানবীয় যুক্তিবুদ্ধি পরিণত হয় এক ভ্রান্তিজনক, সীমিত এবং এমনকি তুচ্ছ ও নিরর্থক যন্ত্রে। এই চপল, অস্থির, উগ্র ও চাঞ্চল্যজনক বিষয়ের সহিত কোনো সম্পর্ক না রেখে আমাদের উচিত তা থেকে মুক্ত হওয়া,--হয় তাকে প্রথম বিচ্ছিন্ন ক'রে ও পরে নিস্তব্ধ ক'রে অথবা মননে এমন একাগ্রতা ও অনন্যতা এনে যাতে ইহা নিজেই বর্জন ক'রতে পারে এই ভিন্নধর্মী বিভ্রান্তিকর উপাদান।

অশুদ্ধির এক তৃতীয় কারণের উৎপত্তি হয় বুদ্ধি থেকেই; এই কারণ হ'ল জ্ঞানৈষণার অযথা ক্রিয়া। ঐ এষণা বুদ্ধির স্বভাব কিন্তু এখানেও নির্বাচন এবং জ্ঞানের জন্য অসম প্রচেষ্টা ব্যাহত ও বিকৃত করে। তাদের থেকে এমন এক পক্ষপাতিত্ব ও আসক্তি আসে যার ফলে ধীশক্তি কতকগুলি ভাবনা ও মতামত আঁকড়ে থাকে আর অল্পবিস্তর একগুঁয়েমির সহিত অন্য সব ভাবনা ও মতামতের সত্য উপেক্ষা করে, কোনো সত্যের কতকগুলি অংশ আঁকড়ে থাকে আর অন্য যেসব অংশ তার পূর্ণতার পক্ষে তখনো প্রয়োজনীয় সেসব স্বীকার করতে সংকুচিত হয়, জ্ঞানের কতকগুলি পূর্বানু-রাগের ধারা আঁকড়ে থাকে আর যেসকল জ্ঞান ভাবুকের অতীতের দ্বারা গঠিত মননের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির প্রতিকূল তা বর্জন করে। এসবের প্রতীকা-রের জন্য দরকার মনের সম্পূর্ণ সমত্ব, ধীশক্তির সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠা এবং মানসিক নিস্পৃহতার পূর্ণতা। শোধিত বুদ্ধি যেমন কোনো কামনা বা লালসার অনুগত হবে না তেমন কোনো বিশেষ ভাবনা বা সত্যের প্রতি পূর্বআকর্ষণ বা বিতৃষ্ণার বশবর্তী হবে না এবং এমন কি যেসব ভাবনা সম্বন্ধে ইহা অতীব নিশ্চিত সেসবেও আসক্ত হ'তে সে অস্বীকার করবে, অথবা তাদের উপর এমন কোনো অযথা গুরুত্ব দেবে না যাতে সত্যের ভারসাম্য নষ্ট হয় অথবা সম্পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট জ্ঞানের অন্যান্য উপাদানের মূল্য হানি ঘটে।

এইভাবে শুদ্ধ-করা বুদ্ধি হ'ল ধীসম্পর্কীয় মনন ও সত্তার এক সম্পূর্ণ, সমগ্র ও নিখুঁত যন্ত্র যা বাধা ও বিকৃতির সব নিম্নতর উৎস থেকে মুক্ত হ'য়ে আত্মা ও বিশ্বের বিভিন্ন সত্য সম্বন্ধে ধীশক্তির পক্ষে যতদূর সম্ভব ততদূর প্রকৃত ও সম্পূর্ণ বোধ লাভ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু সত্যজ্ঞানের জন্য আরো কিছু প্রয়োজনীয় কারণ সত্য জ্ঞান আমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এমন কিছু যা ধীশক্তির অতীত। যাতে বুদ্ধি আমাদের সত্যজ্ঞানলাভে

কোনো বাধা না দিতে পারে, সেজন্য আমাদের দরকার সেই অতিরিক্ত কিছুতে উন্নীত হওয়া এবং এমন এক সামর্থ্য বিকাশ করা যা সক্রিয় ধীসম্পন্ন চিন্তাবিৎ-এর পক্ষে অতীব দুরূহ এবং তার স্বাভাবিক প্রবণতার পক্ষে অরুচিকর অর্থাৎ ধীশক্তির নিষ্ক্রিয়তার সামর্থ্য। ইহাতে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সুতরাং দুইটি বিভিন্ন প্রকারের নিষ্ক্রিয়তা অর্জন করা দরকার।

প্রথমতঃ আমরা দেখেছি যে ধীশক্তির মনন নিজেই অপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ চিন্তন নয়; শ্রেষ্ঠ তাহাই যা আসে বোধিত মনের মাধ্যমে এবং অতিমানসিক শক্তি থেকে। যতদিন আমরা বুদ্ধিগত অভ্যাস এবং অবর কর্মপ্রণালীর বশে থাকি ততদিন বোধিত মন আমাদের কাছে তার সব বাণী পাঠাতে পারে শুধু অবচেতনভাবে, আর সচেতন মনে তা পৌঁছবার আগেই সেসব কম বেশী সম্পূর্ণভাবেই বিকৃত হ'য়ে পড়ে; অথবা যদি ইহা সচেতনভাবে সক্রিয় হয়, তাহ'লে তা হয় শুধু অপ্রচুর সূক্ষ্মতার সহিত এবং তার ব্যাপ্রিয়াতেও থাকে অতীব অপূর্ণতা। আমাদের মধ্যকার পরতরা জ্ঞানশক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের দরকার আমাদের মননের বোধিত ও ধীসম্পর্কীয় উপাদানগুলির মধ্যে সেই বিচ্ছিন্নতা আনা যা আমরা ইতিপূর্বেই এনেছি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়মানসের মধ্যে; আর ইহা সহজ কাজ নয়, কারণ শুধু যে আমাদের বোধিগুলি বুদ্ধিগত ক্রিয়ার আবরণে আসে তা নয়, এমন অনেক মানসিক ক্রিয়াও আছে যেগুলি পরতরা শক্তির বেশে তার আকার অনুসরণ করে। ইহার প্রতিকার হ'ল ধীশক্তিকে প্রথম এমন শিক্ষা দেওয়া যাতে ইহা আসল বোধিকে চিনতে ও মিথ্যা বোধি থেকে তার পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয় আর তার পর তাকে অভ্যস্ত করা চাই যে সে যখন কোনো বুদ্ধিগত অনুভব পায় বা সিদ্ধান্তে পৌঁছে, সে যেন তাকেই শেষ কথা না ভেবে বরং ঊর্ধ্বে তাকায়, এবং সব কিছুকে দিব্য তত্ত্বের নিকট স্থাপন ক'রে যথাশক্তি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে অপেক্ষা করে ঊর্ধ্ব থেকে আলোর জন্য। এইভাবে আমাদের অধিকাংশ বুদ্ধিগত চিন্তাকে জ্যোতির্ময় ঋতচিৎ দর্শনে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়—যদিও আদর্শ হ'ল সমগ্র সংক্রমণ —অথবা অন্ততঃপক্ষে সম্ভব হয় ধীশক্তির পশ্চাতে কর্মরত আদর্শ জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি, শুদ্ধতা ও চিৎ-শক্তির সম্যক্ বৃদ্ধিসাধন। ধীশক্তির এই শিক্ষা দরকার যে ইহা যেন আদর্শ শক্তির অধীনস্থ হয় ও তার কাছে নিষ্ক্রিয় থাকে।

কিন্তু আত্মার জ্ঞানের জন্য দরকার ধীশক্তির সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার সামর্থ্য,

সকল মনন বিসর্জন করার সামর্থ্য, আদৌ চিন্তা না করার জন্য মনের সামর্থ্য পাওয়া; একস্থলে গীতাও এই নির্দেশ দিয়েছে। পাশ্চাত্য মনের কাছে ইহা এক দুর্বোধ্য বিষয় কারণ তার কাছে মননই শ্রেষ্ঠ বিষয় এবং ইহা সহজেই ভুল করবে যে মনের চিন্তা না করার যে সামর্থ্য, ইহার সম্পূর্ণ যে নীরবতা--তা মননের অক্ষমতা। কিন্তু এই নীরবতার সামর্থ্য এক ক্ষমতা, অক্ষমতা নয়, ইহা এক সামর্থ্য, দুর্বলতা নয়। ইহা এক গভীর ও অন্তঃসমৃদ্ধ নিস্তব্ধতা। যখন সমগ্র সত্তার পরিপূর্ণ শুদ্ধতা ও শান্তির মধ্যে মন এইভাবে পুরোপুরি নিস্তব্ধ হয় স্বচ্ছ, নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ জলের মতো আর অন্তঃপুরুষ উর্ধ্বে ওঠে মনন ছাড়িয়ে কেবল তখনই আত্মা যা সকল ক্রিয়া ও সম্ভূতির অতীত ও উৎস পরম নীরবতা যা থেকেই সকল কথার উৎপত্তি, পরমার্থ-সৎ যার আংশিক প্রতিফলন এই সকল সাপেক্ষ্য বিষয়-- নিজেকে অভিব্যক্ত করতে সক্ষম হন আমাদের সত্তার শুদ্ধ স্বরূপে। শুধু সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যেই শোনা যায় পরম নীরবতা; শুধু বিশুদ্ধ শান্তির মধ্যেই প্রকট হয় তার পরম সত্তা। অতএব আমাদের কাছে 'তৎ'-এর নাম "নীরবতা" ও "শান্তি"।

চতুর্থ অধ্যায়

একাগ্রতা

শুদ্ধতার সাথে সাথে আর তা আনার সহায় হিসাবে একাগ্রতাও দরকার। বস্তুতঃ শুদ্ধি ও একাগ্রতা একই অবস্থার দুই দিক,---একটি স্ত্রী-প্রকৃতি, অন্যটি পুং-প্রকৃতি, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়; শুদ্ধতা সেই অবস্থা যাতে একাগ্রতা হ'য়ে ওঠে নিশ্ছিদ্র, যথার্থ ফলপ্রদ, সর্বসমর্থ ; আবার শুদ্ধতা তার কাজ করে একাগ্রতার দ্বারা, একাগ্রতা না থাকলে শুদ্ধতার ফল হ'ত শুধু এক শান্তিপূর্ণ উপশম ও চিরন্তন বিশ্রামের অবস্থা। তাদের বিপরীতগুলিও নিবিড়ভাবে জড়িত; কারণ আমরা দেখেছি যে অশুদ্ধি হ'ল বিভিন্ন ধর্মের সংকর, সত্তার বিভিন্ন অঙ্গের এক শিথিল, মিশ্রিত ও পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া; দেহধারী অন্তঃপুরুষের মধ্যস্থ সত্তার বিভিন্ন শক্তির উপর ইহার জ্ঞানের সঠিক একাগ্রতার অভাবেই এই বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি। আমাদের প্রকৃতির দোষ প্রথমতঃ এই যে বিভিন্ন সব বিষয় যখন শৃঙ্খলাবিহীন বা নিয়ন্ত্রণবিহীন হ'য়ে মনের উপর এলোমেলো ভাবে এসে পড়ে তখন তাদের সব সংস্পর্শে[১] ইহা অসাড়ভাবে তাদের প্রভাবের অধীন হয় আর দ্বিতীয়তঃ তার বিবেচনাহীন অপূর্ণ একাগ্রতা যা আনা হয় অস্থির ও অনিয়মিতভাবে আর তাতে আকস্মিকভাবে কমবেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় এই বা অপর সেই উপর যাতে আমা'দের নিম্ন মন আগ্রহী,---উচ্চতর অন্তঃপুরুষ বা ও বিবেচক ধীশক্তি নয়; অথচ এই নিম্ন মন অস্থির, লম্ফমান, চঞ্চল, সহজেই ক্লান্ত হয়, সহজেই বিক্ষিপ্ত হয় আর ইহাই আমাদের উন্নতির প্রধান শত্রু। এরূপ অবস্থায় শুদ্ধতা, বৃত্তিসমূহের সঠিক ক্রিয়া, সত্তার বিশদ, অকলুষ ও জ্ঞানদীপ্ত শৃঙ্খলা অসম্ভব; পরিবেশ ও বাহিরের সব প্রভাবের যদৃচ্ছার উপর ছেড়ে-দেওয়া বিভিন্ন কর্ম-ধারা পরস্পরের মধ্যে সংঘাতে এসে রুদ্ধ, পথভ্রষ্ট, বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত ক'রতে বাধ্য। ঠিক সেই রকম, শুদ্ধতা না থাকলে, সঠিক মননে, সঠিক সংকল্পে, সঠিক বেদনায় বা আধ্যাত্মিক অনুভূতির নিরাপদ স্থিতিতে সত্তার সম্পূর্ণ, সম.

১ বাহ্যস্পর্শ

নমনীয় একাগ্রতা সম্ভব নয়। সুতরাং এই দুটির একসাথে অগ্রসর হওয়া চাই যেন প্রত্যেকে সাহায্য করে অপরের বিজয় যতক্ষণ না আমরা লাভ করি সেই শাশ্বত শান্তি যা থেকে মানুষের মাঝে উদ্ভব হ'তে পারে সনাতন, সর্বসমর্থ ও সর্বদর্শী কার্যের কিছু আংশিক প্রতিমূর্তি।

কিন্তু ভারতবর্ষে জ্ঞানমার্গের যে ভাবে অনুশীলন হয় তাতে একাগ্রতা এক বিশেষ ও সংকীর্ণতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ মনের সকল বিক্ষেপকারী ক্রিয়া থেকে মননের সেই অপসারণ ও পরম একের ভাবনার উপর তার সেই একাগ্রতা যার দ্বারা অন্তঃপুরুষ উত্তরণ করে প্রাতিভাসিক থেকে এক সদ্‌বস্তুর মধ্যে। মননের দ্বারাই আমরা আমাদের বিকীর্ণ করি প্রাতিভাসিকের মধ্যে; আর মননকে তার নিজের মধ্যে আবার একত্র ক'রেই আমাদের নিজেদের ফিরিয়ে নেওয়া চাই সত্যের মধ্যে। একাগ্রতার তিনটি সামর্থ্য আছে যার দ্বারা এই লক্ষ্যসাধন সম্ভব। যে কোনো বিষয়ের উপর একাগ্রতার দ্বারা আমরা সমর্থ হই সেই বিষয়টিকে জানতে, তাকে তার প্রচ্ছন্ন সব রহস্য উন্মুক্ত করাতে। এই সামর্থ্যকে আমাদের ব্যবহার করা চাই বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য নয়, অনপেক্ষ সদ্‌বিষয় জানার জন্য। আবার একাগ্রতার দ্বারা সমগ্র সংকল্পকে একত্র করা সম্ভব হয় সেই বস্তু আহরণের জন্য যা এখনো অধরা, এখনো আমাদের অতীত; যদি এই সামর্থ্যকে পর্যাপ্ত শিক্ষা দেওয়া হয় আর এই সামর্থ্য যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে এক-চিত্ত ও অকপট, আত্ম-নিশ্চিত ও একমাত্র নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয় আর তার শ্রদ্ধা যদি একান্ত হয় তাহ'লে যে কোনো বিষয়েরই আহরণের জন্য তাকে আমাদের ব্যবহার করা সম্ভব, কিন্তু জগৎ যে নানাবিধ বিষয় আমাদের কাছে উপস্থাপিত করে সেসবের জন্য নয়, বরং তা ব্যবহার করা চাই আধ্যাত্মিকভাবে সেই বিষয় ধরার জন্য যা অন্বেষণের একমাত্র উপযুক্ত বস্তু এবং যা আবার জ্ঞানেরও একমাত্র উপযুক্ত বিষয়। আমাদের সমগ্র সত্তাকে তার যে কোনো একটি স্থিতির উপর একাগ্র করে আমরা যা ইচ্ছা করি তা-ই হ'য়ে উঠতে পারি; উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা আগে নানাবিধ দুর্বলতা ও ভয়ের পুঁটুলি থাকতাম, আমরা তার বদলে এমনকি হতে পারি ক্ষমতা ও সাহসের পাহাড় অথবা অতীব শুদ্ধতা, পবিত্রতা ও শান্তিপূর্ণ বা প্রেমের একমাত্র বিশ্বজনীন অন্তঃপুরুষ; কিন্তু বলা হয় যে এই সব জিনিষ হবার জন্য এই সামর্থ্যকে ব্যবহার করা আমাদের উচিত নয়, যদিও আমরা বর্তমানে যা তার তুলনায় এইসব

জিনিষ অনেক উচ্চস্তরের, বরং আমাদের উচিত, ঐ সামর্থ্য ব্যবহার করা তা-ই হবার জন্য যা সকল বিষয়ের ঊর্ধ্বে, সকল ক্রিয়া ও গুণমুক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ ও অনপেক্ষ পুরুষ। বাকী সবের, অপর সব একাগ্রতার যা মূল্য তা শুধু উচ্ছৃঙ্খল ও আত্ম-বিক্ষেপকারী মনন, সংকল্প ও সত্তাকে তাদের সুমহান্ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যসাধনের পথে প্রস্তুত করার জন্য, প্রাথমিক পদক্ষেপের জন্য, উত্তরোত্তর শিক্ষার জন্য।

একাগ্রতার অন্যপ্রকার অনুশীলনের মতো এইপ্রকার অনুশীলন থেকেও বোঝা যায় পূর্বে শুদ্ধিসাধন হ'য়েছে; আরো বোঝা যায় যে ইহার পরিণতি ত্যাগ, নিবৃত্তি এবং সর্বশেষে সমাধির একান্ত ও বিশ্বাতীত অবস্থায় উত্তরণ; যদি এই সমাধি পরাকাষ্ঠা লাভ করে ও স্থায়ী হয় তাহ'লে বোধ হয় লাখে একজন ছাড়া আর কেহই ফিরে আসে না। কারণ ঐ উপায়ে আমরা যাই "সনাতনের পরম ধামে যেখান থেকে পুরুষ আর প্রত্যাবর্তন করে না" প্রকৃতির কর্মচক্রের মধ্যে[১]; যে যোগীর লক্ষ্য জগৎ থেকে মোক্ষলাভ সে শরীর ত্যাগের সময়ে চায় এই সমাধিরই মধ্যে চিরদিনের মতো চলে যেতে। রাজযোগ সাধনায় আমরা এই পরম্পরা দেখি। কারণ রাজ-যোগীর কর্তব্য হ'ল প্রথম কিছু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা লাভ; মনের নিম্ন বা অধোমুখী কাজকর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত করা তার দরকার, আর পরে তার কর্তব্য হ'ল মনের সকল ক্রিয়াই বন্ধ করে নিজেকে সেই একটিমাত্র ভাবনায় একাগ্র করা যা নিয়ে যায় ক্রিয়া থেকে উপশমের অবস্থায়। রাজযোগে একাগ্রতার অনেকগুলি পর্যায় আছে, যেমন এক পর্যায়ে বিষয়টিকে গ্রহণ করা হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে ধারণ করা হয়, তৃতীয় পর্যায়ে মন সেই স্থিতির মধ্যে লীন হয় বিষয়টি যার চিত্র বা যা একাগ্রতার ফলস্বরূপ; আর শুধু শেষ পর্যায়টিকে রাজযোগে বলা হয় সমাধি যদিও পদটির আরো ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগ সম্ভব, যেমন গীতায় করা হ'য়েছে। কিন্তু রাজযোগের সমাধির মধ্যেও স্থিতিভেদে বিভিন্ন পর্যায় আছে যেমন এক পর্যায়ে মন বাহিরের সহিত সম্পর্কশূন্য হ'লেও তখনো মননের জগতে ধ্যান করে, চিন্তা করে, অনুভব করে; আর একটি পর্যায়ে মন তখনো প্রাথমিক মনন রূপায়ণে সমর্থ, এবং অন্য এক পর্যায়ে মনের সব বহির্ধাবন, এমনকি তার নিজের মধ্যেও, নিবৃত্ত হওয়ায় অন্তঃপুরুষ মন

১ যতো নৈব নিবর্তন্তে তৎ ধাম পরমম্ মম।

ছাড়িয়ে উর্ধ্বে ওঠে অব্যবহার্য ও অনুপাখ্যের নীরবতার মধ্যে। বস্তুতঃ সকল যোগেই মননের একাগ্রতাসাধনের সহায়স্বরূপ অনেক বিষয় আছে, যেমন রূপ, মননের বাচনিক সূত্র, অর্থপূর্ণ নাম; এ সকলই এই সাধন-করার কাজে মনের অবলম্বনস্বরূপ,[১] এসকলেরই ব্যবহার দরকার আবার তাদের অতিক্রম করাও দরকার; উপনিষদ বলে, শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হ'ল রহস্যপূর্ণ পদ "অউম্‌" যার তিনটি অক্ষর ব্রহ্ম বা পরমাত্মার তিনটি পাদের সূচক––জাগ্রত পুরুষ, স্বপ্ন পুরুষ ও সুষুপ্তি পুরুষ আর সমগ্র শক্তিশালী নাদ উর্ধ্বে ওঠে তার দিকে যা যেমন ক্রিয়ার অতীত, তেমন স্থিতিরও অতীত[২]। কারণ সকল জ্ঞানযজ্ঞেরই অন্তিম লক্ষ্য হ'ল বিশ্বাতীত (অতিষ্ঠা)।

কিন্তু পূর্ণযোগের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাতে এই লক্ষ্য আরো জটিল ও কম ব্যতিরেকী––কম ব্যতিরেকী এইভাবে যে আমরা যেমন অন্তঃপুরুষের পরতম অবস্থাকে সৎ বলি ও বাদ দিই না, তেমন দিব্য বিকিরণকেও অসৎ বলি না ও বাদ দিই না। একথা ঠিক যে আমাদের তাঁকে পাওয়া দরকার যিনি সর্বোত্তম, সকল কিছুর উৎস, আবার সর্বাতীত, কিন্তু যা তিনি অতিক্রম করেন তা বাদ দিয়ে নয়, বরং অন্তঃ-পুরুষের এক দৃঢ় অনুভূতি ও পরম অবস্থার উৎস হিসাবে যা অপর সকল অবস্থাকে রূপান্তরিত ক'রে আমাদের জগৎ সম্বন্ধীয় চেতনাকে পুনর্গঠিত করবে তার নিগূঢ় পরম সত্যের রূপে। বিশ্ব সম্বন্ধে সকল চেতনাকে আমরা আমাদের সত্তা থেকে উচ্ছেদ করতে চাই না, আমরা চাই ভগবান, সত্য এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে যেমন বিশ্বের মধ্যে তেমন তার অতীতেও। সুতরাং আমরা যে শুধু অনুপাখ্যকে চাইব তা নয়, আমরা তাঁর অভিব্যক্তিকেও চাইব যাতে তিনি অনন্ত সত্তা, চেতনা ও আনন্দরূপে বিশ্বকে আলিঙ্গন করে আছেন ও তার মধ্যে লীলারত। কারণ সেই ত্রিবিধ আনন্ত্যই তাঁর পরম অভিব্যক্তি এবং আমাদের আস্পৃহা হবে তা জানা, তাতে অংশ নেওয়া ও তা-ই হওয়া; আবার যেহেতু আমরা এই পরম ত্রিত্বকে উপলব্ধি করতে চাই শুধু তাঁর স্বরূপে নয়, তাঁর বিশ্বলীলার মধ্যেও, সেহেতু আমাদের আরো আস্পৃহা হবে তাঁর যে গৌণ অভিব্যক্তি, তাঁর যে দিব্য সম্ভূতি সেই বিশ্বাত্মক দিব্য সত্য, জ্ঞান, সংকল্প, প্রেমের জ্ঞানলাভে ও তাতে যোগদানে। ইহারও সহিত নিজেদের এক করতে আমাদের

১ অবলম্বন ২ মাণ্ডুক্য উপনিষদ

আস্পৃহা হবে, ইহারও দিকে উঠতে আমাদের চেষ্টা হবে, আর এই চেষ্টার পর্ব শেষ হ'লে আমরা আমাদের সকল অহং-ভাব ত্যাগ ক'রে ইহাকে সুযোগ দেব যেন ইহা আমাদের সত্তাতে নিজের মধ্যে উপরে আমাদের টেনে নেয় এবং আমাদের মধ্যে নেমে এসে আমাদের আলিঙ্গন করে তার সকল সম্ভূতিতে। এই সাধনা করা হবে শুধু যে তাঁর পরম অতিস্থিতির দিকে অগ্রসর হবার ও তাতে প্রবেশ করার উপায় হিসাবে তা নয়, তা করা হবে অ-তিষ্ঠাকে অধিগত করলেও ও তাঁর দ্বারা অধিগত হ'লেও বিশ্বের অভিব্যক্তির মধ্যে দিব্য জীবন সম্ভব করার জন্য।

আমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হ'তে হ'লে 'একাগ্রতা' ও 'সমাধি' এই দুটি কথার অর্থ আমাদের কাছে আরো সমৃদ্ধ ও গভীর হওয়া দরকার। আমাদের সকল একাগ্রতা দিব্য "তপঃ"-র শুধু এক প্রতিমূর্তিমাত্র আর ইহার দ্বারাই আত্মা যেমন নিজের মধ্যে সমাহিত হ'য়ে অবস্থান করেন, তেমন নিজের মধ্যে অভিব্যক্ত হন, অভিব্যক্তিকে পালন ও অধিগত করেন, আবার সকল অভিব্যক্তি থেকে নিবৃত্ত হন তাঁর পরম একত্বের মধ্যে। যখন সত্তা আনন্দের জন্য নিজের উপরেই চেতনার মধ্যে অধিষ্ঠান করেন তখন ইহা দিব্য তপঃ, আর যখন জ্ঞানসংকল্প চেতনার শক্তিতে নিজের উপর ও তাঁর সব অভিব্যক্তির উপর অধিষ্ঠিত হন, তখন ইহা দিব্য একাগ্রতার সার, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ। ভগবানের যে আত্ম-বিশেষণের মধ্যে আমরা বাস করি তা স্বীকার করা হলে একাগ্রতা সেই উপায় যার দ্বারা ব্যষ্টি পুরুষ নিজেকে এক করে আত্মার যে কোনো রূপ, অবস্থা বা মনস্তাত্ত্বিক আত্ম-অভিব্যক্তির (ভাব) সহিত এবং সেসবে প্রবিষ্ট হয়। ভগবানের সহিত একাত্মতা লাভের জন্য এই উপায় অবলম্বনই দিব্যজ্ঞান লাভের সর্ত এবং সকল জ্ঞানযোগের মূলসূত্র।

এই একাগ্রতা অগ্রসর হয় পরম ভাবনার দ্বারা আর তা মনন, রূপ ও নাম ব্যবহার করে চাবিকাঠি রূপে যা একাগ্র মনের কাছে উপস্থাপিত করে সকল মনন, রূপ ও নামের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন সত্যকে; কারণ এই ভাবনার মাধ্যমেই মনোময় পুরুষ ঊর্ধ্বে ওঠে সকল প্রকাশ ছাড়িয়ে সেই বস্তুতে যা প্রকাশিত হয়, সেই বস্তুতে যার শুধু যন্ত্র ঐ ভাবনা। ভাবনার উপর একাগ্রতার দ্বারা মনোময় সত্তা যা বর্তমানে আমরা আমাদের মানসিকতার প্রাকার ভেঙে ফেলে উপনীত হয় চেতনার সেই অবস্থায়, সত্তার সেই অবস্থায়, চিন্ময়সত্তার সামর্থ্যের ও চিন্ময়সত্তার আনন্দের সেই অবস্থায়

যার অনুরূপ ও যার প্রতীক, গতিবিধি, ও ছন্দ ঐ ভাবনা। সুতরাং ভাবনার দ্বারা একাগ্রতা হ'ল শুধু এক উপায়, এক চাবিকাঠি যা দিয়ে আমাদের কাছে উন্মুক্ত করা যায় আমাদের সত্তার বিভিন্ন অতিচেতন "লোক"; আত্ম-বিৎ, আত্ম-আনন্দময় সত্তার সেই অতিচেতন সত্য, ঐক্য ও আনন্ত্যের মধ্যে উত্তোলিত আমাদের সমগ্র সত্তার এক বিশেষ আত্ম-সমাহিত অবস্থাই লক্ষ্য ও পরাকাষ্ঠা; আর এই অর্থই আমরা দেব "সমাধি" কথাটিতে। ইহার অর্থ শুধু যে বাহ্য জগতের চেতনা থেকে নিবৃত্ত হ'য়ে, এমনকি আন্তর জগতের চেতনা থেকেও নিবৃত্ত হ'য়ে এমন এক অবস্থায় প্রবেশ করা যা উভয়েরই ঊর্ধ্বে অবস্থিত--তা সে উভয়ের বীজস্বরূপে হ'ক বা এমনকি তাদের বীজাবস্থারও অতীত হ'য়েই হ'ক--তা নয়; বরং ইহা হ'ল পরম এক ও অনন্তে যুক্ত ও একাত্ম হ'য়ে তাঁর মধ্যে দৃঢ় স্থিতি, আর এই স্থিতি অক্ষুণ্ণ থাকে যেমন আমাদের জাগ্রত অবস্থায় যখন আমরা বিষয়সমূহের রূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকি; তেমন তখনও যখন আমরা নিবৃত্ত হই সেই আন্তর ক্রিয়ার মধ্যে যা বিষয়সমূহের বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে, তাদের নাম ও জাতিরূপের লীলার মধ্যে অধিষ্ঠিত; অথবা তখনও যখন আমরা ঊর্ধ্বে উঠি স্থিতিক আন্তরচেতনার অবস্থায় যেখানে আমরা উপনীত হই বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে এবং সকল তত্ত্বের মূল তত্ত্ব যে নাম ও রূপের বীজ তার মধ্যে[১]। কারণ যে অন্তঃপুরুষ গীতার অর্থে আসল সমাধিতে উপনীত হ'য়ে তাতে প্রতিষ্ঠিত (সমাধিস্থ) হন--তিনি সকল অনুভূতির যে মূল বস্তু তার অধিকারী হন এবং অন্য কোনো অনুভূতিই তাঁকে সেখান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না তা এই সব অনুভূতি শিখরে-আরোহণ-করে-নি এমন ব্যক্তির পক্ষে যতই বিক্ষেপকারী হ'ক না কেন। তিনি সকল কিছুকেই আলিঙ্গন ক'রতে সক্ষম হন তাঁর সত্তার পরিধির মধ্যে, কোনো কিছুর দ্বারাই তিনি আবদ্ধ বা বিভ্রান্ত বা সীমিত হন না।

যখন আমরা এই অবস্থায় উপনীত হই যাতে আমাদের সকল সত্তা ও চেতনা একাগ্র থাকে তখন আর পরম ভাবনার উপর একাগ্রতার আবশ্যকতা থাকে না। কারণ সেখানে, সেই অতিমানসিক অবস্থায়, বিষয়সমূহের সব কিছুই উল্টে যায়। মন এমন এক জিনিস যা বাস করে আকীর্ণতায়, পরম্পরায়; ইহা শুধু এক সময়ে একটি জিনিসের উপরই একাগ্র হ'তে

১ অন্তঃপুরুষের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা।

সক্ষম, আর যখন ইহা একাগ্র হয় না তখন ইহা অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ছোটাছুটি করে। সুতরাং তার একাগ্র হওয়া দরকার একটিমাত্র ভাবনায়, ধ্যানের একটিমাত্র প্রসঙ্গে, মনোনিবেশের একটিমাত্র বিষয়ে, সংকল্পের একটিমাত্র উদ্দেশ্যে তবেই যদি ইহা সক্ষম হয় তাকে পেতে বা আয়ত্তে আনতে, আর ইহা তার করা চাই অন্ততঃ সাময়িক-ভাবে অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে। কিন্তু যে তত্ত্ব মানসোত্তর এবং যার মধ্যে আমরা উঠতে চাই তা মননের চঞ্চল ধারা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভাবনাসমূহের বিভাজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভগবান নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত এবং যখন তিনি বিভিন্ন ভাবনা ও কার্য বাহিরে নিক্ষেপ করেন, তখন তিনি নিজেকে বিভক্ত করেন না বা তাদের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করেন না, বরং তাদের ও তাদের গতিবিধিকে তিনি ধারণ করেন তাঁর আনন্ত্যের মধ্যে; অবিভক্ত হ'য়েও তাঁর সমগ্র আত্মা থাকে প্রতি ভাবনা ও প্রতি গতিবিধির পশ্চাতে এবং একই সময় ইহা থাকে সকল কিছুর সমষ্টির পশ্চাতে। তাঁর দ্বারা বিধৃত হ'য়ে প্রতি বিষয়টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে বিকশিত করে, কোনো পৃথক সংকল্প-ক্রিয়ার মাধ্যমে নয়, বরং তার পশ্চাতের চেতনার সাধারণ শক্তির দ্বারা; যদি আমাদের মনে হয় যে প্রত্যেকের মধ্যে দিব্য সংকল্প ও জ্ঞানের একাগ্রতা বর্তমান তবে সে একাগ্রতা বহুবিধ ও সম, ইহা কোনো ব্যতিরেকী একাগ্রতা নয়, বরং আত্মসমাহিত ঐক্য ও আনন্ত্যের মধ্যে স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রণালীই ইহার সত্যতা। যে অন্তঃপুরুষ দিব্য সমাধিতে উঠেছেন তিনি তাঁর প্রাপ্তির মাপ অনুযায়ী যোগদান করেন বিষয়সমূহের পরাবর্তিত অবস্থায়,—আর এই পরাবর্তিত অবস্থাই সত্যকার অবস্থা, কারণ যা আমাদের মানসিকতার উল্টো অর্থাৎ পরাবর্তিত অবস্থা তা-ই সত্য। এই কারণেই, যেমন প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে—যে ব্যক্তি আত্মার অধিকার লাভ করেছেন, তাঁর আর মননে ও চেষ্টায় একাগ্র-তার প্রয়োজন থাকে না, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই জ্ঞান বা ফল লাভ করেন যা তাঁর অন্তঃস্থ ভাবনা বা সংকল্প আলিঙ্গন করতে বাহিরে প্রবৃত্ত হয়।

সুতরাং এই দৃঢ় দিব্যস্থিতি লাভ করাই আমাদের একাগ্রতার লক্ষ্য হওয়া চাই। একাগ্রতাসাধনে প্রথম করণীয় হ'ল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন ইহা কোনো একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয় আর

ইহা তার করা চাই-ই এমনভাবে যাতে ইহা তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন, ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে বিক্ষিপ্ত না হয়। আমাদের সাধারণ জীবনে এরূপ একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনো বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতাসাধন আরো দুরূহ হয়ে ওঠে; অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য।[১] আবার ইহাও দরকার যে ইহা যেন শুধু বুদ্ধিগত চিন্তাবিৎ-এর সেই ক্রমানুয়ী মনন না হয় যার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলিকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা। সম্ভবতঃ প্রথম অবস্থায় ছাড়া যা চাওয়া হয় তা যুক্তির ধারা ততটা নয়, যতটা সেই ভাবনার ফলপ্রদ সারতত্ত্বের উপর যথাসম্ভব অধিষ্ঠান করা যা তার উপর অন্তঃপুরুষের সংকল্পের আগ্রহের জন্য সত্যের সকল দিকই প্রকাশ ক'রতে বাধ্য। এইরকম যদি দিব্য প্রেম ধ্যানের প্রসঙ্গ হয় তাহ'লে প্রেমস্বরূপ ভগবানের ভাবনার সারতত্ত্বের উপর মনের এমনভাবে একাগ্র হওয়া উচিত যাতে দিব্য প্রেমের নানাবিধ অভিব্যক্তির জ্যোতির্ময় অভ্যুদয় হয় সাধকের শুধু মননে নয়, তার হৃদয়ে, সত্তায় ও দর্শনেও। হয়ত প্রথম আসে মনন ও তার পর অনুভূতি কিন্তু ইহা সমানই সম্ভব যে অনুভূতি প্রথম আসে আর অনুভূতি থেকেই জ্ঞানের উদয় হয়। পরে উপলব্ধ অনুভূতিতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে তাকে উত্তরোত্তর অধিগত ক'রতে হবে যতক্ষণ না ইহা স্থায়ী অনুভূতিতে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত হ'য়ে ওঠে সত্তার ধর্ম বা বিধান।

ইহাই একাগ্রতাপূর্ণ ধ্যানের প্রণালী; কিন্তু আরো আয়াসসাধ্য পদ্ধতি হ'ল সমগ্র মনকে একাগ্রতায় শুধু ভাবনার সারতত্ত্বে নিবদ্ধ করা যাতে উপনীত হওয়া যায় ভাবনার পশ্চাতে বস্তুটির স্বরূপে, প্রসঙ্গটির মনন জ্ঞানে নয়, বা মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিতে নয়। এই প্রণালীতে মনন নিবৃত্ত হ'য়ে পরিণত হয় বিষয়ের তন্ময় বা আনন্দপূর্ণ অবধারণে অথবা আন্তর সমাধিতে তার মধ্যে নিমজ্জনে। যদি এই প্রণালী অনুসরণ করা হয় তাহ'লে পরে আমাদের কর্তব্য হ'ল আমরা যে অবস্থাতে উঠি সে অবস্থাকে আবার নিম্নে আহ্বান করা যাতে ইহা অবর সত্তাকে অধিগত করে ও তার

১ আভ্যন্তরীণ বিতর্ক ও বিচারের প্রাথমিক পর্যায়ে, মিথ্যাভাবনাসমূহের সংশোধন এবং বুদ্ধিগত সত্যে পৌছানর জন্য।

আলো সামর্থ্য ও আনন্দ বর্ষণ করে আমাদের সাধারণ চেতনার উপর। কারণ তা না হ'লে আমরা তাকে উন্নত অবস্থায় বা আন্তর সমাধির মধ্যে অধিগত করতে পারি, যেমন অনেকেই করে,——কিন্তু যখন আমরা জেগে উঠব অথবা জগতের সব সংস্পর্শের মধ্যে অবতরণ করব তখন তা আমাদের হাতছাড়া হ'য়ে যাবে; আর এই অর্ধ-ছিন্ন উপলব্ধি পূর্ণযোগের লক্ষ্য নয়।

আর একটি তৃতীয় প্রণালী আছে যাতে প্রথমে বিষয়টি সম্বন্ধে আয়াস-সাধ্য ধ্যানের একাগ্রতাসাধন বা মননদৃষ্টির বিষয়টির আয়াসসাধ্য অব-ধারণ করা হয় না, বরং তাতে প্রথমেই মনকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ করা হয়। এই নিস্তব্ধতা আনা যায় নানা উপায়ে; একটি উপায় হ'ল মানসিক ক্রিয়া থেকে পুরোপুরি সরে দাঁড়িয়ে তাতে যোগ না দিয়ে, শুধু তা নিরীক্ষণ করা যতক্ষণ না ঐ ক্রিয়া তার অননুমোদিত লাফালাফি ও ছোটাছুটিতে ক্লান্ত হ'য়ে উত্তরোত্তর শান্ত হ'তে থাকে ও শেষে সম্পূর্ণ শান্ত হ'য়ে পড়ে। আর একটি উপায় হ'ল সব মনন-আভাসন প্রত্যাখ্যান করা, যখনই সেগুলি আসে তখনই মন থেকে সেসব দূরে নিক্ষেপ করা এবং দৃঢ়ভাবে সত্তার সেই প্রশান্তিকে ধরে থাকা যা মনের বিক্ষোভ ও উদ্দামতার পশ্চাতে সর্বদা সত্যই বিরাজমান। যখন এই নিগূঢ় প্রশান্তির আবরণ উন্মোচিত হয় তখন সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এক মহতী শান্তি আর তখন তার সহিত সাধা-রণতঃ আসে সর্বব্যাপী নীরব ব্রহ্মের বোধ ও অনুভূতি, আর অন্য সব কিছু প্রথমে মনে হয় শুধু রূপ ও ছায়া। এই শান্তিকে ভিত্তি করে আর সব কিছুই গঠন করা সম্ভব, তবে তা আর বিষয়সমূহের বাহ্যরূপের জ্ঞান ও অনুভূতিতে হবে না, তা হবে দিব্য অভিব্যক্তির গভীরতর সত্যের জ্ঞান ও অনুভূতিতে।

সাধারণতঃ একবার এই অবস্থালাভ হ'লে আয়াসসাধ্য একাগ্রতার প্রয়োজন আর অনুভব হয় না। তার স্থলে আসবে সংকল্পের[১] স্বচ্ছন্দ একাগ্রতা যা মননকে ব্যবহার করবে বিভিন্ন অবর অঙ্গকে আভাসন ও আলোক দেওয়ার জন্য। এই সংকল্প তখন জোর ক'রে চাইবে যে অন্নময় সত্তা, প্রাণিক জীবন, হৃদয় ও মন যেন নিজেদের পুনর্গঠন করে ভগবানের সেইসব রূপে যেগুলি নিজেদের প্রকট করে নীরব ব্রহ্ম থেকে। অঙ্গসমূহের

১ এই বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে আত্ম-সিদ্ধি যোগের প্রসঙ্গে।

পূর্ব প্রস্তুতি ও শুদ্ধি অনুযায়ী তারা দ্রুত বা মন্থর গতিতে বাধ্য হবে অল্প-বিস্তর সংগ্রামের পর সংকল্প ও ইহার মনন-আভাসনের বিধান মেনে চলতে, যাতে শেষ পর্যন্ত ভগবানের জ্ঞান আমাদের চেতনাকে অধিগত করে ইহার সকল ভূমিতে এবং ভগবানের প্রতিমূর্তি নির্মিত হয় আমাদের মানব-জীবন যেমন নির্মিত হয়েছিল প্রাচীন বৈদিক সাধকদের দ্বারা। পূর্ণযোগের জন্য ইহাই সবচেয়ে সরল ও শক্তিশালী সাধনা।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্যাগ

শুদ্ধিকরণ ও একাগ্রতার দ্বারা আমাদের সত্তার সকল অঙ্গের শিক্ষাকে যদি বলা যায় যোগ-শরীরের দক্ষিণ হস্ত, তাহ'লে ত্যাগ হ'ল তার বাম হস্ত। শিক্ষা বা সুনির্দিষ্ট অনুশীলনের দ্বারা আমরা আমাদের মধ্যে সুদৃঢ় করি বিষয়সমূহের সত্য, সত্তার সত্য, জ্ঞানের সত্য, প্রেমের সত্য, কর্মের সত্য আর এইসব দিয়ে সরিয়ে দিই সেই সব মিথ্যা যা আমাদের প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন বা বিকৃত করেছিল; ত্যাগের দ্বারা আমরা মিথ্যাগুলিকে ধ'রে, তাদের মূল উৎপাটন ক'রে সেসবকে আমাদের পথ থেকে দূরে ফেলে দিই যাতে তারা টিকে থাকার চেষ্টা ক'রে, প্রতিরোধ তুলে বা বারবার ফিরে এসে আমাদের দিব্য জীবনযাত্রার সুখময় ও সুসঙ্গত উপচয়কে আর না ব্যাহত করে। ত্যাগ হ'ল আমাদের সিদ্ধিলাভের জন্য এক অপরিহার্য যন্ত্র।

এই ত্যাগের পরিধি কতদূর বিস্তৃত? কি তার প্রকৃতি হবে, কিভাবেই বা তার প্রয়োগ হবে? মহতী ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা এবং গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির মহাপুরুষগণ দীর্ঘকাল ধরে যে এক সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যকে অনুমোদন ক'রে এসেছেন তার কথা এই যে ত্যাগ যে শুধু শিক্ষা হিসাবে সম্পূর্ণ হবে তা নয়, সাধ্য হিসাবেও ইহা সুনির্দিষ্ট ও চরম হবে, নিজের জীবন ও আমাদের ঐহিক সত্তাকেও ত্যাগ করা চাই, তার কম হ'লে চলবে না। এই বিশুদ্ধ, উন্নত ও মহীয়ান্ ঐতিহ্য গড়ে ওঠার কারণ অনেক। প্রথম গভীরতর কারণ হ'ল আমাদের মানব বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে এখনকার জাগতিক জীবনের কলুষময় ও অপূর্ণ প্রকৃতির সহিত আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার প্রকৃতির আমূল বিরোধ; আর এই বিরোধের পরিণাম হ'ল জাগতিক জীবনের সম্পূর্ণ বর্জন এই যুক্তিতে যে ইহা এক মিথ্যা, অন্তঃপুরুষের উন্মত্ততা, উদ্বেগপূর্ণ দুঃখের স্বপ্ন অথবা বড় জোর এক দোষযুক্ত আপাতসুন্দর নিঃসারপ্রায় বস্তু, আর না হয় বর্ণনা করা হয় যে ইহা প্রলোভনের রাজত্ব আর সুতরাং ভগবদ্‌চালিত ও ভগবদ্-আকৃষ্ট পুরুষের পক্ষে ইহা শুধু অগ্নিপরীক্ষা ও প্রস্তুতির স্থান, অথবা ইহা বড়জোর

সবসত্তা ভগবানের এক লীলা, পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যসমূহের এক ক্রীড়া যা তিনি শ্রান্ত হ'য়ে পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় কারণ হ'ল ব্যক্তিগত মোক্ষের জন্য অন্তঃপুরুষের বুভুক্ষা, পরিশ্রম ও সংগ্রামের উদ্বেগ থেকে মুক্ত অবিমিশ্র আনন্দ ও শান্তির কোনো উচ্চতর বা উচ্চতম শিখরে পলায়নের আকাঙ্ক্ষা; আর না হয় দিব্য আলিঙ্গনের নিবিড় আনন্দ ছেড়ে কর্ম ও সেবার অবর ক্ষেত্রে ফিরে আসায় তার অনিচ্ছা। কিন্তু তাছাড়া অন্য ছোট ছোট কারণও আছে যা আধ্যাত্মিক অনুভূতির সহিত প্রসঙ্গক্রমে জড়িত—আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও উপলব্ধির জীবনের সহিত কর্মবহুল জীবনের সংযোগ সাধন যে অতীব দুরূহ ইহা প্রবলভাবে বোধ করা ও সে সম্বন্ধে কার্যতঃ প্রমাণ পাওয়া এক কারণ, আবার আমরা ইচ্ছা ক'রে এই দুরূহতাকে বাড়িয়ে বলি যে এই কাজ অসম্ভব; অন্য এক কারণ হ'ল ত্যাগের কাজে ও অবস্থাতে মন যে আনন্দ পেতে শুরু করে তাই—আর বাস্তবিকই মন যা কিছু পায় বা যাতে নিজেকে অভ্যস্ত করে তাতেই সে আনন্দ পায়—আর এই ত্যাগের আনন্দের সহিত আছে জগৎ এবং মানুষের কামনার সব বস্তুগুলির প্রতি উদাসীনতা থেকে পাওয়া প্রশান্তি ও মুক্তির বোধ। সব চেয়ে হীনতম কারণগুলি হ'ল—দুর্বলতা যা সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে আসে, মহান্ জাগতিক পরিশ্রমে ভগ্নোদ্যম পুরুষের বিতৃষ্ণা ও নৈরাশ্য, সেই স্বার্থপরতা যাতে আমরা মৃত্যু ও পুনর্জন্মের সদা-ঘূর্ণায়মান করাল চক্র থেকে নিজেরা মুক্তি পেলেই সন্তুষ্ট থাকি, কিন্তু যারা আমাদের পিছনে পড়ে রইল তাদের কি হ'ল সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাই না, আয়াসরত মানবকুল থেকে যে আর্তনাদ ওঠে তার প্রতি উপেক্ষা।

পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে এসব কারণের কোনোটিই যুক্তিযুক্ত নয়। দুর্বলতা ও স্বার্থপরতার সহিত তার কোনো কারবারই থাকতে পারে না, তা তারা যতই আধ্যাত্মিকপ্রবণ বা আধ্যাত্মিকবেশী হ'ক; দিব্য বল ও সাহস, দিব্য করুণা ও পরোপকারিতা এই সবকেই সে করতে চাইবে তার জীবনের উপাদান, ইহারাই ভগবানের সেই প্রকৃতি যা সে পরিধান করতে চাইবে আধ্যাত্মিক আলো ও সৌন্দর্যের পরিচ্ছদ হিসাবে। সেই বিরাট চক্রের আবর্তনে তার কোনো ভয় বা বিভ্রান্তির বোধ আসে না; সে তার অন্তঃপুরুষের মধ্যে ইহার ঊর্ধ্বে উঠে উপর থেকে জানে তাদের দিব্য বিধান, তাদের দিব্য উদ্দেশ্য। মানবজীবন যাত্রার সহিত দিব্য জীবনের সুসঙ্গতি সাধন, ভগবানের মধ্যে থাকা, অথচ আবার মানবের মধ্যে থাকা

---ইহা দুরূহ হ'লেও, এই দুরূহ সমস্যা সমাধানের জন্যই এখানে সে ব্রতী, এই সমস্যা এড়াবার জন্য নয়। এই জ্ঞান তার হ'য়েছে যে আনন্দ, প্রশান্তি ও মোক্ষ এক অপূর্ণ বিজয়মুকুট, কোনো আসল প্রাপ্তি নয় যদি না তারা এমন এক অবস্থা গড়ে তোলে যা নিজে নিজেই নিরাপদ, অন্তঃ-পুরুষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, নিঃসঙ্গতা বা নিষ্ক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল নয় বরং ঝড়ঝঞ্ঝা, ছোটাছুটি ও যুদ্ধবিগ্রহেও দৃঢ় থাকে, জগতের আনন্দে বা তার কষ্টভোগে কলুষিত হয় না। দিব্য আলিঙ্গনের নিবিড় আনন্দ থেকেও সে বঞ্চিত হবে না কারণ সে কাজ করে মানবজাতির মধ্যে ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেমের টানে; অথবা যদি মনে হয় যে সে ঐ আনন্দ থেকে কিছুক্ষণের জন্য বঞ্চিত হয়েছে তাহ'লেও সে অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝে যে তা পাবার জন্য তার নিজের পদ্ধতিতে যে অপূর্ণতা আছে তা তার থেকে দূর করার জন্যই তাকে আর একটু পরীক্ষা করা হ'চ্ছে। ব্যক্তিগত মোক্ষের জন্য সে আগ্রহী নয়, তবে সে ইহা চায় মানবের পরিপূর্ণতার জন্য আর এইজন্য যে যে ব্যক্তি নিজে বন্ধনের মধ্যে, সে সহজে অপরকে মুক্ত করতে অক্ষম---যদিও ভগবানের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়; ব্যক্তিগত আনন্দের স্বর্গে যেমন তার আকাঙ্ক্ষা নেই, তেমন ব্যক্তিগত কষ্টভোগের নরকেও তার ভয় নেই। যদি আধ্যাত্মিক জীবন ও জাগতিক জীবনের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে এখানে সে রয়েছে সেই ব্যবধান দূর করতে, সেই বিরোধকে সুসঙ্গতিতে রূপান্তরিত করতে। যদি জগৎ ঐহিক সুখ-ভোগ ও শয়তানের রাজত্ব হয়, তাহ'লে সেই কারণেই তো অমৃতের পুত্রদের আরো বেশী কর্তব্য হবে এখানে এসে তাকে জয় করা ভগবান ও পরম চিৎ-পুরুষের জন্য। যদি জীবন উন্মত্ততা হয় তাহ'লে কর্তব্য হবে লক্ষ লক্ষ মানবকে দিব্য যুক্তির আলোর মধ্যে আনা; যদি ইহা স্বপ্ন হয় আর সে স্বপ্ন যখন অত লোকের কাছে বাস্তব সত্য, তাহ'লে কর্তব্য হবে তাদের আরো মহৎ স্বপ্ন দেখান, নয় তো জাগিয়ে তোলা; যদি ইহা মিথ্যা হয়, তাহ'লে দরকার হ'ল বিভ্রান্তদের সত্য দেওয়া। আর যদি বলা হয় যে জগৎ থেকে পলায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়েই জগৎকে আমরা বেশী সাহায্য করতে পারি, সেকথাও আমরা স্বীকার করব না কারণ আমরা এই বিপ-রীত দৃষ্টান্ত দেখি যে বড় বড় অবতারগণ এখানে আসেন এই দেখাতে যে বর্তমান জাগতিক জীবন বর্জন করে যে আমরা শুধু জগতের সাহায্যে করতে পারি তা নয়, বরং আরো বেশী সাহায্য করতে পারি ঐ জীবন

স্বীকার ক'রে ও উন্নত ক'রে। আর যদি ইহা সর্বসত্তার খেলা হয় তাহ'লে তো আমরাও সেই খেলায় নেমে আমাদের যে খেলা তা খেলতে পারি খুসী মনে ও সাহসের সহিত, আমরাও সেই লীলায় আনন্দ পেতে পারি আমাদের দিব্য লীলাসহচরের সাথে।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কারণ এই যে জগৎকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি তাতে জগৎ-জীবন ত্যাগ করার প্রশ্ন আসে না যতক্ষণ আমরা ইহার উদ্দেশ্যসাধনে ভগবান ও মানবের কোনো সহায় হ'তে পারি। আমরা জগৎকে সয়তানের রচনা বা অন্তঃপুরুষের আত্ম-বিভ্রম ব'লে দেখি না, আমরা দেখি তাকে ভগবানের অভিব্যক্তিরূপে, যদিও এখনো ইহা আংশিক অভিব্যক্তি, তবে উত্তরোত্তর প্রকাশমান ও বিবর্তনশীল। সুতরাং আমাদের কাছে যেমন জীবনত্যাগ জীবনের লক্ষ্য হ'তে পারে না তেমন জগৎ-বর্জনও জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। আমরা চাই ভগবানের সহিত আমাদের ঐক্য উপলব্ধি করতে কিন্তু আমাদের কাছে এই উপলব্ধির অর্থ মানবের সহিত আমাদের ঐক্যের সম্পূর্ণ ও একান্ত অনুভব আর আমরা এ দুটিকে আলাদা করতে অক্ষম। খৃষ্টীয় ভাষায় বলা যায় ভগবানের পুত্রই আবার মানবের পুত্র আর সম্পূর্ণ 'খৃষ্টত্ব'র জন্য দুইটি উপাদানই প্রয়োজনীয়; অথবা ভারতীয় মননের প্রকাশ ভঙ্গিতে বলা যায় যে ভগবান নারায়ণের একটিমাত্র রশ্মি এই বিশ্ব, তিনি নরের মধ্যে প্রকট ও চরিতার্থ হন; সম্পূর্ণ নর নর-নারায়ণ আর এই সম্পূর্ণতার মধ্যেই তিনি সৃষ্টির পরম রহস্যের প্রতীক।

সুতরাং আমাদের কাছে ত্যাগ হওয়া চাই এক সাধন মাত্র, কোনো উদ্দেশ্য নয়; আবার ইহা যে একমাত্র বা প্রধান সাধন হবে তা-ও নয়, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের মাঝে ভগবানের চরিতার্থতা, আর এই সদর্থক লক্ষ্যসাধন নেতিবাচক উপায়ে সম্ভব নয়। নেতিবাচক উপায় অবলম্বন করা যায় শুধু চরিতার্থতা সাধনের অন্তরায়ের অপসারণের জন্য। অবশ্য ত্যাগ চাই-ই—যা সব দিব্য চরিতার্থসাধনের বিপরীত বা বিরুদ্ধ সেসবের সম্পূর্ণ ত্যাগ আর যা সব কম বা আংশিক সিদ্ধি সেসবের উত্তরোত্তর ত্যাগ। আমাদের জাগতিক জীবনের প্রতি কোনো আসক্তি রাখা চলবে না; যদি কোনো আসক্তি থাকে, সে আসক্তি ত্যাগ করা চাই, আর তা ত্যাগ করা চাই সম্পূর্ণভাবে; কিন্তু সেইরকম জগৎ থেকে পলায়ন, বা মোক্ষ বা মহান্ আত্ম-নাশেরও প্রতি আমাদের কোনো আসক্তি থাকা চলবে

না; আর যদি এইরূপ আসক্তি থাকে, তা-ও আমাদের ত্যাগ করা চাই, আর তা ত্যাগ করা চাই সম্পূর্ণভাবে।

আবার স্পষ্টতঃই আমাদের ত্যাগ হওয়া চাই আন্তর ত্যাগ; বিশেষতঃ এবং সর্বোপরি আমাদের ত্যাগ করা চাই--ইন্দ্রিয় ও হৃদয়ের মধ্যে আসক্তি ও কামনার লালসা, মনন ও ক্রিয়াতে একগুঁয়েমি, এবং চেতনার কেন্দ্রে অহং-ভাব। কারণ এই তিনটি তিন গ্রন্থিস্বরূপ যার দ্বারা আমরা অবর প্রকৃতির সহিত বদ্ধ থাকি, আর যদি এগুলিকে আমরা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে সক্ষম হই তাহ'লে আর কোনো কিছু এমন নেই যা আমাদের বাঁধতে পারে। সুতরাং আসক্তি ও কামনা বর্জন করা চাই নিঃশেষে; জগতে এমন কিছুই নেই যাতে আমাদের আসক্ত থাকতেই হবে, ধন নয়, দারিদ্র্য নয়, আনন্দ নয়, কষ্টভোগ নয়, জীবন নয়, মৃত্যু নয়, মহত্ত্ব নয়, ক্ষুদ্রতা নয়, পাপও নয়, পুণ্যও নয়, বন্ধু, স্ত্রী, কি সন্তান কেউ নয়, দেশ বা আমাদের কর্ম, ব্রত নয় বা স্বর্গ, মর্ত্য নয়, এদের মধ্যে কিছু নয়, এদের বাইরেও কিছু নয়। তবে ইহার অর্থ এই নয় যে আমাদের ভালোবাসার আদৌ কিছু নেই, আমাদের আনন্দ পাবার কিছু নেই; কারণ আসক্তি হ'ল ভালোবাসার মধ্যে অহং-ভাব, স্বয়ং ভালোবাসা অর্থাৎ প্রেম নয়, কামনা হ'ল আমোদ ও তৃপ্তির জন্য বুভুক্ষার মাঝে সংকীর্ণতা ও অস্থিরতা, ইহা বিষয়সমূহের মধ্যে দিব্য আনন্দলাভের অন্বেষণ নয়। আমাদের পাওয়া চাই এক বিশ্বজনীন প্রেম যা শান্ত অথচ চিরন্তন প্রখর--এত প্রখর যে সবচেয়ে প্রচণ্ড ভাবাবেগের ক্ষণিক তীব্রতাকেও ইহা ছাড়িয়ে যায়; আর চাই বিষয়সমূহের মধ্যে সেই আনন্দ যা দৃঢ়মূল ভগবদ্-আনন্দের, যা বিষয়সমূহের বিভিন্ন রূপের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়, তবে সংশ্লিষ্ট তার সহিত যাকে তাবা নিজেদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছে এবং যা বিশ্বকে আলিঙ্গন করে তার জালে আবদ্ধ না হ'য়ে।[১]

আমরা আগেই দেখেছি যে দিব্য কর্মমার্গে সিদ্ধি পেতে হ'লে মনন ও ক্রিয়াতে আমাদের একগুঁয়েমি সম্পূর্ণ বর্জন করা দরকার; দিব্যজ্ঞানেও সিদ্ধি পেতে হ'লে ইহাকে ঠিক তেমনই সম্পূর্ণ ত্যাগ করা প্রয়োজন। এই একগুঁয়েমির অর্থ মনের অহংভাব কারণ মন আসক্ত থাকে তাব সব

১ নির্লিপ্ত--বিষয়সমূহে দিব্য আনন্দ নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত অর্থাৎ কামনাশূন্য ও সেজন্য নিরাসক্ত।

রুচি অরুচিতে, অভ্যাসে এবং মনন ও দৃষ্টিভঙ্গি ও সংকল্পের অতীত বা বর্তমান গঠনে কেননা এসবকে ইহা মনে করে নিজ বা নিজের ব'লে আর তাদের চারিদিকে 'আমি'ত্ব-র বা "আমার"ত্ব-র সূক্ষ্ম সূতার জাল বুনে মাকড়সার মতো বাস করে সেই জালের মধ্যে। যেমন মাকড়সা তার জালের উপর কোনো আক্রমণে বিরক্ত হয়, মনও তেমন বর্তমান অবস্থার কোনো নাড়ানাড়ি ভালবাসে না, আর মাকড়সা যেমন নিজের জাল ছাড়া অন্য জালে অপরিচিত বোধ করে, তেমন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও গঠনের মধ্যে নিয়ে আসা হলে মনও অপরিচিত ও অসুখী বোধ করে। এই আসক্তিকে মন থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা চাই। অপ্রবুদ্ধ মন যেভাবে জগৎ ও জীবনের সহিত তার স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে লিপ্ত থাকে শুধু যে সেই সাধারণ মনোভাব আমাদের ত্যাগ করা দরকার তা নয়; আমাদের নিজেদের কোনো মানসিক রচনায় বা কোনো বুদ্ধিগত মনন-গঠনে বা ধর্মীয় মতবাদে বা ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তেও আবদ্ধ থাকা আমাদের উচিত নয়; আমাদের যে শুধু মন ও ইন্দ্রিয়ের জাল ছিন্ন করা কর্তব্য তা নয়, চিন্তাবিৎএর জাল, ধর্মোপদেষ্টা ও সম্প্রদায়ের জাল, কথার ফাঁদ, ও ভাবনার বাঁধনেরও ঊর্ধ্বে আমাদের যাওয়া দরকার। এইসব আমাদের মধ্যে অপেক্ষা করে আছে চিৎ-পুরুষকে রূপের মধ্যে আবদ্ধ করতে; কিন্তু আমাদের কর্তব্য সর্বদা উপরে যাওয়া, সর্বদাই ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করা চাই আরো বৃহতের জন্য, সান্তকে ত্যাগ করা চাই অনন্তের জন্য; আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে যেন আমরা অগ্রসর হ'তে পারি এক জ্যোতি থেকে অন্য জ্যোতিতে, এক অনুভূতি থেকে অন্য অনুভূতিতে, অন্তঃপুরুষের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়, তবেই তো আমরা পেতে পারি ভগবানের চরম অতিস্থিতি, তাঁর চরম বিশ্বভাব। এমনকি যে সত্যগুলি আমরা অকাট্য মনে করি সেগুলিতেও আমাদের আসক্ত থাকা উচিত নয়, কেননা এসব অনুপাখ্যের রূপ ও বহিঃপ্রকাশ অথচ অনুপাখ্যকে কোনো রূপ বা প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না; উপর থেকে আসা যে পরতর বাক্ নিজের অর্থের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না তার দিকে, যে দিব্য মনন নিজের মধ্যেই নিজের বিপরীত বহন করে তার আলোর দিকে আমাদের কর্তব্য নিজেদের উন্মুক্ত রাখা।

কিন্তু সকল প্রতিরোধের কেন্দ্র হ'ল অহং-ভাব, আর আমাদের কর্তব্য হ'ল ইহাকে খোঁজা প্রতি গুপ্ত স্থানে ও ছদ্মবেশে, আর সেখান থেকে টেনে

বার ক'রে তাকে বধ করা; কারণ ইহার ছদ্মবেশের অন্ত নেই, সম্ভবপর আত্মগোপনের সকল স্থানেই ইহা আঁকড়ে থাকে। প্রায়শঃই পরোপকারিতা ও উপেক্ষা তার সব চেয়ে সফল ছদ্মবেশ; তাকে খুঁজে বার করার জন্য যেসব দিব্য দূতকে পাঠান হয় তাদের সামনেই ইহা ঐ বেশে দাপটের সহিত তার তাণ্ডব লীলা চালায়। এই ক্ষেত্রে পরম জ্ঞানের সূত্র আমাদের সহায় হয়; আমাদের মূল স্থিতিতে এই সব পার্থক্য আমাদের কাছে নিরর্থক, কারণ কোনো আমি নেই, কোনো তুমি নেই, আছেন শুধু এক দিব্য আত্মা যিনি সকল মূর্ত রূপের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান, ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে সম, আর তাঁকে উপলব্ধি করা, তাঁকে প্রকাশ করা, তাঁকে সেবা করা এবং তাঁকে চরিতার্থ করাই একমাত্র কাজের কাজ। আত্ম-তৃপ্তি ও পরোপকারিতা, ভোগ ও উপেক্ষা—এসব মূল জিনিস নয়। যদি 'একমেব' পরমাত্মার উপলব্ধি, চরিতার্থতা ও সেবার জন্য আমাদের এমন কাজ করা দরকার হয় যা অপরের কাছে মনে হয় অহংভাব-পূর্ণ আত্ম-সেবা বা আত্ম-প্রচার বা মনে হয় অহমাত্মক ভোগ ও আত্ম-পরায়ণতা তাহ'লেও সে কাজ করা আমাদের কর্তব্য; লোকের মতামত অপেক্ষা অন্তঃস্থ দিশারীর নির্দেশ অনুসারেই আমাদের চলা চাই। পরিবেশের প্রভাবের কাজ প্রায়শঃই হয় অতি সূক্ষ্মভাবে; বাইরে থেকে লোকের চোখে আমাদের যাতে সবচেয়ে ভালো দেখায় আমরা তা-ই বেশী পছন্দ করি আর একরকম না জেনেই সেই বেশ ধরি, আর ভিতরের চোখের উপব পর্দা পড়তে দিই। দারিদ্র্যের প্রতিজ্ঞার, বা সেবার বেশের বা উদাসীনতা বা ত্যাগ ও নিষ্কলঙ্ক সাধুত্বের বাহ্য প্রমাণের সাজ পরতেই আমাদের আকর্ষণ, কারণ ঐতিহ্য ও জনমত তাই-ই চায়, আর এইভাবেই আমরা বেশী সক্ষম হই আমাদের পরিবেশের উপর ছাপ রাখতে। কিন্তু এসবই মিথ্যা আত্ম-গরিমা ও বিভ্রান্তি। হয়ত আমাদের এই সব বেশ পরা দরকার হবে, কারণ হয়ত তা আমাদের সেবার সাধারণ বেশ হবে, কিন্তু আবার তা না হবার সম্ভাবনাও সমানই আছে। মানুষের বাহিরের চক্ষুর মূল্য কিছু নেই; ভিতরের চক্ষুই সব কিছু।

আমরা গীতার শিক্ষায় দেখি অহং-ভাব থেকে যে মুক্তি দাবী করা হয় তা কত সূক্ষ্ম। অর্জুন যুদ্ধ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিলেন ক্ষমতার অহং-ভাবের বশে, ক্ষত্রিয়ের অহং-ভাবের বশে; আবার যুদ্ধ থেকে বিমুখ হ'লেন দুর্বলতার এক বিপরীত অহং-ভাবের বশে অর্থাৎ জুগুপ্সা, বিতৃষ্ণা ও

মিথ্যা কৃপার ভাবে যা তার মন, স্নায়বিক সত্তা ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করেছিল; আর এই কৃপা সেই দিব্য করুণা নয় যা বাহুতে বল দেয় ও জ্ঞানের স্বচ্ছতা আনে। কিন্তু এই দুর্বলতা আসে ত্যাগের বেশে, পুণ্যের পরিচ্ছদে: "বরং ভিক্ষুকের জীবন শ্রেয়ঃ, তবু এই রুধিরদগ্ধ ভোগ নয়, সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য আমি চাই না, এমনকি দেবগণের রাজ্যও আমি চাই না।" আমরা বলতে পারি দিব্যগুরু কি নির্বোধ যে তিনি এই মনোভাব দৃঢ় না ক'রে আর একটি মহাপুরুষকে সন্ন্যাসীর দলভুক্ত করার মহান্ সুযোগ নষ্ট করলেন, নষ্ট করলেন জগতের সম্মুখে পবিত্র ত্যাগের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু পরম দিশারী দেখেন অন্যরূপে; এই দিশারীকে কথা দিয়ে ভুল বোঝান যায় না। "তোমার মধ্যে যারা কথা কইছে তারা দুর্বলতা ও মোহ ও অহং-ভাব। আত্মা দর্শন কর, জ্ঞানের দিকে চোখ খোল, তোমার অহং-ভাবের অন্তঃপুরুষ শুদ্ধ কর।" এর পরও কি বললেন? "যুদ্ধ কর, জয়লাভ কর, সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।" অথবা প্রাচীন ভারতীয় লোক-ইতিহাসের আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে হবে রাম যে লঙ্কাধিপতির কাছ থেকে নিজের স্ত্রীর পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করে শত্রুকুল ধ্বংস করেছিলেন তা-ও অহং-ভাব। কিন্তু ইহা কি কম অহংভাব হ'ত যদি তিনি উপেক্ষার নামাবলী গায়ে দিয়ে জ্ঞানের বাঁধা সূত্রের অপব্যবহার ক'রে বলতেন, "আমার স্ত্রী নেই, শত্রু নেই, কামনা নেই, এসব ইন্দ্রিয়ের মায়া; আমার কাজ ব্রহ্ম-বিদ্যা অনুশীলন করা, জনকনন্দিনীকে নিয়ে রাবণ যা খুসি করুক।"

কিন্তু যেমন গীতা জোর দিয়ে বলে, আসল মানদণ্ড ভিতরে। অন্তঃপুরুষকে লালসা ও আসক্তি থেকে মুক্ত করা চাই, তবে যেমন কর্মের প্রতি অহমাত্মক প্রেরণা থেকে মুক্তি দরকার, তেমন দরকার নৈষ্কর্ম্যের প্রতি আসক্তি থেকেও মুক্তি; যেমন পাপের দিকে আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া চাই, তেমন মুক্ত হওয়া চাই পুণ্যের রূপের আসক্তি থেকে। দরকার "আমিত্ব" ও "আমাবত্ব" শূন্য হ'য়ে 'একমেব' আত্মায় বাস করা, 'একমেব' আত্মায় কাজ করা; অপর সকলকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের মন, প্রাণ ও দেহের সেবা করার অহং-ভাব পরিত্যাগ করা যেমন দরকার তেমন দরকার বিশ্বাত্মক পুরুষের ব্যষ্টি কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ করতে অস্বীকার করার অহং-ভাব পরিত্যাগ করা। আত্মায় বাস করার অর্থ যে নৈর্ব্যক্তিক আত্ম-রতির মহাসাগরে মগ্ন হ'য়ে সকল কিছু বিস্মৃত হ'য়ে অনন্তের মধ্যে

শুধু নিজের জন্য বাস করা তা নয়, ইহার অর্থ এই দেহের মধ্যে, সকল দেহের মধ্যে, সকল দেহ অতিক্রম ক'রেও সমভাবে আত্মার মধ্যে ও আত্মা হ'য়ে বাস করা। ইহাই পূর্ণ জ্ঞান।

দেখা যাবে যে আমরা ত্যাগের ভাবনার যে অর্থ করি তা তার প্রচলিত অর্থ থেকে ভিন্ন। ইহার প্রচলিত অর্থ হ'ল,—আত্ম-সংযম, সুখভোগের নিবৃত্তি, সুখের বিষয় বর্জন। মানবের অন্তঃপুরুষের জন্য আত্ম-সংযম এক প্রয়োজনীয় শিক্ষা, কারণ তার হৃদয় অজ্ঞানভাবে আসক্ত হয়; সুখ থেকে নিবৃত্ত হওয়া প্রয়োজনীয় কারণ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পঙ্কিল মধুতে তার ইন্দ্রিয় ধরা প'ড়ে তাতে আটক থাকে; সুখের বিষয় বর্জনের আদেশ দেওয়া হয় কেননা মন বিষয়েই নিবদ্ধ হয়, তা ছাড়িয়ে বা নিজের ভিতরে যাবার জন্য সে তা ত্যাগ করবে না। যদি মানুষের মন এইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন, আসক্ত, এমন কি অশান্ত অস্থিরতারও মধ্যে আবদ্ধ, বিষয়সমূহের রূপে বিভ্রান্ত না হ'ত তাহ'লে ত্যাগের প্রয়োজন থাকত না; অন্তঃপুরুষ চলতে পারত আনন্দের পথে, ক্ষুদ্র থেকে আরো বৃহতে, হর্ষ থেকে দিব্যতর হর্ষে। কিন্তু বর্তমানে তা সম্ভব নয়। তার কর্তব্য হ'ল সে যেসব বিষয়ে আসক্ত সেসব ভিতর থেকে ত্যাগ করা যাতে তাদের প্রকৃত স্বরূপ লাভ সম্ভব হয়। বাহ্য ত্যাগ মূল বস্তু নয়, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য এমনকি তারও প্রয়োজন থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই তা অপরিহার্য এবং সকল ক্ষেত্রেই কখন কখন উপকারী; এমনকি একথা বলা চলে যে অন্তঃপুরুষের অগ্রগতির এক পর্বে সম্পূর্ণ বাহ্য ত্যাগের অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে যেতেই হবে যদিও এই ত্যাগ সর্বদা এমন হওয়া চাই যাতে সেই সব স্বেচ্ছাকৃত নিগ্রহ ও উৎকট আত্ম-নিপীড়ন না থাকে যেগুলি আমাদের অন্তরে আসীন ভগবানের কাছে অপরাধস্বরূপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ত্যাগ বা আত্ম-সংযম সর্বদাই এক সাধন, আর তার ব্যবহারের পালা শেষ হয়। যখন বিষয় আমাদের আর জালে আটকাতে পারে না, তখন বিষয় বর্জনেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় কারণ তখন অন্তঃপুরুষ আর বিষয়কে বিষয় হিসাবে উপভোগ করে না, সে উপভোগ করে তার মধ্যে প্রকাশমান ভগবানকে। সুখ থেকে নিবৃত্ত হওয়ারও প্রয়োজন থাকে না যখন অন্তঃপুরুষ আর সুখ খোঁজে না, বরং সকল বিষয়েই সমভাবে ভগবানের আনন্দ অধিগত করে, তখন আর কোনো বিষয়কে ব্যক্তিগতভাবে বা স্থূলভাবে পাওয়ার প্রয়োজন থাকে না; যখন অন্তঃপুরুষ আর কোনো কিছু চায় না বরং সর্বভূতস্থ সেই এক আত্মার

ইচ্ছানুযায়ী সচেতনভাবে চলে তখন আত্ম-সংযমেরও কোনো ক্ষেত্র থাকে না। তখনই আমরা বিধান থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্ত হই পরম চিৎ-পুরুষের স্বাধীনতার মধ্যে।

যা আমরা অশুভ ব'লে নিন্দা করি শুধু তাই যে আমরা সাধনার পথে পিছনে ফেলে যেতে প্রস্তুত হ'তে হবে তা নয়, যা আমাদের কাছে মনে হয় শুভ অথচ একমাত্র শুভ নয় তা-ও ফেলে যেতে প্রস্তুত হতে হবে। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি আমাদের মঙ্গল ক'রেছে, সাহায্য করেছে, হয়ত একসময় তাদের মনে হ'ত একমাত্র কাম্য বিষয় অথচ একবার তাদের কাজ শেষ হ'লে একবার সেসব পাওয়া গেলে, যখন আমাদের কর্তব্য সেসব ছাড়িয়ে যেতে তখন তারা বাধা ও এমনকি বিরুদ্ধশক্তি হ'য়ে দাঁড়ায়। অন্তঃপুরুষের এমন অনেক অবস্থা আছে যেগুলিকে আয়ত্তে আনার পর সেসবে বিশ্রাম করা বিপজ্জনক কারণ তাহ'লে তো তাদের অতীত ভগবানের সব রাজ্যে আমাদের যাত্রা হয় না। এমনকি যেসব ভগবদ-উপলব্ধি চরম পূর্ণ ও স্বরূপগত ভগবদ্-উপলব্ধি নয়, সেসবেও আমাদের আঁকড়ে থাকা উচিত নয়। সর্বময় ভগবানের কম কিছুতে, চরম অতিস্থিতির নিম্ন কিছুতে আমাদের থামা চলবে না। আর যদি আমরা এই ভাবে চিৎ-পুরুষের মধ্যে স্বাধীন হ'তে পারি, তাহ'লে আমরা খুঁজে পাব ভগবানের কার্যলীলার সকল অপরূপ বৈচিত্র্য; আমরা দেখব যে সব কিছু আন্তরভাবে ত্যাগ ক'রে আমরা কিছুই হারাইনি। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"---এই সব কিছু ত্যাগ করেই তুমি সমর্থ হবে সর্বকে ভোগ করতে। কারণ সব কিছুই আমাদের জন্য রাখা হয় ও আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে সে সব বিস্ময়করভাবে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয় তাঁর সর্বমঙ্গলে, ও সর্ব-সুন্দরে, সর্ব-জ্যোতিতে ও সর্ব-আনন্দে যিনি চির শুদ্ধ ও অনন্ত, যাঁর রহস্য ও অলৌকিকতা যুগ যুগ ধরে চলে অশ্রান্তভাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞানের বিভিন্ন সাধনার সমন্বয়

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা ত্যাগের কথা বলেছি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে যেমন তার পূর্বে বলেছি একাগ্রতার কথা ও তার সম্ভবপর পরিণতি সম্বন্ধে; সুতরাং যা বলা হ'য়েছে তা যেমন প্রযোজ্য জ্ঞানমার্গে, তেমন সমভাবেই প্রযোজ্য কর্ম মার্গ ও ভক্তিমার্গে; কারণ এই তিন মার্গেই ত্যাগ ও একাগ্রতা আবশ্যক যদিও তাদের প্রয়োগের রীতি ও ভাবনা বিভিন্ন হ'তে পারে। তবে এখন আমাদের বিশেষ ক'রে দেখতে হবে জ্ঞান-মার্গের বাস্তব পদ্ধতি-গুলি কি, কারণ এই মার্গে অগ্রসর হবার জন্য একাগ্রতা ও ত্যাগ——এই দুই শক্তির সহায়তা একান্তই আবশ্যক। কার্যতঃ এই পথ হ'ল সত্তার সেই মহান্ সোপানপথ দিয়ে পুনরুত্তরণ যে পথ বেয়ে অন্তঃপুরুষ অবতরণ করেছে জড় জীবনের মধ্যে।

জ্ঞানের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হ'ল আত্মার, আমাদের সত্যকার আত্ম-সত্তার পুনর্প্রাপ্তি, আর এই লক্ষ্যের অর্থ এই স্বীকার করা যে আমাদের সত্তার বর্তমান অবস্থা আমাদের আসল আত্ম-সত্তা নয়। অবশ্য যেসব তীক্ষ্ণ সমাধানে বিশ্বপ্রহেলিকার গ্রন্থি ছেদন করা হয় সেসব আমরা ত্যাগ ক'রেছি; আমরা স্বীকার করি যে বিশ্ব শক্তিসৃষ্ট কোনো কাল্পনিক জড়রূপ নয়, বা মনের রচিত কোনো অসদ্‌বস্তু নয় বা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ভাবনা ও তাদের সব পরিণামের এমন সমষ্টি নয় যার পিছনে আছে আমাদের সাধ্য এক মহাশূন্য বা এক মহান্ আনন্দময় শূন্য আমাদের সনাতন অসত্তার প্রকৃত সত্য হিসাবে। আমরা স্বীকার করি যে আত্মা এক সদ্‌বস্তু, আর বিশ্বও আত্মার এক সদ্‌বস্তু, ইহা শুধু জড়শক্তি ও রূপের সদ্‌বস্তু নয়, ইহা আত্মার চেতনার এক সদ্‌বস্তু এবং এজন্য যে ইহার সত্যতা কম তা নয়, বরং ইহাতে আরো বেশী প্রমাণিত হয় যে ইহা সত্য। তবু, যদিও বিশ্ব একটি তথ্য, মিথ্যা কল্পনা নয়, যদিও ইহা দিব্য ও বিশ্বাত্মার তথ্য, ব্যষ্টি আত্মার মিথ্যা কল্পনা নয়, তথাপি এখানে আমাদের জীবনের অবস্থা এক অজ্ঞানময় অবস্থা, ইহা আমাদের সত্তার আসল সত্য নয়। নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা তা মিথ্যা, আমরা যা নই সেইভাবে আমরা নিজেদের দেখি,

আমাদের পরিবেশের সহিত এক মিথ্যা সম্পর্কের মধ্যে আমাদের বাস, কারণ আমরা বিশ্বকে বা নিজেদের সঠিকভাবে জানি না, আমরা জানি এক অপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে যার ভিত্তি হ'ল পুরুষ ও প্রকৃতির এক সাময়িক মিথ্যা রচনা যা তারা নিজেদের মধ্যে স্থাপন করেছে বিকাশমান অহং-এর সুবিধার জন্য। আর এই মিথ্যাই মূল কারণ যার জন্য আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনে ও আমাদের পরিবেশের সহিত আমাদের সব সম্পর্কে প্রতি পদে এক সাধারণ বিকৃতি, বিশৃঙ্খলা ও কষ্টভোগের আক্রমণে হয়রাণ হই। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও আমাদের গোষ্ঠীগত জীবন, নিজেদের সহিত ও মানুষভাইদের সহিত আমাদের ব্যবহার--এসব প্রতিষ্ঠিত এক মিথ্যার উপর এবং সেজন্য সকল নীতি ও পদ্ধতিও মিথ্যা যদিও এই সকল প্রমাদের মধ্য দিয়ে এক বর্ধিষ্ণু সত্য অবিরত চেষ্টা করছে নিজেকে প্রকাশ ক'রতে। এইজন্যই মানবের কাছে জ্ঞানের পরম গুরুত্ব, তবে এ জ্ঞান জীবনের ব্যবহারিক জ্ঞান নয়, ইহা আত্মা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর-তম জ্ঞান,[১] আর এই জ্ঞানেরই উপর জীবনের খাঁটি ব্যবহার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এই প্রমাদের উৎপত্তি হয় এক মিথ্যা একাত্মতা থেকে। প্রকৃতি তার জড়ীয় ঐক্যের মধ্যে দেখতে বিচ্ছিন্ন নানা দেহ তৈরী করেছে আর জড়-প্রকৃতির মধ্যে অন্তঃপুরুষ এসবের মধ্যে আবিষ্ট হয়ে তাতে বাস করে, ও তাদের অধিগত ক'রে ব্যবহার করে; অন্তঃপুরুষ নিজেকে বিস্মৃত হ'য়ে জড়ের মধ্যকার শুধু এই একমাত্র গ্রন্থিকে অনুভব করে আর বলে, "আমি এই দেহ"। সে নিজেকে দেহ ব'লে ভাবে, দেহের সহিত কষ্ট পায়, দেহের সহিত আনন্দ ভোগ করে, দেহের সাথে জন্মায় ও দেহের সাথেই ধ্বংস হয়; অথবা অন্ততঃ এইভাবেই সে নিজেকে দেখে। আবার প্রকৃতি তার বিশ্বপ্রাণের ঐক্যের মধ্যে দেখতে বিচ্ছিন্ন এমন সব প্রাণের ধারা তৈরী করেছে যেগুলি নিজেদের নিয়ে প্রতি দেহের চারিদিকে ও অভ্যন্তরে প্রাণশক্তির এক আবর্ত গড়ে তোলে আর প্রাণ-প্রকৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত অন্তঃপুরুষ সেই ধারাকে ধ'রে ও তার দ্বারা নিজে ধৃত হ'য়ে প্রাণের সেই ক্ষুদ্র ঘূর্ণায়মান আবর্তের মধ্যে সাময়িক ভাবে আবদ্ধ হয়। অন্তঃপুরুষ তখনো নিজেকে বিস্মৃত হ'য়ে বলে "আমি এই প্রাণ"; সে

১ আত্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান

নিজেকে প্রাণ মনে ক'রে তার লালসা বা কামনার সহিত নিজেও লালায়িত হয়, তার সুখের মধ্যে গড়াগড়ি দেয়, তার আঘাতে রক্তাপ্লুত হয়, তার চলাতে নিজে ছোটে বা হোঁচট খায়। তখনো যদি সে প্রধানতঃ দেহ-বোধের প্রভাবাধীন থাকে, সে আবর্তের জীবনের সহিত নিজের জীবন এক মনে করে ভাবে, "যে দেহের চারিদিকে এই আবর্ত গড়ে উঠেছে সেই দেহনাশের পর যখন এই আবর্তেরও নাশ হবে, তখন আমি আর থাকব না।" তবে যে প্রাণের ধারা ঐ আবর্ত গড়ে তুলেছে সেই ধারার বোধ যদি সে পেতে সমর্থ হয় তাহ'লে সে নিজেকে ঐ ধারা মনে ক'রে বলে, "আমি এই প্রাণের স্রোত; আমি এই দেহের অধিকার পেয়েছি, আমি একে ছেড়ে অন্য দেহ অধিকার করব; আমি অমর প্রাণ, সতত পুনর্জন্মের চক্রে ঘুরছি।"

কিন্তু আবার প্রকৃতি বিশ্বমনে গঠিত মানসিকতার ঐক্যের মধ্যে যেন মানসিকতার এমন সব দেখতে বিচ্ছিন্ন শক্তিউৎপাদক যন্ত্র তৈরী করেছে যেগুলি মানসিক শক্তি ও বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির উৎপাদন, বিতরণ ও পুনঃসঞ্চয়ের স্থির কেন্দ্র, যেন মানসিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার বিভিন্ন ষ্টেশন (ঘাঁটি) যেখানে বিভিন্ন বার্তা ভাবা, লেখা, পাঠান ও লওয়া হয়, ও তাদের অর্থ উদ্ধার করা হয় আর এই সব বার্তা ও বৃত্তি অনেক প্রকারের—ইন্দ্রিয়জ্ঞানাত্মক, ভাবাত্মক, বোধাত্মক, প্রত্যয়াত্মক ও বোধিজ, আর মানসিক প্রকৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত অন্তঃপুরুষ সেসব গ্রহণ ও ব্যবহার করে জগৎকে দেখার জন্য এবং সে মনে করে যে সে-ই এই সব আঘাত বাহিরে ফেলছে এবং গ্রহণ করছে, এবং সেসবের পরিণামে কষ্ট পাচ্ছে বা তাদের আয়ত্ত করছে। প্রকৃতি যেসব জড়দেহ গঠন করেছে তাদের মধ্যে প্রকৃতি এই সব শক্তিউৎপাদক যন্ত্রগুলির আধার প্রতিষ্ঠিত ক'রে, দেহগুলিকে ব্যবহার করে তার ষ্টেশনের ভূমি হিসাবে এবং জড়ের সহিত মনকে যুক্ত করে এমন এক স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা যা বিভিন্ন প্রাণধারার সঞ্চালনে পরিপূর্ণ এবং যার মধ্য দিয়ে মন প্রকৃতির জড়জগৎ সম্বন্ধে এবং ইচ্ছামতো প্রাণজগৎ সম্বন্ধে সচেতন হয়। তা না হ'লে মন প্রথম ও প্রধানতঃ মানসিক জগতের কথা জানতে পারত এবং শুধু পরোক্ষভাবে আভাস পেত জড় জগতের। বর্তমানে তার মনোযোগ নিবদ্ধ শুধু দেহে ও যে জড়জগতে দেহ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে তাতে আর সৃষ্টির বাকীসব সে জানে, শুধু অস্পষ্ট, পরোক্ষ বা অবচেতনভাবে তার নিজেরই বিশাল অবশিষ্ট অংশের মধ্যে যে অংশ

সম্বন্ধে সে এখন বাহ্যতঃ নিঃসাড় ও বিস্মৃত।

অন্তঃপুরুষ নিজেকে এই মানসিকশক্তিউৎপাদক যন্ত্র বা ষ্টেশনের সহিত এক মনে ক'রে বলে, "আমি এই মন।" আর যেহেতু মন দেহগত প্রাণেই আচ্ছন্ন থাকে সে ভাবে "আমি এই প্রাণবন্ত দেহে এক মন" অথবা আরো সাধারণতঃ সে ভাবে "আমি এমন এক দেহ যা প্রাণধারণ ও চিন্তা করে"। সে দেহধারী মনের বিভিন্ন মনন, ভাবাবেগ; ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এর সহিত নিজেকে এক মনে ক'রে কল্পনা করে যে দেহনাশের সহিত এসবেরও যখন নাশ হবে তখন তার নিজের অস্তিত্বও আর থাকবে না। অথবা যদি সে মানসিক ব্যক্তিভাবনার নিত্য ধারা সম্বন্ধে সচেতন হয় সে নিজের সম্বন্ধে ভাবে যে সে এক মনোময় অন্তঃপুরুষ যে একবার বা বারবার দেহধারণ ধরে এবং পার্থিব জীবন থেকে ফিরে যায় তার অতীত মনোলোকে; এইভাবে মনোময় সত্তা যে কখনো কখনো দেহে, কখনো বা প্রকৃতির মনোলোকে বা প্রাণ-লোকে মানসিকভাবে সুখ বা দুঃখভোগ ক'রে টিকে থাকে ইহাকেই সে বলে তার অমর জীবন। অথবা না হয়, যেহেতু মন আলো ও জ্ঞানের এক তত্ত্ব---তা সে তত্ত্ব যতই অপূর্ণ হ'ক---আর তার অতীতে কি কাছে সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা পেতে সে সক্ষম, সেজন্য সে দেখে যে অতীতে যা আছে---হয় কোনো শূন্য নয় কোনো শাশ্বত সন্মাত্র---তার মধ্যে তার বিলীন হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে আর বলে, "সেখানে আমার, এই মনোময় অন্তঃপুরুষের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। দেহবদ্ধ মন ও প্রাণের বর্তমান খেলার প্রতি তার আসক্তি বা বিতৃষ্ণার পরিমাণ অনুযায়ী সে এই লয়-প্রাপ্তিকে ভয় বা কামনা করে, অস্বীকার বা স্বীকার করে।

তবে এ সবই সত্য মিথ্যায় মেশানো। প্রকৃতির তথ্য হিসাবে মন, প্রাণ ও জড় আছে আর মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ব্যক্তিভাবগঠনও আছে, কিন্তু অন্তঃপুরুষ যে নিজেকে তাদের সহিত একাত্ম করে, সেই একাত্মতা মিথ্যা। মন, প্রাণ ও জড় যে আমরা, তা শুধু এই অর্থে যে তারা সত্তার এমন সব তত্ত্ব যেসবকে প্রকৃত আত্মা বিকাশ করেছে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে আর তা এই উদ্দেশ্যে যেন তার অদ্বয় সত্তার এক রূপ প্রকাশ পায় শৃঙ্খলাবদ্ধ জগৎ হিসাবে। ব্যষ্টি মন, প্রাণ ও দেহ এই সব তত্ত্বের এক বিলাস মাত্র; পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পরের আদানপ্রদানের মধ্যে তাকে উপস্থাপিত করা হয় অদ্বয় সন্মাত্রের নিজের সেই বহুত্ব প্রকাশ করার উপায় হিসাবে যে বহুত্বকে তিনি

নিজের ঐক্যের মধ্যে গূঢ়ভাবে শাশ্বতকাল ধারণ করেন ও তা প্রকাশ করতে নিত্য সমর্থ। ব্যষ্টি মন, প্রাণ ও দেহ আমাদের বিভিন্ন রূপ এই কারণে যে আমরা "একমেব"-এর বহুত্বের বিভিন্ন কেন্দ্র; বিশ্ব মন, প্রাণ ও দেহও আমাদের আত্মার রূপ কারণ আমরা আমাদের সত্তায় সেই "একমেব"। কিন্তু আত্মা বিশ্ব বা ব্যষ্টি মন প্রাণ ও দেহের অতিরিক্ত কিছু আর যখন আমরা এই সব বিষয়ের সহিত নিজেকে এক মনে ক'রে নিজেদের সীমা-বদ্ধ করি তখন আমাদের জ্ঞান মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, আর শুধু আমাদের আত্মসত্তা সম্বন্ধে নয়, আমাদের বিশ্বজীবন ও আমাদের ব্যক্তিগত সব কাজকর্ম সম্বন্ধেও আমাদের নির্ধারিকা দৃষ্টি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা মিথ্যাময় করে তুলি।

আত্মা এক সনাতন কেবল পুরুষ ও শুদ্ধ সৎ আর এই সব বিষয় তাঁর সম্ভূতি। এই জ্ঞান থেকে আমাদের যাত্রা করতে হ'বে; এই জ্ঞান আমাদের উপলব্ধি করা চাই এবং ইহাকেই করা চাই ব্যষ্টির আন্তর ও বহির্জীবনের ভিত্তি। জ্ঞানযোগ এই প্রাথমিক সত্য থেকে আরম্ভ ক'রে সাধনার এক নঞর্থক ও সদর্থক পন্থা উদ্ভাবন ক'রেছে যার সাহায্যে আমরা এই সব মিথ্যা একাত্মতাবোধ মুক্ত হ'য়ে সেসব থেকে ফিরে যাব প্রকৃত আত্মজ্ঞানের মধ্যে। 'নঞর্থক' পদ্ধতি হ'ল সর্বদা এই বলা, "আমি দেহ নই", যাতে "আমি দেহ" এই মিথ্যা ভাবনা খণ্ডন ও উচ্ছেদ করা যায়, এই জ্ঞানের উপর একাগ্র হওয়া এবং দেহের প্রতি অন্তঃপুরুষের আসক্তি ত্যাগ ক'রে দেহ-বোধ মুক্ত হওয়া। আমরা আরো বলি, "আমি প্রাণ নই", এবং এই জ্ঞানের উপর একাগ্র হ'য়ে ও প্রাণিক সব বৃত্তি ও কামনার প্রতি আসক্তি ত্যাগ ক'রে প্রাণবোধমুক্ত হই। পরিশেষে আমরা বলি, "মন, গতি, বোধ, মনন--এসব কিছুই আমি নই",এবং এই জ্ঞানের উপর একাগ্র হ'য়ে ও মানসিক সব বৃত্তি ত্যাগ ক'রে মনোবোধমুক্ত হই। যখন আমরা এইভাবে আমাদের ও যেসব বিষয়ের সহিত আমরা নিজেদের এক করেছিলাম তাদের মধ্যে এক ব্যবধান গড়ে তুলি তখন আমাদের থেকে তাদের আবরণ উত্তরোত্তর খসে পড়ে, আর আত্মা দেখা দিতে শুরু করেন আমাদের অনুভূতিতে। সেই সম্বন্ধে আমরা তখন বলি, "আমি শুদ্ধ, নিত্য, আত্মানন্দময় তৎস্বরূপ", এবং আমাদের মনন ও সত্তাকে তাঁর উপর একাগ্র ক'রে আমরা তৎস্বরূপ হ'য়ে উঠি এবং শেষে সমর্থ হই ব্যষ্টিসত্তা ও বিশ্ব ত্যাগ করতে। অপর এক যে সদর্থক পদ্ধতি

বরং রাজযোগের অন্তর্ভুক্ত তা হ'ল ব্রহ্মের মননের উপর একাগ্র হ'য়ে আমাদের মধ্যে অন্য কোনো ভাবনা আসা বন্ধ করা যাতে আমাদের বাহ্য অথবা বৈচিত্র্যপূর্ণ আন্তর সত্তার উপর মনরূপী এই উৎপাদক যন্ত্রের কাজ বন্ধ হ'য়ে যায়; মানসিক নিবৃত্তির দ্বারা প্রাণের ও শরীরের খেলাও স্তিমিত হ'য়ে পড়বে এক চিরন্তন সমাধিতে, সত্তার কোনো অবর্ণনীয় গভীরতম সমাধিতে যাতে আমরা প্রয়াণ করব অনপেক্ষ সন্মাত্রের মধ্যে।

স্পষ্টতঃ এই সাধনা এমন এক আত্ম-কেন্দ্রগত ও ব্যতিরেকী আন্তর ক্রিয়া যাতে জগৎকে বর্জন করা হয় মননের মধ্যে তাকে অস্বীকার ক'রে এবং তার দর্শন থেকে অন্তঃপুরুষের চোখ বন্ধ ক'রে। কিন্তু ব্যষ্টিপুরুষ তার দিকে চোখ বন্ধ করলেও বিশ্ব রয়ে যায় ভগবানের মধ্যে এক সত্য হিসাবে, আর আত্মাও বিশ্বের মধ্যে বর্তমান থাকেন সত্যসত্যই, মিথ্যারূপে নয়; যা সব আমরা বর্জন করেছি সেসব তিনি ধারণ ক'রে আছেন, সকল বিষয়ের মধ্যে তিনি সত্যই প্রতিষ্ঠিত, সত্যসত্যই তিনি জীবকে আলিঙ্গন ক'রে আছেন বিশ্বের মধ্যে, আবার বিশ্বকেও আলিঙ্গন করে আছেন তাঁর মধ্যে যা বিশ্বের অতিরিক্ত ও অতিস্থিত। যতবারই আমরা বাহিরে আসি আন্তর ধ্যানের সমাধি থেকে, ততবারই এই যে স্থায়ী বিশ্বকে আমরা দেখি আমাদের চারিদিকে ঘিরে আছে, তার মধ্যে এই সনাতন আত্মাকে নিয়ে আমরা কি করব? যে অন্তঃপুরুষ বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখে তার জন্য জ্ঞানের বৈরাগ্যমার্গে এক সমাধান ও সাধনা আছে। এই সাধনা হ'ল সর্বগত, সর্বব্যাপী ও সকল কিছুর উপাদানস্বরূপ আত্মাকে আকাশের রূপে দেখা---যার মধ্যে সকল রূপ বর্তমান, যা সকল রূপের মধ্যে বর্তমান এবং যা দিয়ে সকল রূপ গঠিত। ঐ আকাশের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ ও মন সঞ্চরণ করে বিষয়সমূহের নিঃশ্বাস রূপে, আকাশের মধ্যে বায়ুসমুদ্ররূপে, এবং তারাই আকাশ থেকে গঠন করে এই সকল রূপ; কিন্তু তারা যা গঠন করে তা শুধু নাম ও রূপ, কোনো সদ্‌বস্তু নয়; ঘটের যে রূপ আমরা দেখি তা মাটিরই এক রূপ, আর তা ফিরে যায় মাটির পৃথিবীতেই; মাটিও এক রূপ যা পর্যবসিত হয় বিশ্বপ্রাণে, আর বিশ্বপ্রাণও এক গতি যা শান্ত হয় সেই নিস্তব্ধ নির্বিকার আকাশে। এই জ্ঞানের উপর একাগ্র হ'য়ে, সকল প্রাতিভাসিক ও বাহ্যরূপ বর্জন ক'রে আমরা উপলব্ধি করি যে সারা জগৎ আকাশ-ব্রহ্মে নামরূপের এক ভ্রম, মায়া; ইহা আমাদের কাছে অসৎ হ'য়ে ওঠে; আর বিশ্ব অসৎ হ'য়ে ওঠায় তার মধ্যে ব্রহ্মের

প্রতিষ্ঠাও অসৎ হয়, থাকেন শুধু আত্মা যাঁর উপর আমাদের মন মিথ্যা আরোপ ক'রেছে নামরূপাত্মক বিশ্ব। সুতরাং পরমার্থসৎ-এর মধ্যে ব্যষ্টি আত্মার লয়সাধন যুক্তিযুক্ত।

তথাপি, আত্মার লীলা চলতে থাকে—সবকিছুর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকার অবিশ্বর বিভাবে, সব কিছুকে দিব্যভাবে আবৃত করার অক্ষর বিভাবে, আর তার সহিত থাকে প্রতি জিনিষ হওয়া ও সব কিছু হওয়ার অফুরন্ত চাতুরী; আমরা যে এই চাতুরী বুঝতে পারি ও সরে আসি তাতে আত্মা বা বিশ্বের এক বিন্দুও আসে যায় ব'লে মনে হয় না। তাহ'লে আমাদের কি জানা কর্তব্য নয় যে কি ইহা যা এইভাবে আমাদের স্বীকার বা প্রত্যাখ্যানের উর্ধ্বে নিত্য বিরাজিত, আর এত মহান্ ও এত সনাতন যে এসব তাকে স্পর্শ করে না? এখানেও নিশ্চয় কোনো অজেয় সদ্‌বস্তু কর্মরত, আর জ্ঞানের অখণ্ডতার জন্য আমাদের কর্তব্য তা দেখা ও উপলব্ধি করা; নচেৎ ইহাই প্রমাণ হ'তে পারে যে আমাদের নিজেদের জ্ঞানই চাতুরী ও ভ্রম, বিশ্বের মধ্যকার ঈশ্বর নন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য আবার একাগ্র হ'য়ে এই যে সদ্‌বস্তু এত অপ্রতিহতভাবে বিবাজিত তাকে দেখা ও উপলব্ধি করা আর এই জানা যে এই আত্মা সেই পরম পুরুষ ছাড়া আর কিছু নয় যিনি প্রকৃতির অধীশ্বর, এই প্রপঞ্চের ধর্তা যাঁর অনুমতিতে ইহা চলে, যাঁর সংকল্প ইহার অনন্তবিধ ক্রিয়ার প্রভব এবং ইহার চিরন্তন যুগ চক্রসমূহের নির্ধারক। আবার তবু আমাদের কর্তব্য হবে আরো একবার একাগ্র হ'য়ে এই দেখা, উপলব্ধি করা ও জানা যে আত্মাই সেই "একম্ সৎ" যিনি সকলের পুরুষ ও সকলের প্রকৃতি,—উভয়ই, একই সাথে পুরুষ ও প্রকৃতি, এবং সেজন্য বিষয়সমূহের এই সব রূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ ক'রতে এবং আবার এই সব রূপায়ণ হ'তেও সমর্থ। তা না হ'লে আত্মা যা বাদ দেন না, আমরা তা বাদ দিই এবং ইচ্ছামতো ঠিক করি কি আমরা জানব।

জ্ঞানের প্রাচীন বৈরাগ্যমার্গ বিষয়সমূহের ঐক্য এবং এক সন্মাত্রের এই সকল বিভাবের উপর একাগ্রতা স্বীকার করত, তবে তাতে এক পার্থক্য ও ক্রম-পরম্পরা থাকত। যে আত্মা বিষয়ের এইসব রূপ হন তিনি বিরাট বা বিশ্বপুরুষ; যে আত্মা এই সকল রূপ সৃষ্টি করেন তিনি হিরণ্যগর্ভ, তৈজস বা সৃজনশীল ভাবে দ্রষ্টা পুরুষ; যে আত্মা এই সকল বিষয়কে নিজের মধ্যে নিগৃহিত ক'রে ধারণ করেন তিনি প্রাজ্ঞ, চিন্ময় কারণ বা

আদি নির্ধারক পুরুষ; এসবের অতীতে আছেন পরমার্থসৎ যিনি এই সব অসৎ সৃষ্টিতে মত দেন কিন্তু তাদের সহিত তাঁর কোনো ব্যবহার থাকে না। এই 'তৎ'এর মধ্যে আমাদের লয় পাওয়া ও বিশ্বের সহিত আর কোনো সংস্রব না রাখা কর্তব্য, কেননা জ্ঞানের অর্থ অন্তিম জ্ঞান, সুতরাং দরকার এই সব অপূর্ণ উপলব্ধিকে ছেড়ে দেওয়া বা 'তৎ'এর মধ্যে নিমজ্জিত করা। কিন্তু স্পষ্টতঃ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এইসব ব্যবহারিক পার্থক্য মনের তৈরী, বিশেষ কোনো কোনো উদ্দেশ্যের জন্য তাদের মূল্য থাকতে পারে কিন্তু চরম মূল্য কিছু নেই। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কথা হ'ল যে সব এক, বিশ্বাত্মা যে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা আত্মা থেকে ভিন্ন তা নয়, দ্রষ্টা আত্মাও কারণ আত্মা থেকে ভিন্ন নয়, তেমন কারণ আত্মাও পরমার্থসৎ থেকে ভিন্ন নয়, ইহা একই আত্ম-সত্তা যিনি সকল সম্ভূতি হ'য়েছেন, "সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্", ইহা সেই ঈশ্বর যিনি এই সব ব্যষ্টি সত্তা রূপে নিজেকে প্রকট করেন, অন্য কিছু নয়, আবার এই ঈশ্বরও সেই 'একমেব' ব্রহ্ম বৈ অন্য কিছু নয় যিনি বস্তুতঃ এই সব কিছু যা আমরা দেখতে পাই, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন দ্বারা জানতে পারি। সেই আত্মা, ঈশ্বর ও ব্রহ্মকে আমরা জানতে চাই, তবেই তো আমরা উপলব্ধি করতে পারব আমাদের ঐক্য তাঁর সহিত এবং তিনি যাসব ব্যক্ত করেন সেসবের সহিত, আর সেই ঐক্যের মধ্যেই আমরা বাস করতে চাই। জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের দাবী হ'ল যে ইহা হবে ঐক্য-সাধক; যে জ্ঞান ভাগ করে তা সর্বদাই এক আংশিক জ্ঞান হ'তে বাধ্য, তার উপকারিতা হ'ল কোনো কোনো ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের জন্য। যে জ্ঞান ঐক্য সাধন করে তাহাই আসল জ্ঞান।

সুতরাং আমাদের পূর্ণযোগ এই সব বিবিধ সাধনা ও একাগ্রতা গ্রহণ ক'রবে কিন্তু এমন এক সমন্বয়ের দ্বারা তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনবে এবং সম্ভব হ'লে তাদের মিশিয়ে এক করবে যাতে তাদের পরস্পরের ব্যতিরেকী ভাব দূর হয়। পূর্ণজ্ঞানের সাধক ঈশ্বর ও সর্বকে যে উপলব্ধি করবেন তা অন্য ব্যতিরেকী বিশ্বাতীত ব্রহ্মবাদীর মতো শুধু সেসব বর্জন করে নীরব আত্মা বা অজ্ঞেয় পরমার্থসৎকে একমাত্র সত্য বলার জন্য নয় অথবা অন্য ব্যতিরেকী ঈশ্বরবাদী যোগ বা অন্য ব্যতিরেকী সর্বেশ্বরবাদী যোগের মতো শুধু ঈশ্বরের জন্যই বা সর্বের মধ্যে যে তিনি বাস করবেন তা-ও নয়, কি মননে, কি অনুশীলনে বা কি উপলব্ধিতে তিনি কোনো ধর্মমত

বা দার্শনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করবেন না। তাঁর সাধ্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ সত্য। প্রাচীন সাধনাগুলি তিনি বর্জন করবেন না, কারণ ইহারা প্রতিষ্ঠিত শাশ্বত সত্যের উপর, তবে তিনি তাদের ফেরাবেন তাঁর লক্ষ্যের অনুরূপ নতুন দিকে।

আমাদের স্বীকার ক'রতে হবে যে জ্ঞানমার্গে আমাদের যা মুখ্য লক্ষ্য হওয়া চাই তা যতটা আমাদের নিজেদের পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা, ততটা ঐ আত্মাকে অপরের মধ্যে বা প্রকৃতির অধীশ্বর হিসাবে বা সর্ব হিসাবে উপলব্ধি করা নয়; কারণ জীবের জরুরী প্রয়োজন হ'ল তার নিজের সত্তার সর্বোত্তম সত্যপ্রাপ্তি, ইহার বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা, বিভ্রম, মিথ্যা একাত্মবোধ সংশোধন করা, ইহার সঠিক একাগ্রতা ও শুদ্ধতা সাধন করা এবং নিজের উৎসকে জানা ও তাতে উত্তরণ করা। কিন্তু আমরা তা করি আমাদের সত্তার উৎসে বিলীন হবার জন্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল আমাদের সমগ্র জীবন এবং এই আন্তর রাজ্যের সকল অঙ্গ যেন তাদের সঠিক ভিত্তি পায়, তারা যেন বাস ক'রতে পারে আমাদের সর্বোত্তম আত্মার মধ্যে এবং এই বাস যেন হয় শুধু সর্বোত্তম আত্মার জন্য এবং তারা যেন পালন করে শুধু সেই বিধান—অন্য কোনো বিধান নয়—যা আসে আমাদের সর্বোত্তম আত্মা থেকে, আর যা আমাদের শুদ্ধ-করা সত্তাকে দেওয়া হয় সঞ্চারক মানসিকতার মধ্যে কোনো প্রকার মিথ্যা বিকৃতি বিনা। আর যদি আমরা সঠিকভাবে ইহা করি তাহ'লে আমরা দেখতে পাব যে এই পরমাত্মাকে পেয়ে আমরা পেয়েছি তাঁকে যিনি সকলের মধ্যে একমাত্র আত্মা, প্রকৃতির ও সকল প্রকৃতির একমাত্র অধীশ্বরকে, আমাদের নিজেদের সর্বকে যিনি এই বিশ্বেরও সর্ব। কারণ এই যাঁকে আমরা নিজেদের মধ্যে দেখি তাঁকে আমরা নিশ্চয়ই ঐ কারণে দেখতে পাব সর্বত্র কারণ তা-ই তাঁর ঐক্যের সত্য। আমাদের সত্তার এই সত্যকে জানলে ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে, আমাদের ব্যষ্টিত্ব ও বিশ্বের মাঝের অন্তরায় জোর ক'রে উন্মুক্ত ও পরিত্যক্ত হ'তে বাধ্য, আর যে সত্যকে আমরা আমাদের আপন সত্তার ভিতরে উপলব্ধি করি তা আমাদের কাছে নিজেকে বিশ্বভাবের মধ্যে সার্থক না করে পারে না, আর এই বিশ্বভাবই তখন হবে আমাদের আত্মা। নিজেদের মধ্যে বেদান্তর "সোঽহম্" (আমিই তিনি) এই উপলব্ধি করার পর, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আমরা আমাদের চারিদিককার সকল কিছুর দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করব তার অপর দিকের একই সমান

জ্ঞান "তত্ত্বমসি" (তুমি তাহাই)। আমাদের শুধু দেখতে হবে কার্যতঃ কেমনভাবে এই সাধনার অনুশীলন করা হবে যাতে আমরা সফল হ'তে পারি এই মহান্ একীকরণে।

সপ্তম অধ্যায়

দেহের অধীনতা থেকে বিমুক্তি

একবার যখন আমরা আমাদের ধীশক্তিতে ঠিক করি যে যা প্রতীয়মান হয় তা সত্য নয়, আত্মা এই দেহ, কি প্রাণ, কি মন নয় কারণ এসব তার রূপমাত্র তখন এই জ্ঞানমার্গে আমাদের প্রথম কাজ হবে প্রাণ ও দেহের সহিত আমাদের মনের ব্যবহারিক সম্বন্ধে মনকে যথাস্থানে স্থাপন করা যাতে তার পক্ষে আত্মার সহিত তার সঠিক সম্বন্ধ পাওয়া সম্ভব হয়। যে কৌশলে ইহা সাধন করা সব চেয়ে সহজ তা আমরা আগেই জেনেছি কারণ কর্মযোগ সম্বন্ধে আমাদের যে দৃষ্টি তাতে ইহার গুরুত্ব ছিল অনেক; এই কৌশল হ'ল প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে এক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা। পুরুষ অর্থাৎ যে অন্তঃপুরুষ জানে ও আদেশ দেয় সে তার কার্যসাধিকা চিন্ময়ী শক্তির কর্মধারাতে এমন ভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে যে ইহার এই যে স্থূল কর্মধারাকে আমরা দেহ বলি তা-কে সে নিজ ব'লে ভুল করে; সে যে জ্ঞাতা ও আদেশ কর্তা অন্তঃপুরুষ, আর ইহাই তার আপন প্রকৃতি তা সে ভুলে যায়; সে বিশ্বাস করে যে তার মন ও অন্তঃপুরুষ দেহের বিধান ও কর্মপ্রণালীর অধীন; সে ভুলে যায় যে ইহা ছাড়া সে আরো অনেক কিছু যা শারীরিক রূপের চেয়ে মহত্তর; মন যে সত্যই জড়ের চেয়ে মহত্তর এবং জড়ের বিভিন্ন তামসবৃত্তিতে, প্রতিক্রিয়ায় ও নিশ্চেষ্টতার ও অক্ষমতার অভ্যাসে বশীভূত হওয়া যে তার কর্তব্য নয় তা সে ভুলে যায়; সে ভুলে যায় যে সে এমনকি মনের চেয়েও বেশী কিছু, এমন সামর্থ্য যা মনোময় পুরুষকে নিজের ঊর্ধ্বে তুলতে সক্ষম; সে ভুলে যায় যে সে অধীশ্বর সে বিশ্বাতীত; কিন্তু অধীশ্বর যে তার নিজের কর্ম-প্রণালীর দাস হয়ে থাকবে, বিশ্বাতীত যে এমন এক রূপের মধ্যে আবদ্ধ হবে যা তার নিজেরই সত্তার মধ্যে থাকে শুধু এক তুচ্ছ বস্তু হিসাবে তা ঠিক নয়। পুরুষের কর্তব্য এই সব বিস্মৃতিপরায়ণতা দূর করা আর তা করার উপায় হ'ল পুরুষের নিজের আসল প্রকৃতি স্মরণ করা আর এই স্মরণ করা যে দেহ শুধু এক কর্মধারা এবং প্রকৃতির অনেকগুলি কর্ম-ধারার মধ্যে মাত্র একটি ইহা।

তখন আমরা মনকে বলি, "ইহা প্রকৃতির কর্মধারা, ইহা তুমিও নয়, আমিও নয়, এ থেকে পিছিয়ে দাঁড়াও।" আমরা দেখতে পাব যে চেষ্টা করলে এই বিচ্ছিন্ন করার সামর্থ্য মনের আছে আর মন দেহ থেকে পিছিয়ে দাঁড়াতে পারে---শুধু যে ভাবনায় তা নয়, কর্মেও সে তা করতে সমর্থ আর তা যেন শারীরিকভাবে বা বরং প্রাণিকভাবে। দেহের বিষয় সম্বন্ধে একপ্রকার উপেক্ষার ভাব নিয়ে মনের এই বিচ্ছিন্নতাকে দৃঢ় করা চাই; ইহার নিদ্রা কি জাগরণ, ইহার চলাফেরা বা বিশ্রাম, ইহার যন্ত্রণা বা সুখ, স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য, ইহার স্ফূর্তি বা ক্লান্তি, ইহার স্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাচ্ছন্দ্য বা ইহা কি খায়, না খায়---সেসবকে অত্যাবশ্যক ভাবা ও সেই ভেবে ব্যস্ত হওয়া আমাদের কর্তব্য নয়। ইহার এই অর্থ নয় যে আমরা দেহকে যতদূর সম্ভব ঠিকমতো রাখব না; উগ্র কৃচ্ছ্রতা সাধনা বা শরীরকে ইচ্ছা ক'রে অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়। তবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাস্থ্য---এসবের দ্বারা মন যেন বিচলিত না হয়, অথবা শারীরিক ও প্রাণিক লোক দেহের সব বিষয় সম্বন্ধে যে গুরুত্ব দেয় সে গুরুত্ব যেন আমরা না দিই, অথবা বস্তুতঃ এক সম্পূর্ণ গৌণ এবং কেবলমাত্র যন্ত্রের গুরুত্ব ছাড়া আর বেশী কিছু গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই যন্ত্রের গুরুত্বও যেন এত বেশী না হয় যে তা অবশ্য প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়ায়; উদাহরণস্বরূপ, আমরা যেন কখন না মনে করি যে আমাদের খাদ্য কি পানীয়ের উপর মনের শুদ্ধতা নির্ভর করে যদিও এক বিশেষ অবস্থায় কিছু সংযম বা নিষেধ আমাদের আন্তর উন্নতির পক্ষে উপকারী; আবার অপরপক্ষে আমাদের আগের মতো ভাবা উচিত নয় যে খাদ্য ও পানীয়ের উপর মনের, এমনকি প্রাণের যে নির্ভরতা তা এক অভ্যাসের অথবা এই সব তত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতির দ্বারা স্থাপিত এক ব্যবহারিক সম্পর্কের বেশী কিছু। বস্তুতঃ যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তার পরিমাণ বিপরীত অভ্যাস ও নতুন সম্পর্ক দ্বারা ন্যূনতম মাত্রায় কমান যেতে পারে আর তাতে মানসিক বা প্রাণিক উদ্যম এতটুকুও হ্রাস পায় না; এমনকি বিপরীতপক্ষে স্থূল আহারের গৌণ সহায় অপেক্ষা মানসিক ও প্রাণিক শক্তির যেসব গূঢ় উৎসের সহিত তারা সংশ্লিষ্ট সেসবের উপর বেশী নির্ভর ক'রতে শিখে তাদের বিচক্ষণতার সহিত বিকশিত ক'রে আরো অধিক পরিমাণে শক্তির যোগ্যতায় শিক্ষিত করা সম্ভব। অবশ্য আত্ম-শিক্ষার এই দিকটি জ্ঞানযোগ অপেক্ষা আত্ম-সিদ্ধি যোগেই বেশী প্রয়োজনীয়; আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের

পক্ষে প্রধান কথা হ'ল দেহের বিষয়সমূহের প্রতি মনের আসক্তি বা তাদের উপর তার নির্ভরতা ত্যাগ করা চাই।

এইভাবে শিক্ষিত হ'লে মন ক্রমশঃ শিখবে দেহের প্রতি পুরুষের সঠিক মনোভাব নিতে। প্রথমতঃ ইহা জানবে যে মনোময় পুরুষই দেহের ধর্তা, সে কোনো প্রকারেই নিজে দেহ নয়; কারণ মনের দ্বারা ও প্রাণিক শক্তির সহায়ে সে যে ভৌতিক সত্তা ধারণ করে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সে। স্থূল দেহের প্রতি সমগ্র সত্তার এই মনোভাব ক্রমশঃ এত বেশী স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে যে এই দেহ আমাদের কাছে মনে হবে যেন ইহা আমাদের পরিধানের পোষাকের মতো বা হাতে নেওয়া যন্ত্রের মতো বাহিরের কিছু যা আলাদা করা যায়। এমনকি আমাদের ক্রমশঃ এই অনুভব আসা সম্ভব যে দেহ আমাদের প্রাণিক শক্তি ও মানসিকতার শুধু এক প্রকার আংশিক প্রকাশ আর এই ছাড়া এক অর্থে ইহার কোনো অস্তিত্ব নেই। এই সব অনুভূতি থেকে বোঝা যায় যে মন দেহ সম্বন্ধে এক সঠিক স্থিতিতে আসছে আর ইহা স্থূল ইন্দ্রিয়সংবিৎ দ্বারা অভিভূত ও অধিগত মানসিকতার মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করছে আর তার স্থলে গ্রহণ করছে বিষয়সমূহের আসল সত্যের দৃষ্টিভঙ্গি।

দ্বিতীয়তঃ দেহের ক্রিয়া ও অনুভূতি সম্বন্ধে মন জানতে পারে যে ইহার মধ্যে আসীন পুরুষ প্রথমতঃ বিভিন্ন ক্রিয়ার সাক্ষী বা দ্রষ্টা এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন অনুভূতির জ্ঞাতা বা বোদ্ধা। ইহা আর মননে ভাববে না বা ইন্দ্রিয়-সংবিৎ-এ অনুভব করবে না যে এইসব ক্রিয়া ও অনুভূতি তার নিজের, বরং বিবেচনা ও অনুভব করবে যে এই সব তার নিজের নয়, এইসব প্রকৃতির ক্রিয়া যা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ ও তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। এই বিচ্ছিন্নতাকে এত স্বাভাবিক করা যায় এবং এত দূর নেওয়া যায় যে মন ও দেহের মধ্যে একপ্রকার বিভাজন আসবে আর মন দেখবে ও অনুভব করবে যে শরীরের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রণা, ক্লান্তি, অবসাদ প্রভৃতি যেন অন্য কোনো লোকের অনুভূতি আর এই লোকের সহিত এত নিবিড় সংযোগ থাকে যে তার মধ্যে যা সকল কিছু ঘটছে সে তা জানতে পারে। প্রভুত্বলাভের পক্ষে এই বিভাজন এক বড় উপায়, এক বড় পদক্ষেপ; কারণ মন প্রথমে এইসব বিষয় দেখতে শুরু করে অভিভূত না হ'য়ে আর অবশেষে ইহা আদৌ তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হ'য়ে সেসব দেখে নিস্পৃহভাবে ও স্বচ্ছ বুদ্ধির সহিত তবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন

হ'য়ে। ইহাই দেহের দাসত্ব থেকে মনোময় পুরুষের প্রাথমিক মুক্তি; কারণ যথার্থজ্ঞান অবিচলিত ভাবে অনুশীলন করা হ'লে মুক্তি অনিবার্য।

সবশেষে মন জানতে পারবে যে মনের মধ্যকার পুরুষ প্রকৃতির অধীশ্বর আর তার ক্রিয়ার জন্য এই পুরুষের অনুমতি আবশ্যক। ইহা দেখবে যে প্রকৃতির পূর্বেকার সব অভ্যাসে সে গোড়ায় যে আদেশ দিয়েছিল সেই আদেশ সে অনুমন্তা হিসাবে প্রত্যাহার ক'রতে সমর্থ আর শেষ পর্যন্ত সেই অভ্যাস হয় বন্ধ হবে, নয় পুরুষের সংকল্পের দ্বারা নির্দিষ্ট দিকে তার গতি পরিবর্তিত হবে; তবে তৎক্ষণাৎ তা হবে না কারণ প্রকৃতির অতীত কর্ম নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তার দুরপনেয় ফল হিসাবে পূর্বেকার অনুমতি বজায় থাকে, আব অনেকখানি নির্ভর করে অভ্যাসের শক্তির উপর এবং মন ইহাকে কতদূর মৌলিক আবশ্যক ব'লে ভেবেছে সেই ভাবনার উপর; তবে মন, প্রাণ ও দেহের সম্পর্কের জন্য প্রকৃতি যেসব মৌলিক অভ্যাস স্থাপিত করেছে, যদি সেই সবের অন্তর্গত এই অভ্যাস না হয় আর যদি পুরণো অনুমতিকে মন নতুন ক'রে না দেয় বা অভ্যাসটিকে ইচ্ছা ক'রে প্রশ্রয় দেওয়া না হয় তাহ'লে শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন আসবে। এমনকি ক্ষুধা তৃষ্ণার অভ্যাসও কম করা, রোধ করা ও ত্যাগ করা সম্ভব; অনুরূপভাবে ব্যাধির অভ্যাসও কম করা ও ক্রমশঃ দূর করা সম্ভব, আর ইতিমধ্যে মনের যে সামর্থ্যে প্রাণিক শক্তির সচেতন প্রয়োগে বা শুধু মানসিক আদেশে দেহের বিভিন্ন অসুখ নিরাময় করা যায় তা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অনুরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই অভ্যাসের সংশোধন সম্ভব যার দরুণ দৈহিক প্রকৃতি কাজের কোনো কোনো রূপ ও পরিমাণকে মনে করে কষ্টকর, ক্লান্তিজনক বা অসাধ্য এবং এই দৈহিক যন্ত্রের দ্বারা সাধ্য শারীরিক বা মানসিক কর্মের সামর্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, ক্ষিপ্রতা ও কার্যকারিতা আশ্চর্যরকম বৃদ্ধি করা সম্ভব, তাকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, দশগুণ করা যায়।

সাধনপদ্ধতির এই দিকটি যথার্থতঃ আত্মসিদ্ধি যোগের অন্তর্ভুক্ত; তবে এখানে এই সব বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা ভাল, ইহার প্রথম কারণ এই যে পূর্ণযোগের এক অংশ হিসাবে আত্মসিদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের যা বলা প্রয়োজন আমরা তার এক ভিত্তি স্থাপন করি এইভাবে; আর দ্বিতীয় কারণ এই যে জড়বিজ্ঞান যেসব মিথ্যা ধারণা সাধারণের মধ্যে প্রচার করেছে সেসবের সংশোধন করা আমাদের কর্তব্য। এই বিজ্ঞানের কথায়, আমাদের অতীত বিবর্তনের দ্বারা যেসব সাধারণ মানসিক ও শারীরিক

অবস্থা এবং মন ও দেহের মধ্যে যেসব সম্পর্ক বাস্তব ভাবে গড়ে উঠেছে সেইগুলি সঠিক, স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থা, আর এই সব ছাড়া অন্য কিছু, ইহাদের বিপরীত কিছু হয় ব্যাধিগ্রস্ত ও বেঠিক, নয় মতিভ্রম, আত্ম-বঞ্চনা ও উন্মত্ততা। বলা বাহুল্য যে বিজ্ঞান নিজেই এই রক্ষণশীল নীতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, কারণ মানুষ যাতে প্রকৃতির উপর আরো বেশী প্রভুত্ব পায় তার জন্য ইহা কত পরিশ্রম ক'রে সফলতার সহিত প্রকৃতির সাধারণ সব ক্রিয়ার উন্নতিসাধন করে। এখানে বরাবরের মতো এই বলাই যথেষ্ট যে মানসিক ও শারীরিক অবস্থার এবং মন ও দেহের সম্পর্কের যে পরিবর্তনে সত্তার শুদ্ধতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, অনাবিল হর্ষ ও প্রশান্তি আসে, মনের নিজের উপর ও শারীরিক সব ক্রিয়ার সামর্থ্য বহুগুণিত হয়, এককথায় যাতে মানুষ তার নিজের প্রকৃতির উপর অধিকতর প্রভুত্ব লাভ করে, সেই পরিবর্তন স্পষ্টতঃই ব্যাধিগ্রস্ত নয়, ইহা যে মতিভ্রম বা আত্মপ্রবঞ্চনা তা-ও বলা যায় না কারণ ইহার সব ফল প্রত্যক্ষ ও সুনিশ্চিত। প্রকৃতির দ্বারা ব্যষ্টিজীবের যে বিকাশ সাধন হবে, বস্তুতঃ ইহা শুধু তার এক ইচ্ছাকৃত অগ্রবর্তী অবস্থা, প্রকৃতি এই বিকাশ যে কোনো ভাবেই সম্পাদন করবে, তবে এই ক্ষেত্রে সে মানবসংকল্পকে তার প্রধান সহায়ক হিসাবে কাজে লাগাতে ঠিক করে, কারণ তার মূল লক্ষ্য হ'ল পুরুষ যাতে প্রকৃতির উপর সচেতন প্রভুত্ব লাভ করে সেইমতো তাকে চালনা করা।

এই কথা বলার পর আমাদের আরো বলা দরকার যে জ্ঞানমার্গের সাধনায় মন ও দেহের সিদ্ধি আদৌ কোনো বিবেচনার বিষয় নয়, আর না হয় ইহা শুধু বিবেচনার গৌণ বিষয়। একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় হ'ল প্রকৃতি থেকে আত্মায় উত্তরণ ; আর তা করা চাই সম্ভবপর সবচেয়ে দ্রুত বা সবচেয়ে সম্পূর্ণ ও কার্যকরী পদ্ধতিতে ; আর যে পদ্ধতির বিবরণ আমরা দিচ্ছি তা সর্বাপেক্ষা দ্রুত না হ'লেও ফলপ্রসূতাতে সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ। আর এইখানে শারীরিক ক্রিয়া বা নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্ন ওঠে। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, যোগী যথাসম্ভব কর্ম থেকে সরে আসবে, আর বিশেষতঃ এই ভাবা হয় যে খুব বেশী কর্ম এক বাধা কারণ ইহাতে বাহিরের দিকে ক্রিয়াশক্তির অপচয় হয়। ইহার মধ্যে কিছু সত্য আছে ; আর আমাদের আরো মনে রাখা দরকার যে যখন মনোময় পুরুষ শুধু সাক্ষী ও দ্রষ্টার মনোভাব গ্রহণ করে তখন সত্তার উপর নীরবতা, নিঃসঙ্গতা, শারীরিক শান্তি ও দৈহিক নিষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ ইহার সহিত নিশ্চেষ্টতা,

অসামর্থ্য বা কর্মে অনিচ্ছা অর্থাৎ এককথায় তামসিক গুণের বৃদ্ধি না আসে ততক্ষণ ইহা মঙ্গলকর। কিছু না করার সামর্থ্য এক বড় সামর্থ্য, এক বড় প্রভুত্ব; আলস্য, অসামর্থ্য বা ক্রিয়ায় বিতৃষ্ণা ও নিষ্ক্রিয়তায় আসক্তি থেকে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন; জ্ঞানযোগীর পক্ষে মনন থেকে নিবৃত্ত হওয়ার সামর্থ্য, একান্ত নিভৃতে ও নীরবে অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকার সামর্থ্য, অবিচলিত শান্তির সামর্থ্য যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই প্রয়োজনীয় ক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত হওয়ার সামর্থ্য। যে এই সব অবস্থা গ্রহণ ক'রতে ইচ্ছুক নয়, সে এখনো পরমজ্ঞানাভিমুখী পথের যোগ্য হয়নি; যে এই সবের দিকে অগ্রসর হ'তে অক্ষম সে এখনো ঐ জ্ঞানলাভের অযোগ্য।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা উচিত যে সামর্থ্য থাকাই যথেষ্ট; সকল শারীরিক ক্রিয়া থেকে নিবৃত্তি অপরিহার্য নয়; মানসিক বা দৈহিক ক্রিয়াতে বিতৃষ্ণা কাম্য নয়। জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থার সাধকের কর্তব্য—যেমন কর্মে আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া, তেমন সমভাবে মুক্ত হওয়া নৈষ্কর্ম্যে আসক্তি থেকে। বিশেষতঃ মনের বা প্রাণের বা দেহের শুধু নিশ্চেষ্টতার সকল প্রবণতাই অতিক্রম করা চাই, আর যদি দেখা যায় যে প্রকৃতির উপর ঐ অভ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাহ'লে ইহাকে দূর করার জন্য পুরুষের সংকল্প প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থা আসে যখন দেহ ও প্রাণ কাজ করে মনের মধ্যে পুরুষের সংকল্পের শুধু যন্ত্র হিসাবে, তাতে কোনো কষ্টবোধ বা আসক্তি থাকে না, আর তারা যে কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাতে সেই হীন, অধীর ও প্রায়শঃই উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি থাকে না; যা সাধারণ কর্মপ্রণালীর প্রকৃতি। যেমন প্রকৃতির সব শক্তি কাজ করে, দেহ ও প্রাণও কাজ করতে আসে তেমনভাবে—বিনা উদ্বেগে, বিনা পরিশ্রমে, বিনা প্রতিক্রিয়ায়; এই সব হ'ল সেই দেহবদ্ধ প্রাণের বৈশিষ্ট্য যা এখনো ভৌতিক সত্তার প্রভু হয়নি। যখন আমরা এই সিদ্ধি লাভ করি, তখন ক্রিয়ায় বা নিষ্ক্রিয়তায় কিছু আসে যায় না, কারণ ইহাদের কোনোটিই অন্তঃপুরুষের মুক্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে না, অথবা আত্মার দিকে তার এষণা থেকে বা আত্মার মধ্যে তার স্থিতি থেকে তাকে সরিয়ে আনে না। কিন্তু যোগে এই সিদ্ধির অবস্থা আসে পরে, আর তা না আসা পর্যন্ত গীতা-বিহিত মিতাচারের নিয়মই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে প্রশস্ত; সুতরাং অত্যধিক মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়া ভালো নয়, কারণ অত্যধিক পরিশ্রমে অত্যধিক ক্রিয়াশক্তির অপচয় হয়, আর আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর

ইহার প্রতিক্রিয়া অশুভজনক; আবার খুব কম কাজ করাও ভালো নয়, কারণ এই ত্রুটির ফলে নিষ্ক্রিয়তার, এমন কি অক্ষমতার অভ্যাস জন্মায়, আর ইহাকে আবার জয় করতে হয় কষ্ট ক'রে। তবু, মাঝে মাঝে একান্ত শান্তি, নিঃসঙ্গতা ও কর্ম থেকে নিবৃত্তি অতীব বাঞ্ছনীয় এবং অন্তঃপুরুষের নিজের মধ্যে অপসরণের জন্য এইসব যত ঘন ঘন সম্ভব তত ঘন ঘন পাওয়া উচিত, কারণ এইরূপ অপসরণ জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য।

এইভাবে দেহের সহিত ব্যবহারে, প্রাণ অর্থাৎ প্রাণশক্তি'রও সহিত আমাদের ব্যবহার করা দরকার। কাজের জন্য, প্রাণশক্তিকে দুই পৃথক ভাগে ভাগ করা দরকার—স্থূলপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণশক্তি যখন দেহের মধ্যে কাজ করে, এবং সূক্ষ্ম প্রাণ অর্থাৎ প্রাণশক্তি যখন মানসিক ক্রিয়ার সমর্থনে কাজ করে। কারণ আমরা সর্বদাই এক দ্বিবিধ জীবন যাপন করি—মানসিক ও শারীরিক; আর একই প্রাণশক্তি যখন যেটির কাজ করে তখন সেইমতো ভিন্নভাবে সক্রিয় হয় এবং ভিন্নরূপ ধারণ করে। দেহের মধ্যে ইহা আনে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, স্বাস্থ্য, রোগ, শারীরিক স্ফূর্তি প্রভৃতি অর্থাৎ যেগুলি দেহের প্রাণিক অনুভূতি। কারণ মানুষের স্থূল দেহ পাথর বা মাটির মতো নয়; প্রাণকোষ ও অন্নকোষ—এই দুই কোষের সমষ্টি ইহা, আর এই দুয়ের অবিরত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই ইহার জীবন। তবু প্রাণশক্তি ও শরীর—দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ; আর দেহের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকার বোধ থেকে মন যত সরে আসে তত বেশী আমরা সজ্ঞান হই প্রাণ ও দেহযন্ত্রের মধ্যে তার ক্রিয়া সম্বন্ধে, আর সমর্থ হই ইহার কাজ নিরীক্ষণ ক'রতে এবং উত্তরোত্তর নিয়ন্ত্রণ করতে। কার্যতঃ দেহ থেকে সরে এসে আমরা স্থূল প্রাণশক্তি থেকেও পিছিয়ে আসি, আর তা আসি এমনকি যখন আমরা দুটির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি আর অনুভব করি যে শুধু দৈহিক যন্ত্র অপেক্ষা আমাদের অধিকতর নিকটবর্তী। বস্তুতঃ দেহকে সম্পূর্ণ জয় করার উপায় হ'ল স্থূল প্রাণশক্তিকে জয় করা।

দেহ ও ইহার বিভিন্ন কর্মের প্রতি আসক্তি'র সহিত দেহমধ্যস্থ প্রাণের প্রতি আসক্তিও জয় করা হয়। কারণ যখন আমরা অনুভব করি যে এই স্থূল শরীর "আমরা" নয়, ইহা শুধু এক পরিচ্ছদ বা যন্ত্র তখন দেহ-নাশের প্রতি যে জুগুপ্সা প্রাণিক মানবের এত প্রবল ও দুর্বার সহজসংস্কার তা হ্রাস পেতে বাধ্য এবং তাকে বাহিরে নিক্ষেপ করা সম্ভব। ইহাকে বাহিরে নিক্ষেপ করতেই হবে এবং তা করা চাই সম্পূর্ণভাবে। মানবের

যে মৃত্যুভয় ও দেহনাশের প্রতি বিতৃষ্ণা তা তার পূর্ব পশুজন্ম থেকে পাওয়া কলঙ্ক। সে কালিমা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা চাই।

অষ্টম অধ্যায়

হৃদয় ও মন থেকে বিমুক্তি

কিন্তু ঊর্ধ্বগামী অন্তঃপুরুষ শুধু যে দেহমধ্যস্থ প্রাণ থেকে নিজেকে পৃথক করবে তা নয়, মনের মধ্যে প্রাণশক্তির ক্রিয়া থেকেও তার নিজেকে পৃথক করা দরকার; পুরুষের প্রতিনিধি রূপে তার মনকে বলা চাই, "আমি প্রাণ নই, প্রাণ পুরুষের আত্মা নয়, ইহা প্রকৃতির এক ক্রিয়ামাত্র, আর তা-ও অনেকগুলি ক্রিয়ার মধ্যে একটিমাত্র।" প্রাণের বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্রিয়া ও গতি, ব্যক্তির নিকট যা বাহ্য তা ভিতরে গ্রহণ ক'রে আত্মসাৎ করার জন্য উদ্যম এবং ইহা যা ধরে বা যা ইহার কাছে আসে তাতে তৃপ্তি বা অতৃপ্তির এক তত্ত্ব; এই তত্ত্বটি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সর্বব্যাপী তথ্যের সহিত সহচরিত। প্রকৃতির সর্বত্র এই তিনটি বিষয় বিদ্যমান, কারণ প্রাণ বিদ্যমান প্রকৃতির সর্বত্র। কিন্তু আমরা মনোময় পুরুষ হওয়ায় এসবকে আমাদের ভিতর এক মানসিক মূল্য দেওয়া হয়, আর এই মূল্য হয় সেই মন অনুযায়ী যে মন এসব দেখে ও গ্রহণ করে। তারা নেয় ক্রিয়ার, কামনার এবং পছন্দ ও অপছন্দের, সুখ ও দুঃখের রূপ। প্রাণ আমাদের মধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান, ইহা যে শুধু আমাদের দেহের ক্রিয়ার অবলম্বন তা নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়মানস, ভাবমানস, আমাদের ভাবনা-মানসেরও ক্রিয়ার অবলম্বন ইহা, আর এই সবের মধ্যে ইহা তার নিজের বিধান বা ধর্ম এনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, গণ্ডি টানে, তাদের সঠিক ক্রিয়াকে বৈষম্যের মধ্যে ফেলে এবং সেই অব্যবস্থার অশুদ্ধতা ও ব্যামিশ্রভাব উৎ-পাদন করে যা আমাদের মানসতাত্ত্বিক জীবনের সমগ্র অশুভ। সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে বিধানের আধিপত্য বেশী মনে হয় তা হ'ল কামনার বিধান। যেমন সর্বগ্রাহী, সর্বাধিকারী বিশ্বাত্মক ভাগবত সত্তা কাজ করেন, সঞ্চরণ করেন, উপভোগ করেন কেবলমাত্র দিব্য আনন্দের তৃপ্তির জন্য। তেমন ব্যষ্টি প্রাণ কাজ করে, সঞ্চরণ করে, সুখ ও কষ্টভোগ করে প্রধা-নতঃ কামনার তৃপ্তির জন্য। সুতরাং সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি আমাদের অনু-ভূতিতে আবির্ভূত হয় একপ্রকার কাম-মানস রূপে, আর ইহাকে জয় করা আমাদের দরকার যদি আমরা ফিরে পেতে চাই আমাদের প্রকৃত আত্মাকে।

কামনা যেমন আমাদের সব ক্রিয়ার প্রবর্তনের মূল, তেমন সব ক্রিয়াকে সমাধার পথে তোলার মূলেও এই কামনা, আবার আমাদের জীবনের সকল অনর্থেরও মূল ইহা। যদি আমাদের ইন্দ্রিয়মানস, ভাবমানস, ভাবনামানস, কাজ করতে পারত প্রাণশক্তির অযথা প্রবেশ ও তার আনা বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত হ'য়ে আর যদি ঐ শক্তিকে আমাদের জীবনের উপর তার নিজের শাসন আরোপ না ক'রে তাদের সঠিক ক্রিয়া অনুযায়ী চলতে বাধ্য করা হ'ত তাহ'লে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সামঞ্জস্যের সহিত তাদের সঠিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হ'ত। প্রাণশক্তির যথার্থ কাজ হ'ল,—আমাদের অন্তঃস্থ দিব্য তত্ত্ব তাকে যা আদেশ দেয় তা-ই করা, ঐ অন্তরাধিষ্ঠিত ভগবান তাকে যা দেন তা গ্রহণ করা ও উপভোগ করা এবং মোটেই কামনা না করা। ইন্দ্রিয়মানসের যথার্থ কাজ হ'ল প্রাণের বিভিন্ন স্পর্শের নিকট নিষ্ক্রিয় ও দীপ্তভাবে উন্মুক্ত থাকা, এবং তাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎ এবং তাদের মধ্যস্থ রস অর্থাৎ সঠিক আস্বাদন ও আনন্দের তত্ত্ব পরতর ব্যাপারের নিকট প্রেরণ করা; কিন্তু দেহমধ্যস্থ প্রাণশক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান, তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, ক্ষমতা ও অক্ষমতার দ্বারা ব্যাহত হওয়ায়, প্রথমতঃ ইহার পরিধি সংকুচিত হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা এই সব গণ্ডীর মধ্যে জড়গত প্রাণের এই সকল বৈষম্যের সহিত যুক্ত হ'তে বাধ্য হয়। জীবনের আনন্দের যন্ত্র না হ'য়ে ইহা হ'য়ে ওঠে সুখ ও দুঃখের যন্ত্র।

অনুরূপ ভাবে ভাবমানস এইসব বৈষম্য লক্ষ্য ক'রতে এবং তাদের ভাবগত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার বশীভূত হ'তে বাধ্য হওয়ায় ইহা হ'য়ে ওঠে এমন এক দ্বন্দ্বময় রণক্ষেত্র যেখানে চলে হর্ষ ও শোক, প্রেম ও ঘৃণা, ক্রোধ, ভয়, সংগ্রাম, আস্পৃহা, বিরক্তি, পছন্দ, অপছন্দ, উপেক্ষা, সন্তোষ, অসন্তোষ, আশা, নিরাশা, কৃতজ্ঞতা, প্রতিহিংসা প্রভৃতির অর্থাৎ প্রচণ্ড ভাবা-বেগের বিরাট ক্রীড়া; আর ইহাই তো জগতের জীবননাটক। এই নৈরাজ্য-কেই আমরা বলি আমাদের অন্তঃপুরুষ। কিন্তু প্রকৃত অন্তঃপুরুষ, প্রকৃত চৈত্যসত্তা আমাদের অধিকাংশের কাছেই অদেখা, মানবজাতির মধ্যে খুব কম লোকেরই মধ্যে তার বিকাশ হ'য়েছে; ইহা শুদ্ধ প্রেম, হর্ষ ও দীপ্ত প্রযত্নের এমন এক যন্ত্র যার কাজ হ'ল ভগবান ও আমাদের জীব-ভাইদের সহিত সম্মিশন ও ঐক্যলাভ। এই চৈত্যসত্তা আহত থাকে সেই মনো-ভাবাপন্ন প্রাণের অর্থাৎ কাম-মানসের ক্রীড়ার দ্বারা যাকে আমরা অন্তঃ-

পুরুষ ব'লে ভুল করি; ভাবমানস আমাদের অন্তঃস্থ প্রকৃত অন্তঃপুরুষকে, আমাদের হৃদিস্থিত ভগবানকে প্রতিফলিত করতে অসমর্থ, তার পরিবর্তে ইহা বাধ্য হয় কামমানসকে প্রতিফলিত করতে।

তেমন ভাবনামানসেরও যথার্থ কাজ হ'ল জ্ঞানে অনুরাগবিহীন আনন্দ নিয়ে পর্যবেক্ষণ, অবধারণ ও বিচার করা এবং নিজেকে উন্মুক্ত রাখা সেই সব বার্তা ও দীপ্তিছটার দিকে যেসব সক্রিয় হয় তার সব দেখা বিষয়ের উপর এবং সেসবেরও উপর যেগুলি তখনো তার কাছে গোপন থাকে তবে উত্তরোত্তর প্রকাশ হ'তে বাধ্য আর এইসব বার্তা ও দীপ্তিছটা আমাদের মানসিকতার উর্ধ্বে আলোকের মধ্যস্থিত গোপন দিব্য বাণী থেকে আমাদের নিকট গূঢ়ভাবে নিম্নে ঝলক দেয় তবে মনে হ'তে পারে তারা হয় বোধিত মনের মাধ্যমে নিম্নে আসে, নয় দ্রষ্টা হৃদয় থেকে উপরে ওঠে। কিন্তু এই কাজ ভাবনামানস সঠিকভাবে করতে পারে না, আর তার কারণ এই যে ইহা ইন্দ্রিয়স্থিত প্রাণশক্তির সসীমতায় ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ভাবাবেগের বৈষম্যের সসীমতায় আবদ্ধ থাকে এবং আবদ্ধ থাকে নিজেরই সেইসব বুদ্ধিগত রুচি, নিশ্চেষ্টতা, প্রয়াস, একগুঁয়েমির সসীমতায় যেসব রূপ সে নিজের মধ্যে নেয় এই কামমানস, সূক্ষ্ম প্রাণের প্রভাবে। যেমন উপনিষদে বলা হয়েছে--আমাদের সমগ্র মানসচেতনা এই প্রাণের এই প্রাণশক্তির সূত্র ও স্রোতধারায় ওতপ্রেতভাবে জড়িত ; এই প্রাণ চেষ্টা করে, গণ্ডী টানে, ধারণ করে, হারিয়ে ফেলে, কামনা করে ও কষ্টভোগ করে, আর ইহাকে বিশুদ্ধ করা হ'লেই আমরা সক্ষম হই আমাদের প্রকৃত ও সনাতন আত্মাকে জানতে ও অধিগত করতে।

একথা সত্য যে এই সব অনর্থের মূল হ'ল অহং-বোধ আর সচেতন অহংবোধের আসন স্বয়ং মনের মধ্যে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সচেতন মন শুধু প্রতিফলিত করে এমন এক অহং যা ইতিপূর্বেই বিষয়সমূহের অবচেতন মনে সৃষ্ট হ'য়েছিল,--ইহাই সেই প্রস্তর ও উদ্ভিদের মধ্যস্থ মূক অন্তঃ-পুরুষ যা সকল দেহ ও প্রাণের মধ্যে উপস্থিত থাকে আর শুধু শেষ পর্বে স্বর পায় ও জেগে ওঠে; কিন্তু ইহা আদিতে সচেতন মনের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। আর এই উত্তরায়ণে প্রাণশক্তিই হ'য়ে উঠেছে অহং-এর কঠিন গ্রন্থি; কামমানস এই গ্রন্থি শিথিল করতে দেয় না; এমনকি যখন বুদ্ধি ও হৃদয় তাদের অনর্থের কারণ বুঝতে পারে ও তা দূর করতে পারলে খুসী হয় তখনও না; কারণ তাদের মধ্যকার প্রাণই সেই পশু যে বিদ্রোহ

করে ও তাদের জ্ঞান আচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত করে এবং তার অস্বীকৃতির দ্বারা জোর ক'রে তাদের সংকল্প দমন করে।

সুতরাং মনোময় পুরুষের কর্তব্য নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা যাতে এই কামমানসের সহিত তার কোনো সম্বন্ধ না থাকে ও তাকে নিজ বলে না সে মনে করে। তাকে বলতে হবে, "আমি এই জিনিষ নয় যা সংগ্রাম করে ও কষ্টভোগ করে, যা শোক ও আনন্দ, প্রেম ও ঘৃণা, আশা ও ব্যর্থতা, ক্রোধ ও ভয় ও সুখ ও অবসাদের বশীভূত, অর্থাৎ যা প্রাণিক বৃত্তি ও উগ্র ভাবাবেগের অধীন। এইসব শুধু ইন্দ্রিয়গত ও ভাবগত মনে প্রকৃতির ক্রিয়া ও অভ্যাস।" তখন মন তার সব ভাবাবেগ থেকে সরে এসে দৈহিক ক্রিয়া ও অনুভূতির মতো ইহাদেরও দ্রষ্টা বা সাক্ষী হ'য়ে ওঠে। আবার আসে এক আন্তর বিভাজন। একদিকে এই ভাবগত মন যার মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের অভ্যাস অনুযায়ী সব বৃত্তি ও উগ্র ভাবাবেগ পূর্বের মতো চলতে থাকে, আর অন্যদিকে দ্রষ্টা মন যে এইসব দেখে, বিচার করে ও অবধারণ করে কিন্তু সেসব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। ইহা এইসব দেখে যেন ইহা ছাড়া অন্যসব অভিনেতা মানসিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করছে; প্রথমে তার আগ্রহ থাকে ও মাঝে মাঝে আগের মতো নিজেকে তাদের সাথে এক মনে করে, পরে দেখে সম্পূর্ণ শান্তভাবে ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এবং সবশেষে ইহা যে শুধু শান্ত থাকে তা নয়, নিজের নীরব সত্তার শুদ্ধ আনন্দ ভোগ করে আর ছোট ছেলে যেমন খেলতে খেলতে খেলার মধ্যে ডুবে গিয়ে দুঃখকষ্ট পেলে, আমরা তার কল্পনার দুঃখকষ্টে হাসি, ইহাও তেমন সেই অভিনয়ের অবাস্তবতায় হাসে। দ্বিতীয়তঃ ইহা জানতে পারে যে ইহা নিজেই অনুমতির কর্তা আর অনুমতি প্রত্যাহার ক'রে ইহা অভিনয় বন্ধ ক'রে দিতে সক্ষম। অনুমতি প্রত্যাহার করা হ'লে অপর এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে; ভাবগত মন সাধারণতঃ শান্ত ও শুদ্ধ হ'য়ে উঠে এই সব প্রতিক্রিয়া থেকে নিস্তার পায়, আর এমনকি এইসব এলেও তারা আর ভিতর থেকে আসে না, মনে হয় তারা যেন বাইরে থেকে আসে আর মনের উপর তাদের ছাপ পড়ে যেসব ছাপে মনের তন্তুগুলি তখনো সাড়া দিতে সক্ষম; কিন্তু সাড়া দেবার এই অভ্যাস চলে যায় আর যথাসময়ে ভাবগত মন তার পরিত্যক্ত সব উগ্র ভাবাবেগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। আশা ও ভয়, হর্ষ ও শোক, পছন্দ ও অপছন্দ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, সন্তোষ ও অসন্তোষ, আনন্দ ও অবসাদ, ত্রাস ও ক্রোধ ও ভয় ও বিরক্তি ও লজ্জা

এবং প্রেম ও ঘৃণার প্রচণ্ড ভাবাবেগ—এসব খসে পড়ে মুক্ত চৈত্যপুরুষ থেকে।

কি আসে তাদের জায়গায়? আমরা জোর ক'রে চাইলে আসতে পারে সম্পূর্ণ শান্তি, নীরবতা ও উপেক্ষা। কিন্তু যদিও এই অবস্থার মধ্য দিয়ে অন্তঃপুরুষকে সাধারণতঃ যেতে হয়, তাহ'লেও আমোদের যে চরম লক্ষ্য তা ইহা নয়। সুতরাং পুরুষ আবার হ'য়ে ওঠে অধীশ্বর যে সংকল্প করে, আর যার সংকল্প হ'ল অনুচিত উপভোগ সরিয়ে তার স্থানে আনা চৈত্য-জীবনের উচিত উপভোগ। সে যা সংকল্প করে প্রকৃতি তা নিষ্পাদন করে। যা ছিল কামনা ও প্রচণ্ড ভাবাবেগের উপাদান তা-ই হ'য়ে ওঠে শুদ্ধ, সম ও শান্ত প্রগাঢ় প্রেম ও হর্ষ ও একত্বের সত্যবস্তু। প্রকৃত অন্তঃপুরুষ বাহির হ'য়ে অধিষ্ঠিত হয় কামমানসের শূন্য স্থানে। যে পাত্র পরিষ্কার ও শূন্য করা হ'য়েছে তা পূর্ণ করা হয় দিব্য প্রেম ও আনন্দের মদিরায়, তাতে আর দেওয়া হয় না প্রচণ্ড ভাবাবেগের মিষ্ট ও তিক্ত গরল। সকল প্রচণ্ড ভাবাবেগই, এমনকি মঙ্গলের জন্য এরূপ ভাবাবেগ দিব্য প্রকৃতির মিথ্যা রূপ। কৃপার উগ্রভাব আর তার সব অশুদ্ধ উপাদান যেমন শারীরিক জুগুপ্সা ও অপরের দুঃখকষ্ট সহ্য করার ভাবগত অক্ষমতা—এসব বর্জন ক'রে তার স্থলে আনতে হবে পরতরা দিব্য করুণা যা অপরের ভার দেখে, বোঝে ও গ্রহণ করে এবং সাহায্য ও সুস্থ করতে সক্ষম, তবে নিজের ইচ্ছা-মতো জগতের দুঃখকষ্টে বিদ্রোহ ক'রে নয়, অথবা কিছু না জেনে বিষয়-সমূহের বিধান ও তাদের উৎসকে মিথ্যা দোষ দিয়ে নয়; সে তা করে আলোক ও জ্ঞানের সহিত এবং ভগবানের প্রকট হওয়ার ব্যাপারে তাঁর যন্ত্ররূপ। সেইরকম যে প্রেম কামনা করে ও সাগ্রহে গ্রহণ করে, আর হর্ষে উদ্বিগ্ন হয় এবং শোকে ভেঙে পড়ে—তা-ও বর্জন ক'রে আনতে হবে সেই সব সর্বগ্রাহী প্রেম যা এই সব থেকে মুক্ত, যার থাকা না থাকা কোনো বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে না এবং প্রত্যুত্তর আসুক বা না আসুক যার কোনো তারতম্য হয় না। এইভাবে আমরা অন্তঃপুরুষের সব গতির সহিত মোকাবিলা করব; কিন্তু এসব সম্বন্ধে আমরা পরে আরো বলব আত্মসিদ্ধি যোগের আলোচনা প্রসঙ্গে।

কর্ম ও নৈষ্কর্ম্য সম্বন্ধে যে কথা হ'য়েছিল, সেই একই কথা এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে—একদিকে উপেক্ষা ও শান্তি, অন্যদিকে সক্রিয় হর্ষ ও প্রেম। সমত্বই ভিত্তি, উপেক্ষা নয়। হর্ষ ও শোকের কারণগুলি সম্বন্ধে

সম তিতিক্ষা, নিরপেক্ষ উপেক্ষা, এমন শান্ত প্রপত্তি যাতে শোক বা হর্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া থাকে না––এইসব সমত্বের প্রস্তুতি ও নঞর্থক ভিত্তি; কিন্তু সমত্ব পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না ইহা প্রেম ও আনন্দের সদর্থক রূপ নেয়। ইন্দ্রিয়মানসকে পেতে হবে সর্ব-সুন্দরের সম রস, হৃদয়কে পেতে হবে সকলের জন্য সম প্রেম ও আনন্দ, আর সূক্ষ্মপ্রাণের পাওয়া চাই এই রস, প্রেম ও আনন্দের উপভোগ। অবশ্য ইহাই সেই সদর্থক সিদ্ধি যা আসে মুক্তির দ্বারা; কিন্তু জ্ঞানমার্গে আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য বরং সেই মুক্তি যা পাওয়া যায় কামমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ও ইহার সব প্রচণ্ড ভাবাবেগ ত্যাগ ক'রে।

মনন-যন্ত্র থেকেও কামমানসকে বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য, আর তা করার প্রকৃষ্ট উপায় হ'ল মনন ও মতামত থেকে পুরুষের বিচ্ছিন্ন হওয়া। সত্তার সম্যক্ শুদ্ধিকরণ কি––সে সম্বন্ধে যখন আমরা আগে বিবেচনা করেছিলাম তখনই আমরা এই বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে বলেছি। কারণ জ্ঞান-সাধনার এই যে সব প্রক্রিয়ার কথা আমরা বর্ণনা করছি তা হ'ল শুদ্ধিকরণ ও মুক্তিসাধনের পদ্ধতি যার সাহায্যে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত আত্ম-জ্ঞান সম্ভব হয়ে ওঠে, আর উত্তরোত্তর আত্মজ্ঞান নিজেই শুদ্ধি ও মুক্তির এক করণ। সত্তার বাকীসব অংশ সম্বন্ধে যে পদ্ধতি নেওয়া হয় ভাবনামানস সম্বন্ধেও সেই একই পদ্ধতি। পুরুষ প্রথমে ভাবনামানসকে ব্যবহার করবে প্রাণ ও দেহের সহিত এবং কামনা ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ভাবাবেগের মনের সহিত নিজের একাত্মতাবোধ থেকে বিমুক্ত হবার জন্য এবং পরে স্বয়ং ভাবনামানসের দিকেই ঘুরে বলবে "আমি ইহাও নই; আমি মনন নই, মননকর্তাও নই; ধীশক্তির এইসব ভাবনা, মতামত, কল্পনা, প্রচেষ্টা, ইহার বিভিন্ন পূর্বানুরাগ, পছন্দ, মত, সংশয়, আত্ম-সংশোধন––এসব আমি নয়; এইসব শুধু ভাবমানসের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া।" এইভাবে এক বিভাজন সৃষ্টি হয়––এক মন যে চিন্তা ও সংকল্প করে, অন্য মন যা পর্যবেক্ষণ করে, আর পুরুষ হ'য়ে ওঠে শুধু সাক্ষী; সে তার মননের ধারা ও সব বিধান দেখে, অবধারণ করে, কিন্তু তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে। ইহার পর অনুমতি দাতা হিসাবে সে মানসিক নিম্নস্রোত ও যুক্তি-বুদ্ধির ব্যামিশ্রতা থেকে তার পূর্বঅনুমতি প্রত্যাহার ক'রে উভয়কেই বাধ্য করে তাদের সব দুরাগ্রহ থেকে নিবৃত্ত হ'তে। চিন্তাশীল মনের অধীনতা থেকে সে মুক্ত হ'য়ে ওঠে আর সমর্থ হয় পূর্ণ নীরবতা পেতে।

সিদ্ধির জন্য আরো যা দরকার তা হ'ল স্বীয় প্রকৃতির অধীশ্বর হিসাবে নিজের স্থান পুনরায় গ্রহণ করা, আর গ্রহণ করা সেই সংকল্প যা দিয়ে ক্ষুদ্র মানসিক নিম্নস্রোত ও ধীশক্তি সরিয়ে উপর থেকে আলো-করা ঋতচেতন মনন আনা সম্ভব। কিন্তু নীরবতা আবশ্যক; মননে নয়, নীরবতার মধ্যেই আমরা আত্মাকে পাব, তাকে জানতে পারব, শুধু যে তার প্রত্যয় পাব তা নয়, আর মনোময় পুরুষ থেকে বাহিরে সরে এসে প্রবেশ করব তার মধ্যে যা মনের উৎস। কিন্তু এই সরে আসার জন্য আবশ্যক এক অন্তিম মুক্তি, মনস্থিত অহং-বোধ থেকে বিমুক্তি।

নবম অধ্যায়

অহং-বিমুক্তি

বিশ্বপ্রাণের উত্তরোত্তর বিবর্তনে তার প্রথম বড় কাজ হ'ল দেহ-বোধে আবদ্ধ এক মানসিক ও প্রাণিক অহং গঠন; কারণ জড় থেকে সচেতন জীব সৃষ্টি করার জন্য এই উপায়টিই সে পেয়েছিল। আবার এই বিশ্বপ্রাণের দিব্য পরিণতি লাভেরও একমাত্র সর্ত, প্রয়োজনীয় উপায় হ'ল এই সীমাকারী অহং-এর লয়; কারণ একমাত্র এইভাবেই সচেতন জীব পেতে পারে তার বিশ্বাতীত আত্মা অথবা তার প্রকৃত ব্যক্তি। এই দ্বিবিধ গতিকে সাধারণতঃ চিত্রিত করা হয় এক পতন ও উদ্ধার রূপে অথবা সৃষ্টি বা ধ্বংস রূপে---যেন একটি আলো জ্বালা ও তার নিভে যাওয়া অথবা প্রথমে এক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অস্থায়ী ও অসত্য আত্মার গঠন এবং তা থেকে আমাদের সত্যকার আত্মার শাশ্বত বৃহত্ত্বে বিমুক্তি। কারণ মানব মনন দুইটি বিপরীত প্রান্তের দিকে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে---একটি ঐহিক ও অর্থক্রিয়াকারী যাতে ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক অহংবোধের চরিতার্থতা ও তৃপ্তিসাধনকেই জীবনের উদ্দেশ্য গণ্য করা হয় আর তার বেশী কিছু দেখা হয় না; অন্যটি আধ্যাত্মিক, দার্শনিক বা ধর্মীয় যাতে অন্তঃপুরুষের, বা চিৎপুরুষের বা অন্য কিছু চরম সত্তার জন্য অহং জয় করাই একমাত্র পরম কর্তব্য ব'লে গণ্য করা হয়। এমনকি অহং-এর শিবিরেও দুইটি বিভিন্ন মত আছে যাতে বিশ্ব সম্বন্ধে ঐহিক বা জড়বাদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি চিন্তাধারায় মনে করা হয় যে মানসিক অহং আমাদের মানসিকতার সৃষ্টি আর দেহের মৃত্যুর দ্বারা মনের লয়ের সাথে ইহারও লয় হবে; একমাত্র স্থায়ী সত্য হ'ল চিরন্তনী প্রকৃতি যা এই বা অন্য জাতির মধ্যে কর্মরতা আর তারই উদ্দেশ্য পালন করা উচিত, আমাদের নয়। জাতির, সমষ্টিগত অহং-এর চরিতার্থতাসাধনই জীবনের বিধি হওয়া উচিত, ব্যষ্টির চরিতার্থতা নয়। অপর চিন্তাধারাটির প্রবণতা প্রাণবাদের দিকেই বেশী; তাতে স্থির করা হয় যে সচেতন অহংই প্রকৃতির পরম অবদান,---তা সে যতই স্বল্পস্থায়ী হ'ক; ইহাতে অহংকে এক মহৎ স্থান দিয়ে বলা হয় যে ইহা "হওয়ার সংকল্পের" (will-to-be) মানবীয়

প্রতিনিধি আর ইহার মহত্ত্ব ও তৃপ্তিসাধনই আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। অন্য যে আরো অনেক দর্শন কোনো প্রকার ধর্মভাবনা বা আধ্যাত্মিক সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত সেসবেও অনুরূপ পার্থক্য আছে। বৌদ্ধ মতে কোনো প্রকৃত আত্মা বা অহং নেই, ইহাতে কোনো বিশ্বাত্মক বা বিশ্বাতীত পুরুষ স্বীকার করা হয় না। অদ্বৈতবাদী বলে আপাতপ্রতীয়মান ব্যষ্টিপুরুষ পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়, ইহার ব্যষ্টিত্ব মায়া; ব্যষ্টি জীবন পরিহার করাই একমাত্র সত্যকার মোক্ষ। আবার অন্য কিছু দর্শন এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে; তাদের মতে মানবের অন্তঃপুরুষ চিরস্থায়ী; ইহা পরম একের মধ্যে বহুল চেতনার ভিত্তি, আর না হয় ইহা নির্ভরশীল কিন্তু তবু পৃথক এক সত্তা, ইহা নিত্য, সত্য, অবিনশ্বর।

এই সব বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মতের মধ্য থেকে জ্ঞানসাধকের নিজে ঠিক করা চাই তার পক্ষে কোন জ্ঞান প্রশস্ত। কিন্তু যদি আধ্যাত্মিক মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক চরিতার্থতা আমাদের লক্ষ্য হয় তাহ'লে অহং-এর এই ক্ষুদ্র গঠন অতিক্রম করা অবশ্য কর্তব্য। মানুষের অহংভাব ও তার তৃপ্তির মধ্যে কোনো দিব্য পরিণতি ও উদ্ধার সম্ভব নয়। এমনকি নৈতিক অগ্রগতি ও উন্নতিরও জন্য, সামাজিক মঙ্গল ও পূর্ণতারও জন্য অহংভাবের কিছু শুদ্ধি অত্যাবশ্যক; আর আন্তর শান্তি, বিশুদ্ধতা ও হর্ষের জন্য ইহা আরো বেশী অপরিহার্য। কিন্তু যদি আমাদের লক্ষ্য হয় মানবপ্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতিতে উন্নীত করা, তাহ'লে শুধু অহং-ভাব থেকে নয়, অহং-ভাবনা ও অহং-বোধ থেকেও আরো অধিক মৌলিক উদ্ধার প্রয়োজনীয়। অনুভূতিতে দেখা যায় যে যতই আমরা এই সীমাকারী মানসিক ও প্রাণিক অহং থেকে নিজেদের উদ্ধার করি ততই আমরা আয়ত্ত করি বিশালতর জীবন, বৃহত্তর সত্তা, উচ্চতর চেতনা, আরো সুখময় পুরুষ-অবস্থা, এমনকি মহত্তর জ্ঞান, সামর্থ্য ও ক্ষেত্র। এমনকি অতি ঐহিক দর্শনও যে লক্ষ্যের প্রয়াসী অর্থাৎ ব্যষ্টির চরিতার্থতা, পূর্ণতা ও তৃপ্তি তা পাবারও সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় সেই একই অহং-এর তৃপ্তিসাধন নয়, সে উপায় হ'ল এক উচ্চতর ও বৃহত্তর আত্মায় মুক্তিলাভ। শাস্ত্র বলে "সত্তার ক্ষুদ্রতায় সুখ নেই, সুখ আসে বৃহৎ সত্তালাভে" (যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি)। স্বভাবতঃই অহং সত্তার ক্ষুদ্রতা; ইহা চেতনাকে সঙ্কুচিত করে আর এই সঙ্কোচনের সহিত আনে জ্ঞানের সসীমতা

ও অসামর্থ্যকারী অজ্ঞান,—আনে আবদ্ধতা ও সামর্থ্য-হ্রাস এবং এই হ্রাসের দ্বারা অক্ষমতা ও দুর্বলতা, আনে একত্বের ছেদ এবং ঐ ছেদের দ্বারা অসামঞ্জস্য এবং সমবেদনা ও প্রেম ও বুদ্ধির হানি, আনে সত্তার আনন্দের নিবৃত্তি বা অংশীকরণ এবং ঐ অংশীকরণের দ্বারা দুঃখ যন্ত্রণা। যা আমরা হারিয়েছি তা ফিরে পাবার জন্য আমাদের কর্তব্য হ'ল অহং-এর সব জগৎ থেকে জোর ক'রে বাহির হ'য়ে আসা। অহংকে হয় নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে বিলীন হ'তে হবে, নয় এক বৃহত্তর 'আমি'র মধ্যে মিশে এক হ'তে হবে; দরকার ইহার সম্মিশন,—হয় সেই বিশালতর বিশ্ব "আমি"র মধ্যে যার অন্তর্গত এই সকল ক্ষুদ্রতর আত্মা, নয়, বিশ্বাতীতের মধ্যে এই বিশ্বাত্মাও যার এক ক্ষীণ প্রতিমা।

কিন্তু এই বিশ্বাত্মা স্বরূপে ও অনুভূতিতে আধ্যাত্মিক; ইহা যে কোনো সমষ্টিগত সত্তা বা কোনো গোষ্ঠী-পুরুষ বা কোনো মানবসমাজের অথবা এমনকি সমগ্র মানবজাতির প্রাণ ও দেহ তা ব'লে ইহাকে ভুল করা অনুচিত হবে। মানবজাতির উন্নতি ও সুখের কাছে অহং-কে অধীন করা —বর্তমানে ইহাই জগতের মনন ও নীতিতে এক নিয়ামক ভাবনা; কিন্তু ইহা এক মানসিক ও নৈতিক আদর্শ, কোনো আধ্যাত্মিক আদর্শ নয়। কারণ ঐ উন্নতির অর্থ মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক পরিবর্তনের এক অবিরাম পরম্পরা, ইহার কোনো দৃঢ় আধ্যাত্মিক উপাদান নেই, মানবের অন্তঃপুরুষের জন্য কোনো নিশ্চিত প্রতিষ্ঠাও ইহাতে লাভ হয় না। সমষ্টিগত মানবজাতির চেতনা শুধু ব্যষ্টি অহং-সমূহের এক বৃহত্তর ব্যাপক সংস্করণ অথবা তাদের যোগফল। একই উপাদানে গঠিত ও প্রকৃতির গঠন একই হওয়ায় ইহার মধ্যে কোনো মহত্তর আলোক নেই, নিজের সম্বন্ধে কোনো বেশী শাশ্বত বোধ নেই, শান্তি, হর্ষ ও উদ্ধারের কোনো পবিত্রতর উৎসও নেই। বরং ইহা আরো পীড়িত, উদ্বিগ্ন ও তমসাচ্ছন্ন এবং ইহা যে আরো অস্পষ্ট, বিভ্রান্ত ও অনগ্রসরশীল তাতে সন্দেহ নেই। এই হিসাবে সমূহ অপেক্ষা ব্যষ্টি মহত্তর এবং ঐ অধিকতর তামস সত্তার নিকট ব্যষ্টির আরো উজ্জ্বল সব সম্ভাবনাকে গৌণ ক'রতে বলা অনুচিত। যদি আলো, প্রশান্তি, নিষ্কৃতি, আরো উৎকৃষ্ট জীবন আসতে হয়—সেসব অন্তঃপুরুষের মধ্যে অবতরণ করা দরকার এমন কিছু থেকে যা ব্যষ্টির চেয়ে আরো ব্যাপ্ত তবে আবার এমন কিছু থেকে যা সমষ্টিগত অহং থেকে পরতর। পরোপকারিতা, বিশ্বপ্রীতি, মানবজাতির সেবা—এসব নিজে-

দের মধ্যে মানসিক বা নৈতিক আদর্শ, ইহারা আধ্যাত্মিক জীবনের বিধান নয়। যদি আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত আত্ম-ত্যাগের বা মানব-জাতির অথবা সমগ্র জগতের সেবা করার টান আসে তাহ'লে সে টান অহং থেকে বা জাতির কোনো সমষ্টিগত বোধ থেকে আসে না, তা আসে এমন কিছু থেকে যা আরো গূঢ় ও গভীর এবং এই দুয়েরই অতিস্থিত; কারণ ইহার প্রতিষ্ঠা সর্বভূতস্থ ভগবানের বোধের উপর এবং ইহা যে কাজ করে তা অহং বা জাতির জন্য নয়, ইহা কাজ করে ভগবানের জন্য এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সমষ্টিগত মানবের মধ্যে ভগবানের উদ্দেশ্যের জন্য। এই অতিস্থিত প্রভবকেই আমাদের অন্বেষণ ও সেবা করা চাই, ইহাই সেই বৃহত্তর সত্তা ও চেতনা যার নিকট জাতি ও ব্যষ্টি ইহার সত্তার গৌণ সংজ্ঞা।

বস্তুতঃ অর্থক্রিয়াকারী সংবেগের পশ্চাতে এক সত্য আছে যা আত্যন্তিক একদেশীয় আধ্যাত্মিকতা উপেক্ষা বা অস্বীকার বা হেয় করতে প্রবণ। এই সত্য এই যে যেহেতু ব্যষ্টি ও বিশ্বভাব উভয়ই ঐ পরতর ও বৃহত্তর পুরুষের সংজ্ঞা তাদের পূর্ণতারও এক বাস্তব স্থান থাকা চাই পরম সৎ-এর মধ্যে। তাদের পশ্চাতে নিশ্চয়ই এমন কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থাকবে যা পরম প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত, এমন কোনো শাশ্বত সুর থাকবে যা পরম আনন্দের অন্তর্গত; তারা যে মিছামিছি সৃষ্ট হ'য়েছে তা হতে পারে না, আর সত্যই তাদের সৃষ্টি মিছামিছি হয়নি। ব্যষ্টির পূর্ণতা ও তৃপ্তির মতো, মানবজাতির পূর্ণতা ও তৃপ্তিও সম্ভব হয় একমাত্র যদি তারা দৃঢ়ভাবে সাধিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় বিষয়সমূহের এমন এক সত্য ও যথার্থতার উপর যা আরো শাশ্বত কিন্তু এখনো অনায়াত্ত। যেহেতু তারা এক মহত্তর সন্মাত্রের গৌণ সংজ্ঞা, সেহেতু তারা নিজেদের চরিতার্থ করতে সক্ষম কেবল তখনই যখন যার সংজ্ঞা তারা তাকে জানা ও অধিগত করা হয়। মানবজাতির প্রকৃষ্ট সেবার, ইহার উন্নতি, সুখ ও পূর্ণতার সর্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত ভিত্তি হ'ল সেই পথ তৈরী করা বা বাহির করা যা দিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মানব অহং অতিক্রম ক'রে বাস করতে পারে তার প্রকৃত আত্মার মধ্যে— অবিদ্যা অক্ষমতা, বৈষম্য ও দুঃখে আর আবদ্ধ না হ'য়ে। আমাদের আধুনিক ভাবনা ও আদর্শবাদ আমাদের সম্মুখে যে বিবর্তনমূলক সমষ্টি-গত পরোপকারপরায়ণ লক্ষ্য স্থাপিত করেছে তা সর্বাপেক্ষা সুনিশ্চিতভাবে পাবার উপায় হ'ল শাশ্বতের সাধনা, সে উপায় প্রকৃতির মন্থর সমষ্টিগত

বিবর্তনের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে বাস করা নয়। কিন্তু ইহা স্বয়ং এক গৌণ লক্ষ্য; দিব্য সত্তা, চেতনা ও প্রকৃতি পাওয়া, জানা ও অধিগত করা, এবং ভগবানের জন্য তার মধ্যে বাস করা--ইহাই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য, আর ইহাই একমাত্র সিদ্ধি যার জন্য আমাদের অভীপ্সা করা চাই-ই।

সুতরাং পরতম জ্ঞানের সাধকের কর্তব্য,--পৃথ্বীবদ্ধ জড়বাদের পথে না চ'লে আধ্যাত্মিক দর্শন ও ধর্মের পথেই চলা, যদিও তা করা হবে আরো সমৃদ্ধ লক্ষ্য ও আরো ব্যাপক আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু অহং-বর্জনের ব্যাপারে তাকে কতদূর অগ্রসর হ'তে হবে? প্রাচীন জ্ঞানমার্গে আমরা সেই অহং-বোধ বাদ দিতে সক্ষম হই যা দেহে, প্রাণে ও মনে আসক্ত হ'য়ে এগুলির সকলেরই বা যে কোনো একটির সম্বন্ধে বলে, "ইহা আমি।" যেমন কর্মমার্গে, আমরা যে শুধু কর্মীর "আমি" থেকে মুক্ত হ'য়ে একমাত্র ঈশ্বরকেই দেখি সকল কর্মের ও কর্মের অনুমতির প্রকৃত প্রভব ব'লে এবং তাঁর নির্বাহক প্রকৃতি-সামর্থ্যকে অথবা তাঁর পরমা শক্তিকে দেখি একমাত্র প্রতিভূ ও কর্মী হিসাবে তা নয়, আমরা সেই অহং-বোধ থেকেও মুক্ত হই যাতে আমাদের সত্তার বিভিন্ন করণ বা প্রকাশগুলিকে ভুল করা হয় আমাদের প্রকৃত আত্মা ও চিৎ-পুরুষ ব'লে। কিন্তু এই সব করা হবার পরও, তবু কিছু রয়ে যায়; তখনো রয়ে যায় এই সকলের এক মূল, পৃথক "আমি"র এক সাধারণ বোধ। এই মূল অহং এমন কিছু যা অস্পষ্ট, অনির্দেশ্য ও প্রতারক; ইহা আত্মার মতো কোনো বিশেষ বিষয়ে নিজেকে আসক্ত করে না, বা করার দরকার হয় না; ইহা নিজেকে কোনো সমষ্টির সহিত একাত্ম করে না; ইহা মনের একপ্রকার মৌলিক রূপ বা সামর্থ্য যার জন্য মনোময় পুরুষ নিজের সম্বন্ধে এই অনুভব করতে বাধ্য হয় যে সে হয়ত অনির্দেশ্য কিন্তু তবু এক সীমাবদ্ধ সত্তা যা মন, প্রাণ বা দেহ নয় অথচ যার অধীনে তাদের কাজকর্ম চলে প্রকৃতির মধ্যে। অন্য যেসব ছিল তারা পরিচ্ছিন্ন অহং-ভাবনা ও অহংবোধ আর ইহাদের অবলম্বন ছিল প্রকৃতির ক্রীড়া; কিন্তু ইহা হ'ল শুদ্ধ মৌলিক অহং-সামর্থ্য যার অবলম্বন--মনোময় পুরুষের চেতনা। আর যেহেতু মনে হয় যে ইহা ক্রীড়ার উপরে বা পশ্চাতে, ইহার ভিতরে নয়, যেহেতু ইহা বলে না, "আমি মন, প্রাণ বা দেহ", তবে বলে, "আমি এমন এক সত্তা যার উপর মন, প্রাণ ও দেহের ক্রিয়া নির্ভরশীল," অনেকে নিজেদের বিমুক্ত মনে করে আর এই প্রতারক অহংকে ভুল ক'রে ভাবে যে ইহাই "একমেব", ভগবান,

প্রকৃত পুরুষ অথবা অন্ততঃ তাদের অন্তঃস্থ সত্যকার ব্যক্তি---এইভাবে অনির্দেশ্যকে ভুল ক'রে ভাবে অনন্ত ব'লে। কিন্তু যতদিন এই মৌলিক অহং-বোধ থাকে, ততদিন কোনো একান্ত মোক্ষ হয় না। আর এই অবলম্বন নিয়ে অহমাত্মক জীবন আগের মতো ভালোই চলতে পারে, যদিও তার শক্তি ও প্রখরতা হ্রাস পায়। যদি তাদাত্ম্যবোধে কোনো প্রমাদ থাকে তাহ'লে সেই মিথ্যা দাবীতে অহং-জীবনের তীব্রতা ও শক্তি বরং আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনকি যদি এরূপ কোনো প্রমাদ নাও থাকে তবু অহং-জীবন অধিকতর ব্যাপ্ত, শুদ্ধ ও নমনীয় হ'তে পারে, এখন মোক্ষ আরো অনেক সহজলভ্য হয়, এবং সমাপ্তির আরো নিকটবর্তী হয়, কিন্তু তবু তখনো পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত মোক্ষ আসে না। আরো অগ্রসর হ'য়ে এই অনির্দেশ্য অথচ মৌলিক অহং-বোধ থেকে মুক্ত হওয়া এবং যে পুরুষ ইহার অবলম্বন, যার ছায়া ইহা তা-তে ফিরে যাওয়াই অবশ্য কর্তব্য; ছায়াকে অন্তর্হিত হ'তে হ'বে এবং তার অন্তর্ধানের দ্বারা প্রকট করতে হবে চিৎ-পুরুষের অমলিন "ধাতু" (বা দ্রব্য)।

ঐ দ্রব্য হ'ল মানবের আত্মা যাকে ইওরোপীয় ভাবনায় বলা হয় Monad (মনাড্), আর ভারতীয় দর্শনে বলা হয় জীব বা জীবাত্মা, অর্থাৎ জীবন্ত সত্তা, প্রাণীর আত্মা। এই জীব সেই মানসিক অহংবোধ নয় যা প্রকৃতির সাময়িক উদ্দেশ্যের জন্য তার ক্রিয়াধারার দ্বারা গঠিত হয়। মনোময় সত্তা, প্রাণময় সত্তা বা অন্নময় সত্তা যেমন প্রকৃতির সব অভ্যাস, বিধান বা ধারার দ্বারা বদ্ধ,---এই জীব তেমন কোনো বদ্ধ বিষয় নয়। জীব চিৎ-পুরুষ ও আত্মা, প্রকৃতির চেয়ে মহত্তর। অবশ্য ইহা সত্য যে সে প্রকৃতির ক্রিয়ায় সম্মতি দেয়, তার সব বৃত্তি প্রতিফলিত করে এবং মন, প্রাণ, দেহ,---এই ত্রিবিধ মাধ্যম ধারণ করে যাদের মধ্য দিয়ে সে বৃত্তিগুলিকে অন্তঃপুরুষের চেতনার উপর প্রক্ষেপ করে; কিন্তু ইহা স্বয়ং বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত চিৎ-পুরুষের জীবন্ত প্রতিবিম্ব, অথবা এক পুরুষ-রূপ অথবা এক আত্ম-সৃষ্টি। যে এক চিৎ-পুরুষ তাঁর সত্তার কোনো কোনো বিভাবকে জগৎ ও অন্তঃপুরুষের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন তিনি জীবের মধ্যে বহুময়। ঐ চিৎপুরুষই আমাদের প্রকৃত আত্মা, তিনিই সেই এক ও পরতম ও পরম যাঁকে উপলব্ধি করা আমাদের কর্তব্য, তিনিই সেই অনন্ত সত্তা যাঁর মধ্যে আমাদের প্রবেশ করা চাই। এই পর্যন্ত সকল গুরুই একসাথে চলেন, কারণ এই আত্মাই যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির পরম

লক্ষ্য সে বিষয়ে সকলেই একমত, তাঁরা এই বিষয়েও একমত যে যদি আত্মাকে পেতে হয় তাহ'লে জীবের কর্তব্য অপরা প্রকৃতির বা মায়ার অন্তর্গত অহং-বোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করা। কিন্তু এইখান থেকে তাদের ছাড়াছাড়ি হয় আর প্রত্যেকে নিজের নিজের পথে চলে। অদ্বৈতবাদী আত্যন্তিক জ্ঞানমার্গে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য যে একমাত্র আদর্শ স্থাপন করে তা হ'ল পরমের মধ্যে জীবের সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন, লয়, নিমজ্জন বা বিনাশ। দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভক্তিমার্গের দিকে তাকিয়ে আমাদের উপদেশ দেয়,—অবর অহং ও জড়গত জীবন ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য, তবে দেখতে হবে যে মানবের চিৎপুরুষের সর্বোত্তম নিয়তি বৌদ্ধদের আত্ম-নাশ নয়, অদ্বৈতবাদীর আত্ম-নিমজ্জন নয়, একের দ্বারা বহুকে গ্রাস করা নয়, তার নিয়তি হ'ল পরমের, একের, সর্ব-প্রেমিকের মননে, প্রেমে ও রসাস্বাদনে বিভোর শাশ্বত জীবন।

এ বিষয়ে পূর্ণযোগের শিষ্যের কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না; জ্ঞানসাধক হিসাবে পূর্ণজ্ঞানই তার সাধ্য হওয়া চাই, এমন কিছু নয় যা মাঝপথে সমাপ্ত ও চিত্তাকর্ষক অথবা উচ্চশিখরে আসীন ও আত্যন্তিক। তার যে শুধু চরম তুঙ্গে উড়ে যাওয়া দরকার তা নয়, তার আরো দরকার সর্বাপেক্ষা সর্বগ্রাহী প্রসারতার চারিদিক ঘুরে তাতে বিস্তৃত হওয়া, আর তা এমনভাবে হবে যেন সে দার্শনিক ভাবনার কোনো কঠোর গঠনে না আবদ্ধ হয়, বরং স্বচ্ছন্দে গ্রহণ ও ধারণ করতে পারে অন্তঃপুরুষের উচ্চতম ও মহত্তম ও পূর্ণতম ও সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সব অনুভূতি। ব্যষ্টি ও বিশ্বের অতিরিক্ত যে বিশ্বাতীত তাঁর সহিত অন্তঃপুরুষের আত্যন্তিক মিলনই যদি হয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির সর্বোচ্চ উচ্চতা, সকল উপলব্ধির অনন্য শিখর তাহ'লে সেই মিলনের সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ক্ষেত্র হ'ল এই আবিষ্কার করা যে ঐ বিশ্বাতীতই দিব্য স্বরূপ ও দিব্য প্রকৃতির এই দুই অভিব্যক্তিকারী সামর্থ্যের প্রভব, অবলম্বন, আধেয়, আন্তর প্রেরণাদায়ক ও উপাদানস্বরূপ চিৎ-পুরুষ ও দ্রব্য। তার পথ যাই হ'ক না কেন, ইহাই হবে তার নিশানা। কর্মযোগও সার্থক হয় না, একান্ত হয় না, বিজয়ীভাব সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না সাধক পরমের সহিত তার স্বরূপস্থ ও অখণ্ড একত্ব অনুভব করে ও তাতে বাস করে। দিব্য সংকল্পের সহিত তাকে এক হ'তেই হবে, আর তা হ'তে হবে তার সর্বোচ্চ ও অন্তরতম ও তার ব্যাপ্ততম সত্তায় ও চেতনায়, কর্মে, তার সংকল্পে, তার ক্রিয়ার সামর্থ্যে, তার

মনে, দেহে, প্রাণে। তা না হ'লে সে শুধু তার ব্যষ্টি কর্ম থেকে নিষ্কৃতি পায়, কিন্তু পৃথক সত্তা ও তটস্থতার মায়া থেকে নিষ্কৃতি পায় না। সে কাজ করে ভগবানের সেবক ও যন্ত্ররূপে কিন্তু তার পরিশ্রমের মুকুট এবং ইহার সুষ্ঠু ভিত্তি বা প্রেরণা হ'ল সে যাঁকে সেবা করে ও সার্থক করে তাঁর সহিত একত্ব। ভক্তিযোগও সম্পূর্ণ হয় কেবল তখনই যখন প্রেমিক ও (দিব্য) প্রেমাস্পদ মিলিত হ'য়ে এক হয় এবং ভেদ বিলুপ্ত হয় দিব্য একত্বের উল্লাসে, কিন্তু তবু এই মিলনের রহস্যের মধ্যে থাকে একমাত্র প্রেমাস্পদের অস্তিত্ব তবে প্রেমিকের বিনাশ বা সমাপত্তি হয় না। জ্ঞান-মার্গের স্পষ্ট লক্ষ্য হ'ল সর্বোচ্চ ঐক্য, একান্ত একত্বের প্রতি আহ্বানই তার সংবেগ, ইহার অনুভূতিই তার আকর্ষণী শক্তি, কিন্তু এই সর্বোচ্চ ঐক্যই তার মধ্যে তার অভিব্যক্তির ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করে সম্ভবপর বৃহত্তম বিশ্বপ্রসারতা। আমাদের ত্রিবিধ প্রকৃতির ব্যবহারিক অহং-ভাব এবং ইহার মৌলিক অহং-বোধ থেকে ক্রমানুয়ে সরে আসার আবশ্যকতা অনুযায়ী কাজ ক'রে আমরা এই ব্যষ্টি মানুষী অভিব্যক্তির চিৎ-পুরুষ, আত্মা ও ঈশ্বরের উপলব্ধি লাভ করি, কিন্তু আমাদের জ্ঞান পূর্ণ হয় না যদি না আমরা ব্যষ্টির মধ্যে এই আত্মাকে এক করি বিরাট পুরুষের সহিত এবং তাদের মহত্তর সত্যতা পাই ঊর্ধ্বে অনির্বচনীয় কিন্তু অজ্ঞেয় নয় এমন অতিস্থিতির মধ্যে। আত্মবান হ'য়ে ঐ জীবের অবশ্য কর্তব্য হ'ল ভগবানের সত্তার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করা। মানবের আত্মাকে এক করা চাই সর্বভূতের আত্মার সহিত; সান্ত জীবের আত্মার কর্তব্য নিজেকে ঢেলে দেওয়া সীমাহীন সান্তের মধ্যে আর ঐ বিরাট পুরুষকে অতিক্রম করে যেতে হবে বিশ্বাতীত অনন্তের মধ্যে।

ইহা করা সম্ভব হয় না যদি না অহং-বোধকে নির্মমভাবে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হয় তার মূল উৎস থেকে। জ্ঞানমার্গে এই উচ্ছেদসাধনের নঞর্থক উপায় হ'ল অহং-এর সত্যতা অস্বীকার করা আর সদর্থক উপায় হ'ল মননকে অবিরত নিবদ্ধ রাখা একম্ ও অনন্তের স্বরূপের ভাবনায় অথবা সর্বত্র একম্ ও অনন্তের ভাবনায়। অধ্যবসায়ের সহিত ইহা করা হলে, পরিশেষে নিজের ও সমগ্র জগতের উপর মানসিক দৃষ্টির পরিবর্তন হয় এবং একপ্রকার মানসিক উপলব্ধি আসে; কিন্তু পরে ক্রমশঃ অথবা হয়ত দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে এবং প্রায় শুরুতেই মানসিক উপলব্ধি গভীর হ'য়ে পরিণত হয় অধ্যাত্ম অনুভূতিতে যা হ'ল আমাদের সত্তার সার ধাতুর

মধ্যে উপলব্ধি। ক্রমশঃ বেশী ঘন ঘন যে সব অবস্থা আসে তা হ'ল—অনির্দেশ্য ও অসীম কিছুর অবস্থা, অনির্বচনীয় প্রশান্তি, নীরবতা, হর্ষ ও আনন্দের অবস্থা, একান্ত নৈর্ব্যক্তিক সামর্থ্যের শুদ্ধ সত্তার, শুদ্ধ চেতনার, সর্বব্যাপী সান্নিধ্যের এক বোধ। অহং নিজের মধ্যে বা তার অভ্যস্ত সব ক্রিয়ার মধ্যে তখনো টিকে থাকে কিন্তু একটির শান্তি উত্তরোত্তর স্থায়ী হয়, অন্যগুলি ভেঙে, চূর্ণ হ'য়ে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়, আর তাদের তীব্রতা ক্ষীণ হ'য়ে আসায়, তাদের ক্রিয়া পঙ্গু বা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। পরিশেষে সমগ্র চেতনার অবিরত সমর্পণ হ'তে থাকে পরমের সত্তার মধ্যে। প্রথম প্রথম যখন আমাদের বহির্মুখী প্রকৃতির অস্থির বিশৃঙ্খলা ও আচ্ছন্নকারী অশুদ্ধতা সক্রিয় থাকে, যখন মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক অহং-বোধ তখনো বলবান থাকে, তখন এই নতুন মানসিক দৃষ্টিকে, এইসব অনুভূতিকে সাতিশয় দুরূহ দেখা যাবে; কিন্তু একবার ত্রিবিধ অহং-ভাব অবসন্ন বা মৃতপ্রায় হ'লে, আর চিৎ-পুরুষের করণগুলি সংশোধিত ও শুদ্ধ করা হ'লে—সম্পূর্ণ শুদ্ধ, নীরব, নির্মল, প্রসারিত চেতনার মধ্যে একম্-এর শুদ্ধতা, আনন্ত্য, নিস্তব্ধতা প্রতিফলিত হয় স্বচ্ছ সরোবরে আকাশের মতো। প্রতিফলনকারী চেতনার দ্বারা প্রতিফলিত পরম চেতনার সহিত মিলিত হওয়া বা তাকে ভিতরে গ্রহণ করা উত্তরোত্তর প্রয়োজনীয় ও সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে, তখন আর ঐ নির্বিকার আকাশীয় নৈর্ব্যক্তিক বৃহত্ত্ব এবং ব্যক্তিগত জীবনের এই একসময়ের চঞ্চল আবর্তের বা সংকীর্ণ স্রোত—এই দু'য়ের মাঝে বায়বীয় ব্যবধানের সেতুবন্ধন বা বিলুপ্তিসাধন কোনো দুঃসাধ্য অসম্ভব কাজ কিছু নয়, আর সে অনুভূতি তখনো সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী অবস্থা না হ'লেও, ইহা প্রায়শঃই আসতে থাকে। কেননা এমনও হয় যে সম্পূর্ণ শুদ্ধিকরণ হবার আগেই, যদি অহমাত্মক হৃদয় ও মনের সূত্রগুলি আগেই যথেষ্ট চূর্ণ ও শিথিল করা থাকে, জীব প্রধান রজ্জুগুলি হঠাৎ ছিঁড়ে ফেলে আকাশের মধ্যে বন্ধনমুক্ত পাখীর মতো উঠে গিয়ে অথবা বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো প্রসারিত হয়ে পলায়ন করে একম্ ও অনন্তের মধ্যে। প্রথমে আসে বিশ্বচেতনার এক আকস্মিক বোধ, নিজেকে বিশ্বাত্মকের মধ্যে নিক্ষেপ করা; সেই বিশ্বভাব থেকে সাধকের পক্ষে আরো সহজ হয় বিশ্বাতীতের জন্য অভীপ্সা করা। যেসব প্রাচীরের দ্বারা আমাদের চিন্ময় সত্তা আবদ্ধ ছিল সেগুলিকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে তাতে রন্ধ্র করা হয় আর না হয় ভূমিসাৎ করা হয়; ব্যষ্টিত্ব ও ব্যক্তিত্বের, দেশ বা কালের

মধ্যে বা প্রকৃতির ক্রিয়া ও বিধানের মধ্যে অবস্থানের সকল বোধ অন্তর্হিত হয়; তখন আর কোনো অহং থাকে না, কোনো নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট ব্যক্তি থাকে না, থাকে শুধু চেতনা, শুধু সত্তা, শুধু প্রশান্তি ও আনন্দ; জীব হ'য়ে ওঠে অমরত্ব, হ'য়ে ওঠে শাশ্বতত্ব, হ'য়ে ওঠে আনন্ত্য। ব্যক্তিগত অন্তঃ-পুরুষের যা বাকী থাকে তা হ'ল প্রশান্তি ও স্বাধীনতা ও আনন্দের স্তুতিগান যা ঝঙ্কৃত হ'তে থাকে সনাতনের মধ্যে কোনো এক স্থানে।

যখন মনোময় পুরুষের মধ্যে শুদ্ধতা কম থাকে তখন মোক্ষ প্রথম মনে হয় আংশিক ও সাময়িক; মনে হয় জীব যেন আবার নেমে আসে অহমাত্মক জীবনের মধ্যে আর তার কাছ থেকে প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয় পরতর চেতনা। বস্তুতঃ যা ঘটে তা এই যে অপরা প্রকৃতি ও পরতর চেতনার মধ্যে একটি মেঘ বা আবরণ এসে পড়ে, আর প্রকৃতি আবার কিছু সময়ের জন্য তার ক্রিয়ার পুরণো অভ্যাস আরম্ভ করে; তাতে সেই উচ্চ অনুভূতির চাপ থাকে তবে সর্বদা যে এই অনুভূতির জ্ঞান বা বর্তমান স্মৃতি থাকে তা নয়। ইহার মধ্যে তখন যা কাজ করে তা হ'ল পুরণো অহং-এর এক ভূত যা সত্তার মধ্যে তখনো বিদ্যমান বিশৃঙ্খলা ও অপবিত্র-তার অবশিষ্ট অংশের উপর ধরে থাকে পুরণো সব অভ্যাসের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি। মেঘ আড়াল করে, আবার চলে যায়, আরোহণ ও অবরোহণের ছন্দ চলতে থাকে যতদিন না অশুদ্ধতার সম্পূর্ণ নিরসন হয়। আলো-ছায়ার, ওঠানামার এই পর্বটি পূর্ণযোগে দীর্ঘ হবার সম্ভাবনাই বেশী; কেননা এখানে দরকার আধারের সমগ্র সিদ্ধি; ইহাকে এত সমর্থ হ'তে হবে যেন ইহা সকল সময়েই, সকল অবস্থাতেই, ক্রিয়া বা নিষ্ক্রিয়তার সকল পরিস্থিতির মধ্যে সক্ষম হয় পরম সত্যের চেতনা নিতে এবং পরে তার মধ্যে বাস করতে। সাধকের পক্ষে এই চরম উপলব্ধি শুধু সমাধি-মগ্ন অবস্থায় বা নিশ্চল শান্তির মধ্যে পাওয়া যথেষ্ট নয়, তাকে সমর্থ হ'তে হবে যেন সে কি সমাধির বা জাগরণের অবস্থায়, কি নিষ্ক্রিয় চিন্তায় বা ক্রিয়ার শক্তিপ্রবাহের মধ্যে থাকতে পারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মীচেতনার[১] সতত সমাধির মধ্যে। কিন্তু যদি বা যখন আমাদের চিন্ময় সত্তা যথেষ্ট পরিমাণে শুদ্ধ ও নির্মল হয়, তখন পরতর চেতনায় দৃঢ় স্থিতি লাভ হয়। নৈর্ব্যক্তিকভাবাপন্ন জীব বিশ্বাত্মকের সহিত এক হ'য়ে অথবা বিশ্বাতীতের

১ গীতা।

দ্বারা অধিগত হ'য়ে বাস করে ঊর্ধ্বে উদাসীন[১] হ'য়ে আর অক্ষুব্ধভাবে নিম্নে তাকিয়ে দেখে প্রকৃতির পুরণো ক্রিয়ার সেই সব অবশিষ্টাংশ যা তার আধারে আবার আবির্ভূত হ'তে পারে। তার অবর সত্তার মধ্যে প্রকৃতির ত্রিগুণের বিভিন্ন ক্রিয়া তুচ্ছ ক'রে সে অবিচলিত থাকে, এমনকি দুঃখ ও কষ্ট-ভোগের আক্রমণও জয় করে সে অটল থাকে তার স্থিতিতে এবং পরিশেষে, মাঝখানে আর আবরণ না থাকায়, পরতরা প্রশান্তি অভিভূত করে অবর ক্ষোভ ও চঞ্চলতাকে। এক স্থির নীরবতা প্রতিষ্ঠিত হয় যার মধ্যে অন্তঃপুরুষ অপ্রতিহত ভাবে নিজেকে অধিগত করে ঊর্ধ্বে, নিম্নে ও সর্বসমেত।

অবশ্য এরূপ অধিকার চিরাচরিত জ্ঞানযোগের লক্ষ্য নয়; বরং ইহার উদ্দেশ্য হ'ল ঊর্ধ্ব ও নিম্ন ও সর্ব থেকে সরে এসে প্রবেশ করা অনির্দেশ্য পরমার্থসৎ-এর মধ্যে। কিন্তু লক্ষ্য যাই হ'ক না কেন, জ্ঞানযোগের প্রথম যে একটি অবশ্যম্ভাবী ফল তা হ'ল একান্ত শান্তি; কেননা আমাদের মধ্যে প্রকৃতির পুরণো ক্রিয়া পুরোপুরি শান্ত করা না হ'লে কোনো সত্যকার পুরুষ-অবস্থা বা কোনো দিব্য কর্ম অসম্ভব না হ'লেও দুরূহ। আমাদের প্রকৃতি যে কাজ করে তার ভিত্তি হ'ল বিশৃঙ্খলা ও ক্রিয়ার প্রতি অস্থির প্রেরণা, আর ভগবান কাজ করেন স্বচ্ছন্দভাবে, অতলস্পর্শী শান্তির মধ্য থেকে। অন্তঃপুরুষের উপর এই অপরাপ্রকৃতির প্রভুত্বকে যদি আমরা নাশ করতে চাই তাহ'লে আমাদের কর্তব্য সেই অক্ষুব্ধতার গভীর সাগরে ডুব দেওয়া ও তা-ই হওয়া। সুতরাং বিশ্বভাবাপন্ন জীব প্রথম উত্তরণ করে নীরবতাব মধ্যে; ইহা হ'য়ে ওঠে বৃহৎ, অক্ষুব্ধ ও ক্রিয়াশূন্য। যা কিছু ক্রিয়া ঘটে, তা দেহের ও অন্যান্য অঙ্গের বা কোনো প্রক্রিয়ার হ'ক না কেন, জীব সেসব দেখে কিন্তু তাতে অংশ নেয় না বা অনুমতি দেয় না বা তার সহিত কোনো-রূপে নিজেকে জড়ায় না। ক্রিয়া থাকে কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত কর্তা, কোনো বন্ধন, কোনো দায়িত্ব থাকে না। যদি ব্যক্তিগত ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তাহ'লে জীবকে রাখতে হবে বা ফিরে পেতে হবে তথাকথিত অহং-এর রূপ, এক "আমি"র এক প্রকার মানসিক প্রতিমূর্তি যা জ্ঞাতা, ভক্ত, সেবক বা যন্ত্র, কিন্তু ইহা শুধু এক প্রতিমূর্তি, কোনো সদ্‌বস্তু নয়। আর যদি তা না-ও থাকে তবু ক্রিয়া পূর্বের মতো চলতে পারে শুধু প্রকৃতির পুরণো

১ উদাসীন,—এই কথাটি ব্যবহৃত হয় আধ্যাত্মিক "উপেক্ষা"র অর্থে—অর্থাৎ পরমজ্ঞানের স্পর্শযুক্ত অন্তঃপুরুষের অনাসক্ত স্বাতন্ত্র্য।

শক্তিবলে,——তাতে কোনো ব্যক্তিগত কর্তা থাকে না, বস্তুতঃ কর্তার কোনো বোধও আদৌ থাকে না; কারণ যে আত্মার মধ্যে জীব তার সত্তা নিক্ষেপ করেছে তা ক্রিয়াশূন্য অতল নিস্তব্ধতা। কর্মমার্গে ঈশ্বরের উপলব্ধি আসে, কিন্তু এখানে এমনকি ঈশ্বরকেও জানা যায় না; থাকে শুধু নীরব আত্মা ও কর্মরতা প্রকৃতি, তবে এমনকি, প্রথম যা মনে হয়, তার কাজ কোনো সত্যকার জীবন্ত সত্তা নিয়ে নয়, তা শুধু আত্মার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন নাম ও রূপ নিয়ে, কিন্তু এগুলিকে আত্মা সত্য বলে স্বীকার করে না। অন্তঃপুরুষ এমনকি এই উপলব্ধিও ছাড়িয়ে যেতে পারে; হয় ইহা উঠতে পারে ব্রহ্মে যা আত্মার সকল ভাবনার বিপরীত দিকে যেন এক শূন্য যাতে এখানকার কোনো কিছু নেই, এমন এক অব্যপদেশ্য শান্তির শূন্যতা যাতে লোপ পায় সকল কিছু, এমনকি 'সৎ' ও এমনকি সেই সত্তাও যা সকল ব্যষ্টি বা বিশ্ব ব্যক্তিত্বের নৈর্ব্যক্তিক ভিত্তি; আর না হয় অন্তঃপুরুষ ইহার সহিত মিলিত হ'তে পারে যেন ইহা এক অনুপাখ্য "তৎ" যার সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা যায় না; কারণ বিশ্ব এবং যা কিছু আছে সেসবের অস্তিত্বও 'তৎ'-এর মধ্যে নেই, তবে মনের কাছে এগুলি যেন স্বপ্ন; কিন্তু আজ পর্যন্ত যত স্বপ্ন দেখা বা কল্পনা করা হয়েছে তার চেয়ে এমন আরো অসার এই স্বপ্ন যে স্বপ্ন কথাটিও মনে হয় এমন 'সদর্থক' যে কথাটি ইহার সম্পূর্ণ অসত্যতা প্রকাশ করার অনুপযুক্ত। এই সব অনুভূতির উপরই সেই সমুন্নত মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত যার প্রভাব মানবমনের উপর এত দৃঢ় তার স্বোত্তরণের বিভিন্ন সর্বোচ্চ অবস্থায়।

জীবের নতুন স্থিতির তখনো যে মানসিকতা বজায় থাকে তার মধ্যেই স্বপ্ন ও মায়ার এই সব ভাবনা ঘটে কারণ জীব তখন তার পুরণো মানসিক সংস্কারের এবং জীবন ও সত্তা সম্বন্ধে তার পুরণো দৃষ্টির দাবী অস্বীকার করে। বস্তুতঃ প্রকৃতি যে কাজ করে তা তার নিজের জন্য নয় অথবা নিজের গতির দ্বারা নয়, সে কাজ করে আত্মার সহিত, এই আত্মাকেই তার ঈশ্বর ক'রে; কারণ ঐ নীরবতা থেকেই উচ্ছলিত হয় এই সকল ক্রিয়া, এই আপাতপ্রতীয়মান শূন্যই যেন বিগলিত হয় বিভিন্ন অনুভূতির এই সব অনন্ত ঐশ্বর্যরাশির বিলাসে। এই উপলব্ধিতেই পূর্ণ যোগের সাধকের উপনীত হওয়া দরকার, তবে যে প্রণালীতে সে সাধনা হবে তার কথা পরে বলা হবে। যখন সাধক বিশ্বের উপর ঐ ভাবে তার দখল পুনর্বার গ্রহণ করে এবং জগতের মধ্যে আর নিজেকে না দেখে বরং বিশ্বকেই দেখে

নিজের মধ্যে, তখন জীবের স্থান কি হবে বা তার নতুন চেতনায় অহং-বোধের অংশটি কিসের দ্বারা পূর্ণ হবে? কোনো অহং বোধ থাকবে না, এমন কি যদি ব্যষ্টিমন ও দেহে বিশ্বচেতনার ক্রিয়ার প্রয়োজনের জন্য একপ্রকার ব্যষ্টিভাব থাকে; এবং এই কারণে ঐ সকল হবে অবিস্মরণীয় ভাবে 'একম্' আর প্রতি ব্যক্তি বা পুরুষ তার কাছে হবে বহুরূপে 'একম্' বা বরং বহু বিভাবে ও ভঙ্গিতে 'একম্', ব্রহ্ম ক্রিয়ারত ব্রহ্মের উপর, সর্বত্র একই নর-নারায়ণ[১]। ভগবানের সেই বৃহত্তর লীলার মধ্যে দিব্য প্রেমের বিভিন্ন সম্পর্কের হর্ষও সম্ভব হয়, অহং-বোধের মধ্যে স্খলিত না হ'য়েই—যেমন মানবপ্রেমের পরম অবস্থাকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করা হয় যে ইহা দুই দেহের এক অন্তঃপুরুষের ঐক্য। যে জগৎ-লীলার মধ্যে অহং-বোধ এত সক্রিয় এবং বিষয়সমূহের সত্যকে মিথ্যায় এত বিকৃত করে, তার জন্য কিন্তু অহং-বোধ অপরিহার্য নয়; সত্য এই যে,—সর্বদা পরম একই নিজের উপর কর্মরত, নিজের সহিত লীলারত, ঐক্যে অনন্ত, বহুত্বে অনন্ত। যখন ব্যষ্টিভাবাপন্ন চেতনা বিশ্বলীলার ঐ সত্যে উত্তরণ ক'রে তার মধ্যে বাস করে, তখন পূর্ণ ক্রিয়ার মধ্যেও অবর সত্তা ধারণ ক'রেও, জীব তবু ঈশ্বরের সহিত এক; তখন কোনো বন্ধন থাকে না, কোনো মোহ থাকে না। সে আত্মার অধিকারী, অহং-বিমুক্ত।

দশম অধ্যায়

বিশ্বাত্মার উপলব্ধি

যখন আমরা মন, প্রাণ, দেহ থেকে এবং আমাদের সত্তা নয় এমন বাকী সব কিছু থেকে সরে আসি, তখন আমাদের প্রথম ও আবশ্যিক লক্ষ্য হ'ল আত্মার সেই মিথ্যা ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া যার দ্বারা আমরা নিজেদের এক করি অবর জীবনের সহিত আর শুধু এই উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে আমাদের এই প্রতীয়মান সত্তা এক নশ্বর বা সদা পরিবর্তন-শীল জগতের মধ্যে নশ্বর বা পরিবর্তনশীল সৃষ্ট বিষয়। আমাদের জানতে হবে যে আমরা আত্মা, চিৎ-পুরুষ, সনাতন; আমাদের বাস ক'রতে হবে সচেতনভাবে আমাদের প্রকৃত সত্তার মধ্যে। সুতরাং জ্ঞানমার্গে ইহা আমা-দের সর্বপ্রথম, একমাত্র, সর্বগ্রাহী ভাবনা ও সাধনা না হ'লেও ইহাকেই হ'তে হবে মুখ্য ভাবনা ও সাধনা। আমরা যে সনাতন আত্মা তাকে যখন আমরা উপলব্ধি করি, যখন আমরা অচ্ছেদ্যভাবে তা-ই হই, তখনো আমাদের এক গৌণ লক্ষ্য থাকে, আর তা হ'ল,—একদিকে এই সনাতন আত্মা যা আমরা এবং অন্যদিকে এই পরিবর্তনশীল জীবন ও পরিবর্তন-শীল জগৎ যাকে আমরা এ পর্যন্ত আমাদের প্রকৃত সত্তা ও আমাদের একমাত্র সম্ভবপর অবস্থা বলে মিথ্যা ধারণা করে এসেছি—এ দুয়ের মধ্যে সত্যকার সম্বন্ধ স্থাপন করা।

কোনো সম্বন্ধ যদি বাস্তব হ'তে হয়, তাহ'লে সে সম্বন্ধ হওয়া চাই দুই সদ্‌বস্তুর মধ্যে। পূর্বে আমরা ভাবতাম যে সনাতন আত্মা মায়া ও অসৎ না হ'লেও ইহা এমন এক পরোক্ষ প্রত্যয় যা ঐহিক জীবন থেকে দূরবর্তী, কারণ বিষয়সমূহের যা প্রকৃতি তাতে আমরা নিজে কালের প্রবাহের মধ্যে পরিবর্তনশীল ও চরিষ্ণু এই মন, প্রাণ ও দেহ ছাড়া যে অন্য কিছু তা ভাবা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু একবার যখন আমরা এই অবর স্থিতির মধ্যে আমাদের আটক অবস্থা থেকে মুক্তি পাই তখন আমরা সাধা-রণতঃ আত্মা ও জগতের মধ্যে ঐ ভ্রমাত্মক সম্বন্ধের বিপরীত দিকটির আশ্রয় নিই; তখন এই যে শাশ্বত সত্তা যা আমরা উত্তরোত্তর হই বা যার মধ্যে আমরা বাস করি তাকেই আমরা একমাত্র সদ্‌বস্তু ব'লে গণ্য করতে

চাই এবং সেখান থেকে নিম্নে তাকিয়ে জগৎ ও মানুষকে মনে করি তারা এক দূরবর্তী মায়া ও অসৎ কারণ এই স্থিতিটি আমাদের নতুন প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাতে আমরা আর আমাদের চেতনাকে আবদ্ধ রাখি না, সেখান থেকে আমরা উত্তোলিত হ'য়ে রূপান্তরিত হ'য়েছি, মনে হয় তার সহিত আর আমাদের কোনো বন্ধনসূত্র নেই। আর এরূপ হবার সম্ভাবনা বেশী হয় যদি অবর ত্রিবিধ সত্তা থেকে সরে আসার বিষয়ে আমরা সনাতন আত্মার উপলব্ধিকে শুধু মুখ্য উদ্দেশ্য না ক'রে ইহাকে করি আমাদের একমাত্র ও সর্বগ্রাহী উদ্দেশ্য; কারণ তখন আমরা সম্ভবতঃ শুদ্ধ মন থেকে তীরের মতো ছুটে একেবারে প্রবেশ করব শুদ্ধ চিৎ-পুরুষের মধ্যে—এই মধ্যবর্তী স্থান ও ঐ শীর্ষস্থানের মাঝের ধাপগুলি না মাড়িয়েই; আর আমাদের চেতনার উপর আমরা এমন এক ব্যবধানের গভীর বোধ নিবদ্ধ করতে চাইব যে যন্ত্রণাময় পতন বিনা তার উপর যে কোনো সেতু রচনা করে আবার তা পার হ'য়ে আসব তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

কিন্তু আত্মা ও জগতের মধ্যে এক চিরন্তন নিবিড় সম্বন্ধ বর্তমান, আর তাদের মধ্যে সংযোগও আছে, এমন কোনো ব্যবধান নেই যা লাফ দিয়ে পার হ'তে হবে। চিৎপুরুষ ও জড়অস্তিত্ব হ'ল এক সুশৃঙ্খল ক্রমোন্নত শ্রেণীর উচ্চতম ও নিম্নতম ধাপ। সুতরাং দুটির মধ্যে এক বাস্তব সম্বন্ধ ও সংযোগসূত্র অবশ্যই থাকবে যার সাহায্যে সনাতন ব্রহ্ম একই সাথে শুদ্ধ চিৎ-পুরুষ ও আত্মা হ'তে সমর্থ অথচ নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারেন তার নিজের হওয়া বিশ্ব; আর যে অন্তঃপুরুষ সনাতনের সহিত এক বা যুক্ত তার পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে বর্তমানে জগতের মধ্যে আমাদের অজ্ঞানময় মগ্ন অবস্থার বদলে দিব্য সম্বন্ধের ঐ একই স্থিতি অবলম্বন করা। সংযোগের এই তত্ত্বটি হ'ল আত্মা ও সর্বভূতের মধ্যে চিরন্তন ঐক্য; মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষকে সমর্থ হ'তে হবে এই চিরন্তন ঐক্য স্থাপনে যেমন নিত্যমুক্ত বন্ধনহীন ভগবান তাতে সমর্থ, আর যে শুদ্ধ আত্ম-সত্তা আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে তার সঙ্গে সমভাবে ঐ ঐক্য উপলব্ধি করা আমাদের কর্তব্য। অখণ্ড আত্ম-প্রাপ্তির জন্য আমাদের যে শুধু আত্মার সহিত, ভগবানের সহিত এক হ'তে হবে তা নয়, সর্বভূতেরও সহিত আমাদের এক হওয়া চাই। এই যে আমাদের অভিব্যক্ত অস্তিত্বের জগৎ যা আমাদের মানুষভাইদের দ্বারা আকীর্ণ এবং যা থেকে আমরা সরে এসেছি তাকে আমাদের ফিরে নেওয়া কর্তব্য সঠিক সম্বন্ধে এবং এক সনাতন সত্যের

স্থিতিতে কারণ আমরা এসবে বদ্ধ ছিলাম এক অনুচিত সম্বন্ধে ও মিথ্যার স্থিতিতে যা কালের মধ্যে সৃষ্ট হ'য়েছিল সকল বিরোধ, বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব-সমেত বিভক্ত চেতনার তত্ত্বের দ্বারা। আমাদের নবচেতনার মধ্যে সকল বিষয় ও সত্তাকে আমাদের পুনর্গ্রহণ করা কর্তব্য তবে সকলের সহিত এক হ'য়ে, অহমাত্মক ব্যষ্টিত্বের দ্বারা সেসব থেকে বিভক্ত না হ'য়ে।

অর্থাৎ, শুধু শুদ্ধ, স্বপ্রতিষ্ঠ, কালাতীত দেশাতীত, বিশ্বাতীত আত্মার চেতনা নয়, বিশ্বচেতনাও গ্রহণ করা ও হওয়া আমাদের কর্তব্য, আমাদের সত্তাকে একাত্ম করতে হবে অনন্তের সঙ্গে যিনি নিজেকে জগৎসমূহের ভিত্তি ও আধেয় করেন এবং সর্বভূতের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই উপলব্ধির কথাই প্রাচীন বেদান্তবাদীরা এইভাবে বলেছিলেন--আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখা ও সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখা; আবার ইহার উপর তারা বলেন সেই মানবের মহত্তম উপলব্ধির কথা যার মধ্যে সৃষ্টির আদি রহস্যের পুনরাবৃত্তি হ'য়েছে--আত্ম-সত্তাই এই সর্বভূত হয়েছে যা সম্ভূতির বিভিন্ন জগতের অন্তর্গত।[১] আত্মা ও জগতের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধের সমগ্র কথাই মূল রূপে প্রকাশ করা হ'য়েছে এই তিনটি সূত্রের মধ্যে আর এই সম্বন্ধকেই আমাদের আনতে হবে সংকীর্ণতাজনক অহং যে মিথ্যা সম্বন্ধ সৃষ্টি করে তার পরিবর্তে। অনন্তসত্তার যে নবদর্শন ও বোধ আমাদের লাভ করা চাই তা-ই ইহা, সকলের সহিত যে ঐক্য আমাদের স্থাপন করা কর্তব্য তার ভিত্তি ইহা।

কারণ আমাদের আসল আত্মা এই ব্যষ্টি মানসিক সত্তা নয়, ইহা শুধু এক সংকেত, এক বাহ্যরূপ; আমাদের আসল আত্মা বিশ্বব্যাপী, অনন্ত, ইহা সর্বভূতের সহিত এক এবং সর্বভূতের মধ্যে অধিষ্ঠিত। আমাদের মন, প্রাণ ও দেহের পশ্চাতে যে আত্মা এবং আমাদের মানবভাইদের মন, প্রাণ ও দেহের পশ্চাতে যে আত্মা--এই দুই একই আত্মা, আর যদি আমরা আমাদের আত্মাকে অধিগত করি এবং তার পর যখন আমরা আমাদের মানবভাইদের দিকে তাকাই, তখন স্বভাবতঃই আমরা চাই তাদের সহিত এক হ'তে আমাদের চেতনার নতুন ভিত্তিতে। ইহা সত্য যে মন এরূপ তাদাত্ম্য করণে বাধা দেয় আর যদি আমরা ইহাকে ইহার পুরণো সব অভ্যাস ও কাজকর্ম বজায় রাখতে দিই তাহ'লে ইহা বিষয়-

১ ঈশোপনিষদ

সমূহের এই সত্য ও শাশ্বত দর্শন অনুযায়ী নিজেকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ না ক'রে বরং চেষ্টা করবে আবার আমাদের নতুন আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-প্রাপ্তির উপর তার সব বৈষম্যের আবরণ আনতে। কিন্তু প্রথমতঃ যদি আমরা আমাদের যোগের পথে সঠিকভাবে অগ্রসর হ'য়ে থাকি তাহ'লে আমরা আত্মাকে যে পেয়েছি তা শুদ্ধকরা মন ও হৃদয়ের মাধ্যমে, আর শুদ্ধ-করা মন এমন কিছু যা স্বভাবতঃই নিষ্ক্রিয় ও জ্ঞানের নিকট উন্মুক্ত। দ্বিতীয়তঃ মনের গণ্ডী টানার ও ভাগ করার প্রবণতা সত্ত্বেও মনকেও শেখান যায় যেন সে সংকীর্ণতাজনক বাহ্যরূপের খণ্ডিত সংজ্ঞায় না ভেবে ভাবে ঐক্যবিধায়ক সত্যের ছন্দে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য ধ্যান ও একাগ্রতার দ্বারা মনকে অভ্যস্ত করা যেন ইহা আর না ভাবে যে বিভিন্ন বিষয় ও সত্তা নিজে নিজে পৃথকভাবে বিদ্যমান, বরং যেন ইহা সর্বদাই ভাবে যে সর্বত্রই "একম্" এবং সকল বিষয়ই "একম্"। যদিও আমরা এ পর্যন্ত বলে এসেছি যে জ্ঞানের জন্য প্রথম প্রয়োজন হ'ল বাহির থেকে জীবের সরে আসা আর যেন ইহাই একমাত্র অনন্য সাধনা, তথাপি পূর্ণ-যোগের সাধকের পক্ষে এই দুই সাধন পন্থাই একত্র অবলম্বন করা বাস্ত-বিকই আরো ভাল। একটির দ্বারা সে আত্মাকে দেখবে ভিতরে আর অপর-টির দ্বারা সে সেই আত্মাকে দেখবে সেই সবের মধ্যে যেসব এখন মনে হয় আমাদের বাহিরে অবস্থিত। অবশ্য এই শেষ পন্থাটি দিয়ে শুরু করাও সম্ভব অর্থাৎ প্রথমেই উপলব্ধি করা যে এই নয়নগোচর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৃষ্টিতে যা কিছু সে সবই ভগবান বা ব্রহ্ম বা বিরাট পুরুষ এবং পরে তা ছাড়িয়ে যাওয়া বিরাটের পশ্চাতে অবস্থিত সর্বে। কিন্তু ইহাতে অসুবিধাও আছে এবং সেজন্য সম্ভব হ'লে দুইটি পন্থা যুক্ত করাই ভাল।

এই যে উপলব্ধি যে সকল বিষয়ই ভগবান বা ব্রহ্ম তার, যেমন আমরা পূর্বে দেখেছি, তিনটি দিক আছে, আর এগুলিকে আমরা সুবিধামতো অনুভূতির পরপর তিনটি অবস্থা করতে পারি। প্রথম উপলব্ধি হ'ল আত্মা যার মধ্যে সকল সত্তা অবস্থিত। চিৎপুরুষ, ভগবান নিজেকে অভিব্যক্ত করেছেন এক অনন্ত আত্ম-প্রসারিত সত্তা রূপে যিনি স্বপ্রতিষ্ঠ, শুদ্ধ, কাল ও দেশের অনধীন, বরং কাল ও দেশকে বহন করেন চেতনার সংকেত রূপে। তিনি সকল বিষয়ের অতিরিক্ত, তাদের সকলকেই ধারণ করেন ঐ আত্ম-প্রসারিত সত্তা ও চেতনার মধ্যে, যা কিছু তিনি সৃজন করেন, ধারণ করেন বা হন তাদের কোনোটিরই দ্বারা বদ্ধ নন, বরং মুক্ত, অনন্ত

ও সর্বানন্দময়। যেমন প্রাচীন উপমায় বলা হয় তিনি তাদের ধারণ করেন যেমন অনন্ত আকাশ সর্ববিষয় ধারণ করে নিজের মধ্যে। কোনো কোনো সাধকের কাছে ব্রহ্মধ্যান দুরূহ হয় কারণ তার কাছে ইহা প্রথম মনে হয় এক আচ্ছিন্ন ও অগ্রাহ্য ভাবনা; তাদের কাছে আকাশ ব্রহ্মের এই উপমাটি বাস্তবিকই কার্যক্ষেত্রে অনেক সহায় হ'তে পারে। এই পরমসৎকে সে মন দিয়ে দেখতে এবং তার মানসিক সত্তায় অনুভব করতে চেষ্টা করে যেন ইহা আকাশ, ভৌতিক আকাশ নয়, তবে এক বিরাট সত্তা, চেতনা ও আনন্দের সর্বব্যাপী আকাশ, আর ইহাকেই সে একত্বে এক করে তার অন্তঃস্থ আত্মার সহিত। এইরূপ ধ্যানের দ্বারা মনকে উন্মুখতার এমন এক অনুকূল অবস্থায় আনা যেতে পারে যাতে আবরণ ছিন্ন বা অপসারণ করা হ'লে অতিমানসিক দর্শনের দ্বারা আমাদের মানসিকতা আপ্লুত এবং আমাদের সকল দেখা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব। আর যখন এই দেখার পরিবর্তন উত্তরোত্তর শক্তিশালী ও দুর্বার হ'য়ে আমাদের সমগ্র চেতনা অধিকার করে তখন সেই পরিবর্তনের উপর শেষ পর্যন্ত আসে সম্ভূতির পরিবর্তন আর তার ফলে আমরা যা দেখি তা-ই হই। আমাদের আত্ম-চেতনায় আমরা ততটা বিশ্বাত্মক হব না যতটা হব বিশ্বাত্মকের অতিরিক্ত কিছু, অনন্ত। মন ও প্রাণ ও দেহ তখন হবে সেই যে আনন্ত্য আমরা হয়েছি তার অন্তর্গত গতিবৃত্তি মাত্র; আর আমরা দেখব যে যা আছে তা আদৌ জগৎ নয়, ইহা শুধু চিৎপুরুষের এই আনন্ত্য যার মধ্যে সঞ্চরণ করে আত্ম-সচেতন সম্ভূতির তার নিজেরই বিভিন্ন মূর্তির শক্তিশালী নানাবিধ বিশ্ব সামঞ্জস্য।

কিন্তু তাহ'লে এই যে সব রূপ ও সত্তা নিয়ে এই সামঞ্জস্য তৈরী তাদের অবস্থা কি? তারা কি আমাদের কাছে হবে শুধু প্রতিমূর্তি, অন্তঃস্থ সদ্‌বস্তু-রহিত শূন্য নাম ও রূপ, নিজেরা স্বয়ং তুচ্ছ ও অসার আর একসময় এগুলিকে আমাদের মানসিক দর্শনে যতই না জমকালো, শক্তিশালী বা সুন্দর দেখা যেত, এখন তাদের বর্জন করতে হবে, মনে করতে হবে যে তাদের কোনো মূল্য নেই? না, তা নয়; যদিও ইহাই প্রথম স্বাভাবিক ফল হবে যদি সাধক সর্বাশ্রয়ী আত্মার আনন্ত্যে অত্যন্ত প্রগাঢ়ভাবে বিভোর থাকে আর তাঁর আশ্রয়স্থিত অনন্ত সব সত্তাকে বাদ দেয়। কিন্তু এইসব বিষয় শূন্য নয়, এক বিশ্বমনের দ্বারা কল্পিত অসত্য নাম ও রূপমাত্র নয়; আমরা যেমন বলেছি তারা তাদের সদ্‌বস্তুতে আত্মার আত্মসচেতন সম্ভূতি,

অর্থাৎ আত্মা যেমন আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত, তেমন তাদের সকলেরই মধ্যে অধিষ্ঠিত, তাদের সম্বন্ধে সচেতন, তাদের গতিবিধির নিয়ন্তা এবং যা সব তিনি হ'য়েছেন তাদের আলিঙ্গন করে তিনি যেমন আনন্দময়, সেসবের অধিষ্ঠান হ'য়েও তেমন আনন্দময়। যেমন আকাশ ঘট ধারণ করে আবার যেন তার মধ্যে ধরা থাকে, তেমন এই আত্মা সর্বভূতকে ধারণ করেন আবার তাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন––তবে ভৌতিক অর্থে নয়, আধ্যাত্মিক অর্থে, এবং তিনি সর্বভূতের সদ্‌বস্তু। আত্মার এই অন্তরা-ধিষ্ঠানের অবস্থা আমাদের উপলব্ধি করা চাই; সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে আমাদের দেখতে হবে এবং আমাদের চেতনায় নিজেদের ঐ আত্মা হতে হবে। ধীশক্তি ও মানসিক সংস্কারের সকল দাম্ভিক বাধা সরিয়ে দিয়ে আমাদের জানতে হবে যে ভগবান এই সকল সম্ভূতির মধ্যে অবস্থিত এবং তাদের প্রকৃত আত্মা ও চিন্ময় চিৎ-পুরুষ, আর শুধু বুদ্ধিগতভাবে জানা নয়, এমন এক আত্ম-অনুভূতির দারা জানতে হবে যা মানসিক চেত-নার সকল অভ্যাসকে জোর ক'রে পরিবর্তিত করবে তার নিজের দিব্যতর গঠনে।

এই যে আত্মা যা আমরা তাকে সর্বশেষে আমাদের আত্ম-চেতনায় হতে হবে সর্বভূতের সহিত সম্পূর্ণ এক, যদিও ইহা তাদের অতিরিক্ত। আমাদের ইহাকে দেখা চাই শুধু যে সকল কিছুর আধার ও অন্তর্বাসীরূপে তা নয়, দেখা চাই যে ইহাই সব; দেখা চাই ইহা শুধু অন্তরাধিষ্ঠাতা চিৎ-পুরুষ নয়, ইহাই আবার নাম ও রূপ, গতিবৃত্তি ও গতিবৃত্তির ঈশ্বর, মন ও প্রাণ ও দেহ। এই সর্বশেষে উপলব্ধিবলেই আমরা সঠিক স্থিতিতে এবং সত্যের দর্শনে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গ্রহণ কবব সেইসব যে সব থেকে আমরা সাধনার প্রথম ক্রিয়ায় অর্থাৎ পশ্চাদগমন ও প্রত্যাহারে পিছিয়ে এসেছিলাম। যে ব্যষ্টি মন, প্রাণ ও দেহ থেকে আমরা সরে এসেছিলাম আমাদের প্রকৃত সত্তা নয় বোলে, সে সবকে আমরা ফিরে পাব আত্মার প্রকৃত সম্ভূতিরূপে, তবে আর শুধু ব্যষ্টি সংকীর্ণতায় নয়। আমরা এই যে মনকে নেব তা এক ক্ষুদ্র গতির মধ্যে আবদ্ধ পৃথক মানসিকতা রূপে নয়, ইহাকে নেব বিশ্বমনের এক বৃহৎ গতিরূপে; যে প্রাণ নেব তা প্রাণশক্তি ও ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ও কামনার অহমাত্মক ক্রিয়া রূপে নয়, ইহাকে নেব বিশ্বপ্রাণের স্বচ্ছন্দ গতিরূপে, যে দেহকে নেব তা অন্তঃপুরুষের ভৌতিক কারাগার রূপে নয়, ইহাকে নেব এক গৌণ যন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করা যায় এমন পরিচ্ছদ

রূপে এবং এই উপলব্ধিতে যে ইহা বিশ্বজড়ের এক গতি, বিশ্বশরীরের এক কোশ। আমাদের এই অনুভব আসবে যে ভৌতিক জগতের সকল চেতনা আমাদের শারীরচেতনার সহিত এক, চারিদিককার বিশ্বব্যাপী প্রাণের সকল ক্রিয়াশক্তি আমাদেরই আপন ক্রিয়াশক্তি, বৃহৎ বিশ্ব সংবেগ ও আকুতির সকল হৃৎ-স্পন্দন আমাদেরই সব হৃৎ-স্পন্দনের অন্তর্গত যেগুলি দিব্য আনন্দের ছন্দে সমতানবদ্ধ; বিশ্বমনের সকল ক্রিয়া আমাদেরই মানসিকতার মধ্যে প্রবহমান, আর আমাদের মনন-ক্রিয়া ইহার উপর বাহিরে প্রবাহিত হ'চ্ছে সেই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের মতো। এই যে ঐক্য যা সকল মন, প্রাণ জড়কে আলিঙ্গন ক'রে থাকে এক অতিমানসিক সত্যের আলোকে ও আধ্যাত্মিক আনন্দের স্পন্দনে ইহাই আমাদের কাছে হবে সম্পূর্ণ বিশ্বচেতনার মধ্যে আমাদের আভ্যন্তরীণ ভগবদ্-চরিতার্থতা।

কিন্তু যেহেতু এই সকলকে আমাদের আলিঙ্গন করা চাই সত্তা ও সম্ভূতি—এই দুই সংজ্ঞায়, সেহেতু যে জ্ঞান আমরা অধিগত ক'রব তা সম্পূর্ণ ও অখণ্ড হ'তে বাধ্য। শুদ্ধ আত্মা ও চিৎ-পুরুষের উপলব্ধিতেই এ জ্ঞান শেষ হ'লে চলবে না, ইহাতে চিৎ-পুরুষের সেই সকল বিভাবও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যার দ্বারা ইহা নিজেকে ধারণ, বিকশিত ও নিক্ষেপ করে নিজেরই বিশ্বঅভিব্যক্তির মধ্যে। আত্মজ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞানকে এক করা চাই ব্রহ্মের সর্ব-আবেষ্টন-করা জ্ঞানের মধ্যে।

একাদশ অধ্যায়

আত্মার বিভিন্ন বিভাব

জ্ঞানমার্গে যে আত্মার উপলব্ধি আমরা লাভ করি তা যে শুধু আমাদের মনস্তাত্ত্বিক সত্তার বিভিন্ন অবস্থা ও গতিবৃত্তির পশ্চাতে অবস্থিত ও অবলম্বন স্বরূপ সদ্‌বস্তু তা নয়, ইহা আবার সেই বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক সন্মাত্র যা নিজেকে অভিব্যক্ত করেছে বিশ্বের সকল গতির মধ্যে; সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান তার মধ্যে আরো আছে সত্তার বিভিন্ন তত্ত্বের, ইহার বিভিন্ন মৌলিক বিভাবের এবং প্রাতিভাসিক বিশ্বের বিভিন্ন তত্ত্বের সহিত ইহার সব সম্বন্ধের জ্ঞান। ইহাই উপনিষদের সেই কথার অর্থ যাতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে যাকে জানলে সব কিছু জানা হয় তা-ই ব্রহ্ম।[১] উপনিষদ বলে, ইহাকে প্রথম উপলব্ধি ক'রতে হবে শুদ্ধ সৎ-তত্ত্ব হিসাবে এবং পরে যে অন্তঃপুরুষ ইহাকে উপলব্ধি করে তার কাছে ইহার মূল বিভাবগুলি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। অবশ্য উপলব্ধির আগেই আমরা সত্তা কি, জগৎ কি, ––তা দার্শনিক যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে আর এমনকি বুদ্ধিগতভাবে বুঝতেও চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু এরূপ দার্শনিক বোধ জ্ঞান নয়। তাছাড়া, জ্ঞানে ও দর্শনে আমরা উপলব্ধি পেতে পারি বটে কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ থাকে যদি অন্তঃপুরুষের সমগ্র অনুভূতির মধ্যে উপলব্ধি না হয় এবং আমরা যা উপলব্ধি করি তার সহিত আমাদের সমগ্র সত্তার ঐক্য না আসে।[২]যোগ-শাস্ত্রে পরতমকে জানা যায় ও যোগসাধনায় তাঁর সহিত মিলন সাধিত হয় আর তার উদ্দেশ্য হ'ল,––যে বিশ্বাতীত ভগবানকে সকল বিষয় ও জীব তাদের বিভিন্ন অঙ্গের অবর বিধানের মাধ্যমে অজ্ঞানে বা আংশিক জ্ঞান ও অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে তাঁর সহিত শুধু চিন্ময় স্বরূপে নয়, আমাদের সত্তার সচেতন বিধানেও এক হ'য়ে আত্মার মধ্যে বাস করা এবং সেই পরম স্থিতি থেকে কার্য করা। পরম সত্য জানা ও ইহার সহিত

১ যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বম্ বিজ্ঞাতম্––শাণ্ডিল্য উপনিষদ্।

২ গীতায় সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যে পার্থক্য করা হ'য়েছে তা ইহাই; পূর্ণ জ্ঞানের জন্য উভয়ই প্রয়োজনীয়।

সামঞ্জস্যে থাকা--ইহাই যথার্থ সত্তার অবস্থা; আর আমরা যা সব হই, যা সব আমরা অনুভব করি ও সম্পাদন করি সে সবের মধ্যে এই সত্য প্রকাশ করা--ইহাই যথার্থ জীবনযাপনের অবস্থা।

কিন্তু পরতমকে সঠিকভাবে জানা ও প্রকাশ করা মনোময় পুরুষ, মানুষের পক্ষে সহজ নয় কারণ পরম সত্য এবং সেহেতু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিভাবগুলি অতিমানসিক। তাদের ভিত্তি হ'ল সেই সবের মূল ঐক্য যেগুলি ধীশক্তি ও মনের ধারণায় এবং জগৎ সম্বন্ধে আমাদের মানসিক অনুভূতিতে সত্তা ও ভাবনার বিপরীত মেরু এবং সেহেতু এমন বিপরীত ও পরস্পরবিরোধী যে তাদের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য অসম্ভব, অথচ অতিমানসিক অনুভূতিতে এই সব একই সত্যের অনুপূরক বিভাব। আত্মা যে যুগপৎ এক ও বহু,--এই উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তায় আমরা ইহা আগেই দেখেছি; কারণ আমাদের উপলব্ধি করা চাই যে প্রতি বিষয় ও সত্তা--সেই 'তৎ'; সকলের ঐক্যকে উপলব্ধি করা চাই 'তৎ' হিসাবে --যেমন সমষ্টির ঐক্যে, তেমন স্বরূপের একত্বে; আর আমাদের উপলব্ধি করা চাই যে 'তৎ'ই বিশ্বাতীত আর এই যে সকল ঐক্য ও বহুত্ব আমরা সর্বত্র দেখি দুই বিপরীত হিসাবে অথচ যেগুলি সৃষ্টির সহচর মেরু তিনি সে সবের অতীতে অবস্থিত। কারণ প্রতি ব্যষ্টি সত্তাই আত্মা, ভগবান, যদিও যে মানসিক ও ভৌতিক রূপে ইহা বাস্তব ক্ষণে, দেশের বাস্তব ক্ষেত্রে, যেসব আন্তর অবস্থা ও বাহ্য ক্রিয়া ও ঘটনার জালের মাধ্যমে আমরা ব্যষ্টিকে জানি সেসবের উপাদানস্বরূপ পরিস্থিতিসমূহের বাস্তব পরম্পরায় উপস্থিত হয় তা বাহ্যতঃ সীমাবদ্ধ। সেরূপ, সমভাবেই, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রতি সমষ্টিই আত্মা, ভগবান যা নিজেকে প্রকাশ করে এই অভিব্যক্তির অবস্থাসমূহের মধ্যে। কোনো ব্যষ্টি বা সমষ্টিকেই আমরা যথার্থতঃ জানতে পারি না যদি আমরা ইহাকে জানি শুধু সেইভাবে যেমন ইহা নিজের কাছে আন্তরভাবে বা আমাদের কাছে বাহ্যভাবে প্রতীয়মান হয়; ইহাকে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন আমরা জানি যে ইহা ভগবান, একম্, আমাদেরই আপন আত্মা যিনি আত্মঅভিব্যক্তির নানাবিধ মূল বিভাব ও তাঁর নৈমিত্তিক পরিস্থিতিসমূহ প্রয়োগ করছেন। যতদিন না আমরা আমাদের মানসিকতার অভ্যাসগুলি এমন রূপান্তরিত করি যাতে ইহা সম্পূর্ণভাবে সেই জ্ঞানের মধ্যে বাস করবে যাতে "একম্"-এর মধ্যে সকল বিভেদের সামঞ্জস্য সাধিত হয়, ততদিন

আমরা প্রকৃত সত্যের মধ্যে বাস করি না, কেননা আমরা প্রকৃত ঐক্যের মধ্যে বাস করি না। ঐক্যের সিদ্ধ বোধ তা নয় যাতে সকল কিছুকে দেখা হয় এক সমগ্রের বিভিন্ন অংশ রূপে, এক সমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গ হিসাবে; ইহা সেই বোধ যাতে যেমন সর্বকে, তেমন প্রত্যেকটিকে এক পরম তাদাত্ম্যে পুরোপুরি দেখা হয় ভগবান ব'লে, পুরোপুরি দেখা হয় আমাদের আত্মা ব'লে।

আবার তথাপি, অনন্তের মায়া এতই জটিল যে এমন এক অর্থ আছে যাতে সকলকে সমগ্রের বিভিন্ন অংশরূপে, সমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গ হিসাবে, এমনকি এক অর্থে বিভিন্ন পৃথক সত্তা রূপেও দেখা পূর্ণ সত্য ও পূর্ণ জ্ঞানের প্রয়োজনীয় অঙ্গ হ'য়ে ওঠে। কারণ যদিও আত্মা সর্বদাই সকলের মধ্যে এক, তবু আমরা দেখি যে অন্ততঃ সৃষ্টিচক্রের উদ্দেশ্যে ইহা নিজেকে প্রকাশ করে বিভিন্ন নিত্য অন্তঃপুরুষের রূপে যাসব বিভিন্ন জগতের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধ'রে আমাদের ব্যক্তিভাবনার গতিবৃত্তির উপর অধ্যক্ষতা করে। এই স্থায়ী পুরুষ-সত্তাই প্রকৃত ব্যষ্টিত্ব, আর আমরা যাকে আমাদের ব্যক্তিভাবনা বলি তার নিরন্তর পরিবর্তনের পশ্চাতে ইহা দণ্ডায়মান। ইহা সীমাবদ্ধ অহং নয়, বরং এমন এক কিছু যা নিজের মধ্যে অনন্ত; ইহা সত্যই নিজে অনন্ত তবে ইহার সত্তার এক স্তর থেকে ইহা সম্মত হ'য়েছে এক চিরন্তন অন্তঃপুরুষ-অনুভূতির মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত ক'রতে। ইহাই সাংখ্যের সেই বহুপুরুষবাদের মূলে সত্য যাতে বলা হয় যে বহু মৌলিক, অনন্ত, মুক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক পুরুষ প্রতিফলিত করে একমাত্র বিশ্ব ক্রিয়াশক্তির সব গতিবৃত্তিকে। যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সাংখ্য থেকে অত্যন্ত ভিন্ন এক দর্শন এবং বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও মায়াবাদী অদ্বৈত দর্শনের আতিশয্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ উদ্ভূত হ'য়েছিল একরূপ তারও পশ্চাতে ইহা অবস্থিত। এক প্রাচীন অর্ধ-বৌদ্ধ অর্ধ-সাংখ্য মতে শুধু শান্তকেই দেখা হয়, জগতে অন্য কিছু নেই আছে শুধু পঞ্চ ভূতের নিরন্তর সমবায় এবং অচেতন ক্রিয়া-শক্তির তিনটি গুণ যা শান্তের মধ্যে প্রতিফলিত হ'য়ে তার চেতনার দ্বারা পঞ্চভূতের ক্রিয়াধারা আলোকিত করে; কিন্তু ইহা ব্রহ্মের সমগ্র সত্য নয়। আমরা যে শুধু পরিবর্তনশীল মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক উপাদানের স্তূপ, জন্মজন্মান্তরে মন ও প্রাণ ও দেহের বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করি আর তার ফলে কোনো সময়েই এই সকল প্রবাহের পশ্চাতে কোনো সত্য আত্মা বা জীবনের কোনো সচেতন যুক্তি থাকে না

অথবা কিছুই থাকে না, এক সেই "শান্ত" ছাড়া যা এই সকল কিছুই সম্বন্ধে উদাসীন--একথা ঠিক নয়। আমাদের মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ব্যক্তিভাবনার নিরন্তর পরিবর্তনের পশ্চাতে আছে আমাদের সত্তার এক সত্য ও স্থির সামর্থ্য, আর ইহাকেই আমাদের জানা ও রক্ষা করা দরকার যাতে ইহার মাধ্যমে অনন্ত তাঁর ইচ্ছামতো নিজেকে ব্যক্ত করতে পারেন তাঁর শাশ্বত বিশ্বক্রিয়াধারার যে কোনো স্তরে ও যে কোনো উদ্দেশ্যের জন্য।

আর এই একম্ যা সকল কিছুর উৎস এই বহু যার সারতত্ত্ব ও প্রভব হ'ল "একম্" এবং এই ক্রিয়া-শক্তি, সামর্থ্য বা প্রকৃতি যার মাধ্যমে এক ও বহুর সম্বন্ধগুলি রক্ষা করা হয়--এই তিনের সম্ভবপর চিরন্তন ও অনন্ত সম্বন্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা সৃষ্টিকে বিবেচনা করি তাহ'লে আমরা দেখব যে, যেসব দ্বৈতবাদী দর্শন ও ধর্মে মনে হয় সত্তাসমূহের ঐক্য জোরের সহিত অস্বীকার করা হয় আর ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট সব বিষয়ের মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় বিভেদ রচিত হয় তাদেরও সমর্থনে কিছু যুক্তি আছে। যদিও এইসব ধর্মের স্থূলতর রূপগুলিতে একমাত্র লক্ষ্য হ'ল নিম্ন স্বর্গের অজ্ঞানময় সুখভোগ করা, তথাপি এক অতি উচ্চতর ও গভীর-তর অর্থ আছে যাতে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব ভক্ত কবির সেই আকুল কথা; যাতে এক সাদাসিধে জোরালো উপমায় তিনি চেয়েছিলেন যে চিরদিন ধরে পরমের আলিঙ্গনের আনন্দ উপভোগ করার অধিকার অন্তঃপুরুষের আছে। তিনি লিখেছিলেন, "আমি চিনি হ'তে চাই না, আমি চিনি খেতে চাই"। সকলের মধ্যে এক আত্মার স্বরূপগত তাদাত্ম্যের উপর আমরা নিজেদের যত দৃঢ়ভাবেই না প্রতিষ্ঠিত করি, ইহা মনে করার প্রয়োজন নেই যে ঐ আকুল ডাক একপ্রকার আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আস্পৃহা অথবা আসক্ত ও অজ্ঞানপূর্ণ জীবের দ্বারা পরম সত্যের শুদ্ধ ও উন্নত কঠোরতা বর্জন। বরং, সদর্থকভাবে ইহার লক্ষ্য পরম পুরুষের এমন এক গভীর ও রহস্যময় সত্য যা মানুষের ভাষা ব্যক্ত করতে অসমর্থ, মানুষের যুক্তি যার কোনো ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম; এখানে প্রবেশ করার চাবি আছে হৃদয়ের, আর যে জ্ঞানের পুরুষ শুধু নিজের শুদ্ধ কঠোরতায় আগ্রহী তার অহংকার তাকে লোপ করতে সক্ষম নয়। তবে এই বিষয়টি ভক্তিমার্গের শিখরের কথা, আর সেখানে আমরা তার কথা আবার বলব।

পূর্ণ যোগের সাধক তার সাধ্য সম্বন্ধে এক পূর্ণ দৃষ্টি নেবে এবং সে চাইবে তার পূর্ণ উপলব্ধি। ভগবানের যে চিরন্তন আত্ম-অভিব্যক্তি তার

স্বরূপগত বিভাব অনেকগুলি, তিনি নিজেকে অধিগত করেন ও খুঁজে পান অনেক লোকের উপর এবং তাঁর সত্তার অনেক মেরুর মধ্য দিয়ে; প্রতি বিভাবে তার উদ্দেশ্য আছে এবং প্রতি লোকেই বা মেরুতেই ইহার সার্থকতা আছে---আর তা আছে শাশ্বত ঐক্যের শিখরে ও পরমক্ষেত্রে---উভয়েই। ব্যষ্টি আত্মার মাধ্যমেই আমাদের 'একম্'-এ উপনীত হ'তে হবে; ইহা অনিবার্য, কারণ ব্যষ্টি আত্মাই আমাদের সকল অনুভূতির ভিত্তি। বিদ্যার দ্বারা আমরা একম্-এর সহিত তাদাত্ম্য লাভ করি; কারণ দ্বৈতবাদী যাই বলুক একটি স্বরূপগত তাদাত্ম্য আছে যার দ্বারা আমরা আমাদের উৎসের মধ্যে ডুব দিয়ে সক্ষম হই ব্যষ্টিভাবের সকল বন্ধন থেকে, আবার এমন কি বিশ্বভাবেরও সকল বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে। আর ঐ তাদাত্ম্যের অনুভূতি যে শুধু জ্ঞানের পক্ষে বা আচ্ছিন্ন সত্তার শুদ্ধ অবস্থার পক্ষে এক লাভ তা নয়। আমরা দেখেছি যে আমাদের সকল ক্রিয়ার পরাকাষ্ঠা হ'ল কর্মের পথে দিব্য সংকল্প বা চিৎ-সামর্থ্যের সহিত ঐক্যে ঈশ্বরের মধ্যে নিজেদের নিমজ্জন; প্রেমের পরাকাষ্ঠা হ'ল আমাদের প্রেম ও আরাধনার বিষয়ের সহিত উল্লাসভরা আনন্দের ঐক্যে নিজেদের হর্ষ-বিভোর নিমজ্জন। কিন্তু আবার জগতে দিব্য কর্মের জন্য ব্যষ্টি আত্মা নিজেকে চেতনার এক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে আর ইহার মধ্য দিয়ে দিব্য সংকল্প যা দিব্য প্রেম ও আলোকের সহিত এক নিজেকে বাহিরে ঢেলে দেয় বিশ্বের বহুত্বের মধ্যে। এই একই প্রকারে পরমের সহিত এবং অপর সকলের অন্তঃস্থ আত্মার সহিত এই আত্মার তাদাত্ম্যের মাধ্যমে আমরা লাভ করি আমাদের সকল মানবভাইদের সহিত আমাদের ঐক্য। একই সময়ে প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে আমরা ইহার দ্বারা একম্-এর অন্তঃপুরুষ-রূপ হিসাবে এক বিশেষত্ব রক্ষা করি যার জন্য আমরা অপর সব সত্তার সহিত এবং স্বয়ং পরমের সহিত একত্বের মধ্যেও ভেদের বিভিন্ন সম্বন্ধ রক্ষা করতে সমর্থ হই। তবে ইহা অনিবার্য যে এই সম্বন্ধগুলি এমন হবে যে যখন আমরা পুরোপুরি অবিদ্যার মধ্যে বাস করতাম আর একত্ব ছিল শুধু এক নাম বা অপূর্ণ প্রেম, সমবেদনা বা আকুতির এক কষ্টকর আস্পৃহা তখন যেসব সম্বন্ধ আমাদের ছিল সেসব থেকে এইগুলি সারে ও ভাবে অতীব ভিন্ন। ঐক্যই হবে বিধান, ভেদ থাকবে শুধু ঐ ঐক্যকে নানাভাবে উপভোগ করার জন্য। বিভাজনের যে লোক অহং-বোধের বিচ্ছিন্নতা আঁকড়ে থাকে তাতে আবার না নেমে এসে, অথবা ভেদের কোনো

লীলার সহিত সম্পর্করহিত শুদ্ধ তাদাত্ম্যের জন্য আত্যন্তিক সাধনায় আসক্ত না হয়ে, আমরা বরং সত্তার এই দুই মেরুকে আলিঙ্গন ক'রে তাদের মধ্যে সঙ্গতি আনব সেইখানে যেখানে তারা মিলিত হয় পরতমের আনন্ত্যের মধ্যে।

আত্মা, এমনকি ব্যষ্টি আত্মাও যেমন আমাদের মানসিক অহং-বোধ থেকে ভিন্ন, তেমন ভিন্ন আমাদের ব্যক্তিভাবনা থেকে। আমাদের ব্যক্তি-ভাবনা কখন এক থাকে না; ইহা এক সতত পরিবর্তন ও নানাবিধ সমবায়। ইহা কোনো মূল চেতনা নয়, তবে চেতনার বিভিন্ন রূপের বিকাশ--সত্তার কোনো সামর্থ্য নয়, তবে সত্তার বিভিন্ন আংশিক সামর্থ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলা--আমাদের জীবনের আত্ম-আনন্দের ভোক্তা নয় বরং অনুভূতির যে নানাবিধ স্বর ও তান ঐ আনন্দকে কম বা বেশী মাত্রায় বিভিন্ন সম্পর্কের পরিবর্তনশীলতায় পরিণত করবে তাদের জন্য অন্বেষণ। ইহাও পুরুষ ও ব্রহ্ম কিন্তু ইহা ক্ষর পুরুষ, সনাতনের প্রাতিভাসিক, কিন্তু ইহার স্থায়ী সদ্‌বস্তু নয়। গীতায় তিন পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হ'য়েছে, এই তিন পুরুষ দিয়েই দিব্য পরম পুরুষের সমগ্র অবস্থা ও ক্রিয়া গঠিত হয়; ইহারা ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম যিনি অপর দুটিকে ধারণ করেন আবার তাদের অতীত। ঐ পুরুষোত্তমই ঈশ্বর যাঁর মধ্যে আমাদের বাস করা চাই, তিনিই আমাদের মধ্যে ও সকলের মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মা। অক্ষর পুরুষ সেই নীরব, নিষ্ক্রিয়, সম ও নির্বিকার আত্মা যা আমরা লাভ করি যখন আমরা নিবৃত্ত হই সক্রিয়তা থেকে নিষ্ক্রিয়তায়, চেতনা ও শক্তির লীলা ও আনন্দের অন্বেষণ থেকে সেই চেতনা ও শক্তি ও আনন্দের শুদ্ধ ও ধ্রুব ভিত্তিতে যার মাধ্যমে মুক্ত, আত্মস্থ ও অনাসক্ত পুরুষোত্তম লীলা অধিগত ও ভোগ করেন। ব্যক্তিভাবনার যে পরিবর্তনশীল প্রবাহের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বজীবনের বিভিন্ন সম্পর্ক সম্ভবপর হয় তার ধাতু (দ্রব্য) ও অব্যবহিত প্রবর্তক হ'ল ক্ষর পুরুষ। ক্ষরের মধ্যে নিবদ্ধ মনোময় পুরুষ ইহার প্রবাহের মধ্যে বিচরণ করে, শাশ্বত প্রশান্তি, সামর্থ্য ও আত্ম-আনন্দের অধিকার সে পায়নি; অক্ষরের মধ্যে নিবদ্ধ অন্তঃপুরুষ এই সবকে নিজের মধ্যে ধারণ করে কিন্তু জগতে কাজ করতে অক্ষম; কিন্তু যে অন্তঃপুরুষ পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করতে সক্ষম সে সত্তার শাশ্বতপ্রশান্তি ও সামর্থ্য ও আনন্দ ও ব্যাপ্তি উপভোগ করে। নিজের আত্মজ্ঞান ও আত্মসামর্থ্যে ইহা চরিত্র বা ব্যক্তিভাবনার দ্বারা অথবা নিজের

চেতনার শক্তি ও অভ্যাসের বিভিন্ন রূপের দ্বারা বদ্ধ নয় অথচ জগতের মধ্যে ভগবানের আত্ম-প্রকাশের জন্য এসবকে সে ব্যবহার করে বিশাল স্বাধীনতা ও সামর্থ্যের সহিত। এখানেও এই যে পরিবর্তন তার অর্থ যে আত্মার মূল বিভাবগুলির কোনো বিকার তা নয়, ইহার অর্থ পরতমের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে আমাদের উদ্‌বর্তন এবং আমাদের সত্তার দিব্য বিধানের যথার্থ প্রয়োগ।

আত্মার এই তিন বিভাবের সহিত জড়িত রয়েছে ভারতীয় দর্শনের সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে পার্থক্য; ইওরোপীয় ভাবনায় ইহাই ব্যক্তিরূপী ও নৈর্ব্যক্তিক ভগবানের পার্থক্য। এই বিরোধ যে আপেক্ষিক তা উপনিষদের সেই কথাটিতে সুস্পষ্ট হয় যাতে বলা হয়েছে যে পরব্রহ্ম "সগুণ অথচ নির্গুণ"[১]। আবার আমরা পাই সনাতন সত্তার দুই স্বরূপগত বিভাব, দুই মৌলিক দিক, দুই মেরু আর উভয়কেই অতিক্রম করা হয়েছে বিশ্বাতীত দিব্য সদ্‌বস্তুর মধ্যে। কার্যতঃ এই দুই নীরব ও সক্রিয় ব্রহ্মের অনুরূপ। কারণ এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে করা হ'তে পারে যে বিশ্বের সমগ্র ক্রিয়া হ'ল ব্রহ্মের অসংখ্য ও অনন্ত গুণের নানাভাবে প্রকাশ ও রূপায়ণ। চিন্ময় সংকল্পের দ্বারা তাঁর সত্তা চিন্ময় সত্তার উপাদানের সকল প্রকার ধর্ম ও রূপায়ণ গ্রহণ করে, এগুলি যেন স্ফুরন্ত আত্ম-চেতনার বিশ্বস্বভাব ও সামর্থ্যের বিভিন্ন অভ্যাস, অর্থাৎ বিভিন্ন গুণ, আর এই সবেই সকল বিশ্বক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু ইহাদের কোনোটির দ্বারাই বা তাদের সকলগুলির দ্বারাও বা তাদের চরম অনন্ত যোগ্যতার দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না; তিনি তাঁর সব গুণের ঊর্ধ্বে এবং সত্তার এক বিশেষ স্তরে সেসব থেকে মুক্ত হ'য়ে অবস্থান করেন। নির্গুণ ব্রহ্ম যে গুণধারণে অসমর্থ তা নয়, বরং এই নির্গুণ ব্রহ্মই নিজেকে ব্যক্ত করেন সগুণরূপে, অনন্ত গুণরূপে কারণ তিনি সব কিছু ধারণ করেন তাঁর অসীম বিচিত্র আত্মপ্রকাশের একান্ত সামর্থ্যে। তিনি যে এই সব থেকে মুক্ত তা এই অর্থে যে তিনি এসবের অতিরিক্ত; আর বাস্তবিকই যদি তিনি এসব থেকে না মুক্ত হ'তেন, তিনি অনন্ত হ'তে পারতেন না; ভগবান তাঁর সব গুণের অধীন হ'তেন, নিজের প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ হ'তেন, প্রকৃতিই পরম সত্তা হ'ত আর পুরুষ হ'ত ইহার রচনা ও ক্রীড়নক। গুণ বা গুণের অভাব, ব্যক্তিসত্ত্ব

১ নির্গুণো গুণী

বা নৈর্ব্যক্তিকত্ব--কিছুরই দ্বারা সনাতন বদ্ধ নন, তিনি স্বয়ং তাঁর পরিচয়, আমাদের সকল সদর্থক ও নঞর্থক বিবরণের অতীত।

কিন্তু যদিও আমরা সনাতনের বিবরণ দিতে অক্ষম, তবু আমরা তাঁর সহিত নিজেদের এক করতে সক্ষম। বলা হয় যে আমরা নৈর্ব্যক্তিক হ'তে পারি কিন্তু পুরুষবিধ ভগবান হতে পারি না, কিন্তু ইহা সত্য শুধু এই অর্থে যে কেহই ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বসমূহের ঈশ্বর হ'তে অক্ষম; কিন্তু আমরা সক্ষম নিজেদের মুক্ত ক'রতে যেমন নীরবতার সত্তার মধ্যে তেমন সক্রিয় ব্রহ্মের সত্তার মধ্যে; আমরা উভয়ের মধ্যেই বাস ক'রতে সক্ষম, উভয়েরই মধ্যে আমাদের সত্তায় ফিরে যেতে সক্ষম কিন্তু তা হবে প্রতিটির উপযোগী-ভাবে,--নির্গুণের সহিত স্বরূপে এক হ'য়ে আর সগুণের সহিত এক হ'য়ে আমাদের সক্রিয় সত্তার স্বাধীনতায়, আমাদের প্রকৃতিতে[১]। এক শাশ্বত প্রশান্তি, স্থিতি ও নীরবতার মধ্য থেকে পরম নিজেকে ঢেলে দেন এমন চিরন্তন সক্রিয়তার মধ্যে যা অবাধ ও অনন্ত, তিনি নিজের জন্য নিজের আত্ম-বিশেষণ নির্ধারণ করেন ইচ্ছামতো, অনন্ত গুণ ব্যবহার করেন যাতে তা থেকে রচিত হয় গুণের বিচিত্র সমবায়। সেই প্রশান্তি, স্থিতি ও নীরবতায় আমাদের ফিরে যেতে হবে; আর তার মধ্য থেকে কাজ করতে হবে গুণের বন্ধন থেকে দিব্যভাবে মুক্ত হ'য়ে কিন্তু তবু জগতে দিব্য কর্মের জন্য আমরা সব গুণ, এমনকি, যেগুলি অত্যন্ত বিপরীত সেগুলিও ব্যবহার করব বৃহৎ ও নমনীয়ভাবে। শুধু পার্থক্য এই যে, ঈশ্বর কাজ করেন সকল বিষয়ের কেন্দ্রের মধ্য থেকে, আর আমরা কাজ করি ব্যষ্টি কেন্দ্রের অর্থাৎ আমরা যে তাঁর অন্তঃপুরুষ-রূপ তার মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্কল্প ও সামর্থ্য ও আত্ম-জ্ঞান সঞ্চালন ক'রে। ঈশ্বর কোনো কিছুর অধীন নন; ব্যষ্টি অন্তঃপুরুষ-রূপ তার নিজের সর্বোচ্চ আত্মার অধীন, আর এই অধীনতা যত বেশী ও যত একান্ত হয় তত বেশী হয় তার একান্ত শক্তি ও স্বাধীনতার বোধ।

(পাশ্চাত্ত্যদর্শনের) পুরুষবিধ (Personal) ও নৈর্ব্যক্তিকের (Impersonal) পার্থক্য মূলতঃ ভারতীয় পার্থক্যের সমান কিন্তু ইংরাজী কথাগুলির সহিত এমন এক সীমার অর্থ জড়িত আছে যা ভারতীয় ভাবনায় নেই। ইওরোপীয় ধর্মগুলির পুরুষবিধ ভগবান এমন ব্যক্তি যার অর্থ মানবীয়

১ সাধর্ম্য মুক্তি।

ব্যক্তি, তিনি সর্বশক্তি ও সর্বজ্ঞতার অধিকারী হ'য়েও তাঁর গুণের দ্বারা সীমাবদ্ধ; শিব বা বিষ্ণু বা ব্রহ্মা বা সকলের ভগবতী মাতা, দুর্গা বা কালী—এইসব ভারতীয় বিশেষ ভাবনার অনুরূপ ইহা। বস্তুতঃ প্রতি ধর্মই তার নিজস্ব হৃদয় ও ভাবনা অনুযায়ী পূজা ও সেবার জন্য এক ভিন্ন ব্যক্তিরূপী দেবতা খাড়া করে। ক্যালভিনের (Calvin) উগ্র ও কঠিন-হৃদয় ভগবান আর সাধু ফ্রান্সিসের (St. Francis) মধুর ও প্রেম-ময় ভগবান দুই ভিন্ন সত্তা, যেমন, ভিন্ন প্রসন্ন বিষ্ণু আর ভীষণা কালী যদিও ইনি সর্বদাই স্নেহশীলা ও মঙ্গলময়ী, নিধনের মধ্যেও করুণাময়ী, ধ্বংসের দ্বারাই উদ্ধার করেন। শিব যিনি কৃচ্ছ্র ত্যাগের দেবতা ও সকল কিছুর সংহারকর্তা তাঁকে মনে হয় বিষ্ণু ও ব্রহ্মা থেকে ভিন্ন যাঁরা কাজ করেন দয়া, প্রেম দিয়ে, জীব রক্ষা ক'রে অথবা জীবন ও সৃষ্টির জন্য। স্পষ্টতঃই এইরূপ সব প্রত্যয়ে বিশ্বের অনন্ত ও সর্বব্যাপী স্রষ্টা ও রাজ্যে-শ্বরের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা শুধু অত্যন্ত আংশিক ও আপেক্ষিক অর্থে সত্য হওয়া সম্ভব। তাছাড়া ভারতীয় ধর্মের ভাবনায় বলা হয় না যে এই সব বিবরণ পর্যাপ্ত। পুরুষবিধ ভগবান তাঁর গুণের দ্বারা সীমিত নন, তিনি অনন্ত গুণ, অনন্ত গুণধারণে সমর্থ এবং সে সবের অতীত, তিনি এসবের ঈশ্বর ও তাদের ব্যবহার করেন ইচ্ছামতো, আর ব্যষ্টি অন্তঃ-পুরুষের নিজস্ব প্রকৃতি ও ব্যক্তিভাবনা অনুযায়ী তার কামনা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন তাঁর অনন্ত দেবত্বের নানাবিধ নাম ও রূপে। এই কারণেই সাধারণ ইওরোপীয় মনের পক্ষে বেদান্ত বা সাংখ্য দর্শন থেকে ভিন্ন যে ভারতীয় ধর্ম তা বুঝতে এত কষ্ট হয়। কারণ অনন্তগুণসম্পন্ন এক পুরুষবিধ ভগবান এমন পুরুষবিধ ভগবান যিনি একটি ব্যক্তি নন বরং যিনি একমাত্র আসল ব্যক্তি ও সকল ব্যক্তিসত্ত্বের উৎস—এরূপ ভাবনা ইহার পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু দিব্য ব্যক্তিসত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র যথার্থ ও সম্পূর্ণ সত্য।

আমাদের সমন্বয়ে দিব্য ব্যক্তিসত্ত্বের কি স্থান তা পরে ভক্তিযোগের আলোচনায় সম্যক্ ভাবে বিবেচনা করা হবে, তবে এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে পূর্ণ যোগে ইহার স্থান আছে এবং মুক্তিলাভের পরও ইহার স্থান থাকে। কার্যতঃ ব্যক্তিদেবতার দিকে যাবার পথের তিনটি পর্যায় আছে; প্রথমটিতে ভাবা হয় যে আমাদের প্রকৃতি ও ব্যক্তিভাবনা দেবতার যে নাম ও রূপ পছন্দ করে সেই অনুযায়ী দেবতার বিশেষ রূপ বা বিশেষ সব

গুণ বর্তমান[১]; দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনিই একমাত্র প্রকৃত ব্যক্তি, সর্ব-ব্যক্তিসত্ত্ব, অনন্তগুণ; তৃতীয় পর্যায়ে আমরা ফিরে যাই ব্যক্তিসত্ত্ব সম্বন্ধে সকল ভাবনা ও তথ্যের চরম উৎসে অর্থাৎ তার মধ্যে যার নির্দেশ উপনিষদ দেয় কোনো বিশেষণ প্রয়োগ না ক'রে একটিমাত্র কথা--"সঃ"র দ্বারা। পুরুষবিধ ও নৈর্ব্যক্তিক ভগবানের সম্বন্ধে আমাদের সকল উপলব্ধিই এখানে মিলিত হ'য়ে এক হয় একান্ত দেবত্বের মধ্যে। কারণ নৈর্ব্যক্তিক ভগবান তাঁর চূড়ান্ত পাদে কোনো আচ্ছিন্ন প্রত্যয় বা শুধু এক তত্ত্ব বা সত্তার শুধু এক অবস্থা বা সামর্থ্য বা মাত্রা নয়, যেমন আমরা নিজেরা বস্তুতঃ এরূপ আচ্ছিন্ন প্রত্যয় নই। এইরূপ সব প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে ধীশক্তি প্রথম ইহার দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু উপলব্ধির পরিণতি হ'ল সে সবের অতিক্রমণ। সত্তার উত্তরোত্তর উচ্চ তত্ত্বগুলির ও সচেতন জীবনের উত্তরোত্তর উচ্চ অবস্থাগুলির উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা যেখানে উপনীত হই তা কোনো একপ্রকার সদর্থক শূন্যের মধ্যে অথবা এমন কি অস্তিত্বের কোনো অনির্বচনীয় অবস্থার মধ্যে সব কিছুর বিলোপ নয়: আমরা উপনীত হই বিশ্বাতীত সৎ স্বরূপে যা আবার সদ্‌ব্রহ্ম যিনি ব্যক্তিসত্ত্বের সকল বিবরণের অতীত অথচ সর্বদাই ব্যক্তিসত্ত্বের সারতত্ত্ব।

যখন "তৎ"-এর মধ্যে বাস করি ও আমাদের সত্তাকে লাভ করি, আমরা ইহাকে অধিগত করতে সমর্থ হই ইহার দুই বিভাবেই--নৈর্ব্যক্তিক-কে পাই সত্তা ও চেতনার এক পরম অবস্থায়, আত্মাধিকারী সামর্থ্য ও আনন্দের অনন্ত নৈর্ব্যক্তিকত্বের মধ্যে আর পুরুষবিধকে পাই দিব্য প্রকৃতির দ্বারা যা কাজ করে ব্যষ্টি অন্তঃপুরুষ-রূপের মধ্য দিয়ে এবং উহা ও ইহার যে বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক আত্মা--এ দুয়ের মধ্যকার সম্বন্ধের দ্বারা। এমনকি পুরুষবিধ দেবতারও সহিত তাঁর বিভিন্ন রূপ ও নামের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধ রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব; দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি আমাদের কর্ম হয় প্রধানতঃ প্রেমের কর্ম, তাহ'লে প্রেমের ঈশ্বররূপেই আমরা তাঁকে সেবা ও প্রকাশ করতে চাইব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সকল নাম ও রূপ ও গুণের মধ্যে তাঁর অখণ্ড উপলব্ধিও পাব আর জগতের প্রতি আমাদের মনোভাবে তাঁর যে সম্মুখভাগ প্রধান তাকেই সমগ্র অনন্ত ভগবান ব'লে ভুল করব না।

১ ইষ্টদেবতা

দ্বাদশ অধ্যায়

সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা "আত্মার বিভিন্ন বিভাব" সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি তার সম্বন্ধে প্রথম মনে হ'তে পারে যে ইহা উচ্চ ধরণের তত্ত্বজ্ঞান-মূলক, আর এমন সব বুদ্ধিগত প্রত্যয় যেগুলি সাধনার উপলব্ধির চেয়ে বরং দার্শনিক বিশ্লেষণের পক্ষে বেশী উপযোগী। কিন্তু ইহা এক মিথ্যা পার্থক্য, আমাদের মানসশক্তির বিভাজনের দ্বারাই এই পার্থক্যের সৃষ্টি। প্রাচীন মনীষার, অর্থাৎ যে প্রাচ্য মনীষার উপর আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছি তার অন্ততঃ এক মৌলিক নীতি এই যে দর্শন যে শুধু এক বুদ্ধিগত আমোদের খেলা বা সূক্ষ্ম তর্কশাস্ত্রের ক্রীড়া অথবা এমন কি তত্ত্বগত সত্যের জন্য এরূপ সত্যের অন্বেষণ হবে তা ঠিক নয়, বরং তা হবে সকল সঠিক উপায়ে সর্বসত্তার মূল সত্যগুলির সন্ধান, আর তারপর এইসব সত্য হওয়া উচিত আমাদের আপন জীবনের পথের নির্দেশ। সাংখ্য অর্থাৎ সত্যের আচ্ছিন্ন ও বিশ্লেষণমূলক উপলব্ধি হ'ল জ্ঞানের এক দিক; যোগ অর্থাৎ আমাদের অনুভূতিতে আন্তর অবস্থায় ও বহির্জীবনে এই সত্যের বাস্তব ও সমন্বয়ী উপলব্ধি হ'ল অন্য এক দিক। এই দুইটি উপায়ের সাহায্যেই মানব মিথ্যা ও অবিদ্যা থেকে উদ্ধার পেয়ে বাস করতে সক্ষম হয় সত্যের মধ্যে ও সত্যের দ্বারা। আর যেহেতু প্রতি চিন্তাশীল মানবের লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই পরম বস্তু যা সে জানতে পারে অথবা হ'তে সমর্থ, সেহেতু অন্তঃপুরুষের কর্তব্য হবে মননের দ্বারা সেই পরম সত্য সন্ধান করা ও জীবনের দ্বারা তা সমাধা করা।

এইখানেই জ্ঞানযোগের সেই অংশের সমগ্র গুরুত্ব যা আমরা বর্তমানে বিবেচনা করছি অর্থাৎ সত্তার যেসব মূল তত্ত্বগুলির উপর, আত্ম-অস্তিত্বের যেসব মূল বিভাবগুলির উপর অনপেক্ষ ভগবান তাঁর আত্ম-অভিব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান[১]। যদি আমাদের সত্তার সত্য এই হয় যে ইহা এক অনন্ত ঐক্য ও একমাত্র ইহার মধ্যেই আছে সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি,

[১] তত্ত্বজ্ঞান

আলোক, জ্ঞান, সামর্থ্য, আনন্দ এবং আমরা যে অন্ধকার, অজ্ঞানতা, দুর্বলতা, দুঃখ, খণ্ডতার সম্পূর্ণ অধীন তার কারণ যদি এই হয় যে আমরা সৃষ্টিকে দেখি এক অনন্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক সত্তার সংঘর্ষরূপে, তাহ'লে স্পষ্টতঃই সবচেয়ে কার্যোপযোগী ও বাস্তব ও উপকারী অথচ সবচেয়ে উন্নত ও দার্শনিক জ্ঞান হবে এমন উপায় বার করা যার সাহায্যে আমরা প্রমাদ থেকে নিস্তার পেয়ে বাস করতে সমর্থ হই সত্যের মধ্যে। সেইরূপ আবার যদি এই একম্ স্বভাবতঃ সেই সব গুণের ক্রিয়ার বন্ধন থেকে মুক্তি হয় যেগুলির দ্বারা আমাদের মনোভূমি গঠিত আর যদি ঐ ক্রিয়ার অধীনতা থেকেই এই সংঘর্ষ ও বৈষম্য উৎপন্ন হয় যার মধ্যে আমরা বাস করি ও চিরদিন ছটফট করি শুভ ও অশুভ, পাপ ও পুণ্য, তৃপ্তি ও বিফলতা, হর্ষ ও বিষাদ, সুখ ও যন্ত্রণা এই সব দ্বন্দ্বের মধ্যে তাহ'লে এই সব গুণের অতীতে গিয়ে সে সবের ঊর্ধ্বে যা সর্বদাই অবস্থিত তার দৃঢ় প্রশান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই একমাত্র কার্যোপযোগী জ্ঞান। নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞানতা, নিজের সহিত, ও জীবনের সহিত ও অন্যদের সহিত আমাদের বৈষম্য ও বিবাদ---এই সবের কারণ যদি হয় ক্ষর ব্যক্তিভাবনার প্রতি আসক্তি, আর যদি এমন এক নির্ব্যক্তিক একম্ থাকে যার মধ্যে এরূপ কোনো বৈষম্য, অজ্ঞানতা, নিরর্থক ও কোলাহলময় চেষ্টা থাকে না, কারণ ইহা নিজের সহিত চিরন্তন তাদাত্ম্য ও সামঞ্জস্যে অবস্থিত তাহ'লে আমাদের অন্তঃপুরুষের মধ্যে সত্তার সেই নৈর্ব্যক্তিকত্ব ও অক্ষুব্ধ একত্ব লাভই হবে মানবের সাধনার একমাত্র পন্থা ও উদ্দেশ্য আর ইহাকেই আমাদের যুক্তিবুদ্ধি কার্যোপযোগিতার নাম দিতে সম্মত হ'তে পারে।

প্রকৃতির সকল সম্বন্ধের সত্যকার সূত্র ও রহস্যের জন্য মন ও দেহের মাধ্যমে প্রকৃতির চিরন্তন অন্বেষণে তার যে সংঘর্ষ ও উচ্ছ্বাস তাদের ঊর্ধ্বে আমাদের উত্তোলন করে এমন ঐক্য, নৈর্ব্যক্তিকত্ব ও বিভিন্ন গুণের ক্রিয়া থেকে মুক্তি বিদ্যমান। আর মানবজাতির প্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি হ'ল যে একমাত্র ঐখানেই উপনীত হ'য়ে, একমাত্র নিজেকে নৈর্ব্যক্তিক, এক, শান্ত, আত্ম-সমাহিত ক'রে, মানসিক ও প্রাণিক জীবন অপেক্ষা চিরন্তন মহত্তর তত্ত্বের মধ্যে ঐ জীবন অপেক্ষা মহত্তর হ'য়ে অর্জন করা যায় স্বপ্রতিষ্ঠ এবং সেহেতু দৃঢ় প্রশান্তি ও আভ্যন্তরীণ মুক্তি। সুতরাং ইহাই জ্ঞানযোগের প্রথম উদ্দেশ্য, এক অর্থে বিশিষ্ট ও মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা আমরা আগেই জোর দিয়ে বলেছি যে ইহা প্রথম হ'লেও সমগ্র উদ্দেশ্য নয়; ইহা মূল উদ্দেশ্য হ'তে পারে, কিন্তু

সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য নয়। জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না যদি ইহা শুধু দেখায় কেমন করে যাওয়া যায় বিভিন্ন সম্বন্ধ থেকে সকল সম্বন্ধের অতীতে, ব্যক্তিভাবনা থেকে নৈর্ব্যক্তিকত্বে, বহুত্ব থেকে অলক্ষণ ঐক্যে। আমাদের কাছে ইহার আরো দেওয়া দরকার--বিভিন্ন সম্বন্ধের সমগ্র লীলার, বহুত্বের সমগ্র বৈচিত্র্যের, বিভিন্ন ব্যক্তিভাবনার সমগ্র সংঘর্ষ ও প্রতিক্রিয়ার সেই সূত্র, সেই রহস্য যার জন্য বিশ্বজীবন অন্বেষণে তৎপর। আর জ্ঞান তখনো অসম্পূর্ণ রয়ে যায় যদি ইহা দেয় শুধু ভাবনা, আর অক্ষম হয় অনুভূতিতে তার সত্যতা নির্ধারণ করতে ; আমরা যে সন্ধান-সূত্র চাই, রহস্য চাই তা এই জন্য যে আমরা যেন প্রাতিভাসিককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ইহা যার প্রতিরূপ সেই সদ্‌বস্তু দিয়ে, ইহার সব বৈষম্যকে নিরাময় করতে পারি তাদের পশ্চাতে অবস্থিত সামঞ্জস্য ও মিলনের গূঢ় তত্ত্বের দ্বারা, আর উপনীত হই জগতের মিলনেচ্ছু ও বিভেদেচ্ছু প্রচেষ্টা থেকে ইহার সার্থকতার সৌষম্যে। জগতের হৃদয়ের যে আকুতি এবং ইহাকে পূর্ণ ও কার্যকরী আত্মজ্ঞানের যা দেওয়া আবশ্যক তা শুধু প্রশান্তি নয়, তা সার্থকতা ; প্রশান্তি শুধু হ'তে পারে আত্ম-সার্থকতার শাশ্বত অবলম্বন, অনন্ত অবস্থা, স্বাভাবিক আবহাওয়া।

উপরন্তু যে জ্ঞান বহুত্বের, ব্যক্তিভাবনার, গুণের বিভিন্ন সম্বন্ধের লীলার প্রকৃত রহস্য খুঁজে পায় তার দেখান আবশ্যক নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিভাবনার উৎসের মধ্যে, নির্গুণ ও যা নিজেকে বিভিন্ন গুণে প্রকাশ করে তার মধ্যে, অস্তিত্বের ঐক্য ও ইহার বহুলক্ষণযুক্ত বহুত্বের মধ্যে সত্তার স্বরূপে প্রকৃত একত্ব, সত্তার সামর্থ্যে অন্তরঙ্গ ঐক্য। যে জ্ঞান এই দুটির মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান রেখে দেয় সে জ্ঞান চূড়ান্ত হ'তে পারে না, তা ইহা বিশ্লেষণমূলক ধীশক্তির কাছে যতই তর্কবুদ্ধি সম্মত হ'ক অথবা আত্ম-বিভাগ-করা অনুভূতিতে যতই সন্তোষজনক হ'ক। প্রকৃত জ্ঞানের কর্তব্য এমন একত্ব লাভ করা যা বিষয়সমূহের সমগ্রতার অতিরিক্ত হ'লেও তাকে আলিঙ্গন করে, এমন একত্ব লাভ করা নয় যা সমগ্রতাকে আলিঙ্গন করতে অসমর্থ ও তাকে বর্জন করে। কারণ সর্ব-অস্তিত্বের নিজের মধ্যেই অথবা কোনো বিশ্বাতীত একত্ব এবং "পরিভূঃ"--এ দুয়ের মাঝে দ্বন্দ্বের এমন কোনো আদি ব্যবধান থাকতে পারে না যার উপর সেতু রচনা অসম্ভব। আবার যেমন জ্ঞানে, তেমনই অনুভূতি ও আত্মসার্থকতায়। যে অনুভূতি দেখে যে বিষয়সমূহের শীর্ষে দুই বিপরীত তত্ত্বের মধ্যে সেতু রচনার অযোগ্য এই-

রূপ এক আদি ব্যবধান আছে আর যে অনুভূতি ইহা বড় জোর লাফ দিয়ে পার হ'তে সমর্থ হয় যাতে একটি বা অন্যটির মধ্যে তার বাস সম্ভব হয়, কিন্তু এ দুটিকে আলিঙ্গন ক'রে এক ক'রতে অক্ষম, সে অনুভূতি চরম অনুভূতি নয়। আমরা যেভাবেই জানবার প্রয়াস করি না কেন--মননের দ্বারা, অথবা মননের অতীত জ্ঞানের দর্শনের দ্বারা অথবা আমাদের সত্তা-স্থিত সেই পূর্ণ আত্ম-অনুভূতির দ্বারা যা জ্ঞানোপলব্ধির শীর্ষ ও পরিপূর্ণতা, আমাদের এমন সক্ষম হওয়া দরকার যেন আমরা সর্বতৃপ্তিসাধক ঐক্য চিন্তায় পাই, দেখি ও অনুভব করি আর জীবনেও চরিতার্থ করি। ইহাই আমরা পাই সেই 'একম্'এর ভাবনায়, দর্শনে ও অনুভূতিতে যাঁর একত্ব বহুর মধ্যে আত্ম-প্রকাশ দ্বারা বিলুপ্ত বা দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হয় না, যিনি বিভিন্ন গুণের বন্ধনমুক্ত, কিন্তু তবু অনন্ত গুণ, যিনি সকল সম্বন্ধ ধারণ ও সংযুক্ত করেও চির অনপেক্ষ, যিনি কোনো একটি ব্যক্তি নন অথচ সকল ব্যক্তি কারণ তিনিই সর্বজ্ঞ সত্তা এবং একমাত্র চিন্ময় পুরুষ। যে ব্যষ্টিকেন্দ্র আমরা নিজেদের বলি তার পক্ষে, ইহার চেতনার দ্বারা এই ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করা এবং নিজের মধ্যে তাঁর প্রকৃতি ফুটিয়ে তোলাই আমাদের সম্মুখস্থিত উচ্চ ও অপরূপ অথচ সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত এবং পরমোত্তম অর্থক্রিয়াকারী ও উপকারী লক্ষ্য। ইহাই আমাদের আত্ম-জীবনের সার্থকতা, আবার সেই সাথে আমাদের বিশ্বজীবনের সার্থকতা, এবং ব্যষ্টির সার্থকতা যেমন নিজের মধ্যে তেমন বিশ্ব বহুর সহিত সম্বন্ধে। এই দুই সংজ্ঞার মধ্যে এমন কোনো বিরোধ নেই যার সামঞ্জস্য সাধন অসম্ভব: বরং যখন দেখা গেছে যে আমাদের আত্মা এবং বিশ্বের আত্মা একই তখন তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য থাকতে বাধ্য।

বস্তুতঃ এই সকল বিপরীত সংজ্ঞা শুধু বিভিন্ন সাধারণ অবস্থা যাতে চিন্ময় সত্তার অভিব্যক্তি হয় সেই বিশ্বাতীতের মধ্যে যিনি সর্বদাই এক,--শুধু যে পশ্চাতে তা নয়, সকল অবস্থার মধ্যেই তিনি এক, তা এই অবস্থা-গুলি দৃশ্যতঃ যতই বিপরীত হ'ক। আর, ইহাদের সকলের আদি ঐক্য-সাধক চিৎ-সত্ত্ব এবং একমাত্র সারগর্ভ বিভাব হ'ল সেই তত্ত্ব যাকে মননের সুবিধার জন্য বর্ণনা করা হয় সচ্চিদানন্দের ত্রিতত্ত্ব বোলে। সৎ, চিৎ, আনন্দ--ইহারা সর্বত্র বিদ্যমান তিন অবিচ্ছেদ্য দিব্য সংজ্ঞা। ইহাদের কোনোটিই প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন নয়, যদিও আমাদের মন ও আমাদের মানসিক অনুভূতি শুধু যে প্রভেদ করতে পারে তা নয়, বিচ্ছিন্নও করতে

পারে। মন বলতে ও ভাবতে পারে, "আমি ছিলাম, কিন্তু অচেতন ছিলাম" --কারণ কোনো সত্তার পক্ষেই, "আমি আছি, কিন্তু অচেতন"--এ বলা সম্ভব নয়--আর ইহা ভাবতে ও অনুভব করতে পারে "আমি আছি কিন্তু দুঃখী; জীবনে কোনো সুখ নেই।" বস্তুতঃ ইহা অসম্ভব। আমরা আসলে যে অস্তিত্ব, যে সনাতন "আমি আছি", যার সম্বন্ধে কখনো "ইহা ছিল" একথা বলা সত্য হবে না--সে অস্তিত্ব কোনো স্থানেই, কোনো কালেই অচেতন নয়। যাকে আমরা অচেতনতা বলি তা শুধু অন্য-চেতনা; ইহা হ'ল বিভিন্ন বহির্বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মানসিক প্রতীতির এই উপর-ভাসা তরঙ্গের প্রবেশ আমাদের অধিচেতন আত্ম-সংবিৎ-এর মধ্যে এবং অস্তিত্বের অন্যান্য লোকের যে আমাদের সংবিতে তারও মধ্যে। যখন আমরা আন্তর ভাবনায় মগ্ন হ'য়ে আমাদের সব ভৌতিক সত্তা ও পরিবেশ ভুলে যাই তখন যেমন আমরা অচেতন হই না, তেমনই যখন আমরা নিদ্রিত বা মূর্চ্ছিত বা ভেষজাচ্ছন্ন বা "মৃত" হই অথবা অন্য কোনো অবস্থা-তেই আমরা প্রকৃতপক্ষে তার বেশী যে অচেতন হই তা নয়। যে কেহ যোগের পথে একটুও অগ্রসর হ'য়েছে তার পক্ষে ইহা এক অতি প্রাথমিক বিষয়, আর ভাবনার কাছে ইহা মোটেই দুরূহ নয় কারণ অনুভূতির দ্বারা ইহার প্রতি অংশটি প্রমাণিত হয়। অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের নিরানন্দ যে একসঙ্গে থাকতে পারে না--ইহা উপলব্ধি করা আরো দুরূহ। যাকে আমরা দুঃখ, শোক, যন্ত্রণা, নিরানন্দ বলি তা আবার শুধু অস্তিত্বের আন-ন্দের এক উপরভাসা তরঙ্গ তবে এসব যে আমাদের মানসিক অনুভূতিতে এইরূপ আপাতপ্রতীয়মান বিপরীত রঙ নেয় তার কারণ হ'ল আমাদের বিভক্ত সত্তার মধ্যে এসবকে মিথ্যাভাবে গ্রহণ করার একপ্রকার চাতুরী, কিন্তু এই বিভক্ত সত্তা আদৌ আমাদের অস্তিত্ব নয়, ইহা শুধু আমাদের আত্ম-অস্তিত্বের অনন্ত সাগরের দ্বারা উপরে নিক্ষিপ্ত চিৎ-শক্তির এক আংশিক গঠন বা বিবর্ণ শীকর। ইহা উপলব্ধি ক'রতে হ'লে আমাদের কর্তব্য হবে,--আমরা এই যে সব উপরভাসা অভ্যাসে, আমাদের মনোময় সত্তার এইসব তুচ্ছ চাতুরীতে বিভোর থাকি তা থেকে সরে আসা--আর যখন আমরা এসবের পশ্চাতে ও দূরে যাই তখন আশ্চর্য লাগে কত বাহ্য তারা, বাস্তবিকই কি অদ্ভুত ক্ষীণ ও অল্পভেদ করা কাঁটা-ফোটা এইসব; তাছাড়া আমাদের উপলব্ধি করা চাই প্রকৃত অস্তিত্ব ও প্রকৃত চেতনা এবং অস্তিত্ব ও চেতনার সত্যকার অনুভূতি, সৎ, চিৎ ও আনন্দ।

চিৎ অর্থাৎ দিব্য-চেতনা আমাদের মানসিক আত্মসংবিৎ নয়, আমরা দেখব যে ইহা শুধু এক রূপ, এক নিম্নতর ও সীমিত প্রকার বা গতিবৃত্তি। যখন আমরা অগ্রসর হ'য়ে আমাদের ও বিষয়সমূহের মধ্যকার অন্তঃপুরুষ সম্বন্ধে জেগে উঠি, তখন আমরা উপলব্ধি করব যে উদ্ভিদের মধ্যে, ধাতুর মধ্যে, অণুর মধ্যে, বিদ্যুৎপ্রবাহের মধ্যে, জড়প্রকৃতির অন্তর্গত প্রতি বিষয়টির মধ্যেই চেতনা বর্তমান; আমরা এমনকি ইহাও দেখব যে এই চেতনা বাস্তবিকই মানসিক চেতনা অপেক্ষা নিম্নতর বা আরো সীমিত প্রকার নয়, বরং বিপরীত পক্ষে অনেক নিষ্প্রাণ রূপের মধ্যে ইহা আরো প্রখর, দ্রুত, তীব্র যদিও উপরদিকে কম বিকশিত। কিন্তু চিৎ-এর তুলনায়, ইহাও অর্থাৎ প্রাণিক ও জড়প্রকৃতির এই চেতনা এক নিম্নতর এবং সেহেতু সীমিত রূপ, প্রকার ও গতিবৃত্তি। এই নিম্নপ্রকার বা বিভাবগুলি একই অবিভাজ্য অস্তিত্বের অবর স্তরের চিৎ-সত্ত্ব। আমাদের মধ্যেও আমাদের অবচেতন সত্তার মধ্যে এমন এক ক্রিয়া আছে যা ঠিক "নিষ্প্রাণ" জড়প্রকৃতিরই ক্রিয়া যা থেকে আমাদের শারীর সত্তার ভিত্তি গঠিত হয়েছে, আর এক ক্রিয়া আছে যা উদ্ভিদ্-জীবনের ক্রিয়া এবং অন্য একটি ক্রিয়া আছে যা আমাদের চারিদিককার নিম্ন পশুজগতের ক্রিয়া। এই সবের উপর আমাদের মধ্যস্থ চিন্তাশীল যুক্তিশীল চেতনসত্তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ এত বেশী যে এই সব নিম্ন স্তর সম্বন্ধে আমাদের কোনো সত্যকার সংবিৎ নেই; আমাদের এই সব অংশ যে কি করছে তা আমরা তাদের নিজস্ব ভাবে জানতে অক্ষম, আমরা তাদের ক্রিয়াকে নিই অতি অপূর্ণভাবে, চিন্তাশীল যুক্তিশীল মনের সংজ্ঞায় ও মূল্যে। তবু আমরা বেশ ভালোভাবেই জানি যে আমাদের মধ্যে যেমন পরিচিত মানবসত্তা আছে, তেমন পশুও আছে—সচেতন সহজপ্রবৃত্তি ও সংবেগের অধীন এবং চিন্তাশীল বা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নয়, এমন কিছু আছে, আবার তা-ও আছে যা মননে ও সংকল্পে নিজের অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে উপর থেকে ইহার সহিত মিলিত হয় উচ্চতর স্তরের আলো ও শক্তি নিয়ে, এবং কিছু মাত্রায় ইহাকে নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহার ও পরিবর্তন করে। কিন্তু মানবের মধ্যে পশু তো শুধু আমাদের অবমানবীয় সত্তার শীর্ষ; ইহার নিম্নে অনেক কিছু আছে যা পশুর নিম্নস্তরের, শুধু প্রাণিক মাত্র, অনেক কিছু যা কাজ করে এমন সহজপ্রবৃত্তি ও সংবেগের বশে যার গঠনকারী চেতনা উপরিভাগ থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। এই অবপাশবিক সত্তার নিম্নে আরো গভীরে আছে অবপ্রাণিক।

যোগে যে অসাধারণ আত্ম-জ্ঞান ও অনুভূতি পাওয়া যায় তার মধ্যে যখন আমরা অগ্রসর হই তখন আমরা অবগত হই যে দেহেরও নিজস্ব এক চেতনা আছে; ইহার বিভিন্ন অভ্যাস, সংবেগ, সহজাতপ্রবৃত্তি আছে, আর আছে এমন এক নিঃসাড় অথচ কার্যকরী সংকল্প যা আমাদের সত্তার বাকী অংশ থেকে বিভিন্ন এবং ইহাকে বাধা দিতে ও ইহার কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ। আমাদের সত্তার মধ্যে সংঘর্ষের বেশীর ভাগেরই কারণ এই মিশ্র জীবন এবং পরস্পরের উপর এই সব বিভিন্ন ও বিষম স্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। কারণ এখানে মানব এক বিবর্তনের পরিণাম আর সে নিজের মধ্যে ঐ বিবর্তনের সব কিছু ধারণ করে--যা শুধু শারীরিক ও অবপ্রাণিক সচেতন সত্তা তা থেকে আরম্ভ ক'রে এখন শীর্ষে যা সে সেই মনোময় জীব পর্যন্ত।

কিন্তু বস্তুতঃ এই বিবর্তন এক অভিব্যক্তি, এবং যেমন আমাদের মধ্যে এই সব অবসাধারণ আত্মা ও অব-মানবীয় স্তর আছে, ঠিক তেমনই আমাদের মধ্যে আমাদের মনোময় সত্তার উর্ধ্বে আছে অতিসাধারণ ও অতিমানবীয় বিভিন্ন স্তর। অস্তিত্বের বিশ্বাত্মক চিৎ-সত্ত্ব হিসাবে চিৎ যেখানে অন্যান্য স্থিতি গ্রহণ করে, আর বিচরণ করে অন্যবিধ বিভাবে, অন্যবিধ নীতি অনুযায়ী এবং ক্রিয়ার অন্যবিধ শক্তির দ্বারা। যেমন প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন, মনের উর্ধ্বে আছে এক সত্য-লোক অর্থাৎ এক আত্ম-দীপ্ত, আত্ম-কার্যকরী ভাবনা-লোক যাকে আমাদের মন, যুক্তিবুদ্ধি, বিভিন্ন সূক্ষ্মভাব, সংবেগ, ইন্দ্রিয়-সংবিৎ-এর উপর আলোক ও শক্তিতে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং যা ইহাদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বিষয়সমূহের আসল সত্যের অর্থে, ঠিক যেমন আমরা আমাদের মানসিক যুক্তিবুদ্ধি ও সংকল্প প্রয়োগ করি আমাদের ইন্দ্রিয়-অনুভূতি ও পশুপ্রকৃতির উপর যাতে আমরা সে সবকে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হই আমাদের বিচারবুদ্ধিসম্মত ও নৈতিক বোধের অর্থে। সেখানে কোনো অন্বেষণ থাকে না, যা থাকে তা বরং স্বাভাবিক অধিকার; সংকল্প ও যুক্তিবুদ্ধির মধ্যে, সহজাতপ্রবৃত্তি ও সংবেগের মধ্যে, কামনা ও অনুভূতির মধ্যে, ভাবনা ও সৎ-এর মধ্যে কোনো সংঘর্ষ বা বিচ্ছিন্নতা থাকে না; বরং সকল কিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহচারী, পরস্পরের মধ্যে ফলপ্রসূ, আর তাদের উৎপত্তিতে, তাদের বিকাশে ও তাদের কার্যকারিতায় একীভূত। কিন্তু এই লোকের অতীতে এবং ইহার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়

এমন অন্য বিভিন্ন লোক আছে যেগুলিতে এই চিৎই নিজেই প্রকট হয়--এই যেসব বিচিত্র চেতনা এখানে ব্যবহৃত হয় নানাবিধ রূপায়ণ ও অভিজ্ঞতার জন্য তার মূল প্রভব ও আদ্য সম্পূর্ণতা হ'ল এই চিৎ। সেখানে জ্ঞান ও সংকল্প ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও আমাদের বিভিন্ন বৃত্তির, সামর্থ্যের অনুভূতির প্রকারের বাকীসব শুধু যে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহচারী, একীভূত তা নয়, সেসব চেতনার এক সত্তা, ও চেতনার এক সামর্থ্য। এই চিৎ-ই নিজেকে এমন পরিবর্তিত করে যে ইহা সত্য-লোকে অতিমানস, মনোলোকে মানসিক যুক্তিবুদ্ধি, সংকল্প, ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, এবং অবর লোকসমূহে বিভিন্ন প্রাণিক বা শারীরিক সহজাতপ্রবৃত্তি, সংবেগ; অভ্যাস যেগুলি বাহ্যতঃ নিজেকে সচেতনভাবে পায়নি এমন এক তমসাচ্ছন্ন শক্তির অন্তর্গত। সবই চিৎ কারণ সবই সৎ; সব-ই এক আদি চেতনার নানাবিধ গতিবৃত্তি, কেননা সব-ই এক আদি সত্তার নানাবিধ গতিবৃত্তি।

যখন আমরা চিৎ-কে খুঁজে পাই, দেখি বা জানি, তখন আমরা ইহাও দেখি যে ইহার স্বরূপ,--আনন্দ অর্থাৎ আত্ম-অস্তিত্বের আনন্দ। আত্মাকে অধিগত করার অর্থ আত্ম-আনন্দ অধিগত করা; আত্মাকে না অধিগত করার অর্থ অস্তিত্বের আনন্দের জন্য অল্পবিস্তর অজ্ঞানময় অন্বেষণের মধ্যে থাকা। চিৎ শাশ্বতকাল ইহার আত্ম-আনন্দের অধিকারী; আর যেহেতু চিৎ, সত্তার বিশ্বব্যাপী চিৎ-সত্ত্ব, সেহেতু চিন্ময় বিরাট পুরুষও চিন্ময় আত্ম-আনন্দের অধিকারী, অস্তিত্বের বিশ্বব্যাপী আনন্দের প্রভু। ভগবান যেভাবেই নিজেকে অভিব্যক্ত করুন--সর্ব-গুণের মধ্যে অথবা নির্গুণের মধ্যে, ব্যক্তিরূপের মধ্যে অথবা নৈর্ব্যক্তিকত্বের মধ্যে, বহুশোষক একের মধ্যে অথবা স্বরূপগত বহুত্ব প্রকাশমান একের মধ্যে--তিনি সর্বদাই আত্ম-আনন্দ ও সর্ব-আনন্দের অধিকারী কারণ ইহা সর্বদাই সচ্চিদানন্দ। আমাদের পক্ষেও, স্বরূপগত ও সর্বগতের মধ্যে আমাদের প্রকৃত আত্মাকে জানা ও অধিগত করার অর্থ অস্তিত্বের স্বরূপগত ও বিশ্বব্যাপী আনন্দ, আত্ম-আনন্দ ও সর্ব-আনন্দ উপলব্ধি করা। কারণ সর্বগত শুধু স্বরূপগত সৎ, চিৎ ও আনন্দের বহির্বর্ষণ; এবং যেখানেই ও যে রূপেই ইহা অস্তিত্ব হিসাবে অভিব্যক্ত হয় সেখানে স্বরূপগত চেতনা থাকতে বাধ্য আর সুতরাং স্বরূপগত আনন্দও থাকতে বাধ্য।

ব্যষ্টিপুরুষ তার নিজের এই সত্যকার প্রকৃতির অধিকারী নয় অথবা তার অভিজ্ঞতার এই সত্যকার প্রকৃতি উপলব্ধি করে না কারণ ইহা

স্বরূপগত ও সর্বগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজেকে এক করে পৃথক পৃথক উৎপাতের সহিত, গৌণ রূপ ও প্রকারের সহিত এবং পৃথক বিভাব ও বাহনের সহিত। এইভাবে ইহা তার মন, দেহ ও প্রাণ-ধারাকে নিজের মূল আত্মা বলে গ্রহণ করে। সে এসবকে তাদের নিজেদের হিসা-বেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে সর্বগতের বিরুদ্ধে এবং সর্বগত যার অভিব্যক্তি তারও বিরুদ্ধে। ব্যষ্টি ও সর্বগত অপেক্ষা মহত্তর ও ইহাদের অতীত কিছুর জন্য নিজেকে সর্বগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও সার্থক করার চেষ্টা করা সঙ্গত কিন্তু সর্বগতের বিরুদ্ধে সর্বগতের এক আংশিক বিভাবের নির্দেশ অনুযায়ী সেরূপ করার চেষ্টা অসঙ্গত। এই আংশিক বিভাবকে অথবা বরং বিভিন্ন আংশিক অনুভূতির সমষ্টিকে ইহা একত্র করে মান-সিক অনুভূতির এক কৃত্রিম কেন্দ্রের চারিদিকে অর্থাৎ মানসিক অহং-এর চারিদিকে আর ইহাকেই ইহা নিজ বলে, এই অহংকেই ইহা সেবা করে; আর সেই যে মহত্তর ও অতীত কিছু যার আংশিক অভিব্যক্তি সকল বিভাবগুলি, এমন কি সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বিভাবও যার আংশিক অভিব্যক্তি তার জন্য ইহা জীবন ধারণ না ক'রে, জীবনধারণ করে অহং-এর জন্য। এই জীবনযাত্রা মিথ্যা আত্মার মধ্যে, আসল আত্মার মধ্যে নয়; এই জীবনযাত্রা অহং-এর জন্য, অহং-এর নির্দেশ অনুযায়ী, ভগবানের জন্য নয়, ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী নয়। এই পতন কিভাবে ঘটেছে, আর কি উদ্দেশ্যেই ইহা করা হয়েছে—এই প্রশ্ন যোগের এলাকার চেয়ে বরং সাংখ্যের এলাকারই অন্তর্গত। আমাদের এই কাজের কথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে এই আত্ম-বিভাজনের ফলেই এই আত্ম সীমাবদ্ধতা যার দ্বারা আমরা সত্তা ও অনুভূতির আসল প্রকৃতি অধিগত ক'রতে অক্ষম হয়েছি এবং সেজন্য আমাদের মনে, প্রাণে ও দেহে অবিদ্যা, অসামর্থ্য ও কষ্টভোগের অধীন। ঐক্য না পাওয়াই মূল কারণ; ঐক্য ফিরে পাওয়াই প্রকৃষ্ট পন্থা আর এই ঐক্য হবে সর্বগতের সহিত এবং সর্বগত যাকে প্রকাশ করার জন্য এখানে উপস্থিত তার সহিত। আমাদের উপলব্ধি করা চাই আমাদের নিজেদের ও সকলের প্রকৃত আত্মাকে; আর প্রকৃত আত্মাকে উপলব্ধি করার অর্থ সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মনোময় পুরুষের অসুবিধা

জ্ঞানমার্গে আমাদের উন্নতি করার যে পর্যায়ে আমরা এসে পৌঁছেছি তা এই: আমরা শুরু করেছিলাম এই ব'লে যে মন, প্রাণ ও দেহ,---এই তিন সংজ্ঞার ঊর্ধ্বে আমাদের যে শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ সন্মাত্র তা উপলব্ধি করাই এই যোগের প্রথম উদ্দেশ্য, কিন্তু এখন আমরা বলি যে ইহা পর্যাপ্ত নয়, আমাদের আরো কর্তব্য আত্মাকে বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা তাঁর বিভিন্ন মূল বিভাবে এবং প্রধানতঃ সচ্চিদানন্দ হিসাবে তাঁর ত্রি-এক সত্যতায়। আত্মার সত্যতা ও ব্রহ্মের স্বরূপ যে শুধু শুদ্ধ সন্মাত্র তা নয়, ইহার সত্তার ও চেতনার শুদ্ধ চেতনা ও শুদ্ধ আনন্দও আত্মার সত্যতা ও ব্রহ্মের স্বরূপ।

তাছাড়া, আত্মা বা সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি দুই প্রকারের। একটি হ'ল এমন নীরব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, আত্মমগ্ন, স্বয়ং-পূর্ণ সৎ, চিৎ ও আনন্দের উপলব্ধি যা এক, নৈর্ব্যক্তিক, বিভিন্ন গুণের ক্রিয়ারহিত, বিশ্বের অনন্ত দৃশ্যরূপ থেকে বিমুখ অথবা ইহাকে দেখে উপেক্ষার সহিত, তাতে কোনো অংশ না নিয়ে। আর একটি হ'ল সেই একই সৎ, চিৎ ও আনন্দের উপলব্ধি যা নিরঙ্কুশ, মুক্ত, বিষয়সমূহের প্রভু, অবিচ্ছেদ্য শান্তির মধ্য থেকে সক্রিয়, যা নিজেকে বাহিরে ঢেলে দিচ্ছে চিরন্তন আত্ম-একাগ্রতার মধ্য থেকে অনন্ত ক্রিয়া ও গুণে, যিনি এক পরম ব্যক্তি হ'য়েও এক বিশাল সম নৈর্ব্যক্তিকত্বের ভিতর ব্যক্তিসত্ত্বের এই সকল খেলা নিজের মধ্যে ধারণ করেন, বিশ্বের এই অনন্ত দৃশ্যরূপ অধিগত করেন নিরাসক্ত হ'য়ে তবে অবিচ্ছেদ্যভাবে আলাদা না হ'য়ে, দিব্য ঈশনার সহিত এবং তাঁর শাশ্বত জ্যোতির্ময় আত্ম-আনন্দের অগণিত বিকিরণের সহিত---এক অভিব্যক্তি হিসাবে যা তিনি ধারণ করেন কিন্তু যার দ্বারা তিনি ধৃত হন না, যা তিনি শাসন করেন স্বাধীনভাবে এবং সেজন্য যার দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না। ইহা ধর্মের পুরুষবিধ ভগবান নন অথবা দার্শনিকদের সগুণ ব্রহ্ম নন, তবে এমন কিছু যার মধ্যে পুরুষবিধ ও নৈর্ব্যক্তিকত্বের, গুণ ও নির্গুণের সমন্বয় সাধিত হয়। ইহাই বিশ্বাতীত যিনি তাদের উভয়কেই অধিগত করেন তাঁর সত্তার মধ্যে আবার তাদের উভয়কেই প্রয়োগ করেন তাঁর অভিব্যক্তির

বিভিন্ন বিভাব হিসাবে। অতএব ইহাই পূর্ণযোগের সাধকের উপলব্ধির বিষয়।

এখনই বোঝা যায় যে এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা মন, প্রাণ ও দেহ থেকে সরে এসে যে শুদ্ধ শান্ত আত্মার উপলব্ধি লাভ করি তা শুধু আমাদের পক্ষে এই মহত্তর উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি অর্জন। সুতরাং ঐ সাধনপন্থাই আমাদের যোগের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়; আরো কিছু প্রয়োজন যা আরো ব্যাপকভাবে সদর্থক। এই যা সব আমাদের আপাতিক আত্মা এবং ইহার অধিষ্ঠান বিশ্বের সকল দৃশ্যরূপ সে সব থেকে যেমন আমরা সরে এসে প্রবেশ করেছিলাম স্বপ্রতিষ্ঠ আত্ম-চেতন ব্রহ্মের মধ্যে, তেমন এখন আমাদের দরকার মন, প্রাণ ও দেহকে ফিরে পাওয়া ব্রহ্মের সর্বগ্রাহী আত্ম-সত্তা, আত্ম-চেতনা ও আত্ম-আনন্দের সহিত। জগৎ-লীলার অনধীন হ'য়ে শুধু শুদ্ধ আত্ম-সত্তা লাভ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সকল সত্তাকেই আমাদের লাভ করা চাই আমাদের আপন সত্তা ব'লে; আমরা যে দেশকালগত সকল পরিবর্তনের অতীত এক অনন্ত অহং-শূন্য চেতনা--শুধু এই জানলে চলবে না, দেশ ও কালের মধ্যে চেতনার ও ইহার সৃজনশীল শক্তির সকল বহির্বর্ষণের সহিতও আমাদের এক হওয়া চাই; শুধু অতলস্পর্শী প্রশান্তি ও অক্ষুব্ধতার সামর্থ্য পাওয়াই যথেষ্ট নয়, বিশ্বজনীন বিষয়সমূহেও স্বচ্ছন্দ ও অনন্ত আনন্দেরও সামর্থ্য লাভ প্রয়োজন। কারণ, কেবল শুদ্ধ শান্তি নয়, তাহাই সচ্চিদানন্দ, তাহাই ব্রহ্ম।

যদি আমরা সহজেই অতিমানসিক লোকে নিজেদের উন্নীত করতে এবং সেখানে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হ'য়ে জগৎ ও সত্তাকে, চেতনা ও ক্রিয়াকে, সচেতন অনুভূতির বহির্গমন ও অন্তঃপ্রবেশকে দিব্য করণসমূহের সামর্থ্যের দ্বারা তদনুযায়ী উপলব্ধি করতে সমর্থ হতাম, তাহ'লে এই উপলব্ধিতে কোনো কোনো তত্ত্বগত বাধা আসত না। কিন্তু মানব মনোময় পুরুষ, এখনো অতিমানসিক পুরুষ নয়। সুতরাং জ্ঞানের সাধনা ও নিজের সত্তার উপলব্ধি--এই কাজ তার করা চাই মনের দ্বারা আর অতিমানসিক সব লোক থেকে তার যা সাহায্য পাওয়া সম্ভব তাই দিয়ে। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা যে সত্তা উপলব্ধি করি তার এই যে বৈশিষ্ট্য, সুতরাং আমাদের যোগের এই যে বৈশিষ্ট্য তা আমাদের উপর এমন কতকগুলি সীমাবদ্ধতা ও প্রাথমিক বাধা চাপিয়ে দেয় যা অতিক্রম করা যায় একমাত্র দিব্য সাহায্যের দ্বারা অথবা কঠোর সাধনার দ্বারা এবং বস্তুতঃ একমাত্র এই

দুইটি সহায়ের মিলিত শক্তিতে। পূর্ণজ্ঞানের, পূর্ণ উপলব্ধির, পূর্ণ হওয়ার পথে এই সব বাধাগুলি আমাদের প্রথম সংক্ষেপে বলা দরকার, তবে যদি আমরা আরো অগ্রসর হ'তে সমর্থ হই।

বস্তুতঃ আমাদের অস্তিত্বের বিন্যাসে উপলব্ধ মানসিক সত্তা ও উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্তা,—দুই ভিন্ন লোক; একটি উৎকৃষ্ট ও দিব্য, অন্যটি উৎকৃষ্ট ও মানবীয়। প্রথমটিতে আছে অনন্ত সত্তা, অনন্ত চেতনা ও সংকল্প, অনন্ত আনন্দ এবং অতিমানসের অনন্ত ব্যাপক ও স্বয়ং-ফলপ্রসূ জ্ঞান অর্থাৎ যে চারটি দিব্যতত্ত্ব; অন্যটিতে আছে মানসিক সত্তা, প্রাণিক সত্তা ও শারীরিক সত্তা—তিনটি মানবীয় তত্ত্ব। ইহাদের আপাতপ্রতীয়মান প্রকৃতিতে এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ; প্রত্যেকটি অপরটির বিপরীত। দিব্য তত্ত্ব অনন্ত ও অমর সত্তা; মানবীয় তত্ত্ব হ'ল কাল, ক্ষেত্র ও রূপে সীমাবদ্ধ জীবন, এমন জীবন যা মৃত্যু তবে এই মৃত্যু চেষ্টারত সেই জীবন হবার জন্য যা অমরত্ব। দিব্য তত্ত্ব অনন্ত চেতনা যা ইহার অন্তর্গত নিজের সব অভিব্যক্তি অতিক্রম করে এবং তাদের আলিঙ্গন ক'রে অবস্থিত; মানবীয় তত্ত্ব এমন চেতনা যাকে অচিতির সুপ্তি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, যা তার ব্যবহার কবা করণগুলির অধীন, দেহ ও অহং দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং অন্যান্য সব চেতনা, দেহ এবং অহং-র সহিত নিজের সম্বন্ধ অন্বেষণে যত্নবান আর ইহা সে করে সদর্থকভাবে মিলনসাধক সংযোগ ও সমবেদনার বিবিধ উপায়ে এবং নঞর্থকভাবে বৈরীভাবাপন্ন সংযোগ ও বিদ্বেষের বিবিধ উপায়ে। দিব্য তত্ত্ব,—অবিচ্ছেদ্য আত্ম-আনন্দ ও অভঙ্গনীয় সর্ব-আনন্দ; মানবীয় তত্ত্ব,—মন ও দেহের ইন্দ্রিয়সংবিৎ যা আনন্দের অন্বেষণ করে কিন্তু পায় শুধু সুখ, উপেক্ষা ও যন্ত্রণা। দিব্যতত্ত্ব সর্বব্যাপক অতিমানসিক জ্ঞান ও সর্বসাধক অতিমানসিক সংকল্প; মানবীয় তত্ত্ব এমন এক অজ্ঞানতা যা জ্ঞানের চেষ্টা করে বিষয়সমূহের বিভিন্ন খণ্ড ও অংশের ধারণা থেকে, তবে এসবকে তার একত্র যোগ করতে হয় আনাড়ির মতো; ইহা এক অসামর্থ্য তবে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান বিস্তারের মতো ক্রমে ক্রমে সামর্থ্য বিস্তারের মাধ্যমে শক্তি ও সংকল্প অর্জন করতে চেষ্টা করে; আর এই বিস্তারসাধন করার একমাত্র উপায় হ'ল ইহার জ্ঞানের আংশিক ও বিভক্ত পদ্ধতির অনুরূপভাবে সংকল্পের আংশিক ও বিভক্ত প্রয়োগ। দিব্যতত্ত্ব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ঐক্যের উপর এবং বিষয়সমূহের বিভিন্ন অতিস্থিতির ও সমগ্রতার ঈশ্বর; মানবীয় তত্ত্ব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত

করে বিভক্ত বহুত্বের উপর এবং এমনকি যখন ইহা তাদের বিভাজন ও বিভিন্ন অংশের এবং তাদের জোড়া লাগানর ও এক করার সব দুরূহ ক্রিয়ার প্রভু, তখনো ইহা সেসবের অধীন। মানবের কাছে এই দুটির মধ্যে এক আবরণ ও ঢাকনি থাকে যার দরুণ মানব যে শুধু দিব্যতত্ত্ব লাভে অসমর্থ হয় তা নয়, এমনকি তা জানতেও অসমর্থ হয়।

সুতরাং যখন মনোময় পুরুষ সাধনা করে দিব্যতত্ত্ব জানতে, তা উপলব্ধি ক'রতে ও তা হ'তে, তার প্রথম কাজ হ'ল এই ঢাকনি তোলা, এই আবরণ সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু ঐ দুরূহ ব্রতে যখন সে সফল হয় সে দেখে যে দিব্য তত্ত্ব এমন কিছু যা তার চেয়ে মহত্তর, দূরবর্তী উচ্চ এবং মানসিক, প্রাণিক, এমনকি শারীরিকভাবেও তার ঊর্ধ্বে; ইহার দিকে সে ঊর্ধ্বে তাকায় নিজের দীন অবস্থা থেকে, আর যদি আদৌ সম্ভব হয় ইহাতে তাকে আরোহণ করা চাই অথবা যদি সম্ভব না হয় ইহাকে নিম্নে আবাহন করা তার দরকার আর দরকার ইহার অধীন হ'য়ে আরাধনা করা। সে দিব্যতত্ত্বকে দেখে সত্তার এক মহত্তর লোক রূপে, এবং পরে তার নিজের প্রত্যয় বা উপলব্ধির প্রকৃতি অনুযায়ী সে দেখে ইহা অস্তিত্বের এক পরম অবস্থা, এক স্বর্গ অথবা এক সৎ বা নির্বাণ। অথবা সে দেখে যে সে নিজে যা তা থেকে অন্ততঃ বর্তমানে সে নিজে তা থেকে ইহা ভিন্ন এক পরম সত্তা, আর তারপর আবার সেই সত্তার কোনো দিক বা বিভাব সম্বন্ধে তার নিজের প্রত্যয় বা উপলব্ধি তার দর্শন বা অবধারণ অনুযায়ী সে তাকে কোনো না কোনো নামে ভগবান ব'লে ডাকে এবং মনে করে ভগবান হয় পুরুষবিধ বা নৈর্ব্যক্তিক, সগুণ অথবা নির্গুণ, নীরব ও উদাসীন সামর্থ্য অথবা সক্রিয় প্রভু ও সাহায্যদাতা। আর না হয় ইহাকে সে দেখে এক পরম সদ্‌বস্তুরূপে যার এক প্রতিফলন তার নিজের অপূর্ণ সত্তা অথবা যা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হ'য়েছে এবং তারপর সর্বদাই তার নিজের প্রত্যয় বা উপলব্ধি অনুযায়ী ইহার নাম দেয় আত্মা বা ব্রহ্ম এবং ইহার সম্বন্ধে নানাবিধ বিশেষণ প্রয়োগ করে—সৎ, অসৎ, তাও, শূন্য, শক্তি, অজ্ঞেয়।

সুতরাং আমরা যদি মনের দ্বারা চেষ্টা করি সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করতে, তাহ'লে প্রথম এই বাধা আসা সম্ভব যে আমরা ইহাকে দেখব এমন কিছু ব'লে যা ঊর্ধ্বে, অতীতে, এমনকি এক অর্থে চারিদিকে অবস্থিত কিন্তু সেই সত্তা ও আমাদের সত্তার মধ্যে এক ব্যবধান বিদ্যমান,—এমন এক গহ্বর যার উপর কোনো সেতু রচিত হয়নি, এমনকি কোনো সেতু

রচনা সম্ভবও নয়। সেখানে আছে এই অনন্ত অস্তিত্ব; কিন্তু যে মনোময় পুরুষ ইহাকে জানতে পারে তা থেকে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর আমাদের সত্তা ও জগৎ-সত্তা সম্বন্ধে আমাদের আপন অনুভূতি যাতে তার আনন্দময় আনন্ত্যের অনুভূতি হ'তে পারে তার জন্য আমরা যে তার কাছে নিজেদের তুলে তা হব অথবা তাকে আমাদের কাছে নামিয়ে আনব তা সম্ভব হয় না। সেখানে আছে এই মহৎ সীমাহীন নিরুপাধি চেতনা ও শক্তি; কিন্তু আমাদের চেতনা ও শক্তি তা থেকে পৃথকভাবে বিদ্যমান, এমনকি তার মধ্যে থাকলেও ইহা পৃথক, সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র, অবসন্ন, নিজের প্রতি ও জগতের প্রতি বিতৃষ্ণ, কিন্তু ইহা যে পরতর বিষয় দেখেছে তার অংশগ্রহণে অসমর্থ। সেখানে আছে এই অমেয় অনাবিল আনন্দ; কিন্তু আমাদের আপন সত্তা থেকে যায় ইহার দিব্য আনন্দগ্রহণে অসমর্থ, সুখ, দুঃখ ও নিস্তেজ নিষ্ক্রিয় ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এর অবর প্রকৃতির ক্রীড়া। সেখানে আছে এই পূর্ণ জ্ঞান ও সংকল্প; কিন্তু আমাদের আপন জ্ঞান ও সংকল্প সর্বদাই থেকে যায় সেই মানসিক বিকৃত জ্ঞান ও পঙ্গু সংকল্প যা ভগবানের ঐ প্রকৃতির অংশগ্রহণে তার সহিত একতান হ'তে অসমর্থ। আর না হয় যতক্ষণ আমরা কেবল সেই দর্শনের আনন্দবিভোর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকি, ততক্ষণ আমরা নিজেদের থেকে মুক্তি পাই; কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা আবার আমাদের আপন সত্তার উপর আমাদের চেতনা ফেরাই, আমরা তা থেকে বিচ্যুত হই আর ইহা হয় অন্তর্ধান করে, নয় দূরে সরে গিয়ে অস্পষ্ট হ'য়ে পড়ে। ভগবান আমাদের ছেড়ে চলে যান; দর্শন তিরোহিত হয়; আবার আমরা ফিরে আসি আমাদের মর্ত্য জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে।

যে কোনো প্রকারে, এই গহ্বরের উপর সেতু রচনা আবশ্যক। আর এই বিষয়ে মনোময় পুরুষের পক্ষে দুইটি সম্ভাবনা থাকে। একটি সম্ভাবনা হ'ল,—এক মহান দীর্ঘস্থায়ী, একাগ্র, সকলভোলা প্রয়াসের দ্বারা নিজের মধ্য থেকে পরমের মধ্যে তার উত্তরণ; কিন্তু এই প্রয়াসে মন বাধ্য হয় তার নিজের চেতনা ছেড়ে অন্য একটির মধ্যে অন্তর্হিত হ'তে এবং সাময়িক-ভাবে অথবা চিরদিনের মতো নিজেকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করলেও হারিয়ে ফেলতে। ইহাকে যেতে হয় সমাধির তন্ময় অবস্থায়। সেজন্য রাজযোগে ও অন্যান্য যোগপ্রণালীতে এই সমাধি বা যৌগিক তন্ময়-অবস্থার উপর এক অতীব গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ ইহার মধ্যে মন শুধু যে তার সাধারণ আগ্রহের বিষয় ও কাজকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয় তা নয়, ইহা প্রথম

নিবৃত্ত হয় বাহ্য ক্রিয়া ও বোধ ও সত্তার সকল চেতনা থেকে এবং পরে নিবৃত্ত হয় বিভিন্ন আন্তর মানসিক ক্রিয়ার সকল চেতনা থেকে। তার এই অন্তর-সমাহিত অবস্থায় মনোময় পুরুষের পক্ষে পরমতত্ত্বের স্বরূপের বা নানাবিধ বিভাবের বা নানাবিধ স্তরের বিভিন্ন প্রকারের উপলব্ধি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু আদর্শ হ'ল সম্পূর্ণরূপে মন ত্যাগ করা এবং মানসিক উপলব্ধির অতীতে গিয়ে একান্ত সমাধির মধ্যে প্রবেশ করা যার মধ্যে মনের বা অবর জীবনের সকল চিহ্নের অবসান হয়। কিন্তু ইহা চেতনার এমন এক অবস্থা যা খুব কম সাধকই পেতে সমর্থ এবং যা থেকে প্রত্যাবর্তন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।

যেহেতু মানসচেতনাই মনোময় পুরুষের অধিকার-ভুক্ত একমাত্র জাগ্রত অবস্থা সেহেতু, স্পষ্টতঃই, তার পক্ষে আমাদের সমগ্র জাগ্রত জীবন ও আমাদের সকল আভ্যন্তরীণ মন—এই উভয়কেই সম্পূর্ণভাবে পিছনে না ফেলে অন্য কোনো চেতনায় সম্পূর্ণ প্রবেশ করা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। এইজন্যই যৌগিক সমাধির প্রয়োজন। কিন্তু কেহই অনবরত এই সমাধিতে থাকতে পারে না; অথবা যদিই বা কেউ অনির্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য ইহার মধ্যে অবস্থান করতে পারত, তাহ'লেও দৈহিক জীবনের উপর কোনো প্রবল বা নিরন্তর আহ্বানের দ্বারা ঐ সমাধি ভগ্ন হওয়া সর্বদাই সম্ভব। আর যখন কেহ মানসিক চেতনায় ফিরে আসে, সে আবার উপস্থিত হয় অবর সত্তার মধ্যে। সেজন্যই বলা হ'য়েছে যে যতক্ষণ না দেহ ও দৈহিক জীবন চূড়ান্তভাবে ত্যাগ করা হয়, ততক্ষণ মানবজন্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি, মনোময় পুরুষের জীবন থেকে সম্পূর্ণ উৎ-ক্রান্তি অসম্ভব। যে যোগী এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তার সম্মুখে এই আদর্শ ধরা হয়—মানবজীবনের, মানসিক সত্তার সকল কামনা, প্রতি ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাও বর্জন কর, জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কর, আর ক্রমশঃ বেশী ঘন ঘন এবং উত্তরোত্তর গভীরভাবে সমাধির সর্বাপেক্ষা একাগ্র অবস্থায় প্রবেশ করে শেষে সত্তার সেই পূর্ণ অন্তঃসমাহিত অবস্থায় দেহ ত্যাগ কর, তবেই সম্ভব হবে পরম সন্মাত্রের মধ্যে মহাপ্রয়াণ। মন ও চিৎ-পুরুষের মধ্যে এই আপাতপ্রতীয়মান অসঙ্গতিও একটি কারণ যে জন্য অতগুলি ধর্ম ও দর্শন বাধ্য হ'য়ে জগৎকে দোষ দেয় আর প্রতীক্ষা ক'রে থাকে এক পরপারের স্বর্গের জন্য অথবা এক শূন্য নির্বাণ বা পরম ব্রহ্মের মধ্যে এক সর্বোত্তম অলক্ষণ আত্ম-সত্তার জন্য।

কিন্তু এই যখন অবস্থা, তখন যে মানবমন ভগবানকে চায় তার কি করণীয়---তার জাগ্রত মুহূর্তগুলি সম্বন্ধে? কারণ এই সব যদি মর্ত্য মানসিকতার সকল অক্ষমতার অধীন হয়, যদি ইহারা শোক, ভয়, ক্রোধ, প্রচণ্ড ভাবাবেগ, ক্ষুধা, লোভ, কামনা, প্রভৃতির আক্রমণের হাত থেকে নিস্তার না পায় তাহ'লে একথা মনে করা অযৌক্তিক হবে যে দেহত্যাগের মুহূর্তে যৌগিক সমাধির মধ্যে শুধু মনোময় পুরুষের একাগ্রতার দ্বারাই অন্তঃপুরুষ সক্ষম হবে পরম সৎ-এর মধ্যে প্রয়াণ করতে, আর না ফিরে। কারণ মানবের সাধারণ চেতনা তখনো বৌদ্ধকথিত কর্ম-শৃঙ্খলা বা কর্ম প্রবাহের অধীন; ইহা তখনো এমন সব ক্রিয়াশক্তির সৃষ্টি করতে থাকে যেগুলি তাদের উৎপাদক মনোময় পুরুষের পরবর্তী জীবনে সক্রিয় ও ফলপ্রসূ হ'তে বাধ্য। অথবা অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, চেতনাই যখন নির্ধারক বস্তু, দৈহিক জীবন তা নয় কারণ ইহা তো শুধু এক ফল, তখন মানুষ সাধারণতঃ তখনো মানবীয় বা অন্ততঃ মানসিক ক্রিয়ার স্তরের অন্তর্গত, আর শুধু স্থূল শরীর থেকে প্রস্থান করলেই এই ক্রিয়া লোপ করা যায় না; মর্ত্যদেহ ত্যাগ করলেই যে মর্ত্যমন ত্যাগ করা হবে তা নয়। তাছাড়া, জগতের প্রতি প্রবল বিরক্তি বা জড়জীবনের প্রতি প্রাণ-বিরুদ্ধ উপেক্ষা বা বিতৃষ্ণা থাকাও যথেষ্ট নয়; কারণ ইহাও অবর মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়ার অন্তর্গত। শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এই যে এমনকি মুক্তিরও জন্য কামনা ও তার আনুষঙ্গিক সকল মানসিক ক্রিয়ারই ঊর্ধ্বে প্রথম যেতে হবে, তবে যদি অন্তঃপুরুষ সক্ষম হয় সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে। সুতরাং মনের পক্ষে শুধু অসাধারণ অবস্থাতেই নিজের মধ্য থেকে পরতর চেতনায় উত্তরণে সক্ষম হওয়াই যথেষ্ট নয়, ইহার জাগ্রত মানসিকতাকেও সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করা প্রয়োজন।

মনোময় পুরুষের পক্ষে যে দ্বিতীয় সম্ভাবনা উন্মুক্ত থাকে, এখন আমরা তার ক্ষেত্রেই এইভাবেই আসি; কারণ যদি তার নিজের মধ্য থেকে সত্তার এক দিব্য অতিমানসিক লোকে উত্তরণই তার প্রথম সম্ভাবনা হয়, তাহ'লে অন্যটি হ'ল দিব্যতত্ত্বকে নিজের মধ্যে নিম্নে আবাহন করা যাতে তার মানসিকতা অবশ্যই পরিবর্তিত হয় দিব্যের প্রতিমূর্তিতে, আর দিব্যভাবাপন্ন বা আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হয়। ইহা করা সম্ভব এবং প্রাথমিকভাবে করা চাই-ই মনের সেই সামর্থ্যের দ্বারা যার জন্য মন যে বিষয়কে জানে, নিজের চেতনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করে ও চিন্তা করে সেই বিষয়ের

প্রতিফলন হয়। কারণ, মন বস্তুতঃ এক প্রতিক্ষেপক, এক মাধ্যম, আর তার কোনো ক্রিয়ারই উদ্ভব নিজে থেকে হয় না, কোনোটিই আত্ম-নির্ভর নয়। সাধারণতঃ মন প্রতিফলিত করে মর্ত্য প্রকৃতির অবস্থা এবং যে শক্তি জড়বিশ্বের অবস্থার মধ্যে কাজ করে তার বিভিন্ন ক্রিয়া। কিন্তু যদি ইহা এইসব ক্রিয়া এবং মানসিক প্রকৃতির বিশিষ্ট সব ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ ক'রে নির্মল, নিষ্ক্রিয় ও শুদ্ধ হয়, তাহ'লে ইহার মধ্যে দিব্য তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়,—যেন এক স্বচ্ছ দর্পণের মধ্যে অথবা বাতাসে অক্ষুব্ধ নিস্তরঙ্গ নির্মল জলের মধ্যে আকাশের মতো। মন তখনো সম্পূর্ণ-ভাবে দিব্য তত্ত্বের অধিকার পায় না বা দিব্য হয় না, তবে যতক্ষণ ইহা এই শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে ততক্ষণ ইহা দিব্যতত্ত্বের বা তার এক জ্যোতির্ময় প্রতিবিম্বের অধিকারভুক্ত হয়ে থাকে। ইহা যদি সক্রিয় হয়, ইহা আবার এসে পড়ে মর্ত্য প্রকৃতির বিক্ষোভের মধ্যে আর তাকেই প্রতি-ফলিত করে, তখন আর ইহা দিব্যতত্ত্বকে প্রতিফলিত করে না। এইজন্য যে আদর্শ সাধারণতঃ বলা হয় তা হ'ল—একান্ত শান্তভাব এবং প্রথম সকল বাহ্য ক্রিয়ার এবং পরে সকল আন্তর গতিবৃত্তির অবসান; এখানেও জ্ঞানমার্গের সাধকের থাকা চাই একপ্রকার জাগ্রত সমাধি। যে সব ক্রিয়া অপরিহার্য সেসবের হওয়া চাই বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের একান্ত বাহ্য ক্রিয়া, আর শান্ত মন শেষ পর্যন্ত তাতে কোনো অংশও নেয় না, তা থেকে কোনো ফল বা লাভও চায় না।

কিন্তু পূর্ণ যোগের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত নয়! জাগ্রত মানসিকতার শুধু নঞর্থক অক্ষুব্ধতা নয়, তার সদর্থক রূপান্তর একান্ত প্রয়োজনীয়। এই রূপান্তর সম্ভব কারণ যদিও দিব্যলোক ও সমূহ মানসিক চেতনার ঊর্ধ্বে আর তাদের মধ্যে বাস্তবভাবে প্রবেশ করতে হ'লে সাধারণতঃ সমাধির মধ্যে আমাদের মানসিক চেতনাশূন্য হতে হয়, তথাপি মানসিক সত্তার মধ্যেই দিব্যলোকসমূহ বর্তমান যেগুলি আমাদের সাধারণ মানসিকতা অপেক্ষা মহত্তর; এই মানসিকতা সঠিক দিব্য লোকেরই বিভিন্ন অবস্থা ফুটিয়ে তোলে তবে এখানে মানসিকতার অবস্থাগুলি প্রবল হওয়ায় তারা ইহাদের দ্বারা কিছু পরিবর্তিত হয়। দিব্য লোকের অন্তর্গত সকল অনু-ভূতিকেই সেখানে ধরা যায়, তবে মানসিক পন্থায় ও মানসিক রূপে। উন্নত মানুষের পক্ষে দিব্য মানসিকতার এই সব লোকে জাগ্রত অবস্থায় উত্তরণ করা সম্ভব; অথবা তার পক্ষে ইহাও সম্ভব হয় যে সে ঐসব থেকে

এমন সব অনুভাব ও অনুভূতির প্রবাহ পাবে যেগুলি শেষ পর্যন্ত তার সমগ্র জাগ্রত জীবনকে তাদের কাছে উন্মুক্ত করবে এবং ইহাকে রূপান্তরিত করবে তাদের প্রকৃতিতে। এইসব উচ্চতর মানসিক অবস্থাগুলি তার সিদ্ধির বিভিন্ন অব্যবহিত উৎস, বৃহৎ বাস্তব করণ, আন্তর ধাম।[১]

কিন্তু এই সব লোকে যাত্রাপথে বা তাদের থেকে শক্তি লাভ করাতে আমাদের মানসিকতার সব সংকীর্ণতা আমাদের সঙ্গে থাকে। প্রথমতঃ মন অবিভক্ত বস্তুর সুদৃঢ় বিভাজক, আর তার সমগ্র প্রকৃতিই হ'ল এক-সময়ে শুধু একটি বিষয়েই নিবদ্ধ থাকা অন্যসব বাদ দিয়ে অথবা সেইটিতে জোর দেওয়া অন্যগুলিকে ছোট ক'রে। এই জন্য, ইহা সচ্চিদানন্দ লাভে, তাঁর শুদ্ধ অস্তিত্ব, সৎ বিভাবেই নিবদ্ধ থাকে, আর তখন চিৎ ও আনন্দ হয় নিজেদের লীন করে শুদ্ধ, অনন্ত সত্তার অনুভূতির মধ্যে অথবা সেখানে শান্ত হ'য়ে থাকে; আর এই ভাবেই আসে শান্ত অদ্বৈতবাদীর উপলব্ধি। অথবা ইহা চেতনা, চিৎ বিভাবের উপর নিবদ্ধ থাকবে আর তখন সৎ ও আনন্দ হবে এক অনন্ত বিশ্বাতীত সামর্থ্য ও চিৎ-শক্তির অনুভূতির উপর নির্ভরশীল; আর এইভাবেই আসে তান্ত্রিক শক্তি সাধকের উপলব্ধি। অথবা ইহা আনন্দ বিভাবের উপর নিবদ্ধ হবে আর তখন মনে হবে যে সৎ ও চেতনা যেন অন্তর্হিত হ'য়েছে এমন এক আনন্দের মধ্যে যার আত্ম-অধিকারী সংবিৎ-এর অথবা উপাদানস্বরূপ সত্তার ভিত্তি নেই; আর ইহাতে আসে নির্বাণপ্রয়াসী বৌদ্ধের উপলব্ধি। অথবা ইহা নিবদ্ধ হবে সচ্চিদা-নন্দের এমন কোনো বিভাবে যা মনে আসে অতিমানসিক জ্ঞান, সংকল্প ও প্রেম থেকে, আর তখন সচ্চিদানন্দের অনন্ত নৈর্ব্যক্তিক বিভাব হয় প্রায় সম্পূর্ণ-ভাবে, নয় একেবারে সম্পূর্ণভাবে লীন হয় পরম দেবতার অনুভূতিতে, আর ইহাতে আসে নানা ধর্মের বিভিন্ন অনুভূতি এবং ভগবানের সহিত সম্বন্ধে মানবীয় অন্তঃপুরুষের কোনো স্বর্গধাম বা দিব্য অবস্থালাভ। আর যাদের উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্বজীবন থেকে যে কোনো স্থানে প্রস্থান, তাদের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত, কারণ এই সব তত্ত্ব বা বিভাবের যে কোনো একটির মধ্যে মনকে নিমজ্জিত ক'রে ব'লে অথবা অধিকার ক'রে তারা তাদের মানসিকতার দিব্য লোকের মধ্যে অবস্থানের মাধ্যমে অথবা সেসবের দ্বারা তাদের জাগ্রত অবস্থা অধি-

১ বেদে ইহাদের নানা নামে অভিহিত করা হয়—সদঃ, গৃহ, বা ক্ষয়, ধাম, পদং, ভূমি, ক্ষিতি (অর্থাৎ আসন, ঘর, স্থিতি, বা অবস্থা পাদপীঠ, ভূমি, আবাস)

গত হওয়ায় এই কাম্য প্রয়াণ সাধনে সমর্থ হয়।

কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের কর্তব্য হ'ল সবকিছুকে সুসমঞ্জস করা যাতে এইসব হ'তে পারে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ উপলব্ধির সমগ্র ও সম ঐক্য। এইখানে তার কাছে উপস্থিত হয় মনের শেষ বাধা—একই সাথে ঐক্য ও বহুত্ব ধারণে তার অক্ষমতা। এক শুদ্ধ অনন্তে উপনীত হ'য়ে সেখানে বাস করা এবং এমনকি সেই সময়েই সৎ-এর—যে সৎ চেতনা ও যে চেতনা আনন্দ—তার পূর্ণ মণ্ডলাকার অনুভূতি পাওয়া একেবারে দুরূহ না হ'তে পারে। এমনকি মন এই ঐক্য সম্বন্ধে তার অনুভূতিকে বহুত্বে প্রসারিত করতে পারে যাতে সে বোধ করে যে ইহা যেমন বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, তেমন বিশ্বের মধ্যে প্রতি বিষয়ে, শক্তিতে ও ক্রিয়াতেও অনুপ্রবিষ্ট অথবা একই সময়ে সে বোধ করে যে এই সৎ-চিৎ-আনন্দ বিশ্বকে ধরে আছে, ইহার সকল বিষয়কে আবৃত করে আছে এবং ইহার সকল গতিবৃত্তি উৎপন্ন করছে। অবশ্য এই সব অনুভূতিকে ঠিক মতো একত্র ও সুসমঞ্জস করা তার পক্ষে দুরূহ; কিন্তু তথাপি ইহা সচ্চিদানন্দকে অধিগত করতে সক্ষম একই সাথে নিজের মধ্যে, সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট তত্ত্ব হিসাবে এবং সকলের আধার রূপে। কিন্তু ইহার সহিত এই চূড়ান্ত অনুভূতি যুক্ত করা যে এই সকলই সচ্চিদানন্দ এবং তিনি বৈ আর কিছু নয় এই ভাবে বিভিন্ন বিষয়, গতিবৃত্তি, রূপ অধিগত করা—ইহাই মনের পক্ষে এক প্রকাণ্ড বাধা। পৃথক পৃথক ভাবে ইহাদের যে কোনো একটি সম্পন্ন করা সম্ভব; মন একটি থেকে অন্যটিতে যেতে পারে, একটিতে পৌছে অন্যটি বর্জন করতে পারে আর ইহাকে বলতে পারে অবর জীবন অথবা অন্যটিকে পরতর জীবন। কিন্তু কোনো কিছু বিসর্জন না দিয়ে সব এক করা, কোনো কিছু বর্জন না ক'রে অখণ্ডতা সাধন—ইহাই তার চরম বাধা।

চতুর্দশ অধ্যায়

নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ব্রহ্ম

নিজের প্রকৃত সত্তা ও জগৎ-সত্তা সম্বন্ধে পূর্ণ উপলব্ধিলাভের পথে মনোময় পুরুষ যে বাধার সম্মুখীন হয় তা দূর করা যায় তার আত্ম-বিকাশের দুই বিভিন্ন পথের একটি বা অন্যটি অনুসরণ ক'রে। একটি পথ হ'ল—তার আপন সত্তার লোক থেকে লোকান্তরে নিজেকে বিকশিত করা এবং প্রতি লোকেই ক্রমানুয়ে জগতের সহিত ও সচ্চিদানন্দের সহিত তার একত্ব আস্বাদন করা; প্রতি লোকেই তার এই উপলব্ধি হয় যে সচ্চিদানন্দ সেই লোকের পুরুষ ও প্রকৃতি, চিন্ময়পুরুষ ও প্রকৃতি-পুরুষ, আর তার উত্তরণ পথে সে সত্তার নিম্ন পর্যায়ের ক্রিয়া নিজের মধ্যে গ্রহণ করে। অর্থাৎ সে আত্ম-বিস্তার ও রূপান্তরের একপ্রকার পরিগ্রাহী প্রণালীর দ্বারা সক্ষম হয় জড়াসক্ত মানবের বিকাশসাধনে দিব্য বা আধ্যাত্মিক মানবে। মনে হয় অতি প্রাচীন ঋষিরা এই পদ্ধতিই অবলম্বন ক'রতেন, আর তার আভাস পাই আমরা ঋগ্‌বেদে ও কোনো কোনো উপনিষদে[১]। অপর পথে তার প্রয়াস হ'ল প্রথমেই মানসিক সত্তার উচ্চতম লোকে শুধু আত্ম-অস্তিত্বের উপলব্ধি লাভ করা এবং সেই সুদৃঢ় ভিত্তি থেকে তার মানসিকতার অবস্থার মধ্যে আধ্যাত্মিকভাবে সেই প্রণালী উপলব্ধি করা যে প্রণালীতে স্বয়ম্ভূ সর্বভূত হ'য়েছেন, তবে এই উপলব্ধি করা হয় আত্ম-বিভক্ত অহমাত্মক চেতনার মধ্যে অবতরণ না ক'রে, কারণ এই চেতনা অবিদ্যার মধ্যে বিবর্তনের এক অবস্থা। এইভাবে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনোময় পুরুষ রূপে বিশ্বাত্মক আত্ম-অস্তিত্বের মধ্যে সচ্চিদানন্দের সহিত এক হ'য়ে সে তখন তা ছাড়িয়ে উত্তরণ করতে পারে শুদ্ধ আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের অতিমানসিক লোকে। এই শেষোক্ত পদ্ধতিরই বিভিন্ন পর্যায় আমরা এখন দেখাতে চেষ্টা করব জ্ঞানমার্গের সাধকের জন্য।

অহং, মন, প্রাণ, দেহ—এসবের সহিত তার আত্মার অভিন্নতা বোধ থেকে নিবৃত্ত হবার সাধন পন্থা অনুসরণ করার পর সাধক জ্ঞানের দ্বারা

১ ইহার মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যে উপলব্ধি লাভ করে তা হ'ল এক শুদ্ধ আত্মবিৎ অস্তিত্ব যা এক, অবিভক্ত, শান্তিময়, নিষ্ক্রিয়, জগতের ক্রিয়ায় অবিচলিত। জগতের সহিত এই আত্মার যে একমাত্র সম্পর্ক থাকে ব'লে মনে হয় তা হ'ল এমন এক নিস্পৃহ সাক্ষীর সম্পর্ক যে সাক্ষী জগতের কোনো ক্রিয়াতেই জড়িত নয়, যার উপর তাদের কোনো প্রভাবই আসে না বা যাকে তারা এমনকি স্পর্শও করে না। চেতনার এই অবস্থাকে যদি আরো এগিয়ে নেওয়া যায় তাহ'লে সাধক এমন এক আত্মার কথা জানতে পারে যা প্রপঞ্চ (জগৎ-সত্তা) থেকে এমনকি আরো দূরে; জগতের সবকিছুই এক অর্থে সেই আত্মার মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু তবু একই সময় তারা তার ইহার চেতনার বাহিরে, ইহার সত্তার মধ্যে অসৎ, তারা আছে শুধু এক প্রকার অসৎ মনে---সুতরাং এক স্বপ্ন, মায়া। এই উদাসীন ও বিশ্বাতীত সৎ অস্তিত্বকে নিজের আপন সত্তার শুদ্ধ আত্মা ব'লে উপলব্ধি করা সম্ভব; অথবা আত্মা বা নিজের আপন সত্তার ভাবনাও ইহার মধ্যে বিলীন হবার সম্ভাবনা থাকে যাতে মনের কাছে ইহা শুধু এক অজ্ঞেয় "তৎ", যা মানসচেতনার কাছে অজ্ঞেয় এবং প্রপঞ্চের সহিত যার কোনো প্রকার বাস্তব সংযোগ বা ব্যবহার সম্ভব নয়। এমনকি মনোময় পুরুষের পক্ষে ইহার এই উপলব্ধিও সম্ভব যে ইহা এক নাস্তি, অসৎ বা শূন্য, তবে এমন শূন্য যা জগতের সবকিছু রহিত, এমন অসৎ যাতে জগতের সব কিছুই অবর্তমান, অথচ ইহাই একমাত্র সদ্‌বস্তু। নিজের সত্তার একাগ্রতার দ্বারা ঐ অতিস্থিতির দিকে আরো অগ্রসর হওয়ার অর্থ মানসিক সত্তা ও প্রপঞ্চ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে নিক্ষেপ করা অজ্ঞেয়ের মধ্যে।

কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানযোগের দাবী হ'ল প্রপঞ্চের উপর দিব্য প্রত্যাবর্তন, আর তার প্রথম কর্তব্য হ'ল এই উপলব্ধি করা যে আত্মাই সর্ব, সর্বম্‌ ব্রহ্ম। প্রথম, স্বয়ম্ভুর উপর একাগ্র হ'য়ে আমাদের এই উপলব্ধি করা দরকার যে মন ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যে সবকে জানে সেসব হ'ল আমাদের আপন চেতনার কাছে এই যে শুদ্ধ আত্মা আমরা যা এখন হ'য়েছি তার মধ্যে অবস্থিত বিষয়সমূহের সংকেত। শুদ্ধ আত্মার এই দর্শন মানসবোধ ও মানস-দৃষ্টির কাছে প্রতিভাত হয় এমন এক অনন্ত সদ্‌বস্তু রূপে যার মধ্যে সকল কিছু থাকে শুধু নাম ও রূপ হিসাবে, যথার্থতঃ অসৎ নয়, মতিভ্রম বা স্বপ্ন নয়, কিন্তু চেতনার এক সৃষ্টি মাত্র যা বাস্তব হওয়া অপেক্ষা বরং অনুভবগম্য ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চেতনার এই স্থিতিতে

সকল কিছুকেই স্বপ্ন না মনে হ'লেও তবু মনে হয় সেসব প্রশান্ত, অচঞ্চল, শান্তিময়, উদাসীন আত্মার মধ্যে যেন অনেকটা ছবি বা পুতুল নাচ। আমাদের নিজের প্রাতিভাসিক জীবন এই প্রত্যয়গত ক্রিয়ার অংশ, অন্য বিভিন্ন রূপের মধ্যে মন ও দেহের এক যান্ত্রিক রূপ, আমরা নিজেরা অন্য বিভিন্ন নামের মধ্যে সত্তার এক নাম, এই সর্বগ্রাহী প্রশান্ত আত্ম-সংবিৎসম্পন্ন আত্মার মধ্যে স্বয়ং-ক্রিয়ভাবে চঞ্চল। জগতের যে সক্রিয় চেতনা তা এই অবস্থায় আমাদের উপলব্ধিতে উপস্থিত নয়, কারণ আমাদের মধ্যে মনন নিস্তব্ধ হ'য়েছে আর সেইজন্য আমাদের আপন চেতনা সম্পূর্ণ শান্ত ও নিষ্ক্রিয়—যা কিছু আমরা করি, মনে হয় সেসব শুধু যান্ত্রিক, আমাদের সক্রিয় ও সংকল্প ও জ্ঞানের দ্বারা তাদের যে সচেতনভাবে উৎপত্তি হ'য়েছে তা মনে হয় না। অথবা যদি মনন দেখা দেয়, তা-ও ঘটে বাকীসবের মতো যান্ত্রিকভাবে আমাদের দেহসঞ্চালনের মতো, প্রকৃতির অ-দেখা শক্তির চালনায় যেমন হয় উদ্ভিদ ও মৌলিক পদার্থে, তা যে আমাদের আত্ম-সত্তার কোনো সক্রিয় সংকল্পের দ্বারা চালিত হয় তা নয়। কারণ এই আত্মা নিশ্চল, ইহা যে ক্রিয়ার অনুমতি দেয়, ইহা তা প্রবর্তন করে না অথবা তাতে অংশ নেয় না। এই আত্মা সর্ব শুধু এই অর্থে যে ইহা অনন্ত এক যা নির্বিকার রূপে সকল নাম ও রূপ এবং তাদের আশ্রয়স্থল।

চেতনার এই অবস্থার ভিত্তি হ'ল শুদ্ধ আত্ম-সত্তা সম্বন্ধে মনের আত্যন্তিক উপলব্ধি যাতে চেতনা শান্ত, নিষ্ক্রিয়, সত্তার শুদ্ধ আত্ম-সংবিৎ-এ বিস্তৃতভাবে সমাহিত, সক্রিয় নয়, কোনো প্রকার সম্ভূতির উৎপাদক নয়। ইহার জ্ঞানের বিভাব নির্বিশেষ তাদাত্ম্যের সংবিতের মধ্যে শান্ত; ইহার শক্তি ও সংকল্পের বিভাব অপরিবর্তনীয় নির্বিকারতার সংবিতের মধ্যে শান্ত। আবার তবু ইহা নাম রূপের কথা জানে, জানে গতিবৃত্তির কথা; কিন্তু মনে হয় এই গতিবৃত্তির উৎপত্তি আত্মা থেকে হয় না, তা যেন চলে নিজেরই স্বগত সামর্থ্যের বলে, আর আত্মার মধ্যে শুধু প্রতিফলিত হবার জন্য। ইহার অর্থ এই যে মনোময় পুরুষ আত্যন্তিক একাগ্রতার দ্বারা নিজের থেকে চেতনার স্ফুরন্ত বিভাব সরিয়ে ফেলেছে, আর আশ্রয় নিয়েছে স্থিতিক চেতনার মধ্যে আর দু'য়ের মধ্যে এক প্রাচীর নির্মাণ ক'রেছে যাতে সংযোগ না হয়; নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ব্রহ্মের মাঝে ব্যবধানের এক প্রণালী তৈরী হয়েছে, তাদের একজন দাঁড়িয়ে থাকে এক পারে, অন্যজন অন্য পারে, একে অপরকে দেখে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই, নেই কোনো

সমবেদনার স্পর্শ, কোনো ঐক্যবোধ। সুতরাং নিষ্ক্রিয় আত্মার কাছে সকল সচেতন সত্তা মনে হয় স্বভাবতঃই নিষ্ক্রিয়, সকল ক্রিয়াই মনে হয় নিজে অচেতন ও গতিবিধিতে যন্ত্রবৎ জড়। এই অবস্থার উপলব্ধিই প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের ভিত্তি; ইহার শিক্ষা এই যে পুরুষ অর্থাৎ চিন্ময় পুরুষ শান্ত, নিষ্ক্রিয়, অক্ষর সত্তা আর প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ পুরুষ এমনকি তার অন্তর্গত মন ও বুদ্ধি ও সক্রিয়, ক্ষর, যন্ত্রবৎ জড় তবে ইহা পুরুষে প্রতিফলিত হয় আর পুরুষ তার মধ্যে যা প্রতিফলিত হয় তার সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করে তার তাকে দেয় তার নিজের চেতনার আলো। যখন পুরুষ প্রকৃতির সহিত নিজেকে অভিন্ন না ক'রতে শেখে, তখন প্রকৃতি তার ক্রিয়ার সংবেগ থেকে সরে সাম্যাবস্থায় ও নিষ্ক্রিয়তায় ফিরে যায়। এই অবস্থাকে বেদান্ত যে দৃষ্টিতে দেখল তাতে এই দর্শনের উৎপত্তি হ'ল যে নিষ্ক্রিয় আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সদ্‌বস্তু এবং অন্য সব এই আত্মার উপর মানসিক ভ্রমের মিথ্যা ক্রিয়ার দ্বারা আরোপিত নাম ও রূপ; আর এই ভ্রম দূর করা দরকার অক্ষর আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা এবং এই আরোপকে[১] অস্বীকার করে। বস্তুতঃ এই দুই মতের পার্থক্য শুধু প্রকাশভঙ্গিতে ও দৃষ্টিকোণে; সারতঃ তারা একই আধ্যাত্মিক অনুভূতি থেকে একই বুদ্ধিগত সামান্যভাবনা।

যদি আমরা এখানেই নিরস্ত হই তাহ'লে জগতের প্রতি শুধু দুইটি মনোভাব সম্ভব। হয় আমাদের থাকতে হবে জগৎ-লীলার শুধু নিষ্ক্রিয় সাক্ষীরূপে, নয় তার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হবে যন্ত্রের মতো শুধু বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার দ্বারা,[২] কিন্তু সচেতন আত্মা তাতে কোনো অংশ গ্রহণ করবে না। প্রথমটি নির্বাচন করা হ'লে আমাদের কাজ হ'ল যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় ও নীরব ব্রহ্মের অনুরূপ নিষ্ক্রিয়তা লাভ করা। আমরা আমাদের মনকে শান্ত করেছি, মননের ক্রিয়া ও হৃদয়ের চাঞ্চল্যকে নিস্তব্ধ করেছি, আর লাভ ক'রেছি সম্পূর্ণ আন্তর প্রশান্তি ও উদাসীনতা; এখন আমাদের প্রয়াস হ'ল প্রাণ ও দেহের যান্ত্রিক ক্রিয়াকে শান্ত করা, ইহাকে যথাসম্ভব ন্যূনতম পরিমাণে হ্রাস করা যাতে শেষ পর্যন্ত চিরদিনের মতো পুরোপুরি ইহার অবসান আসে। যে বৈরাগ্যযোগ জীবন অস্বীকার করে তার অন্তিম লক্ষ্য ইহাই কিন্তু স্পষ্টতঃ ইহা

১ অধ্যারোপ ২ কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈঃ—গীতা

আমাদের লক্ষ্য নয়। বিকল্প পথটি নির্বাচন ক'রে আমরা সক্ষম হই বাহ্যতঃ বেশ পুরোপুরি কর্মে প্রবৃত্ত থাকতে অথচ তখন থাকে সম্পূর্ণ আন্তর নিষ্ক্রিয়তা, প্রশান্তি, মানসিক নীরবতা, উদাসীনতা, এবং বিভিন্ন ভাবাবেগের নিবৃত্তি, স্বেচ্ছাবৃত্তির উপশম।

সাধারণ মনের কাছে ইহা সম্ভবপর মনে হয় না। যেমন ভাবাবেগের দিক থেকে, ইহা ভাবতে পারে না যে কামনা ও ভাবাবেগের পছন্দ না থাকলে কোনো ক্রিয়া সম্ভবপর, তেমন বুদ্ধির দিক থেকেও ইহা ভাবতে অক্ষম যে মনন-প্রত্যয় এবং সংকল্পের সচেতন প্রবর্তনা ও সক্রিয়তা বিহনে কোনো ক্রিয়া সম্ভবপর। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে জড় ও নিতান্তই সজীব প্রাণজগতের সমগ্র ক্রিয়ার মতো আমাদের নিজেদেরও ক্রিয়ার অধিকাংশ করা হয় যান্ত্রিক সংবেগ ও চালনার দ্বারা যার মধ্যে এইসব বিষয় অন্ততঃ প্রকাশ্যে সক্রিয় নয়। বলা যেতে পারে যে কেবলমাত্র শারীরিক ও প্রাণিক ক্রিয়া সম্বন্ধেই ইহা সম্ভবপর, কিন্তু যেসব ক্রিয়া সাধারণতঃ ভাবনাপর ও সংকল্পপর মনের ব্যাপ্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, যেমন মানবজীবনের কথা বলা, লেখা, এবং সকল বুদ্ধির কাজ ——তাদের বেলায় ইহা সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইহা যে সত্য নয় তা আমরা দেখি যখন আমরা সক্ষম হই আমাদের মানসিক প্রকৃতির অভ্যাসগত ও সাধারণ ধারার পশ্চাতে যেতে। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষণে দেখা যায় যে আপতিক কর্তার মনন ও সংকল্পে কোনোরূপ সচেতন প্রবর্তনা না থাকলেও এই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব; তার বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়, তার কথা বলার ইন্দ্রিয় পর্যন্ত, হ'য়ে ওঠে সে ভিন্ন অন্যের মনন ও সংকল্পের নিষ্ক্রিয় যন্ত্র।

ইহা নিশ্চিত যে সকল বুদ্ধির কাজের পশ্চাতে এক বুদ্ধিমান সংকল্প থাকতে বাধ্য, কিন্তু ইহা যে কর্তার সচেতন মনের বুদ্ধি বা সংকল্প হ'তে হবে তা নয়। যেসব মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার কথা আমি বলেছি, তাদের মধ্যে কতকগুলিতে স্পষ্টতঃই অপর মানুষের সংকল্প ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করে, অন্যগুলিতে নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না কিসের দরুণ তা ঘটছে—— ইহা কি অন্য সত্তার প্রভাব বা প্রেরণা, না অবচেতন, অধিচেতন মনের উদ্বর্তন, না এই দুয়েরই মিশ্রিত ও যুক্ত ক্রিয়া। কিন্তু শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা "কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈঃ" ক্রিয়ার এই যে যৌগিক অবস্থা তাতে কাজ করে স্বয়ং প্রকৃতির সর্বগত বুদ্ধি ও সংকল্প বিভিন্ন অতিচেতন ও অবচেতন কেন্দ্র

থেকে, যেমন ইহা কাজ করে উদ্ভিদ জগতের বা নিষ্প্রাণ জড়ীয় রূপের যন্ত্রের মতো উদ্দেশ্যপূর্ণ সব শক্তির মধ্যে, তবে এখানে যৌগিক অবস্থায় কাজ হয় এমন এক জীবন্ত যন্ত্রের মাধ্যমে যে ক্রিয়ার ও যন্ত্র ব্যবহারের সচেতন সাক্ষী। ইহা বিশেষ লক্ষণীয় যে এরূপ অবস্থার কথা বলায়, লেখায়, বুদ্ধির কাজে ভাবনায় এমন এক পূর্ণ শক্তি ফুটে ওঠে যা ভাস্বর, ত্রুটিশূন্য, যুক্তিসম্মত ও চিদাবিষ্ট এবং যাতে সাধনের উপায়গুলি সম্পূর্ণ-ভাবে সাধ্যের উপযোগী হয়; মানুষ নিজে তার মন, সংকল্প ও সামর্থ্যের পুরণো সাধারণ অবস্থায় যা করতে পারত তার চেয়ে এইসব কাজ অনেক উচ্চস্তরের, অথচ সব সময়ই সে বোঝে যে ভাবনা তার কাছে আসে, সে নিজে তা ভাবে না, যে সংকল্প তার মাধ্যমে কাজ করে সে তাকে কাজের মধ্যে নিরীক্ষণ করে কিন্তু তাকে নিজের ব'লে নেয় না বা ব্যবহার করে না, যেসব সামর্থ্য তার মধ্য দিয়ে জগতের উপর সক্রিয় সেসব সে নিজের ব'লে দাবী করে না, সে শুধু তাদের নিষ্ক্রিয় প্রবাহপ্রণালী। কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ ব্যাপার অসাধারণ নয়, অথবা বিষয়সমূহের সাধারণ বিধানের বিরুদ্ধ নয়। কারণ আমরা কি জড়প্রকৃতির আপাতপ্রতীয়মান জড়ক্রিয়ার মধ্যে নিগূঢ় সর্বগত সংকল্প ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ক্রিয়াপদ্ধতি দেখি না? আর বস্তুতঃ এই সর্বগত সংকল্প ও বুদ্ধিই প্রশান্ত, উদাসীন ও আন্তর নীরব যোগীর মধ্য দিয়ে ঐভাবে কাজ করে, আর যোগী ইহার ক্রিয়া সম্পাদনে সীমিত ও অজ্ঞ ব্যক্তিগত সংকল্প ও বুদ্ধির কোনো বাধা আনে না। সে বাস করে নীরব আত্মার মধ্যে; সে সক্রিয় ব্রহ্মকে কাজ করতে দেয় তার প্রাকৃত যন্ত্রগুলির মধ্য দিয়ে, আর ইহার সর্বগত শক্তি ও জ্ঞানের বিভিন্ন রূপায়ণ স্বীকার করে, তবে নিরপেক্ষভাবে কোনো অংশ গ্রহণ না ক'রে।

এই যে স্থিতি যাতে আন্তর নিষ্ক্রিয়তা ও বাহ্যকর্ম পরস্পরের অনধীন, তা হ'ল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক মুক্তির অবস্থা। যেমন গীতায় বলা হয় যোগী কর্মরত থেকেও নিষ্কর্মা থাকে, কারণ সে তো কর্ম করে না, কর্ম করে বিশ্বপ্রকৃতি, প্রকৃতির অধীশ্বরের নির্দেশে। যোগী তার কোনো কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, সেসব কর্ম তার মনের উপর কোনো শেষ জের বা ফল রাখে না বা তার অন্তঃপুরুষে লেগে থাকে না বা কোনো দাগ ফেলে না[১]; তারা

১ ন কর্ম লিপ্যতে নরে, ঈশ উপনিষদ

অন্তর্ধান করে, সম্পাদনের দ্বারাই বিলীন[১] হয়, অক্ষর আত্মার উপর তাদের কোনো প্রভাব পড়ে না, অন্তঃপুরুষেও কোনো পরিবর্তন আসে না। সুতরাং উন্নীত পুরুষকে যদি প্রপঞ্চের মধ্যে মানবীয় কর্মের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখতে হয় তাহ'লে তার যে স্থিতি নেওয়া কর্তব্য, মনে হয় তা এই,—— অন্তরে অপরিবর্তনীয় নীরবতা, অক্ষুব্ধতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং বাহিরে সেই সর্বগত সংকল্প ও প্রজ্ঞার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম যা গীতার কথামতো কাজ করে তার কোনো কাজে জড়িত বা বদ্ধ বা অজ্ঞভাবে আসক্ত না হ'য়ে। আর ইহা নিশ্চিত যে যেমন আমরা কর্মযোগে দেখেছি যোগীর যে স্থিতি লাভ করা কর্তব্য তা হ'ল সম্পূর্ণ আন্তর নিষ্ক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত পূর্ণকর্ম। কিন্তু এখানে এই যে আত্ম-জ্ঞানের অবস্থায় আমরা উপনীত হ'য়েছি তাতে স্পষ্টতঃই অখণ্ডতার অভাব; কারণ এখনো নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ব্রহ্মের মধ্যে এক ব্যবধান, এক অনুপলব্ধ ঐক্য অথবা চেতনার এক চিড় রয়ে যায়। আমাদের এখনো দরকার নীরব আত্মার অধিকার না হারিয়ে সক্রিয় ব্রহ্মকে সচেতনভাবে অধিগত করা। ভিত্তি হিসাবে আমাদের রাখা চাই আন্তর নীরবতা, অক্ষুব্ধতা, নিষ্ক্রিয়তা, কিন্তু সক্রিয় ব্রহ্মের বিভিন্ন কর্মে দূরস্থ উদাসীনতার স্থলে আমাদের পাওয়া চাই তাদের মধ্যে সম ও নিরপেক্ষ আনন্দ; পাছে আমাদের মুক্তি ও প্রশান্তি নষ্ট হয় এই ভয়ে কর্মে অংশগ্রহণে অস্বীকার করার পরিবর্তে আমাদের প্রয়োজন সক্রিয় ব্রহ্মকে সচেতন ভাবে অধিগত করা যাঁর অস্তিত্বের আনন্দ তাঁর প্রশান্তিকে নষ্ট করে না অথবা সকল কর্মপ্রণালীর উপর তাঁর প্রভুত্বের দ্বারা বিভিন্ন কর্মের মধ্যে তাঁর শান্ত স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

এই বাধা সৃষ্টির কারণ এই যে মনোময় পুরুষ আত্যন্তিকভাবে একাগ্র হয়ে থাকে শুদ্ধ অস্তিত্বের মনোলোকের উপর যেখানে চেতনা শান্ত নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এবং অস্তিত্বের আনন্দ শান্ত,——অস্তিত্বের শান্তির মধ্যে। অস্তিত্বের চিৎশক্তির তার যে লোকে চেতনা সক্রিয় সামর্থ্য ও সংকল্প হিসাবে এবং আনন্দ সক্রিয় অস্তিত্বের হর্ষ হিসাবে——তাও তার আলিঙ্গন করা চাই। এখানে অসুবিধা এই যে মন খুব সম্ভব শক্তির চেতনাকে অধিগত না ক'রে নিজেকে নিক্ষেপ করবে তার মধ্যে। প্রকৃতির মধ্যে এই অধঃনিক্ষেপের চরম মানসিক অবস্থা হ'ল সেই অবস্থা যাতে সাধারণ মানুষ

১ প্রবিলীয়ন্তে কর্মাণি——গীতা

মনে করে যে তার দৈহিক ও প্রাণিক ক্রিয়া এবং তার উপর নির্ভরশীল তার মনোবৃত্তিই তার সমগ্র আসল জীবন আর অন্তঃপুরুষের নিষ্ক্রিয়তা হ'ল জীবন থেকে প্রস্থান এবং শূন্যতার দিকে অগ্রসর হওয়া। সে বাস করে সক্রিয় ব্রহ্মের উপরিভাগে আর যে সময় নিষ্ক্রিয় আত্মায় আত্যন্তিক-ভাবে একাগ্র নীরব অন্তঃপুরুষ মনে করে যে সকল ক্রিয়া শুধু নাম ও রূপ, সে মনে করে যে ইহারাই একমাত্র সদ্‌বস্তু এবং আত্মাই নাম মাত্র। একটিতে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম দূরে থাকেন সক্রিয় ব্রহ্ম থেকে এবং তাঁর চেতনায় কোনো অংশগ্রহণ করেন না, আর অপরটিতে সক্রিয় ব্রহ্ম দূরে থাকেন নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম থেকে এবং তাঁর চেতনায় কোনো অংশ নেন না, আবার নিজের চেতনাকেও সম্পূর্ণভাবে অধিগত করেন না। এই আত্যন্তিকতার মধ্যে প্রত্যেকটি অপরের কাছে সম্পূর্ণ অসৎ না হ'লেও, ইহা স্থিতির এক স্থিতি-ধর্মিতা অথবা আত্মাকে না পাওয়ার এমন অবস্থা যার স্থিতিধর্মিতা হ'ল যন্ত্রের মতো সক্রিয় থাকা। কিন্তু যে সাধক একবার বিষয়সমূহের স্বরূপ নিশ্চিতভাবে দেখেছে এবং নীরব আত্মার শান্তি সম্যক্‌ভাবে আস্বাদন ক'রেছে তার পক্ষে এমন কোনো অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নয় যাতে আত্ম-জ্ঞানের হানি হয়, অথবা অন্তঃপুরুষের প্রশান্তি বিসর্জন দিতে হয়। যে মন ও প্রাণ ও দেহের শুধু ব্যষ্টিগত ক্রিয়ায় এত অজ্ঞান ও পরিশ্রম ও বিক্ষোভ তার মধ্যে সে আর নিজেকে ফিরে নিক্ষেপ করবে না। যা কিছু নতুন অবস্থা তার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হবে তা তার কাছে সন্তোষ-জনক হবে যদি কেবল এই হয় যে সে ইতিপূর্বেই যে বিষয়কে দেখেছে প্রকৃত আত্মজ্ঞান, আত্ম-আনন্দ ও আত্ম-অধিকারের পক্ষে অপরিহার্য ব'লে তার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত এবং তা ইহার অন্তর্গত।

তবু যখন সে আবার জগতের ক্রিয়ার সহিত নিজেকে যুক্ত ক'রতে চেষ্টা করে তখন আবার পুরণো মানসিক বৃত্তির মধ্যে আংশিক, উপরভাসা ও অস্থায়ী পতনের সম্ভাবনা থাকে। এই পতন রোধ করতে হ'লে অথবা তা এলে তার প্রতিকারের জন্য তার কর্তব্য হ'ল সচ্চিদানন্দের সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধ'রে থাকা এবং অনন্ত একম্‌ সম্বন্ধে তার উপলব্ধিকে প্রসারিত করা অনন্ত বহুত্বের বিলাসে। সকল বিষয়ের মধ্যে একম্‌ ব্রহ্ম যেমন চিন্ময় সত্তার শুদ্ধ সংবিৎ তেমন সত্তার চিৎ-শক্তি—ইহাতেই তাকে একাগ্র হ'তে হবে এবং ইহাই তার উপলব্ধি করা চাই। অস্তিত্বকে যথার্থভাবে অধিগত করতে হ'লে তার পরবর্তী কাজ হ'ল এই উপলব্ধি করা যে

আত্মাই সর্ব,—শুধু যে বিষয়সমূহের অনন্য স্বরূপ হিসাবে তা নয়, তাদের বহুধা রূপের মধ্যেও, শুধু যে বিশ্বাতীত চেতনার মধ্যে সকলকে ধরে আছেন ব'লে তা নয়, উপাদানস্বরূপ চেতনার দ্বারা সব কিছু হ'য়েছেন ব'লেও। যে অনুপাতে এই উপলব্ধি সিদ্ধ হয়, সেই অনুপাতে চেতনার পাদ এবং তার উপযোগী মানসিক দৃষ্টিরও পরিবর্তম হয়। এমন এক অক্ষর আত্মা যা নাম ও রূপ ধারণ করে, প্রকৃতির সব পরিণাম ধারণ করে অথচ সেসবে অংশ নেয় না, তার পরিবর্তে আসবে সেই আত্মার চেতনা যা স্বরূপে অক্ষর, তার মৌলিক স্থিতিতে অপরিবর্তনীয় অথচ এই যে সর্বভূতকে মন নাম ও রূপ হিসাবে পার্থক্য করে সে সবকে নিজের অনুভূতিতে গঠন করে এবং নিজেই সে সব হয়। মন ও দেহের সব রূপায়ণ শুধু যে পুরুষের মধ্যে প্রতিফলিত বিভিন্ন সংকেত হবে তা নয়, সেগুলি হবে সব বাস্তব রূপ আর ব্রহ্ম, আত্মা, চিন্ময়পুরুষ ইহাদের ধাতু এবং যেন ইহাদের রূপায়ণের উপাদান। রূপের সহিত যুক্ত নাম শুধু যে মনের এমন এক ভাবনা যার অনুরূপ ঐ নামধারী কোনো বাস্তব সত্তা নেই তা নয়, তার পশ্চাতে থাকবে চিন্ময় সত্তার এক সত্যকার সামর্থ্য, ব্রহ্মের এক সত্যকার আত্ম-অনুভূতি যার অনুরূপ এক বিষয় ইহা তার নীরবতার মধ্যে যোগ্য তবে অব্যক্ত রূপে ধারণ করত। আবার তথাপি ইহার সকল পরিবর্তনের মধ্যে উপলব্ধি করা হবে যে ইহা এক, মুক্ত এবং সে সকলের ঊর্ধ্বে। নাম ও রূপের অধ্যারোপের অধীন এক অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তুর উপলব্ধির পরিবর্তে এই উপলব্ধি হবে যে এক সনাতন পুরুষই নিজেকে বাহিরে প্রক্ষেপ করছেন অনন্ত সম্ভূতির মধ্যে। যোগীর চেতনায় সর্বভূত হবে আত্মার, তার নিজের অন্তঃপুরুষ-রূপ, শুধু যে ভাবনারূপ তা নয়, আর সেসব তার সহিত এক, আর তার বিশ্বসত্তার অন্তর্গত। যা কিছু আছে সে সকলেরই সমগ্র অন্তঃপুরুষ জীবন, মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক জীবন তার কাছে হবে সেই পুরুষের এক অবিভক্ত গতিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি যিনি চিরদিন একই থাকেন। আত্মাকে উপলব্ধি করা হবে যে তাঁর যে দুই বিভাব—অক্ষর স্থিতি ও ক্ষর প্রবৃত্তি তাতে আত্মাই সর্ব এবং দেখা যাবে যে ইহাই আমাদের সত্তার ব্যাপক সত্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিশ্বচেতনা

সক্রিয় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা ও তাঁর সহিত নিজেকে যুক্ত করার অর্থ ব্যষ্টিচেতনার পরিবর্তে বিশ্বচেতনা লাভ করা, তবে মিলন আংশিক কি সম্পূর্ণ যেমন হবে, সেই অনুসারে ঐ পরিবর্তনও হবে অপূর্ণ বা পূর্ণ। মানবের সাধারণ জীবন শুধু যে এক ব্যষ্টিচেতনা তা নয়, ইহা অহমাত্মক চেতনাও; অর্থাৎ ইহা সেই চেতনা যাতে ব্যষ্টিপুরুষ বা জীবাত্মা নিজেকে এক করে বিশ্বপ্রকৃতির গতিবৃত্তির মধ্যে তার মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক অনুভূতির গ্রন্থির সহিত, তার মনোসৃষ্ট অহং-এর সহিত, এবং অপেক্ষাকৃত কম ঘনিষ্ঠভাবে মন, প্রাণ ও দেহের সহিত যারা বিভিন্ন অনুভূতি গ্রহণ করে; কারণ ইহাদের সম্বন্ধে সে বলতে পারে "আমার মন, প্রাণ ও দেহ", আর এইজন্য ইহাদের সে নিজ ব'লে মনে করে অথচ সে মনে করে যে সে অংশতঃ এই সব নয়, এই সব এমন কিছু যা সে অধিকার করে ও ব্যবহার করে; কিন্তু অহং সম্বন্ধে সে বলে, "ইহা আমি।" মন, প্রাণ ও দেহের সহিত অভিন্নতা বোধ থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সে তার অহং থেকে ফিরে যেতে পারে সেই আসল জীবের, জীবাত্মার চেতনায় যে জীবাত্মা মন, প্রাণ ও দেহের প্রকৃত অধিকারী। এই জীবের দিক থেকে পিছনে তার দিকে তাকিয়ে যার প্রতিভূ ও সচেতন সংকেত সে, সে ফিরে যেতে পারে শুদ্ধ আত্মার, অনপেক্ষ সন্মাত্রের, অথবা অনপেক্ষ অসতের বিশ্বাতীত চেতনায়--যে তিনটি একই সনাতন সদ্‌বস্তুর বিভিন্ন স্থিতি। কিন্তু একদিকে বিশ্বপ্রকৃতি আর অন্যদিকে ইহার এক ও বিশ্বব্যাপী আত্মার অধিকারী বিশ্বাতীত সন্মাত্র--ইহাদের মধ্যে অবস্থিত বিশ্বচেতনা, বিরাট পুরুষ যার প্রকৃতি অর্থাৎ সক্রিয় সচেতন শক্তি হ'ল সমগ্র নিসর্গ শক্তি (Nature)। আমরা তাতে উপনীত হ'তে পারি, তা হ'তে পারি হয় অহংএর প্রাচীরগুলি যেন পাশাপাশিভাবে ভেঙে একম্-এর অন্তর্গত সর্বভূতের সহিত নিজেকে একাত্ম ক'রে অথবা ঊর্ধ্ব থেকে শুদ্ধ আত্মা বা অনপেক্ষ সন্মাত্রকে ইহার বহির্গামী, বিশ্বগত, সর্ব-গ্রাহী, সকলের উপাদান-স্বরূপ আত্মজ্ঞান ও আত্ম-সৃজনশীল সামর্থ্যে উপলব্ধি ক'রে।

সকলের মধ্যে বিশ্বগত নীরব আত্মা রূপেই এই বিশ্বচেতনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা মনোময় পুরুষের পক্ষে সব চেয়ে সহজ; ইহাই শুদ্ধ ও সর্বব্যাপী সাক্ষী যিনি বিশ্বের চিন্ময়পুরুষরূপে বিশ্বের সকল প্রবৃত্তি নিরীক্ষণ করেন, ইনিই সচ্চিদানন্দ--যাঁর আনন্দের জন্য বিশ্বপ্রকৃতি তার বিভিন্ন কর্মের চিরন্তন শোভাযাত্রা প্রদর্শন করে। আমরা এমন এক তত্ত্বকে জানতে পারি যা আমাদের ও সকল বিষয়ের মধ্যে অবস্থিত এক অক্ষত আনন্দ, এক শুদ্ধ ও সিদ্ধ সান্নিধ্য, এক অনন্ত ও স্বয়ং-পূর্ণ সামর্থ্য; সকল বিষয় বিভক্ত হ'লেও ইহা বিভক্ত হয় না, বিশ্ব অভিব্যক্তির চাপ ও সংঘর্ষের প্রভাবাধীন নয়, এই অভিব্যক্তির সকল কিছুর ঊর্ধ্বে থেকেও ইহা সে সবের অন্তঃস্থ। ইহা আছে ব'লেই এইসকল কিছু থাকে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব এই সকলের উপর নির্ভর করে না; ইহা এত মহান্ যে তার দ্বারা অধ্যুষিত ও ধৃত কাল ও দেশের মধ্যে গতিধারার দ্বারা ইহা সীমিত হয় না। এই ভিত্তি বলেই আমরা সমর্থ হই আমাদের স্বীয় সত্তার মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে দিব্যসত্তার নিরাপত্তায় অধিগত ক'রতে। যার মধ্যে আমরা বাস করি তার দ্বারা আমরা আর সীমিত ও আবদ্ধ হই না, বরং যে সবের মধ্যে আমরা বাস করতে সম্মত হই সেসবকে আমরা ভগবানের মতো নিজেদের মধ্যে ধারণ করি প্রকৃতির ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে। আমরা মন বা প্রাণ বা দেহ নই, বরং ইহাদের অধিকারী নীরব, শান্তিময়, সনাতন অন্তঃপুরুষ যা তাদের অন্তঃপ্রেরণাদাতা এবং পরিপোষক; আর এই অন্তঃ-পুরুষকেই আমরা সর্বত্র দেখি যে ইহা সকল প্রাণ ও মন ও দেহকে পোষণ ক'রে, তাদের মধ্যে প্রেরণা দিয়ে ও তাদের অধিগত ক'রে অবস্থিত, ইহাকে আর আমরা নিজেদের মধ্যে এক পৃথক ও ব্যষ্টিপুরুষ ব'লে দেখি না। ইহাতেই এই সকল কিছু চলন্ত ও সক্রিয়; এই সকল কিছুর মধ্যে ইহা স্থির ও অক্ষর। ইহাকে লাভ করলে, আমরা লাভ করি আমাদের শাশ্বত আত্ম-সত্তাকে যা তার সনাতন চেতনা ও আনন্দের মধ্যে স্থির।

ইহার পর আমাদের উপলব্ধি করা চাই যে এই নীরব আত্মাই বিশ্ব-প্রকৃতির সকল ক্রিয়ার প্রভু, সেই একই স্বয়ম্ভু যিনি তাঁর সনাতন চেতনার সৃজনশীল শক্তিতে বিলসিত হ'য়েছেন। এই সকল ক্রিয়া শুধু তাঁরই সামর্থ্য ও জ্ঞান ও আত্ম-আনন্দ যা তাঁর অনন্ত সত্তায় সর্বত্র বিস্তৃত হ'য়েছেন ("পর্যগাৎ") তাঁর শাশ্বত প্রজ্ঞা ও সংকল্পের সব কাজ করার জন্য। আমরা ভগবানকে, সকলের সনাতন আত্মাকে যে প্রথম উপলব্ধি করি তাতে

তিনিই উৎস এই সব কিছুর--ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয়তা, সকল জ্ঞান ও অজ্ঞানতা, সকল আনন্দ ও কষ্টভোগ, সকল শুভ ও অশুভ, পূর্ণতা ও অপূর্ণতা, সকল শক্তি ও রূপ, শাশ্বত দিব্যতত্ত্ব থেকে প্রকৃতির সকল বহির্গমন ও ভগবানের দিকে প্রকৃতির সকল প্রত্যাবর্তন। পরে আমরা উপলব্ধি করি যে তিনি স্বয়ং সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছেন তাঁর সামর্থ্য ও জ্ঞানে--কারণ সামর্থ্য ও জ্ঞান তাঁরই স্বরূপ--আর তিনি যে শুধু তাদের সব কর্মের উৎস তা নয়, তিনি তাদের কর্মের স্রষ্টা ও কর্তা, সর্বভূতের মধ্যে এক; কারণ বিশ্ব অভিব্যক্তির বহু পুরুষ এক ভগবানেরই বিভিন্ন আনন মাত্র, এই যে বহু মন, প্রাণ ও দেহ--এসব শুধু তাঁরই বিভিন্ন মুখোস ও ছদ্মবেশ। আমরা বোধ করি যে প্রতি সত্তাই বিশ্বব্যাপী নারায়ণ যিনি আমাদের সম্মুখে বহুরূপে উপস্থিত; আমরা তার মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলি আর অনুভব করি যে আমাদের নিজেদের মন, প্রাণ ও দেহ আত্মারই এক রূপ মাত্র আর যাদের আমরা আগে অপর ব'লে ভাবতাম এখন তারা সব আমাদের চেতনায় অন্য মন, প্রাণ ও দেহে আমাদেরই আত্মা। বিশ্বস্থ সকল শক্তি ও ভাবনা ও ঘটনা ও বিষয়সমূহের আকার এই আত্মার শুধু বিভিন্ন প্রকাশমাত্রা, ভগবানের শাশ্বত আত্ম-রূপায়ণের তাঁর বিভিন্ন ইষ্টার্থ। বিভিন্ন বিষয় ও সত্তাকে এই ভাবে দেখলে, আমাদের পক্ষে তাদের এই ভাবে দেখা সম্ভব যে তারা যেন তাঁর বিভক্ত সত্তার বিভিন্ন অংশ ও খণ্ড, কিন্তু এই উপলব্ধি ও জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না যদি না আমরা গুণ ও দেশ ও বিভাজনের এই ভাবনা অতিক্রম করি ও অনন্তকে দেখি সর্বত্র, বিশ্ব ও বিশ্বস্থ প্রতি বিষয়কে দেখি যেন অনন্তের অস্তিত্বে ও গূঢ় চেতনায়, ও সামর্থ্যে ও আনন্দে, আর অবিভাজ্য ভগবানকে দেখি তাঁর সমগ্রতায়--আমাদের মনে তাঁর যে রূপ তৈরী হয় তা শুধু আংশিক অভিব্যক্তি হিসাবে যতই আমাদের প্রতীতি হ'ক না কেন। যখন আমরা এইভাবে ভগবানকে অধিগত করি নীরব ও সর্বোত্তম সাক্ষীরূপে, এবং সক্রিয় প্রভুরূপে এবং সকলের উপাদানস্বরূপ সত্তা রূপে, আর এইসব বিভাবের মধ্যে কোনো বিভাজন না করি তাহ'লে আমরা অধিগত করি সমগ্র বিশ্ব ভগবানকে, আলিঙ্গন করি সমগ্র বিশ্বাত্মক আত্মা ও সদ্বস্তুকে, প্রবুদ্ধ হই বিশ্বচেতনায়।

এই যে বিশ্বচেতনা আমরা লাভ করি, তার সহিত আমাদের ব্যষ্টি জীবনের সম্পর্ক কি হবে? কেননা, যেহেতু তখনো আমাদের মন, দেহ ও মানবজীবন থাকে, সেহেতু, আমাদের পৃথক ব্যষ্টি চেতনাকে অতিক্রম

করা হ'লেও আমাদের ব্যষ্টি জীবন চলতে থাকে। ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে আমরা বিশ্বচেতনা উপলব্ধি করব কিন্তু তা হব না, ইহাকে দেখব, অর্থাৎ অন্তঃপুরুষ দিয়ে, ইহাকে অনুভব করব এবং ইহার মধ্যে বাস করব, ইহার সহিত যুক্ত হব, কিন্তু তার সহিত পুরোপুরি এক না হ'য়ে এক কথায়, বিশ্বাত্মার বিশ্বচেতনার মধ্যে জীবাত্মার ব্যষ্টিচেতনা রক্ষা করা সম্পূর্ণ সম্ভব। দু'য়ের মধ্যে একপ্রকার পার্থক্য রক্ষা ক'রে তাদের মধ্যের সম্পর্কগুলি উপভোগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব; বিশ্বাত্মার আনন্দ ও আনন্ত্যে অংশগ্রহণ করার সাথে আমরা ব্যষ্টি আত্মা থাকতে পারি; অথবা ইহাদের উভয়কেই আমরা অধিগত করতে পারি মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর আত্মা হিসাবে, একটি নিজেকে বাহিরে ঢেলে দিচ্ছে দিব্যচেতনা ও শক্তির বিশ্ব-ক্রীড়ার মধ্যে, আর অন্যটি ঢেলে দিচ্ছে সেই একই বিরাটপুরুষের ক্রিয়া আমাদের ব্যষ্টি পুরুষকেন্দ্র বা পুরুষ-রূপের মধ্য দিয়ে এবং মন, প্রাণ ও দেহের ব্যষ্টি ক্রীড়ার জন্য। কিন্তু সর্বদাই জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধির পরাকাষ্ঠা হ'ল এমন সামর্থ্য লাভ যাতে ব্যক্তিভাবনাকে বিশ্বসত্তার মধ্যে বিলীন করা, ব্যষ্টি চেতনাকে বিশ্বচেতনায় নিমজ্জন করা, এমনকি অন্তঃ-পুরুষ-রূপকেও চিৎ-পুরুষের ঐক্য ও বিশ্বভাবের মধ্যে মুক্ত করা সম্ভব হয়। ইহাই সেই লয় বা মোক্ষ যা জ্ঞানযোগের সাধ্য। চিরাচরিত যোগের মতো ইহা প্রসারিত হ'তে পারে মন প্রাণ ও দেহেরও লয়ে নীরব আত্মার বা অনপেক্ষ সন্মাত্রের মধ্যে কিন্তু মোক্ষের সার হ'ল অনন্তের মধ্যে ব্যষ্টি জীবের নিমজ্জন। যখন যোগী আর অনুভব করে না যে সে দেহের মধ্যে অবস্থিত বা মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ চেতনা, আবার অনন্ত চেতনার নিঃসীম-তার মধ্যে বিভাজনের বোধও হারিয়ে ফেলে তখন সে যে ব্রত সাধনের জন্য অগ্রসর হ'য়েছিল তা সিদ্ধ হয়। ইহার পর মানবজীবন আর রাখা বা না রাখা কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, কারণ সর্বদা নীরূপ 'একম্'-ই মন ও প্রাণ ও দেহের নানা রূপের মধ্যে কাজ করে আর প্রতি অন্তঃ-পুরুষ শুধু এক একটি আসন যেখান থেকে ইহা তার নিজের খেলা পর্য-বেক্ষণ, গ্রহণ ও প্রবর্তন ক'রতে মনস্থ করে।

বিশ্বচেতনায় অবস্থান ক'রে আমরা যার মধ্যে নিজেদের নিমজ্জন করি তা সচ্চিদানন্দ। এক সনাতন সন্মাত্রই আমরা তখন হই, এক সনাতন চেতনাই তার নিজের সব কাজ দেখে আমাদের মধ্যে ও অপরের মধ্যে, সেই চেতনার এক সনাতন সংকল্প বা শক্তিই নিজেকে বিলসিত করে

অনন্ত কর্মধারায়, এক অনন্ত আনন্দই তার নিজের ও তার সকল কর্মধারার হর্ষ লাভ করে---ইহা নিজে স্থির, অক্ষর, কালাতীত, দেশাতীত, পরম, এবং তার বিভিন্ন কর্মধারার আনন্ত্যের মধ্যে নিজে নিস্তব্ধ, তাদের পরিবর্তনের দ্বারা ইহা পরিবর্তিত হয় না, তাদের বহুত্বের দ্বারা ইহা খণ্ডিত হয় না, কাল ও দেশের সমুদ্রের মধ্যে তাদের প্রবাহের জোয়ার ভাঁটায় ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, তাদের আপাতপ্রতীয়মান বিপরীত রূপের দ্বারা ইহা বিভ্রান্ত অথবা তাদের দিব্যইচ্ছাকৃত সীমার দ্বারা সীমিত হয় না। সচ্চিদানন্দই ব্যক্ত বিষয়সমূহের বহুত্বের ঐক্য, তিনিই তাদের সকল বৈচিত্র্য ও বিরোধের শাশ্বত সামঞ্জস্য, তিনিই সেই অনন্ত পূর্ণতা যা তাদের সব সসীমতা সার্থক করে ও তাদের সকল অপূর্ণতার নিশানা।

ইহা স্পষ্ট যে এই বিশ্বচেতনায় বাস করলে বিশ্বের মধ্যে সকল কিছু সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি ও মূল্যায়নের আমূল পরিবর্তন হবে। আমরা অবিদ্যার মধ্যে বাস করি ব্যষ্টি অহংরূপে, আর সব কিছু বিচার করি জ্ঞানের এক খণ্ডিত, আংশিক ও ব্যক্তিগত মান দিয়ে; আমরা সব কিছু জানি সীমিত চেতনা ও শক্তির গ্রহণ-সামর্থ্য অনুযায়ী, এবং সেজন্য বিশ্ব অভিজ্ঞতার কোনো অংশেই দিব্যসাড়া দিতে অথবা প্রকৃত মূল্য স্থাপনে আমরা অক্ষম। আমরা যে সসীমতা, দুর্বলতা, অসামর্থ্য, শোক, যন্ত্রণা, সংগ্রাম এবং ইহার সব বিরুদ্ধভাবাবেগ অথবা এইসব বিষয়ের বিপরীতগুলি অনুভব করি, তা করি এক চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে বিপরীত হিসাবে, অনপেক্ষ শুভ ও সুখের নিত্যতার মধ্যে নয়। আমরা বাস করি অনুভূতির খণ্ড খণ্ড অংশ দিয়ে আর প্রতি বিষয় ও সমগ্রকে বিচার করি আমাদের আংশিক মূল্য দিয়ে। যখন আমরা অনপেক্ষ মূল্য পাবার চেষ্টা করি তখন আমরা শুধু বিষয়সমূহের কোনো আংশিক দৃষ্টিকে বড় করে ধরি যাতে তাই কাজ করে দিব্য কর্মপ্রণালীসমূহের সমগ্রতার বদলে। আমরা ভাণ করি যে আমাদের অংশগুলিই পূর্ণ আর আমাদের একদেশীয় দৃষ্টিকোণগুলি স্থাপন করি ভগবানের সমগ্র দর্শনের সার্বভৌমত্বের মধ্যে।

বিশ্বচেতনায় প্রবেশ করলে আমরা সেই সমগ্র-দর্শনের অংশীদার হই, আর সব কিছুকে দেখি অনন্ত ও একম্-এর মূল্যে। আমাদের কাছে সসীমতারও অজ্ঞানতারও অর্থের পরিবর্তন হয়। অজ্ঞানতা পরিবর্তিত হয় দিব্য জ্ঞানের এক বিশেষ ক্রিয়ায়; বল, ও দুর্বলতা ও অসামর্থ্য পরিবর্তিত হয় দিব্যশক্তির নানাবিধ মাত্রার স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে ও সম্বরণে সুখ ও দুঃখ

পরিবর্তিত হয় দিব্য আনন্দের প্রভুত্বে ও বশ্যতায়; সংগ্রাম পরিবর্তিত হয় দিব্য সুষমার মধ্যে বিভিন্ন শক্তি ও মূল্যের সাম্যে। মন, প্রাণ ও দেহের সসীমতা আর আমাদের কষ্ট দেয় না; কারণ আর আমরা ইহাদের মধ্যে বাস করি না, আমরা বাস করি চিৎ-পুরুষের আনন্ত্যের মধ্যে, আর এই সবকে আমরা দেখি অভিব্যক্তির মধ্যে তাদের যথার্থ মূল্যে ও স্থানে ও উদ্দেশ্যে—যেন ইহারা সেই সচ্চিদানন্দের পরম সত্তা, চিৎ-শক্তি ও আনন্দের বিভিন্ন মাত্রা যিনি বিশ্বের মধ্যে নিজেকে আবৃত ও প্রকাশ করছেন। মানুষ ও বিষয়সমূহকে আর আমরা তাদের বাহ্যরূপ দিয়ে বিচার করি না এবং আমরা মুক্ত হই সকল প্রকার বিদ্বেষপূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী ভাবনা ও ভাবাবেগ থেকে; কারণ প্রতি বিষয় ও প্রাণীর মধ্যে আমরা অন্তঃপুরুষকেই দেখি, ভগবানকেই খুঁজি ও পাই এবং বাকী সবের মূল্য আমাদের কাছে শুধু গৌণ সেই সংস্থানের মধ্যে যা আমাদের জন্য থাকে শুধু ভগবানের আত্ম-প্রকাশরূপে, তাদের নিজেদের কোনো একান্ত মূল্য নেই। সেইরূপ কোনো ঘটনাই আমাদের বিক্ষুব্ধ করতে সক্ষম হয় না, কারণ সুখকর ও দুঃখকর, মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক ঘটনাসমূহের পার্থক্য নষ্ট হয়, আর সব কিছুই দেখা হয় তাদের দিব্যমূল্য ও দিব্য উদ্দেশ্যে। এইভাবে আমরা লাভ করি সম্পূর্ণ মুক্তি ও অনন্ত সমত্ব। এই পূর্ণতার কথাই উপনিষদ বলে এই কথায়—"যার মধ্যে আত্মা সর্বভূত হ'য়েছে, তার মোহ কেমন করে হবে, যে সম্যক্ জানে[১] এবং সকল কিছুতে একত্ব দেখে তার শোক কোথা থেকে আসবে?"

কিন্তু ইহা হয় কেবল তখনই যখন বিশ্বচেতনায় পূর্ণতা আসে যা মনোময় পুরুষের পক্ষে দুষ্কর। যখন মানসিকতা চিৎ-পুরুষের ভগবানের ভাবনা বা উপলব্ধি লাভ করে, তখন তার ঝোঁক হয় অস্তিত্বকে দুই বিপরীত ভাগে ভাগ করতে—অপর ও পর অস্তিত্ব। একদিকে সে দেখে অনন্ত, অরূপ, এক প্রশান্তি ও আনন্দ, স্থৈর্য ও নীরবতা, পরমার্থসৎ, বৃহৎ, শুদ্ধ; অন্যদিকে সে দেখে সান্ত, রূপময় জগৎ, বিষম বহুত্ব, সংঘর্ষ ও কষ্টভোগ এবং অপূর্ণ, অবাস্তব শুভ, ক্লেশকর ক্রিয়া, নিরর্থক সফলতা, সাপেক্ষ, সীমিত ও তুচ্ছ ও জঘন্য। যারা এই বিভাজন, এই বিরোধ

১ বিজানতঃ। এক ও বহুর জ্ঞানই বিজ্ঞান, ইহাতে বহুকে দেখা হয় একের সংজ্ঞায়, দিব্য সত্তার অনন্ত ঐক্যসাধক "সত্যম্, ঋতম্ ও বৃহৎ"-এর মধ্যে।

সৃষ্টি করে তাদের কাছে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায় শুধু একম্-এর প্রশান্তিতে, অনন্তের অলক্ষণত্বে, পরমার্থসৎ-এর অসম্ভূতিতে, তাদের কাছে এই পরমার্থ-সৎই একমাত্র বাস্তব সত্তা; মুক্ত হ'তে হলে সকল মূল্য ধ্বংস করা চাই, সকল সসীমতাকে শুধু অতিক্রম করা নয়, তাদের বিলোপ সাধন করা চাই। তারা দিব্য বিরামের মুক্তি পায়, কিন্তু দিব্য কর্মের স্বাধীনতা পায় না; তারা বিশ্বাতীতের শান্তি উপভোগ করে, কিন্তু বিশ্বাতীতের বিশ্বব্যাপী আনন্দ উপভোগ করে না। তাদের স্বাধীনতা নির্ভর করে বিশ্ব ক্রিয়া থেকে বিরত থাকার উপর, ইহা বিশ্ব অস্তিত্বকে আয়ত্ত ও অধিগত করতে অক্ষম। তবে তাহাদের পক্ষে বিশ্বাতীত শান্তির মতো বিশ্বগত শান্তি উপলব্ধি করা ও তাতে অংশ গ্রহণ করাও সম্ভব। তবু বিভাজন দূর হয় না। যে স্বাধীনতা তারা উপভোগ করে তা হ'ল নীরব নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর স্বাধীনতা, ইহা সেই দিব্য অধীশ্বর-চেতনার স্বাধীনতা নয় যা সকল বিষয় অধিগত করে, সকল কিছুতেই আনন্দ পায়, সৃষ্টির সকল রূপের মধ্যেই নিজেকে ঢেলে দেয়,—পতন বা ক্ষয় বা বন্ধন বা কলুষের ভয় না ক'রেই। চিৎ-পুরুষের সকল অধিকার তখনো অধিগত করা হয় না, তখনো থাকে এক অস্বীকৃতি, এক সসীমতা, সকল অস্তিত্বের সমগ্র একত্ব থেকে এক সংবরণ। মন, প্রাণ, দেহের কর্মপ্রণালী দেখা হয় মনোময় পুরুষের আধ্যাত্মিক লোকের স্থৈর্য ও প্রশান্তি থেকে এবং পূর্ণ করা হয় সেই স্থৈর্য ও প্রশান্তি দিয়ে; তারা সর্বকর্তৃত্বময় চিৎ-পুরুষের বিধানের দ্বারা অধিকৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয় না।

ইহা হয় যখন মনোময় পুরুষ অবস্থান করে তার নিজের সব আধ্যাত্মিক লোকে, সৎ, চিৎ, আনন্দের সব মনোময় লোকে এবং তাদের আলো ও আনন্দ ঢালে নিম্নে অপর অস্তিত্বের উপর। কিন্তু একপ্রকার বিশ্বচেতনায় উপনীত হবার প্রয়াস করা সম্ভব হয় অপর লোকগুলির মধ্যেই বাস ক'রে, আমরা যেমন বলেছি পাশাপাশিভাবে তাদের সব সসীমতা দূর ক'রে এবং নিম্নে তাদের মধ্যে পর অস্তিত্বের আলোক ও বৃহত্ব আবাহন ক'রে। শুধু যে চিৎ-পুরুষ এক তা নয়, মন, প্রাণ, জড়ও এক। এক বিশ্বমন আছে, এক বিশ্বপ্রাণ আছে, এক বিশ্বদেহ আছে। বিশ্বজনীন সমবেদনা, বিশ্বজনীন প্রেম এবং অপর সব সত্তার ভিতরের অন্তঃপুরুষের বোধ ও জ্ঞান লাভ করার জন্য মানবের সকল চেষ্টারই হ'ল প্রসারশীল মন ও হৃদয়ের সামর্থ্যের দ্বারা অহং-এর প্রাচীরগুলিকে আঘাতে আঘাতে ক্ষীণ

ও দীর্ণ এবং শেষে তাদের ভূমিসাৎ ক'রে এক বিশ্বচেতনার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা। আর যদি আমরা সক্ষম হই মন ও হৃদয়ের দ্বারা চিৎ-পুরুষের স্পর্শ লাভ করতে, এই অবর মানবসত্তার মধ্যে ভগবানের শক্তি-শালী অন্তঃপ্রবাহ গ্রহণ করতে এবং প্রেমের দ্বারা, বিশ্বজনীন আনন্দের দ্বারা, সকল প্রকৃতি ও সকল সত্তার সহিত মনের একত্বের দ্বারা আমাদের প্রকৃতি-কে পরিবর্তিত ক'রতে দিব্য প্রকৃতির প্রতিবিম্বে, তাহ'লে প্রাচীরগুলি ভাঙ-তেও আমরা সক্ষম হব। এমনকি আমাদের দেহগুলিও প্রকৃতপক্ষে পৃথকসত্তা নয়, এবং সেজন্য আমাদের শারীর চেতনাও সমর্থ হয় অপরের ও বিশ্বের শারীর চেতনার সহিত একত্বলাভে। যোগী এই অনুভব ক'রতে সক্ষম যে তার দেহ অন্য সকল দেহের সহিত এক, সে তাদের সব বিকা-রের কথাও জানতে পারে, এমনকি সেসবে অংশ গ্রহণ করতে পারে; সকল জড়ের ঐক্য সে সর্বদাই অনুভব ক'রতে সক্ষম, আর তার শরীর যে জড়ের গতির[১] মধ্যে একগতি তা-ও সে অবগত হয়। তার পক্ষে আরো সম্ভব সর্বদাই এবং স্বাভাবিকভাবেই এই অনুভব করা যে অনন্ত প্রাণের সমগ্র সাগরই তার সত্যকার প্রাণিক জীবন আর তার নিজের জীবন সেই সীমাহীন কল্লোলের এক তরঙ্গমাত্র। আবার ইহার চেয়ে আরো সহজে সে সক্ষম হয় মনে ও হৃদয়ে নিজেকে সকল ভূতের সহিত যুক্ত করতে, তাদের বিভিন্ন কামনা, সংগ্রাম, সুখ, দুঃখ, ভাবনা, সংবেগের কথা জানতে এমনভাবে যেন এইসব তার নিজেরই, অন্ততঃ যেন সেসব ঘটছে তার বৃহত্তর আত্মার মধ্যে তার নিজের হৃদয় ও মনের বিভিন্ন বৃত্তির মতো প্রায় সমান অথবা সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গ ভাবে। ইহাও বিশ্বচেতনার এক উপলব্ধি।

এমনকি মনে হতে পারে যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ একত্ব কারণ এই মনো-সৃষ্ট জগতে যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় সে সবকেই ইহাতে আমাদের আপন ব'লে স্বীকার করা হয়। কখন কখন দেখা যায় যে ইহাকেই বলা হ'য়েছে সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা। একথা ঠিক যে ইহা এক মহতী উপলব্ধি এবং মহত্তরা এক উপলব্ধিলাভের পথ। গীতায় যে বলা হ'য়েছে হর্ষে বা শোকে সর্বভূতকে আত্মবৎ গ্রহণ করতে তা ইহার কথাই। এই সমবেদনাপূর্ণ একত্ব এবং অনন্ত করুণার পথ দিয়ে বৌদ্ধ উপনীত হয়

১ জগত্যাম্ জগৎ—ঈশ উপনিষদ

তার নির্বাণে। তবু ইহার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় ও মাত্রা আছে। প্রথম অবস্থায় অন্তঃপুরুষ তখনো দ্বন্দ্বের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার অধীন এবং সেহেতু তখনো অপরা প্রকৃতির অধীন থাকে; বিশ্বকষ্টে সে বিষণ্ণ ও ব্যথিত হয়, বিশ্বআনন্দে সে প্রফুল্ল হয়। অপরের সুখে আমরা সুখের বশীভূত হই, তাদের দুঃখেও আমরা কষ্টভোগ করি আর এই একত্ব এমনকি দেহেও বিস্তৃত করা যায় যেমন সেই ভারতীয় সাধুর বেলায় হ'য়েছিল যে মাঠে এক বলদকে তার নির্দয় মালিক প্রহার করছে দেখে ঐ প্রাণীর যন্ত্রণা অনুভব করে আর্তনাদ করেছিল এবং দেখা গেল তার নিজের গায়েও চাবুকের দাগ ফুটে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কাছে অবর সত্তার বশ্যতার সহিত সচ্চিদানন্দের স্বাধীনতার মধ্যে একত্ব থাকাও একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই সিদ্ধিলাভ সম্ভব যখন অন্তঃপুরুষ মুক্ত হ'য়ে বিশ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহের ঊর্ধ্বে ওঠে, তখন এই সবকে অনুভব করা হয় প্রাণ, মন ও দেহের মধ্যে অবর গতি হিসাবে। অন্তঃপুরুষ এসবকে বোঝে, স্বীকার করে, তাদের প্রতি তার সমবেদনা থাকে কিন্তু তাদের দ্বারা সে অভিভূত বা প্রভাবিত হয় না, ফলে এমনকি মন ও দেহও শিক্ষা করে সে সবকে উপরিস্থল ছাড়া অন্যত্র অভিভূত বা এমনকি প্রভাবিত না হয়ে স্বীকার করতে। আর এই সাধনার সিদ্ধি আসে যখন অস্তিত্বের দুই অর্ধ আর বিভক্ত থাকে না এবং মন, প্রাণ ও দেহ বিভিন্ন বিশ্বসংস্পর্শের প্রতি অবর বা অজ্ঞানময় সাড়া থেকে উপচিত হয় চিৎ-পুরুষের স্বাধীনতায় এবং অবসান হয় দ্বন্দ্বের বশ্যতার। ইহার এই অর্থ নয় যে অপরের সংগ্রাম ও কষ্টভোগের বোধ থাকে না, বরং ইহার অর্থ এমন এক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা ও স্বাধীনতা যা সাধককে সামর্থ্য দেয় সুষ্ঠুভাবে বুঝতে, বিষয়সমূহের উপর যথার্থ মূল্য স্থাপন করতে এবং নিম্ন থেকে সংগ্রাম করার পরিবর্তে ঊর্ধ্ব থেকে নিরাময় করতে। ইহা দিব্য করুণা ও পরোপকারেচ্ছা রুদ্ধ করে না, কিন্তু ইহা যে মানবীয় ও পাশবিক দুঃখ ও কষ্টভোগ রুদ্ধ করে তা ঠিক।

মনোময় পুরুষের আধ্যাত্মিক ও অবর লোকগুলির মধ্যকার যে যোগসূত্রটি তাকেই প্রাচীন বৈদান্তিক পরিভাষায় বলা হয় বিজ্ঞান, আর আমরা ইহাকে বলতে পারি সত্য-লোক বা আদর্শ মন বা অতিমানস যেখানে এক ও বহু মিলিত হয় এবং আমাদের সত্তা স্বচ্ছন্দভাবে উন্মুক্ত হয় দিব্যসত্যের উদ্ভাসক আলোর দিকে এবং দিব্যসংকল্প ও জ্ঞানের চিদা-বেশের নিকট।

আমাদের ও ভগবানের মধ্যে যে বুদ্ধিগত, ভাবগত ও ইন্দ্রিয়গত মনের আবরণ আমাদের সাধারণ জীবন নির্মাণ করেছে তাকে যদি আমরা ছিন্ন করতে সক্ষম হই, তাহ'লে আমরা আমাদের সকল মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক অনুভূতিকে ঊর্ধ্বে নিতে পারি সত্য-মানসের মধ্য দিয়ে--আর ইহাই ছিল প্রাচীন বৈদিক "যজ্ঞের" নিগূঢ় বা রহস্যময় অর্থ--যাতে সেসব রূপান্তরিত হয় সচ্চিদানন্দের অনন্ত সত্যের বিভিন্ন সংজ্ঞায়, আর আমরা সমর্থ হই অনন্ত সন্মাত্রের বিভিন্ন সামর্থ্য ও দীপ্তিকে গ্রহণ করতে দিব্য জ্ঞান, সংকল্প ও আনন্দের বিভিন্ন রূপে যাতে তাদের আরোপ করা হয় আমাদের মানসিকতা, প্রাণিকতা ও শারীরিক সত্তার উপর যতক্ষণ না অবরসত্তা রূপান্তরিত হয় পরতর সত্তার সিদ্ধ আধারে। ইহাই বৈদিক সাধনার দুই ধারা--একটি হল মানবের মাঝে দেবগণের অবতরণ ও জন্ম, আর অন্যটি হ'ল দিব্য জ্ঞান, সামর্থ্য ও আনন্দের দিকে সংগ্রামরত বিভিন্ন মানবসামর্থ্যের আরোহণ এবং তাদের উত্তরণ দেবগণের মধ্যে, আর ইহাদের পরিণাম আসে একের, অনন্তের, আনন্দময় জীবনের ভগবানের সহিত মিলনের অমরত্বের অধিকার লাভ। এই আদর্শ লোক অধিকার করার বলে আমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করি অপর ও পর অস্তিত্বের বিরোধ, এবং সেই মিথ্যা ব্যবধান যা অবিদ্যা সৃষ্টি করেছিল সান্ত ও অনন্তের মাঝে, ভগবান ও প্রকৃতির মাঝে, এক ও বহুর মাঝে, আর আমরা উন্মুক্ত করি ভগবানের দ্বার, জীবকে সার্থক করি বিশ্বচেতনার সম্পূর্ণ সুষমার মধ্যে এবং বিশ্বসত্তার মধ্যে উপলব্ধি করি বিশ্বাতীত সচ্চিদানন্দের আবির্ভাব।

ষোড়শ অধ্যায়

একত্ব

অতএব যখন সাধক মন, প্রাণ ও দেহের সহিত তার অভিন্নতা বোধ থেকে তার চেতনার কেন্দ্র প্রত্যাহার ক'রে তার প্রকৃত আত্মা আবিষ্কার করে, আর আবিষ্কার করে সেই আত্মার একত্ব শুদ্ধ নীরব অক্ষর ব্রহ্মের সহিত এবং সেই অক্ষর ব্রহ্মের মধ্যে সেই তত্ত্বও আবিষ্কার করে যার দ্বারা জীব তার আপন ব্যক্তিরূপ থেকে পলায়ন করে নৈর্ব্যক্তিকের মধ্যে, তখন জ্ঞানমার্গের সাধনার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়। একমাত্র ইহাই একান্তভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞানযোগের চিরাচরিত লক্ষ্যের জন্য, নিমজ্জনের জন্য, বিশ্ব জীবন থেকে পলায়নের জন্য, সকল বিশ্বসত্তার অতীত যে অনপেক্ষ ও অনুপাখ্য পরব্রহ্ম তার মধ্যে মোক্ষের জন্য। এইরূপ মোক্ষ-কামী তার পথে অন্য উপলব্ধিও পেতে পারে; বিশ্বের যিনি প্রভু, যে পুরুষ নিজেকে সকল সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে অভিব্যক্ত করেন তাঁকে সে উপলব্ধি করতে পারে, বিশ্বচেতনা লাভ করতে পারে, আর পারে সকল সত্তার সহিত তার ঐক্য জানতে ও অনুভব ক'রতে। কিন্তু এই সব শুধু তার যাত্রার বিভিন্ন পর্যায় বা অবস্থা, অনুপাখ্য লক্ষ্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হবার কালে তার অন্তঃপুরুষের বিকাশের পরিণাম। এই সব ছাড়িয়ে যাওয়াই তার পরম লক্ষ্য। অপরপক্ষে স্বাধীনতা ও নীরবতা ও প্রশান্তি পাবার পর যখন আমরা বিশ্বচেতনার দ্বারা নীরব ব্রহ্মের মতো আবার সক্রিয় ব্রহ্মকেও অধিগত করি, এবং দিব্য স্বাধীনতার মধ্যে দৃঢ়ভাবে বিশ্রাম ও বাস করতে সক্ষম হই, তখন আমরা এই পথের সাধনার দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত করি এবং ইহার দ্বারা আত্ম-জ্ঞানের অখণ্ডতা হ'য়ে ওঠে মুক্ত পুরুষের অবস্থান ভূমি।

অন্তঃপুরুষ এইভাবে নিজেকে অধিকার করে সচ্চিদানন্দের ঐক্যের মধ্যে এবং তার নিজের সত্তার সকল অভিব্যক্ত লোকের উপর। অখণ্ড জ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে ইহা সব কিছুর মিলন সাধন করে সচ্চিদানন্দের মধ্যে, কারণ সত্তা যে শুধু স্বরূপে এক তা নয়, ইহা এক সর্বত্র, তার সকল স্থিতিতে, এবং প্রতি বিভাবে, যেমন একত্বের চরম রূপে, তেমন বহুত্বেরও

চরম রূপে। চিরাচরিত জ্ঞান এই সত্যকে মুখে স্বীকার করলেও কাজের বেলায় তর্ক করে যেন একত্ব সর্বত্র সমান নয় অথবা সকলের মধ্যে ইহাকে সমানভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ইহা একত্বকে পায় অব্যক্ত পরমার্থ-সৎ-এর মধ্যে, কিন্তু ততখানি পায় না অভিব্যক্তির মধ্যে, ইহাকে পুরুষবিধ অপেক্ষা নৈর্ব্যক্তিকে আরো শুদ্ধভাবে পায়, সম্পূর্ণভাবে পায় নির্গুণে, কিন্তু সগুণে তত সম্পূর্ণভাবে নয়, ইহাকে সন্তোষজনকভাবে উপস্থিত দেখে নীরব ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের মধ্যে, কিন্তু সক্রিয় ব্রহ্মের মধ্যে তত সন্তোষজনকভাবে নয়। সেজন্য ইহা পরমার্থসৎ-এর এই সব অপর সংজ্ঞাগুলিকে উত্তরণের পরম্পরায় তাদের বিপরীতগুলির নিম্নে স্থাপন করে এবং দাবী করে যে শেষ পর্যন্ত ইহাদের বর্জন আবশ্যক, যেন চরম উপলব্ধির পক্ষে এই বর্জন অপরিহার্য। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান এরূপ কোনো বিভাজন করে না; একত্ব সম্বন্ধে তার যে দৃষ্টি তাতে ইহা অন্য একপ্রকার একান্ততায় উপনীত হয়। অব্যক্ত ও ব্যক্ত, নৈর্ব্যক্তিক ও পুরুষবিধ, নির্গুণ ও সগুণ, বিশ্বজনীন নীরবতার অনন্ত গভীরতা এবং বিশ্বজনীন ক্রিয়ার অনন্ত বৃহত্ত্ব––এসবেরই মধ্যে ইহা পায় একই একত্ব। ইহা একই একান্ত একত্ব পায় পুরুষে ও প্রকৃতিতে, দিব্য সান্নিধ্যে ও দিব্য সামর্থ্য ও জ্ঞানের বিভিন্ন কর্মে, এক-পুরুষের নিত্য ব্যক্ততাতে এবং বহুপুরুষের নিরন্তর অভিব্যক্তিতে, সচ্চিদা-নন্দের অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের মধ্যে যিনি নিজের বহুবিধ একত্ব নিজের কাছে সর্বদাই বাস্তব রাখেন এবং মন, প্রাণ ও দেহের আপাতপ্রতীয়মান সব বিভাজনের মধ্যে যেসবে একত্ব নিগূঢ় হ'লেও সর্বদাই বাস্তব এবং বাস্তব হবার জন্য অবিরাম প্রয়াসী। ইহার কাছে সকল ঐক্য এক প্রগাঢ়, শুদ্ধ ও অনন্ত বাস্তব উপলব্ধি, সকল ভেদ একই ভাবগত ও সনাতন সত্তার প্রচুর, সমৃদ্ধ ও অসীম বাস্তব উপলব্ধি।

সুতরাং সম্পূর্ণ ঐক্যোপলব্ধি পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণযোগের সার। সচ্চিদানন্দ যে স্বরূপে এক এবং তাঁর সকল অভিব্যক্তিতেও এক,––এই জানা জ্ঞানের ভিত্তি; একত্বের এই দর্শনকে চেতনার কাছে তার স্থিতিতে ও তার ক্রিয়াতে বাস্তব করা এবং পরম সত্তা ও সকল সত্তার সহিত ঐক্য বোধের মধ্যে বিভক্ত ব্যষ্টিত্বের বোধ নিমজ্জন ক'রে তা-ই হওয়া––জ্ঞানযোগে ইহাই তার সফল সাধনা; ঐক্যের ঐ বোধে বাস করা, চিন্তা, অনুভব, সংকল্প ও কর্ম করা––ইহাই ব্যষ্টি সত্তা ও ব্যষ্টিজীবনে তার সফল সাধনা। ভেদের মধ্যে একত্বের এই যে উপলব্ধি এবং একত্বের এই যে অনুশীলন––

ইহাই যোগের সব কিছু।

অস্তিত্বের যে কোনো স্থিতিতে বা যে কোনো লোকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপে এক। সুতরাং ইহাকেই আমাদের সকল সফল ক্রিয়ার ভিত্তি করা কর্তব্য—তা সে ক্রিয়া চেতনার বা শক্তির বা সত্তার হ'ক, জ্ঞান বা সংকল্প বা আনন্দের হ'ক। আমরা যেমন দেখেছি, আমাদের বাস করতে হবে বিশ্বাতীত পরমার্থসৎ-এর চেতনায় এবং সেই পরমার্থসৎ-এর চেতনাতেও যিনি সকল সম্পর্কের মধ্যে অভিব্যক্ত, নৈর্ব্যক্তিক এবং সকল ব্যক্তিরূপ হিসাবে ব্যক্ত, সকল গুণের অতীত এবং অনন্ত গুণসমৃদ্ধ, এক নীরবতা যার মধ্য থেকে নিত্য বাক্ সৃজন করে, এক দিব্য স্থৈর্য ও শান্তি যা অনন্ত আনন্দ ও ক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে অধিকার করে। আমাদের তাঁকে পাওয়া চাই এইভাবে যে তিনিই পুরুষরূপ সকল কিছু জানেন, সকল কিছু অনুমতি করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন, সকল কিছুর আধার, ভর্ত্তা এবং আন্তরশক্তি আর তিনিই একসাথে প্রকৃতি রূপে সকল জ্ঞান, সংকল্প ও রূপায়ণ সম্পাদন করেন। তাঁকে দেখা চাই যে তিনিই এক সন্মাত্র, নিজের মধ্যে আত্ম-সমাহিত সত্তা এবং সর্বভূতের মধ্যে বিলসিত সত্তা; তিনিই এক চেতনারূপে তাঁর অস্তিত্বের ঐক্যের মধ্যে একাগ্র, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রসারিত এবং অগণিত সত্তার মধ্যে বহু কেন্দ্রগত; তিনিই এক শক্তিরূপে আত্ম-সমাহিত চেতনার বিশ্রামের মধ্যে স্থিতিক এবং প্রসারিত চেতনার ক্রিয়ার মধ্যে স্ফুরন্ত; তিনিই এক আনন্দরূপে তাঁর অলক্ষণ আনন্ত্যের কথা সানন্দে অবগত এবং সকল লক্ষণ ও শক্তি ও বিভিন্ন রূপকে নিজ ব'লে সানন্দে অবগত; তিনিই এক সৃজনশীল জ্ঞান ও নিয়ন্তা সংকল্প যা অতিমানসিক, এবং সকল মন, প্রাণ ও দেহের প্রভব ও নিধারক; তিনিই এক মন যা সকল মনোময় পুরুষের আশ্রয় ও তাদের সকল মানসিক বৃত্তির উপাদানস্বরূপ; তিনিই এক প্রাণ যা সকল সজীব সত্তার মধ্যে সক্রিয় ও তাদের প্রাণিক ক্রিয়ার উৎপাদক; তিনিই এক ধাতু যা বিভিন্ন রূপ ও বিষয়ের উপাদানস্বরূপ যেন ইহা সেই দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর ছাঁচ যার মধ্যে মন ও প্রাণ ব্যক্ত ও সক্রিয় হয়, ঠিক যেমন এক শুদ্ধ অস্তিত্ব সেই আকাশতত্ত্ব যার মধ্যে সকল চিৎ-শক্তি ও আনন্দ মিলিত হ'য়ে অবস্থান করে এবং নানাভাবে নিজেদের পায়। কারণ এইগুলিই সচ্চিদানন্দের ব্যক্ত সত্তার সপ্ত তত্ত্ব।

পূর্ণজ্ঞান যোগের কর্তব্য হ'ল এই অভিব্যক্তির দুই প্রকৃতি স্বীকার করা —কারণ সচ্চিদানন্দের পরা প্রকৃতি আছে যার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়

এবং মন, প্রাণ ও দেহের অপরা প্রকৃতি আছে যার মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন; ইহার আরো উচিত এই দুইকে প্রদীপ্ত উপলব্ধির একত্বের মধ্যে সমন্বিত ও যুক্ত করা। এই দুইকে পৃথক রাখা আমাদের চলে না, কারণ তাহ'লে আমাদের একপ্রকার দ্বিবিধ জীবন যাপন করতে হয়——ভিতরে বা ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক, এবং আমাদের সক্রিয় ও পার্থিব জীবন যাত্রায় মানসিক ও জড়াসক্ত; আমাদের কর্তব্য,——পরতর সদ্‌বস্তুর আলোক, শক্তি ও হর্ষে অবর জীবনযাত্রাকে নতুনভাবে দেখা ও পুনর্গঠন করা। আমাদের উপলব্ধি করা চাই যে জড় হ'ল চিৎ-পুরুষের ইন্দ্রিয়-সৃষ্ট ছাঁচ, অর্থাৎ পার্থিব সত্তা ও ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ পরিস্থিতির মধ্যে সচ্চিদানন্দের আলোক, শক্তি ও হর্ষের সকল অভিব্যক্তির এক মাধ্যম। আমাদের দেখা চাই যে প্রাণ অনন্ত দিব্য শক্তির এক প্রবাহ প্রণালী এবং ইন্দ্রিয় ও মন ইহা থেকে যে দূরত্ব ও বিভাজনের প্রাকার সৃষ্টি করেছে তা ভেঙে ফেলা চাই, তবেই দিব্য সামর্থ্যের পক্ষে সম্ভব হবে আমাদের সকল প্রাণপ্রবৃত্তিকে অধিগত করে চালনা ও পরিবর্তন করা যতক্ষণ না প্রাণশক্তি রূপান্তরিত হয়ে শেষে আর সেই সীমিত প্রাণ-শক্তি থাকে না যা এখন আমাদের মন ও দেহ ধারণ করে এবং যতক্ষণ না ইহা হ'য়ে ওঠে সচ্চিদানন্দের সর্ব-আনন্দময় চিৎ-শক্তির প্রতিমূর্তি। অনুরূপভাবে আমাদের উচিত আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানগত ও ভাবগত মানসিকতাকে পরিবর্তন করা দিব্য প্রেম ও বিশ্বজনীন আনন্দের লীলায়; আমাদের আরো উচিত আমাদের অন্তঃস্থ জ্ঞান ও সংকল্প প্রয়াসী ধীশক্তিকে পরিপূর্ণ করা দিব্য জ্ঞান-সংকল্পের আলোকে যতক্ষণ না ইহা রূপান্তরিত হয় সেই পরতর ও মহিমময় কর্মের প্রতিমূর্তিতে।

এই যে রূপান্তর তা সত্য-মানসের জাগরণ বিনা সম্পূর্ণ হ'তে পারে না অথবা প্রকৃতপক্ষে নিষ্পন্ন করা যায় না; মনোময় পুরুষের মধ্যে এই সত্য-মানস অতিমানসের প্রতিরূপ এবং ইহার দীপ্তিরাশিকে মানসিকভাবে গ্রহণ করতে সমর্থ। এই মধ্যবর্তী সামর্থ্যের মুক্ত দুয়ার না থাকায় চিৎ-পুরুষ ও মনের বিরুদ্ধতার দরুণ, পরা ও অপরা——এই দুই প্রকৃতি পৃথক হ'য়ে থাকে এবং যদিও যোগাযোগ ও প্রভাব থাকা সম্ভব অথবা অপরা-প্রকৃতির পক্ষে পরাপ্রকৃতিকে একপ্রকার জ্যোতির্ময় অথবা আনন্দময় সমাধির মধ্যে লাভ করা সম্ভব হয়, তাহ'লেও অপরা প্রকৃতির পূর্ণ ও সুষ্ঠু রূপান্তর সম্ভব হয় না। জড় ও তার সকল রূপের মধ্যে অবস্থিত চিৎ-পুরুষকে, সকল ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়সংবিতের মধ্যে অবস্থিত দিব্য

আনন্দকে, সকল প্রাণ-প্রবৃত্তির পশ্চাতে দিব্যশক্তিকে আমরা ভাবমানস দিয়ে অপূর্ণভাবে অনুভব করতে পারি, ইন্দ্রিয়মানস দিয়ে বোধ করতে পারি অথবা বুদ্ধিমানস দিয়ে এসবের প্রতীতি ও ধারণা পেতে সক্ষম হই; কিন্তু তবু অপরা প্রকৃতি তার নিজের স্বভাব বজায় রাখে এবং ঊর্ধ্ব থেকে আসা প্রভাবকে তার ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করবে এবং তার লক্ষণে পরিবর্তিত করবে। এমনকি যখন এই প্রভাব তার সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা ব্যাপ্ত ও তীব্র সামর্থ্য গ্রহণ করে, তখনো ইহা তার ক্রিয়ায় অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল হবে, ইহাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে শুধু শান্তি ও নিস্তব্ধতার মধ্যে; ইহাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হ'লে আমরা আবার মাঝে মাঝে তামসিকতার প্রতিক্রিয়ার অধীন হব; সাধারণ জীবন ও ইহার বিভিন্ন বাহ্য স্পর্শের চাপে এবং দ্বন্দ্বসমূহের আক্রমণে ইহাকে ভুলে যাওয়ারই প্রবণতা বেশী হবে, ইহাকে সম্পূর্ণভাবে পাবার সম্ভাবনা থাকে শুধু যখন আমরা নিজেদের ও ভগবানের সহিত একাকী থাকি, আর না হয় তাকে পেতে পারি শুধু প্রগাঢ় আনন্দ ও উল্লাসের অবস্থায়, তা সে মুহূর্তব্যাপী হ'ক বা আরো কিছু দীর্ঘসময়ব্যাপী হ'ক। কারণ আমাদের মানসিকতা একটি সীমিত যন্ত্র, ইহা বিচরণ করে সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে এবং বিষয়সমূহকে গ্রহণ করে খণ্ড খণ্ড ক'রে আংশিকভাবে, সুতরাং ইহা চঞ্চল, অস্থির ও পরিবর্তনশীল হ'তে বাধ্য; ইহা স্থিরতা পেতে পারে শুধু তার ক্রিয়ার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ক'রে আর নিষ্ঠা পায় নিবৃত্তি ও বিশ্রামের দ্বারা।

অপরপক্ষে আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য-দর্শনগুলি আসে সেই অতিমানস থেকে যা আনন্ত্য থেকে সৃষ্টি করে বিশ্বশৃঙ্খলা; এই অতিমানস এমন সংকল্প যা জানে ও এমন জ্ঞান যা কার্যসাধক। বেদ বলে, ইহার কর্মপ্রবৃত্তি নিম্নে নিয়ে আসে দ্যুলোকের অবাধ বর্ষণ—আলোক ও সামর্থ্য ও আনন্দের মহো অর্ণঃ থেকে সপ্ত নদীর পূর্ণ প্রবাহ। ইহা সচ্চিদানন্দের প্রকাশক। আমাদের মানসিকতার বিক্ষিপ্ত ও অসম্বদ্ধ আভাসনগুলির পশ্চাতে অবস্থিত সত্যেরও প্রকাশক ইহা, আর তাদের প্রতিটিকে ইহা বাধ্য করে পিছনের সত্যের ঐক্যের মধ্যে তাদের আপন আপন স্থানে আসতে; এই ভাবে ইহা সক্ষম হয় আমাদের মনের অর্ধ-আলোককে রূপান্তরিত করতে আলোকের নিশ্চিত সমগ্রতায়। আমাদের মানসিক সংকল্প ও ভাবগত সব ইচ্ছা ও প্রাণিক চেষ্টার সকল কুটিল ও অপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত সংঘর্ষের

পশ্চাতে অবস্থিত সংকল্পকে ইহা প্রকাশ করে এবং প্রতিটিকে বাধ্য করে পিছনের জ্যোতির্ময় সংকল্পের ঐক্যের মধ্যে তার আপন স্থানে আসতে; এই-ভাবে ইহা সক্ষম হয় আমাদের প্রাণের ও মনের অর্ধ-অন্ধকারময় সংগ্রাম-কে রূপান্তরিত করতে সুশৃঙ্খল শক্তির এক নিশ্চিত সমগ্রতায়। ইহা সেই আনন্দ প্রকাশ করে যার জন্য আমাদের প্রতি ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ভাবাবেগ হাতড়ায় এবং যা থেকে তারা পিছনে পড়ে হ'য়ে দাঁড়ায় আংশিক পাওয়া তুষ্টি অথবা অসন্তোষ, যন্ত্রণা, শোক বা উদাসীনতা এবং প্রতিটিকে ইহা বাধ্য করে পশ্চাতে অবস্থিত বিশ্বজনীন আনন্দের ঐক্যের মধ্যে নিজের স্থানে আসতে; এইভাবে ইহা সক্ষম হয় আমাদের দ্বন্দ্বভাবাপন্ন সব ভাবা-বেগ ও ইন্দ্রিয়-সংবিতের বিরোধকে রূপান্তরিত করতে শান্ত অথচ গভীর ও শক্তিশালী প্রেম ও আনন্দের নিশ্চিত সমগ্রতায়। উপরন্তু ইহা বিশ্বক্রিয়া প্রকাশ ক'রে সত্তার সেই সত্য দেখায় যা থেকে তার প্রতি ক্রিয়া উৎপন্ন হয় ও যার দিকে তারা অগ্রসর হয়; প্রতি গতিতে যে কার্যসাধিকা শক্তি থাকে তা-ও ইহা দেখায়, আর দেখায় সত্তার আনন্দকে যার জন্য এবং যা থেকে প্রতিটির জন্ম; আর এই সবকে ইহা সম্পৃক্ত করে সচ্চিদানন্দের বিশ্বসত্তা, চেতনা, শক্তি ও আনন্দের সহিত। এইভাবে ইহা আমাদের জন্য সুসমঞ্জস করে সৃষ্টির সকল বিরোধ, বিভাজন ও বিপরীতভাবগুলি এবং আমাদের দেখায় তাদের মধ্যে বর্তমান একত্ব ও অনন্তকে। এই অতি-মানসিক আলোকের মধ্যে উন্নীত হ'লে, দুঃখ সুখ ও উদাসীনতা পরিবর্তিত হ'তে শুরু করে এক স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দের হর্ষে; বল ও দুর্বলতা, সফলতা ও বিফলতা এক স্বয়ং কার্যসাধক শক্তি ও সংকল্পের বিভিন্ন সামর্থ্যে; সত্য ও প্রমাদ, জ্ঞান ও অজ্ঞানতা এক অনন্ত আত্ম-সংবিৎ ও বিশ্বজ্ঞানের আলোকে; সত্তার বৃদ্ধি ও সত্তার হ্রাস, সসীমতা ও সসীমতার অতিক্রমণ এক আত্ম-চরিতার্থ করা চিন্ময় অস্তিত্বের বিভিন্ন তরঙ্গে। আমাদের সকল জীবন ও আমাদের সকল মূল সত্তা রূপান্তরিত হয় সচ্চিদানন্দের অধিকার-ভুক্ত বস্তুতে।

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির তিনটি পথ যে বিভিন্ন লক্ষ্য নিজেদের সম্মুখে স্থাপন করে তাদের ঐক্যে আমরা উপনীত হই এই পূর্ণজ্ঞানের পথে। জ্ঞানের লক্ষ্য প্রকৃত আত্ম-সত্তার উপলব্ধি, কর্মের লক্ষ্য সেই দিব্য চেতনার উপলব্ধি যা নিগূঢ়ভাবে সকল কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে, ভক্তির লক্ষ্য সেই আন-ন্দের উপলব্ধি যা প্রেমিকরূপে উপভোগ করে সকল পুরুষকে ও সকল

ভূতকে--সৎ, চিৎ-তপস্ ও আনন্দ। অতএব প্রত্যেকেরই লক্ষ্য সচ্চিদা-নন্দকে পাওয়া তাঁর ত্রয়াত্মক দিব্যপ্রকৃতির একটি বা অপর বিভাবের মধ্য দিয়ে। জ্ঞানের দ্বারা আমরা সর্বদাই উপনীত হই আমাদের প্রকৃত সনাতন অক্ষর সত্তাতে ইহাই সেই স্বয়ম্ভূ যার তামস প্রতিরূপ হ'ল বিশ্বের প্রতি "আমি", আর আমরা ভেদ বিলোপ করি "সোঽহম্"--"আমি তিনি" এই মহতী উপলব্ধির মধ্যে, এবং তার সাথে আমরা আবার উপনীত হই অপর সকল সত্তার সহিত আমাদের তাদাত্ম্যে।

কিন্তু একই সাথে সেই অনন্ত সত্তা সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানে আমরা জানি যে ইহা এক চিৎ-শক্তি যা বিভিন্ন জগৎ সৃষ্টি ও শাসন করে এবং ইহাদের কর্মের মধ্যে নিজেকে অভিব্যক্ত করে; ইহা ঈশ্বররূপে স্বয়ম্ভূকে প্রকট করে তাঁর বিশ্বব্যাপী চিৎ-সংকল্পের মধ্যে। ইহার দ্বারাই আমরা সমর্থ হই আমাদের সংকল্পকে তাঁর সংকল্পের সহিত যুক্ত করতে, সকল ভূতের ক্রিয়াশক্তির মধ্যে তাঁর সংকল্পকে উপলব্ধি করতে আর এই বুঝতে যে অপর সকলের এই সব শক্তির চরিতার্থতা আমাদের নিজেদেরই বিশ্বজনীন আত্ম-চরিতার্থতার অংশ। এইভাবে দূর হয় সংঘর্ষ ও বিভাজন ও বিরো-ধের বাস্তবতা, থাকে শুধু তাদের বাহ্য রূপ। অতএব ঐ জ্ঞানের দ্বারা আমাদের দ্বারা দিব্যকর্মসাধন সম্ভবপর হয়, এই কর্মপ্রণালী আমাদের প্রকৃতির কাছে ব্যক্তিগত কিন্তু সত্তার কাছে ইহা নৈর্ব্যক্তিক কারণ ইহার উদ্ভব "তৎস্বরূপ" থেকে যা আমাদের অহং-এর অতীত এবং কাজ করে শুধু তার বিশ্বগত অনুমতির দ্বারা। আমাদের সব কর্মে আমরা প্রবৃত্ত হই সমত্বের সহিত, কর্ম ও কর্মফলে বদ্ধ না হ'য়ে, পরতমের সহিত এক-তানে, বিশ্বাত্মকের সহিত একতানে, আমাদের কাজের জন্য পৃথক দায়িত্ব থাকে না, এবং সেজন্য তাদের সব প্রতিক্রিয়ার কোনো প্রভাবও আমাদের স্পর্শ করে না। এই যা আমরা দেখেছি কর্মমার্গের সার্থকতা তা-ই এই-ভাবে হ'য়ে ওঠে জ্ঞানমার্গের অনুষঙ্গ ও ফল।

পূর্ণজ্ঞান আমাদের আরো দেখায় যে স্বয়ম্ভূ আবার সর্ব-আনন্দময় যিনি জগৎ প্রকাশক, সকল সত্তা প্রকাশক সচ্চিদানন্দরূপে তাদের আরাধনা গ্রহণ করেন,--যেমন তিনি গ্রহণ করেন তাদের সব আস্পৃহার কাজ ও জ্ঞানের এষণা এবং তাদের দিকে নিম্নে নত হ'য়ে তাদের নিজের কাছে আকর্ষণ ক'রে সকলকে গ্রহণ করেন তাঁর ভাগবতসত্তার হর্ষের মধ্যে। তিনি যে আমাদের দিব্য আত্মা তা জেনে আমরা তাঁর সহিত এক হই,

যেমন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক হয় ঐ আলিঙ্গনের উল্লাসে। সকল সত্তার-ও মধ্যে তাঁকে জেনে, সর্বত্র প্রেমাস্পদের মহিমা ও সৌন্দর্য ও হর্ষ অনুভব করে আমরা আমাদের অন্তঃপুরুষকে রূপান্তরিত করি বিশ্বজনীন আনন্দের তীব্র ভাবাবেগ ও বিশ্বজনীন প্রেমের ব্যাপ্তিতে ও হর্ষে। এই যেসব আমরা দেখব ভক্তিমার্গের পরাকাষ্ঠা তা-ও হয়ে ওঠে জ্ঞানমার্গের অনুষঙ্গ ও ফল।

এইভাবে পূর্ণজ্ঞানের দ্বারা আমরা সব কিছুকে এক করি 'একম্'-এর মধ্যে। আমরা বিশ্বসঙ্গীতের সকল তানই গ্রহণ করি, সকল সুর গ্রহণ করি তা সে সব সুর মধুর বা কর্কশ হ'ক, আভাসনে ভাস্বর বা তমসাচ্ছন্ন হ'ক, শক্তিশালী বা অস্পষ্ট হ'ক, শোনা যাক অথবা শোনা না যাক, আর আমরা দেখি যে সব পরিবর্তিত হ'য়ে সমন্বিত হ'য়েছে সচ্চিদানন্দের অবিভাজ্য একতানের মধ্যে। জ্ঞান সামর্থ্য ও আনন্দও আনে। "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" (যে সর্বত্র একত্ব দেখে তার মোহই বা হবে কেমন করে শোকই বা আসবে কোথা থেকে?")

সপ্তদশ অধ্যায়

পুরুষ ও প্রকৃতি

পূর্ণজ্ঞানকে সমগ্রভাবে নিলে, ইহাই তার ফল; ইহার কাজ হ'ল আমাদের সত্তার বিভিন্ন তন্ত্রীগুলি নিয়ে বিশ্বসত্তার মধ্যে একত্র করা। ভগবান যেমন জগৎকে অধিগত করেন, আমরাও যদি চাই জগৎকে তেমন সুষ্ঠুভাবে অধিগত করতে আমাদের দিব্যভাবাপন্ন চেতনার মধ্যে, আমাদেরও জানতে হবে প্রতি বিষয়কে তার একান্ত সত্তাতে,—প্রথমে ইহা একাকী যেমন তেমনভাবে এবং দ্বিতীয়তঃ যে সকল তাকে সম্পূর্ণ করে সেই সকলের সহিত তার যোগে ; কারণ ভগবান এইভাবেই তাঁর সত্তাকে জগতের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন ও দেখেছেন। বিষয়সমূহকে অংশ হিসাবে, অপূর্ণ পদার্থ হিসাবে দেখা নিম্ন বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান। পরমার্থসৎ সর্বত্র বিরাজিত, সর্বত্রই তাঁকে দেখা ও পাওয়া চাই। প্রতি সান্তই অনন্ত এবং তাকে জানা ও বোধ করা চাই যেমন তার উপরভাসা সান্ত বাহ্যরূপে তেমন তার স্বকীয় অনন্ততাতে। কিন্তু জগৎকে ঐভাবে জানতে হ'লে, ইহাকে ঐভাবে দেখতে ও অনুভব করতে হলে, ইহা যে ঐরূপ সে সম্বন্ধে শুধু এক বুদ্ধিগত ভাবনা বা কল্পনা পাওয়াই যথেষ্ট নয়। দরকার একপ্রকার দিব্য দর্শন, দিব্য বোধ, দিব্য উল্লাস, আমাদের চেতনার বিষয়সমূহের সহিত আমাদের নিজেদের মিলনের অনুভূতি। ঐ অনুভূতিতে শুধু যে পরপার তা নয়, এপারেরও সবকিছু, শুধু যে সমগ্রতা অর্থাৎ সমষ্টিরূপী সর্ব তা নয়, সর্বের মধ্যে প্রতি জিনিষটি আমাদের কাছে হ'য়ে ওঠে আমাদের আত্মা, ভগবান, পরমার্থসৎ ও অনন্ত, সচ্চিদানন্দ। ভগবানের জগতে সম্পূর্ণ আনন্দের, মন ও হৃদয় ও সংকল্পের সম্পূর্ণ তৃপ্তির, চেতনার সম্পূর্ণ মুক্তির রহস্য ইহাই। ইহাই সেই পরমা অনুভূতি যা পাবার জন্য কলা ও কাব্য, এবং প্রত্যক্‌বৃত্ত ও পরাক্‌বৃত্ত জ্ঞানের এইসকল নানাবিধ প্রযত্ন, বিষয়সমূহকে অধিকার ও উপভোগ করার সকল কামনা ও চেষ্টা অল্পবিস্তর অজ্ঞানভাবে প্রবৃত্ত; বস্তুগুলির বিভিন্ন রূপ ও ধর্ম ও গুণ আয়ত্ত করার জন্য তাদের যে চেষ্টা তা শুধু এক প্রাথমিক কাজ কিন্তু ইহাতে গভীরতম তৃপ্তি আসে না যদি না এইসব বস্তুকে সুষ্ঠু ও একান্তভাবে আয়ত্তে এনে

তারা সেই অনন্ত সদ্‌বস্তুর বোধ লাভ করে যার বাহ্য প্রতীক এইসব বস্তু। যুক্তিবাদী মনে ও সাধারণ ইন্দ্রিয়-অনুভূতিতে একথা মনে হ'তে পারে শুধু কবির কল্পনা বা রহস্যপূর্ণ ভ্রম; কিন্তু যে একান্ত তৃপ্তি ও প্রকাশবোধ ইহা দেয়,—আর একমাত্র ইহা তা দিতে সক্ষম,—তা-ই বস্তুতঃ এক প্রমাণ যে ইহা এক মহত্তর সত্য; উহার দ্বারা আমরা সেই পরতর চেতনা ও দিব্যতর বোধ থেকে এক রশ্মি পাই যাতে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হবার জন্যই আমাদের আন্তর সত্তা অভিপ্রেত,—শুধু যদি আমরা তাতে সম্মত হই।

আমরা দেখেছি যে ভাগবত সত্তার শ্রেষ্ঠ তত্ত্বরাজি সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য। সাধারণতঃ বিচারশীল মন আমাদের বলে যে যা সকল অভিব্যক্তির অতীত শুধু তা-ই অনপেক্ষ, শুধু নীরূপ চিৎ-পুরুষই অনন্ত, শুধু কালাতীত, দেশাতীত, অক্ষর, নিশ্চল আত্মাই তার বিশ্রাম অবস্থায় একান্তভাবে সত্য; আর যদি আমরা আমাদের সাধনায় এই ভাবনা অনুসরণ করি ও ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই তাহ'লে ঐ প্রত্যক্‌বৃত্ত অনুভূতিতেই আমরা উপনীত হব, অন্যসব আমাদের কাছে মনে হবে মিথ্যা বা শুধু আপেক্ষিকভাবে সত্য। কিন্তু যদি আমরা শুরু করি বৃহত্তর ভাবনা থেকে, তাহ'লে এক পূর্ণতর সত্য ও বিশালতর অনুভূতি আমাদের নিকট উন্মুক্ত হয়। আমরা অনুভব করি যে কালাতীত, দেশাতীত অস্তিত্বের অক্ষর অবস্থা এক অনপেক্ষ ও অনন্ততত্ত্ব; কিন্তু ভাবগত সত্তার যে বিভাবে ইহা তার বিভিন্ন সামর্থ্য, গুণ ও আত্ম-সৃজনের বহির্বর্ষণকে সর্ব-আনন্দময়ভাবে অধিগত করে তার চিৎ-শক্তি ও সক্রিয় আনন্দও এক অনপেক্ষ ও অনন্ত তত্ত্ব—আর বস্তুতঃ ইহা সেই একই অনপেক্ষ ও অনন্ত তত্ত্ব, আর এত এক যে আমরা একই সাথে সমভাবে উপভোগ করতে সক্ষম হই দিব্য কালাতীত স্থৈর্য ও প্রশান্তি এবং সক্রিয়তার দিব্য কালাধিকারী আনন্দ আর তা হয় স্বচ্ছন্দভাবে, অনন্তভাবে, তাতে বন্ধন থাকে না, অথবা অস্থিরতা ও কষ্টভোগের মধ্যেও পড়তে হয় না। এই যে সক্রিয়তা যা অক্ষরের মধ্যে আত্ম-নিহিত ও এক অর্থে অন্তরে প্রত্যাহৃত ও গুপ্ত আর বিশ্বে প্রকাশিত তার সকল তত্ত্ব সম্বন্ধেই আমরা ঐ একই অনুভূতি পেতে এবং তাদের অনন্তগুণ ও সামর্থ্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হই।

এই তত্ত্বগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হ'ল পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতভাব যা ঐক্যে পর্যবসিত হয়; এই দ্বৈতভাব সম্বন্ধে আমরা কর্মযোগে

আগে বলেছি। কিন্তু জ্ঞানযোগের পক্ষেও ইহা সমানই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনসমূহে এই ভাগটি সুস্পষ্টভাবে করা হয়েছিল; কিন্তু ইহার ভিত্তি হ'ল ঐক্যের মধ্যে ব্যবহারিক দ্বৈতভাবের চিরন্তন তথ্য যার উপর জগদ্-অভিব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের যেমন দৃষ্টি সেই অনুযায়ী ইহার বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। বেদান্তবাদীরা নাম দিয়েছিল---আত্মা ও মায়া; তাদের পূর্বানুরাগ অনুযায়ী কাহারও কাছে আত্মার অর্থ অক্ষর তত্ত্ব আর মায়া আত্মার সেই সামর্থ্য যার বলে আত্মা নিজের উপর বিশ্বভ্রান্তি আরোপ করে; অথবা অন্য কাহারও কাছে আত্মার অর্থ ভাগবত সত্তা, আর মায়ার অর্থ চিৎ-সত্তা ও চিৎ-শক্তির প্রকৃতি যার দ্বারা ভগবান নিজেকে মূর্ত করেন পুরুষ রূপে ও বিষয়সমূহের রূপে: অন্য কেউ নাম দিল---ঈশ্বর ও শক্তি, প্রভু ও তাঁর শক্তি, তাঁর বিশ্বসামর্থ্য। সাংখ্যের বিশ্লেষণমূলক দর্শন বলত যে তাদের দ্বৈতভাব চিরন্তন, একত্বের কোনো সম্ভাবনা নেই, ইহাতে স্বীকার করা হ'ত শুধু মিলন ও বিচ্ছেদের সম্পর্ক যার দ্বারা প্রকৃতির বিশ্বক্রিয়া পুরুষের জন্য আরম্ভ হয়, চলতে থাকে অথবা নিবৃত্ত হয়; কারণ পুরুষ নিষ্ক্রিয় চিন্ময় সত্তা---ইহা স্বরূপে একই এবং চিরকাল অক্ষর,---প্রকৃতি হ'ল নিসর্গের সক্রিয়া শক্তি যা তার গতির দ্বারা বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃজন ও পালন করে এবং স্থিতির মধ্যে মগ্ন হ'য়ে ইহার লয় সাধন করে। এই সব দার্শনিক পার্থক্য ছেড়ে দিলে, আমরা সেই আদি মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিতে আসি যেখান থেকে বাস্তবিকই সকলের আরম্ভ অর্থাৎ এই অনুভূতি যে সকল বিশ্বের না হ'লেও সকল প্রাণীর, সকল মনুষ্যের সত্তাতে দুইটি তত্ত্ব বিদ্যমান---এক দ্বৈতসত্তা, প্রকৃতি ও পুরুষ।

এই দ্বৈত-ভাব স্বতঃসিদ্ধ। আদৌ কোনো দার্শনিক বিচার না ক'রেই, শুধু অভিজ্ঞতাবলেই আমরা সকলে ইহা দেখতে পাই, যদিও ইহার কোনো আঁটসাঁট বর্ণনা দেবার চেষ্টা আমরা করি না। যে আত্যন্তিক জড়বাদে পুরুষকে অস্বীকার করা হয়, অথবা বলা হয় যে ইহা শুধু এক প্রাকৃতিক ঘটনার অল্পবিস্তর ভ্রান্তিপূর্ণ ফল যখন ইহা সক্রিয় হয় স্থূল মস্তিষ্কের সেই দুর্বোধ্য বিষয়ের উপর যাকে আমরা চেতনা বা মন বলি, কিন্তু যা বাস্তবিকই এক প্রকার জটিল স্নায়বিক আক্ষেপের বেশী আর কিছু নয়, এমনকি সেই জড়বাদও এই দ্বৈতভাবের ব্যবহারিক তথ্যকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। কিভাবে ইহার উৎপত্তি হ'ল সে কথায় আদৌ কিছু যায় আসে না; ইহা অনস্বীকার্য যে ইহা আছে, ইহা আমাদের সমগ্র জীবনের নির্ধা-

রক, আর আমরা যে মানুষ, আমাদের সংকল্প, বুদ্ধি আছে, এক আন্তর জীবন আছে যার জন্যই আমাদের সকল সুখ ও দুঃখভোগ আমাদের কাছে এই একটি জিনিসই বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের সমগ্র সমস্যাই এই একটি-মাত্র প্রশ্নে পর্যবসিত হয়,—"এই যে অন্তঃপুরুষ ও প্রকৃতি যারা পরস্পরের মুখোমুখি বিদ্যমান—একদিকে এই প্রকৃতি, এই ব্যক্তিগত ও বিশ্বক্রিয়া যা চেষ্টা করে অন্তঃপুরুষের উপর তার প্রভাব ফেলতে, তাকে অধিগত, নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করতে, আর অন্যদিকে এই অন্তঃপুরুষ যা এক রহস্য-ময় ভাবে অনুভব করে যে তার স্বাধীনতা আছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে, সে যা হয় ও করে তার জন্য তার দায়িত্ব আছে আর সেজন্য সে চেষ্টা করে নিজের ও জগতের প্রকৃতির সহিত মোকাবিলা করতে, ইহাকে নিয়ন্ত্রণ, অধিগত ও উপভোগ করতে অথবা হয়ত তা বর্জন ক'রে তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে,—এদের নিয়ে আমরা কি করব?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে আমাদের জানতে হবে,—জানতে হবে অন্তঃপুরুষ কি করতে সক্ষম, জানতে হবে নিজেকে নিয়ে সে কি করতে সক্ষম, আরো জানতে হবে প্রকৃতি ও জগতকে নিয়ে সে কি করতে সক্ষম। মানবের সমগ্র দর্শন, ধর্ম, প্রাকৃতবিজ্ঞান বাস্তবিকই আর কিছু নয়, সেসব শুধু এক প্রয়াস যাতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় সব সঠিক তথ্য পাওয়া যায় এবং আমাদের জ্ঞানের ক্ষমতামতো সন্তোষজনকভাবে আমা-দের জীবনের সমস্যার সমাধান হয়।

এই যে আমাদের অপরা ও বিক্ষুব্ধ প্রকৃতি ও সত্তার সহিত আমাদের বর্তমান সংঘর্ষ ও তাদের অধীনতা তা থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাবার আশা জাগে যখন আমরা অনুভব করি যে আমাদের পুরুষ-সত্তার দুইটি স্থিতি আছে—একটি নিম্ন, বিক্ষুব্ধ ও অধীনস্থ অপরটি উচ্চ, পরম, অক্ষুব্ধ ও প্রভুত্বপূর্ণ; একটি মনের মধ্যে দোলায়মান, অন্যটি চিৎ-পুরুষের মধ্যে প্রশান্ত; ইহাদের কথা ধর্ম ও দর্শন স্বীকার করে কিন্তু আধুনিক ভাবনা চেষ্টা করেছে তা অস্বীকার করতে। শুধু নিষ্কৃতি লাভের নয়, এক সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ও বিজয়ী সমাধানের আশার উদয় হয় যখন আমরা অনুভব করি—যেমন কোনো কোনো ধর্ম ও দর্শন স্বীকার করে কিন্তু অন্য সব মনে হয় অস্বীকার করে—যে অন্তঃপুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতভাবাপন্ন ঐক্যের মধ্যেও এক নিম্ন, সাধারণ মানবীয় পাদ ও এক উচ্চতর দিব্য পাদ বিদ্যমান; এই দিব্য পাদের মধ্যে দ্বৈতভাবের অবস্থাগুলি পরাবর্তিত হয়

এবং অন্তঃপুরুষ তা-ই হয় যা হবার জন্য সে এখন শুধু সংগ্রাম ও আস্পৃহা করে অর্থাৎ নিজের প্রকৃতির প্রভু হয়, স্বাধীন হয় এবং ভগবানের সহিত মিলনে জগৎ-প্রকৃতিরও অধিকারী হয়। এই সম্ভাবনাগুলি সম্বন্ধে আমাদের যেমন ভাবনা হবে, সেই অনুযায়ী সমাধান সাধনেও আমাদের চেষ্টা হবে।

যখন অন্তঃপুরুষ মনের মধ্যে সংবৃত্ত থাকে, মানসিক ভাবনা, ইন্দ্রিয়-সংবিৎ, ভাবাবেগ, জগতের প্রাণিক ও ভৌতিক সব আঘাত গ্রহণ ও সেসবে যান্ত্রিক প্রত্যাঘাত প্রভৃতির সাধারণ ঘটনার দ্বারা অধিগত থাকে তখন অন্তঃপুরুষ প্রকৃতির অধীন। এমনকি তার সংকল্প ও বুদ্ধিও তার মানসিক প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয় আর এইসব এমনকি আরো বেশী নির্ধারিত হয় তার পরিবেশের মানসিক প্রকৃতির দ্বারা যা ব্যষ্টি মানসিকতার উপর সূক্ষ্ম ও নিগূঢ়ভাবে কাজ ক'রে তাকে অভিভূত করে; সুতরাং নিজের অভিজ্ঞতা ও ক্রিয়াকে নিয়মাধীন, নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করার জন্য তার যে চেষ্টা তার মধ্যে এক ভ্রান্তি রয়ে যায়, কারণ সে যখন ভাবে যে সে কাজ করছে, তখন প্রকৃতপক্ষে কাজ করছে প্রকৃতি, যা সব সে চিন্তা করে, সংকল্প করে ও সম্পাদন করে, আসলে সেসব নির্ধারণ করে প্রকৃতি। তার মধ্যে যদি সততই এই জ্ঞান না থাকত যে সে আছে, যে সে নিজে নিজেই বিদ্যমান, সে দেহ বা প্রাণ নয়, বরং অন্য কিছু যা বিশ্বঅভিজ্ঞতাকে নির্ধারণ না করলেও অন্ততঃ তা গ্রহণ ও স্বীকার করে তাহ'লে শেষ পর্যন্ত সে বাধ্য হ'ত এই মনে করতে যে প্রকৃতিই সব এবং অন্তঃপুরুষ এক ভ্রান্তি। এই সিদ্ধান্তই আধুনিক জড়বাদ স্বীকার করে, শূন্যবাদী বৌদ্ধমতও এই সিদ্ধান্তে এসেছিল; এই উভয়সংকট দেখে সাংখ্য তার সমাধান করল এই ব'লে যে বাস্তবিকপক্ষে পুরুষ প্রকৃতির নির্ধারণগুলি শুধু প্রতিফলিত করে, সে নিজে কিছু নির্ধারণ করে না, সে প্রভু নয়, তবে সেইসবকে প্রতিফলিত করতে অস্বীকার করে সে নিজে ফিরে যেতে পারে শাশ্বত নিশ্চলতা ও প্রশান্তির মধ্যে। অন্য এমন সব সমাধানও আছে যেসব ঐ একই ব্যবহারিক সিদ্ধান্তে আসে বটে, কিন্তু অন্য প্রান্ত থেকে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্রান্ত থেকে তারা বলে যে প্রকৃতি ভ্রম বা মায়া অথবা পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনিত্য এবং তারা আমাদের কাছে এমন এক অতীত অবস্থার নির্দেশ দেয় যেখানে তাদের দ্বৈতভাব থাকে না, হয় তারা উভয়ই চিরন্তন ও অনির্বচনীয় কিছুর মধ্যে বিলীন হয়, নয় সক্রিয় তত্ত্বটিকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়। যদিও এই সব সমাধানে মানবজাতির বৃহত্তর আশার এবং গভীর সংবেগ ও

আস্পৃহার তৃপ্তি হয় না, তবু তাদের সীমার মধ্যে তারা যুক্তিসিদ্ধ; কারণ তারা পায় পরমার্থসৎকে তার স্বরূপে, অথবা অন্তঃপুরুষের পৃথক একান্ততায়, যদিও তারা পরমার্থসতের সেই সব বহু আনন্দময় আনন্ত্য বর্জন করে যা মানবের মাঝে চিরন্তন অন্বেষুর কাছে আনা হয় যখন পুরুষ তার দিব্য সত্তায় প্রকৃতির সত্যকার অধিকার পায়।

চিৎ-পুরুষের মধ্যে উন্নীত হ'লে পুরুষ আর প্রকৃতির অধীন থাকে না, সে এই মানসিক ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে থাকে। সে ঊর্ধ্বে থাকতে পারে বিচ্ছিন্ন ও বিবিক্ত হ'য়ে, উদাসীন অর্থাৎ নিস্পৃহভাবে ঊর্ধ্বে আসীন হতে পারে, অথবা নিজের সম্বন্ধে তার নির্বিশেষ, তার একাগ্র আধ্যাত্মিক অনুভূতির তন্ময়করা প্রশান্তি বা আনন্দের দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে তাতে লীন হয়ে থাকতে পারে; তখন আমাদের কাজ হবে প্রকৃতি ও বিশ্বসত্তা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে অতিস্থিত হওয়া, দিব্য ও নিরঙ্কুশ প্রাপ্তির দ্বারা জয় করা নয়। কিন্তু চিৎ-পুরুষ, ভগবান যে শুধু প্রকৃতির ঊর্ধ্বে তা নয়, তিনি প্রকৃতি ও বিশ্বের ঈশ্বরও বটে; পুরুষের কর্তব্য তার আধ্যাত্মিক স্থিতিতে উঠে ভগবানের সহিত তার ঐক্যের দ্বারা অন্ততঃ সেই একই ঈশনা লাভে সমর্থ হওয়া। নিজের প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হওয়া তার অবশ্য কর্তব্য কিন্তু তা শুধু শান্তির মধ্যে নয়, বা এই প্রকৃতিকে জোর করে নিবৃত্ত করে নয়, তা করা চাই তার ক্রীড়া ও সক্রিয়তাকে অপ্রতিহতভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। নিম্ন স্থিতিতে ইহা সম্ভব নয়, কারণ পুরুষ কাজ করে মনের মাধ্যমে, আর মন কাজ করতে পারে শুধু এক একটি জীবের মধ্য দিয়ে ও আংশিকভাবে সেই বিশ্বপ্রকৃতিকে তুষ্টির সহিত মান্য ক'রে অথবা ক্ষোভের সহিত তার অধীন হ'য়ে যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে দিব্যজ্ঞান ও দিব্যসংকল্প বিশ্বের মধ্যে সাধিত হয়। কিন্তু চিৎ-পুরুষ জ্ঞান ও সংকল্পের অধিকারী, সে তাদের উৎস ও কারণ, তাদের অধীন নয়; সুতরাং যে অনুপাতে পুরুষ তার দিব্য অথবা আধ্যাত্মিক সত্তা গ্রহণ করে, সেই অনুপাতে সে তার প্রকৃতির গতিরও উপর নিয়ন্ত্রণও গ্রহণ করে। প্রাচীন ভাষায়, সে হয়ে ওঠে স্বরাট্, অর্থাৎ মুক্ত এবং নিজের জীবন ও সত্তা রাজত্বের আত্ম-শাসক। কিন্তু তার পরিবেশের, তার জগতের উপরও তার নিয়ন্ত্রণ বর্ধিত হয়। কিন্তু সে ইহা করতে পারে শুধু নিজেকে বিশ্বভাবাপন্ন ক'রে; কারণ দিব্য ও বিশ্বগত সংকল্পকেই তার প্রকাশ করা চাই জগতের উপর তার ক্রিয়ার মধ্যে। প্রথমে তার কর্তব্য হ'ল মনের মতো ক্ষুদ্র বিভক্ত ব্যক্তি-সঙ্ঘের

শারীরিক, প্রাণিক, ইন্দ্রিয়গত, ভাবগত, বুদ্ধিগত দৃষ্টির দ্বারা সীমাবদ্ধ না হ'য়ে তার চেতনা প্রসারিত করা এবং বিশ্বকে দেখা নিজের মধ্যে; তার নিজের বুদ্ধিগত সব ভাবনা, কামনা ও চেষ্টা, অভিরুচি, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, সংবেগ আঁকড়ে না থেকে তার গ্রহণ করা উচিত সব জগৎ-সত্য, জগৎ-ক্রিয়াশক্তি, জগৎ-প্রবণতা, জগদ্‌-উদ্দেশ্য; তার নিজের যেসব বুদ্ধিগত ভাবনা, কামনা ইত্যাদি থাকে সেসবকে বিশ্বভাবের সহিত সুসঙ্গত করা আবশ্যক। তারপর তার কর্তব্য হ'ল, তার জ্ঞান ও সংকল্পকে তাদের উৎসেই নিবেদন করা দিব্য জ্ঞান ও দিব্য সংকল্পের নিকট এবং এইভাবে নিবেদনের মধ্য দিয়ে লয়ে উপনীত হওয়া যাতে তার ব্যক্তিগত আলো মিলিয়ে যায় দিব্য আলোকের মধ্যে, তার ব্যক্তিগত প্রবর্তনার বিনাশ হয় দিব্য প্রবর্তনার মধ্যে। প্রথম দরকার অনন্তের সহিত একতান হওয়া, ভগবানের সহিত সুসমঞ্জস হওয়া এবং পরে দরকার অনন্তের সহিত মিলিত হওয়া, ভগবানের মধ্যে গৃহীত হওয়া—তবেই সম্ভব হবে পূর্ণ ক্ষমতা ও ঈশনা, আর ঠিক ইহাই আধ্যাত্মিক জীবন ও আধ্যাত্মিক সত্তার আসল প্রকৃতি।

পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও প্রভুত্বের দিকে পুরুষের যে গতি তাতে প্রকৃতির দিকে পুরুষ যেসব বিভিন্ন ভাব নিতে পারে তার সন্ধান পাওয়া যাবে গীতায় পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য করা হয়েছে তা থেকে। গীতা বলে, পুরুষ সাক্ষী, ভর্তা, অনুমন্তা, জ্ঞাতা, ঈশ্বর, ভোক্তা; প্রকৃতি কার্য সাধন করে, ইহা এক সক্রিয় তত্ত্ব এবং পুরুষের ভাব অনুযায়ী ইহার কোনো না কোনো ক্রিয়া থাকবেই। ইচ্ছা করলে পুরুষ শুদ্ধ সাক্ষীর স্থিতি নিতে পারে; প্রকৃতির ক্রিয়াকে সে দেখতে পারে এমন এক বিষয় হিসাবে যা থেকে সে পৃথক হ'য়ে অবস্থিত; ইহা শুধু লক্ষ্য করে, কিন্তু নিজে কোনো অংশ নেয় না। এই যে শান্ত থাকার সামর্থ্য তার গুরুত্ব আমরা দেখেছি, ইহা সেই প্রত্যাহার ক্রিয়ার ভিত্তি যার দ্বারা আমরা দেহ, প্রাণ, মানসিক ক্রিয়া, ভাবনা, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, ভাবাবেগ প্রভৃতি সব কিছু সম্বন্ধে বলতে পারি, "প্রাণ, মন ও দেহের মধ্যে যা সক্রিয় তা প্রকৃতি, ইহা আমি নয়, ইহা এমনকি আমরাও নয়," আর এই ভাবে আমরা পাই এই সব বিষয় থেকে পুরুষের বিচ্ছিন্নতা এবং তাদের উপশম। অতএব এইভাবে যে ত্যাগ বা অন্ততঃ অংশ না নেওয়ার মনোভাব আসে তা তামসিক হ'তে পারে যখন প্রাকৃত ক্রিয়া থাকাকালীন তা মাথা পেতে নিশ্চেষ্টভাবে সহ্য

করা হয়, ইহা রাজসিক হ'তে পারে যদি তাতে বিরক্তি, ঘৃণা বা জুগুপ্সার ভাব থাকে, সাত্ত্বিক হ'তে পারে যদি পুরুষের বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে ভাস্বর বুদ্ধি এবং বিবিক্ততা ও বিশ্রামের শান্তি ও হর্ষ থাকে, তবে তার সহিত এক সম ও নৈর্ব্যক্তিক আনন্দও থাকতে পারে, এ আনন্দ যেন অভিনয় দর্শকের আনন্দ, দর্শক আনন্দ পায় কিন্তু আসক্ত হয় না, সে যেকোনো সময়ই উঠে পড়ে সমানই আনন্দের সহিত অভিনয় ছেড়ে চলে যেতে পারে। সাক্ষীর শ্রেষ্ঠ মনোভাব হ'ল বিশ্বসৃষ্টির ঘটনাসমূহের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ আসক্তি-শূন্যতা ও মুক্তি।

শুদ্ধ সাক্ষী হিসাবে, পুরুষ অস্বীকার করে প্রকৃতির ভর্তা বা পোষক হ'য়ে কাজ করতে। "ভর্তা" অন্য কিছু, ভগবান বা শক্তি বা মায়া, কিন্তু পুরুষ নয়, পুরুষ শুধু তার সাক্ষী—চেতনার উপর প্রাকৃত ক্রিয়ার প্রতিবিম্ব পড়তে দেয়, কিন্তু তা পালন করার বা বজায় রাখার কোনো দায়িত্ব নেয় না। সে এই কথা বলে না, "এই সব আমার মধ্যে আছে, আমি এদের পালন করি, ইহারা আমার সত্তার ক্রিয়া"; বড় জোর সে বলে, "এই সব আমার উপর আরোপিত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবিকই তারা আমার বাহিরের জিনিষ।" অস্তিত্বের মধ্যে স্পষ্ট ও সত্যকার দ্বৈত না থাকলে, ইহা বিষয়-টির সমগ্র সত্য হ'তে পারে না; পুরুষ ভর্তাও বটে, যে ক্রিয়া-শক্তি বিশ্বের দৃশ্যাবলী উদ্ঘাটিত করে আর তার বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তি চালনা করে তাকে পুরুষ তার সত্তার মধ্যে ধারণ করে। যখন পুরুষ ভর্তার এই কাজ স্বীকার করে, তখন সে তা করতে পারে নিষ্ক্রিয়ভাবে ও আসক্তিশূন্য হ'য়ে আর এই অনুভব করে যে সে শক্তি দেয় কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করে না। নিয়ন্ত্রণ করে অন্য কেউ,—ভগবান অথবা শক্তি অথবা মায়ার স্বরূপ; পুরুষ শুধু নিস্পৃহভাবে ভরণ করে তবে যতক্ষণ না ক'রে নয়, হয়ত ততক্ষণ ভরণ করে যতক্ষণ তার অতীত অনুমতির ও ক্রিয়াশক্তিতে তার আগ্রহের শক্তি বজায় থাকে ও শেষ হ'তে চায় না। কিন্তু ভর্তার মনোভাব সম্পূর্ণ স্বীকার করা হ'লে, বুঝতে হবে যে সক্রিয় ব্রহ্মের ও বিশ্বসত্তার তার আনন্দের সহিত তাদাত্ম্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে। কারণ পুরুষ হ'য়ে উঠেছে সক্রিয় অনুমতিদাতা।

সাক্ষীর ভাবেও এক প্রকার অনুমতি আছে, তবে ইহা নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট এবং ইহার সম্বন্ধে কোনো একান্ততা নেই; কিন্তু যদি সে ভরণ করতে সম্পূর্ণ রাজী হয়, তাহ'লে অনুমতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে যদিও পুরুষ রাজী

হয় প্রকৃতির সকল ক্রিয়াশক্তিকে শুধু প্রতিফলিত, ভরণ ও সেইভাবে পালন করতে এবং তার বেশী সে কিছু করে না, নির্ধারণ করে না, নির্বাচন করে না, এই বিশ্বাস করে যে যা নির্বাচন ও নির্ধারণ করে তা ভগবান বা শক্তি স্বয়ং বা কোনো জ্ঞান-সংকল্প, আর পুরুষ শুধু সাক্ষী ও ভর্তা এবং এই-ভাবে অনুমতিদাতা, "অনুমন্তা" কিন্তু জ্ঞান ও সংকল্পের অধিকারী ও পরিচালক, "জ্ঞাতা ঈশ্বরঃ" সে নয়। কিন্তু যদি তার অভ্যাসই হয় তার কাছে যা দেওয়া হয় তার মধ্য থেকে নির্বাচন ও বর্জন করা, তাহ'লে সে নির্ধারক; আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয় অনুমতি হ'য়ে উঠেছে সম্পূর্ণ সক্রিয় অনুমতি এবং হ'তে চলেছে সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ।

সক্রিয় নিয়ন্তা সে হয়ে ওঠে যখন প্রকৃতির জ্ঞাতা, ঈশ্বর ও ভোক্তা হিসাবে তার যে সম্পূর্ণ কাজ তা সে স্বীকার করে। জ্ঞাতা হিসাবে পুরুষ সেই শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী যা কাজ করে ও নির্ধারণ করে, সে সত্তার সেইসব বিভিন্ন মূল্যগুলি দেখে যেগুলি বিশ্বের মধ্যে নিজেদের চরি-তার্থ করছে, সে নিয়তির রহস্যের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু শক্তি নিজেই জ্ঞানের দ্বারা নির্ধারিত হয়, জ্ঞানই তার আদি ও উৎস, তার বিভিন্ন মূল্যায়-নের মাননির্দেশক ও সব মূল্যের ফলদায়ক। অতএব যে অনুপাতে পুরুষ আবার জ্ঞাতা হয় সেই অনুপাতে সে আবার ক্রিয়ার নিয়ন্তাও হয়। আবার ইহাও সে করতে পারে না সক্রিয় "ভোক্তা" না হয়ে। অবর সত্তায় ভোগ দুই প্রকারের––সদর্থক ও নঙর্থক, যা ইন্দ্রিয়সংবিতের তড়িৎপ্রবাহের মধ্যে রূপান্তরিত হয় সুখে ও দুঃখে, কিন্তু পরসত্তায় ইহা আত্ম-অভিব্যক্তিতে দিব্য আনন্দের এক সক্রিয় সম উপভোগ। ইহাতে মুক্তির কোনো হানি নেই, অজ্ঞানময় আসক্তির মধ্যেও কোনো অবতরণ নেই। যে জীব তার অন্তঃপুরুষে মুক্ত সে জানে যে ভগবান প্রকৃতির ক্রিয়ার ঈশ্বর, মায়া তাঁর জ্ঞান-সংকল্প যা সব কিছু নির্ধারণ ও সম্পাদন করে, আর শক্তি এই দ্বিবিধ দিব্যসামর্থ্যের সংকল্পের দিক যার মধ্যে জ্ঞান সর্বদাই বর্তমান ও কর্মরত; নিজের সম্বন্ধে সে জানে, এমনকি ব্যষ্টি জীব হিসাবে সে জানে যে সে দিব্য সত্তার এক কেন্দ্র, গীতার কথায় ঈশ্বরের অংশ, আর এইভাবে প্রকৃ-তির সেই ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে যা সে অবলোকন, ভরণ, অনুমোদন ও ভোগ করে, জানে এবং জ্ঞানের নির্ধারক সামর্থ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে; আর যখন সে নিজেকে বিশ্বভাবাপন্ন করে, তখন তার জ্ঞান প্রতিফলিত করে শুধু দিব্যজ্ঞান, তার সংকল্প সাধন করে শুধু দিব্যসংকল্প, সে ভোগ

করে শুধু দিব্য আনন্দ, অজ্ঞানময় ব্যক্তিগত তৃপ্তি নয়। এমনকি প্রতি-নিধিরূপে বিশ্বসত্তার উপভোগ ও আনন্দের মধ্যেও সীমিত ব্যক্তিসত্ত্ব অধি-কার ক'রে, ত্যাগ করে পুরুষ এইভাবে তার স্বাধীনতা বজায় রাখে। এই পরতর স্থিতিতে সে সম্পূর্ণভাবে নিয়েছে পুরুষ ও প্রকৃতির বিভিন্ন সত্যকার সব সম্পর্ক।

সচ্চিদানন্দের সত্তা থেকেই পুরুষ ও প্রকৃতির উদ্ভব—তাদের মিলনে ও দ্বৈতভাবে। আত্ম-সচেতন অস্তিত্ব হ'ল সত্তার মূল স্বরূপ; ইহাই সৎ বা পুরুষ; আত্ম-সচেতন অস্তিত্বের সামর্থ্য—তা ইহা নিজের মধ্যে নিবৃত্ত থাকুক বা তার চেতনা ও শক্তির, তার জ্ঞান ও তার সংকল্পের, চিৎ ও তপসের, চিৎ ও তার শক্তির বিভিন্ন কার্যে সক্রিয় হ'ক—ইহাই প্রকৃতি। সত্তার আনন্দ হ'ল এই চিন্ময় সত্তা ও চিন্ময়ী শক্তির মিলনের শাশ্বত সত্য, তা নিজের মধ্যে তন্ময় থাকুক আর না হয় তার এই দুই বিভাবের অচ্ছেদ্য দ্বৈতভাবে বিলসিত হ'ক—লোকসমূহের উদ্ঘাটন ও তাদের অবলোকন করা, তাদের মধ্যে ক্রিয়াসাধন ও ঐ ক্রিয়া ধারণ করা বিভিন্ন কর্ম নিষ্পাদন করা এবং অনুমতি দেওয়া যার অভাবে প্রকৃতির শক্তি কাজ করতে অক্ষম, জ্ঞান ও সংকল্প নিষ্পাদন ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং জ্ঞান-শক্তি ও সংকল্প শক্তির নির্ধারণসমূহ জানা ও নিয়ন্ত্রণ করা, উপভোগের সম্পদ সরবরাহ করা ও উপভোগ করা—পুরুষ যে প্রকৃতির অধিকারী, দ্রষ্টা জ্ঞাতা ঈশ্বর, আর প্রকৃতি যে সত্তা প্রকাশে, সংকল্প সাধনে, আত্ম-জ্ঞানের তৃপ্তিসাধনে, পুরুষের সত্তার আনন্দ উৎপাদনে সক্রিয়। এই যা আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি সত্তার স্বরূপের উপর তাহাই পুরুষের সহিত প্রকৃতির পরম ও সার্বিক সম্পর্ক। স্বরূপে পুরুষের একান্ত আনন্দ এবং এই ভিত্তির উপর প্রকৃতিতে পুরুষের একান্ত আনন্দ—ইহারাই এই সম্পর্কের দিব্য সার্থকতা।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পুরুষ ও তার মুক্তি

এখন আমাদের থেমে বিবেচনা করতে হবে, এই যে আমরা পুরুষ ও প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পর্ক স্বীকার করলাম তাতে আমরা কি কি বিষয়ে আবদ্ধ হ'লাম; কারণ ইহার অর্থ এই যে মানবজাতির যেসব সাধারণ লক্ষ্য তার কোনোটিই আমাদের সাধনার যোগের উদ্দেশ্যের অনুর্ভুক্ত নয়। আমাদের পার্থিব জীবন বর্তমানে যা তা আমাদের যোগ স্বীকার করে না, অথবা কোনোরূপ নৈতিক উৎকর্ষে বা ধর্মের উল্লাসে বা পরপারের কোনো স্বর্গে ইহা তৃপ্ত থাকতে পারে না অথবা সত্তার তেমন কোনো লয়সাধনেও ইহা তৃপ্ত হ'তে পারে না যার দ্বারা জীবনের অশান্তি সন্তোষজনকভাবে দূর করতে পারা যায়। আমাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন হ'য়ে ওঠে; আমাদের লক্ষ্য শুধু কোনো অহং-ভাবে ও পার্থিবসত্তাতে বাস করা নয়, আমাদের লক্ষ্য অনন্ত ভাগবতসত্তার মধ্যে, ভগবানের মধ্যে বাস করা, তবে সেই সাথে প্রকৃতি থেকে, আমাদের মানবভাইদের কাছ থেকে, পৃথিবী ও পার্থিব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে—ঠিক যেমন ভগবান আমাদের কাছ থেকে ও পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকেন না। জগৎ ও প্রকৃতি ও এই সকল সত্তার সহিত সম্পর্কযুক্ত হ'য়েও তিনি অবস্থান করেন, তবে এমন সামর্থ্য, স্বাতন্ত্র্য ও আত্মজ্ঞানের সহিত যা একান্ত ও অবিচ্ছেদ্য। আমাদের মুক্তি ও সিদ্ধির অর্থ অবিদ্যা, বন্ধন ও দুর্বলতা অতিক্রম করা এবং দিব্যসামর্থ্য, স্বাতন্ত্র্য ও আত্মজ্ঞান সহ জগৎ ও প্রকৃতির সহিত সম্পর্কে তাঁর মধ্যে বাস করা। কারণ সৃষ্টির সহিত পুরুষের সম্পর্কের পরাকাষ্ঠা হ'ল পুরুষের দ্বারা প্রকৃতিকে অধিগত করা যখন পুরুষ আর অবিদ্যাচ্ছন্ন নয় ও প্রকৃতির অধীন নয় বরং যখন সে তার ব্যক্ত সত্তাকে জানে, অতিক্রম করে, উপভোগ ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার আত্মপ্রকাশ কি হবে তা সে নির্ধারণ করে বিপুল ও স্বচ্ছন্দভাবে।

পুরুষের বিশ্বজন্ম ও সম্ভূতির মধ্যে প্রকৃতির সহিত তার খেলার সব কিছুরই অর্থ এই যে এক একত্ব তার নিজের দ্বৈতভাবের বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বার করছে। সর্বত্রই এক সচ্চিদানন্দ, যিনি স্বয়ম্ভূ, অসীম,

এমন ঐক্য যা তার নিজের বৈচিত্র্যের চরম আনন্ত্যের দ্বারা বিনষ্ট হয় না---ইহাই সত্তার মূল সত্য, ইহার জন্যই আমাদের জ্ঞানের এষণা এবং ইহাতেই আমাদের প্রত্যক্‌রত্ত জীবনের পরিণতি। ইহা থেকেই অপর সকল সত্যের উৎপত্তি, ইহারই উপর তারা প্রতিষ্ঠিত, ইহার দ্বারাই প্রতিমুহূর্তে তাদের অস্তিত্ব সম্ভবপর এবং শেষ অবধি ইহাতেই তারা নিজেদের ও পরস্পরকে জানতে সক্ষম, আর সমন্বিত, সুসমঞ্জস ও সার্থক হয়। জগতের সকল সম্পর্কই---এমনকি সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে পীড়াদায়ক আপতিক বৈষম্যগুলিও এমন কিছুর সম্পর্ক যা তার নিজের বিশ্বসত্তার মধ্যে নিজের কাছে শাশ্বত; বিভিন্ন অসম্বন্ধ সত্তা আকস্মিকভাবে অথবা বিশ্ব-অস্তিত্বের কোনো যান্ত্রিক রীতির দরুণ মিলেছে এবং তাদের সংঘর্ষই এই সব সম্পর্ক,---তা কোথাও বা কোনো সময়ই ঠিক নয়। সুতরাং একত্বের এই শাশ্বত তথ্যের পুনর্প্রাপ্তিই আমাদের আত্মজ্ঞানের মূল কাজ; ইহার মধ্যে বাস করাই যে আমাদের সত্তাকে আন্তর ভাবে অধিগত করার এবং জগতের সহিত আমাদের সঠিক ও আদর্শ সম্পর্কগুলির ফলপ্রসূ তত্ত্ব তা নিশ্চিত। এই জন্যই একত্বের উপর আমাদের সবচেয়ে বেশী ক'রে জোর দিতে হয়েছে এই ব'লে যে ইহাই আমাদের জ্ঞানযোগের লক্ষ্য, এবং এক হিসাবে সমগ্র লক্ষ্য।

কিন্তু সর্বত্রই এবং সকল লোকেই এই ঐক্য নিজেকে বিলসিত করে দ্বৈতভাবের এক কার্যসাধক বা ব্যবহারিক সত্যের দ্বারা। সনাতন হ'ল এক অনন্ত চিন্ময় সন্মাত্র, পুরুষ, ইহা নিশ্চেতন ও যান্ত্রিক কিছু নয়; ঐক্যের সাম্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত স্বীয় চিন্ময় সত্তার শক্তির আনন্দের মধ্যে ইহা নিত্য অবস্থিত; কিন্তু বিশ্বের মধ্যে বিচিত্র সৃজনশীল আত্মানুভূতির সহিত ক্রীড়ারত তার চিন্ময়সত্তার শক্তির সমানই শাশ্বত আনন্দের মধ্যেও ইহা অবস্থিত। ঠিক যেমন আমরা নিজেরা জানি বা জানতে পারি যে আমরা সর্বদাই কালাতীত, নামাতীত, চিরন্তন কিছু যাকে আমরা আত্মা বলি এবং যা আমরা যেসব সেসবের ঐক্যস্বরূপ, আবার তবু সাথে সাথে আমরা যেসব কাজ করি, চিন্তা করি, সংকল্প ও সৃজন করি, হই,---সে সবের বিচিত্র অভিজ্ঞতা পাই ঠিক সেই রকমই হ'ল জগতের মধ্যে পুরুষের আত্মবোধ। পার্থক্য এই যে আমরা বর্তমানে সীমিত ও অহং-বদ্ধ মানসিক জীব হওয়ায়, সাধারণতঃ আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয় অবিদ্যার মধ্যে আর আমরা আত্মার মধ্যে বাস করি না, তবে শুধু সময়ে সময়ে ইহার

দিকে পিছনে তাকাই বা ইহাতে সরে যাই, অথচ সনাতন ইহার অধিকারী তাঁর অনন্ত আত্মজ্ঞানের মধ্যে, তিনি নিত্যই এই আত্মা এবং এইসব আত্ম-অভিজ্ঞতার দিকে তাকান সত্তার পরিপূর্ণতা থেকে। মনের কারাগারে আবদ্ধ আমাদের মতো তিনি ভাবেন না যে তাঁর সত্তা আত্ম-অভিজ্ঞতার এক অনির্দিষ্ট পরিণাম ও যোগফল, অথবা এক বিরাট বিরুদ্ধতত্ত্ব। সত্তা ও সম্ভূতির মধ্যে যে প্রাচীন দার্শনিক বিবাদ তা শাশ্বত আত্মজ্ঞানের নিকট সম্ভবপর নয়।

চিন্ময়সত্তার যে সক্রিয়শক্তি নিজেকে চরিতার্থ করে তার আত্ম-অনুভূতির বিভিন্ন সামর্থ্যের মধ্যে, তার জ্ঞান, সংকল্প, আত্ম-আনন্দ, আত্ম-বিভাবনার বিভিন্ন সামর্থ্যের মধ্যে এবং ইহাদের ক্রিয়া-শক্তির সকল চমক-প্রদ বৈচিত্র্য, বিপর্যয়, সংরক্ষণ ও পরিবর্তনের মধ্যে, এমনকি বিকারের মধ্যেও---ইহাকেই আমরা বলি প্রকৃতি,---যেমন বিশ্বের মধ্যে, তেমন আমাদের মধ্যে। কিন্তু বৈচিত্র্যের এই শক্তির পিছনে এক সম ঐক্যের মধ্যে আছে সেই একই শক্তির নিত্য সাম্যাবস্থা এবং এই শক্তি যেমন বৈচিত্র্যগুলি উৎপাদন করেছে তেমন তাদের ধারণ করে নিরপেক্ষভাবে এবং শাসন করে এবং সত্তা, পুরুষ তার আত্ম-আনন্দের যে লক্ষ্য নিজের চেতনায় ভাবনা করেছে এবং নিজের সংকল্পের দ্বারা বা চেতনার সামর্থ্যের দ্বারা নির্ধারিত করেছে তা যাই হ'ক না কেন তার দিকে ঐ শক্তি চালনা করে। ইহাই দিব্য প্রকৃতি যার সহিত ঐক্যের মধ্যে আমাদের ফিরে যেতে হবে আমাদের আত্ম-জ্ঞানের যোগের দ্বারা। আমাদের হ'তে হবে পুরুষ, সচ্চিদানন্দ যে তার প্রকৃতির দিব্য ব্যষ্টিগত অধিকার পেয়ে আনন্দ ভোগ করে, আর আমাদের অহমাত্মক প্রকৃতির অধীন মনোময় পুরুষ হ'লে চলবে না। কারণ তাহাই আসল মানুষ, জীবের পরম ও অখণ্ড আত্মা, আর অহং হ'ল আমাদেরই শুধু এক অবর ও আংশিক অভিব্যক্তি যার মাধ্যমে কোনো প্রকারের সীমিত ও প্রস্তুতিকর অভিজ্ঞতা সম্ভবপর হয় এবং কিছু সময়ের জন্য তা উপভোগ করতে দেওয়া হয়। কিন্তু অবর সত্তার এই উপভোগ আমাদের সমগ্র ভব্যার্থ নয়; এমনকি এই জড় জগতে মানুষ হিসাবে আমরা যে বেঁচে থাকি তারও একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা নয়।

আমাদের এই যে ব্যষ্টিসত্তা, তা সেই সত্তা যার দ্বারা আত্ম-সচেতন মনে অজ্ঞান সম্ভবপর হয় কিন্তু ইহা আবার সেই সত্তাও যার দ্বারা আধ্যা-

ত্মিক সত্তার মধ্যে মুক্তি সম্ভবপর হয় আর সম্ভব হয় দিব্য অমরত্বভোগ। যে অমরত্বে উপনীত হয় সে সনাতন নয়, কি তাঁর অতিস্থিতিতে, কি বিশ্ব-সত্তায়; জীবই আত্ম-জ্ঞানে উত্তরণ করে, তাতেই ইহা অধিগত থাকে, এবং তার দ্বারাই ইহা কার্যকরী হয়। আধ্যাত্মিক, মানসিক বা জড়গত-- সকল জীবনই হ'ল পুরুষের লীলা তার প্রকৃতির বিভিন্ন সম্ভাবনার সহিত; কারণ এই লীলা না থাকলে কোনো আত্ম-প্রকাশ ও কোনো আপেক্ষিক আত্ম-অনুভূতি সম্ভব নয়। এমনকি, সকল কিছুই আমাদের বৃহত্তর আত্মা --আমাদের এই উপলব্ধিতেও এবং ভগবান ও অপর সকল সত্তার সহিত আমাদের একত্বেও এই লীলা স্থায়ী হ'তে পারে এবং স্থায়ী হওয়া দরকার --অবশ্য যদি না আমরা চাই যে আমরা সকল আত্ম-প্রকাশ এবং সমাধি-মগ্ন ও তন্ময় আত্ম-অনুভূতি ছাড়া অন্যসব আত্ম-অনুভূতি থেকে নিবৃত্ত হব। কিন্তু তখনও এই যে সমাধির বা মুক্ত লীলার উপলব্ধি হয় তা হয় ব্যষ্টিসত্তার মধ্যেই; সমাধি হ'ল এই মনোময় পুরুষের নিমজ্জন ঐক্যের একমাত্র অনুভূতির মধ্যে, আর মুক্ত লীলা হ'ল আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে তার মনকে তুলে নেওয়া একত্বের স্বচ্ছন্দ উপলব্ধি ও আনন্দের জন্য। কারণ দিব্য সত্তার প্রকৃতি হ'ল সর্বদাই তার ঐক্য অধিগত করা কিন্তু এই ঐক্যকে অধিগত করতে হবে অনন্ত অনুভূতির মধ্যেও অনেক দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে, অনেক লোকের উপর এবং নিজের অনেক সচেতন সামর্থ্য বা আত্মার মাধ্যমে--অর্থাৎ আমাদের সীমিত বুদ্ধিগতভাষায়, এক চিন্ময় পুরুষের অনেক ব্যষ্টিত্বের মাধ্যমে। আমাদের প্রত্যেকেই এই সব ব্যষ্টি-ত্বের একটি। ভগবান থেকে দূরে সীমিত অহং-এর মধ্যে, সীমিত মনের মধ্যে থাকার অর্থ আমাদের নিজেদের থেকে দূরে থাকা, আমাদের সত্যকার ব্যষ্টিত্ব থেকে বঞ্চিত থাকা, আসল ব্যষ্টি না হ'য়ে আপতিক ব্যষ্টি হওয়া; ইহা আমাদের অবিদ্যার সামর্থ্য। ভাগবতসত্তার মধ্যে গৃহীত হ'য়ে এখন যাতে আমরা বাস করি তাকে আমাদের আধ্যাত্মিক, অনন্ত ও বিশ্বব্যাপী চেতনা বলে জানার অর্থ আমাদের পরম ও অখণ্ড আত্মাকে, আমাদের সত্যকার ব্যষ্টিত্বকে অধিগত করা; ইহা আমাদের আত্ম-জ্ঞানের সামর্থ্য।

চিরন্তন অভিব্যক্তির এই যে তিন সামর্থ্য--ভগবান, প্রকৃতি ও জীব তাদের শাশ্বত ঐক্য ও প্রত্যেকের জন্য অপরের অন্তরঙ্গ প্রয়োজনীয়তা জেনে আমরা বুঝতে পারি স্বয়ং অস্তিত্বকে এবং জগতের বাহ্যরূপের মধ্যে সেই সব কিছুকে যা এখন আমাদের অজ্ঞানতার কাছে বিভ্রান্তিকর। আত্মা-

দের আত্ম-জ্ঞান ইহাদের কোনোটিকেই ধ্বংস করে না, ইহা ধ্বংস করে শুধু আমাদের অজ্ঞানতাকে ও ইহার বিশিষ্ট অবস্থাগুলিকে যার জন্য আমরা আমাদের প্রকৃতির অহমাত্মক সব নির্ধারণে আবদ্ধ হ'য়ে তাদের অধীন হই। যখন আমরা আমাদের সত্যকার সত্তা ফিরে পাই তখন অহং আমাদের কাছ থেকে খসে যায়; ইহার স্থান নেয় আমাদের পরম ও অখণ্ড আত্মা, আমাদের সত্যকার ব্যষ্টিত্ব। এই পরম আত্মা হিসাবে ইহা নিজেকে সকল সত্তার সহিত এক করে এবং সকল জগৎ ও প্রকৃতিকে দেখে স্বীয় আনন্ত্যের মধ্যে। আমাদের এই কথার অর্থ শুধু এই যে আমাদের পৃথক অস্তিত্বের বোধ মিলিয়ে যায় অসীম, অবিভক্ত ও অনন্ত সত্তার চেতনার মধ্যে, আর ইহাতে আমরা আর আমাদের বর্তমান জন্ম ও সম্ভূতির নাম ও রূপে এবং বিভিন্ন বিশেষ মানসিক ও শারীরিক নির্ধারণে আবদ্ধ অনুভব করি না, বিশ্বের কোনো কিছুর বা কাহারও থেকে আমরা আর পৃথক থাকি না। ইহাকেই প্রাচীন মনীষীরা বলতেন অসম্ভূতি বা জন্মনাশ বা নির্বাণ। সেই সাথে, আমাদের জীবজন্ম ও সম্ভূতির মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন ও কর্ম চলতে থাকে তবে ভিন্ন জ্ঞান ও সম্পূর্ণ অন্য এক প্রকার অনুভূতি নিয়ে; জগৎও থাকে তবে ইহাকে আমরা দেখি আমাদের সত্তার মধ্যে, ইহা যে আমাদের সত্তার বাহিরে আমরা ভিন্ন অন্য কিছু সেভাবে নয়। আমাদের প্রকৃত সত্তার, আমাদের অখণ্ড সত্তার এই নতুন চেতনায় শাশ্বতভাবে বাস করতে সমর্থ হওয়াই মুক্তিপ্রাপ্তি ও অমরত্বভোগ।

এইখানে আসে সেই ভাবনার জটিলতা যে অমরত্ব সম্ভব হয় শুধু মৃত্যুর পর অন্যসব জগতে, অস্তিত্বের বিভিন্ন উচ্চতর লোকে, অথবা মুক্তিতে মানসিক বা দৈহিক জীবনধারণের সকল সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়, এবং জীব জীবন চিরকালের জন্য বিলীন হয় এক নৈর্ব্যক্তিক আনন্ত্যের মধ্যে। এই সব ভাবনা যে জোরালো হয় তার কারণ অনুভূতিতে তাদের কিছু সমর্থন মেলে আর অন্তঃপুরুষও একপ্রকার ইহার প্রয়োজন অথবা ঊর্ধ্বাভিমুখী আকর্ষণ অনুভব করে যখন সে মন ও জড়ের প্রবল বন্ধনগুলি ত্যাগ করে। মনে হয় যে এই সব বন্ধন সকল পার্থিব জীবন বা সকল মানসিক অস্তিত্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য। মৃত্যু জড় জগতের রাজা কারণ মনে হয় প্রাণ এখানে থাকে শুধু মৃত্যুর অধীন হ'য়ে, নিরন্তর মরণের দ্বারা; অমরত্বকে এখানে জয় করতে হবে কষ্টের সহিত এবং তার যা প্রকৃতি তাতে মনে হয় অমরত্ব হ'ল সকল মৃত্যুবর্জন এবং সেহেতু জড় জগতের মধ্যে সকল জন্ম

বর্জন। অমরত্বের ক্ষেত্র নিশ্চয়ই হবে কোনো সূক্ষ্মলোকে, কোনো স্বর্গে যেখানে হয় দেহ থাকে না, আর না হয় ইহা অন্যবিধ এবং অন্তঃপুরুষেরই এক রূপমাত্র অথবা এক গৌণ অবস্থা। অপরপক্ষে যারা অমরত্বের অতীতে যেতে চায় তারা বোধ করে যে সকল লোক ও স্বর্গ সান্ত অস্তিত্বেরই বিভিন্ন অবস্থা এবং অনন্ত আত্মা এসব থেকে মুক্ত। তারা অভিভূত হয় নৈর্ব্যক্তিক ও অনন্তের মধ্যে বিলীন হওয়ার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা এবং অন্তঃপুরুষের সম্ভূতিতে তার আনন্দের সহিত নৈর্ব্যক্তিক সত্তার আনন্দের কোনোরূপ সমীকরণে তাদের অক্ষমতার দ্বারা। বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র উদ্ভাবন করা হয় যাতে নিমজ্জন ও লয়ের প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধির কাছে গ্রাহ্য করা হয়; কিন্তু যা বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ ও সিদ্ধান্তে আসার শেষ কথা তা হ'ল ওপারের হাতছানি, অন্তঃপুরুষের প্রয়োজনীয়তা, আর এই ক্ষেত্রে একপ্রকার নৈর্ব্যক্তিক সন্মাত্রে বা অসতে তার আনন্দ। কারণ সিদ্ধান্তের ভিত্তি হ'ল পুরুষের নির্ধারক আনন্দ, তার প্রকৃতির সহিত সে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সংকল্প করে সেই সম্পর্ক, তার প্রকৃতির নানাবিধ সব সম্ভাবনার মধ্যে তার ব্যক্তিগত আত্ম-অনুভূতির বিকাশে সে যে ধারা অনুসরণ করেছে তার ফলস্বরূপ সে যে অনুভূতি লাভ করে। ইহার সমর্থনে আমাদের বুদ্ধিগত যুক্তিগুলি শুধু ঐ অনুভূতি সম্বন্ধে যুক্তিবুদ্ধিকে দেওয়া আমাদের বিবরণ, আর ইহারা কতকগুলি কৌশল যা দিয়ে আমরা মনকে সাহায্য করি যেন অন্তঃপুরুষ যে পথে যাচ্ছে সেই পথ সে মেনে নেয়।

আমাদের বর্তমান অনুভূতি আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইলেও, আমাদের জগৎ-সত্তার কারণ অহং নয়; কারণ অহং হ'ল জগৎ-সত্তার যে প্রকার আমাদের তার শুধু এক ফল ও অবস্থা; ইহা এক সম্পর্ক যা বহু-অন্তঃপুরুষময় পুরুষ ব্যষ্টিভাবাপন্ন বিভিন্ন মন ও দেহের মধ্যে স্থাপন করেছে, ইহা আত্ম-রক্ষার ও পরস্পরকে বাদ দেওয়ার ও আক্রমণ করার এক সম্পর্ক যাতে জগতের মধ্যে বিষয়সমূহের পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার মধ্যে অনন্যনির্ভর মানসিক ও ভৌতিক অনুভূতির এক সম্ভাবনা আসে। কিন্তু এই সব লোকে কোনো অনপেক্ষ অনন্যনির্ভরতা সম্ভব হয় না; সুতরাং এই আত্যন্তিক সাধনার একমাত্র সম্ভবপর পরিণতি হ'ল নৈর্ব্যক্তিকতা যা সকল মানসিক ও ভৌতিক অনুভূতি বর্জন করে: শুধু এইভাবেই এক একান্ত অনন্যনির্ভর আত্ম-অনুভূতি লাভ সম্ভব হয়। তখন মনে হয় অন্তঃপুরুষ অবস্থান করে নিজের মধ্যেই অনপেক্ষভাবে, অনন্য-

নির্ভর হ'য়ে; ভারতীয় কথায় সে তখন স্বাধীন, শুধু নিজের উপর নির্ভরশীল, ভগবান বা অন্য সব সত্তার উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং এই অনুভূতিতে ভগবান, ব্যক্তিগত আত্মা ও অন্যান্য সত্তাকে অবিদ্যার পার্থক্য ব'লে অস্বীকার ও বর্জন করা হয়। অহংই তার নিজের অপূর্ণতা স্বীকার করে ও নিজ ও তার বিপরীত সব কিছু—উভয়কেই বিসর্জন দেয় যাতে অনন্য-নির্ভর আত্ম-অনুভূতি সম্বন্ধে তার নিজের মৌলিক সহজাত প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়; কেননা ইহা দেখে যে ভগবান ও অপর সকলের সহিত সম্পর্কের দ্বারা তা সাধন করার জন্য ইহার চেষ্টা আগাগোড়াই ভ্রম, অসারত্ব ও শূন্যতার অভিশাপগ্রস্ত। ইহা তাদের আর স্বীকার করে না কারণ তাদের স্বীকার করলেই ইহা তাদের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে; ইহা নিজের স্থায়িত্ব স্বীকার করতেও ক্ষান্ত হয় কারণ অহং-এর স্থায়িত্বের অর্থ তা-ই স্বীকার করা যাকে ইহা আত্মা নয় বলে বাদ দিতে চেষ্টা করে এবং বিশ্ব ও অন্যান্য সত্তাও স্বীকার করা। বৌদ্ধদের আত্মনাশের স্বরূপই হ'ল মনোময় পুরুষ যা সব অনুভব করে সে সবের একান্ত বর্জন; অদ্বৈতবাদীর যে আত্ম নিমজ্জন তার অনপেক্ষসত্তার মধ্যে, তা-ও সেই একই লক্ষ্য, তবে তার ভাবনা এসেছে ভিন্নভাবে: উভয়ই হ'ল অন্তঃপুরুষের এক চূড়ান্ত ঘোষণা যে সে আত্যন্তিকভাবে প্রকৃতির অনধীন।

মোক্ষের জন্য যে এক প্রকার সংক্ষিপ্ত সাধনপথকে আমরা প্রত্যাহারের সাধনা বলে বর্ণনা করেছি সেই পথে যে অনুভূতি লাভ হয় তা এই প্রবণতার পক্ষে সহায়কর। কারণ ইহার অর্থ অহং চূর্ণ করা এবং মানসিকতার যেসব অভ্যাস এখন আমাদের আছে সেসব বর্জন করা: কারণ ঐ মানসিকতা জড় ও বিভিন্ন স্থূলইন্দ্রিয়ের অধীন আর ঐভাবে যে বিভিন্ন সব জিনিস শুধু বিভিন্ন রূপ, বিষয়, বাহ্যঘটনা এবং ঐসব রূপে যে নাম দিই সেই বিভিন্ন নাম। অপর প্রাণীদের প্রত্যক্‌বৃত্ত জীবন সম্বন্ধে আমরা জানি শুধু আমাদের নিজেদের এই জীবনের সহিত সাদৃশ্যের দ্বারা অথবা তাদের কথা বলা, কর্ম ইত্যাদি যেসব বাহ্য নিদর্শনগুলিকে আমাদের মন আমাদের নিজেদের প্রত্যক্‌বৃত্ততার সংজ্ঞায় রূপান্তরিত করে সেসবের উপর ভিত্তি করে অনুমান বা পরোক্ষ অনুভবের দ্বারা; এছাড়া আমরা সরাসরি অপরের প্রত্যক্‌বৃত্ত জীবনের কথা জানি না। যখন আমরা অহং এবং স্থূল মন ভেঙে বেরিয়ে আসি চিৎ-পুরুষের আনন্ত্যের মধ্যে তখনো আমরা জগৎ ও অপর সবকে দেখি যেমন মন তাদের দেখতে আমাদের অভ্যস্ত

করেছে অর্থাৎ নাম ও রূপ হিসাবে; শুধু চিৎ-পুরুষের প্রত্যক্ষ ও মহত্তর সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের নতুন অনুভূতিতে, মনের কাছে সেসবের নিজেদের যে প্রত্যক্ষ পরাক্‌বৃত্ত সত্যতা এবং পরোক্ষ প্রত্যক্‌বৃত্ত সত্যতা ছিল তা নষ্ট হয়। যে সত্যতর সদ্‌বস্তুর অনুভূতি আমরা এখন পাই তার সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হয় ঐসব (অর্থাৎ জগৎ ও অন্য সব কিছু); আমাদের মানসিকতা শান্ত ও উদাসীন হ'য়ে পড়ায়, ইহা আর সেই সব মধ্যবর্তী সংজ্ঞাগুলি জানতে ও নিজের কাছে বাস্তব করতে চেষ্টা করে না যেগুলি যেমন আমাদের মধ্যে তেমন সেই-সবেও অবস্থিত আর যাদের সম্বন্ধে জ্ঞানের উপযোগ হ'ল আধ্যাত্মিক আত্মা ও জগতের পরাক্‌বৃত্ত সব ঘটনার মধ্যকার ব্যবধানের উপর সেতু রচনা করা। এক শুদ্ধ আধ্যাত্মিক সন্মাত্রের আনন্দময় অনন্ত নৈর্ব্যক্তিকতাতেই আমরা তৃপ্ত থাকি; তখন আর অন্যকিছু বা অন্য কেহ আমাদের কাছে অর্থহীন। স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের যা দেখায় এবং সেসব সম্বন্ধে মন যা অনুভব ও ভাবনা করে এবং যাতে অত অপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী ভাবে আনন্দ পায় তা এখন মনে হয় অবাস্তব ও তুচ্ছ; সত্তার যেসব মধ্যবর্তী সত্যের মধ্য দিয়ে এইসব জিনিসকে একম্‌ উপভোগ করেন এবং যাতে তাঁর জন্য তাঁর সত্তার ও আনন্দের সেই মূল্য থাকে যা আমরা যেমন বলতে পারি, তাঁর কাছে বিশ্বঅস্তিত্বকে সুন্দর ও অভিব্যক্তির যোগ্য করে, সেসবকে আমরা পাই না আর পেতে চাই-ও না। ভগবান জগতে যে আনন্দ পান সে আনন্দের ভাগ আর আমরা পাই না; বরং আমাদের কাছে মনে হয় যে সনাতন তাঁর সত্তার শুদ্ধতার মধ্যে জড়ের অশুদ্ধ প্রকৃতি আসতে দিয়ে নিজেকে হীন করেছেন অথবা অসার সব নাম ও অবাস্তব সব রূপ কল্পনা ক'রে নিজ সত্তার সত্যকে মিথ্যা করেছেন। আর না হয় যদি আমরা আদৌ ঐ আনন্দ অনুভব করি আমরা তা করি দূর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে যার জন্যে আমরা অন্তরঙ্গ প্রাপ্তির বোধ নিয়ে তা ভোগ করতে পারি না, অথবা আনন্দ অনুভব করি এক তন্ময় ও আত্যন্তিক আত্ম-অনুভূতির মহত্তর আনন্দের প্রতি আকর্ষণ নিয়ে যার জন্য আমরা এই অবর সংজ্ঞার মধ্যে থাকতে পারি শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ আমাদের এখানে বাধ্য হ'য়ে থাকতে হয় আমাদের স্থূল প্রাণ ও শরীর টিকে থাকে ব'লে, তবে তার বেশী নয়।

কিন্তু যদি আমাদের যোগসাধনার পথে অথবা জগতের উপর আমাদের উপলব্ধ আত্মার স্বচ্ছন্দ প্রত্যাবর্তনের ও আমাদের মধ্যে পুরুষের দ্বারা তার প্রকৃতিকে স্বচ্ছন্দভাবে ফিরে পাওয়ার ফলে আমরা সচেতন হ'য়ে উঠি

শুধু যে অপরের সব দেহ ও বাহ্য আত্ম-প্রকাশ সম্বন্ধে তা নয়, অন্তরঙ্গভাবে তাদের আন্তর সত্তা, তাদের মন, তাদের অন্তঃপুরুষ সম্বন্ধে এবং এসবের মধ্যে তারও সম্বন্ধে যার কথা তাদের নিজেদের উপরভাসা মন জানে না তাহ'লে তাদের মধ্যেও আমরা দেখি প্রকৃত সত্তা আর আমরা তাদের দেখি যে তারা আমাদের আত্মারই বিভিন্ন আত্মা, শুধু বিভিন্ন নাম ও রূপ নয়। তারা আমাদের কাছে হ'য়ে ওঠে সনাতনের বিভিন্ন সদ্‌বস্তু। আমাদের মন আর তখন সে সবকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ভেবে মোহগ্রস্ত বা অসৎ মনে করে ভ্রান্তির অধীন থাকে না। অবশ্য আমাদের কাছে জড়াসক্ত জীবনের পুরণো অভিভূত করা মূল্য থাকে না কিন্তু ভাগবত পুরুষের কাছে তার যে মহত্তর মূল্য তা পাওয়া যায়; ইহা যে আমাদের সম্ভূতির একমাত্র সংজ্ঞা এই বলে ইহাকে আর গণ্য করা হয় না, তবে মনে করা হয় যে মন ও চিৎ-পুরুষের পরতর সংজ্ঞার সম্পর্কে ইহার শুধু এক গৌণ মূল্য আছে আর এই গৌণ-তার জন্য তার মূল্য হানি না হ'য়ে বরং বৃদ্ধি পায়। আমরা দেখি যে আমাদের জড়গত সত্তা, জীবন, প্রকৃতি---এসব শুধু পুরুষের এক স্থিতি-ভঙ্গি তার প্রকৃতির সম্পর্কে আর তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব কেবল তখনই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যখন তাদের নিজের মধ্যে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে না দেখে বরং দেখা হয় সেই সব পরতর স্থিতি ভঙ্গির উপর নির্ভরশীল হিসাবে যারা তাদের অবলম্বন স্বরূপ; এইসব মহত্তর সম্পর্ক থেকেই তারা তাদের অর্থ পায়, সুতরাং ইহাদের সহিত সচেতনভাবে যুক্ত হ'য়েই তারা চরিতার্থ করতে পারে তাদের যথার্থ সব প্রবণতা ও লক্ষ্য। মুক্ত আত্মজ্ঞান প্রাপ্তিতে জীবন তখন আমাদের কাছে সার্থক হ'য়ে ওঠে, ইহা আর তখন ব্যর্থ হয় না।

পরিশেষে এই বৃহত্তর অখণ্ড জ্ঞান ও মুক্তি আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে বন্ধনহীন ও চরিতার্থ করে। যখন আমরা এই জ্ঞান আয়ত্ত করি তখন আমরা বুঝি কেন আমাদের অস্তিত্ব ভগবান, আমরা নিজেরা ও জগৎ,---এই তিন সংজ্ঞার মধ্যে বিচরণ করে, আর আমরা তাদের সকলকে বা কোনো একটিকে পরস্পরের বিরুদ্ধ, অসঙ্গত, বিসংবাদী বলে দেখি না; আবার বিপরীত দিকে, তারা যে আমাদের অবিদ্যার এমন সংজ্ঞা যা পরিশেষে শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক ঐক্যের মধ্যে বিলীন হবে---এই বলেও তাদের গণ্য করি না। আমরা বরং তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি আমাদের আত্ম-সার্থকতার এমন সংজ্ঞা হিসাবে যেগুলি মুক্তির পর তাদের মূল্য

রক্ষা করে বরং কেবল তখনই পায় তাদের প্রকৃত মূল্য। আর আমরা অনুভব করি না যে আমাদের অস্তিত্ব অন্য সব অস্তিত্ব বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যাদের সহিত আমাদের বিভিন্ন সম্পর্কের দ্বারাই আমাদের জগৎ-অভিজ্ঞতা গঠিত হয়; এই নব চেতনায় তারা সকলেই থাকে আমাদের মধ্যে আর আমরাও থাকি তাদের মধ্যে। তারা ও আমরা আর তখন অতগুলি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অহং নই যে প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বতন্ত্র চরিতার্থতার বা স্বোত্তরণের প্রয়াসী হয় এবং শেষ পর্যন্ত আর অন্য কিছুর দিকে লক্ষ্য করে না; তারা সকলেই সেই সনাতন এবং প্রত্যেকের অন্তঃস্থ আত্মা তার মধ্যে নিগূঢ়ভাবে সকলকে আলিঙ্গন করে এবং নানা-ভাবে প্রয়াস করে তার ঐক্যের এই পরতর সত্যকে তার পার্থিব সত্তায় ফুটিয়ে তুলতে ও সফল করতে। পরস্পরকে বাদ দেওয়া নয়, পরস্পরকে অন্তর্ভূক্ত করাই আমাদের ব্যষ্টিত্বের দিব্য সত্য, প্রেমই পরতর বিধান, অনন্যনির্ভর আত্ম-চরিতার্থতা নয়।

আমাদের আসল সত্তা যে পুরুষ সে সর্বদাই প্রকৃতির অনধীন ও অধীশ্বর, আর আমরা যে এই অনধীনতা লাভের প্রয়াসী তা সঙ্গত; অহমাত্মক ক্রিয়ার ও ইহার স্বোত্তরণের উপকারিতা ইহাই, কিন্তু অনধীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে অহং-এর যে নীতি তাকেই একান্তভাবে পূর্ণ করায় অনধীনতা সঠিকভাবে সার্থক করা হয় না, ইহা সার্থক করা হয় নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে পুরুষের এই পরতম স্থিতিতে উপনীত হ'লে। সেখানে প্রকৃতির অতীতে স্থিতি হয়, আবার প্রকৃতিকে অধিগত করাও হয়, আমাদের ব্যষ্টি-ত্বের সুষ্ঠু সার্থকতাসাধন হয়, আবার জগৎ ও অপর সকলের সহিত আমা-দের সব সম্পর্কেরও সুষ্ঠু সার্থকতাসাধন হয়। সুতরাং ওপারের স্বর্গে পৃথিবী সম্বন্ধে উদাসীন হ'য়ে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ আমাদের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নয়; আমাদের নিজেদের মুক্তির মতোই অপর সকলের মুক্তি ও আত্ম-সার্থকতাও আমাদের নিজেদের কাজ—এমনকি বলা চলে আমাদের দিব্য স্বার্থ। তা না হ'লে অপর সকলের সহিত আমাদের ঐক্যের কোনো কার্য-করী অর্থ থাকে না। এই জগতে অহমাত্মক জীবনের সব প্রলোভন জয় করা হ'ল আমাদের নিজেদের উপর আমাদের প্রথম বিজয়; ওপারের স্বর্গে ব্যক্তিগত সুখের প্রলোভন জয় করা আমাদের দ্বিতীয় বিজয়; আর জীবন থেকে পলায়নের ও নৈর্ব্যক্তিক আনন্ত্যের মধ্যে আত্ম-বিভোর আন-ন্দের যে শ্রেষ্ঠ প্রলোভন তা জয় করা হ'ল অন্তিম ও মহত্তম বিজয়। তখন

আমরা মুক্ত হই সকল ব্যষ্টি আত্যন্তিকতা থেকে এবং অধিগত করি আমাদের সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা।

মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষের অবস্থা হ'ল নিত্যমুক্ত পুরুষের অবস্থা। ইহার চেতনা এক অতিস্থিতি এবং এক সর্বগ্রাহী ঐক্য। ইহার যে আত্মজ্ঞান তাতে আত্ম-জ্ঞানের সকল সংজ্ঞাগুলি রহিত হয় না, বরং সকল বিষয়কে এক ও সুসঙ্গত করে ভগবান ও দিব্য প্রকৃতির মধ্যে। ধর্মের যে তীব্র উল্লাস শুধু ভগবান ও আমাদের জানে আর বাকী সবকে বাহিরে রাখে, ইহার কাছে তা শুধু এক অন্তরঙ্গ অনুভব যা তাকে প্রস্তুত করে সকল জীবের চারিদিকে দিব্য প্রেম ও আনন্দের আলিঙ্গনের অংশভাক্ হ'তে। সিদ্ধ পুরুষের পক্ষে সেরকম স্বর্গীয় আনন্দ ভোগ করা সম্ভব হয় না যাতে ভগবান ও আমরা ও কৃতার্থ জনেরা যুক্ত হয় কিন্তু অকৃতার্থজন ও তাদের কষ্টভোগের দিকে আমরা দূর থেকে উদাসীনভাবে চেয়ে থাকতে পারি; কারণ তারাও তার আত্মা; ব্যক্তিগতভাবে দুঃখকষ্ট ও অবিদ্যা থেকে মুক্ত হওয়ায় সে স্বভাবতঃই তাদের দিকে ফিরবে তাদেরও তার মুক্তির দিকে নিয়ে আসার জন্য। অপরপক্ষে ভগবান ও ওপারকে বাদ দিয়ে আত্মা ও অপর সকল ও জগতের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কের ভিতর বিভোর থাকার অবস্থা আরো অসম্ভব, সুতরাং সিদ্ধ পুরুষ পৃথিবীর দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, এমনকি মানুষের সহিত মানুষের শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে পরহিতার্থক সম্বন্ধের দ্বারাও সীমাবদ্ধ হয় না। ইহার কাজ বা ইহার চরম সিদ্ধি যে পরের জন্য নিজেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা তা নয়, বরং নিজেকে সার্থক করা ভগবদ্-প্রাপ্তি, স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্যে যাতে তার সার্থকতার মধ্যে, তার সার্থকতার দ্বারা অপর সকলও সার্থক হ'তে পারে। কারণ একমাত্র ভগবানের মধ্যেই, শুধু ভগবদ্-প্রাপ্তির দ্বারাই জীবনের সকল বৈষম্য দূর করা যায়, সুতরাং শেষ পর্যন্ত মানুষকে ভগবানের দিকে উত্তোলন করাই মানবজাতিকে সাহায্য করার একমাত্র কার্যকরী পন্থা। অপর সকল কাজকর্মের ও আমাদের আত্ম-অনুভূতির বিভিন্ন উপলব্ধির উপকার ও সামর্থ্য আছে কিন্তু পরিশেষে এইসব জনাকীর্ণ পার্শ্ব-পথরেখাকে বা এইসব নির্জন পন্থাকে চারিদিক ঘুরে মিলতে হবে অখণ্ড মার্গের ব্যাপ্তির মধ্যে যা দিয়ে মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষ সকলকে অতিক্রম করে, সকলকে আলিঙ্গন করে এবং হ'য়ে ওঠে সকলের সার্থকতার নিশ্চিত আশ্বাস ও সামর্থ্য আর এই সার্থকতা হয় ভগবানের যে অভিব্যক্ত সত্তা তাদের তাতে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

আমাদের অস্তিত্বের বিভিন্ন লোক

যদি আমাদের অন্তঃস্থ পুরুষকে এইভাবে তার পরতম আত্মা, দিব্য পুরুষের সহিত মিলনের দ্বারা তার প্রকৃতির জ্ঞাতা, প্রভু ও স্বাধীন ভোক্তা হ'তে হয়, তাহ'লে স্পষ্টতঃই, আমাদের সত্তার বর্তমান লোকে আবিষ্ট থেকে সে কাজ করা সম্ভব হয় না; কারণ ইহা সেই জড়লোক যার মধ্যে প্রকৃতির শাসন সম্পূর্ণ; সেখানে প্রকৃতির কর্মপ্রবৃত্তির বিভ্রান্তিকর আলোড়নের মধ্যে, তার ক্রিয়াধারার স্থূল আড়ম্বরের মধ্যে দিব্যপুরুষ সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকেন, আর জড়ের মধ্যে প্রকৃতির দ্বারা চিৎ-পুরুষের সংবৃত্তি থেকে ব্যষ্টি পুরুষের উদ্‌বর্তন কালে এই ব্যষ্টিপুরুষ তার সকল কাজকর্মে জড়ীয় ও প্রাণিক করণ সমূহের মধ্যে তখনো বিশেষ জড়িত থাকায় দিব্য স্বাধীনতা ভোগ করতে অসমর্থ। যাকে ইহা তার স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব বলে তা শুধু প্রকৃতির কাছে মনের সূক্ষ্ম অধীনতা; অবশ্য পশু, উদ্ভিদ ও ধাতুর মতো প্রাণিক ও জড়ীয় বিষয়ের স্থূল অধীনতা অপেক্ষা মনের ঐ অধীনতা লঘুতর, এবং যে অবস্থায় মুক্তি ও শাসন সম্ভব হয় তার আরো নিকটবর্তী, কিন্তু তবু ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব নয়। সুতরাং আমাদের চেতনার বিভিন্ন লোক এবং মনোময় সত্তার বিভিন্ন আধ্যাত্মিক লোক সম্বন্ধে আমাদের বলতে হয়েছে; কারণ এই সব না থাকলে, এখানে, এই পৃথিবীতে দেহধারী জীবের মোক্ষ অসম্ভব হ'ত। তাকে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হ'ত, আর বড় জোর নিজেকে প্রস্তুত করতে হ'ত যাতে সে তা খুঁজে পায় অন্য বিভিন্ন লোকে এবং অন্য একপ্রকার ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক দেহে যা জড়গত অনুভূতির কঠিন আবরণে তত দৃঢ়ভাবে আবৃত নয়।

সাধারণ জ্ঞানযোগে চেতনার শুধু দুই লোক স্বীকার করলেই চলে—আধ্যাত্মিক লোক ও জড়ভাবাপন্ন মানসিক লোক; শুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধি এই দু'য়ের মাঝে অবস্থিত হ'য়ে দুটিকেই দেখে,—প্রাতিভাসিক জগতের সব ভ্রান্তি ছিন্ন ক'রে, জড়ভাবাপন্ন মানসিক লোক অতিক্রম ক'রে দেখে আধ্যাত্মিক লোকের সদ্‌বস্তু; আর তারপর ব্যষ্টিপুরুষের সংকল্প জ্ঞানের এই স্থিতির সহিত নিজেকে যুক্ত ক'রে অপরা স্থিতি বর্জন করে এবং পরম

লোকের মধ্যে সরে গিয়ে সেখানেই আবিষ্ট হয়, মন ও দেহ হারিয়ে তা থেকে প্রাণ বিসর্জন দেয় এবং পরমপুরুষের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত ক'রে ব্যষ্টিজীবন থেকে উদ্ধার পায়। ইহা জানে যে ইহা আমাদের অস্তিত্বের সমগ্র সত্য নয়, এই অস্তিত্ব আরো অনেক বেশী জটিল; ইহা জানে যে অনেক লোক বর্তমান কিন্তু এইসব এই মোক্ষের জন্য অত্যাবশ্যক নয় ব'লে ইহা তাদের অবহেলা করে আর না হয় তাদের দিকে মন দেয় না। এইসব লোক বরং বাস্তবিকই তার বিঘ্নস্বরূপ কারণ সেখানে বাস করলে লাভ হয় চিত্তাকর্ষক নব নব সূক্ষ্ম অনুভূতি, সূক্ষ্ম উপভোগ, সূক্ষ্ম শক্তি, প্রাতিভাসিক জ্ঞানের এক নতুন জগৎ আর এসবের অন্বেষণে সৃষ্টি হয় তার একমাত্র যে লক্ষ্য ব্রহ্মের মধ্যে নিমজ্জন তার পথের বিভিন্ন অন্তরায় আর ভগবানের দিকে যাবার পথের ধারে পর পর অসংখ্য ফাঁদ। কিন্তু আমরা যখন প্রপঞ্চ স্বীকার করি, আর আমাদের কাছে সকল প্রপঞ্চ ব্রহ্ম ও ভগবদ্-উপস্থিতিতে পূর্ণ, তখন আমাদের কাছে এই সব কোনো ভীতির জিনিষ নয়; পথভ্রষ্ট হবার বিপদ যতই থাকুক না কেন, সেসবের সম্মুখীন হ'য়ে আমাদের তা জয় করতে হবে। যদি জগৎ ও আমাদের নিজেদের জীবন এতই জটিল হয়, তাহ'লে আমাদের কর্তব্য এই সব জটিলতা জানা ও স্বীকার করা যাতে আমাদের আত্ম-জ্ঞান ও তার প্রকৃতির সহিত পুরুষের বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হ'তে পারে। যদি অনেক লোক থাকে, সেসব আমাদের অধিগত করা চাই ভগবানের জন্য, যেমন আমরা চাই আমাদের মন, প্রাণ ও দেহের সাধারণ স্থিতিকে আধ্যাত্মিকভাবে অধিগত ক'রে রূপান্তরিত ক'রতে।

সকল দেশেই প্রাচীন বিদ্যা আমাদের সত্তার প্রচ্ছন্ন সত্যগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধানে পূর্ণ ছিল, যার ফলে অনুশীলন ও সন্ধানের এক বিশাল ক্ষেত্রের সৃষ্টি হ'য়েছিল; ইওরোপে ইহাদের নাম দেওয়া হয় গুহ্যবিদ্যা (occultism) কিন্তু আমরা প্রাচীতে অনুরূপ কোনো পদ ব্যবহার করি না কেননা এইসব বিষয় পাশ্চাত্ত্য মানসিকতার কাছে যত দূরবর্তী, রহস্যময় ও অসামান্য মনে হয় আমাদের কাছে তত মনে হয় না; এই সব আমাদের আরো নিকটবর্তী আর আমাদের সাধারণ জড়গত জীবন ও এই বৃহত্তর জীবনের মাঝের আবরণটি অনেক পাতলা। ভারতবর্ষে,[১] মিশরে, ক্যাল্-

১ উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষে তান্ত্রিক প্রণালী।

ডিয়ায়, চীনে, গ্রীসে, কেল্টিক দেশগুলিতে ইহারা এমন অনেক যৌগিক প্রণালী ও সাধনার অঙ্গ হ'য়েছে যেগুলির একসময় সর্বত্র বেশ প্রভাব ছিল, কিন্তু আধুনিক মনের কাছে সে সব প্রতিভাত হ'য়েছে শুধু কুসংস্কার ও রহস্যবাদ যদিও যেসব তথ্য ও অনুভূতির উপর ইহারা প্রতিষ্ঠিত সেগুলি জড় জগতের তথ্য ও অনুভূতির মতোই তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে সমানই বাস্তব এবং তাদের নিজেদের বুদ্ধিগম্য নিয়মের দ্বারা সমানই নিয়ন্ত্রিত। সূক্ষ্মজ্ঞানের এই বিশাল ও দুর্গম ক্ষেত্রের মধ্যে নামা আমাদের এখন অভি-প্রায় নয়।[১] তবে যেসব প্রশস্ত তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে ইহার কাঠামো নির্মিত সেসব সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা আবশ্যক কারণ এই সবের অভাবে আমাদের জ্ঞানযোগ সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। আমরা দেখি যে বিভিন্ন প্রণালীতে আলোচিত তথ্যগুলি সর্বদা একই তবে মত ও অনুশীলনের বিন্যাস সম্বন্ধে প্রচুর পার্থক্য আছে, কারণ অত বৃহৎ ও দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় এরূপ পার্থক্য স্বাভাবিক ও অনিবার্য। এক প্রণালীতে যেসব বিষয় বাদ দেওয়া আছে, অন্যতে সেসবকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া আছে, কোনো কোনো প্রণালীতে যা অপ্রধান অন্যতে তা-ই আবার অত্যধিক প্রধান স্থানীয়; যেসব অনুভূতি এক প্রণালীতে শুধু গৌণ ক্ষেত্র ব'লে বিবে-চিত হ'য়েছে, সেইগুলি অন্যতে পৃথক রাজ্য বলে আলোচিত হ'য়েছে। কিন্তু আমি এখানে বরাবর বৈদিক ও বৈদান্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করব যার বড় রেখাগুলি আমরা উপনিষদে পাই; ইহার প্রথম কারণ এই যে আমার কাছে এই পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা সরল ও দার্শনিক ব'লে মনে হয়; আর বিশেষতঃ এই কারণে যে আমাদের যে পরম উদ্দেশ্য মোক্ষ, তার পক্ষে বিভিন্ন লোকের উপযোগিতার দিক থেকে এই পদ্ধতিই শুরু থেকেই গণ্য হ'য়েছে। এই পদ্ধতিতে তার ভিত্তিস্বরূপ নেওয়া হয়েছে আমাদের সাধারণ সত্তার তিন তত্ত্ব—মন, প্রাণ ও জড়, সচ্চিদানন্দের ত্রয়াত্মক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং সংযোজক তত্ত্ব বিজ্ঞান, অতিমানস, মুক্ত বা আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা, আর এইভাবে আমাদের সত্তার সম্ভবপর সকল বৃহৎ স্থিতিগুলিকেই সাজানো হ'য়েছে সপ্ত লোকের এক শ্রেণীতে—(কখন কখন ইহাদের পঞ্চ

১ এ সম্বন্ধে আমরা এখানে পরে আলোচনা করব ব'লে আশা করি; তবে 'আর্য'তে আমাদের প্রথম কাজ হ'ল আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সব সত্যের আলোচনা করা; এই সব আয়ত্ত করা হবার পরই সূক্ষ্ম বিদ্যার দিকে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন।

লোক ব'লে গণ্য করা হয় কারণ নিম্নের পঞ্চলোকই আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অধিগম্য)---যার মধ্য দিয়ে বিকাশমান সত্তা উত্তরণ করতে পারে তার সিদ্ধিতে।

কিন্তু প্রথমে আমাদের প্রণিধান করা চাই,---চেতনার বিভিন্ন লোক, অস্তিত্বের বিভিন্ন লোক ব'লতে আমরা কি বুঝি। আমরা বুঝি পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কের এক সাধারণ সুস্থির স্থিতি বা জগৎ। কারণ যা কিছুকে আমরা জগৎ বলতে পারি তা হ'ল---আর ইহা ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়---এমন এক সাধারণ সম্পর্কের ধারা যে সম্পর্ক-কে সৃষ্টি অথবা স্থাপিত করেছে এক বিশ্বঅস্তিত্ব নিজের, অথবা বলা যাক তার শাশ্বত তথ্য বা যোগ্যতার এবং তার সম্ভূতির বিভিন্ন সামর্থ্যের মধ্যে। সম্ভূতির সহিত ঐ অস্তিত্বের বিভিন্ন সম্পর্কের অবস্থায় এবং সম্ভূতি সম্বন্ধে তার অনুভূতির অবস্থায় আমরা ঐ অস্তিত্বকে পরুষ বলি, জীবের মধ্যে ব্যষ্টি পুরুষ, বিশ্বের মধ্যে বিশ্বপুরুষ; সম্ভূতির তত্ত্ব ও বিভিন্ন সামর্থ্যকে আমরা বলি প্রকৃতি। কিন্তু যেহেতু সত্তা, সত্তার চিৎ-শক্তি ও আনন্দ সর্বদাই অস্তিত্বের তিনটি উপাদানভূত সংজ্ঞা, সেহেতু যেভাবে প্রকৃতিকে এই তিনটি আদি বিষয় ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত করা হয় এবং তাদের যে রূপ দিতে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়,---বস্তুতঃ সেইভাবে ও সেইসব রূপের দ্বারা জগতের প্রকার নির্ধারিত হবে। কারণ অস্তিত্ব নিজেই তার সম্ভূতির উপাদান এবং সর্বদা তা হ'তে বাধ্য; ইহাকে গঠন করা চাই সেই ধাতুতে যা নিয়ে শক্তিকে কাজ করতে হয়; আবার শক্তির হওয়া চাই সেই সামর্থ্য যা ঐ ধাতুকে কর্মে প্রয়োগ করে, আর তা নিয়ে যে কোনো লক্ষ্য সাধনের জন্য কর্ম করে। শক্তিই সেই বিষয় যাকে আমরা সাধারণতঃ প্রকৃতি বলি। আবার যে লক্ষ্য, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন জগৎ সৃষ্টি হয় তা সাধন করা চাই সেই চেতনার দ্বারা যা সকল অস্তিত্ব ও সকল শক্তি ও তাদের সকল কর্মপ্রণালীতে স্বগত, আর উদ্দেশ্য হওয়া চাই জগতের মধ্যে নিজেকে ও অস্তিত্বের আনন্দকে পাওয়া। যে কোনো জগৎ-অস্তিত্বের অবস্থা ও লক্ষ্যগুলিকে পর্যবসিত হ'তে হবে ঐ উদ্দেশ্যসাধনেই; অস্তিত্বই বিকশিত করছে তার নিজের সত্তার সংজ্ঞাগুলি, তার সত্তার সামর্থ্য, তার সত্তার চিন্ময় আনন্দ; যদি এই সব নিবর্তিত অবস্থায় থাকে, তাদের বিবর্তন আবশ্যক; তারা যদি আবৃত থাকে, তাদের আত্ম-প্রকাশ আবশ্যক।

এখানে পুরুষ বাস করে এক জড় বিশ্বের মধ্যে; একমাত্র ইহার সম্ব-

ক্ষেই সে অব্যবহিতভাবে সচেতন; ঐ বিশ্বের মধ্যে নিজের সব যোগ্যতার বাস্তবতা সাধনের দুরূহ বিষয়টিই তার আসল কাজ। কিন্তু জড়ের অর্থ আত্ম-ভোলা শক্তির মধ্যেও ধাতুর স্ববিভাজক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাবে খণ্ডিত রূপের মধ্যে অস্তিত্বের চিন্ময় আনন্দের নিবর্তন। সুতরাং জড় জগতের সমগ্র তত্ত্ব ও প্রচেষ্টা হবে,—যা নিবর্তিত অবস্থায় আছে তার বিবর্তন এবং যা অবিকশিত রয়েছে তার বিকাশসাধন। এখানে সবকিছু প্রথম থেকেই আচ্ছন্ন রয়েছে জড়শক্তির প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় নিশ্চেতন সুপ্তির মধ্যে; সুতরাং যে কোনো জড়ীয় সম্ভূতির সমগ্র লক্ষ্য হবে নিশ্চেতনের মধ্য থেকে চেতনার জাগরণ; জড়ীয় সম্ভূতির সমগ্র পরিণতি হওয়া চাই জড়ের আবরণের অপসারণ ও সম্ভূতির মধ্যে নিজের আবদ্ধ অন্তঃপুরুষের নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-সচেতন পুরুষের জ্যোতির্ময় প্রকাশ। যেহেতু মানুষ এরূপ এক আবদ্ধ পুরুষ, সেহেতু এই জ্যোতির্ময় মোক্ষ ও আত্ম-জ্ঞান লাভই হবে তার সর্বোত্তম উদ্দেশ্য ও তার সিদ্ধির সর্ত।

কিন্তু এই যে উদ্দেশ্য যা এখনো অত অনিবার্যভাবে ভৌতিক শরীরে জাত মনোময় পুরুষের সর্বোত্তম লক্ষ্য তার যথার্থ সাধনের পক্ষে জড় জগতের বিভিন্ন সংকীর্ণতা প্রতিকূল ব'লে মনে হয়। প্রথমে অস্তিত্ব এখানে নিজেকে রূপায়িত করেছে মূলতঃ জড়রূপে; নিজের আত্ম-অনুভবকারী চিৎশক্তির কাছে ইহাকে স্ববিভাজক জড়ধাতুর রূপে পরাক্‌বৃত্তভাবাপন্ন. ও ইন্দ্রিয়গোচর ও মূর্ত করা হ'য়েছে, এবং এই জড়ের সমাহারের দ্বারা মানুষের জন্য এমন এক ভৌতিক শরীর নির্মাণ করা হয়েছে যা অন্য সব থেকে পৃথক ও বিভক্ত এবং ক্রিয়াধারার সব দৃঢ় রীতির অধীন, অর্থাৎ আমরা যেমন বলি নিশ্চেতন জড়প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়মের অধীন। তার সত্তার শক্তিও জড়ের মধ্যে সক্রিয় প্রকৃতি বা শক্তি যা ধীরে ধীরে নিশ্চেতনা থেকে প্রাণে জাগ্রত হ'য়েছে, আর সর্বদাই রূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সর্বদাই দেহের উপর নির্ভরশীল, ইহার কারণে সর্বদাই (বিশ্ব) প্রাণের অন্য অংশ থেকে ও অন্যান্য প্রাণধারী জীব থেকে পৃথক, নিশ্চেতনার বিভিন্ন বিধান ও শারীরিক জীবনধারণের বিভিন্ন সীমার দ্বারা সর্বদাই তার বিকাশে, স্থায়িত্বে, আত্ম-সিদ্ধিতে বিঘ্নিত। ঠিক সেই রকম, তার চেতনা এমন এক মানসিকতা যা দেহের মধ্যে ও এক তীক্ষ্ণভাবে ব্যষ্টিভাবাপন্ন প্রাণের মধ্যে স্ফুটিত হ'চ্ছে; সুতরাং ইহা তার বিভিন্ন কর্মধারায় ও সামর্থ্যে সীমিত এবং পর্যাপ্ত যোগ্যতাবিহীন বিভিন্ন দৈহিক ইন্দ্রিয়ের

উপর ও অতীব সীমাবদ্ধ প্রাণশক্তির উপর নির্ভরশীল; ইহা বিশ্বমনের অন্য অংশ থেকে পৃথক; আর অন্যান্য মনোময় জীবের চিন্তার মধ্যে তার প্রবেশপথও রুদ্ধ, তাদের আন্তর ক্রিয়া সম্বন্ধে সে তার নিজের মানসিকতার সাদৃশ্যের সাহায্যে এবং তাদের বিভিন্ন অপ্রচুর দৈহিক সংকেত ও আত্ম-প্রকাশ থেকে যতটুকু বুঝতে পারে, তাছাড়া সেসব মানুষের স্থূল মনের কাছে অজ্ঞাত থাকে। তার চেতনা সর্বদাই নিশ্চেতনার দিকে পিছিয়ে পড়ছে, আর এই নিশ্চেতনার মধ্যে তার চেতনার এক বড় অংশ সর্বদাই নিবর্তিত থাকে, তার প্রাণ পিছিয়ে পড়ে মৃত্যুর দিকে, তার দৈহিক সত্তা বিকিরণের দিকে। স্থূল ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ইন্দ্রিয়মানসের উপর প্রতিষ্ঠিত এই অপূর্ণ চেতনা তার পরিবেশের সহিত যেসব সম্পর্ক রাখে তাদের উপর নির্ভর করে তার সত্তার আনন্দ, অর্থাৎ তার সত্তার আনন্দ নির্ভর করে এক সীমিত মনের উপর যা সীমিত দেহ, সীমিত প্রাণশক্তি, সীমিত ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে চেষ্টা করে বাহিরের বিজাতীয় জগৎকে আয়ত্তে আনতে। সুতরাং ইহার অধিকারের সামর্থ্য সীমিত, ইহার আনন্দের শক্তি সীমিত এবং জগতের যেসব স্পর্শ ইহার শক্তির অতিরিক্ত যেসব ঐ শক্তি সহ্য করতে অসমর্থ, আয়ত্তে আনতে, আত্মসাৎ ও অধিগত ক'রতে অসমর্থ সে সবকে বাধ্য হ'য়ে পরিবর্তিত হ'তে হবে এমন কিছুতে যা আনন্দ নয়, যন্ত্রণাতে, অস্বস্তিতে বা বিষাদে। আর না হয় ইহার মোকাবিলা করা চাই ইহাকে গ্রহণ না ক'রে বা ইহার সম্বন্ধে সচেতন না হ'য়ে, অথবা, যদি গ্রহণ করা হয়, ইহাকে সরিয়ে রাখতে হবে উদাসীনতার দ্বারা। তাছাড়া, সত্তার যেরূপ আনন্দ সে অধিগত করে তা সচ্চিদানন্দের আত্ম-আনন্দের মতো স্বাভাবিকভাবে ও শাশ্বতভাবে অধিগত করা হয় না, তা অধিগত করা হয় কালের মধ্যে অনুভব ও অর্জনের দ্বারা, এবং সেহেতু তাকে বজায় রাখার ও দীর্ঘস্থায়ী করার একমাত্র উপায় হ'ল অনুভূতির পুনরাবৃত্তি আর স্বভাবতঃই এই আনন্দ অতীব অনিশ্চিত ও ক্ষণিক।

এই সবের অর্থ এই যে জড় বিশ্বের মধ্যে প্রকৃতির সহিত পুরুষের স্বাভাবিক সব সম্পর্ক হ'ল ইহার সব ক্রিয়াধারার শক্তির মধ্যে চিন্ময়-সত্তার সম্পূর্ণ সমাপত্তি, অতএব পুরুষের সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতি, ও আত্ম-জ্ঞানহীনতা, প্রকৃতির সম্পূর্ণ আধিপত্য এবং প্রকৃতির কাছে পুরুষের অধীনতা। পুরুষ নিজেকে জানে না, যদি সে কিছু জানে, সে জানে শুধু প্রকৃতির কর্মধারা। মানবের মধ্যে ব্যষ্টি আত্ম-সচেতন পুরুষের উদ্‌বর্তনের ফলেই

যে অজ্ঞানতা ও অধীনতার এই সব প্রাথমিক সম্পর্কগুলি দূর হবে তা নয়। কারণ এই পুরুষ বাস করছে অস্তিত্বের এক জড়লোকে অর্থাৎ প্রকৃতির এমন এক স্থিতির মধ্যে যেখানে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্পর্কে জড় এখনো প্রধান নির্ধারক ও তার চেতনা জড়ের দ্বারা সীমিত হওয়ায় এই চেতনা সম্পূর্ণ আত্ম-অধিকারী চেতনা হ'তে অসমর্থ। এমনকি বিশ্বপুরুষও যদি জড়সূত্রের সীমাবদ্ধ হ'ত সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অধিগত করতে অসমর্থ হ'ত; আর ব্যষ্টিপুরুষের সামর্থ্য তো আরো অনেক কম হওয়ায় সে নিজেকে অধিগত করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ; দৈহিক, প্রাণিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতার দরুণ অস্তিত্বের বাকী সব তার কাছে হ'য়ে ওঠে বাহি-রের কিছু অথচ ইহারই উপর সে তার প্রাণ ও তার আনন্দ ও তার জ্ঞানের জন্য নির্ভরশীল। নিজের উপর, ও বিশ্বের উপর মানুষের যে অসন্তোষ তার সমগ্র কারণ হ'ল তার সামর্থ্য, জ্ঞান, প্রাণ, অস্তিত্বের আনন্দের এই সব সীমাগুলি। আর যদি জড় বিশ্বই সব কিছু হ'ত এবং জড়লোকই তার সত্তার একমাত্র লোক হ'ত, তাহ'লে মানুষ, ব্যষ্টিপুরুষ কখনই সিদ্ধি ও আত্ম-সার্থকতা লাভে সমর্থ হ'ত না, আর বাস্তবিকই পশুর জীবন ছাড়া অন্য কোনো জীবনই লাভ করতে পারত না। এমন সব জগৎ থাকতে বাধ্য যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতির এই সব অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক সম্পর্ক থেকে সে মুক্ত অথবা তার সত্তার এমন সব লোক থাকতে বাধ্য যেখানে উত্তরণ ক'রে সে ঐসব সম্পর্কের অতীতে যেতে পারে অথবা অন্ততঃ এমন সব লোক, জগৎ ও উচ্চতর সত্তা থাকতে বাধ্য যাদের থেকে সে নিতে পারে জ্ঞান, বিভিন্ন সামর্থ্য, হর্ষ তার সত্তার বৃদ্ধি অথবা এই সব পেতে তাকে সাহায্য করা হয়, আর তা না হ'লে এই সব পাওয়া অসম্ভব হ'ত। প্রাচীন বিদ্যা বলে যে এই সব বিষয় বর্তমান—অন্যান্য বিভিন্ন জগৎ, উচ্চতর সব লোক; আর সেসবের সহিত যোগাযোগ ও সেসবে উত্তরণ সম্ভব, আর তার উপলব্ধ সত্তার বর্তমান পর্যায়ে যা তার উপরে অবস্থিত তার সহিত সংস্পর্শের দ্বারা ও তার প্রভাবের দ্বারা তার বৃদ্ধিও সম্ভব।

যেমন, পুরুষ ও প্রকৃতির সব সম্পর্কের এমন এক স্থিতি আছে যেখানে জড় প্রথম নির্ধারক, অর্থাৎ জড়ীয় অস্তিত্বের জগৎ বর্তমান, তেমন ঠিক তার উপরে এমন এক স্থিতি আছে যার মধ্যে জড় শ্রেষ্ঠ নয়, বরং যেখানে জড়ের বদলে প্রাণশক্তি প্রথম নির্ধারক। এই জগতে বিভিন্ন রূপ প্রাণের অবস্থা নির্ধারণ করে না, বরং প্রাণই রূপ নির্ধারণ করে, সুতরাং

এখানে রূপগুলি জড়জগতের সব রূপের চেয়ে আরো বেশী স্বতন্ত্র, তরল, এবং অধিকতর এবং আমাদের ধারণায় আশ্চর্য রকমের পরিবর্তনশীল। এই প্রাণশক্তি নিশ্চেতন জড়শক্তি নয়, এমনকি তার নিম্নতম সব ক্রিয়ায় ছাড়া অন্য ক্রিয়াতে অবচেতন শক্তিও নয়, কিন্তু ইহা সত্তার চিৎ-শক্তি যা অগ্রসর হয় গঠনের দিকে, তবে আরো মৌলিক ভাবে উপভোগের দিকে, প্রাপ্তির দিকে, নিজের স্ফুরন্ত সংবেগের তৃপ্তির দিকে। সুতরাং এই যে নিছক প্রাণিক অস্তিত্বের জগৎ, পুরুষ ও প্রকৃতির সব সম্পর্কের এই যে স্থিতি যেখানে প্রাণসামর্থ্য আমাদের স্থূল জীবনযাত্রায় যা ঘটে তার চেয়ে অত অধিকতর স্বাধীনতা ও সামর্থ্যের সহিত সক্রিয়---এখানে কামনা ও সংবেগের তৃপ্তিই প্রথম বিধান; ইহাকে বলা যায় কামনার জগৎ, কারণ তাহাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, স্থূল জীবন যেমন মনে হয় একটি পরিবর্তনশীল সূত্রে নিবদ্ধ ইহা তেমন কোনো একটী পরিবর্তনশীল সূত্রে নিবদ্ধ নয়, বরং ইহা তার স্থিতির অনেক পরিবতন সাধনে সমর্থ। আর তার মধ্যে অনেক উপলোক আছে---যেসব উপলোক জড়ীয় অস্তিত্ব স্পর্শ ক'রে মনে হয় তার মধ্যে মিলিয়ে যায় সেসব থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাণ-সামর্থ্যের তুঙ্গে আছে সেই সব উপলোক যেগুলি শুদ্ধ মানসিক ও চৈত্য অস্তিত্বের সব লোক স্পর্শ ক'রে তাদের মধ্যে মিলিয়ে যায়। কারণ, প্রকৃতির মধ্যে সত্তার অনন্ত পর্যায়ে এমন কোনো প্রশস্ত ব্যবধান নেই, কোনো আকস্মিক খাদ নেই যা লাফ দিয়ে পার হ'তে হবে, ইহার বদলে একটি অন্যটির মধ্যে মিলিয়ে যায়, এক সূক্ষ্ম অনবচ্ছেদ আছে; ইহার মধ্য থেকে তার পৃথক ও সুস্পষ্ট অনুভূতির সামর্থ্য যেসব ক্রম, নির্দিষ্ট স্তর, সুস্পষ্ট পর্যায় তৈরী করে তা দিয়ে অন্তঃপুরুষ জগৎ-অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলিকে নানাভাবে জানে ও অধিগত করে। আবার, কোনো না কোনো প্রকারের উপভোগ কামনার সমগ্র উদ্দেশ্য হওয়ায় তা-ই কামনা-জগতের ঝোঁক হ'তে বাধ্য; কিন্তু যেহেতু যেখানেই পুরুষ মুক্ত নয় ---আর কামনার অধীন থাকলে তার মুক্ত হওয়া সম্ভবও নয়---তার সকল অনুভূতির সদর্থক ও নঙর্থক ভাব থাকবেই, এই জগতে শুধু যে এমন সব বিশাল বা তীব্র বা বিরামহীন উপভোগের সম্ভাবনা আছে যা সীমিত স্থূল মনের কল্পনারও প্রায় অতীত তা নয়, তাতে তেমনই সমান বিশাল কষ্ট-ভোগেরও সম্ভাবনা আছে। এইজন্য এইখানে সেইসব বিভিন্ন নিম্নতম স্বর্গ ও সকল প্রকার নরক অবস্থিত যেসব সম্বন্ধে লোককথায় ও কল্পনায়

মানবমন নিজেকে আদিমতম যুগ থেকে প্রলুব্ধ ও সন্ত্রস্ত রেখেছে। বাস্তবিকই, সকল মানব কল্পনাই কোনো সদ্‌বস্তু বা বাস্তব সম্ভাবনার অনুরূপ, যদিও সেগুলি নিজেরা পৃথকভাবে সম্পূর্ণ অশুদ্ধ চিত্র হ'তে পারে অথবা অতীব স্থূলরূপে প্রকাশিত হ'তে পারে এবং সেজন্য সেগুলি বিভিন্ন অতি-ভৌতিক সদ্‌বস্তুর সত্য প্রকাশের অনুপযুক্ত।

যেহেতু প্রকৃতি এক জটিল ঐক্য, কতকগুলি অসম্বন্ধ ঘটনার সমবায় নয়, সেহেতু জড় অস্তিত্ব ও এই প্রাণিক বা কামনার জগতের মধ্যে এমন কোনো ব্যবধান থাকা অসম্ভব যার উপর সেতু রচনা করা যায় না। প্রত্যুত, এক অর্থে বলা যায় যে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের মধ্যে অবস্থিত এবং কিছু পরিমাণে অন্ততঃ অন্যোন্যনির্ভর। বস্তুতঃ, জড়জগৎ সত্যই প্রাণজগৎ থেকে একপ্রকার প্রক্ষেপ, এমন এক বিষয় যা ইহা বাহিরে নিক্ষেপ ক'রেছে ও নিজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেছে যাতে ইহার কতকগুলি কামনা মূর্ত ও চরিতার্থ হ'তে পারে এমন সব অবস্থার মধ্যে যা ইহার নিজের অবস্থা থেকে ভিন্ন অথচ যেগুলি ইহার নিজেরই অত্যন্ত জড়ীয় আকাঙ্ক্ষার যুক্তিসম্মত পরিণাম। বলা যেতে পারে যে ভৌতিক বিশ্বের জড়ীয় নিশ্চেতন অস্তিত্বের উপর এই প্রাণজগতের চাপের ফলেই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হ'য়েছে। আমাদের নিজেদের ব্যক্ত প্রাণসত্তাও এমন এক বৃহত্তর ও গভীরতর প্রাণসত্তার শুধু এক উপরভাসা পরিণাম যার সঙ্গত স্থান হ'ল প্রাণলোকে আর যার মধ্য দিয়ে আমরা প্রাণজগতের সহিত যুক্ত। উপরন্তু আমাদের উপর অবিরাম প্রাণজগতের ক্রিয়া হ'চ্ছে আর জড়অস্তিত্বের প্রতি বিষয়ের পিছনে আছে প্রাণজগতের উপযুক্ত বিভিন্ন সামর্থ্য; এমনকি সর্বাপেক্ষা স্থূল ও আদিম পদার্থেরও পিছনে আছে তাদের অবলম্বনস্বরূপ বিভিন্ন আদিম প্রাণসামর্থ্য, আদিমসত্তা। প্রাণজগতের বিভিন্ন প্রভাবগুলি সর্বদাই জড়অস্তিত্বের উপর জলধারার মতো নেমে এসে সেখানে তাদের সব সামর্থ্য ও ফল উৎপন্ন ক'রছে, এই সব আবার প্রাণজগতে ফিরে যায় তার পরিবর্তনসাধনের জন্য। আমাদের প্রাণ-অংশ, কামনা-অংশ সর্বদাই সেখানকার স্পর্শ ও প্রভাব পায়; সেখানে শুভ কামনা ও অশুভ কামনার বিভিন্ন হিতকর ও অহিতকর সামর্থ্য আছে আর আমরা তাদের কথা না জানলেও, তাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও তারা আমাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই সব সামর্থ্য যে শুধু প্রবণতা, নিশ্চেতনশক্তি তা নয়, যেগুলি জড়ের সীমায় থাকে সেগুলি ছাড়া, ইহারা অবচেতনও নয়, ইহারা সচেতন

সামর্থ্য, জীবন্ত প্রভাব। যখন আমরা আমাদের অস্তিত্বের উচ্চতর লোক সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ হই তখন আমরা ইহাদের শত্রু বা মিত্র ব'লে জানতে পারি, জানতে পারি যে ইহারা এমন সব সামর্থ্য যা আমাদের অধিগত করার প্রয়াসী বা যে সবকে আমরা আয়ত্ত ক'রে, অভিভূত ক'রে তাদের পিছনে ফেলে ছাড়িয়ে যেতে পারি। প্রাণজগতের সামর্থ্যগুলির সহিত মানুষের সম্ভবপর এই সম্পর্ক ইওরোপীয় গুহ্যবিদ্যার, বিশেষতঃ মধ্যযুগের এই বিদ্যার এক বড় অংশের বিষয় হ'য়েছিল এবং প্রাচীরও কোনো কোনো রূপের যাদুবিদ্যা ও অধ্যাত্মবাদের বড় অংশের বিষয় হ'য়েছিল। অতীতের এই যেসব "কুসংস্কার"--সত্যই অনেক কুসংস্কার ছিল অর্থাৎ অনেক অজ্ঞান-ময় ও বিকৃত বিশ্বাস, মিথ্যা ব্যাখ্যা এবং ওপারের নিয়মগুলির সহিত অজ্ঞ ও বিশ্রী ব্যবহার ছিল--তবু তাদের পিছনে এমন সব সত্য ছিল যা কোনো ভাবী প্রাকৃতবিজ্ঞান জড়জগতের সহিত তার একমাত্র কাজ থেকে নিষ্কৃতি পেলে পুনরাবিষ্কার করতে সমর্থ। কারণ জড়বিশ্বে মনোময় পুরুষের অস্তি-ত্বের মতোই অতিজড়ীয় ও এক সদ্‌বস্তু।

তবে এই যে এত সব আমাদের পিছনে আছে ও সর্বদাই আমাদের উপর চাপ দিচ্ছে তাদের সম্বন্ধে আমরা যে সাধারণতঃ অজ্ঞ তার কারণ কি? সেই একই কারণ যার জন্য আমরা আমাদের প্রতিবেশীর আন্তর-জীবনের কথা জানি না, যদিও আমাদের মতো তাদেরও আন্তরজীবন বর্তমান এবং সর্বদাই আমাদের উপর তার গুহ্য প্রভাব প্রয়োগ করে--কেননা আমাদের ভাবনার ও বেদনার অনেক অংশই আমাদের মধ্যে আসে বাহির থেকে, আমাদের মানবভাইদের থেকে, মানবজাতির ব্যষ্টি জীব ও সমষ্টিগত মন উভয় থেকেই; আর সেই একই কারণে আমরা আমাদের নিজেদেরই সত্তার সেই বৃহত্তর অংশের কথা জানি না যা আমা-দের জাগ্রত মনের কাছে অবচেতন বা অধিচেতন এবং সর্বদাই আমাদের উপরিস্থ জীবনকে প্রভাবিত এবং গুহ্যভাবে নির্ধারণ করছে। এসবের কারণ এই যে আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি শুধু আমাদের দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলি এবং প্রায় পুরোপুরি বাস করি দেহের মধ্যে, ও স্থূল প্রাণ ও স্থূল মনের মধ্যে আর প্রাণজগৎ যে আমাদের সহিত সম্পর্কে আসে তা সরাসরি এসবের মধ্য দিয়ে আসে না। এই সম্পর্কস্থাপনের কাজ হয় আমাদের সত্তার অন্যসব অংশের মাধ্যমে, যাদের উপনিষদে বলা হয় 'কোষ' ও পরবর্তী পরিভাষায় বলা হয় 'শরীর'; অর্থাৎ তা হয় আমাদের

সত্যকার মনোময় পুরুষের বাস যে মনকোষ বা সূক্ষ্মশরীর তার মাধ্যমে এবং প্রাণকোষ বা প্রাণিক শরীরের মাধ্যমে; এই প্রাণকোষ বা প্রাণিক শরীর ভৌতিক বা অন্নকোষের সহিত আরো নিবিড়ভাবে সংযুক্ত আর এই দুয়ে মিলে গঠিত হয় আমাদের জটিল অস্তিত্বের স্থূলশরীর। এই সবের এমন সব সামর্থ্য, ইন্দ্রিয়বোধ ও গ্রহণক্ষমতা আছে যেগুলি সর্বদাই আমাদের মধ্যে সক্রিয় এবং আমাদের বিভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয় ও আমাদের স্থূল প্রাণ ও মানসিকতার গ্রন্থির সহিত সংযুক্ত ও তাদের উপর আঘাত দেয়। আত্ম-বিকাশের দ্বারা আমরা সক্ষম হই ইহাদের কথা জানতে, তাদের মধ্যে আমাদের প্রাণকে অধিগত করতে, তাদের মধ্য দিয়ে প্রাণ-জগৎ ও অপরাপর জগতের সহিত সচেতন সম্পর্কে আসতে এবং আরো সক্ষম হই এমনকি জড় জগতেরই বিভিন্ন সত্য, তথ্য ও ঘটনা সম্বন্ধে অধিকতর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অধিকতর অন্তরঙ্গ জ্ঞানের জন্য তাদের ব্যবহার করতে। এই যে জড়লোক যা এখন আমাদের কাছে সর্বেসর্বা তা ছাড়া আমাদের অস্তিত্বের অন্য সব লোকেও আমরা এই আত্ম-বিকাশের দ্বারা অল্পবিস্তর পূর্ণভাবে বাস ক'রতে সক্ষম হই।

প্রাণজগতের সম্বন্ধে যা বলা হ'য়েছে তা বিশ্ব-অস্তিত্বের আরো উচ্চতর বিভিন্ন লোক সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য, তবে প্রয়োজনীয় কিছু পার্থক্য থাকবে। কারণ ইহার উজানে আছে মনোলোক, মানসিক অস্তিত্বের জগৎ যার মধ্যে প্রাণ বা জড় নয়, মনই প্রথম নির্ধারক। সেখানে মন জড়ীয় অবস্থা বা প্রাণশক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং মনই ইহাদের নির্ধারণ ও ব্যবহার করে নিজের তৃপ্তির জন্য। সেখানে মন অর্থাৎ চৈত্য ও বুদ্ধিসত্তা এক অর্থে স্বাধীন, অন্ততঃ এত স্বাধীন যে ইহা নিজেকে এমনভাবে তৃপ্ত ও চরিতার্থ করতে সক্ষম যে আমাদের দেহ-বদ্ধ ও প্রাণ-বদ্ধ মানসিকতার কল্পনারও একরকম অতীত; কারণ সেখানে পুরুষ শুদ্ধ মনোময় সত্তা আর প্রকৃতির সহিত তার সব সম্পর্ক নির্ধারিত হয় ঐ শুদ্ধতর মানসিকতার দ্বারা, সেখানে প্রকৃতি প্রাণিক ও ভৌতিক না হ'য়ে বরং মানসিক। প্রাণ-জগৎ ও পরোক্ষভাবে জড়লোকও—উভয়ই ঐ মনোলোক থেকে প্রক্ষেপবিশেষ, মনোময় পুরুষের এমন কতকগুলি প্রবণতার ফল যেগুলির প্রয়াস ছিল নিজেদের উপযোগী ক্ষেত্র, বিভিন্ন অবস্থা ও সামঞ্জস্যের আয়োজন লাভ; আর বলা যায় যে এই জগতে মনের উৎপত্তির কারণ হ'ল মনোলোকের চাপ প্রথম প্রাণজগতের উপর এবং ইহার পর জড়অস্তিত্বের মধ্যে প্রাণের

উপর। প্রাণজগতে নিজের পরিবর্তনের দ্বারা ইহা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে কাম-মানস; নিজের অধিকার বলে ইহা আমাদের মধ্যে প্রবুদ্ধ করে আমাদের চৈত্য ও বুদ্ধিগত অস্তিত্বের শুদ্ধতর সব সামর্থ্য। কিন্তু আমাদের উপরিস্থ মানসিকতা হ'ল এক বৃহত্তর অধিচেতন মানসিকতার গৌণ ফল-মাত্র আর এই অধিচেতন মানসিকতার স্বধাম হ'ল মনোলোক। মানসিক অস্তিত্বের এই জগৎও আমাদের উপর ও আমাদের জগতের উপর সততই সক্রিয়, ইহারও বিভিন্ন সামর্থ্য ও সত্তা আছে এবং আমাদের মনোময় শরীরের মাধ্যমে ইহা আমাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত। সেখানে আমরা চৈত্য ও মানসিক স্বর্গগুলিও পাই, আর পুরুষ যখন এই স্থূল শরীর ত্যাগ করে সে ঐসব স্বর্গে উঠে সেখানে সাময়িকভাবে বাস ক'রতে পারে যতক্ষণ না পার্থিব অস্তিত্বের টানে তাকে আবার নীচের দিকে নামিয়ে আনে। এখানেও অনেক লোক আছে, তাদের মধ্যে নিম্নতমটি নীচের সব জগতের উপর এসে প'ড়ে তাদের মধ্যে মিলিয়ে যায় আর মন-সামর্থ্যের তুঙ্গে অবস্থিত উচ্চতম লোকটি মিলিয়ে যায় অধিকতর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের বিভিন্ন জগতের মধ্যে।

সুতরাং এই সব উচ্চতম জগৎ অতিমানসিক; তারা অতিমানসের তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মুক্ত, আধ্যাত্মিক বা দিব্য বুদ্ধি[১] বা বিজ্ঞানের তত্ত্বের এবং সচ্চিদানন্দের ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এইসব থেকেই নিম্নের জগৎগুলি উৎপন্ন আর তা হয় নিজের প্রকৃতির সহিত অন্তঃপুরুষের ক্রিয়ার কতকগুলি বিশিষ্ট বা সংকীর্ণ অবস্থার মধ্যে পুরুষের এক প্রকার পতনের দ্বারা। কিন্তু এইসবও সংযোগের অযোগ্য এমন কোনো ব্যবধানের দ্বারা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; আমাদের উপর তাদের প্রভাব আসে জ্ঞানকোষ ও আনন্দকোষ নামে অভিহিত অংশের মাধ্যমে, কারণ শরীর বা আধ্যাত্মিক শরীরের মাধ্যমে এবং কম সরাসরি মানসিক শরীরের মাধ্যমে, আর তাদের গূঢ় সামর্থ্য সব যে প্রাণিক ও জড়ীয় অস্তিত্বের বিভিন্ন ক্রিয়াধারায় থাকে না তা-ও নয়। প্রাণ ও শরীরের মধ্যে বর্তমান মনোময় সত্তার উপর এই সব পরতম জগতের চাপের ফলেই

১ ইহাকে (Divine intelligence) বলা হয় "বিজ্ঞান" বা "বুদ্ধি" কিন্তু পদটিতে অর্থভ্রম হবার সম্ভাবনা কারণ মানসিক বুদ্ধির বেলাতেও এই পদ প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু মানসিক বুদ্ধি দিব্য বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন এক নিম্ন বুদ্ধিমাত্র।

আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে আমাদের চিন্ময় আধ্যাত্মিক সত্তা ও আমাদের বোধিমূলক মন। কিন্তু আমাদের কথায়, অধিকাংশ মানবেরই এই কারণ শরীর একরকম অবিকশিত, আর সেখানে বাস করা অথবা বিভিন্ন অতি-মানসিক লোকে আরোহণ করা——অবশ্য এইগুলি মানসিক সত্তায় অবস্থিত অনুরূপ উপলোক থেকে পৃথক——মানবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা দুষ্কর বিষয় এবং আরো দুষ্কর সেসবে সচেতনভাবে আবিষ্ট হওয়া। সমাধির তন্ময় অবস্থায় ইহার সাধন সম্ভব, কিন্তু অন্যপ্রকারে ইহার সাধনের একমাত্র উপায় হ'ল ব্যষ্টি পুরুষের সামর্থ্যসমূহের এক নব বিবর্তন, কিন্তু ইহার কথা এমনকি কল্পনা করার ইচ্ছাও একরকম কারুরই নেই। অথচ ইহারই উপর নির্ভর করে সেই সিদ্ধ আত্ম-চেতনা একমাত্র যার দ্বারা পুরুষ সমর্থ হয় প্রকৃতির উপর পূর্ণ সচেতন নিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভে; কারণ সেখানে এমনকি মনও নিম্ন-তর প্রভেদকারী তত্ত্বগুলিকে নির্ধারণ করে না, ইহাদের স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেন পরম চিৎ-পুরুষ তাঁর অস্তিত্বের এমন সব গৌণ সংজ্ঞা হিসাবে যা উচ্চতর তত্ত্বগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর ইহাদের সাহায্যে লাভ করে তাদের নিজেদের সুষ্ঠু সামর্থ্য। একমাত্র তাহাই হবে নিবর্তিত বিষয়ের সম্পূর্ণ বিবর্তন এবং অবিকশিত বিষয়ের বিকাশ আর ইহার জন্য পুরুষ, যেন নিজের কাছে পণ রেখে এই জড়বিশ্বের মাঝে বেছে নিয়েছেন সর্বাপেক্ষা দুরূহকার্যের অবস্থাগুলি।

বিংশ অধ্যায়

অপরার্ধের ত্রি-পুরুষ

ইহাই বিশ্ব অস্তিত্বের নানাবিধ জগতের এবং আমাদের সত্তার নানাবিধ লোকের গঠনতত্ত্ব; ইহারা যেন এক সোপানশ্রেণী যা নিম্নে জড়ের মধ্যে নেমে গিয়েছে এবং হয়ত তারও নিম্নে গিয়েছে, আর উঠেছে পরম চিৎ-পুরুষের শিখরসমূহে, এমনকি হয়ত সেই বিন্দুতে যেখানে অস্তিত্ব বিশ্বসত্তা থেকে বাহিরে প্রস্থান করে বিশ্বোর্ধ্ব পরমার্থসৎ-এর বিভিন্ন স্তরে—অন্ততঃ এই কথাই বলা হয় বৌদ্ধ জগৎ-সংস্থানের বর্ণনায়। কিন্তু আমাদের সাধারণ জড়ভাবাপন্ন চেতনার কাছে এসবের অস্তিত্ব নেই, কারণ আমরা ব্যস্ত থাকি জড়জগতের এক ক্ষুদ্রকোণের মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে এবং পৃথিবীর উপর একটিমাত্র দেহের মধ্যে নিবদ্ধ আমাদের জীবনরূপী কালের এক ক্ষুদ্র মুহূর্তের তুচ্ছ সব অভিজ্ঞতা নিয়ে আর সেজন্য ঐসব জগৎ ও লোক আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে। ঐ চেতনার কাছে জগৎ হ'ল বিভিন্ন জড়বস্তু ও শক্তির এক স্তূপ যাতে কোনো রকমের এক আকার গড়ে উঠেছে এবং কতকগুলি স্থির স্বপ্রতিষ্ঠ বিধানের দ্বারা বিভিন্ন নিয়মিত গতিবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের শৃঙ্খলা স্থাপিত হ'য়েছে; এইসব বিধানকে আমাদের মানতে হয়, ইহারা আমাদের নিয়ন্ত্রণ ও চারিদিকে সীমাবদ্ধ করে আর ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের যথাশক্তি উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক যাতে আমরা এই যে একটিমাত্র স্বল্পস্থায়ী জীবন যা জন্মে আরম্ভ হয়, মৃত্যুতে শেষ হয় এবং দ্বিতীয়বার আর ফিরে আসে না তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হই। আমাদের আপনসত্তা জড়ের এই বিশ্বপ্রাণের মাঝে অথবা জড়শক্তির কর্মধারার চিরন্তন প্রবাহের মাঝে এক প্রকার আকস্মিক ঘটনা বা অন্ততঃ এক অতি ক্ষুদ্র ও গৌণ ব্যাপার। কোনো রকমে এক অন্তঃপুরুষ বা মন দেহের মধ্যে এসে উপস্থিত হ'য়েছে এবং ভাল ক'রে বোঝে না এমন সব বিষয় ও শক্তির মধ্যে স্খলিত পদে বিচরণ করে; প্রথমে সে এক বিপজ্জনক ও প্রধানতঃ বৈরীভাবাপন্ন জগতের মধ্যে কোনো রকমে দুরূহ জীবনযাপনে ব্যস্ত থাকে এবং পরে ব্যস্ত থাকে ইহার বিভিন্ন বিধান প্রণিধান ও ব্যবহার করার চেষ্টায় যাতে যতদিন জীবন থাকে

ততদিন তাকে যথাসম্ভব সহনীয় বা সুখী করা যায়। যদি বাস্তবিকই আমরা জড়ের মধ্যে ব্যষ্টিভাবাপন্ন মনের এইরূপ এক গৌণ ক্রিয়ার বেশী কিছু না হ'তাম তাহ'লে আমাদের কাছে দেবার মতো অস্তিত্বের আর কিছু থাকত না; ইহার শ্রেষ্ঠ অংশ বড় জোর হ'ত চিরন্তন জড় ও প্রাণের বিভিন্ন বাধার সহিত ক্ষণস্থায়ী বুদ্ধিশক্তি ও সংকল্পের এই সংঘর্ষ, আর তার সঙ্গে কল্পনার বিলাস, এবং আমাদের কাছে ধর্ম ও কলার দেওয়া বিভিন্ন সান্ত্বনা-দায়ক আজব কথা এবং মানুষের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন ও অস্থির কল্পনাশক্তির দেখা সব চমৎকার স্বপ্ন যুক্ত হ'য়ে তার তীব্রতা কমাত।

কিন্তু যেহেতু মানুষ অন্তঃপুরুষ, সে শুধু এক জীবন্ত দেহ নয়, সেহেতু সে কখনই দীর্ঘকাল সন্তুষ্ট থাকতে পারে না যে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই যে প্রাথমিক প্রতীতি,—একমাত্র যে প্রতীতিকে জীবনের বাহ্য ও পরাক্‌বৃত্ত তথ্য সমর্থন করে—তা-ই প্রকৃত সত্য বা সমগ্র জ্ঞান: তার প্রত্যক্‌বৃত্ত সত্তা ওপারের বিভিন্ন সদ্‌বস্তুর ইঙ্গিত ও সংকেতে পূর্ণ, ইহা আনন্ত্য ও অমরত্বের বোধের দিকে উন্মুক্ত, অন্যান্য জগৎ, সত্তার উচ্চতর সম্ভাবনা, অন্তঃপুরুষের জন্য অনুভূতির বৃহত্তর সব ক্ষেত্র—এসব সম্বন্ধেও তার সহজেই দৃঢ় বিশ্বাস আসে। (প্রাকৃতিক) বিজ্ঞান আমাদের দেয় অস্তিত্বের পরাক্‌বৃত্ত সত্য এবং আমাদের অন্নময় ও প্রাণময় সত্তা সম্বন্ধে বাহ্য জ্ঞান; কিন্তু আমরা অনুভব করি যে ইহাদের উজানে এমন সব বিভিন্ন সত্য আছে যেগুলি সম্ভবতঃ আমাদের প্রত্যক্‌বৃত্ত সত্তার উৎকর্ষ ও ইহার বিভিন্ন সামর্থ্যের বিস্তারের দ্বারা আমাদের কাছে উত্তরোত্তর উন্মুক্ত হ'তে পারে। এই জগতের জ্ঞান পাবার পর, ইহার উজানে অস্তিত্বের অন্যান্য অবস্থার জ্ঞানান্বেষণের জন্য আমাদের অদম্য প্রেরণা আসে, আর এইজন্যই উগ্র জড়বাদ ও সন্দেহবাদের যুগের পর সর্বদাই আসে গুহ্যবাদ, নানাবিধ রহস্যময় বিশ্বাস, বিভিন্ন নতুন ধর্ম এবং অনন্ত ও ভগবানের জন্য গভীর-তর এষণার যুগ। আমাদের বাহ্য মানসিকতা ও আমাদের দৈহিক প্রাণের সব বিধানের জ্ঞান যথেষ্ট নয়; ইহা সর্বদাই আমাদের নিয়ে যায় নিম্নে ও পশ্চাতে অবস্থিত প্রত্যক্‌বৃত্ত জীবনের সেই রহস্যময় ও প্রচ্ছন্ন গহনে যার শুধু এক প্রান্ত বা বহিঃপ্রাঙ্গন হ'ল আমাদের উপরভাসা চেতনা। আমরা দেখতে পাই যে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহের কাছে যা উপস্থিত তা বিশ্ব অস্তিত্বের শুধু জড়ীয় খোলক এবং যা আমাদের বাহ্য মানসিকতায় জানা যায় তা পশ্চাতে অবস্থিত অনির্ণীত বিশাল সব মহাদেশের প্রান্তভাগ

মাত্র। এই সবকে অনুসন্ধান ক'রে নির্ণয় করা এমন এক কাজ যা নিশ্চয়ই জড় বিজ্ঞান বা বাহ্য মনোবিদ্যার জ্ঞান ছাড়া অন্য জ্ঞানের অন্তর্গত। নিজেকে ছাড়িয়ে এবং নিজের জীবনের সব প্রত্যক্ষ ও জড় তথ্য ছাড়িয়ে যাবার জন্য ধর্মই মানবের প্রথম প্রয়াস। তার অন্নময় ও মনোময় সত্তার অবলম্বনস্বরূপ এক অনন্ত সম্বন্ধে তার যে আন্তর বোধ এবং ইহার সান্নিধ্যে এসে ইহার সংসর্গে বাস করার জন্য তার অন্তঃপুরুষের যে আস্পৃহা—ইহাদের তার কাছে দৃঢ় ও বাস্তব করাই ধর্মের মুখ্য কাজ। মানব চির-দিন স্বপ্ন দেখেছে যে নিজেকে অতিক্রম ক'রে দৈহিক ও মর্ত্য জীবন পার হ'য়ে অমর জীবন ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের আনন্দের মধ্যে তার উপচয় সম্ভব; কিন্তু এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে তার সাধারণ জীবন কোনো নিশ্চিত আশ্বাস দেয় না; ধর্মের কাজ হ'ল তাকে ঐ সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত করা। ইহা তার এই বোধকেও দৃঢ় করে যে তার ভাগ্য এখন যে জগৎ বা লোকের মধ্যে নির্ধারিত হ'চ্ছে তাছাড়া অস্তিত্বের অন্যান্য লোক বা জগৎও আছে আর এই সব জগতে এই মরণশীলতা এবং অশুভ ও কষ্টভোগের কাছে এই অধীনতা স্বাভাবিক অবস্থা নয়, বরং অমরত্বের আনন্দই চিরন্তন অবস্থা। আনুষঙ্গিকভাবে, ইহা তাকে মর্ত্য জীবনের এমন এক নিয়ম দেয় যার সাহায্যে তার কর্তব্য হ'ল অমরত্বের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। সে পুরুষ, দেহ নয়, আর তার পার্থিব জীবন হ'ল এমন এক উপায় যার দ্বারা সে তার আধ্যাত্মিক সত্তার ভবিষ্যৎ অবস্থাগুলি নির্ধারণ করে। এই সব তো সকল ধর্মেরই সাধারণ কথা, কিন্তু ইহার বেশী তাদের কাছ থেকে আমরা আর কোনো দৃঢ় নিশ্চয়তা পাই না। তারা ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে; কোনো কোনো ধর্ম বলে, পৃথিবীতে আমরা এই একটি জীবনই পাই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য, তারা অন্তঃপুরুষের অতীত অমরত্ব অস্বীকার করে, স্বীকার করে শুধু তার ভবিষ্যৎ অমরত্ব, এমন কি এই অবিশ্বাস্য মত জাহির ক'রে ভয় দেখায় যে যারা সঠিক পথে চলে না তাদের ভবিষ্যতে আছে অনন্তকালের কষ্টভোগ; আবার অন্য যেসব ধর্ম আরো উদার ও যুক্তিসম্মত তারা জন্মান্তর স্বীকার করে, তারা বলে যে এই পর পর জীবনের দ্বারাই অন্তঃপুরুষ উপচিত হয় অনন্তের জ্ঞানের মধ্যে; ইহারা এই সম্পূর্ণ নিশ্চিত আশ্বাসও দেয় যে সকলেরই অন্তিম নিয়তি হ'ল লক্ষ্যপ্রাপ্তি ও সিদ্ধিলাভ। কোনো কোনো ধর্ম আমাদের বলে যে অনন্ত হ'ল আমাদের থেকে ভিন্ন এমন এক পুরুষ যার সহিত আমরা ব্যক্তিগত সকল সম্পর্ক

স্থাপনে সমর্থ, অপর কিছু ধর্ম বলে যে ইহা এক নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব যার মধ্যে আমাদের পৃথক সত্তার লয় সাধন কর্তব্য; সেজন্য কেউ কেউ বলে যে আমাদের নিশানা হ'ল ওপারের এমন সব জগৎ যার মধ্যে আমরা ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করি, অন্যেরা বলে আমাদের লক্ষ্য অনন্তের মধ্যে নিমজ্জনের দ্বারা প্রপঞ্চের উপশম। বেশীর ভাগ ধর্মই আমাদের উপদেশ দেয় যে পার্থিব জীবনকে এক পরীক্ষা বা সাময়িক পীড়া বা অসার কিছু ভেবে সহ্য করা বা ত্যাগ করা চাই এবং ওপারের দিকেই আমাদের সব আশা নিবদ্ধ করা কর্তব্য; কোনো কোনো ধর্মে আমরা এই পৃথিবীর উপর দেহের মধ্যে মানবের সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে পরম চিৎ-পুরুষের, ভগবানের ভবিষ্য বিজয়ের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই এবং এইভাবে তারা যে শুধু জীবের পৃথক আশা ও আস্পৃহা সমর্থন করে তা নয়, জাতির সম্মিলিত ও সমবেদনাপূর্ণ আশা ও আস্পৃহাকেও সমর্থন করে। বস্তুতঃ ধর্ম কোনো জ্ঞান নয়, ইহা এক বিশ্বাস ও আস্পৃহা; অবশ্য ইহার সমর্থনে দুইটি বিষয় আছে---বিশাল আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের অনির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত বোধি-মূলক জ্ঞান এবং যেসব পুরুষ সাধারণ জীবন পার হ'য়ে ঊর্ধ্বে উঠেছেন তাঁদের প্রত্যক্ষবৃত্ত অনুভূতি; কিন্তু ইহা নিজে নিজে আমাদের দেয় শুধু আশা ও বিশ্বাস যাতে আমরা ইহাদের সাহায্যে পরম চিৎ-পুরুষের বিভিন্ন গুপ্ত প্রদেশ ও বৃহত্তর সত্যকে অন্তরঙ্গভাবে পাবার জন্য আস্পৃহা ক'রতে উৎসাহিত হই। আমরা যে সর্বদাই কোনো ধর্মের কিছু সুস্পষ্ট সত্যকে ও প্রতীককে বা কোনো বিশেষ সাধনপন্থাকে কতকগুলি অলঙ্ঘ্য গোঁড়া মতে পরিণত করি তা থেকে বোঝা যায় যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়ে আমরা এখনো শিশুমাত্র, আর এখনো আমরা অনন্তের বিদ্যা থেকে দূরবর্তী।

অথচ প্রতি বড় ধর্মেরই পিছনে, অর্থাৎ ইহার বিশ্বাস, আশা, বিভিন্ন সব প্রতীক, বিক্ষিপ্ত সত্য ও সীমাকারী গোঁড়া মতের বাহ্য দিকের পিছনে আছে আন্তর আধ্যাত্মিক সাধনা ও দীপ্তির গূঢ় দিক যার সাহায্যে প্রচ্ছন্ন সব সত্য জানা যায়, সাধন ও অধিগত করা যায়। প্রতি বাহ্য ধর্মেরই পিছনে এক গূঢ় যোগশাস্ত্র থাকে, অর্থাৎ এক বোধিমূলক জ্ঞান থাকে যার দিকে প্রথম সোপান হ'ল বিশ্বাস, অবর্ণনীয় বিভিন্ন সদ্‌বস্তু থাকে যার সব রূপময় প্রকাশ হ'ল তার বিভিন্ন প্রতীক, ইহার বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত সত্যের গভীরতর তাৎপর্য থাকে, আর থাকে অস্তিত্বের বিভিন্ন উচ্চতর লোকের সব রহস্য যাদের স্থূল ইঙ্গিত ও আভাসন হ'ল তার সব গোঁড়া মত ও

কুসংস্কার। জড়জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ে প্রাথমিক সব বাহ্য-রূপ ও ব্যবহারের বদলে তার বিশাল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিভিন্ন প্রচ্ছন্ন সত্য ও এখনো গূঢ় রয়েছে এমন সব সামর্থ্য এনে এবং আমাদের নিজেদের মনে বিভিন্ন বিশ্বাস ও মতের বদলে পরীক্ষিত অনুভূতি ও গভীরতর বুদ্ধি এনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Science) যে কাজ করে, যোগও সেই কাজ করে আমাদের সত্তার বিভিন্ন উচ্চতর লোক ও জগৎ ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে যেগুলি ধর্মের লক্ষ্য। সুতরাং বন্ধ দুয়ারের পিছনে এই যে সব ক্রম-বিন্যস্ত অনু-ভূতির ভাণ্ডার অবস্থিত যেখানে যাবার চাবিকাঠি মানবের চেতনা ইচ্ছা করলেই পেতে পারে, সে সব ভাণ্ডার এক ব্যাপক জ্ঞানযোগের অন্তর্ভুক্ত; এই যোগকে শুধু পরমার্থ-সৎ এর অন্বেষণে বা ভগবানেব স্বরূপ জ্ঞানের বিষয়ে, অথবা ব্যষ্টি মানবপুরুষের সহিত বিভিন্ন বিবিক্ত সম্পর্কের মধ্যে ভগবানকে জানার বিষয়ে আবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। ইহা সত্য যে পরমার্থ-সৎ এর চেতনাই জ্ঞানযোগের পরতম লক্ষ্য এবং ভগবদ্-প্রাপ্তিই তার প্রথম ও মহত্তম ও সর্বাপেক্ষা আগ্রহের বিষয়, আর কোনো অবর জ্ঞানের জন্য ইহাকে অবহেলা করার অর্থ আমাদের যোগকে হীন অথবা এমনকি তুচ্ছ বোলে কলঙ্কিত করা এবং ইহা বিশিষ্ট লক্ষ্য হারান বা তা থেকে ভ্রষ্ট হওয়া; কিন্তু ভগবানকে জানা হ'লে, আমাদের অস্তিত্বের বিভিন্ন লোকে আমাদের ও জগতের সহিত ভগবানের নানাবিধ সম্পর্কের মধ্যে ভগবদ্-জ্ঞানও জ্ঞানযোগের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। শুদ্ধ আত্ম-সত্তাতে উত্তরণ করাকেই আমাদের প্রত্যক্‌বৃত্ত আত্ম-উন্নয়নের পরাকাষ্ঠা বোলে দৃঢ়ভাবে ধ'রে রেখে আমরা সেই শিখর থেকে বিভিন্ন অবর আত্মাকেও অধিগত করতে পারি, এমনকি তাদের অন্তর্গত যে অন্নময় আত্মা এবং প্রকৃতির সব কর্মপ্রণালী সেসবও অধিগত করতে পারি।

এই জ্ঞানের জন্য আমাদের সাধনা পৃথক পৃথক দুই দিকে সম্ভব—পুরুষের দিকে, প্রকৃতির দিকে; আর ভগবানের আলোকে পুরুষ ও প্রকৃতির নানাবিধ সম্পর্ককে সুষ্ঠুভাবে অধিগত করার জন্য আমরা এই দুই দিককে একত্র করতে পারি। উপনিষদে বলা হয় যে মানুষ ও জগতের মধ্যে, অর্থাৎ পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক পঞ্চপর্বা পুরুষ বিদ্যমান। প্রথম যার কথা আমরা সকলে জানি তা হ'ল অন্নময় পুরুষ, আত্মা বা সত্তা; ইহা এমন এক আত্মা যার সম্বন্ধে মনে হয় শরীর থেকে আলাদাভাবে তাঁর প্রায় কোনো অস্তিত্বই নেই আর শরীরের উপর নির্ভর করে না এমন

কোনো প্রাণিক বা এমন কি মানসিক ক্রিয়াও নেই। জড়জগতের সর্বত্রই এই অন্নময় পুরুষ বিদ্যমান; ইহা শরীর ব্যেপে অবস্থিত, অস্ফুটভাবে ইহার বিভিন্ন গতিবৃত্তি প্রবর্তন করে এবং ইহার সব অনুভূতির সমগ্র ভিত্তি; সকল বিষয়কেই, এমনকি যেসব মানসিক চেতনাসম্পন্ন নয় সে সবকেও ইহা অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু মানবের মধ্যে ইহা প্রাণিকভাবাপন্ন ও মানসিকভাবাপন্ন হ'য়ে উঠেছে; ইহা প্রাণিক ও মানসিক সত্তা ও ঐ প্রকৃতির বিধান ও বিভিন্ন সামর্থ্যের কিছু লাভ করেছে। কিন্তু এইসব তার যে পাওয়া তা গৌণ, যেন তার আদি প্রকৃতির উপর আরোপ করা হ'য়েছে এবং তাদের প্রয়োগ করা হয় ভৌতিক অস্তিত্ব ও ইহার বিভিন্ন করণের বিধান ও ক্রিয়ার অধীনভাবে। আমাদের মানসিক ও প্রাণিক অংশের উপর দেহের ও ভৌতিক প্রকৃতির এই আধিপত্যের জন্যই মনে হয় প্রথম দৃষ্টিতে জড়বাদীদের এই মতের সমর্থন করা হয় যে মন ও প্রাণ শুধু ভৌতিক শক্তির অবস্থা ও পরিণাম এবং ইহাদের সকল বৃত্তিকেই প্রাণী-শরীরস্থ ঐ শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বস্তুতঃ, দেহের নিকট মন ও প্রাণের এই সম্পূর্ণ অধীনতাই অবিকশিত মানবজাতির বিশিষ্ট লক্ষণ, যেমন ইহা মানবের অধস্তন প্রাণীদেরও এক বিশিষ্ট লক্ষণ, অবশ্য এখানে এমনকি আরো বেশী মাত্রায়। পুনর্জন্মবাদের কথা এই যে যারা পার্থিব জীবনে এই অবস্থা পার হয় না তারা মৃত্যুর পর মানসিক বা উচ্চতর প্রাণের জগতে উঠতে অক্ষম; বরং বিভিন্ন ভৌতিক লোকের শ্রেণীর প্রান্তভাগ থেকে তাদের ফিরে আসতে হয় পরবর্তী পার্থিব জীবনে আরো বিকাশসাধনের উদ্দেশ্যে। কারণ অবিকশিত অন্নময় পুরুষ জড় প্রকৃতির ও নিজের সংস্কারের সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন এবং তার কর্তব্য হ'ল আগে এই সবকে আরো শ্রেয়স্করভাবে ব্যবহার করা তবে যদি সে সক্ষম হয় সত্তার ক্রমবিন্যাসে আরো ঊর্ধ্বে আরোহণ ক'রতে।

অধিকতর বিকশিত মানবজাতি আমাদের সুবিধা দেয় যাতে আমরা সক্ষম হই সত্তার প্রাণময় ও মনোময় লোক থেকে প্রাপ্ত সকল সামর্থ্য ও অনুভূতির আরো শ্রেয়স্কর ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে, যাতে এই সব প্রচ্ছন্ন লোক থেকে আরো সাহায্যের জন্য আমরা আরো বেশী প্রবণ হই, স্থূল লোকের মধ্যে আমরা আরো কম নিবিষ্ট থাকি এবং যাতে আমরা কাম-লোক থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মহত্তর প্রাণিক শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা, মহত্তর ও সূক্ষ্মতর মানসিক শক্তির দ্বারা এবং চৈত্যিক ও বুদ্ধিময় লোক থেকে

প্রাপ্ত সামর্থ্যের দ্বারা সক্ষম হই অন্নময় সত্তার আদি প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ ও কিছু পরিবর্তন সাধনে। এই বিকাশের দ্বারা আমরা মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মাঝে মধ্যবর্তী অস্তিত্বের আরো উচ্চ শিখরে উঠতে সক্ষম হই, আর সক্ষম হই পুনর্জন্মেরই আরো শ্রেয়স্কর ও দ্রুত ব্যবহারে আরো উচ্চতর মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাহ'লেও, আমাদের যে অন্নময় সত্তা তখনো আমাদের জাগ্রত আত্মার অধিকাংশকে নির্ধারণ করে তার মধ্যে আমরা কাজ করি আমাদের ক্রিয়ার উৎস যেসব জগৎ বা লোক তাদের সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট চেতনা না নিয়েই। অবশ্য অন্নময় সত্তার প্রাণলোক ও মনোলোক সম্বন্ধে আমরা অবগত থাকি কিন্তু যথার্থ প্রাণলোক ও মনোলোক সম্বন্ধে অথবা আমাদের সাধারণ চেতনার পশ্চাতে যে মহত্তর ও বৃহত্তর প্রাণময় ও মনোময় পুরুষ আমরা হই তার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। বিকাশের শুধু এক উচ্চ অবস্থাতেই আমরা তাদের কথা জানতে পারি কিন্তু তখনো তা জানি সাধারণতঃ শুধু আমাদের মানসিকভাবাপন্ন স্থূল প্রকৃতির ক্রিয়ার পশ্চাতে; আমরা ঐসব লোকে প্রকৃতই বাস করি না, কারণ তা যদি ক'রতাম তাহ'লে আমরা প্রাণ-সামর্থ্যের দ্বারা অতিশীঘ্রই দেহকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারতাম এবং এই দুইকেই নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারতাম "নেতা" মনের দ্বারা; তখন আমরা আমাদের সংকল্প ও জ্ঞানকে আমাদের সত্তার প্রভু ক'রে তাদের দ্বারা আমাদের শারীরিক ও মানসিক জীবনকে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে সমর্থ হ'তাম। অন্নময় আত্মাকে অতিক্রম করার এবং উচ্চতর সব আত্মাকে অধিগত করার এই সামর্থ্য যোগের দ্বারা অর্জন করা যায় আরো উন্নীত ও প্রসারিত আত্ম-চেতনা ও আত্ম-ঈশনার মাধ্যমে।

পুরুষের দিক থেকে ইহা করা সম্ভব অন্নময় আত্মা থেকে এবং ভৌতিক প্রকৃতির সহিত তার নিবিষ্টতা থেকে সরে এসে এবং মনন ও সংকল্পের একাগ্রতার মাধ্যমে নিজেকে প্রথম প্রাণময় আত্মার ও পরে মনোময় আত্মার মধ্যে উন্নীত ক'রে। ঐ উপায়ের দ্বারা আমরা প্রাণময় পুরুষ হ'য়ে অন্নময় আত্মাকে ঐ নব চেতনার মধ্যে ঊর্ধ্বে নিয়ে আসতে সক্ষম হই যাতে আমরা দেহ, ইহার প্রকৃতি ও ইহার সব ক্রিয়াকে শুধু জানি আমরা বর্তমানে যে প্রাণ-পুরুষ তার এমন গৌণ অবস্থা ব'লে যেগুলি প্রাণ-পুরুষ ব্যবহার করে জড়জগতের সহিত তার বিভিন্ন সম্পর্কের জন্য। অন্নময় সত্তা থেকে এক প্রকার দূরে থাকার ভাব এবং তাছাড়া ইহার উপর শ্রেষ্ঠত্ব;

দেহ শুধু এক যন্ত্র বা খোল এবং ইহাকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়,—এইরূপ এক সুস্পষ্ট বোধ; আমাদের অন্নময় সত্তা ও প্রাণ-পরিবেশের উপর আমাদের বিভিন্ন কামনার অসাধারণ কার্যকারিতা; যে প্রাণ-শক্তি সম্বন্ধে আমরা এখন সুস্পষ্টভাবে সচেতন হ'য়ে উঠি তাকে ব্যবহার ও চালনা করার বিষয়ে সামর্থ্য ও আয়াসের এক প্রখর বোধ; কারণ আমরা বাস্তবভাবে অনুভব করি যে ইহার ক্রিয়া দেহের সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে ভৌতিক এবং ইহা এক প্রকার সূক্ষ্ম ঘনত্বে মনের দ্বারা ব্যবহৃত ক্রিয়াশক্তি রূপে আমাদের বোধগম্য; অন্নময় লোকের ঊর্ধ্বে আমাদের মধ্যে প্রাণলোক সম্বন্ধে আমাদের সংবিৎ এবং কামনা-জগতের বিভিন্ন সত্তার সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাদের সহিত সংযোগ; বিভিন্ন নতুন সামর্থ্যের বিকাশ ও সক্রিয়তা —যেগুলিকে সাধারণতঃ গুহ্য সামর্থ্য বা সিদ্ধি বলা হয়; জগতের মধ্যে প্রাণ-পুরুষ সম্বন্ধে এক নিবিড় বোধ ও তার সহিত সমবেদনা এবং অপর ব্যক্তিদের বিভিন্ন ভাবাবেগ, কামনা, প্রাণিক সংবেগ সম্বন্ধে জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়-সংবিৎ;—এইসব হ'ল যোগলব্ধ এই নব চেতনার কতকগুলি নিদর্শন।

কিন্তু এই সকল সামর্থ্য আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিভিন্ন অবর পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত এবং বাস্তবিকই স্থূল অস্তিত্বের চেয়ে এমন বেশী আধ্যাত্মিক কিছু নয়। এইভাবে আমাদের আরো উচ্চে যেতে হবে এবং নিজেদের তুলতে হ'বে মনোময় আত্মার মধ্যে। তা-ই ক'রে আমরা মনোময় আত্মা হ'য়ে অন্নময় ও প্রাণময় সত্তাকে ইহার মধ্যে ঊর্ধ্বে নিয়ে আসতে সক্ষম হই যাতে প্রাণ ও দেহ ও তাদের বিভিন্ন ক্রিয়া আমাদের কাছে হ'য়ে ওঠে আমাদের সত্তার এমন সব গৌণ অবস্থা যেগুলি আমরা বর্তমানে যে মন-পুরুষ তার দ্বারা ব্যবহৃত হয় জড় অস্তিত্বের অন্তর্গত বিভিন্ন অবর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এখানেও আমরা প্রথমে লাভ করি প্রাণ ও দেহ থেকে এক প্রকার দূরে থাকার ভাব আর মনে হয় যে আমাদের প্রকৃত জীবন জড়াসক্ত মানবের লোক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য এক লোকে অবস্থিত এবং ইহা পার্থিব অস্তিত্ব অপেক্ষা আরো সূক্ষ্ম অস্তিত্বের সহিত, পার্থিব জ্ঞানা-লোক অপেক্ষা আরো বিশাল জ্ঞানালোকের সহিত এবং এক অতীব বিরল অথচ আরো মহতী ক্রিয়া-শক্তির সহিত সংযুক্ত; বস্তুতঃ আমরা মনোময় লোকের সংস্পর্শে আসি, মনোময় সব জগতের কথা জানতে পারি, ইহার বিভিন্ন সত্তা ও সামর্থ্যের সহিত যোগাযোগেও সমর্থ হই। ঐ লোক থেকে আমরা কামনা-জগৎ ও জড় অস্তিত্বকে দেখি যেন ইহারা আমাদের নিম্নে

অবস্থিত, এমন বিষয় এই সব যে ইচ্ছা করলেই আমরা ইহাদের দূরে নিক্ষেপ করতে পারি আমাদের থেকে এবং বস্তুতঃ যখন আমরা দেহত্যাগ করি তখন ইহাদের সহজেই বর্জন করি যাতে আমরা বিভিন্ন মানসিক বা চৈত্যিক স্বর্গে অধিষ্ঠিত হই। কিন্তু এইরূপ দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার বদলে আমরা বরং প্রাণ ও দেহ ও প্রাণলোক ও মনোলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও হ'তে পারি এবং প্রভুত্বের সহিত সে সবের উপর সক্রিয় হ'তে পারি আমাদের সত্তার নব উচ্চলোক থেকে। ভৌতিক বা প্রাণিক ক্রিয়া-শক্তি ছাড়া অন্য এক প্রকার কলনা—এমন কিছু যাকে আমরা বলতে পারি শুদ্ধ মন-সামর্থ্য ও আত্ম-শক্তি, যা অবশ্য বিকশিত মানুষ ব্যবহার করে তবে পরোক্ষ ও অপূর্ণভাবে কিন্তু যা আমরা এখন ব্যবহার করতে পারি স্বচ্ছন্দে ও সজ্ঞানে—তা-ই হ'য়ে ওঠে আমাদের ক্রিয়ার সাধারণ ধারা, আর সেসময় কামনাশক্তি ও শারীরিক ক্রিয়া গৌণ হ'য়ে পড়ে, তাদের শুধু ব্যবহার করা হয় তাদের পিছনে অবস্থিত এই নবশক্তির যোগে এবং ইহার সাময়িক প্রণালীরূপে। বিশ্বস্থিত মনের সঙ্গেও আমাদের সংযোগ ও সম-বেদনা থাকে, ইহার সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি, সকল ঘটনার পিছনে অবস্থিত সেইসব বিভিন্ন অভিপ্রায়, নির্দেশ, বিভিন্ন মনন-শক্তি এবং সূক্ষ্ম সামর্থ্যসমূহের সংগ্রাম সম্বন্ধেও অবগত থাকি যে সব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অজ্ঞ অথবা স্থূল ঘটনা থেকে শুধু অস্পষ্ট ভাবে অনুমানে সক্ষম অথচ যেসব আমরা এখন প্রত্যক্ষভাবে দেখতে ও অনুভব করতে পারি তাদের ক্রিয়ার কোনো স্থূল নিদর্শন বা এমনকি প্রাণিক সংবাদ আসার আগেই। আবার অপর বিভিন্ন সত্তার মনোক্রিয়ার জ্ঞান ও বোধও আমরা অর্জন করি, তা এই সব সত্তা অন্নলোকের হ'ক বা ইহার উপরের সব লোকের হ'ক; এবং মনোময় পুরুষের মহত্তর বিভিন্ন সামর্থ্য অর্থাৎ গুহ্য সামর্থ্য বা সিদ্ধি যেগুলি প্রাণলোকের বিশিষ্ট সব সামর্থ্য বা সিদ্ধি অপেক্ষা আরো বেশী বিরল বা সূক্ষ্মতর প্রকারের স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চেতনায় জেগে ওঠে।

এই সব কিন্তু আমাদের সত্তার অপরার্ধের ত্রিজগতের, প্রাচীন ঋষিদের "ত্রৈ লোক্যের" অবস্থা। এইসব লোকে আমরা যতদিন বাস করি, ততদিন আমাদের সব সামর্থ্য ও আমাদের চেতনার প্রসার যতই হ'ক না কেন, আমরা তখনো বাস করতে থাকি বিশ্বদেবগণের এলাকার মধ্যে এবং পুরুষের উপর প্রকৃতির শাসনের অধীন থাকি, যদিও এই অধীনতা অনেক

পরিমাণে সূক্ষ্মতর, সহজতর ও লঘুতর। প্রকৃত স্বাধীনতা ও ঈশনা লাভ করতে হ'লে প্রয়োজন হ'ল আমাদের সত্তার বহু-অধিত্যকাযুক্ত পর্বতের আরো উচ্চতর স্তরে আরোহণ করা।

একবিংশ অধ্যায়

স্বোত্তরণের সোপান

এই যে অপর ত্রি-সত্তা ও অপর ত্রি-লোক যার মধ্যে সাধারণতঃ আমাদের চেতনা এবং ইহার বিভিন্ন সামর্থ্য ও পরিণাম সীমাবদ্ধ তা থেকে উত্তরণকে বৈদিক ঋষিরা বর্ণনা করেছেন যেন ইহা অন্তরীক্ষ ও পৃথ্বী— এই দুই "রোদসী" ছাড়িয়ে বা ভেদ ক'রে উজানযাত্রা; এই উত্তরণের ফলে অনন্ততার এমন ক্রম-পরম্পরা উন্মুক্ত হয় যার সহিত মানবের সাধারণ সত্তার এমনকি তার সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও ব্যাপ্ত অবস্থাতেও এখনো কোনো পরিচয় নেই। এই উচ্চতার মধ্যে, এমনকি এই ক্রম-পরম্পরায় নিম্নতম ধাপেও আরোহণ করা তার পক্ষে দুরূহ। এক বিচ্ছেদ যা স্বরূপতঃ অসত্য হ'লেও কার্যতঃ প্রখর মানবের সমগ্র সত্তাকে, পিণ্ডকে বিভক্ত করে, আবার তেমন ইহা বিভক্ত করে জগৎ-সত্তাকেও, ব্রহ্মাণ্ডকেও। উভয়েরই এক উচ্চ ও নিম্ন গোলার্ধ আছে, ইহারাই প্রাচীন জ্ঞানের পরার্ধ ও অপরার্ধ। পরার্ধ হ'ল পরম চিৎ-পুরুষের পূর্ণ ও শাশ্বত রাজ্য; কারণ এখানে ইহা অবিরাম ও অক্ষুণ্ণভাবে ব্যক্ত করে ইহার আনন্ত্যরাজি, বিলসিত করে ইহার অসীম অস্তিত্বের, ইহার অসীম চেতনা ও জ্ঞানের, ইহার অসীম শক্তি ও সামর্থ্যের, ইহার অসীম আনন্দের অনাবৃত মহিমপুঞ্জ। ঠিক তেমনই অপরার্ধও পরম চিৎ-পুরুষের অধিকারভুক্ত, কিন্তু এখানে ইহা তার যে সীমাকারী মন, আবদ্ধ প্রাণ ও বিভাগকরা দেহের অবর আত্ম-প্রকাশ তার দ্বারা নিবিড়ভাবে, ঘন আচ্ছাদনে আবৃত। অপরার্ধের মধ্যে আত্মা নামরূপের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকে; আন্তর ও বাহ্যের, ব্যষ্টি ও সামান্যের মধ্যে বিভাজনের দ্বারা ইহার চেতনা খণ্ডিত; ইহার দৃষ্টি ও বোধ বহির্মুখী (পরাক্‌বৃত্ত); ইহার শক্তি ইহার চেতনার বিভাজনের দ্বারা সীমিত হওয়ায় কাজ করে শৃঙ্খলবদ্ধ হ'য়ে; ইহার জ্ঞান, সংকল্প, সামর্থ্য, আনন্দ এই বিভাজনের দ্বারা বিভক্ত হওয়ায়, এই সীমার দ্বারা সীমিত হওয়ায় উন্মুক্ত থাকে সেসবের বিপরীত বা বিকৃত রূপের দিকে, অজ্ঞানতা, দুর্বলতা ও কষ্টভোগের দিকে। অবশ্য আমরা আমাদের বোধ ও দর্শনকে প্রত্যাক্‌বৃত্ত (অন্তর্মুখী) ক'রে নিজেদের মধ্যে প্রকৃত আত্মা বা চিৎ-পুরুষের কথা

অবগত হ'তে সক্ষম; সেই আত্মা বা চিৎপুরুষকে আমরা আবার বাহ্য জগৎ ও ইহার ঘটনাবলীর মধ্যেও আবিষ্কার করতে সক্ষম, আর তার উপায় হ'ল সেখানেও বোধ ও দৃষ্টিকে নাম ও রূপের আবরণের মধ্য দিয়ে আন্তর মগ্ন ক'রে তাদের মধ্যে যা আবিষ্ট বা না হয় তাদের পশ্চাতে যা দণ্ডায়মান তাতে পৌছান। এই অন্তর্মুখী দৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের সাধারণ চেতনা প্রতিবোধের দ্বারা জানতে পারে আত্মার অনন্ত সত্তা, চেতনা ও আনন্দের কথা এবং এই সব বিষয়ের নিষ্ক্রিয় বা স্থিতিক আনন্ত্যের অংশভাক্ হতেও পারে। কিন্তু আমরা ইহার জ্ঞান, সামর্থ্য ও হর্ষের সক্রিয় বা স্ফুরন্ত অভিব্যক্তির অংশ পেতে পারি শুধু অতীব সীমিত পরিমাণে। এমনকি প্রতিবোধের দ্বারা এই যে স্থিতিক তাদাত্ম্য লাভ তা-ও সাধারণতঃ দীর্ঘ ও দুরূহ সাধনা ব্যতীত সম্ভব হয় না এবং তা-ও হয় বহু জন্মের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর আত্মবিকাশের ফলে; কারণ আমাদের সাধারণ চেতনা তার সত্তার অপরার্ধের বিধানে অতি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ থাকে। ইহাকে আদৌ উত্তরণ করা সম্ভব কি না তা বুঝতে হ'লে আমাদের কর্তব্য যেসব জগৎ নিয়ে এই দুই গোলার্ধ গঠিত তাদের সব সম্পর্ক ব্যবহারিক সূত্রাকারে পুনর্বার বলা।

সকল কিছুই পরম চিৎ-পুরুষের দ্বারা নির্ধারিত হয়, কারণ সূক্ষ্মতম অস্তিত্ব থেকে সূক্ষ্মতম জড় পর্যন্ত সকল কিছুই পরম চিৎ-পুরুষের অভিব্যক্তি। কিন্তু এই চিৎ-পুরুষ, আত্মা বা সত্তা যে জগতের মধ্যে বাস করে সেই জগৎকে এবং ঐ জগতের মধ্যে ইহার চেতনা, শক্তি ও আনন্দের সব অনুভূতিতে নির্ধারণ করে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কের অনেক সম্ভবপর স্থিতির মধ্যে কোনো এক স্থিতির দ্বারা—যেটি তার নিজেরই কোনো না কোনো বিশ্বতত্ত্বের অন্তর্গত কোনো ভিত্তিমূলক স্থিতি। জড়তত্ত্বের মধ্যে স্থিত হ'য়ে ইহা হ'য়ে ওঠে জড় প্রকৃতির শাসনের মধ্যে এক ভৌতিক বিশ্বের অন্নময় আত্মা; তখন চিৎ-পুরুষ বিভোর থাকে জড় সম্বন্ধে তার অনুভূতির মধ্যে; জড় অস্তিত্বের বিশিষ্ট তামসিক সামর্থ্যের অজ্ঞানতা ও নিশ্চেষ্টতার দ্বারা ইহা অভিভূত হয়। জীবের মধ্যে ইহা হ'য়ে ওঠে জড়ভাবাপন্ন পুরুষ, "অন্নময় পুরুষ" যার প্রাণ ও মন বিকশিত হ'য়েছে জড়তত্ত্বের অজ্ঞানতা ও নিশ্চেষ্টতার মধ্য থেকে এবং যা এই সবের মৌলিক সীমাগুলির অধীন। কারণ জড়ের মধ্যকার প্রাণ কাজ করে দেহের অধীন হ'য়ে; জড়ের মধ্যকার মন কাজ করে দেহের এবং প্রাণিক বা স্নায়বিক

সত্তার অধীন হ'য়ে; জড়ের মধ্যে চিৎ-পুরুষ নিজেই তার আত্ম-সম্পর্ক ও তার বিভিন্ন সামর্থ্য বিষয়ে এই জড়শাসিত ও প্রাণ-তাড়িত মনের বিভিন্ন সীমা ও বিভাজনের দ্বারা সীমিত ও বিভক্ত। এই অন্নময় পুরুষ স্থূল শরীরে এবং ইহার সংকীর্ণ ভাসাভাসা বাহ্য চেতনায় বদ্ধ হ'য়ে বাস করে এবং ইহা সাধারণতঃ ইহার বিভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয়ের, ইহার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বোধের, ইহার জড়বদ্ধ প্রাণ ও মনের সব অনুভূতিকে এবং তাদের সহিত বড় জোর কিছু সীমিত আধ্যাত্মিক অস্পষ্ট আভাসকে গ্রহণ করে অস্তিত্বের সমগ্র সত্য ব'লে।

মানব এক চিৎ-পুরুষ, কিন্তু এমন চিৎ-পুরুষ যে জড় প্রকৃতির মধ্যে বাস করে মনোময় পুরুষ হ'য়ে; তার নিজের আত্ম-চেতনার কাছে সে স্থূল দেহের মধ্যে এক মন। কিন্তু প্রথমে সে যে মনোময় পুরুষ তা জড়-ভাবাপন্ন এবং সে জড়ভাবাপন্ন পুরুষকে, অন্নময় পুরুষকে তার প্রকৃত আত্মা ব'লে গ্রহণ করে। উপনিষদের কথায়, সে জড়কে (অন্নকে) ব্রহ্ম ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য হয় কারণ এখানে তার দৃষ্টি দেখে যে অন্নই সেই বিষয় যা থেকে সকল কিছুর জন্ম, যার দ্বারা সকল কিছু জীবনধারণ করে এবং যার মধ্যে সকল কিছু তাদের প্রয়াণে প্রত্যাবর্তন করে। চিৎ-পুরুষ সম্বন্ধে তার স্বাভাবিক সর্বোচ্চ প্রত্যয় হ'ল ইহা এক অনন্ত, বরং এক নিশ্চেতন অনন্ত যা জড় বিশ্বে (আর একমাত্র ইহাকেই সে বাস্তবিক জানে) বাস করে বা তা ব্যেপে থাকে এবং ইহার উপস্থিতির সামর্থ্যের দ্বারা তার চারিদিকে এই সকল রূপ অভিব্যক্ত করে। নিজের সম্বন্ধে তার স্বাভাবিক সর্বোচ্চ ভাবনা এই যে সে অন্তঃপুরুষ বা চিৎ-পুরুষ, তবে ইহার সম্বন্ধে তার ভাবনা অস্পষ্ট, আর সে এমন এক অন্তঃপুরুষ যা শুধু ভৌতিক জীবনের অনুভূতির দ্বারা অভিব্যক্ত ভৌতিক ঘটনাবলীর সহিত জড়িত এবং ইহার বিনাশে স্বয়ংক্রিয় রীতির বশে বাধ্য হয়ে ফিরে যায় অনন্তের বিশাল নির্বিশেষতার মধ্যে। কিন্তু তার আত্ম-বিকাশের সামর্থ্য থাকায়, সে অন্নময় পুরুষের এই সব স্বাভাবিক ভাবনা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম; আর সক্ষম এই সবের পরিপূরক হিসাবে বিভিন্ন অতি-ভৌতিক লোক ও জগৎ থেকে লওয়া কিছু অনুভূতি যোগ ক'রতে। সে মনে একাগ্র হ'য়ে তার সত্তার মানসিক অংশ পুষ্ট করতে সক্ষম, তবে সাধারণতঃ ইহাতে তার প্রাণিক ও শারীরিক জীবনের পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হয়; পরিশেষে মন প্রাধান্য লাভ ক'রে ওপারের দিকে উন্মুক্ত হ'তে সক্ষম হয়।

এই আত্ম-মুক্ত-করা মনকে সে একাগ্র ক'রতে পারে পরম চিৎপুরুষে। এখানেও এই প্রক্রিয়ায় সে সাধারণতঃ তার পূর্ণ মানসিক ও শারীরিক জীবন থেকে উত্তরোত্তর বিমুখ হয়; প্রকৃতির মধ্যে তার জড়গত ভিত্তির সামর্থ্য অনুযায়ী সে যথাসম্ভব তাদের সব সম্ভাবনাকে সীমিত বা নিরুৎ-সাহ করে। পরিশেষে তার আধ্যাত্মিক জীবন প্রাধান্য লাভ ক'রে ধ্বংস করে তার পৃথ্বীমুখী প্রবণতা এবং ছিন্ন করে ইহার সব বন্ধন ও সীমা। আধ্যা-ত্মিকভাবাপন্ন হ'য়ে সে তার প্রকৃত অস্তিত্ব স্থাপিত করে ওপারে অন্য সব জগতে, প্রাণময় বা মনোময় লোকের স্বর্গে; পৃথিবীর উপর এই জীবনকে সে দেখতে শুরু করে যেন ইহা এক যন্ত্রণাপূর্ণ বা কষ্টকর ঘটনা বা যাত্রা যাতে সে তার আন্তর আদর্শ আত্মার, তার আধ্যাত্মিক স্বরূপের পূর্ণ উপভোগে কখনই সমর্থ হ'বে না। উপরন্তু আত্মা বা চিৎ-পুরুষ সম্বন্ধে তার সর্বোচ্চ ভাবনায় ইহাকে সে অল্পবিস্তর শান্ত ধারণা করতেই প্রবণ; কারণ আমরা যেমন দেখেছি, সে যা সম্পূর্ণ অনুভব করতে সক্ষম তা শুধু তার স্থিতিক আনন্ত্য, প্রকৃতির দ্বারা সীমিত নয় এমন পুরুষের নিশ্চল স্বাধীনতা, প্রকৃতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছে এমন পুরুষ। অবশ্য তার মধ্যে কিছু দিব্য স্ফুরন্ত অভিব্যক্তি আসা সম্ভব, কিন্তু ইহা জড় প্রকৃতির গুরুভার সীমারাজির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উঠতে অক্ষম। নীরব ও নিষ্ক্রিয় আত্মার শান্তিই আরো সহজলভ্য এবং ইহাকেই সে আরো সহজে ও পূর্ণভাবে ধারণ করতে সক্ষম; অনন্ত কর্মপ্রবৃত্তির আনন্দ, অপরিমেয় সামর্থ্যের কল্পনা (dyna-mis) লাভ করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য।

কিন্তু চিৎ-পুরুষ জড়তত্ত্বে স্থিত না হ'য়ে স্থিত হ'তে পারে প্রাণতত্ত্বে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লে চিৎ-পুরুষ হ'য়ে ওঠে সচেতনভাবে স্ফুরন্ত প্রকৃতির রাজত্বে এক প্রাণময় জগতের প্রাণময় আত্মা, এক প্রাণ-ক্রিয়াশক্তির প্রাণ-ময় পুরুষ। সচেতন প্রাণের সামর্থ্য ও বিলাসের বিভিন্ন অনুভূতিতে বিভোর হ'য়ে ইহা বশীভূত হয় কামনা, প্রবৃত্তি ও প্রচণ্ড ভাবাবেগের যেগুলি প্রাণিক অস্তিত্বের বিশিষ্ট রাজসিক তত্ত্বের অন্তর্গত। জীবের মধ্যে এই চিৎ-পুরুষ হ'য়ে ওঠে প্রাণময় পুরুষ যার প্রকৃতিতে প্রাণ-শক্তিগুলি উৎপীড়ন করে মানসিক ও ভৌতিক তত্ত্বসমূহকে। প্রাণজগতের মধ্যে ভৌতিক পদার্থ তার সব ক্রিয়া ও রচনা সহজেই গঠন করে কামনা ও ইহার সব কল্পনা অনুযায়ী এবং প্রাণের বেগ ও সামর্থ্যের ও তাদের বিভিন্ন রচনার দাস হ'য়ে তাদের আদেশ পালন করে, আর তাদের ইহা প্রতিহত বা সীমিত

করে না যেমন ইহা করে এইখানে পৃথিবীতে যেখানে নিষ্প্রাণ জড়ের মধ্যে প্রাণ এক অনিশ্চিত ঘটনা। প্রাণসামর্থ্যের দ্বারা মানসিক পদার্থও গঠিত ও সীমিত হয়, ইহা তার আদেশ পালন করে এবং সহায় হয় শুধু তার বিভিন্ন কামনার প্রেরণাকে ও তার বিভিন্ন সংবেগের শক্তিকে সমৃদ্ধ ও চরিতার্থ করার কাজে। এই প্রাণময় পুরুষ বাস করে এক প্রাণিক দেহে যা ভৌতিক জড়ের চেয়ে অনেক সূক্ষ্মতর এক দ্রব্যে গঠিত; ইহা এমন এক দ্রব্য যা চিন্ময় ক্রিয়াশক্তির দ্বারা পূর্ণ এবং এমন সব অনুভব, সামর্থ্য, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি লাভে সমর্থ যেসব পৃথ্বীজড়ের স্থূল আণবিক পদার্থ দিতে পারে এরূপ যে কোনো বিষয় অপেক্ষা অনেক বেশী বলশালী। মানবেরও নিজের মধ্যে তার অন্নময় সত্তার পশ্চাতে আছে এই প্রাণময় পুরুষ, এই প্রাণিক প্রকৃতি ও এই প্রাণিক শরীর যা অন্নময় সত্তার অধিচেতনস্তরে অবস্থিত, অ-দেখা ও অ-জানা ভাবে তবে অতি সন্নিকটে এবং ইহার সহিত যুক্ত হ'য়ে গঠন করে তার অস্তিত্বের সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ভাবে সক্রিয় অংশ; প্রাণ-জগৎ বা কামনা-জগতের সহিত সংযুক্ত এক সমগ্র প্রাণ-লোক আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, ইহা এমন এক গূঢ় চেতনা যার মধ্যে প্রাণ ও কামনার লীলা চলে বন্ধনহীন ভাবে, তাদের আত্ম-প্রকাশ হয় স্বচ্ছন্দভাবে এবং সেখান থেকে তারা তাদের সব প্রভাব ও রচনা নিক্ষেপ করে আমাদের বহিঃপ্রাণের উপর।

এই প্রাণলোকের সামর্থ্য যে অনুপাতে তার মধ্যে নিজেকে প্রকট করে এবং তার অন্নময় সত্তাকে অধিকার করে, সেই অনুপাতে এই 'পৃথিবীপুত্র' হ'য়ে ওঠে প্রাণ-শক্তির এমন এক বাহন যার সব কামনা প্রবল, সব রাগ-বিকার ও ভাবাবেগ প্রচণ্ড ক্রিয়া তীব্রভাবে স্ফুরন্ত অর্থাৎ সে উত্তরোত্তর হ'য়ে ওঠে রাজসিক মানব। এখন তার পক্ষে তার চেতনায় প্রাণলোকের দিকে উদ্বুদ্ধ হওয়া, এবং প্রাণময় পুরুষ হ'য়ে ওঠা, প্রাণিক প্রকৃতি ধারণ করা এবং প্রত্যক্ষ ভৌতিক শরীরের মতোই গূঢ় প্রাণশরীরেও বাস করা সম্ভবপর হয়। যদি সে কিছু পূর্ণতা বা এক-নিষ্ঠতাসহ এই পরিবর্তন সাধন করে---সাধারণতঃ তা হয় বৃহৎ ও হিতকর সীমার মধ্যে অথবা তার সহিত থাকে নিষ্কৃতিদায়ক বহু জটিলতা---আর যদি সে এইসব বিষয় ছাড়িয়ে না ওঠে, এবং প্রাণের উজানে যে শিখরে এইসবকে ব্যবহার, শুদ্ধ ও উন্নত করা যায় সেখানে সে না আরোহণ করে, তাহ'লে সে হ'য়ে ওঠে নিম্ন চরিত্রের অসুর বা দানব, রাক্ষসপ্রকৃতির, নিছক সামর্থ্য ও প্রাণ-শক্তির

পুরুষ; সে স্ফীত বা প্রপীড়িত হয় অসীম কামনা ও রাগ-বিকারের শক্তির দ্বারা এবং চালিত হয় সক্রিয় সামর্থ্য ও বিশাল রাজসিক অহং দ্বারা, তবে এমন সব সামর্থ্যের অধিকারী সে হয় যেগুলি সাধারণ অপেক্ষাকৃত নিশ্চেষ্ট পৃথ্বী-প্রকৃতির দেহবদ্ধ মানবের সামর্থ্য অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণের ও অনেক বেশী প্রকারের। এমনকি যদি সে প্রাণলোকে মনের বিকাশ সাধন করে প্রচুরভাবে এবং ইহার স্ফুরন্ত শক্তিকে ব্যবহার করে আত্ম-তৃপ্তির জন্য, আবার আত্ম-সংযমের জন্যও, তবু তা হবে আসুরিক তপস্যার সহিত, যদিও ইহা এক আরো উন্নত চরিত্রের এবং ইহার উদ্দেশ্য হবে আরো নিয়ন্ত্রিতভাবে রাজসিক অহং-এর তৃপ্তি সাধন।

কিন্তু যেমন অন্নময় লোকে সম্ভব, তেমন প্রাণময় লোকেরও পক্ষে নিজের প্রকারের কোনো বিশেষ আধ্যাত্মিক মহত্ত্বে আরোহণ করা সম্ভবপর। প্রাণাসক্ত মানুষ ইচ্ছা করলেই কাম-পুরুষ ও কাম-লোকের পক্ষে স্বাভাবিক সব ভাবনা ও ক্রিয়া-শক্তি ছাড়িয়ে নিজেকে তুলতে পারে। সে এক উচ্চতর মানসিকতা বিকাশসাধনে সক্ষম, আর সক্ষম প্রাণময় পুরুষের অবস্থার মধ্যে চিৎ-পুরুষকে অথবা আত্মাকে ইহার বিভিন্ন রূপ ও সামর্থ্যের পশ্চাতে বা উজানে কিছু উপলব্ধি করার জন্য একাগ্র হ'তে। এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে নিষ্ক্রিয় শান্তভাবের আবশ্যকতা অপেক্ষাকৃত কম হবে; কারণ সনাতনের আনন্দ ও সামর্থ্যের সক্রিয় চরিতার্থতাসাধন, স্ফুরন্ত অনন্তের আরো বলশালী ও আত্ম-তৃপ্ত সব সামর্থ্যের, আরো সমৃদ্ধ বিকাশসাধনের সম্ভাবনা আরো অনেক বেশী হবে। কিন্তু তথাপি ঐ চরিতার্থতাসাধন কখনই প্রকৃত ও অখণ্ড সিদ্ধির কাছাকাছিও আসতে সক্ষম হবে না; কারণ কামনা-জগতের সব অবস্থা অন্নময় জগতের অবস্থার মতোই সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে অনুপযোগী। প্রাণপুরুষেরও কর্তব্য আমাদের অস্তিত্বের অপরার্ধে তার প্রাণের পূর্ণতা, সক্রিয়তা ও শক্তি ক্ষুণ্ণ ক'রেও চিৎ-পুরুষের বিকাশসাধন করা এবং পরিশেষে প্রাণিক সূত্র থেকে, প্রাণ থেকে সরে এসে তার উজানে অবস্থিত নীরবতা বা অনির্বচনীয় সামর্থ্যে যাওয়া। যদি সে প্রাণ থেকে না সরে আসে, তাহ'লে তাকে প্রাণের শৃঙ্খলেই বদ্ধ থাকতে হবে, এবং কামনা-জগতের শুধু নিজের অধিকার বলে এবং ইহার প্রবল রাজসিকতত্ত্বের দরুণ ইহার অধোমুখী আকর্ষণের দ্বারা তার আত্ম-চরিতার্থতাও সীমিত হবে। প্রাণময় লোকেও সম্পূর্ণ সিদ্ধি অসম্ভব; যে পুরুষ শুধু অতদূর পৌছয় তাকে মহত্তর অনুভূতি, উচ্চতর

আত্ম-বিকাশ, চিৎ-পুরুষের আরো সোজাভাবে উত্তরণের জন্য ফিরে আসতে হবে স্থূল জীবনের মধ্যে।

জড় ও প্রাণের উপরে আছে মনের তত্ত্ব, যা বিষয়সমূহের গূঢ় প্রভবের আরো নিকটবর্তী। মনে স্থিত পরম চিৎ-পুরুষ হ'য়ে ওঠে মনোময় জগতের মনোময় আত্মা এবং সেখানে আবিষ্ট থাকে নিজেরই শুদ্ধ ও জ্যোতির্ময় মানসিক প্রকৃতির রাজত্বে। সেখানে ইহা কাজ করে বিশ্ব বুদ্ধির অতীব স্বাধীনতার মধ্যে; আর ইহার সহায়ে থাকে চৈত্য মানসিক ও উচ্চতর ভাবপ্রধান মনঃশক্তির সম্মিলিত সব ক্রিয়া যেগুলি মনোময় অস্তিত্বের বিশিষ্ট সাত্ত্বিক তত্ত্বের স্বচ্ছতা ও প্রসন্নতার দ্বারা সূক্ষ্মভাবাপন্ন ও আলোকিত হয়। জীবের মধ্যে ঐরূপ স্থিত চিৎ-পুরুষ হ'য়ে ওঠে মনোময় পুরুষ যার প্রকৃতিতে মনের স্বচ্ছতা ও জ্যোতির্ময় সামর্থ্য কাজ করে নিজের অধিকারেই, প্রাণিক বা দৈহিক সব করণের কোনো সীমার বা উৎপীড়নের অনধীন হ'য়ে; বরং ইহাই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে ইহার দেহের বিভিন্ন রূপ এবং ইহার প্রাণের বিভিন্ন সামর্থ্য। কারণ মন তার নিজের লোকে প্রাণের দ্বারা সীমিত বা জড়ের দ্বারা ব্যাহত হয় না, যেমন ইহা হয় এখানে পৃথ্বী-ক্রিয়াধারায়। এই মনোময় পুরুষ বাস করে এক মনোময় বা সূক্ষ্মদেহে যা জ্ঞান, অনুভব, ও অপর সব সত্তার সহিত সমবেদনা ও পারস্পরিক আন্তরবোধের এমন সব সামর্থ্য ভোগ করে যা একরকম আমাদের কল্পনার অতীত; ইহাদের সহিত তার থাকে এমন এক স্বচ্ছন্দ, সূক্ষ্ম ও ব্যাপক মানসিকভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়-শক্তি যা প্রাণ-প্রকৃতির বা জড় প্রকৃতির স্থূলতর সব অবস্থার দ্বারা সীমিত হয় না।

মানবেরও নিজের মধ্যে অধিচেতন স্তরে, অজানা ও অদেখা ভাবে, তার জাগ্রত চেতনা ও স্থূল শরীরের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় এই মনোময় পুরুষ, মানসিক প্রকৃতি ও মনোময় শরীর আছে আর আছে এক মনোময় লোক যা জড়ভাবাপন্ন নয় এবং যার মধ্যে মনের তত্ত্ব স্বচ্ছন্দে কাজ করে; এই যে জগৎ যা ইহার বিজাতীয়, ইহার স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক এবং ইহার শুদ্ধতা ও স্বচ্ছতানাশক, তার সহিত ইহা যেমন সংঘর্ষে রত, ইহা এখানে মনোলোকে তেমন সংঘর্ষে রত নয়। যে অনুপাতে এই মনোলোক মানবের উপর চাপ দেয়, সেই অনুপাতে তার বিভিন্ন উচ্চতর শক্তি, তার বুদ্ধিপ্রধান ও চিত্ত-মানসিক সত্তা ও সামর্থ্যগুলি, তার উচ্চতর ভাবপ্রধান প্রাণ জাগ্রত ও উপচিত হয়। কারণ ইহা যতই প্রকট হয়, স্থূল অংশগুলি ততই ইহার

প্রভাবাধীন হয় এবং দেহবদ্ধ প্রকৃতির অনুরূপ মনোলোক ইহার দ্বারা ততই সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়। ইহার ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের কোনো এক বিশেষ মাত্রায়, ইহা মানবকে করতে পারে সত্যকারের মানব, শুধু এক যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী নয়; কারণ ইহা তখন আমাদের অন্তঃস্থ মনোময় পুরুষকে ইহার বিশিষ্ট শক্তি দেয়; এই মনোময় পুরুষই আমাদের মানব-জাতির মনস্তাত্ত্বিক গঠনের সারতত্ত্ব যা আন্তরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যদিও এখনো ইহা নিরতিশয় বাধাগ্রস্ত।

এই উচ্চতর মানসিক চেতনায় প্রবুদ্ধ হওয়া, এই মনোময় পুরুষ হওয়া,[১] এই মানসিক প্রকৃতি ধারণ করা এবং শুধু প্রাণময় ও অন্নময় কোষে বাস না ক'রে এই মনোময় শরীরেও বাস করা মানবের পক্ষে সম্ভব। যদি এই রূপান্তরে পর্যাপ্ত সম্পূর্ণতা থাকত তাহ'লে সে এমন এক জীবন ও সত্তা লাভে সক্ষম হ'ত যা অন্ততঃ অর্ধদিব্য। কারণ সে এমন দৃষ্টি ও বিভিন্ন সামর্থ্য ও অনুভব উপভোগ করত যা এই সাধারণ জীবন ও শরীরের ক্ষেত্রের অতীত; সে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করত শুদ্ধজ্ঞানের স্বচ্ছতার দ্বারা, অন্যসব সত্তার সহিত সে যুক্ত হ'ত প্রেম ও সুখের সম-বেদনার দ্বারা, তার ভাবাবেগগুলি উন্নীত হ'ত চৈত্য-মানসিক লোকের পূর্ণতায়; তার ইন্দ্রিয়সংবিৎগুলি উদ্ধার পেত স্থূলতা থেকে, তার সূক্ষ্ম শুদ্ধ ও নমনীয় ধীশক্তি মুক্তি পেত অশুদ্ধ প্রাণিক ক্রিয়া-শক্তি ও জড়ের সব বাধা থেকে। আব, যে কোনো মানসিক হর্ষ ও জ্ঞান অপেক্ষা পরতর প্রজ্ঞা ও আনন্দের প্রতিবোধও সে বিকশিত করত, কারণ সে আরো পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ ক'রতে পারত অতিমানসিক আলোকের শরস্বরূপ বিভিন্ন চিদাবেশ ও বোধি যাতে অক্ষম মনের বিকৃতকারী ও মিথ্যাজনক মিশ্রণ থাকত না এবং সে গঠন করতে পারত তার উৎকৃষ্ট মানসিক অস্তিত্ব ঐ বৃহত্তর জ্যোতির ছাঁচে ও সামর্থ্যে। তখন সে আত্মা বা পরম চিৎ-

১ এখানে আমি 'মন' বলতে শুধু যে মানুষের সাধারণ জানা উচ্চতম স্তব ধ'রেছি তা নয়, সেই সব আবো উচ্চতর স্তরও ইহার অন্তগত যেগুলিতে প্রবেশ করার হয় তার বর্তমানে কোনো শক্তি নেই, নয় তাদেব বিভিন্ন সামথ্যের এক ক্ষীণ অংশকে শুধু আংশিক ও মিশ্রিতভাবে গ্রহণ করা হয়—অর্থাৎ প্রভাস মন, বোধি এবং সবশেষ সৃজনক্ষম অধিমানস বা মায়া যা অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত এবং আমাদের বর্তমান অস্তিত্বের উৎস। যদি মন ব'লতে শুধু যুক্তিবুদ্ধি বা মানুষীবুদ্ধি বোঝায় তাহ'লে স্বাধীন মনোময় পুরুষ ও ইহার অবস্থা এমন কিছু হ'ত যা তাদের সম্বন্ধে এখানে যে বর্ণনা দেওয়া হ'ল তার চেয়ে অনেক বেশী সীমিত ও অতীব নিম্ন শ্রেণীর।

পুরুষকেও উপলব্ধি করতে পারত এখন যা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বিশালতর এবং আরো জ্যোতির্ময় ও আরো প্রগাঢ় তীব্রতায় এবং তার অস্তিত্বের পরিতৃপ্ত সুষমার মধ্যে ইহার সক্রিয় সামর্থ্য ও আনন্দের বৃহত্তর লীলার সহিত।

আর আমাদের সাধারণ ধারণায় ইহাই মনে হবে এক পূর্ণ সিদ্ধি, এমন কিছু যার জন্য মানব আদর্শবাদের চরমে উঠেও আস্পৃহা করতে পারে। ইহা নিঃসন্দেহ যে শুদ্ধ মনোময় পুরুষের যা নিজস্ব স্বভাব তাতে ইহা এক পর্যাপ্ত সিদ্ধি, কিন্তু তখনো ইহার স্থান আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মহত্তর বিভিন্ন সম্ভাবনার অনেক নিম্নে। কেননা এখানেও আমাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মনের বিভিন্ন সীমার অধীন থাকবে, আর মন হ'ল যেন এক প্রতিফলিত, মিশ্রিত ও বিকীর্ণ অথবা সংকীর্ণভাবে তীব্র আলোক, ইহা চিৎ-পুরুষের বৃহৎ ও ব্যাপক স্বপ্রতিষ্ঠ দীপ্তি ও হর্ষ নয়। ঐ বৃহত্তর আলোক, ঐ গভীরতর আনন্দ মনের নাগালের অতীত। বাস্তবিকই মন কখনই চিৎ-পুরুষের সুষ্ঠু যন্ত্র হ'তে পারে না; ইহার ক্রিয়ার কোনো পরম আত্ম-প্রকাশ সম্ভব নয়, কারণ তার স্বভাবই হ'ল পৃথক করা, বিভক্ত করা, সীমা টানা। এমনকি যদি মন সকল সদর্থক অনৃত ও প্রমাদ থেকে মুক্ত হ'তে পারত, এমনকি যদি ইহা পুরোপুরি বোধিসম্পন্ন ও অভ্রান্তভাবে বোধিসম্পন্ন হ'তে পারত, তাহ'লেও ইহার ক্ষমতা হ'ত শুধু বিভিন্ন অর্ধ-সত্য বা পৃথক সত্য আনা ও সংগঠন করা আর এসবকে যে আনত তা-ও তাদের নিজেদের আকারে নয়, তা হ'ত বিভিন্ন জ্যোতির্ময় প্রতিমূর্তিতে যেগুলিকে একত্র রাখা হ'ত যাতে কোনো রাশীকৃত সমগ্র বা স্তূপময় গঠন নির্মিত হয়। সুতরাং এখানে আত্ম-সিদ্ধি প্রয়াসী মনোময় পুরুষের কর্তব্য হ'ল হয় নিজের অবর অস্তিত্ব বর্জন ক'রে শুদ্ধ চিৎ-পুরুষের মধ্যে প্রস্থান করা, আর না হয় স্থূল জীবনের উপর ফিরে আসা তার মধ্যে এমন এক সামর্থ্য বিকাশ করার জন্য যা এখনো পর্যন্ত আমাদের মানসিক ও চৈত্য প্রকৃতিতে পাওয়া যায় নি। ইহাই উপনিষদের সেই কথার মর্ম যাতে বলা হয় যে মন পুরুষের দ্বারা লব্ধ স্বর্গ হ'ল তা-ই যাতে মানবকে নিয়ে যায় সূর্যের রশ্মিসমূহ অর্থাৎ অতিমানসিক ঋতচেতনার বিকীর্ণ, বিভক্ত যদিও প্রখর সব কিরণ আর সেখান থেকে ফিরে আসতে হয় পার্থিব অস্তিত্বে। কিন্তু যেসব জ্ঞানদীপ্ত সাধক পার্থিব জীবন ত্যাগ ক'রে "সূর্যদ্বারের" মধ্য দিয়ে উজানে চলে যায় তারা সেখান থেকে ফেরে না। যে মনোময় পুরুষ তার

নিজ লোক ছাড়িয়ে যায় সে প্রত্যাবর্তন করে না কেননা ঐ সংক্রমণের দ্বারা সে অস্তিত্বের এমন এক উচ্চ লোকে যায় যা পরার্ধের বিশিষ্ট লোক। সে ইহার মহত্তর আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে এই অপরার্ধের ত্রিতত্ত্বের মধ্যে নামিয়ে আনতে অক্ষম, কারণ এখানে মনোময় পুরুষই আত্মার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। এখানে এই ত্রিবিধ মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় শরীর প্রায় আমাদের সামর্থ্যের সম্পূর্ণ ক্ষেত্র, তারা ঐ মহত্তর চেতনার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়; এই আধার এমনভাবে তৈরী হয় নি যে ইহার মধ্যে কোনো মহত্তর দেবতা ধারণ করা যায় বা এই অতিমানসিক শক্তি ও জ্ঞানের জ্যোতির স্থান হয়।

এই যে সসীমতা তা বর্তমান থাকে শুধু ততদিন যতদিন মানব আবদ্ধ থাকে মানসিক মায়ার পরিসীমার মধ্যে। যদি সে সর্বোচ্চ মানসিক আয়তন ছাড়িয়ে ওঠে জ্ঞান-আত্মার মধ্যে, যদি সে হ'য়ে ওঠে জ্ঞান-পুরুষ, বিজ্ঞানে স্থিত চিৎ-পুরুষ, "বিজ্ঞানময় পুরুষ" এবং ধারণ করে ইহার অনন্ত সত্য ও সামর্থ্যের প্রকৃতি, যদি সে বাস করে জ্ঞানকোষে, কারণ শরীরে, এবং আবার এই সব সূক্ষ্ম মানসিক কোষে ও তার সহিত সংযুক্ত প্রাণময় ও স্থূলতর অন্নময় কোষে, তাহ'লে তখন এবং কেবল তখনই সে সমর্থ হবে তার পার্থিব অস্তিত্বের মধ্যে পুরোপুরি নামিয়ে আনতে অনন্ত আধ্যাত্মিক চেতনার পূর্ণতা; কেবল তখনই সে উপযুক্ত হ'বে তার সমগ্র সত্তাকে, এমনকি তার সমগ্র ব্যক্ত দেহবদ্ধ প্রকাশমান প্রকৃতিকে তুলতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে। কিন্তু ইহা অত্যধিক দুষ্কর; যেহেতু, কারণ শরীর নিজেকে সহজেই উন্মুক্ত করে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক লোকের চেতনা ও সামর্থ্য-রাজির নিকট এবং ইহার যে প্রকৃতি তাতে ইহা অস্তিত্বের পরার্ধের অন্তর্ভূক্ত কিন্তু মানবের মাঝে ইহা হয় আদৌ বিকশিত হয় নি, নয় এ-পর্যন্ত শুধু অপরিণতভাবে বিকশিত ও সংহত হয়েছে এবং আমাদের অন্তঃস্থ অধিচেতন লোকের বহু মধ্যবর্তী দ্বারের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন আছে। ইহা তার উপাদান আনে সত্য-জ্ঞানের লোক থেকে, এবং অনন্ত আনন্দের লোক থেকে এবং এইসব পুরোপুরি আরো অগম্য পরার্ধের অন্তর্গত। ইহারা তাদের সত্য ও আলোক ও হর্ষ বর্ষণ করে এই অপর অস্তিত্বের উপর এবং যেসবকে আমরা আধ্যাত্মিকতা বলি, যেসবকে সিদ্ধি বলি সেসবের উৎস তারাই। কিন্তু তাদের এই অন্তর্বর্ষণ আসে পুরু সব আবরণের পিছন থেকে এবং ইহাদের মধ্য দিয়ে এসে যখন তারা পৌঁছয় তখন তারা এত

মিশ্রিত ও ক্ষীণ যে তারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে আমাদের বিভিন্ন স্থূল অনুভবের জড়ীয়তার মধ্যে, অতিমাত্রায় বিকৃত ও দূষিত হয় আমাদের সব প্রাণিক সংবেগের মধ্যে, তারা আমাদের ভাবনাপর এষণার মধ্যেও দূষিত হয়, যদিও কিছু কম পরিমাণে, এমনকি আমাদের মানসিক প্রকৃতির সর্বোচ্চ বোধিসম্পন্ন বিভিন্ন স্তরের অপেক্ষাকৃত শুদ্ধতা ও প্রখরতার মধ্যেও তারা দূষিত হয় তবে আরো কম পরিমাণে। সকল অস্তিত্বের মধ্যেই অতিমানসিক তত্ত্ব নিগূঢ়ভাবে নিহিত। এমন কি স্থূলতম জড়ীয়তার মধ্যেও ইহা বর্তমান, বিভিন্ন অবর জগৎকে ইহা রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করে তার গুপ্ত সামর্থ্য ও বিধানের বলে; কিন্তু ঐ সামর্থ্য নিজেকে অবগুণ্ঠিত রাখে এবং ঐ বিধান কাজ করে অলক্ষিতভাবে আমাদের শারীরিক, প্রাণিক ও মানসিক প্রকৃতির হীনতর নিয়মের শৃঙ্খলিত সব সীমা ও পঙ্গু বিকৃতির মধ্য দিয়ে। তবু হীনতম রূপগুলিরও মধ্যে এই যে তার উপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ তা থেকে আমরা আশ্বাস পাই—আর এই আশ্বাসের কারণ হ'ল সকল অস্তিত্বের ঐক্য—যে সকল আবরণ সত্ত্বেও, আমাদের রাশিরাশি আপতিক অক্ষমতা সত্ত্বেও, আমাদের মন, ও প্রাণ ও দেহের অসামর্থ্য বা অনিচ্ছুকতা সত্ত্বেও তাদের জাগরণ সম্ভবপর, এমনকি এখানে তাদের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিও সম্ভবপর। আর যা সম্ভবপর তা একদিন হবেই, কারণ তাহাই সর্বশক্তিমান চিৎ-পুরুষের বিধান।

পুরুষের এই সব পরতর অবস্থার স্বরূপ এবং তাদের যে সব আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিভিন্ন জগৎ তাদের স্বরূপ অবধারণ করা স্বভাবতঃই দুরূহ। এমনকি উপনিষদ এবং বেদও শুধু তাদের আভাস দেয় বিভিন্ন সংকেতে, ইঙ্গিতে ও প্রতীকে। তবু দুই গোলার্ধের সীমানায় অবস্থিত মনের দ্বারা যতদূর আয়ত্ত করা সম্ভব ততদূর তাদের সব নীতি ও ব্যবহারিক ফল সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেওয়ার প্রয়াস করা প্রয়োজনীয়। ঐ সীমানার অতীতে যাওয়াই আত্মজ্ঞানের দ্বারা স্বোত্তরণ-যোগের পরাকাষ্ঠা, সম্পূর্ণতা। উপনিষদ বলে সিদ্ধির অভীপ্সু পিছনে সরে এসে উপরে যায়, অন্নময় পুরুষ থেকে প্রাণময় পুরুষে, আবার প্রাণময় পুরুষ থেকে মনোময় পুরুষে—মনোময় পুরুষ থেকে বিজ্ঞানময় পুরুষে এবং ঐ বিজ্ঞানময় আত্মা থেকে আনন্দময় পুরুষে। এই আনন্দময় আত্মা পূর্ণ সচ্চিদানন্দের চিন্ময় প্রতিষ্ঠা এবং তার মধ্যে প্রয়াণেই সমাপ্ত হয় পুরুষের উৎক্রান্তি। সুতরাং দেহবদ্ধ চেতনার এই যে সুনিশ্চিত রূপান্তর, আমাদের সদা অভীপ্সু প্রকৃ-

তির এই যে জ্যোতির্ময় রূপান্তর ও স্বোত্তরণ—–তার কিছু বর্ণনা নিজের কাছে দেবার চেষ্টা করা মনের অবশ্য কর্তব্য। মন যে বর্ণনা পেতে সক্ষম তা কখনই বিষয়ের স্বরূপের পক্ষে পর্যাপ্ত হ'তে পারে না, তবে অন্ততঃ তার কিছু আভাস-দেওয়া ছায়ার অথবা হয়ত কোনো অর্ধ-ভাস্বর প্রতিমূর্তির ইঙ্গিত দেওয়া ইহার পক্ষে সম্ভব।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিজ্ঞান

আমাদের সুষ্ঠু স্বোত্তরণে আমরা আমাদের মনোময় চিন্ময় সত্তার অজ্ঞানতা বা অর্ধ-আলোকিত অবস্থা থেকে বাহিরে ও উপরে প্রয়াণ করি তার ঊর্ধ্বে এক মহত্তর প্রজ্ঞা-আত্মা ও সত্য-সামর্থ্যের মধ্যে যাতে আমরা সেখানে বাস করতে পারি দিব্য জ্ঞানের নির্বাধ আলোকের মধ্যে। আমরা যে মনোময় মানব তা পরিবর্তিত হয় ঋত-চিৎ দেবে, 'বিজ্ঞানময় পুরুষে'। আমাদের উৎক্রান্তি শৈলের এই সানুর উপর আসীন হ'য়ে আমরা থাকি বিরাট পুরুষের এই জড়ীয়, এই প্রাণিক, এই মানসিক স্থিতি থেকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন লোকে এবং এই পরিবর্তনের সাথে আমাদের পুরুষ-জীবন ও আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সকল দৃষ্টি ও অনুভূতিরও পরিবর্তন হয়। আমরা জন্ম লই এক নব পুরুষ-অবস্থার মধ্যে এবং ধারণ করি এক নব প্রকৃতি; কারণ পুরুষের যে অবস্থা, প্রকৃতিরও সেই অবস্থা হয়। জগৎ-উৎক্রান্তির প্রতি সংক্রমণে, জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে, বদ্ধ মন থেকে মুক্ত বুদ্ধিতে, যেমন যেমন প্রচ্ছন্ন, অর্ধ-ব্যক্ত বা ইতিপূর্বেই ব্যক্ত হ'য়েছে এমন অন্তঃপুরুষ সত্তার উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে ওঠে, প্রকৃতিও তেমন তেমন উন্নীত হয় অস্তিত্বের এক মহত্তর কর্ম-ধারায়, আরো বিস্তৃত চেতনায়, আরো বিপুল শক্তিতে এবং আরো প্রগাঢ় বৃহৎ ক্ষেত্রে ও হর্ষে। কিন্তু মন-আত্মা থেকে বিজ্ঞান-আত্মায় সংক্রমণ যোগের মহৎ ও চূড়ান্ত সংক্রমণ। ইহার অর্থ আমাদের উপর বিশ্ব অবিদ্যার শেষ বন্ধনেরও অপসারণ এবং আমাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা বিষয়সমূহের পরম সত্যে, এমন এক অনন্ত ও শাশ্বত চেতনায় যাকে তমসাচ্ছন্নতা, মিথ্যা, কষ্টভোগ বা প্রমাদ দ্বারা কলুষিত করা যায় না।

ইহাই প্রথম শিখর যা দিব্য পূর্ণতার, "সাধর্ম্যের", "সাদৃশ্যের" মধ্যে প্রবেশ করে; কারণ বাকীসব শুধু তার দিকে ঊর্ধ্বে তাকায় অথবা তার তাৎপর্যের কিছু কিরণ আহরণ করে। মনের বা অধিমানসের উচ্চতম শিখরগুলিও এক হ্রাস-পাওয়া অবিদ্যার পরিধির অন্তর্গত; তারা কিছু দিব্য আলোক বক্রভাবে নিতে সক্ষম কিন্তু ইহার সামর্থ্য হ্রাস না ক'রে আমাদের

অবর অঙ্গসমূহে ইহাকে চালনা করতে অক্ষম। কারণ যতদিন আমরা মন, প্রাণ ও দেহ---এই ত্রিস্তরের মধ্যে থাকি, ততদিন আমাদের সক্রিয়া প্রকৃতি কাজ করতে থাকে অজ্ঞানতার শক্তিতে, এমনকি তখনো যখন মনের মধ্যকার অন্তঃপুরুষ জ্ঞানের কিছুটা অধিগত করে। এমনকি যদি অন্তঃপুরুষ তার মানসিক চেতনায় জ্ঞানের সকল বিশালতাকেই প্রতিফলিত বা বিবৃত করত, তাহ'লেও সে ইহাকে ক্রিয়ার শক্তিতে সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে সক্ষম হ'ত না। তার ক্রিয়ায় শক্তি হয়ত প্রচুর বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু তবু সত্যের পশ্চাতে এমন এক সংকীর্ণতা থাকবে, তখনো সত্য বিভক্ত হবার এত বেশী সম্ভাবনা থাকবে যে অনন্তের সামর্থ্যে অখণ্ডভাবে তার কাজ করা সম্ভব হবে না। সাধারণ সামর্থ্যগুলির তুলনায় দিব্যভাবাপন্ন প্রভাস মনের সামর্থ্য বিপুল হ'তে পারে, কিন্তু তখনো ইহা অক্ষমতার অধীন থাকবে এবং কার্যসাধক সংকল্পের শক্তি এবং ইহার প্রেরণাদায়ক ভাবনার আলো---এ দুয়ের মধ্যে কোনো সঙ্গতি থাকা সম্ভব হবে না। অনন্ত সান্নিধ্য সেখানে থাকতে পারে স্থিতিশীল পাদে কিন্তু প্রকৃতির ক্রিয়াগুলির প্রবৃত্তি তখনো অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত, ইহার কর্মপ্রণালীর ত্রিগুণ অনুসারেই ইহা চলতে বাধ্য এবং ইহার অন্তঃস্থ মহত্ত্বের কোনো পর্যাপ্ত রূপ দিতে ইহা অক্ষম। অকৃতকার্যতা, আদর্শ সংকল্প ও কার্যসাধক সংকল্পের মধ্যে ব্যবধান আমাদের আন্তর চেতনায় আমরা যে সত্যকে অনুভব করি তাকে জীবন্ত রূপ ও ক্রিয়ায় ফুটিয়ে তুলতে এই যে আমাদের নিরন্তর অক্ষমতা---এই সবের যে দুঃখময় পরিস্থিতি তা পদে পদে ব্যাহত করে মন ও প্রাণের সকল আস্পৃহাকে তাদের পশ্চাতে অবস্থিত দিব্যত্ব লাভের পথে। কিন্তু বিজ্ঞান শুধু সত্য নয়, ইহা সত্য-সামর্থ্যও, ইহা অনন্ত ও দিব্য প্রকৃতির নিজস্ব কর্মধারা; ইহা সেই দিব্য জ্ঞান যা স্বতঃস্ফূর্ত ও জ্যোতির্ময় ও অবশ্যম্ভাবী আত্ম-চরিতার্থতা সাধনের শক্তি ও আনন্দের মধ্যে দিব্য সংকল্পের সহিত এক। সুতরাং, বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা মানব প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করি দিব্য প্রকৃতিতে।

তাহ'লে এই বিজ্ঞান কি, কিভাবেই বা তার বর্ণনা সম্ভব? দুইটি বিপরীত প্রমাদ পরিহার করা চাই, ইহারা এমন দুই ভ্রান্ত ধারণা যা বিজ্ঞানের সত্যের বিপরীত দুই দিক বিকৃত করে। একটি প্রমাদ হ'ল সেই সব দার্শনিকদের যারা ধীশক্তির মধ্যে নিবদ্ধ থাকে; ইহাতে "বিজ্ঞান"কে সমার্থক করা হয় অন্য ভারতীয় সংজ্ঞা "বুদ্ধির" সহিত এবং 'বুদ্ধি'কে

সমার্থক করা হয় যুক্তিবুদ্ধির, বিচারবুদ্ধির, তর্কবুদ্ধির সহিত। যেসব দর্শন এই অর্থ গ্রহণ করে তারা শুদ্ধ ধী-র লোক থেকে একেবারে চলে যায় শুদ্ধ চিৎ-পুরুষের লোকে। কোনো মধ্যবর্তী সামর্থ্য স্বীকার করা হয় না, শুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানের কোনো দিব্যতর ক্রিয়া স্বীকার করা হয় না; সত্যের সম্মুখীন হবার জন্য সীমিত মানুষী সাধনকেই লওয়া হয় চেতনার সম্ভবপর উৎকৃষ্ট চালক ব'লে, ইহার সর্বোচ্চ শক্তি ও আদি গতিবৃত্তি ব'লে। এক বিপরীত প্রমাদ হ'ল রহস্যবাদীদের ভ্রান্ত ধারণা যাতে বিজ্ঞানকে এক করা হয় অনন্তের সেই চেতনার সহিত যা সকল ভাবময় জ্ঞান থেকে মুক্ত অথবা এমন ভাবময় জ্ঞান যা পুঞ্জীভূত হ'য়েছে ভাবনার একমাত্র সারে এবং যা 'একম্' এর একমাত্র ও অপরিবর্তনীয় ভাবনায় অন্য স্ফুরন্ত ক্রিয়ারহিত। ইহাই উপনিষদের "চৈতন্যঘন" এবং বিজ্ঞানের অন্যতম গতি, বরং ইহার বহুমুখী গতিবৃত্তির মধ্যে একটি সূত্র। বিজ্ঞান যে শুধু অনন্ত স্বরূপের ঘনীভূত চেতনা তা নয়, ইহা আবার একই সময়ে অনন্তের অসংখ্যবিধ লীলার অনন্ত জ্ঞান। সকল ভাবময় জ্ঞান (মানসিক নয়, অতিমানসিক) ইহার মধ্যে নিহিত, কিন্তু ইহা ভাবময় জ্ঞানের দ্বারা সীমিত নয়, কারণ ইহা সকল ভাবময় গতিবৃত্তির অনেক উজানে। আবার, বিজ্ঞানের ভাবময় জ্ঞানের স্বরূপ যে বুদ্ধিগত চিন্তা তা-ও ইহা নয়; আমরা যাকে যুক্তিবুদ্ধি বলি ইহা তা নয়, ইহা ঘনীভূত বুদ্ধি নয়। কারণ যুক্তিবুদ্ধির সব প্রণালী মানসিক, তার আহরণ মানসিক, তার ভিত্তি মানসিক; কিন্তু বিজ্ঞানের ভাবময় প্রণালী স্বয়ং-প্রকাশ, অতি-মানসিক, ইহার মনন-আলোক থেকে যা উৎপন্ন হয় তা স্বতঃস্ফূর্ত, আহরণ দ্বারা উৎপন্ন হয় না; ইহার মনন-ভিত্তি হ'ল সচেতন তাদাত্ম্যের অভিব্যক্তি, পরোক্ষ সন্নিকর্ষজাত সংস্কারের রূপান্তর নয়। মননের এই দুই রূপের মধ্যে এক সম্পর্ক আছে, এমন কি একপ্রকার ছিন্ন অভিন্নতা আছে; কারণ একটি অন্যটি থেকে গূঢ়ভাবে উৎপন্ন হয়। মনের অতীতে যা তা থেকেই মনের উৎপত্তি। কিন্তু তারা কাজ করে ভিন্ন লোকে এবং পরস্পরের ধারার বিপরীত ভাবে।

এমনকি শুদ্ধতম যুক্তিবুদ্ধিও, সর্বাপেক্ষা ভাস্বর বিচারবুদ্ধিযুক্ত ধী-মত্তাও বিজ্ঞান নয়। যুক্তিবুদ্ধি বা ধীশক্তি অপরাবুদ্ধি মাত্র; ইহা তার ক্রিয়ার জন্য ইন্দ্রিয়মানসের দেওয়া সব বিষয়ের ও মানসিক বুদ্ধির দেওয়া সব প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের মতো ইহা স্বয়ং-প্রকাশ, প্রামাণিক নয়,

ইহা বিষয়কে বিষয়ীর সহিত এক করে না। বস্তুতঃ বুদ্ধির এক পররূপ আছে যাকে বলা হয় বোধিসম্পন্ন মানস বা বোধিসম্পন্ন যুক্তিবুদ্ধি এবং ইহা তার বিভিন্ন বোধি, চিদাবেশ, দ্রুত প্রকাশক দর্শন, তার ভাস্বর অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারের দ্বারা মহত্তর সামর্থ্য, ক্ষিপ্রতর ক্রিয়া ও অধিকতর ও স্বতঃস্ফূর্ত নিশ্চয়তার সহিত যুক্তিবুদ্ধির কাজ ক'রতে সক্ষম। ইহা কাজ করে সত্যের আত্ম-আলোকে যা ইন্দ্রিয়মানসের চঞ্চল মশালশিখা ও তার সীমিত অনিশ্চিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে না; ইহা বুদ্ধিজ প্রত্যয় দিয়ে অগ্রসর হয় না, ইহা অগ্রসর হয় অন্তর্দর্শনের সব প্রত্যয় দিয়ে: ইহা এক প্রকার সত্য-দর্শন, সত্য-শ্রবণ, সত্য-স্মৃতি, সাক্ষাৎ সত্য-বিবেক। এই সত্যময় ও প্রামাণিক বোধি এবং সাধারণ মানসিক যুক্তিবুদ্ধির যে সামর্থ্যকে ইহার সহিত সহজেই ভুল করা হয় সেই সামর্থ্য এই দুই যে পৃথক তা প্রণিধান করা চাই। এই শেষেরটি নিগূহিত যুক্তিবুদ্ধির এমন এক সামর্থ্য যা তার সিদ্ধান্তে পৌঁছয় লাফ দিয়ে, তার্কিক মনের সাধারণ ধাপগুলিতে তার প্রয়োজন থাকে না। যেমন কোনো ব্যক্তি বিপজ্জনক জমিতে হাঁটবার সময় চোখে সে যে পরিমাণ মাটি দেখতে পায় তাকে পায়ের স্পর্শ দিয়ে ভয়ে ভয়ে পরীক্ষা ক'রে অগ্রসর হয়, তেমন তর্কবুদ্ধিও অগ্রসর হয় একটির পর একটি পা ফেলে, আর প্রতি পদক্ষেপের নিশ্চয়তা পরীক্ষা ক'রে। কিন্তু তর্কবুদ্ধির এই অপর তর্কাতীত পদ্ধতি হ'ল দ্রুত অন্তর্দৃষ্টির বা ক্ষিপ্র বিচারের গতি; ইহা অগ্রসর হয় দীর্ঘ পদক্ষেপে বা লম্ফ দিয়ে যেমন কোনো ব্যক্তি লাফিয়ে চলে একটি নিশ্চিত জায়গা থেকে অন্য একটি নিশ্চিত স্থানে, অন্ততঃ যাকে সে নিশ্চিত ব'লে জানে তাতে। এই যে জায়গাটি সে পার হয় তাকে সে দেখে নেয় এক সংহত দৃষ্টির ঝলকে কিন্তু সে চোখ দিয়ে বা স্পর্শের দ্বারা ইহার বিভিন্ন পরম্পরা, লক্ষণ বা অবস্থা পৃথক পৃথক দেখে না বা মাপ করে না। এই গতিবৃত্তিতে বোধির সামর্থ্যের কিছু বোধ থাকে, ইহার কিছু বেগ থাকে আর থাকে ইহার আলোক ও নিশ্চয়তার কিছু অবভাস, আর ইহাকে বোধি মনে ক'রতে আমরা সর্বদাই উন্মুখ। কিন্তু আমাদের ধারণা ভুল আর ইহাকে বিশ্বাস করার পরিণতি হ'তে পারে নিদারুণ বিষম প্রমাদ।

বুদ্ধিবাদীরা এমনকি ইহাও মনে করে যে বোধি স্বয়ং এই পদ্ধতির চেয়ে বেশী কিছু নয়, যাতে তর্কমনের সমগ্র কাজটি করা হয় ক্ষিপ্রতার সহিত, অথবা বোধ হয় অর্ধ-চেতনভাবে বা অবচেতনভাবে, ইহা যুক্তি-

সম্মত পদ্ধতির দ্বারা বিবেচনার সহিত সম্পাদিত হয় না। কিন্তু স্বরূপতঃ এই ক্রিয়া বোধি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর ইহা যে সত্যক্রিয়া হবেই তা-ও নয়। ইহার উল্লম্ফনের পরিণতি হ'তে পারে পদ-স্খলন, ইহার ক্ষিপ্রতা প্রবঞ্চনা করতে পারে, ইহার নিশ্চয়তা প্রায়ই হয় এক অতিবিশ্বাসী প্রমাদ। ইহার সিদ্ধান্তের সত্যতাকে সর্বদা নির্ভর করতে হবে ভবিষ্যতে ইন্দ্রিয়-বোধের সাক্ষ্য দ্বারা তার যাথার্থ্যতা নির্ণয়ের বা সমর্থনের উপর, আর না হয় নিজের কাছে নিজের নিশ্চয়তা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজন হবে বুদ্ধিমূলক সব প্রত্যয়ের এক যুক্তিসম্মত মিলনসাধন। বস্তুতঃ এই অবর আলোক অতি সহজেই নিজের মধ্যে নিতে পারে প্রকৃত বোধির মিশ্রণ, আর তখন এক মিথ্যা-বোধিসম্পন্ন বা অর্ধ-বোধিসম্পন্ন মনের সৃষ্টি হয়, যা তার পুনঃপুনঃ উজ্জ্বল সফলতার দরুণ অতীব ভ্রান্তিজনক কারণ এই সব সফলতা বিভিন্ন অত্যধিক আত্ম-নিশ্চিত মিথ্যা নিশ্চয়তার আবর্তকে কথঞ্চিৎ উপশম করে মাত্র। প্রত্যুত, প্রকৃত বোধির নিজের মধ্যেই থাকে তার সত্যতার নিজের প্রমাণ; ইহা তার সীমার মধ্যে ধ্রুব ও অভ্রান্ত। এবং যতক্ষণ ইহা শুদ্ধ বুদ্ধি থাকে এবং নিজের মধ্যে কোনো ইন্দ্রিয়-প্রমাদ বা বুদ্ধিগত ভাবময় জ্ঞানের মিশ্রণ আসতে দেয় না ততদিন ইহা কোনো অনুভূতির দ্বারাই খণ্ডিত হয় না। পরে, যুক্তিবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারা এই বোধির যাথার্থ্যতা নির্ণয় করা যেতে পারে কিন্তু ঐ যাথার্থ্যতা নির্ণয়ের উপর ইহার সত্যতা নির্ভর করে না, ইহা স্বতঃপ্রণোদিত আত্ম-প্রমাণের দ্বারা সুনিশ্চিত। যদি কখনো এই মহত্তর আলোকের সহিত অনুমানের উপর নির্ভরশীল যুক্তিবুদ্ধির বিরোধ হয় তাহ'লে পরিশেষে আরো প্রচুর জ্ঞানের পর দেখা যাবে যে বোধিমূলক সিদ্ধান্তই সঠিক এবং যে যুক্তিসম্মত ও অনুমানগত সিদ্ধান্ত আরো গ্রহণীয় মনে হয়েছিল তা ভ্রমপূর্ণ। কারণ প্রকৃত বোধির উৎপত্তি বিষয়সমূহের স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্য থেকে এবং ঐ স্বপ্রতিষ্ঠ সত্যই ইহাকে দৃঢ় করে, জ্ঞানলাভের কোনো পরোক্ষ, গৌণ বা অন্যাশ্রিত পদ্ধতির দ্বারা ইহাকে দৃঢ় করা হয় না।

কিন্তু এই বোধিসম্পন্ন যুক্তিবুদ্ধিও বিজ্ঞান নয়, ইহা অতিমানস-আলোকের এক রশ্মিমাত্র যা দীপ্তির ঝলকের দ্বারা চলে আসে মানসিকতার মধ্যে, যেমন বিদ্যুৎ আসে অনুজ্জ্বল মেঘাচ্ছন্ন অঞ্চলে। ইহার বিভিন্ন চিদাবেশ, সত্য-দর্শন, বোধি, স্বয়ং-প্রকাশক নির্ণয় হ'ল এক পরতর বিজ্ঞান-লোক থেকে আসা এমন সব বার্তা যা সুবিধামত আমাদের চেতনার অবর

স্তরে এসে পড়ে। বোধিসম্পন্ন মনের স্বরূপই এমন যে ইহার ক্রিয়ার ও স্বয়ং-পূর্ণ বিজ্ঞানের ক্রিয়ার মধ্যে গুরুতর প্রভেদের ব্যবধান রয়ে যায়। প্রথমতঃ ইহা কাজ করে পৃথক পৃথক ও সীমিত সব দীপ্তি দ্বারা; একটি বিদ্যুৎ-ঝলকের দ্বারাই তার কাজ শুরু ও শেষ হয় এবং এই এক ঝলকের দ্বারা জ্ঞানের যে নিতান্তই সংকীর্ণ ক্ষেত্র বা একটিমাত্র স্বল্প অংশ আলোকিত হয় তার মধ্যেই ইহার সত্য সীমাবদ্ধ থাকে। আমরা প্রাণীর মধ্যে সহজাত সংস্কারের ক্রিয়া দেখি; এই সংস্কার সেই প্রাণ-মানস বা ইন্দ্রিয়-মানসের এক স্বয়ং-ক্রিয় বোধি যা প্রাণীর শ্রেষ্ঠ ও নিশ্চিততম করণ আর ইহারই উপর প্রাণীকে নির্ভর করতে হয় কারণ মানুষের মতো যুক্তিবুদ্ধির আলো তার নেই, তার যা আছে তা আরো অপরিণত ও এখনো মন্দগঠিত বুদ্ধি। আর আমরা প্রথমেই দেখতে পাই যে এই যে সহজাত সংস্কার যা যুক্তি-বুদ্ধি অপেক্ষা অত বেশী নিশ্চিত ব'লে মনে হয় তার আশ্চর্যজনক সত্য পাখী, পশু বা পতঙ্গের মধ্যে সীমিত থাকে সেই কোনো বিশেষ ও পরিমিত প্রয়োজনের মধ্যে যা সাধনের জন্য তাকে প্রয়োগ করা হয়। যখন প্রাণীর প্রাণ-মানস ঐ পরিমিত সীমা ছাড়িয়ে কাজ করতে চেষ্টা করে তখন ইহা মানুষের যুক্তিবুদ্ধি অপেক্ষা আরো অন্ধভাবে বিষম ভুল করে আর ইহাকে কষ্ট করে শিখতে হয় পর পর অনেক ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার দ্বারা। মানুষের উচ্চতর মানসিক বোধি হ'ল আন্তর-দর্শনমূলক বোধি, ইহা ইন্দ্রিয়-বোধি নয়; কারণ ইহা দীপ্ত করে বুদ্ধিকে, ইন্দ্রিয়মানসকে নয়, ইহা আত্ম-সচেতন ও জ্যোতির্ময়, ইহা অর্ধ অবচেতন অন্ধ আলোক নয়: ইহা স্বাধীন-ভাবে নিজে নিজে করে, যন্ত্রের মতো স্বয়ং-ক্রিয় নয়। কিন্তু তথাপি, এমন-কি যখন ইহা অনুকরণশীল মিথ্যা-বোধির দ্বারা দূষিত হয় না তখনো ইহা মানুষের মধ্যে, প্রাণীর সহজসংস্কারের মতোই সীমিত থাকে,---সীমিত থাকে সংকল্প বা জ্ঞানের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের মধ্যে---যেমন সহজ-সংস্কার সীমিত থাকে জীবনধারণের কোনো বিশেষ উপকারিতার বা প্রকৃতির উদ্দেশ্যের মধ্যে। আর যখন বুদ্ধি তার প্রায় অপরিবর্তনীয় অভ্যাসের মতো চেষ্টা করে ইহাকে কাজে লাগাতে, প্রয়োগ ক'রতে, ইহার সহিত কিছু যোগ দিতে, ইহা বোধিসম্পন্ন কেন্দ্রের চারিদিকে নিজেরই বিশিষ্ট ধারণা অনুসারে গড়ে তোলে সত্য ও প্রমাদের মিশ্রণের এক স্তূপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বুদ্ধি এই বোধির সারপদার্থের মধ্যে ইন্দ্রিয়-প্রমাদ ও ভাবনাগত প্রমাদের কিছু উপাদান আরোপ ক'রে অথবা বিভিন্ন মানসিক

যোগ ও বিচ্যুতির দ্বারা ইহাকে আচ্ছাদন ক'রে বোধির সত্যকে যে শুধু পথভ্রষ্ট করে তা নয়, ইহা এই সত্যকে বিকৃত এবং মিথ্যায় পরিণত করে। বোধির উৎকৃষ্ট অবস্থায় ইহা আমাদের দেয় শুধু সীমিত আলো, যদিও এই আলো প্রখর; আমাদের অপব্যবহারের দরুণ অথবা ইহার মিথ্যা অনুকরণের দরুণ ইহার নিকৃষ্ট অবস্থায় ইহা এমন সব সংশয় ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের ফেলতে পারে যেগুলি কম উচ্চাভিলাষী যুক্তিবুদ্ধি এড়িয়ে যায় আর তার নিজের নিরাপদ ও আয়াসকর মন্থর পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট থাকে, তবে এই পদ্ধতি যুক্তিবুদ্ধির অবর সব উদ্দেশ্যের পক্ষে নিরাপদ হ'লেও, কখনই বিষয়সমূহের আন্তর সত্যের সন্তোষজনক দিশারী নয়।

যুক্তিবুদ্ধির উপর আমাদের নির্ভরতার আধিক্য যতই কম হয় ততই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় বোধিসম্পন্ন মনের ব্যবহার অনুশীলন ও সম্প্রসারণ করতে। আমরা আমাদের মানসিকতাকে শিক্ষা দিতে পারি যেন ইহা এখনকার মতো বোধিসম্পন্ন দীপ্তির প্রতি পৃথক ঝলককেই তার নিজের বিভিন্ন অবর উদ্দেশ্যের জন্য না অধিকার করে, যেন ইহা এই ঝলকের চারিদিকে প্রথমেই আমাদের ভাবনাকে নিক্ষেপ ক'রে এক কঠিন বুদ্ধিগত ক্রিয়ায় না পরিণত ক'রে; আমরা ইহাকে এই শিক্ষা দিতে সক্ষম যে ইহা যেন চিন্তা করে ক্রমানুয়ী ও সম্বদ্ধ বোধিসমূহের প্রবাহে, যেন ইহা আলোর পর আলো বর্ষণ করে প্রোজ্জ্বল ও বিজয়ী পরম্পরায়। এই দুরূহ পরিবর্তন সাধনে আমরা সেই অনুপাতে সক্ষম হব যে অনুপাতে আমরা শুদ্ধ করতে পারি এই বিঘ্নদেওয়া বুদ্ধিকে---অর্থাৎ যদি আমরা ইহার মধ্যে কমাতে পারি বিষয়সমূহের বাহ্যরূপের দাসত্বে আবদ্ধ জড়গত মননের উপাদান, অবর প্রকৃতির বিভিন্ন ইচ্ছায়, কামনায়, সংবেগে আবদ্ধ প্রাণিক মননের উপাদান, বুদ্ধির বেশী পছন্দসই, অনুকূল বা পূর্বেই স্থির করা হয়েছে এমন সব ভাবনায়, প্রত্যয়ে, মতামতে, নির্দিষ্ট ক্রিয়াসমূহে আবদ্ধ বুদ্ধিগত মননের উপাদান আর যদি আমরা ঐসব উপাদানকে ন্যূনতম মাত্রায় হ্রাস ক'রে তাদের স্থলে আনতে পারি বিষয়সমূহের এক বোধিসম্পন্ন দর্শন ও বোধ, বাহ্যরূপগুলির মধ্যে বোধিসম্পন্ন অন্তর্দৃষ্টি, বোধিসম্পন্ন সংকল্প ও বোধিসম্পন্ন ভাবময় জ্ঞান। এই কাজ আমাদের চেতনার পক্ষে যথেষ্ট দুষ্কর কারণ আমাদের চেতনা স্বভাবতঃই মানসিকতা প্রাণিকতা ও দৈহিকতার ত্রিবিধ বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থাকে নিজেরই অপূর্ণ-

তায় ও অজ্ঞানতায়——ইহারাই অন্তঃপুরুষের বন্ধন বিষয়ে বৈদিক রহস্যার্থক উপকথার উত্তম, মধ্যম ও অধম পাশ, অর্থাৎ বাহ্যরূপের মিশ্রিত সত্য ও মিথ্যার সেই পাশগুলি যা দিয়ে শুনঃশেপকে বদ্ধ করা হয়েছিল যূপকাষ্ঠে।

কিন্তু এই দুরূহ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করা হ'লেও বোধি বিজ্ঞান হবে না; ইহা হবে মনের মধ্যে তার ক্ষীণ বিস্তার অথবা প্রথম প্রবেশের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। এই যে পার্থক্য যার সঠিক বর্ণনা প্রতীকের সাহায্য বিনা সহজ নয় তাকে বোঝান যায় যদি আমরা বৈদিক উপমাটি গ্রহণ করি যাতে সূর্য হ'ল বিজ্ঞানের[১] প্রতীক, আর আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হ'ল মানবের ও বিশ্বের মানসিকতা, প্রাণিকতা ও দৈহিকতার প্রতীক। পৃথিবীতে বাস করলে, অন্তরীক্ষে আরোহণ করলে, এমনকি আকাশে পাখা মেললেও মনোময় পুরুষ তখনো থাকে সূর্যের রশ্মিজালের মধ্যে, তার দৈহিক আলোর মধ্যে নয়। আর ঐ রশ্মিজালের মধ্যে সে বিষয়সমূহকে যেভাবে দেখে তা তাদের স্বরূপে নয়, বরং তার দর্শন-ইন্দ্রিয়ে তারা যে ভাবে ইন্দ্রিয়ের দোষের জন্য বিকৃত হ'য়ে অথবা তার সীমাবদ্ধতার জন্য তাদের সঙ্কুচিত সত্যে প্রতিফলিত হয় সেইভাবে দেখে। কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুষ বাস করে স্বয়ং সূর্যের মধ্যে, প্রকৃত আলোকের নিজের দেহ ও দীপ্তির মধ্যে; এই জ্যোতিকে সে জানে নিজেরই আত্ম-জ্যোতির্ময় সত্তা ব'লে আর সে দেখে অপরার্ধের ত্রিতত্ত্বের ও ইহার অন্তর্গত প্রতি বিষয়টির সমগ্র সত্য। সে ইহাকে যে দেখে তা মানসিক দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিফলনের দ্বারা নয়, সে দেখে সাক্ষাৎ বিজ্ঞানসূর্যরূপী চক্ষু দিয়ে——কারণ বেদের কথায় সূর্য হ'ল দেবগণের চক্ষু। মনোময় পুরুষ, এমনকি বোধিসম্পন্ন মানসেও সত্যকে অনুভব করে শুধু প্রোজ্জ্বল প্রতিফলনের দ্বারা অথবা সীমিত বার্তার দ্বারা এবং ইহার সহিত আবার থাকে মানসিক দর্শনের বিভিন্ন সীমা ও ন্যূন সামর্থ্য; কিন্তু অতিমানসিক পুরুষ তাকে দেখে স্বয়ং বিজ্ঞানের দ্বারা এবং সত্যের সঠিক কেন্দ্র ও উচ্ছল উৎস থেকে, তার স্বরূপে এবং নিজেরই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ং-প্রকাশক পদ্ধতির দ্বারা। কারণ বিজ্ঞান হ'ল পরোক্ষ ও মানবীয় জ্ঞানের বিপরীত প্রত্যক্ষ ও দিব্য জ্ঞান।

ধীশক্তির কাছে বিজ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করার একমাত্র উপায় হ'ল

১ এইজন্য বেদে সূর্যকে বলা হয় "ঋতম্ জ্যোতিঃ"।

ধীশক্তির বিপরীত স্বরূপের সহিত তুলনা করা এবং তখনো যে সমস্ত পদ আমাদের ব্যবহার করতে হয় তারা তা প্রকাশ করতে পারে না যদি না তাদের সহিত সহায়স্বরূপ থাকে কিছু বাস্তব অনুভূতি। কারণ যুক্তিবুদ্ধির তৈরী এমনকি ভাষা আছে যা যুক্তিবুদ্ধির অতীত বিষয়কে প্রকাশ করতে সক্ষম? মূলতঃ, এই দুই সামর্থ্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে মানসিক যুক্তি-বুদ্ধি কষ্ট ক'রে চলে অজ্ঞানতা থেকে সত্যে, কিন্তু বিজ্ঞানের নিজের মধ্যেই আছে সত্যের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ, তার অব্যবহিত দর্শন এবং সহজ ও সতত অধিকার; সত্যের জন্য অন্বেষণের বা কোনো প্রকার পদ্ধতির প্রয়োজন বিজ্ঞানের থাকে না। যুক্তিবুদ্ধি শুরু করে সব বাহ্যরূপ নিয়ে এবং কষ্ট ক'রে পরিশ্রম করে তাদের পশ্চাতে সত্যে পৌছাবার জন্য আর এই কাজে তাকে সর্বদাই অথবা প্রায়শঃই বাহ্যরূপের উপর অন্ততঃ আংশিক-ভাবেও নির্ভর করতে হয়। বিজ্ঞান শুরু করে সত্য থেকে, এবং বাহ্য রূপগুলি দেখায় সত্যের আলোকে; ইহা স্বয়ং সত্যের শরীর ও ইহার মর্ম। যুক্তিবুদ্ধি অগ্রসর হয় অনুমানের দ্বারা, ইহা সিদ্ধান্তে পৌছয়; কিন্তু বিজ্ঞান অগ্রসর হয় তাদাত্ম্য বা দর্শনের দ্বারা--ইহা হয়, দেখে ও জানে। স্থূল দর্শন যেমন বিষয়সমূহের বাহ্য রূপ দেখে ও আয়ত্ত করে প্রত্যক্ষভাবে, তেমন ও আরো বেশী প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞান বিষয়সমূহের সত্য দেখে ও আয়ত্ত করে। কিন্তু যেখানে বিষয়সমূহের সহিত স্থূলইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয় প্রচ্ছন্ন সংযোগের দ্বারা, বিজ্ঞান তাদের সহিত তাদাত্ম্যে আসে অনবগুণ্ঠিত একত্বের দ্বারা। এইভাবে ইহা সব বিষয়কে জানতে পারে যেমন কোনো ব্যক্তি তার নিজের অস্তিত্ব জানে,--সহজভাবে, সুনিশ্চিত-ভাবে ও অবিলম্বে। যুক্তিবুদ্ধির কাছে ইন্দ্রিয়গুলি যা দেয় শুধু তা-ই প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সত্যের বাকী অংশ জানা যায় পরোক্ষভাবে; বিজ্ঞানের কাছে তার সকল সত্যই প্রত্যক্ষজ্ঞান। সুতরাং ধীশক্তির দ্বারা যে সত্য লাভ হয় তা এক অর্জন যার উপর সর্বদাই থাকে সন্দেহের কিছু ছায়া, অসম্পূর্ণতা, রাত্রি ও অজ্ঞানতা বা অর্ধ-জ্ঞানের এক ঘিরে থাকা উপচ্ছায়া, আরো অধিক জ্ঞানের দ্বারা পরিবর্তন বা খণ্ডনের এক সম্ভাবনা। বিজ্ঞানের সত্য সংশয়-মুক্ত, স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রতিষ্ঠ, অখণ্ডনীয়, অনপেক্ষ।

যুক্তিবুদ্ধির প্রথম করণ হ'ল অবেক্ষা--সাধারণ, বিশ্লেষণমূলক ও সংশ্লেষণমূলক; ইহা নিজেকে সাহায্য করে সাদৃশ্য-তুলনা, পার্থক্য-তুলনা ও উপমানের দ্বারা--অভিজ্ঞতা থেকে পরোক্ষজ্ঞানে অগ্রসর হয় অবরোহ

অনুমান ও আরোহ অনুমানের তর্কসম্মত প্রণালীতে ও সকল প্রকার অনুমানের সাহায্যে--নির্ভর করে স্মৃতির উপর, নিজেকে ছাড়িয়ে যায় কল্পনার দ্বারা ও দৃঢ় করে সিদ্ধান্তের দ্বারা; সবই হ'ল অন্ধকারে অন্বেষণের এক ধারা। বিজ্ঞান অন্বেষণ করে না, সত্য তার অধিকারভুক্ত। অথবা যদি ইহাকে আলোকিত করতে হয়, ইহা এমনকি তখনো অন্বেষণ করে না; ইহা প্রকাশ করে, দীপ্ত করে। বুদ্ধি থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত চেতনায় কল্পনার স্থলে আসবে সত্য-অন্তঃপ্রেরণা, মানসিক সিদ্ধান্তের স্থলে আসবে স্ব-প্রকাশক নির্ণয়। যুক্তি থেকে সিদ্ধান্তে যাবার মন্থর ও স্খলনশীল তর্ক পদ্ধতিকে বাহিরে নিক্ষেপ করে তার স্থলে আসবে দ্রুত বোধিসম্পন্ন ক্রিয়া; সিদ্ধান্ত বা তথ্য অবিলম্বেই জানা যাবে তার নিজেরই অধিকারে তার নিজেরই স্বয়ং-পূর্ণ সাক্ষীর দ্বারা আর যে সব সাক্ষ্যর দ্বারা আমরা তাতে উপনীত হই সেসব সাক্ষ্যও দেখা যাবে অবিলম্বে, তথ্যের সঙ্গেই, একই ব্যাপক চিত্রে, তার সাক্ষ্য হিসাবে নয় বরং তার অন্তরঙ্গ বিভিন্ন অবস্থা, সংযোগ ও সম্পর্ক হিসাবে, তার গঠনের অংশ অথবা পরিস্থিতির পার্শ্ব হিসাবে। মানসিক ও ইন্দ্রিয়গত অবেক্ষা পরিবর্তিত হবে এক আন্তর দর্শনে যাতে করণগুলি ব্যবহৃত হবে প্রণালী হিসাবে, তবে মন যেমন স্থূলইন্দ্রিয়ের অভাবে অন্ধ ও বধির, এই আন্তরদর্শন তাদের উপর তেমন নির্ভর করে না; আর এই দর্শন শুধু যে বিষয়টিকে দেখবে তা নয়, ইহা আরো দেখবে তার সকল সত্য, তার বিভিন্নশক্তি, সামর্থ্য, তার অন্তর্গত নিত্য তত্ত্বসমূহ। আমাদের অনিশ্চিত স্মৃতি নষ্ট হবে, আর ইহার স্থলে আসবে জ্ঞানের জ্যোতির্ময় অধিকার, এক দিব্য স্মৃতি যা অর্জিত জ্ঞানের ভাণ্ডার নয়, বরং চেতনায় সর্বদা অবস্থিত সকল বিষয়ের আধার, একই সঙ্গে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্মৃতি।

কারণ যুক্তিবুদ্ধি অগ্রসর হয় কালের এক ক্ষণ থেকে অন্যক্ষণে আর হারায় ও অর্জন করে, আবার হারায়; ও আবার অর্জন করে কিন্তু বিজ্ঞান কালকে আয়ত্ত করে এক দৃষ্টিতে ও চিরন্তন সামর্থ্যে এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে যুক্ত করে তাদের বিভিন্ন অবিভাজ্য সংযোগসূত্রে, জ্ঞানের একটিমাত্র অবিচ্ছিন্ন চিত্রে, তাদের পাশাপাশি রেখে। বিজ্ঞান শুরু করে সমগ্রতা থেকে যা বিজ্ঞানের অধিকারে থাকে অব্যবহিত ভাবে; ইহা বিভিন্ন অংশ, বর্গ ও খুঁটিনাটিকে দেখে শুধু সমগ্রতার সম্পর্কে এবং ইহার সহিত এক দর্শনে: মানসিক যুক্তিবুদ্ধি বস্তুতঃ সমগ্রতাকে আদৌ

দেখতে পায় না এবং কোনো সমগ্রকেই সম্পূর্ণভাবে জানে না, সমগ্রকে ইহা যা জানে তা শুধু ইহার বিভিন্ন অংশ, স্তূপ ও খুঁটিনাটির বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ থেকে আরম্ভ ক'রে; অন্যাথায়, ইহার সমগ্র-দর্শন সর্বদাই অস্পষ্ট লক্ষণসমূহের এক অনিশ্চিত প্রাথমিক বোধ অথবা এক অপূর্ণ অবধারণ বা বিভ্রান্তিপূর্ণ সংক্ষেপ। যুক্তিবুদ্ধির কাজ হ'ল বিভিন্ন উপাদান, প্রক্রিয়া ও গুণ নিয়ে; এই সবের দ্বারা বিষয়ের স্বরূপ, ইহার সত্যতা, ইহার সার সম্বন্ধে কোনো ভাবনা গঠন করার জন্য তার চেষ্টা নিরর্থক। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়কে প্রথম দেখে তার স্বরূপে, তার আদি ও শাশ্বত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ ক'রে এবং ইহার সহিত তার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও গুণ যুক্ত করে শুধু তার প্রকৃতির আত্ম-প্রকাশ হিসাবে। যুক্তিবুদ্ধি বাস করে বৈচিত্র্যের মধ্যে, ইহা তার বন্দী; যেমন ইহা কালের বিভিন্ন খণ্ডের সহিত ও দেশের বিভিন্ন বিভাজনের সহিত ব্যবহার করে, তেমন ইহা বিষয়গুলিকে ব্যবহার করে পৃথক পৃথক ভাবে এবং প্রতি বিষয়কে ব্যবহার করে পৃথক অস্তিত্ব হিসাবে; ইহা ঐক্য দেখে শুধু যোগফলের মধ্যে অথবা বৈচিত্র্য বাদ দিয়ে অথবা সামান্য ভাবনা ও শূন্য মূর্তি হিসাবে। কিন্তু বিজ্ঞান ঐক্যের মধ্যে আবিষ্ট থাকে, এবং ইহার দ্বারাই বৈচিত্র্যসমূহের সকল প্রকৃতি জানে; ইহা আরম্ভ করে ঐক্য থেকে এবং বৈচিত্র্যগুলিকে দেখে শুধু ঐক্যের অন্তর্গত হিসাবে, বৈচিত্র্য মিলে যে ঐক্য গঠিত হ'য়েছে তা নয়, ঐক্যই নিজের বহুত্ব গঠন করেছে। বিজ্ঞানময় জ্ঞান, বিজ্ঞানময় অনুভব কোনো প্রকৃত বিভাজন স্বীকার করে না; বিষয়গুলি যেন তাদের প্রকৃত ও আদি একত্বের অনধীন এইভাবে ইহা তাদের পৃথকভাবে ব্যবহার করে না। যুক্তিবুদ্ধির কাজ সান্তের সহিত, ইহা অনন্তের কাছে অসহায়: অনন্ত সম্বন্ধে ইহার যে ভাবনা সম্ভব তা হ'ল এই যে ইহা এক অনির্দিষ্ট বিস্তার যার মধ্যে সান্ত কাজ করে কিন্তু অনন্ত স্বরূপে যা সে সম্বন্ধে ইহার ভাবনা করা দুরূহ, ইহাকে সে আদৌ আয়ত্ত করতে ও ইহার মধ্যে আদৌ প্রবেশ করতে ইহা অক্ষম। কিন্তু বিজ্ঞান অনন্তের মধ্যেই বর্তমান, দেখে ও বাস করে: ইহা সর্বদাই শুরু করে অনন্ত থেকে এবং সান্ত বিষয়সমূহকে জানে শুধু অনন্তের সহিত তাদের সম্পর্কে ও অনন্তের অর্থে।

আমাদের নিজেদের যুক্তিবুদ্ধির সহিত বিপরীতভাবে তুলনায় আমরা বিজ্ঞানকে যা জানি তেমনভাবে তার এইরূপ অপূর্ণ বর্ণনা না করে যদি আমরা বিজ্ঞানকে বর্ণনা করতে চাই ইহা নিজেকে যেভাবে জানে সেইভাবে

তাহ'লে সংকেত ও প্রতীক ছাড়া অন্যভাবে ইহার সম্বন্ধে কিছু বলা এক-রকম অসম্ভব। আর প্রথমে আমাদের স্মরণ রাখা চাই যে বিজ্ঞানময় স্তর, মহৎ, বিজ্ঞান আমাদের চেতনার পরমলোক নয়, ইহা একটি মধ্য-বর্তী বা সংযোজক লোক। একদিকে কেবল পরম চিৎ-পুরুষের ত্রয়াত্মক মহিমা, সনাতনের অনন্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দ ও অন্যদিকে আমাদের অবর ত্রিবিধ সত্তা ও প্রকৃতি—এই দু'য়ের মধ্যে অবস্থিত হ'য়ে ইহা যেন দণ্ডায়-মান রয়েছে সনাতনের মধ্যস্থরূপী, ব্যাকৃত, সংগঠনকারী ও সৃজনশীল প্রজ্ঞা, সামর্থ্য ও হর্ষরূপে। সচ্চিদানন্দ তাঁর অগ্রাহ্য সত্তার আলোক বিজ্ঞা-নের মধ্যে একত্র ক'রে তা বাহিরে অন্তঃপুরুষের উপর বর্ষণ করেন সত্তার দিব্য জ্ঞান, দিব্য সংকল্প ও দিব্য আনন্দের আকারে ও সামর্থ্যে। ইহা যেন অনন্ত আলো যা সূর্যের সংহত মণ্ডলের মধ্যে একত্র করার পর তাকে চির-স্থায়ী রশ্মিধারায় বর্ষণ করা হয় সূর্যের উপর নির্ভরশীল সকল কিছুর উপর। কিন্তু বিজ্ঞান শুধু আলোক নয়, ইহা শক্তি; ইহা সৃজনশীল জ্ঞান, ইহা দিব্য প্রধান ভাবনার আত্ম-কার্যসাধক সত্য। এই ভাবনা সৃজনশীল কল্পনা নয়, ইহা এমন কিছু নয় যা শূন্যে নির্মাণ করে, ইহা শাশ্বত ধাতুর আলোক ও সামর্থ্য, সত্য-শক্তিতে পূর্ণ সত্য-আলোক; আর সত্তায় যা সুপ্ত থাকে তা-ই ইহা বাহিরে প্রকাশ করে, সত্তায় কখন ছিল না এমন কিছু অবাস্তব ইহা সৃষ্টি করে না। বিজ্ঞানের ভাবময় জ্ঞান হ'ল সনাতন সন্মাত্রের চেতনার বিকিরণশীল আলোক-সত্ত্ব; প্রতি রশ্মিই এক সত্য। বিজ্ঞানের অন্তঃস্থ সংকল্প শাশ্বত জ্ঞানের এক চিন্ময় শক্তি; ইহা সত্তার চেতনা ও ধাতুকে প্রক্ষেপ করে সত্য-সামর্থ্যের বিভিন্ন অভ্রান্ত রূপে,—এমন সব রূপ যেগুলি ভাবনাকে মূর্ত করে এবং ইহাকে নিখুঁতভাবে কার্যকরী করে এবং প্রতি সত্য-সামর্থ্যকে ও প্রতি সত্য-রূপকে ইহা ফুটিয়ে তোলে তার প্রকৃতি অনুসারে স্বতঃস্ফূর্ত ও সঠিকভাবে। বিজ্ঞানের মধ্যে দিব্য-ভাবনার এই সৃজনশীল শক্তি থাকে ব'লে, বেদে সূর্যকে অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রভু ও প্রতীককে বর্ণনা করা হয়েছে যে ইহা সকল বিষয়ের জনক আলোক, "সূর্য সবিতৃ" জ্যোতির্ময়-প্রজ্ঞা যা অভিব্যক্ত অস্তিত্বের মধ্যে বহিঃ-প্রকাশক। দিব্য আনন্দের, শাশ্বত আনন্দের অন্তঃপ্রেরণাবলেই এই সৃষ্টি; ইহা নিজে-রই সত্য ও সামর্থ্যের আনন্দে পরিপূর্ণ, ইহা সৃষ্টি করে আনন্দের ভিতর, সৃষ্টি করে আনন্দের মধ্য থেকে এবং যা সৃষ্টি করে তা-ও আনন্দময়। সুতরাং বিজ্ঞানের জগৎ, অতিমানসিক জগৎ হ'ল সত্যময় ও সুখময়

সৃজন, "ঋতম্, ভদ্রম্" কারণ ইহার মধ্যকার সকল কিছুই ইহার নির্মাতা যে পূর্ণ আনন্দ তার অংশভাক্। অব্যভিচারী জ্ঞানের এক দিব্য দ্যুতি, অবিচলিত সংকল্পের এক দিব্য সামর্থ্য এবং স্খলনহীন আনন্দের এক দিব্য আরাম—এই সব হ'ল অতিমানসের মধ্যস্থ, বিজ্ঞানের মধ্যস্থ পুরুষের প্রকৃতি। এখানে যা সব অপূর্ণ ও সাপেক্ষ সেসবের পূর্ণ অনপেক্ষতত্ত্ব নিয়েই বিজ্ঞানময় বা অতিমানসিক লোক গঠিত, এবং এখানে যাসব বিপরীত তাদের সমন্বিত পরস্পর-সংযোজন ও সুখময় সম্মিশনই তার গতি-বৃত্তি। কারণ এই সব বিপরীতের বাহ্য রূপের পশ্চাতে তাদের বিভিন্ন সত্য অবস্থিত আর সনাতনের এই সব সত্যের মধ্যে পরস্পরের কোনো বিরোধ নেই; আমাদের মনের ও প্রাণের বিপরীত বিষয়গুলি অতিমানসের মধ্যে তাদের নিজেদের প্রকৃত মর্মে রূপান্তরিত হ'লে তারা সংযুক্ত হয়, আর তাদের দেখা যায় যেন তারা সনাতন সদ্বস্তুর ও চিরস্থায়ী আনন্দের বিভিন্ন সুর ও রঙের খেলা। অতিমানস বা বিজ্ঞান হ'ল পরম সত্য, পরম দিব্যমনন, পরমা বাক্, পরম আলোক, পরম সংকল্প-ভাবনা; ইহা দেশাতীত অনন্তের আন্তর ও বাহ্য বিস্তার, কালাতীত সনাতনের শৃঙ্খলমুক্ত কাল, পরমার্থ-সৎ-এর সকল অনপেক্ষতত্ত্বের দিব্য সামঞ্জস্য।

দ্রষ্টা মনের কাছে, বিজ্ঞানের তিন সামর্থ্য বর্তমান। ইহার পরম সামর্থ্য ঈশ্বরের অনন্ত সত্তা, চেতনা ও আনন্দ সম্বন্ধে অবগত এবং সে সবকে ইহা নিজের মধ্যে গ্রহণ করে ঊর্ধ্ব থেকে; ইহার সর্বোচ্চ শিখরে ইহা সনাতন সচ্চিদানন্দের অনপেক্ষ জ্ঞান ও শক্তি। ইহার দ্বিতীয় সামর্থ্য অনন্তকে একাগ্র করে এক ঘন জ্যোতির্ময় চেতনায়, ইহা "চৈতন্যঘন" বা "চিদ্‌ঘন", দিব্য চেতনার বীজাবস্থা যার মধ্যে দিব্য সত্তার সকল অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব এবং দিব্য চিন্ময়-ভাবনা ও প্রকৃতির সকল অলঙ্ঘনীয় সত্য জীবন্ত ও মূর্ত রূপে নিহিত। ইহার তৃতীয় সামর্থ্য এই সব বিষয়কে বাহিরে প্রকাশ করে বা বিকিরণ করে দিব্যজ্ঞানের কার্যক্ষম ভাবনা, দর্শন, যথার্থ তাদাত্ম্যের দ্বারা, দিব্য সংকল্প-শক্তির সঞ্চালনের দ্বারা, দিব্য আনন্দ-তীব্রতার স্পন্দনের দ্বারা আর তাতে গড়ে ওঠে তাদের বিভিন্ন সামর্থ্য, রূপ ও জীবন্ত পরিণামের এক বিশ্ব সামঞ্জস্য, এক অসীম বৈচিত্র্য, এক বহুবিধ ছন্দ। যখন মনোময় পুরুষ উন্নত হ'য়ে বিজ্ঞানময় পুরুষ হয় তখন তাকে এই তিন সামর্থ্যের মধ্যে আরোহণ করতে হয়। তার কর্তব্য হ'ল রূপান্তরের দ্বারা নিজের সব গতিবৃত্তিকে পরিণত করা বিজ্ঞানের বিভিন্ন গতিবৃত্তি-

তে, নিজের মানসিক অনুভব, ভাবময় জ্ঞান সুখকে পরিণত করা দিব্য-জ্ঞানের দ্যুতিতে, দিব্য সংকল্প-শক্তির স্পন্দনে, দিব্য আনন্দ-সাগরের তরঙ্গে ও বন্যায়। তার নিজের মানসিক প্রকৃতির চেতন-সত্ত্বকে রূপান্তরিত করা চাই "চিদ্‌ঘন" অর্থাৎ ঘন স্বয়ং-প্রকাশক চেতনায়। আরো দরকার নিজের চিন্ময় ধাতুকে রূপান্তরিত করা অনন্ত সচ্চিদানন্দের বিজ্ঞানময় আত্মায় বা সত্য-আত্মায়। এই তিন ক্রিয়াকে ঈশোপনিষদে এইভাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে--প্রথমটিকে বলা হ'য়েছে "ব্যূহ" অর্থাৎ বিজ্ঞান-সূর্যের রশ্মি-রাজিকে সত্য-চেতনার ক্রমে বিন্যাস করা; দ্বিতীয়টিকে বলা হ'য়েছে "সমূহ" অর্থাৎ রশ্মিগুলিকে বিজ্ঞানসূর্যের শরীরে একত্রিত করা; তৃতীয়টি হ'ল সূর্যের সেই কল্যাণতম রূপদর্শন যার মধ্যে অন্তঃপুরুষ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে অধিগত করে অনন্ত পুরুষের[১] সহিত নিজের একত্ব। ঊর্ধ্বে, তার মধ্যে, চারিদিকে, সর্বত্র পরতম আর অন্তঃপুরুষ পরতমে আবিষ্ট ও তাঁর সহিত এক,--নিজেরই ঘনীভূত জ্যোতির্ময় পুরুষ প্রকৃতিতে একাগ্র ভগ-বানের অনন্ত সামর্থ্য ও সত্য,--দিব্য জ্ঞান, সংকল্প ও আনন্দের এমন ভাস্বর কর্মধারা যা প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ সুষ্ঠু--ইহাই সেই মনোময় পুরুষের মৌলিক অনুভূতি যে বিজ্ঞানের সিদ্ধিতে রূপান্তরিত ও চরিতার্থ ও ঊর্ধ্বায়িত হ'য়েছে।

১ "সূর্য, ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ, তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি;" বেদে বিজ্ঞান-লোককে বলা হয় "ঋতম্ সত্যম্, বৃহৎ"--ইহারা একই ত্রিবিধ ভাবনা তবে বিভিন্নভাবে বর্ণিত। ঋতম হ'ল সত্যের ধারা অনুযায়ী দিব্যজ্ঞান, সংকল্প ও আনন্দের ক্রিয়া অর্থাৎ সত্য-চেতনার লীলা। সত্যম্ হ'ল যে সত্তা ঐভাবে কাজ করে তার সত্য, সত্য-চেতনার স্ফুরন্ত স্বরূপ। বৃহৎ হ'ল সচ্চিদা-নন্দের আনন্ত্য যা থেকে অন্য দুটির উৎপত্তি এবং যার মধ্যে ইহারা প্রতিষ্ঠিত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিজ্ঞানপ্রাপ্তির বিভিন্ন সর্ত

বিজ্ঞানের প্রথম তত্ত্ব হ'ল জ্ঞান, কিন্তু জ্ঞান ইহার একমাত্র সামর্থ্য নয়। অপর সকল লোকেরই মতো সত্যচেতনা নিজেকে সেই বিশেষ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করে যা স্বভাবতঃই ইহার সকল গতির চাবিকাঠি; কিন্তু ইহা তার দ্বারা সীমিত নয়, অস্তিত্বের অপর সকল সামর্থ্যই ইহা ধারণ করে। পার্থক্য এই যে এই সব অন্য সামর্থ্যের স্বভাব ও কর্মধারা পরিবর্তিত হ'য়ে নিজেরই মূল ও প্রধান বিধান অনুযায়ী আকার ধারণ করে; বুদ্ধি, প্রাণ, দেহ, সংকল্প, চেতনা, আনন্দ—এই সকলই দিব্য জ্ঞানে জ্যোতির্ময়, প্রবুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। বস্তুতঃ ইহাই সর্বত্র পুরুষ-প্রকৃতির ধারা; অভিব্যক্ত অস্তিত্বের সকল স্তর-পরম্পরা এবং ক্রমবিন্যস্ত সামঞ্জস্যসমূহের প্রধান গতিরীতি ইহাই।

মনোময় পুরুষে মানস-বোধ বা বুদ্ধিই মূল ও প্রধান তত্ত্ব। মনোজগতের অধিবাসী মনোময় পুরুষ তার কেন্দ্রীয় ও নির্ধারক স্বভাবে বুদ্ধি-স্বরূপ; সে বুদ্ধির এক কেন্দ্র, বুদ্ধির এক পুঞ্জীভূত গতিবৃত্তি, বুদ্ধির এক গ্রহিষ্ণু ও বিকিরণশীল ক্রিয়া। তার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার বুদ্ধিগত বোধ আছে, নিজের অস্তিত্ব ছাড়া অপর অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তার বুদ্ধিগত বোধ আছে, নিজের স্বভাব ও কর্মধারা ও অপরসকলের কর্মধারা সম্বন্ধেও তার বুদ্ধিগত বোধ আছে, বিষয় ও ব্যক্তিসমূহের স্বভাব এবং নিজের সহিত তাদের বিভিন্ন সম্পর্ক ও পরস্পরের সহিত তাদের বিভিন্ন সম্পর্ক সম্বন্ধেও তার বুদ্ধিগত বোধ আছে। এই সব নিয়েই অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা গঠিত। অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার অন্য কোনো জ্ঞান নেই, প্রাণ ও জড় যেভাবে তার কাছে ইন্দ্রিয়গোচর হয় এবং যেভাবে তারা তার মানসিক বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য হ'তে সমর্থ—সে ছাড়া অন্যভাবে ইহাদের সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান নেই; যেসব সম্বন্ধে তার ইন্দ্রিয়বোধ ও মানসিক প্রতীতি নেই, সেসব তার কাছে কার্যতঃ অস্তিত্ব-শূন্য, অথবা অন্ততঃ তার জগৎ ও প্রকৃতির অজানা ভিন্ন প্রকারের।

মানব তার মূল তত্ত্বে মনোময় পুরুষ কিন্তু সে মনোময় জগতে বাস

করে না, সে যে অস্তিত্বে বাস করে তা প্রধানতঃ ভৌতিক; তার মন জড়-আধারে আবদ্ধ ও জড়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং তাকে শুরু করতে হয় বিভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিয়ে; জড়গত সংস্পর্শের সকল প্রণালীই এই সব স্থূল ইন্দ্রিয়; মানস-বোধ নিয়ে সে শুরু করে না। কিন্তু তবু, এই সব স্থূল ইন্দ্রিয় যা সব নিয়ে আসে সেসব মানস-বোধের দ্বারা আয়ত্ত ও বুদ্ধিগত সত্তার সত্ত্বে ও মূল্যে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ও তা না হ'লে সে ইহাদের স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে না, আর করতে পারেও না। অবর অবমানুষী অব-মানসিক জগতে যা প্রাণিক, স্নায়ুগত, স্ফুরন্ত, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া তা মানস-সংজ্ঞায় পরিবর্তিত বা মানস-শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হ'য়েও বেশ ভালভাবেই কার্যকরী থাকে, কিন্তু সেসবকে তার মধ্যে উন্নত ক'রে দেওয়া চাই কোনোপ্রকার বুদ্ধির কাছে। মানবীয় বৈশিষ্ট্য পেয়ে মানবীয় হ'তে হ'লে ইহাকে প্রথম হ'তে হবে শক্তির বোধ, কামনার বোধ, সংকল্পের বোধ, বুদ্ধিগত সংকল্প-ক্রিয়ার বোধ অথবা শক্তি-ক্রিয়ার মানসিকভাবে সচেতন বোধ। তার সত্তার যে অবর আনন্দ তা পরিণত হয় মানসিক অথবা মানসিকভাবাপন্ন প্রাণিক বা ভৌতিক সুখের এবং ইহার বিকৃতি দুঃখের বোধে, অথবা পছন্দ ও অপছন্দর মানসিক ও মানসিকভাবাপন্ন বেদনাত্মক ইন্দ্রিয়সংবিতে অথবা আনন্দ ও নিরানন্দের বুদ্ধিতে ---এই সবই হ'ল বুদ্ধিগত মানসবোধের ব্যাপার। সেইরকম আবার, যা তার ঊর্ধ্বে, যা তার চারিদিকে এবং যার মধ্যে সে বাস করে সেইসব--ভগবান, বিরাট পুরুষ, বিভিন্ন বিশ্বশক্তি---তার কাছে অস্তিত্ব-শূন্য ও অসৎ যতক্ষণ না তার মন সেসবে প্রবুদ্ধ হয় এবং পায়,---যদিও তখনো তাদের আসল সত্য পায় না---অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহের কিছু ভাবনা, নিরীক্ষণ, অনুমান, কল্পনা, অনন্তের কিছু মানসিক বোধ, তার ঊর্ধ্বে ও চারিদিকে অতি-আত্মার বিভিন্ন শক্তির কিছু বুদ্ধিগত অর্থপ্রকাশক চেতনা।

যখন আমরা মন থেকে বিজ্ঞানে যাই, তখন সকল কিছুই পরিবর্তিত হয়; কারণ সেখানে প্রত্যক স্বগত জ্ঞানই কেন্দ্রীয় তত্ত্ব। বিজ্ঞানময় সত্তার যা স্বভাব তাতে ইহা এক সত্য-চেতনা, বিষয়সমূহের সত্য-দর্শনের এক কেন্দ্র ও পরিধি, বিজ্ঞানের এক পুঞ্জীভূত গতিবৃত্তি অথবা সূক্ষ্মদেহ। ইহার ক্রিয়া হ'ল বিষয়সমূহের গভীরতম সত্যতম আত্মা ও প্রকৃতির আন্তর বিধান অনুযায়ী সেসবের সত্য-সামর্থ্যের আত্ম-চরিতার্থতাকারী ও বিকিরণশীল কর্ম। বিজ্ঞানে প্রবেশ করার পূর্বে বিষয়সমূহের এই যে সত্য আমাদের

লাভ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়--কারণ বিজ্ঞানময় লোকে ইহারই মধ্যে সকল কিছু অবস্থিত এবং ইহা থেকেই সকল কিছুর উৎপত্তি--তা সর্ব-প্রথম হ'ল ঐক্যের, একত্বের এক সত্য, তবে বৈচিত্র্য উৎপাদন করে এমন ঐক্য, বহুত্বের মধ্যে ঐক্য আর তথাপি সর্বদাই ঐক্য, এক অপরাজেয় একত্ব। সর্বঅস্তিত্ব ও সর্বভূতের সহিত আমাদের নিজেদের বিপুল ও নিবিড় আত্ম-অভিন্নতা, বিশ্বব্যাপিতা, বিশ্ব অবধারণ বা ধারণ, এক প্রকার সর্বময়ত্ব--এই সব ব্যতীত বিজ্ঞানের অবস্থা, বিজ্ঞানময় পুরুষের অবস্থা লাভ করা অসম্ভব। বিজ্ঞানময় পুরুষের নিজের সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই চেতনা থাকে যে সে অনন্ত, সাধারণতঃ এই চেতনাও থাকে যে সে নিজের মধ্যে জগৎ ধারণ করে আছে এবং ইহার অতিরিক্ত সে; ইহা সেই বিভক্ত মনোময় পুরুষের মতো নয় যে সাধারণতঃ এমন এক চেতনায় বদ্ধ থাকে যে নিজেকে অনুভব করে যে সে জগতের মধ্যে ধরা রয়েছে ও ইহার এক অংশ। সুতরাং সীমাজনক ও আবদ্ধকারী অহং থেকে উদ্ধার পাওয়াই বিজ্ঞানময় সত্তা লাভের দিকে প্রথম প্রাথমিক পদক্ষেপ; কারণ যতদিন আমরা এই অহং-এর মধ্যে বাস করি ততদিন এই পরতর সদ্-বস্তু, এই বৃহৎ আত্ম-সচেতনতা, এই প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান আশা করা বৃথা। অহং-মনন, অহং-ক্রিয়া, অহং-সংকল্পের দিকে অতি সামান্য প্রত্যাবর্তনেরও ফল হ'ল, চেতনা যে বিজ্ঞানময় সত্য লাভ করেছে তা থেকে বিভক্ত মানস-প্রকৃতির বিভিন্ন অনৃতের মধ্যে ইহার স্খলন। এই জ্যোতির্ময় পরতর চেতনার মূল ভিত্তিই হ'ল সত্তার দৃঢ় বিশ্বজনীনতা। সকল কঠোর পৃথক্-ভাব পরিহার ক'রে (তবে তার পরিবর্তে এক প্রকার অতিস্থিত ঊর্ধ্ব-দৃষ্টি বা অনধীনতা লাভ ক'রে) আমাদের পক্ষে প্রয়োজন হ'ল,--আমরা সকল বিষয় ও সত্তার সহিত যে এক তা অনুভব করা, তাদের সহিত নিজেদের অভিন্ন করা, তারা যে আমরা নিজেরাই এইভাবে তাদের জানা, তাদের সত্তাকে আমাদের আপন সত্তা ব'লে অনুভব করা, তাদের চেতনাকে আমা-দের চেতনার অংশ ব'লে স্বীকার করা, আমাদেরই ক্রিয়াশক্তির মতো অন্তরঙ্গভাবে তাদের ক্রিয়াশক্তির সহিত সংযোগ স্থাপন করা, সকলের সহিত এক আত্মা হ'তে শেখা। অবশ্য ঐ একত্ব যে প্রয়োজনীয় সর্বকিছু তা নয়, তবে ইহা এক প্রথম সর্ত এবং ইহা ব্যতীত বিজ্ঞানপ্রাপ্তি হয় না।

যতদিন বর্তমানের মতো আমাদের এই অনুভব থাকবে যে আমরা এক ব্যষ্টিগত মন, প্রাণ ও দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত এক চেতনা, ততদিন

এই বিশ্বজনীনতা পুরোপুরি অর্জন করা অসম্ভব। অন্নময় শরীর থেকে, এমনকি মনোময় শরীর থেকে বিজ্ঞানময় শরীরে পুরুষের একপ্রকার উত্তরণ প্রয়োজন। মস্তিষ্ক বা ইহার প্রতিরূপ মানসিক "পদ্ম" আর আমাদের চিন্তার কেন্দ্র থাকতে পারে না, হৃদয় বা ইহার প্রতিরূপ "পদ্ম"ও আর আমাদের ভাবগত ও ইন্দ্রিয়সংবেদনগত সত্তার উৎসকেন্দ্র থাকতে পারে না। আমাদের সত্তার, আমাদের মননের, আমাদের সংকল্প ও ক্রিয়ার চিন্ময় কেন্দ্র, এমন কি আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ভাবাবেগের আদি শক্তিও দেহ ও মনের বাহিরে উঠে তাদের ঊর্ধ্বে এক স্বতন্ত্র স্থান গ্রহণ করে। আর আমাদের এ ইন্দ্রিয়বোধ হয় না যে আমরা দেহের মধ্যে বাস করছি, আমাদের বোধ হয় যে আমরা ইহার ঊর্ধ্বে অবস্থিত যেন ইহার প্রভু, অধিকারী বা ঈশ্বর এবং সেই সাথে ইহাকে ঘিরে রাখি আবদ্ধ স্থূল ইন্দ্রিয়ের চেতনা অপেক্ষা এক আরো ব্যাপ্ত চেতনার দ্বারা। এখন আমরা বাস্তবতার সজীব শক্তিতে সাধারণ ও অবিরতভাবে উপলব্ধি করি জ্ঞানীদের সেই কথার তাৎপর্য যে পুরুষ দেহকে বহন করে অথবা পুরুষ দেহের মধ্যে থাকে না, বরং দেহই পুরুষের মধ্যে থাকে। মস্তিষ্ক থেকে নয়, দেহের ঊর্ধ্ব থেকেই আমরা ভাবনা ও সংকল্প করব; মস্তিষ্কের ক্রিয়া হবে উপর থেকে মনন-শক্তি ও সংকল্প-শক্তির আঘাতে দেহ-যন্ত্রের প্রত্যুত্তর ও সঞ্চালন মাত্র। সকল কিছুই উৎপন্ন হবে উপর থেকে; আমাদের বর্তমান মানসিক ক্রিয়ার প্রতিরূপ যা কিছু বিজ্ঞানে আছে সে সবই ঘটে উপর থেকে। বিজ্ঞানময় রূপান্তরের এই যে বিভিন্ন অবস্থা তার সকলগুলি না হ'লেও অনেকগুলিই লাভ করা যায় এবং বস্তুতঃ লাভ করা প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানপ্রাপ্তির বহুপূর্বেই—তবে প্রথমে অপূর্ণভাবে, যেন প্রতিফলনের দ্বারা—স্বয়ং উত্তরমানসে এবং আরো সম্পূর্ণভাবে সেই চেতনায় যাকে আমরা বলতে পারি মানসিকতা ও বিজ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত অধিমানস চেতনা।

কিন্তু এই (বিজ্ঞান) কেন্দ্র এবং এই (বিজ্ঞানময়) ক্রিয়া স্বাধীন, বদ্ধ নয়, দেহযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়, সংকীর্ণ অহং-বোধে আবদ্ধ নয়। ইহা দেহে জড়িত নয়; ইহা যে কোনো বিভক্ত ব্যষ্টিত্বের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে জগতের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আনাড়ির মতো চেষ্টা করছে অথবা নিজেরই গভীরতর চিৎ-পুরুষের জন্য অন্তর্মুখী হ'য়ে অন্ধের মতো খুঁজছে তা-ও নয়। কারণ এই মহান্ রূপান্তরে আমরা এমন এক চেতনা পেতে শুরু করি যা কোনো উৎপাদক আধারের (generating

box) মধ্যে আবদ্ধ নয়, বরং যা সর্বত্র স্বচ্ছন্দভাবে ব্যাপ্ত এবং স্ব-প্রতিষ্ঠ-ভাবে প্রসারশীল; এক কেন্দ্র আছে বা থাকতে পারে, কিন্তু তা ব্যষ্টিক্রিয়ার সুবিধার জন্য, ইহা কোনো অনমনীয় বা সংগঠনসূচক বা পার্থক্যসূচক কেন্দ্র নয়। ইহার পর থেকে আমাদের সচেতন ক্রিয়াবলীর স্বভাবই হয় বিশ্বজনীন; ইহা বিশ্বসত্তার সহিত এক এবং বিশ্বভাব থেকে উৎপন্ন হ'য়ে অগ্রসর হয় নমনীয় ও পরিবর্তনীয় ব্যষ্টিভাবাপন্নতার দিকে। ইহা এমন এক অনন্ত পুরুষের সংবিৎ হ'য়ে উঠেছে যে সর্বদাই কাজ করে বিশ্বজনীন-ভাবে, যদিও জোর দেওয়া হয় তার বিভিন্ন শক্তির ব্যষ্টিগত রূপায়ণের উপর। কিন্তু এই জোর পার্থক্যসূচক অপেক্ষা বরং বৈশিষ্ট্যসূচক, এবং এই রূপায়ণ আর তা নয় যা আমরা ব্যষ্টিত্ব ব'লে বুঝি; এখন আর নিজেরই যন্ত্রক্রিয়ার সূত্রে আবদ্ধ ক্ষুদ্র সীমিত নির্মিত কোনো ব্যক্তি নেই। চেতনার এই অবস্থা আমাদের সত্তার বর্তমান প্রকারের পক্ষে এত অস্বাভাবিক যে ইহাকে পায়নি এমন যুক্তিবাদী ব্যক্তির কাছে মনে হবে ইহা অসম্ভব অথবা এক বিজাতীয় অবস্থা; কিন্তু অধিগত হ'লে ইহা তার মহত্তর শান্তি, স্বাধী-নতা, আলোক, সামর্থ্য, সংকল্পের কার্যকারিতা, ভাবনা ও বেদনার প্রামাণ্য সত্যের দ্বারা এমনকি মানসিকবুদ্ধিরও কাছে নিজের যথার্থতা প্রতিপন্ন করে। কেননা এই অবস্থা ইতিপূর্বেই শুরু হয় মুক্ত মনের উচ্চতর স্তর-সমূহে এবং সেজন্য মানসবুদ্ধি ইহাকে কিছু কিছু অনুভব ও বুঝতে সক্ষম হয়, তবে ইহা সুষ্ঠু আত্ম-অধিকারে উন্নত হয় একমাত্র তখনই যখন ইহা পিছনে ফেলে আসে মানসিক স্তরসমূহ, অর্থাৎ একমাত্র অতিমানসিক বিজ্ঞানে।

চেতনার এই অবস্থায় অনন্ত আমাদের কাছে হ'য়ে ওঠে মূল, বাস্তব সদ্‌বস্তু, একমাত্র বিষয় যা অব্যবহিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবে সত্য। অনন্ত সম্বন্ধে আমাদের মৌলিক বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সান্ত সম্বন্ধে চিন্তা করা অথবা তা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে, কারণ একমাত্র এই অনন্তের মধ্যেই সান্ত জীবনধারণে সক্ষম, নিজেকে গঠন করতে সক্ষম, কোনো সত্যতা বা স্থায়িত্ব পেতে সক্ষম। যতদিন এই সান্ত মন ও দেহ আমাদের চেতনার কাছে আমাদের অস্তিত্বের প্রথম তথ্য এবং আমাদের সকল চিন্তা, বেদনা ও সংকল্পের ভিত্তি এবং যতদিন সান্ত বিষয়-সমূহই স্বাভাবিক সদ্‌বস্তু যা থেকে আমরা মাঝে মাঝে অথবা এমনকি প্রায়শঃই অনন্তের কোনো ভাবনা ও বোধে উত্তরণ করি ততদিন আমরা

বিজ্ঞান থেকে বহুদূরবর্তী। বিজ্ঞানময় লোকে অনন্তই যুগপৎ আমাদের সত্তার স্বাভাবিক চেতনা, ইহার প্রথম তথ্য, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধাতু। ইহা আমাদের কাছে অতীব মূর্ত রূপে সেই ভিত্তি যা থেকে প্রতি সান্ত বিষয়ই নিজেকে গঠন করে, এবং ইহার সীমাহীন অপরিমেয় বিভিন্ন শক্তিই আমাদের সকল মনন, সংকল্প ও আনন্দের উৎপত্তির কারণ। কিন্তু এই অনন্ত যে শুধু ব্যাপ্তির বা প্রসারতার এক অনন্ত যার মধ্যে সকল কিছু রূপগ্রহণ করে ও ঘটে তা নয়। ঐ অপরিমেয় প্রসারতার পশ্চাতে যে এক দেশাতীত আন্তর অনন্ত আছে তা বিজ্ঞানময় চেতনা সর্বদাই জানে দ্বিবিধ অনন্তের মধ্য দিয়েই আমরা পৌছব সচ্চিদানন্দের স্বরূপগত সত্তায়, আমাদের আপন সত্তার পরম আত্মায়, এবং আমাদের বিশ্ব অস্তি-ত্বের সমগ্রতায়। আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয় এমন এক অসীম অস্তিত্ব যার সম্বন্ধে আমরা অনুভব করি যে ইহা যেন আমাদের উর্ধ্বে এক আনন্ত্য যার মধ্যে উঠতে আমরা চেষ্টা করি এবং ইহা যেন আমাদের চারিদিকে এক আনন্ত্য যার মধ্যে আমাদের পৃথক অস্তিত্ববিলীন করার জন্য আমরা প্রয়াস করি। পরে, ইহার মধ্যে আমরা প্রসারিত হই এবং ইহার মধ্যে উত্তরণ করি; অহং ভেঙে আমরা বার হই ইহার বৃহত্ত্বের মধ্যে এবং তা-ই হই চিরদিনের জন্য। যদি এই মুক্তি অর্জন করা যায়, তাহ'লে আমাদের তেমন সংকল্প থাকলে এই মুক্তির সামর্থ্য আমাদের অবর সত্তাকেও উত্ত-রোত্তর অধিগত ক'রতে পারে যতদিন না এমনকি আমাদের অবম ও বিকৃততম ক্রিয়াবলীও রূপান্তরিত হয় বিজ্ঞানের সত্যে।

অনন্ত সম্বন্ধে এই বোধ এবং অনন্তের দ্বারা এই অধিকার—ইহাই ভিত্তি, এবং একমাত্র ইহা অর্জন করা হ'লেই আমরা অগ্রসর হ'তে পারি অতিমানসিক ভাবনা, অনুভব, বোধ, তাদাত্ম্য ও সংবিতের কোনোপ্রকার সাধারণ অবস্থার দিকে। কারণ, এমনকি অনন্তের বোধও শুধু এক প্রথম প্রতিষ্ঠা, আরো অনেক কিছু করা কর্তব্য তবে যদি পরে চেতনা স্ফুরন্ত-ভাবে বিজ্ঞানময় হ'য়ে উঠতে পারে। কারণ অতিমানসিক জ্ঞান হ'ল পরম আলোকের খেলা; এমনকি বিজ্ঞানে আরোহণ করার পূর্বেই অন্য অনেক আলোক, মানবমন ছাড়া জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর আমাদের মধ্যে উন্মুক্ত হ'তে পারে এবং ঐ মহাজ্যোতির কিছু গ্রহণ বা প্রতিফলিত ক'রতে পারে। কিন্তু ইহাকে আয়ত্ত বা সম্পূর্ণভাবে অধিগত করতে হ'লে আমাদের কর্তব্য হ'ল প্রথম ঐ পরম আলোকের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করা ও তা-ই হওয়া, আমা-

দের চেতনাকে রূপান্তরিত করা চাই ঐ চেতনায়, তাদাত্ম্যের দ্বারা আত্ম-সংবিতের ও সর্ব-সংবিতের ইহার যে তত্ত্ব ও সামর্থ্য তা-ই হওয়া চাই আমাদের অস্তিত্বের পূর্ণ সত্ত্ব। কারণ আমাদের চেতনা যে ধরণের হবে, আমাদের জ্ঞান ও ক্রিয়ার সাধন ও পথগুলিও সেরূপ হ'তে বাধ্য, আর যদি জ্ঞানের ঐ পরতর সামর্থ্য আমাদের আয়ত্ত করতে হয়,—শুধু তা মাঝে মাঝে পাওয়া নয়—তাহ'লে চেতনারই আমূল রূপান্তর অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহা কোনো পরতর মননের বা একপ্রকার দিব্য যুক্তিবুদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেখানে এখন আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সব সাধনগুলির প্রবেশ নিষিদ্ধ, আর তারা অন্ধ ও অকার্যকরী সেখানে ইহা সেসব সাধনকে অতিমাত্রায় প্রসারিত, সক্রিয় ও কার্যকরী ভাবে উত্তোলন করে এবং তাদের পরিণত করে বিজ্ঞানের উচ্চ এবং প্রখর বোধাত্মক ক্রিয়াধারায়। এইভাবে ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়ক্রিয়াকে উপরে নিয়ে তাকে, এমনকি তার সাধারণ ক্ষেত্রেও ভাস্বর করে যাতে আমরা লাভ করি বিষয়সমূহের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু আবার ইহা মানসবোধকেও এমন সমর্থ করে যে ইহা বাহ্য ঘটনার মতো আন্তর ঘটনারও প্রত্যক্ষ বোধ পায়, আর উদাহরণস্বরূপ যে বিষয়ের উপর ইহা নিবদ্ধ হয় তার বিভিন্ন ভাবনা, বেদনা, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া অনুভব, ও গ্রহণ বা উপলব্ধি করে।[১] ইহা বিভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাথে বিভিন্ন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিও ব্যবহার করে এবং তাদের রক্ষা করে তাদের সব প্রমাদ থেকে। যে জড়লোকে আমাদের সাধারণ মানসিকতা অজ্ঞানতার সহিত আসক্ত তা ছাড়া অস্তিত্বের অন্য বিভিন্ন লোকেরও জ্ঞান, অনুভূতি ইহা আমাদের দেয় এবং আমাদের জন্য জগৎ প্রসারিত করে। সেইরকম ইহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎ রূপান্তরিত করে এবং সেসবকে যেমন তাদের পূর্ণ ধারণ-শক্তি দেয় তেমন দেয় তাদের পূর্ণ প্রখরতা; কারণ আমাদের সাধারণ মানসিকতায় পূর্ণ প্রখরতা অসম্ভব, এইজন্য যে এক নির্দিষ্ট সীমার বাহিরের স্পন্দনগুলি ধারণ ও সহ্য করার সামর্থ্য তার নেই, মন ও দেহ—দুইই ভেঙে যাবে আঘাতের চাপে বা সুদীর্ঘ টানে। আমাদের বিভিন্ন বেদনা ও ভাবাবেগের অন্তর্গত জ্ঞানের উপাদানকেও

১ পতঞ্জলি বলেন, এই সামর্থ্য আসে বিষয়ের উপর "সংযমের" দ্বারা। কিন্তু সংযমের প্রয়োজন মানসিকতার জন্য, বিজ্ঞানে "সংযমের" কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এই প্রকারের বোধ বিজ্ঞানের স্বাভাবিক ক্রিয়া।

ইহা তুলে নেয়---কারণ আমাদের বিভিন্ন বেদনার মধ্যেও জ্ঞানের এমন সামর্থ্য ও কার্যসাধনের এমন সামর্থ্য আছে যা আমরা জানি না ও সঠিক-ভাবে বিকশিত করি না---এবং ইহা একই সময়ে তাদের মুক্ত করে তাদের বিভিন্ন সংকীর্ণতা থেকে, তাদের বিভিন্ন প্রমাদ ও কলুষ থেকে। কারণ সকল বিষয়ে বিজ্ঞানই সত্য, ঋত, পরম বিধান, "দেবানাম্ অদব্ধানি ব্রতানি"।

জ্ঞান এবং শক্তি বা সংকল্প---কারণ সকল চিন্ময় শক্তিই সংকল্প--হ'ল চেতনার ক্রিয়ার যুগ্ম দিক। আমাদের মানসিকতায় ইহারা বিভক্ত। ভাবনা প্রথম আসে, সংকল্প আসে ইহার পর স্খলিতপদে, অথবা ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অথবা ভাবনার অপূর্ণ যন্ত্র হিসাবে তাকে ব্যবহার করা হয় আর ফলও হয় অপূর্ণ; আর না হয় সংকল্প প্রথম শুরু করে তার মধ্যে এক অন্ধ বা অর্ধদর্শী ভাবনা নিয়ে এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে এমন কিছু সম্পাদন করে যার সম্বন্ধে আমরা সঠিক ধারণা পাই পরে। আমাদের অন্তর্গত এই দুই সামর্থ্যের মধ্যে কোনো একত্ব নেই, নেই কোনো পূর্ণ সামঞ্জস্যবোধ; আর না হয় কার্যসাধনের সহিত কার্যারম্ভের কোনো সুষ্ঠু মিল থাকে না। তাছাড়া জীবের সংকল্প ও বিশ্বসংকল্পের সহিত সুসমঞ্জস নয়; ইহা তাকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে, অথবা তার নীচে পড়ে থাকে আর না হয় তা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে তার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইহা সত্যের বিভিন্ন কাল বা ঋতু জানে না, জানে না তার বিভিন্ন মাত্রা বা পরিমাণ। বিজ্ঞান সংকল্পকে তুলে নিয়ে ইহাকে প্রথম অতিমানসিক জ্ঞানের সত্যের সহিত সামঞ্জস্যে আনে এবং পরে আনে ইহার সহিত একত্বে। এই জ্ঞানে জীবের ভাবনা বিশ্বভাবের ভাবনার সহিত এক, কারণ উভয়কেই ফিরিয়ে নেওয়া হয় পরম জ্ঞানের ও বিশ্বাতীত সংকল্পের সত্যে। বিজ্ঞান শুধু যে আমাদের বুদ্ধিগত সংকল্প তুলে নেয় তা নয়, ইহা আমাদের বিভিন্ন কামনা, এমনকি যেগুলিকে আমরা হীন কামনা বলি সেগুলিও তুলে নেয়, তুলে নেয় বিভিন্ন সহজসংস্কার, সংবেগ, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-সংবিতের বিভিন্ন বাহ্য প্রাপ্তি এবং এই সবকে ইহা রূপান্তরিত করে। ইহারা আর ইচ্ছা ও কামনা থাকে না, কারণ প্রথমে ইহাদের যে ব্যক্তিগত ভাব তার অবসান হয় এবং পরে অবসান হয় তাদের সেই অনায়াত্তের জন্য সংগ্রামের ভাব যাকে আমরা বলি লালসা ও কামনা। ইহারা আর সহজসংস্কারমূলক বা বুদ্ধিপ্রধান মানসিকতার অন্ধ বা অর্ধ-অন্ধ চেষ্টা থাকে

না, ইহারা রূপান্তরিত হয় সত্য-সংকল্পের বিচিত্র ক্রিয়ায়; আর ঐ সংকল্প কাজ করে ইহার পূর্ব-নির্ধারিত ক্রিয়ার সঠিক পরিমাণের স্বগত জ্ঞান নিয়ে এবং সেজন্য ইহার এমন এক কার্যকারিতা থাকে যা আমাদের মানসিক সংকল্প-ক্রিয়ার অজ্ঞাত। সেইজন্য আবার বিজ্ঞানময় সংকল্পের ক্রিয়াতে পাপের কোনো স্থান নেই; কারণ সকল পাপই সংকল্পের প্রমাদ, অবিদ্যার কামনা ও ক্রিয়া।

যখন কামনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়, তখন শোক ও সকল আন্তর কষ্টভোগেরও অবসান হয়। বিজ্ঞান শুধু যে আমাদের জ্ঞান ও সংকল্পের অংশগুলি তুলে নেয় তা নয়, ইহা আমাদের স্নেহ ও আনন্দের অংশগুলিও তুলে নিয়ে তাদের রূপান্তরিত করে দিব্য আনন্দের ক্রিয়ায়। কারণ যদি জ্ঞান ও শক্তি চেতনার ক্রিয়ার যুগ্ম দিক বা সামর্থ্য হয়, তাহ'লে আনন্দ--যা আমরা যাকে সুখ বলি তার চেয়ে পরতর কিছু--চেতনার নিজস্ব সত্ত্ব এবং জ্ঞান ও সংকল্পের, শক্তি ও আত্ম সংবিতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণাম। সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও বিষাদ--উভয়ই আনন্দের বিকৃতরূপ আর ইহাদের উৎপত্তির কারণ হ'ল আমাদের চেতনা ও ইহার প্রযুক্ত শক্তির মধ্যে, আমাদের জ্ঞান ও সংকল্পের মধ্যে সামঞ্জস্যের হানি, এবং এমন এক অবর লোকে অবতরণের দরুণ তাদের একত্ব-ছেদ যার মধ্যে তারা সীমিত, নিজেদের মধ্যে বিভক্ত, তাদের পূর্ণ ও সঙ্গত ক্রিয়া থেকে নিবারিত, অন্যশক্তি, অন্যচেতনা, অন্য জ্ঞান, অন্য সংকল্পের সহিত তারা সংঘর্ষে লিপ্ত। এই বিচ্যুতিকে বিজ্ঞান সংশোধন করে তার সত্যের সামর্থ্যের দ্বারা এবং একত্ব ও সামঞ্জস্যে, ঋত ও পরম বিধানে সমগ্রভাবে পুনঃস্থাপনের দ্বারা। আমাদের সকল ভাবাবেগ তুলে নিয়ে ইহা সেসবকে রূপান্তরিত করে প্রেম ও আনন্দের বিবিধ রূপে, এমনকি আমাদের বিভিন্ন রকমের ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, কষ্টভোগের কারণগুলিকেও ইহা এইভাবে রূপান্তরিত করে। যে অর্থ তারা হারিয়েছিল এবং যা এই হারানর দরুণ তারা এখনকার বিকৃতিতে পরিণত হ'য়েছে সে অর্থ ইহা বাহির করে বা প্রকট করে; ইহা আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে শাশ্বত শিবে। অনুরূপভাবে ইহা আমাদের বিভিন্ন অনুভব ও ইন্দ্রিয়বোধের সহিত ব্যবহার ক'রে তারা যে আনন্দ খোঁজে তা সমস্তই প্রকাশ করে, তবে তা প্রকাশ করে তার সত্যে, কোনো বিকৃতিতে ও অসঙ্গত অন্বেষণে ও অসঙ্গত গ্রহণে নয়; এমনকি আমাদের অবর সব সংবেগগুলিকেও ইহা শিক্ষা দেয় যেন

তারা যেসব বাহ্য রূপের পশ্চাতে ছোটে সেসবের মধ্যে স্পর্শ করে ভগবান ও অনন্তকে। এই যে সব করা হয় তা অবর সত্তার মূল্যে করা হয় না, তা করা হয় মানসিক, প্রাণিক, জড়ীয় সত্তাকে দিব্য আনন্দের অবিচ্ছেদ্য শুদ্ধতায়, স্বাভাবিক প্রখরতায়, এক অথচ বহুবিধ অবিরত উল্লাসে উত্তোলন ক'রে।

অতএব বিজ্ঞানের সত্তা তার সকল কার্যের মধ্যে এমন পূর্ণ-করা জ্ঞান-সামর্থ্য, সংকল্প-সামর্থ্য, আনন্দ-সামর্থ্যের ক্রীড়া যে-সবকে উন্নত করা হ'য়েছে মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক স্তরের উচ্চতর স্তরে। এই সত্তা সর্ব-ব্যাপী, বিশ্বভাবাপন্ন এবং অহমাত্মক ব্যক্তিসত্ত্ব ও ব্যষ্টিত্ব থেকে মুক্ত এবং ইহা এক পরতর আত্মার, সত্তার এক পরতর চেতনার এবং সেহেতু এক পরতরা শক্তির ও পরতর আনন্দের লীলা। ঐসব বিজ্ঞানের মধ্যে কাজ করে মহত্তরা বা দিব্য প্রকৃতির শুদ্ধতায়, ঋতে, সত্যে। ইহার সামর্থ্যগুলি প্রায়ই এমন সব মনে হ'তে পারে যেসবকে যোগের সাধারণ ভাষায় বলা হয় সিদ্ধি, ইওরোপীয়রা বলে গুহ্যশক্তি, ভক্তেরা ও অনেক যোগীরা যাদের পরিহার ও ভয় করে এই ব'লে যে ইহারা ভগবানের জন্য সত্যকার অন্বেষণের পথে বিভিন্ন ফাঁদ, অন্তরায় ও বিভ্রমকারী বিষয়। কিন্তু তাদের স্বভাবই ঐরূপ, তারা যে এখানে বিপজ্জনক তার কারণ তাদের অস্বাভাবিকভাবে চাওয়া হয় অহং-এর দ্বারা অবর সত্তায় অহমাত্মক তৃপ্তির জন্য। বিজ্ঞানের মধ্যে ইহারা গুহ্যশক্তিও নয়, সিদ্ধিও নয়, ইহারা বিজ্ঞা-নের প্রকৃতির উন্মুক্ত আয়াসহীন ও স্বাভাবিক ক্রীড়া। বিজ্ঞান হ'ল ভাগবত সত্তার দিব্য সব তাদাত্ম্যের মধ্যে ইহার সত্য-সামর্থ্য ও সত্য-ক্রিয়া এবং যখন ইহা বিজ্ঞানলোকে উন্নীত জীবের মধ্য দিয়ে কাজ করে, ইহা নিজেকে চরিতার্থ করে অবিকৃতভাবে, ত্রুটিশূন্য বা অহমাত্মক প্রতিক্রিয়া-রহিত হ'য়ে, ভগবদ্-অধিকার থেকে বিচ্যুত না হ'য়ে। সেখানে জীব আর তখন অহং নয়, সে পরতরা দিব্যপ্রকৃতিতে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত মুক্ত-জীব, আর এই দিব্য প্রকৃতির এক অংশ সে, "পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা" ইহা পরম ও বিশ্বাত্মক আত্মারই প্রকৃতি যখন অবশ্য আত্মাকে দেখা হয় বহুময় ব্যষ্টিত্বের লীলায় তবে অবিদ্যার আবরণশূন্য হ'য়ে, আত্ম-জ্ঞানের সহিত, দেখা হয় ইহার বহুময় একত্বে, ইহার দিব্যশক্তির সত্যে।

বিজ্ঞানের মধ্যেই পাওয়া যায় পুরুষ ও প্রকৃতির সঠিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া, কারণ সেখানে তারা মিলিত হ'য়ে এক হ'য়েছে, আর ভগবান তখন

আর মায়াবৃত নন। সকলই তাঁর ক্রিয়া। জীব তখন আর বলে না, "আমি চিন্তা করি, আমি কাজ করি, আমি কামনা করি, আমি অনুভব করি।" ঐক্যের জন্য সাধনায় রত যে সাধক ঐক্য পাবার আগেই বলেছিল "হৃদিস্থিত তুমি যেমন আমায় নিযুক্ত করবে তেমন আমি কাজ করব", সে সেই সাধকেরও মতো তা বলে না। কারণ হৃদয়, মানসিক চেতনার কেন্দ্র আর তখন উৎপত্তির কেন্দ্র নয়, ইহা শুধু এক আনন্দময় প্রণালী। সে বরং জানে যে ভগবান ঊর্ধ্বে আসীন, সকলের প্রভু, "অধিষ্ঠিত", আবার তার অভ্যন্তরেও সক্রিয়। আর নিজে সেই পরতর সত্তায় আসীন হ'য়ে "পরার্ধে, পরমস্যাম্ পরাবতি", সে সত্য অর্থে নির্ভীকভাবে বলতে পারে "ভগবান নিজেই তাঁর প্রকৃতির দ্বারা আমার ব্যষ্টিতত্ত্ব ও ইহার বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়ে জানেন, কাজ করেন, ভালবাসেন, আনন্দ পান এবং সেখানে ইহার পরতর ও দিব্যমাত্রায় সেই বহুবিধ "লীলা" চরিতার্থ করেন, আর অনন্ত নিজেই নিত্য যে বিশ্বজনীনতা তার মধ্যে তিনি এই লীলা করেন নিত্যকাল ধরে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বিজ্ঞান ও আনন্দ

বিজ্ঞানে উত্তরণের ও বিজ্ঞানময় চেতনার কিছু পাওয়ার ফলে মানবের অন্তঃপুরুষ উন্নত এবং তার জগৎ-জীবন ঊর্ধ্বায়িত হ'য়ে এমন আলোক ও সামর্থ্য ও আনন্দ ও আনন্ত্যের গরিমা পেতে বাধ্য যা আমাদের বর্তমান মানসিক ও স্থূল অস্তিত্বের পঙ্গু ক্রিয়া ও বিভিন্ন সীমিত উপলব্ধির তুলনায় মনে হ'বে এক চূড়ান্ত ও অনপেক্ষ সিদ্ধির পূর্ণ স্থিতি ও প্রবৃত্তি। আর ইহা এক সত্যকার সিদ্ধি, এমন কিছু যা চিৎ-পুরুষের উৎ-ক্রান্তিতে আর পূর্বে হয়নি। কারণ মানসিকতার লোকে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরও মধ্যে এমন কিছু থাকে যা মাথাভারী, একমুখী ও আত্যন্তিক; এমনকি সর্বাপেক্ষা ব্যাপ্ত মানসিক আধ্যাত্মিকতাও যথেষ্ট ব্যাপ্ত নয়, এবং উপরন্তু জীবনের মধ্যে আত্ম-প্রকাশের অপূর্ণ সামর্থ্যের দ্বারা ইহা কলুষিত। আবার তথাপি ইহার উজানে যা আছে তার তুলনায় ইহাও,---এই প্রাথমিক বিজ্ঞানময় জ্যোতিও এক পূর্ণতর সিদ্ধির দিকে শুধু এক উজ্জ্বল পথ। ইহাই সুদৃঢ় ও প্রোজ্জ্বল ধাপ যেখান থেকে আমরা সানন্দে আরোহণ করতে পারি আরো ঊর্ধ্বে অনপেক্ষ আনন্ত্যসমূহের মধ্যে যেগুলি জন্মপরিগ্রহকারী চিৎ-পুরুষের প্রভব ও গন্তব্যস্থল। এই যে অধিকতর উৎক্রান্তি তাতে বিজ্ঞান তিরোহিত হয় না বরং উপনীত হয় নিজেরই সেই পরম আলোকে যেখান থেকে ইহা অবতরণ করেছে মন ও পরম অনন্তের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে।

উপনিষদ আমাদের বলে যে মনোময় আত্মার ঊর্ধ্বে বিজ্ঞানময় আত্মা অধিগত করার পর এবং ইহার মধ্যে সকল অবর আত্মাই ঊর্ধ্বে আকৃষ্ট হবার পর তখনো আমাদের জন্য থাকে আরো একটি ধাপ আর সর্বশেষ ধাপ---যদিও প্রশ্ন হ'তে পারে ইহা কি চিরন্তনভাবেই সর্বশেষ ধাপ, না শুধু এমন সর্বশেষ ধাপ যা কার্যতঃ ভাবনায় আসে অথবা শুধু বর্তমানে আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়---আর এই ধাপ হ'ল আমাদের বিজ্ঞানময় অস্তিত্বকে তুলে নেবার জন্য আনন্দ-আত্মার মধ্যে এবং সেখানে সম্পূর্ণ করা দিব্য অনন্তের আধ্যাত্মিক আত্ম-আবিষ্কার। আনন্দ, অর্থাৎ পরম

শাশ্বত আনন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষী হর্ষ বা সুখ অপেক্ষা অতীব ভিন্ন ও উচ্চতর প্রকৃতির, এবং ইহাই চিৎ-পুরুষের স্বরূপগত ও আদি প্রকৃতি। আনন্দের মধ্যেই চিৎ-পুরুষ পাবে তার প্রকৃত আত্মা, আনন্দের মধ্যেই সে পাবে তার স্বরূপগত চেতনা, আনন্দের মধ্যেই সে পাবে তার অস্তিত্বের অনপেক্ষ সামর্থ্য। চিৎপুরুষের এই সর্বশ্রেষ্ঠ, অনপেক্ষ, অসীম, নিরুপাধি আনন্দের মধ্যে দেহধারী পুরুষের প্রবেশই অনন্ত মোক্ষ ও অনন্ত সিদ্ধি। একথা সত্য যে এমনকি যে অবর লোকগুলিতে পুরুষ তার খব ও পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতির সহিত ক্রীড়ারত সেখানেও এই আনন্দের কিছু উপভোগ সম্ভব প্রতিফলনের দ্বারা, সীমিত অবতরণের দ্বারা। জ্ঞানের বিজ্ঞানময় সত্য লোক ও ইহার উর্ধ্বস্থিত লোকের মতোই, অন্নময় লোকে, প্রাণময় লোকে, মনোময় লোকেও এক আধ্যাত্মিক ও নিঃসীম আনন্দের অনুভূতি সম্ভব। আর যে যোগী এই সব লঘুতর উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করে সে এইসবকে এত সম্পূর্ণ ও প্রবল দেখবে যে সে মনে করবে ইহার চেয়ে মহত্তর, ইহার অতীতে আর কিছু নেই। কারণ প্রতি দিব্য তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত থাকে আমাদের সত্তার অপর ছয় সুরের সকলগুলিরই সমগ্র যোগ্যতা; প্রকৃতির প্রতি লোকই এই সব সুরের বিষয়ে নিজস্ব পূর্ণতা পেতে পারে তার নিজের সব পরিস্থিতি অনুযায়ী। কিন্তু অখণ্ড পূর্ণসিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায় হ'ল পরতম লোকের মধ্যে অবম লোকের উপচীয়মান উত্তরণ এবং অবম লোকের মধ্যে পরতম লোকের অবিরত অবতরণ যতক্ষণ না এই সব হ'য়ে ওঠে একসাথে একই অনন্ত ও সনাতন সত্যের দৃঢ় পিণ্ড এবং নমনীয় সাগর-সত্ত্ব!

মানবের অন্তঃস্থ স্থূল চেতনাও, অর্থাৎ অন্নময় পুরুষও এই পরম উত্তরণ ও অখণ্ড অবতরণ ব্যতীতই সচ্চিদানন্দের আত্মা প্রতিফলিত ও তার মধ্যে প্রবেশ ক'রতে সমর্থ হয়। ইহা সে করতে পারে দুই উপায়ে—হয় স্থূলপ্রকৃতির অন্তঃস্থ পুরুষের, সেখানে নিগূঢ় কিন্তু তথাপি বিদ্যমান তার আনন্দ, সামর্থ্য ও আনন্ত্যের প্রতিফলনের দ্বারা, আর না হয়, তার ভিতরের বা বাহিরের আত্মার মধ্যে নিজের ধাতু ও অস্তিত্বের পৃথক বোধ হারিয়ে ফেলে। ইহার পরিণাম হ'ল স্থূল মনের এমন এক প্রশংসিত নিদ্রা যার মধ্যে অন্নময় পুরুষ একপ্রকার সচেতন নির্বাণে নিজেকে ভুলে যায়, আর না হয় প্রকৃতির হাতে জড় বস্তুর মতো, "জড়বৎ", বাতাসের মধ্যে পাতার মতো ঘুরে বেড়ায়; অথবা অন্য এক পরিণাম হ'ল ক্রিয়ার

শুদ্ধ সুখময় ও স্বচ্ছন্দ দায়িত্বহীনতার অবস্থা, "বালবৎ", দিব্য শৈশব। কিন্তু এই যে অবস্থা আসে তাতে আরো উন্নত স্তরের ঐ একই পাদের অন্তর্গত জ্ঞানের ও আনন্দের উচ্চতর ঐশ্বর্যরাজি থাকে না। ইহা সচ্চিদানন্দের এক নিশ্চেষ্ট উপলব্ধি যার মধ্যে প্রকৃতির উপর পুরুষের কোনো প্রভুত্ব থাকে না অথবা প্রকৃতিরও কোনো ঊর্ধ্বায়ন হয় না তার নিজেরই পরম সামর্থ্যের মধ্যে, পরাশক্তির অনন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে। অথচ ইহারাও,—এই প্রভুত্ব ও এই ঊর্ধ্বায়ন সিদ্ধির দুই তোরণ, পরম সনাতনের মধ্যে প্রবেশ করার দুই চমৎকার দুয়ার।

ঐ একইভাবে মানবের অন্তঃস্থ প্রাণ-অন্তঃপুরুষ ও প্রাণ-চেতনা অর্থাৎ প্রাণময়পুরুষ সচ্চিদানন্দের আত্মাকে সরাসরি প্রতিফলিত ক'রতে ও তার মধ্যে প্রবেশ ক'রতে সক্ষম হয় আর সে ইহা করে, হয় বিশ্ব প্রাণের মধ্যকার পুরুষের বিশাল ও উজ্জ্বল ও আনন্দময় প্রতিফলনের দ্বারা, নয় তার ভিতরে বা বাহিরে বিশাল আত্মার মধ্যে প্রাণ ও অস্তিত্বের পৃথক বোধ হারিয়ে ফেলে। ইহার ফল—হয় নিছক আত্ম-বিস্মৃতির এক গভীর অবস্থা, না হয়, প্রাণ-প্রকৃতির দ্বারা দায়িত্বহীনভাবে চালিত এক ক্রিয়া, মহতী বিশ্ব-শক্তির প্রাণিক নৃত্যের কাছে আত্ম-বিসর্জনের উৎকৃষ্ট উৎসাহ। বহির্সত্তা বাস করে ভগবদ্-অধিকৃত উন্মত্ততার মধ্যে "উন্মত্তবৎ" আর নিজের ও জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকে না হয়, সম্পূর্ণ অবহেলা করে যথাযোগ্য মানুষী ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রচলিত রীতি ও ঔচিত্য অথবা এক মহত্তর সত্যের সামঞ্জস্য ও ছন্দ। ইহা কাজ করে বন্ধনরহিত প্রাণময় পুরুষের মতো, "পিশাচবৎ", যেন এক দিব্য পাগল অথবা দিব্য পিশাচ। এখানেও প্রকৃতির উপর কোনো প্রভুত্ব বা পরম ঊর্ধ্বায়ন নেই। আছে শুধু আমাদের ভিতরে আত্মার দ্বারা এক আনন্দপূর্ণ স্থিতিক অধিকার এবং আমাদের বাহিরে স্থূল ও প্রাণিক প্রকৃতির দ্বারা এক অনিয়ন্ত্রিত স্ফুরন্ত অধিকার।

মানবের অন্তঃস্থ মানস-অন্তঃপুরুষ ও মানস-চেতনা অর্থাৎ মনোময় পুরুষ ঐ একই সরাসরিভাবে সচ্চিদানন্দকে প্রতিফলিত ক'রতে ও তাঁর মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় আর ইহা সে করে হয় পুরুষের প্রতিফলনের দ্বারা যেমন সে নিজেকে প্রতিফলিত করে শুদ্ধ বিশ্বমনের প্রকৃতিতে যা জ্যোতির্ময়, নির্বাধ, সুখময়, নমনীয়, অসীম, না হয়, তার ভিতরে ও তার বাহিরে বৃহৎ, মুক্ত, অপরিচ্ছিন্ন কেন্দ্রাতীত আত্মার মধ্যে সমাপত্তির দ্বারা।

ইহার ফল,——হয় সকল মন ও ক্রিয়ার এক নিশ্চল অবসান, আর না হয় এমন এক কামনাশূন্য বন্ধনরহিত ক্রিয়া যা নির্লিপ্ত আন্তর সাক্ষী নিরীক্ষণ করে। মনোময় পুরুষ হ'য়ে ওঠে এমন এক সন্ন্যাসী যে জগতে একলা থাকে ও সকল মানুষী সম্পর্ক সম্বন্ধে উদাসীন অথবা এমন এক নিগূঢ় পুরুষ যে উল্লাসভরা ভগবদ্-সান্নিধ্যে বা আনন্দপূর্ণ তাদাত্ম্যে বাস করে এবং সকল জীবের প্রতি শুদ্ধ প্রেম ও রভসের বিভিন্ন আনন্দময় সম্পর্ক রাখে। এমনকি মনোময় পুরুষের পক্ষে একসাথে সকল তিন লোকেই আত্মাকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। তখন সে এই সব বিষয় হয় পালাক্রমে, পরপর অথবা একসাথে। অথবা সে অবর রূপগুলি রূপান্তরিত করতে পারে পরতর অবস্থার বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে; সে উপরে নিয়ে যেতে পারে মুক্ত স্থূল মনের 'বালবৎ' ভাবকে বা নিশ্চেষ্ট দায়িত্বহীনতাকে, অথবা মুক্ত প্রাণিক মনের দিব্য উন্মত্ততাকে এবং সকল বিধি, ঔচিত্য ও সামঞ্জস্যের প্রতি অমনোযোগিতাকে এবং এইসব দিয়ে রঙীন বা আরত ক'রতে পারে সাধুর রভসকে বা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর একক স্বাধীনতাকে। এখানেও জগতের মধ্যে প্রকৃতির উপর পুরুষের কোনো প্রভুত্ব থাকে না, কোনো ঊর্ধ্বায়ন থাকে না, থাকে একরূপ দ্বিবিধ অধিকার——ভিতরে মানসিক আধ্যাত্মিক অনন্তের স্বাতন্ত্র্য ও আনন্দের দ্বারা, এবং বাহিরে মানস-প্রকৃতির সুখময়, স্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত লীলার দ্বারা। কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞানকে এমন এক প্রকারে গ্রহণ করার ক্ষমতা মনোময় পুরুষের থাকে যে প্রকারে প্রাণময় পুরুষ বা অন্নময় পুরুষ তা গ্রহণ ক'রতে অক্ষম এবং যেহেতু সে তা গ্রহণ করতে সক্ষম জ্ঞানের সহিত, যদিও এই জ্ঞান মানসিক প্রত্যন্তরের সীমিত জ্ঞান, সেহেতু ইহার আলো দিয়ে তার বাহ্য ক্রিয়াকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা, অথবা যদি তা না হয়, ইহার মধ্যে তার সংকল্প ও তার চিন্তাধারাকে অন্ততঃ অভিষিক্ত ও বিশুদ্ধ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু মন পারে শুধু অন্তঃস্থ অনন্ত ও বাহিরের সান্ত প্রকৃতির মধ্যে একটা আপোষে পৌছতে; পূর্ণতার কোনো বোধ নিয়ে তার বাহ্য ক্রিয়ার মধ্যে আন্তর সত্তার জ্ঞান ও সামর্থ্য ও আনন্দের আনন্ত্য বর্ষণ ক'রতে ইহা অক্ষম; এই বাহ্য ক্রিয়া সর্বদাই অপ্রচুর রয়ে যায়। তবু ইহা সন্তুষ্ট ও স্বতন্ত্র থাকে কারণ ক্রিয়া প্রচুর বা অপ্রচুর হ'ক, অন্তঃস্থ প্রভুই তার ভার নেন, তা চালনার দায়িত্ব নেন ও তার পরিণাম নির্ধারণ করেন।

কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুষই প্রথম অংশ নেন শুধু যে সনাতনের স্বাধীনতায়

তা নয়, তাঁর সামর্থ্য ও আধিপত্যেও। কারণ সে তার ক্রিয়ার মধ্যে পরম দেবতার ঐশ্বর্যের পূর্ণতা গ্রহণ করে, তাঁর ঐশ্বর্যের বোধ পায়। ইহা অনন্তের স্বচ্ছন্দ, মনোহর ও রাজকীয় যাত্রার অংশভাক্, আদি জ্ঞান, নিষ্কলুষ সামর্থ্য, অখণ্ডনীয় আনন্দের আধার, আর সকল জীবনকে রূপান্তরিত করে শাশ্বত আলোকে, ও শাশ্বত বহ্নিতে এবং শাশ্বত অমৃত-মদিরায়। ইহা আত্মার অনন্ত অধিগত করে, আবার ইহা অধিগত করে প্রকৃতির অনন্ত। অনন্তের আত্মার মধ্যে প্রকৃতিগত আত্মাকে ইহা ততটা হারায় না, যতটা সে পায়। অন্য যেসব লোকে মনোময় পুরুষের প্রবেশ আরো সহজ, সেসবে মানব ভগবানকে পায় নিজের মধ্যে, এবং নিজেকে পায় ভগবানের মধ্যে; ব্যক্তি বা প্রকৃতি অপেক্ষা বরং স্বরূপে সে দিব্য হ'য়ে ওঠে। বিজ্ঞানে, এমনকি মানসিকভাবাপন্ন বিজ্ঞানে, দিব্যসনাতন মানবরূপী প্রতীক অধিগত, পরিবর্তিত ও চিহ্নিত করেন, ব্যক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে আবৃত করেন এবং আংশিকভাবে খুঁজে পান। মনোময় পুরুষ বড় জোর তাই গ্রহণ বা প্রতিফলিত করে যা সত্য, দিব্য ও শাশ্বত; বিজ্ঞানময় পুরুষ প্রকৃত তাদাত্ম্যে উপনীত হয় এবং অধিগত করে সত্য-প্রকৃতির চিৎ-পুরুষ ও সামর্থ্য। পুরুষ ও প্রকৃতি যে দুটি পৃথক সামর্থ্য-পরস্পরের অনুপূরক, ---সাংখ্যদর্শনের যে মহান সত্য আমাদের বর্তমান প্রাকৃত অস্তিত্বের ব্যবহারিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত,---বিজ্ঞানে তাদের দ্বৈতভাব তিরোহিত হয় তাদের দ্বয়াত্মক সত্তায়, গুহ্য পরমের স্ফুরন্ত রহস্যে। সত্য-সত্তা হ'ল ভারতীয় প্রতিমাবিদ্যার প্রতীক হর-গৌরী[১]; ইহাই পুরুষ-স্ত্রীরূপী দ্বিবিধ সামর্থ্য যা পরমের পরমাশক্তি থেকে জাত এবং ইহার দ্বারা বিধৃত।

সুতরাং সত্য-পুরুষ অনন্তের মধ্যে আত্ম-বিস্মৃতির অবস্থায় আসে না; অনন্তের মধ্যে ইহা আসে শাশ্বত আত্ম-অধিকারে। ইহার ক্রিয়া অনিয়মিত নয়; অনন্ত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ সংযম। অবর লোকসমূহে পুরুষ স্বভাবতঃই প্রকৃতির অধীন আর নিয়ামক তত্ত্ব পাওয়া যায় অপরা প্রকৃতিতে; সেখানে সকল নিয়মপালন নির্ভর করে সান্তের বিধানের কঠোর অধীনতা স্বীকার করার উপর। এই সব লোকের উপর অবস্থিত পুরুষ যদি সেই বিধান থেকে সরে চলে যায় অনন্তের স্বাধীনতার মধ্যে, ইহা তার

১ ইহাই ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর, ঈশ্বর ও শক্তির দ্বয়াত্মক শরীর---দক্ষিণার্ধ নর ও বামার্ধ নারী।

স্বাভাবিক কেন্দ্র হারিয়ে ফেলে এবং বিশ্ব আনন্ত্যের মধ্যে কেন্দ্র-শূন্য হ'য়ে পড়ে, আর যে জীবন্ত সামঞ্জস্যকারী তত্ত্বের দ্বারা তার বহির্সত্তা তখনো পর্যন্ত নিয়মিত হ'ত তা থেকে সে বঞ্চিত হয় আর অন্য কোনো তত্ত্ব সে পায় না। ব্যক্তিগত প্রকৃতি অথবা ইহার যা অবশিষ্ট থাকে তা শুধু কিছুদিনের জন্য ইহার অতীত গতিবৃত্তিগুলি যন্ত্রের মতো চালিয়ে যায় অথবা ইহা ব্যক্তির শরীরসংস্থান অপেক্ষা বরং ঐ শরীরের উপর কার্যরত বিশ্বশক্তি তরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতনের মধ্যে নৃত্য করে, আর না হয় ইহা এক দায়িত্বশূন্য রভসের উন্মত্ত পদক্ষেপের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় অথবা ইহা নিশ্চেষ্ট থাকে এবং ইহার অন্তরে যে চিৎ-পুরুষ ছিল তার শ্বাস ইহাকে পরিত্যাগ করে। অপরপক্ষে যদি পুরুষ নিজের স্বাতন্ত্র্যের সংবেগে নিয়ন্ত্রণের এমন অপর এক ও দিব্য কেন্দ্র আবিষ্কারের অভিমুখে অগ্রসর হয় যার মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবের মধ্যে তার নিজের ক্রিয়া সচেতনভাবে শাসন ক'রতে সক্ষম, তাহ'লে সে অগ্রসর হ'চ্ছে বিজ্ঞানের দিকে যেখানে ঐ কেন্দ্র অর্থাৎ এক শাশ্বত সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলার কেন্দ্র পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। মন ও প্রাণের উর্ধ্বে বিজ্ঞানে আরোহণ করলেই পুরুষ তার নিজের প্রকৃতির ঈশ্বর হ'তে পারে কারণ সে তখন শুধু পরাপ্রকৃতির অধীন। কারণ সেখানে শক্তি বা সংকল্প দিব্যজ্ঞানের অবিকল প্রতিরূপ, সুষ্ঠু কলনা। এবং ঐ জ্ঞান শুধু যে পরম সাক্ষীর চক্ষু তা নয়, ইহা ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত ও বিজয়ী অবলোকন। ইহার জ্যোতির্ময় নিয়ামক সামর্থ্য---এমন এক সামর্থ্য যাকে রুদ্ধ বা অস্বীকার করা যায় না,---তার আত্ম-প্রকাশশীল শক্তিকে আরোপ করে সকল ক্রিয়ার উপর এবং প্রতি গতিবৃত্তি ও সংবেগকে ক'রে তোলে সত্য ও উজ্জ্বল ও যথার্থ ও অনিবার্য।

অবর লোকসমূহের বিভিন্ন সব উপলব্ধিকে বিজ্ঞান বর্জন করে না; কারণ ইহা আমাদের ব্যক্ত প্রকৃতির ধ্বংস বা লয় নয়, নির্বাণ নয়, বরং ইহা তার মহিমময় চরিতার্থতা। ইহা প্রাথমিক উপলব্ধিসমূহকে রূপান্তরিত ও দিব্য সুষমার উপাদান করার পর সেসবকে অধিগত করে তার নিজের পরিবেশের মধ্যে। বিজ্ঞানময় পুরুষ শিশু কিন্তু রাজ-শিশু[১]; বিজ্ঞানলোকই রাজকীয় ও শাশ্বত শৈশব যার খেলার সামগ্রী হ'ল বিভিন্ন জগৎ এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি হ'ল ক্লান্তিহীন ক্রীড়ার আশ্চর্যময় উদ্যান। বিজ্ঞান

১ হেরাক্লিটেস (Heraclitus) ঐরূপ বলেন, "রাজ্য শিশুর অধীন।"

দিব্য নিশ্চেষ্টতার অবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু ইহা সেই অধীন পুরুষের নিশ্চেষ্টতা নয় যে ঝরা পাতার মতো ঈশ্বরের শ্বাসের মধ্যে প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয়। ইহা সেই সুখময়ী নিষ্ক্রিয়তা যার মধ্যে আছে প্রকৃতি-পুরুষের ক্রিয়া ও আনন্দের এক কল্পনাতীত তীব্রতা; আর এই প্রকৃতি-পুরুষ যেমন চালিত হয় কর্তৃত্বময় পুরুষের আনন্দের দ্বারা তেমন সেই সাথে সে জানে যে সে নিজেই পুরুষের ঊর্ধ্বে ও তার চারিদিকে পরাশক্তি এবং নিজের বক্ষের উপর তাকে নিত্যকাল পরমানন্দে আয়ত্তে রেখে বহন করে। পুরুষ প্রকৃতির এই দ্বয়াত্মক সত্তা যেন এক প্রদীপ্ত সূর্য ও দিব্য আলোকের পুঞ্জ যা নিজেই নিজেকে বহন করে তার কক্ষপথে তার নিজেরই আন্তর চেতনা ও সামর্থ্যের দ্বারা যা বিশ্বচেতনা ও সামর্থ্যের সহিত এক, পরম অতি-স্থিতির সহিত এক। ইহার উন্মত্ততা আনন্দের প্রাজ্ঞ উন্মত্ততা, ইহা এক পরম চেতনা ও সামর্থ্যের এমন অমেয় রভস যা নিজের দিব্য গতিবৃত্তি-সমূহের মধ্যে স্পন্দিত হয় স্বাতন্ত্র্য ও তীব্রতার অনন্ত বোধ সমেত। ইহার ক্রিয়া বুদ্ধির অতীত এবং সেজন্য যে যুক্তিবুদ্ধিপ্রধান মনের কাছে ইহার সন্ধানসূত্র নেই, তার কাছে ইহা মনে হয় এক প্রকাণ্ড উন্মত্ততা। কিন্তু তবু যাকে উন্মত্ততা ব'লে মনে হয় তা এমন এক ক্রিয়ারত প্রজ্ঞা যা মনকে পরাভূত করে তার অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহের স্বাতন্ত্র্য ও সমৃদ্ধির দ্বারা এবং তার বিভিন্ন গতির মৌলিক সরলতার মধ্যে অনন্ত জটিলতার দ্বারা, ইহাই জগন্নাথের আপন পদ্ধতি আর এমন এক জিনিষ বুদ্ধিতে যার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না,—ইহাও এক নৃত্য, বিভিন্ন শক্তির আবর্তন কিন্তু নটরাজ তাঁর শক্তিরাজি নিয়ন্ত্রিত ক'বে চালনা করেন ছন্দের তালে তালে,—রাস-লীলার আপন-তৈরী সুষম চক্রে। দিব্য পিশাচের মতোই বিজ্ঞানময় পুরুষও সাধারণ মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষুদ্র আচারপ্রথা ও ঔচিত্যের দ্বারা বদ্ধ হয় না, অথবা সেই সব সংকীর্ণ বিধির দ্বারাও বদ্ধ হয় না যে সবের মাধ্যমে সাধারণ জীবন অপরা প্রকৃতির বিভ্রমকারী দ্বন্দ্বসমূহের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়ার জন্য সাময়িক সুবিধা রচনা করে অথবা চেষ্টা করে ইহাকে জগতের আপতিক বিরোধসমূহের মধ্যে চালনা ক'রতে, ইহার অগণিত বাধাবিঘ্ন পরিহার ক'রে তার বিভিন্ন বিপদ ও গর্ত-গহ্বরের চার পাশ দিয়ে অতীব সতর্কতার সহিত পা ফেলতে। বিজ্ঞানময় অতিমানসিক জীবন আমাদের কাছে অস্বাভাবিক কারণ যে পুরুষ প্রকৃতির সহিত নির্ভীক-ভাবে, ও এমনকি উগ্রভাবে ব্যবহার করে তার সকল দুঃসাহসিক কার্য ও

নির্ভীক আনন্দকে এই জীবন নেয় স্বচ্ছন্দভাবে, অথচ এই জীবনই অনন্তের আপন স্বাভাবিক অবস্থা এবং তার সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় সত্যের বিধানের দ্বারা তার যথার্থ অভ্রান্ত ধারায়। ইহা পালন করে সেই বিধান যা এক অসংখ্য একত্বের মধ্যে আত্ম-অধিকৃত জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের বিধান। ইহাকে অস্বাভাবিক মনে হয় কারণ ইহার ছন্দকে মনের ভুল-করা তালের দ্বারা মাপা যায় না, অথচ ইহা পা ফেলে এক আশ্চর্যজনক ও বিশ্বাতীত ছন্দের তালে।

আর তাহ'লে আরো এক উচ্চতর ধাপের কি প্রয়োজন আর বিজ্ঞানময় পুরুষ ও আনন্দময় পুরুষের মধ্যে কি-ই বা প্রভেদ? কোনো স্বরূপগত প্রভেদ নেই, কিন্তু তবু এক প্রভেদ আছে কারণ এক চেতনা থেকে অন্য চেতনায় যাওয়া হয় এবং অবস্থানের কিছু পরাবর্তন হয়—কেননা জড় থেকে সর্বোত্তম সন্মাত্রে উত্তরণের প্রতি ধাপেই চেতনার পরাবর্তন হয়। পুরুষ তখন আর ইহার উজানের কিছুর দিকে তাকায় না, বরং সে ইহাতেই থাকে এবং এখান থেকে সে আগে যা সব ছিল সেসবের দিকে নীচে তাকায়। বস্তুতঃ, সকল লোকেই আনন্দ খুঁজে পাওয়া সম্ভব, কারণ ইহা সর্বত্র বিদ্যমান ও সর্বত্রই এক। এমনকি চেতনার প্রতি অবর জগতেই আনন্দলোকের পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু অবর লোকসমূহে ইহাকে যে শুধু পাওয়া যায় ইহার মধ্যে শুদ্ধ মন বা প্রাণবোধ বা শারীর সংবিতের এক প্রকার বিলীনতার দ্বারা তা নয়, ইহা যেন নিজেই মিশ্রিত হ'য়ে তরল হয়ে পড়ে সেই মিশ্রণের মধ্যে অবস্থিত মন, প্রাণ ও জড়ের বিলীন রূপের দ্বারা এবং এত তুচ্ছ ও ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে যে অবর চেতনার কাছে ইহা বিস্ময়ের বিষয় হ'লেও ইহার প্রকৃত তীব্রতার সহিত তুলনার অযোগ্য। অপরপক্ষে বিজ্ঞানের থাকে স্বরূপগত চেতনার ঘন আলো[১] যার মধ্যে আনন্দের প্রগাঢ় পূর্ণতা থাকা সম্ভব। আর যখন বিজ্ঞানের রূপ মিলিয়ে যায় আনন্দের মধ্যে তখন ইহা একেবারে ধ্বংস হয় না, তবে ইহার এক স্বাভাবিক পরিবর্তন আসে পুরুষকে যা নিয়ে যায় ঊর্ধ্বে তার অন্তিম ও পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে; কারণ ইহা নিজেকে রূপায়িত করে চিৎ-পুরুষের অনপেক্ষ অস্তিত্বের ছাঁচে এবং প্রসারিত হয় নিজেরই সম্পূর্ণ স্ব-প্রতিষ্ঠ আনন্দময় আনন্ত্যের বিভিন্ন রূপে। অনন্ত ও পরমার্থ-সৎই বিজ্ঞানের সকল ক্রিয়াবলীর চিন্ময়

১ চিদ্‌ঘন

উৎস, সহচারী তত্ত্ব, অবস্থা, মান, ক্ষেত্র ও আবহাওয়া, আর বিজ্ঞান এই অনন্ত ও পরমার্থসৎকে অধিগত করে তার ভিত্তি, প্রভব, উপাদান দ্রব্য, অন্তর্বাসী ও প্রেরণাদায়ক সান্নিধ্য হিসাবে; কিন্তু ইহার ক্রিয়ায় ইহাকে মনে হয় যেন ইহা তার কর্মরূপে তার কার্যধারার ছন্দোময় প্রণালীরূপে, সনাতনের দিব্যমায়ারূপে[১] অথবা প্রজ্ঞা-রূপায়ণ রূপে পৃথকভাবে অবস্থিত। বিজ্ঞান হ'ল দিব্য চিৎ-শক্তির দিব্য জ্ঞান-সংকল্প; ইহা প্রকৃতি-পুরুষের সুসমঞ্জস চেতনা ও ক্রিয়া--দিব্য অস্তিত্বের আনন্দে পূর্ণ। আনন্দের মধ্যে জ্ঞান এই সব সংকল্পমূলক সামঞ্জস্য থেকে ফিরে যায় শুদ্ধ আত্ম-চৈতন্যের মধ্যে, সংকল্প মিলিয়ে যায় শুদ্ধ বিশ্বাতীত শক্তির মধ্যে আর উভয়কেই তুলে নেওয়া হয় অনন্তের শুদ্ধ আনন্দের মধ্যে। বিজ্ঞানময় অস্তিত্বের ভিত্তি হ'ল আনন্দের আত্ম-সত্ত্ব ও আত্ম-রূপ।

উৎক্রান্তিতে এই যা হয় তার কারণ এইখানে একান্ত ঐক্যে সংক্রমণ সম্পূর্ণ শেষ হয়; বিজ্ঞান ইহার চূড়ান্ত ধাপ কিন্তু অন্তিম বিশ্রামস্থল নয়। বিজ্ঞানের মধ্যে পুরুষ তার আনন্ত্যের কথা জানে ও ইহার মধ্যে বাস করে, অথচ সে-ই আবার অনন্তের জীব-ক্রীড়ার জন্য বাস করে এক কার্যোপযোগী কেন্দ্রে। সর্বভূতের সহিত নিজের তাদাত্ম্য সে উপলব্ধি করে, তবে এক প্রভেদহীন বৈশিষ্ট্য সে রাখে যার দ্বারা সে সর্বভূতের সহিত এক-প্রকার বিচিত্রতার মধ্যে সংযোগ রাখতেও সক্ষম হয়। সংযোগের হর্ষের জন্য এই যে বৈশিষ্ট্য তা মনের মধ্যে শুধু যে প্রভেদ হ'য়ে দাঁড়ায় তা নয়, ইহা তার আত্ম-অনুভূতিতে হ'য়ে ওঠে আমাদের অন্য বিভিন্ন আত্মা থেকে বিভাজন, তার আধ্যাত্মিক সত্তায় ইহা হ'য়ে ওঠে আমাদের সহিত যে আত্মা এক তাকে অপরের মধ্যে হারিয়ে ফেলার এক বোধ, যে আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত হ'য়েছে তা পাবার জন্য প্রয়াস, জীবনের মধ্যে অহমাত্মক আত্ম-সমাপত্তি ও হারানো একত্বের জন্য অন্ধ অন্বেষণের মধ্যে এক আপোষ। নিজের অনন্ত চেতনায় বিজ্ঞানপুরুষ স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করে একপ্রকার সীমা নিজেরই বিভিন্ন প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যের জন্য; এমনকি তার সত্তার এক বিশেষ জ্যোতির্ময় প্রভামণ্ডলও থাকে যার মধ্যে সে বিচরণ করে, যদিও ঐ মণ্ডলের বাহিরে সে সকল বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সর্বসত্তা ও

১ এই মায়া ভ্রমের অর্থে নয়, ইহা 'মায়া' পদের আদি বৈদিক অর্থে। বিজ্ঞানময় অস্তিত্বে সব কিছুই বাস্তব, আধ্যাত্মিকভাবে মূর্ত, তাদের সত্যতা চিরন্তন প্রমাণযোগ্য।

সর্বভূতের সহিত নিজেকে অভিন্ন করে। আনন্দের মধ্যে সকলই পরাবর্তিত হয়, কেন্দ্র লোপ পায়। আনন্দ-প্রকৃতিতে কোনো কেন্দ্র নেই, নেই কোনো স্বেচ্ছাকৃত বা আরোপিত পরিধি--কিন্তু সকল কিছু একত্রে সকল কিছু পৃথকভাবে এক সম সত্তা, এক অভিন্ন চিৎ-পুরুষ। আনন্দময় পুরুষ নিজেকে পায় ও অনুভব করে সর্বত্র; তার কোনো বাসস্থান নেই, সে "অনিকেত", অথবা সর্বই তার বাসস্থান, আর না হয় যদি সে পছন্দ করে সকল কিছুই তার বিভিন্ন বহু বাসস্থান যেগুলি পরস্পরের জন্য উন্মুক্ত থাকে চিরদিন। অন্য সকল আত্মা পুরোপুরি তার নিজেরই আত্মা--যেমন স্বরূপে, তেমন ক্রিয়ায়। বৈচিত্র্যপূর্ণ একত্বের মধ্যে সংযোগের হর্ষ পুরোপুরি হ'য়ে ওঠে অগণিত একত্বের মধ্যে একান্ত তাদাত্ম্যের হর্ষ। সন্মাত্র আর তখন জ্ঞানের সংজ্ঞায় ব্যাকৃত হয় না, কারণ এখানে জ্ঞেয়, জ্ঞান এবং জ্ঞাতা সম্পূর্ণভাবে এক আত্মা, এবং যেহেতু সকল কিছু সকল কিছুকে অধিগত করে নিবিড়তম নিবিড়তার উজানে এক অন্তরঙ্গ তাদাত্ম্যে, যা আমরা জ্ঞান বলি তার কোনো প্রয়োজন নেই। সকল চেতনাই অনন্তের আনন্দের, সকল সামর্থ্য অনন্তের আনন্দের সামর্থ্য, সকল রূপ ও ক্রিয়াবলী অনন্তের আনন্দের বিভিন্ন রূপ ও ক্রিয়াবলী। নিজের সত্তার এই যে একান্ত সত্য তার মধ্যেই আনন্দের সনাতন পুরুষের বাস--এখানে সে বিপরীত সব ঘটনার মধ্যে বিকৃত থাকে, সেখানে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে তাকে রূপান্তরিত করা হয় তাদের সত্যতায়।

পুরুষের অস্তিত্ব বজায় থাকে, তার নাশ হয় না, কোনো অলক্ষণ অনির্দেশের মধ্যে সে বিলীন হয় না। কেননা আমাদের অস্তিত্বের প্রতি লোকে একই নীতি প্রযোজ্য; পুরুষ আত্ম-সমাপত্তির তন্ময়তাতে নিদ্রিত হ'য়ে পড়তে পারে, ভগবদ্-প্রাপ্তির অনির্বচনীয় তীব্রতার মধ্যে আবিষ্ট থাকতে পারে, আবার বাস করতে পারে নিজেরই লোকের সর্বোত্তম গরিমার মধ্যে--বিভিন্ন ভারতীয় শাস্ত্রের আনন্দলোকে, ব্রহ্মলোকে, বৈকুণ্ঠে, গোলোকে --এমনকি অবর জগৎসমূহেরও দিকে ফিরতে পারে সে সবকে নিজের আলোক, সামথ্য, পরমানন্দে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। শাশ্বত জগৎসমূহে এবং ক্রমশঃ বেশী করে মনের উর্ধ্বে সকল জগতেই এই সব অবস্থা পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। কারণ তারা পৃথক নয়; তারা পরমার্থসৎ-এর চেতনার বিভিন্ন সহবর্তী, এমনকি একীভূত সামর্থ্য। আনন্দলোকে অবস্থিত ভগবান কোনো জগৎ-লীলায় অক্ষম নন, অথবা তিনি তাঁর গরিমা প্রকাশে

নিজেকে নিবারণ করেন না। বরং, যেমন উপনিষদ বলে, আনন্দই প্রকৃত সৃজনক্ষম তত্ত্ব। কারণ এই দিব্য আনন্দ[১] থেকেই সকল কিছুর জন্ম; ইহার মধ্যে সকল কিছুই অস্তিত্বের একান্ত সত্য হিসাবে পূর্ব থেকেই অবস্থিত; বিজ্ঞান এই সত্য বাহিরে এনে ভাবনা ও ভাবনার বিধানের দ্বারা এক স্বেচ্ছাকৃত সীমার অধীন করে। আনন্দের মধ্যে সকল বিধানের অবসান হয়, আর থাকে সকল সর্ত বা সীমার বন্ধনরহিত একান্ত স্বাধীনতা। ইহা সকল তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ, আবার একই গতিতে সকল তত্ত্বের ভোক্তা; ইহা সর্বগুণমুক্ত আবার নিজেরই অনন্ত গুণের ভোক্তা; ইহা সকল রূপের উর্ধ্বে আবার সকল আত্ম-রূপ ও আকারের রচয়িতা ও ভোক্তা। এই অচিন্তনীয় সম্পূর্ণতাই চিৎ-পুরুষের স্বরূপ,---যে চিৎ-পুরুষ বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক, আর বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক চিৎ-পুরুষের সহিত আনন্দের মধ্যে এক হওয়ার অর্থ পুরুষেরও তা-ই হওয়া, তার কিছু কম নয়। যেহেতু এই লোকের উপর অনপেক্ষ তত্ত্ব এবং অনপেক্ষতত্ত্বসমূহের লীলা থাকে, সেহেতু স্বভাবতঃই আমাদের মনের কোনো প্রত্যয়ের দ্বারা ইহার বর্ণনা সম্ভব নয়, অথবা আমাদের বিভিন্ন মানস প্রত্যয় যেসব প্রাতিভাসিক বা আদর্শ সদ্-বস্তুর বুদ্ধিগত সংকেত সেসবের নিদর্শন দ্বারাও ইহার বর্ণনা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ এই সদ্-বস্তুগুলি নিজেরাই ঐসব অবর্ণনীয় অনপেক্ষতত্ত্বের আপেক্ষিক প্রতীকমাত্র। প্রতীক, প্রকাশশীল সদ্‌বস্তু যা আমাদের দিতে পারে তা এমনকি তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধেও এক ভাবনা, অনুভব, ইন্দ্রিয়বোধ, দর্শন, সংযোগ, কিন্তু অবশেষে আমরা তার উজানে সেই তত্ত্বে যাই যার প্রতীক এই সব, এবং ভাবনা, দর্শন, সংযোগ অতিক্রম ক'রে, আদর্শ সদ্‌বস্তুসমূহ ভেদ ক'রে উপনীত হই প্রকৃত সদ্-বস্তুসমূহে, "একম্"-এ, পরমে, কালাতীতে ও সনাতনে, অনন্তভাবে অনন্তে।

আমরা বর্তমানে যা আছি ও যা জানি তার সম্পূর্ণ অতীত এমন কিছু বিষয় সম্বন্ধে যখন আমরা অন্তর্মুখীভাবে অবগত হই এবং সেই বিষয়টির দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হই তখন প্রথম আমাদের যে সর্বগ্রাসী সংবেগ আসে তা হ'ল বর্তমান বাস্তবতা থেকে প্রস্থান ক'রে সেই পরতর সদ্-বস্তুতে পুরোপুরি আবিষ্ট থাকা। যখন আমরা পরম সন্মাত্র ও অনন্ত আনন্দের

১ এইজন্য আনন্দের জগৎকে বলা হয় জনলোক---'জন' পদের যে দুই অর্থ---জন্ম ও আনন্দ---সেই দুই অর্থে।

প্রতি আকৃষ্ট হই তখন সেই আকর্ষণের যে চরম রূপ হয় তা হ'ল এই অবর ও সান্ত অস্তিত্বকে ভ্রান্তিরূপে হেয় জ্ঞান এবং ওপারে নির্বাণের জন্য আস্পৃহা--চিৎ-পুরুষের মধ্যে লয় পাওয়ার, নিমজ্জিত থাকার, বিনষ্ট হবার এক প্রচণ্ড আবেগ। কিন্তু প্রকৃত লয়ে, সত্যকার নির্বাণের অর্থ অবর অস্তিত্বের যা সব বন্ধনসূচক বৈশিষ্ট্য সেসবের বিমুক্তি পরতর অস্তিত্বের বৃহত্তর সত্তার মধ্যে, জীবন্ত সৎ-এর দ্বারা জীবন্ত প্রতীকের চিন্ময় অধিকার। পরিশেষে আমরা জানতে পারি যে ঐ পরতর সদ্-বস্তু শুধু যে বাকী সবের কারণ তা নয়, শুধু যে ইহা বাকীসবকে আলিঙ্গন করে ও তাদের মধ্যে অবস্থান করে তা নয়, বরং যতই আমরা ইহাকে ক্রমশঃ আরো বেশী অধিগত করি ততই বাকীসব আমাদের পুরুষ-অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয় এক মহত্তর ইষ্টার্থে এবং হ'য়ে ওঠে সৎ-এর আরো সমৃদ্ধ প্রকাশের, অনন্তের সহিত এক অধিকতর বহুমুখী যোগাযোগের, পরতমে এক বৃহৎ উত্তরণের সাধন। সবশেষে আমরা অনপেক্ষ তত্ত্বের নিকটে পৌঁছাই এবং ইহার পরম ইষ্টার্থগুলিতেও পৌঁছাই যেগুলি সকল বিষয়ের অনপেক্ষ তত্ত্ব। মোক্ষের জন্য যে প্রচণ্ড আগ্রহ, "মুমুক্ষুত্ব" এতদিন পর্যন্ত আমাদের প্রেরণার উৎস ছিল তা নষ্ট হয়, কারণ এখন আমরা তার অন্তরঙ্গ সামীপ্যে থাকি যা সদা মুক্ত, যা আমাদের বর্তমান বন্ধনের প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত হয় না অথবা যা আমাদের কাছে মনে হয় বন্ধন তাকে ভয় করে না। নিজের মুক্তির জন্য বদ্ধ পুরুষের আত্যন্তিক আগ্রহ নাশই একমাত্র উপায় যার দ্বারা আমাদের প্রকৃতির একান্ত মুক্তি আসা সম্ভব। মানুষের অন্তঃপুরুষকে ভগবান নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন নানা প্রলোভনের সাহায্যে; আনন্দ সম্বন্ধে অন্তঃপুরুষের নিজের আপেক্ষিক ও অপূর্ণ ধারণা থেকেই এই সব প্রলোভনের উৎপত্তি; এই সব প্রলোভন আনন্দ অন্বেষণের বিভিন্ন পন্থা, তবে যদি আমরা শেষ পর্যন্ত সেসবেই জড়িয়ে থাকি, তাহ'লে আমরা ঐসব অত্যুত্তম আনন্দের অনির্বচনীয় সত্য হারাই। এই সব প্রলোভনের মধ্যে প্রথম হ'ল ঐহিক পুরস্কারের প্রলোভন, অর্থাৎ পার্থিব মন ও দেহে জড়বিষয়ক, বুদ্ধিগত, নৈতিক বা অন্য প্রকারের সুখের পারিতোষিক। এই একই ফলপ্রসূ প্রমাদের আরো দূরবর্তী ও মহত্তর রূপান্তর হ'ল দ্বিতীয় প্রলোভন যাতে এই সব ঐহিক পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশী এক স্বর্গীয় আনন্দের আশা করা হয়; স্বর্গের ধারণা ক্রমশঃ উচ্চ ও শুদ্ধ হ'তে থাকে যতক্ষণ না ইহা লাভ করে ভগবানের নিত্য সান্নিধ্যের অথবা

সনাতনের সহিত নিরবধি মিলনের শুদ্ধ ভাবনা। সবশেষে আমরা পাই সকল প্রলোভনের মধ্যে সূক্ষ্মতম প্রলোভন—এই সব জাগতিক বা স্বর্গীয় সুখ থেকে, এবং সকল দুঃখ, কষ্ট, পরিশ্রম ও উদ্বেগ থেকে, এবং সকল প্রাতিভাসিক বিষয় থেকে নিষ্কৃতিলাভ, এক নির্বাণ, পরমার্থসতের মধ্যে আত্ম-লয়, নিবৃত্তি ও অনুপাখ্য প্রশান্তির আনন্দ। পরিশেষে মনের এই সব খেলনা অতিক্রম ক'রে যেতে হ'বে। জন্মের ভীতি ও জন্ম থেকে নিষ্কৃতি পাবার কামনা—আমাদের মধ্য থেকে এই দুয়েরই সম্পূর্ণ অপসরণ একান্ত আবশ্যক। কারণ, প্রাচীন কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে বলা যায়,—যে পুরুষ একত্ব উপলব্ধি করেছে তার মোহ নেই, জুগুপ্সা নেই; যে পুরুষ আনন্দ-ব্রহ্মে প্রবেশ করেছে, কারুর কাছ থেকে বা কোনো বিষয় থেকে তার ভয় পাবার কিছু নেই। ভয়, কামনা, ও শোক—এসব মনের ব্যাধি; ইহার বিভাজন ও সীমাবন্ধনের বোধ থেকেই তাদের উৎপত্তি, যে মিথ্যা তাদের জনয়িতা তার অবসান হ'লে উহাদেরও অবসান হয়। আনন্দ এই সব ব্যাধিমুক্ত; ইহা সন্ন্যাসীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে ইহার উৎপত্তি হয় না।

আনন্দময় পুরুষ সম্ভূতি (জন্ম) কি অসম্ভূতিতে (জন্মহীনতায়) বদ্ধ নয়; সে বিদ্যার কামনার দ্বারা চালিত হয় না অথবা অবিদ্যার ভয়ে ক্লিষ্ট হয় না। পরম আনন্দময় পুরুষ আগেই বিদ্যার অধিকারী হ'য়েছে, জ্ঞানের সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে সে উঠেছে। রূপ বা কর্ম দ্বারা চেতনায় সীমিত না হওয়ায় সে অবিদ্যায় আকুলিত না হ'য়েও অভিব্যক্তির সহিত লীলায় সক্ষম। ইতিপূর্বেই সে ঊর্ধ্বে শাশ্বত অভিব্যক্তির রহস্যের মধ্যে সে তার নিজের কাজ করে, আবার, যখন সময় হয়, সে এখানে নেমে আসবে জন্মের মধ্যে আর তাতে সে যে প্রকৃতির চক্র-আবর্তনের শৃঙ্খলে বদ্ধ অবিদ্যার দাস হবে তা নয়। কারণ সে জানে যে বারবার জন্ম পরিগ্রহের উদ্দেশ্য ও বিধান হ'ল দেহবদ্ধ পুরুষ যেন লোক থেকে লোকান্তরে ঊর্ধ্বে ওঠে এবং সর্বদাই অবর লীলার বিধির পরিবর্তে আনে পরতর লীলার বিধি, এমন কি যেন সে তা আনে নিম্নে জড়ক্ষেত্রেও। ঐ উত্তরণকে ঊর্ধ্ব থেকে সাহায্য করায় আনন্দময় পুরুষের ঘৃণা নেই, তার ভয়ও নেই ভগবদ্-সোপান বেয়ে নিম্নে জড়জন্মের মধ্যে নেমে এসে সেখানে নিজের আনন্দময় প্রকৃতির সামর্থ্য দিতে দিব্যশক্তিসমূহের ঊর্ধ্বাভিমুখী আকর্ষণে। বিকাশমান কাল-পুরুষের সেই অপরূপ মুহূর্তের সময় এখনো আসে নি।

সাধারণতঃ মানব এখনো আনন্দময় প্রকৃতিতে উত্তরণ করতে সক্ষম নয়; প্রথম তার যা কর্তব্য তা হ'ল নিজেকে বিভিন্ন উচ্চতর শিখরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেসব থেকে বিজ্ঞানে উত্তরণ করা; সম্পূর্ণ আনন্দ-সামর্থ্যকে নিম্নে এই পার্থিব প্রকৃতিতে নামিয়ে আনার ক্ষমতা তার আরো কম; তার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন হ'ল আর মনোময় মানব না থাকা ও অতিমানবীয় হওয়া। এখন তার পক্ষে যা করা সম্ভব তা হ'ল নিজের অন্তঃপুরুষের মধ্যে ইহার সামর্থ্যের কিছু বেশী বা কম পরিমাণে গ্রহণ করা, তবে অবর চেতনার মধ্য দিয়ে আসার দরুণ ঐ সামর্থ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়, কিন্তু তাহ'লেও তা থেকে সে পায় এক রভসের ও এক অপার দিব্য-আনন্দের বোধ।

আর, যখন আনন্দময় প্রকৃতি এক নব অতিমানসিক জাতির মধ্যে প্রকট হবে তখন ইহার স্বরূপ কি হবে? পূর্ণ বিকশিত পুরুষ এক প্রগাঢ় ও অসীম আনন্দ-চেতনার অনুভূতির স্থিতিতে ও স্ফুরন্ত পরিণতিতে সকল সত্তার সহিত এক হবে। আর যেহেতু প্রেম আনন্দ-একত্বের অমোঘ সামর্থ্য ও পুরুষ-প্রতীক সে এই একত্বের দিকে অগ্রসর হবে এবং তাতে প্রবেশ করবে বিশ্বপ্রেমের তোরণ দিয়ে;—এই বিশ্বপ্রেম প্রথম হবে মানব-প্রেমের ঊর্ধ্বায়িত রূপ এবং পরে হবে দিব্য প্রেম, আর ইহার পরাকাষ্ঠায় ইহা এমন এক সৌন্দর্যময়, মাধুর্যময় ও জ্যোতির্ময় বিষয় হবে যা এখন আমাদের ধারণার অতীত। আনন্দ-চেতনার মধ্যে সে সকল জগৎ-লীলা ও ইহার বিভিন্ন সামর্থ্য ও ঘটনার সহিত এক হবে এবং তখন চিরতরে নির্বাসিত হবে আমাদের দীন ও কলঙ্কিত মানসিক ও প্রাণিক ও শারীরিক জীবনের শোক ও ভয়, ক্ষুধা ও যন্ত্রণা। সে আনন্দ-মুক্তির সেই সামর্থ্য পাবে যার মধ্যে আমাদের সত্তার সকল পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বগুলি মিলিত হবে তাদের অনপেক্ষ মূল্যে। সকল অশুভ বাধ্য হ'য়ে পরিবর্তিত হবে শুভে; সর্ব-সুন্দরের বিশ্ব সৌন্দর্য অধিকার করবে তার অধঃপতিত রাজ্য-গুলি; প্রতি অন্ধকার রূপান্তরিত হবে এক অন্তর্গূঢ় আলোর মহিমায়, আর মন যে সব বৈষম্য সৃষ্টি করে সত্য ও শিব ও সুন্দরের মধ্যে, সামর্থ্য ও প্রেম ও বিদ্যার মধ্যে সে সব তিরোহিত হবে শাশ্বত শিখরের উপর, অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে যেখানে তারা সর্বদাই এক।

মন, প্রাণ ও দেহের মধ্যে অবস্থিত পুরুষ প্রকৃতি থেকে বিভক্ত এবং ইহার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত। প্রকৃতির যা সবকে সে মূর্তরূপ দিতে সক্ষম

সে সবকে সে তার প্রবল সামর্থ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ও অধীন করার প্রয়াস করে, আর তথাপি সে তার পীড়াদায়ক দ্বন্দ্বগুলির অধীন থাকে এবং বস্তুতঃ সে পুরোপুরি, আগাগোড়া তার ক্রীড়নক। বিজ্ঞানের মধ্যে পুরুষ প্রকৃতির সহিত দ্বয়াত্মক, পুরুষ তার নিজের প্রকৃতির প্রভু হিসাবে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপগত একত্বের দ্বারা তাদের মিল ও সামঞ্জস্য পায় আর এমনকি সে তা পায় যে সময় সে পরতমের রাজকীয় দিব্য প্রকৃতিতে পরতমের কাছে এক অনন্ত আনন্দপূর্ণ অধীনতা স্বীকার করে--যে অধীনতার উপর নির্ভর করে তার প্রভুত্ব ও তার সর্ববিধ স্বাধীনতা। বিজ্ঞানের উচ্চশিখরসমূহে এবং আনন্দের মধ্যে সে প্রকৃতির সহিত এক, আর তখন সে তার সহিত শুধু দ্বয়াত্মক নয়। তখন আর অবিদ্যার মধ্যে পুরুষের সহিত প্রকৃতির বিভ্রান্তিকর লীলা থাকে না; সব কিছুই পুরুষের সচেতন লীলা, নিজের সহিত ও নিজের সকল আত্মার সহিত ও পরতমের সহিত ও দিব্য শক্তির সহিত এবং তা হয় নিজের এবং অনন্ত আনন্দময় প্রকৃতির মধ্যে। ইহাই পরম রহস্য, সর্বোত্তম গুহ্য তত্ত্ব, আর আমাদের মানসিক সব ধারণার কাছে এবং আমাদের সীমিত বুদ্ধির উজানে যা আছে তা প্রণিধান করার জন্য এই বুদ্ধির প্রয়াসের কাছে ঐ রহস্য যতই দুরূহ ও জটিল হ'ক না কেন, ইহা আমাদের অনুভূতির কাছে সরল। সচ্চিদানন্দের আত্ম-রতির মুক্ত আনন্ত্যের মধ্যে আছে এক ভাগবত শিশুর লীলা, অনন্ত প্রেমিকের এক "রাসলীলা" এবং তাঁর রহস্যপূর্ণ আত্মিক প্রতীকগুলি এক কালাতীত নিত্যকালের মধ্যে নিজেদের পুনঃ পুনঃ প্রকট করে সৌন্দর্যের রূপে এবং আনন্দের ছন্দে ও সুষমায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পরা ও অপরা বিদ্যা

জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা এখন শেষ হ'ল, আর আমরা দেখলাম কোথায় ইহা নিয়ে যায়। প্রথমতঃ, জ্ঞানযোগের সাধ্য হ'ল ভগবদ্-প্রাপ্তি অর্থাৎ চেতনার মাধ্যমে, অভিন্নতার মাধ্যমে, দিব্য সদ্-বস্তুর প্রতিবোধের মাধ্যমে ভগবানকে অধিগত করা এবং ভগবানের দ্বারা অধিগত হওয়া। কিন্তু তা যে শুধু আমাদের বর্তমান জীবন থেকে দূরে কোনো আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের মধ্যে হবে তা নয়, তা হতে হবে এখানেও; সুতরাং সাধ্য হ'ল ভগবানকে স্বরূপে পাওয়া, ভগবানকে জগতের মধ্যে পাওয়া, ভগবানকে অন্তরে পাওয়া, ভগবানকে পাওয়া সর্ব বিষয়ে ও সর্ব সত্তায়। ইহার অর্থ ভগবানের সহিত একত্ব লাভ করা এবং ইহার মাধ্যমে বিশ্বাত্মা, বিশ্ব ও সর্বভূতেরও সহিত একত্ব লাভ করা; সুতরাং ইহার অর্থ একত্বের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্যও লাভ করা, তবে তা হবে একত্বের ভিত্তিতে, বিভাজনের ভিত্তিতে নয়। ইহার অর্থ ভগবানকে পাওয়া তাঁর ব্যক্তিরূপে ও তাঁর নৈর্ব্যক্তিকত্বে; তাঁর নির্গুণ শুদ্ধতায় ও তাঁর অনন্তগুণে; কালের মধ্যে ও কালাতীত বিভাবে; তাঁর ক্রিয়ায় ও তাঁর নীরবতায়; সান্তের মধ্যে এবং অনন্তের মধ্যে। ইহার অর্থ তাঁকে পাওয়া শুধু শুদ্ধ আত্মায় নয়, সকল আত্মাতেই; শুধু আত্মায় নয়, প্রকৃতির মধ্যেও; শুধু চিৎ-পুরুষে নয়, অতিমানস, মন, প্রাণ ও দেহেও পাওয়া; ইহার অর্থ চিৎ-পুরুষ দিয়ে, মন দিয়ে, প্রাণিক ও শারীরিক চেতনা দিয়ে তাঁকে পাওয়া; আবার ইহার অর্থ এই যে এই সবও যেন তাঁর দ্বারা অধিগত হয় যাতে আমাদের সমগ্র সত্তা তাঁর সহিত এক হয়, তাঁতেই পূর্ণ হয়, তাঁর দ্বারাই শাসিত ও চালিত হয়। যেহেতু ভগবান একত্ব, সেহেতু ইহার অর্থ আমাদের শারীরিক চেতনারও এক হওয়া জড়বিশ্বের পুরুষ ও প্রকৃতির সহিত; আমাদের প্রাণের এক হওয়া সর্বপ্রাণের সহিত, আমাদের মনের এক হওয়া বিশ্বমনের সহিত; আমাদের চিৎ-পুরুষের এক হওয়া বিরাট পুরুষের সহিত। ইহার অর্থ তাঁর মধ্যে তাঁর অনপেক্ষ বিভাবে নিমজ্জিত হওয়া এবং তাঁকে সকল সম্বন্ধের মধ্যে পাওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, সাধ্য হ'ল দিব্য সত্তা ও দিব্য প্রকৃতি ধারণ করা। এবং যেহেতু ভগবান সচ্চিদানন্দ, সেহেতু সাধ্য হ'ল আমাদের সত্তাকে উন্নীত করা দিব্যসত্তার মধ্যে, আমাদের চেতনাকে দিব্য চেতনার মধ্যে, আমাদের ক্রিয়া-শক্তিকে দিব্য ক্রিয়াশক্তিতে; আমাদের অস্তিত্বের আনন্দকে, সত্তার দিব্য আনন্দের মধ্যে। আর এই সাধ্য শুধু যে এই পরতর চেতনার মধ্যে আমাদের নিজেদের উত্তোলন করা তা নয়, ইহার মধ্যে আমাদের সর্বসত্তায় বিস্তৃত হওয়া, কারণ ইহাকে পাওয়া চাই আমাদের অস্তিত্বের সকল লোকে ও আমাদের সকল অঙ্গে যাতে আমাদের মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক অস্তিত্ব পূর্ণ হ'য়ে ওঠে দিব্য প্রকৃতিতে। আমাদের বুদ্ধিপ্রধান মানসিকতাকে হ'তে হবে দিব্য জ্ঞান-সংকল্পের ক্রীড়া, আমাদের মানসিক পুরুষ-জীবনের হওয়া চাই দিব্য প্রেম ও আনন্দের ক্রীড়া, আমাদের প্রাণশক্তি দিব্যপ্রাণের ক্রীড়া, আমাদের শারীরিক সত্তা দিব্য ধাতুর এক ছাঁচ। আমাদের মধ্যে ভগবদ্-ক্রিয়াকে উপলব্ধি ক'রতে হবে দিব্য বিজ্ঞান ও দিব্য আনন্দের নিকট আমাদের নিজেদের উন্মীলনের দ্বারা এবং ইহার পূর্ণতায়, বিজ্ঞান ও আনন্দের মধ্যে উত্তরণের দ্বারা এবং সেখানে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠানের দ্বারা। কারণ যদিও আমাদের স্থূল জীবন এই জড়লোকের উপর প্রতিষ্ঠিত আর স্বাভাবিক বাহ্য-মুখী জীবনে মন ও অন্তঃপুরুষ জড় অস্তিত্বেই ব্যস্ত, তবু আমাদের সত্তার এই বাহ্যভাব কোনো অনিবার্য সংকীর্ণতা নয়। প্রকৃতির সহিত পুরুষের বিভিন্ন সম্পর্কের যে সব বিভিন্ন লোক আছে তাদের একটি থেকে অন্যটিতে আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ চেতনাকে উন্নীত ক'রতে সক্ষম, আর এমনকি অন্নময় পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভাবাধীন মনোময় পুরুষের বদলে আমরা হ'য়ে উঠতে পারি বিজ্ঞানময় পুরুষ বা বিজ্ঞান-আত্মা এবং ধারণ করতে পারি বিজ্ঞানময় প্রকৃতি বা আনন্দময় প্রকৃতি। আর আন্তর জীবনের এই উন্নয়নের দ্বারা আমরা সক্ষম হই আমাদের সমগ্র বহির্মুখী জীবনকে রূপান্তরিত করতে; জড়প্রভাবাধীন জীবনের পরিবর্তে আমরা তখন পাব এমন জীবন যা চিৎ-পুরুষের প্রভাবাধীন এবং সেই সাথে এই জীবনের সকল পরিস্থিতিও গঠিত ও নির্ধারিত হবে সত্তার শুদ্ধতার দ্বারা, সান্তেরও মধ্যে অনন্ত চেতনার দ্বারা, চিৎ-পুরুষের দিব্য ক্রিয়া-শক্তি, দিব্য হর্ষ ও আনন্দের দ্বারা।

ইহাই নিশানা; তাছাড়া আমরা দেখেছি পদ্ধতির মূল অঙ্গ কি কি। তবে পদ্ধতিবিষয়ক প্রশ্নের যে একটি দিকে আমরা এ পর্যন্ত হাত দিই নি

সেইটি এখন আমাদের প্রথমে সংক্ষেপে বিবেচনা করা দরকার। পূর্ণ-যোগের শাস্ত্রে এই নীতি অবশ্য পালনীয় সে সমগ্র জীবনই যোগের অংশ; কিন্তু যে বিদ্যার কথা আমরা বলছি তা মনে হয় জীবন ব'লতে সাধারণতঃ যা বোঝায় তার বিদ্যা নয়, বরং জীবনের পশ্চাতে কোনো বিষয়ের বিদ্যা। দুই প্রকারের বিদ্যা আছে:—একটি চেষ্টা করে অস্তিত্বের আপাতিক ঘটনা-গুলি বুঝতে বাহ্যভাবে, বাহির থেকে অগ্রসর হ'য়ে, ধীশক্তির মাধ্যমে—ইহাই অপরা বিদ্যা, আপতিক জগতের বিদ্যা; দ্বিতীয়টি সেই বিদ্যা যার চেষ্টা হ'ল অস্তিত্বের সত্য জানা ভিতর থেকে, তার উৎসে ও সদ্-বস্তুতে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা। সাধারণতঃ, দুটির মধ্যে এক প্রখর প্রভেদ করা হয়, আর মনে করা হয় যে যখন আমরা পরা বিদ্যা, ভগবদ্-জ্ঞান লাভ করি, তখন অন্যটি, জগদ-জ্ঞান আমাদের কাছে নিষ্প্রয়োজন: কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা একই এষণার দুই দিক। সকল বিদ্যাই শেষ পর্যন্ত ভগবদ্-বিদ্যা,—নিজের মাধ্যমে, প্রকৃতির মাধ্যমে, প্রকৃতির বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে। মানবজাতিকে এই বিদ্যালাভের চেষ্টা প্রথম করতে হবে বাহ্য জীবনের মাধ্যমে; কারণ, যতদিন না তার মানসিকতা যথেষ্ট বিকশিত হয় ততদিন আধ্যাত্মিক বিদ্যা বাস্তবিকই সম্ভব হয় না, আর যে অনুপাতে ইহা বিকশিত হয়, সেই অনুপাতে আধ্যাত্মিক বিদ্যার সম্ভাবনা আরো সমৃদ্ধ ও পূর্ণ হয়।

প্রাকৃত বিজ্ঞান, কলা, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, মনোবিদ্যা, মানব ও তার অতীতের জ্ঞান, কর্ম স্বয়ং—এই সব উপায়েই আমরা লাভ করি প্রকৃতির মাধ্যমে ও জীবনের মাধ্যমে ভগবানের বিভিন্ন ক্রিয়াপ্রণালীর জ্ঞান। প্রথমে জীবনের বিভিন্ন কর্মধারাতে ও প্রকৃতির বিভিন্ন রূপেই আমরা ব্যস্ত থাকি, কিন্তু যতই আমরা ক্রমশঃ আরো গভীরে যাই এবং অধিকতর ব্যাপক দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা লাভ করি ততই ইহাদের প্রতি ধারাই আমাদের নিয়ে যায় মুখোমুখি ভগবানের কাছে। প্রাকৃত বিজ্ঞান তার শেষ সীমায়, এমনকি জড়বিজ্ঞানও শেষে বাধ্য হয় জড়জগতের মধ্যে অনন্তকে, বিশ্বাত্মককে, চিৎ-পুরুষকে, দিব্য বুদ্ধি ও সংকল্পকে অনুভব করতে। যে সব সূক্ষ্ম বিজ্ঞান আমাদের সত্তার উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর বিভিন্ন লোক ও সামর্থ্যের কর্ম নিয়ে আলোচনা করে এবং পশ্চাতে অবস্থিত সেই সব জগতের বিভিন্ন সত্তা ও ঘটনার সংস্পর্শে আসে যেগুলি অদেখা, আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোধগম্য নয়, তবে যেগুলি সূক্ষ্ম মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় সেই সব সূক্ষ্ম বিজ্ঞানেরও আরো সহজে ঐ একই ধ্রুব পরিণতি। কলারও

সেই পরিণতি; যে সৌন্দর্যানুরাগী ব্যক্তি কান্ত ভাবাবেগের মাধ্যমে প্রকৃতি নিয়েই ব্যস্ত থাকে সে-ও নিশ্চয় শেষে আধ্যাত্মিক ভাবাবেগ লাভ ক'রে প্রকৃতির মধ্যে শুধু যে অনন্ত জীবন অনুভব করবে তা নয়, অনন্ত সান্নিধ্যও অনুভব করবে; যে মানবজীবনের মধ্যে সৌন্দর্য নিয়ে মত্ত থাকে সে-ও শেষে মানবজাতির মধ্যে নিশ্চয় দেখবে ভগবানকে, বিশ্বাত্মককে, আধ্যাত্মিক সত্তাকে। বিষয়সমূহের বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনায় রত দর্শনও শেষে নিশ্চয়ই অনুভব করবে এই সকল তত্ত্বের মূল তত্ত্বকে, এবং ইহার প্রকৃতি, বিভিন্ন গুণ ও মৌলিক কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবে। সেইরূপ, নীতিশাস্ত্রও শেষ পর্যন্ত দেখবে, মঙ্গলের যে বিধান ইহা খোঁজে সে বিধান ভগবানেরই বিধান এবং তা নির্ভর করে বিধানস্বামীর সত্তা ও প্রকৃতির উপর। জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে মন ও অন্তঃপুরুষের অনুশীলন থেকে মনোবিদ্যাও নিয়ে যায় সকল বিষয় ও সত্তার মধ্যে একই পুরুষ ও একই মনের অনুভবে। প্রকৃতির ইতিহাস ও চর্চার মতো মানবের ইতিহাস ও চর্চা নিয়ে যায় সেই সনাতন ও বিশ্বাত্মক সামর্থ্য ও পুরুষের অনুভবে যাঁর মনন ও সংকল্প কাজ করে বিশ্ব ও মানব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কর্ম নিজেই আমাদের জোর ক'রে সেই দিব্য সামর্থ্যের সংস্পর্শে নিয়ে আসে যা আমাদের সব ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করে, এইসব ক্রিয়াকে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করে। ধীশক্তি ভগবানকে জানতে ও বুঝতে শুরু করে, ভাবাবেগগুলি শুরু করে তাঁকে অনুভব ও আকাঙ্ক্ষা ও ভক্তি করতে, সংকল্প শুরু করে তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োগ করতে---এই ভগবান ব্যতীত প্রকৃতি ও মানবের অস্তিত্ব বা সঞ্চরণ সম্ভব নয়, আর একমাত্র তাঁর সম্বন্ধে সচেতন জ্ঞানের দ্বারাই আমরা উপনীত হ'তে পারি আমাদের সর্বোত্তম সম্ভাবনাগুলিতে।

এইখানেই যোগের প্রবেশ। জ্ঞান, ভাবাবেগ ও ক্রিয়ার ব্যবহারের দ্বারাই ভগবদ্-প্রাপ্তির জন্য ইহার কাজ শুরু হয়। ভগবানের সহিত মিলনের জন্য সচেতন ও সুষ্ঠু অন্বেষণই যোগ, এই মিলনের দিকেই ছিল বাকীসবের যাত্রা ও অন্বেষণ, তবে অজ্ঞান ও অপূর্ণভাবে। সুতরাং যোগ প্রথমে অপরা বিদ্যার ক্রিয়া থেকে ও পদ্ধতি থেকে পৃথক থাকে। কারণ যখন এই অপরা বিদ্যা ভগবানের দিকে যায় বাহির থেকে পরোক্ষভাবে, আর কখনো তাঁর গোপন নিবাসে প্রবেশ করে না, যোগ আমাদের ডাকে ভিতরে এবং ভগবানের দিকে যায় সরাসরিভাবে; যে সময় অপরা বিদ্যা তাঁকে খোঁজে ধীশক্তির মাধ্যমে এবং আবরণের পশ্চাত থেকে তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হয়,

যোগ তাঁকে খোঁজে উপলব্ধির মাধ্যমে, ইহা আবরণ তুলে তাঁর পূর্ণ দর্শন পায়; যখন উহা শুধু সান্নিধ্য ও প্রভাব অনুভব করে, যোগ সেই সান্নিধ্যের মধ্যে প্রবেশ ক'রে নিজেকে প্রভাবের দ্বারা পূর্ণ করে; যখন উহা শুধু কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে অবগত হয় এবং সেসবের মাধ্যমে সদ্-বস্তুর কিছু আভাস পায়, যোগ সদ্-বস্তুর সহিত আমাদের আন্তর সত্তাকে অভিন্ন করে এবং সেখান থেকে কর্মপ্রণালী দেখে। সুতরাং অপরা বিদ্যার সব পদ্ধতি থেকে যোগের সব পদ্ধতি ভিন্ন।

বিদ্যার মধ্যে যোগের পদ্ধতি হ'ল সর্বদা প্রত্যক্‌বৃত্ত হওয়া আর যখন ইহা বাহ্য বিষয়সমূহের উপর তাকায় তার উদ্দেশ্য হ'ল বাহ্যরূপ ভেদ ক'রে তাদের মধ্যে এক নিত্য সদ্-বস্তুতে উপনীত হওয়া। অপরা বিদ্যা বাহ্যরূপ ও কর্মপ্রণালীতে ব্যস্ত থাকে; পরা বিদ্যার প্রথম প্রয়োজন হ'ল এই সব থেকে সরে এসে সেই সদ্-বস্তুতে যাওয়া যার বাহ্যরূপ তারা এবং চিন্ময় অস্তিত্বের সেই সত্তা ও সামর্থ্যে যাওয়া যাদের কর্মপ্রণালী তারা। ইহা এই কাজ করে এই তিনটি উপায়ে—শুদ্ধি, একাগ্রতা, অভিন্নতা; ইহাদের প্রত্যেকটি পরস্পরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং প্রতিটির দ্বারা অপরগুলি সম্পূর্ণ হয়। শুদ্ধির উদ্দেশ্য হ'ল সমগ্র মনোময় সত্তাকে এমন এক স্বচ্ছ দর্পণ করা যাতে দিব্য সদ্-বস্তুর প্রতিফলন সম্ভব হয়, ইহাকে এমন এক নির্মল পাত্র ও নির্বাধ প্রণালী করা যার ভিতর দিব্য সান্নিধ্যের ও যার মধ্য দিয়ে দিব্য প্রভাবের বর্ষণ সম্ভব হয়, ইহাকে এমন এক সূক্ষ্মভাবাপন্ন উপাদান করা যাকে দিব্যপ্রকৃতি অধিগত ক'রে নতুনভাবে গঠন ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয় দিব্য পরিণামের জন্য। কারণ বর্তমানে মনোময় সত্তা প্রতিফলন করে শুধু সেই সব বিশৃঙ্খলা যেগুলির উৎপত্তি জগৎ সম্বন্ধে মানসিক ও স্থূল দৃষ্টির থেকে, ইহা শুধু অজ্ঞানময় অপরা প্রকৃতির বৈষম্যের প্রণালী এবং এমন সব বাধা ও কলুষে পূর্ণ যেগুলির জন্য পরা প্রকৃতির ক্রিয়া সম্ভব হয় না, সেজন্য আমাদের সত্তার সমগ্র আকার বিরূপ ও অপূর্ণ, সর্বোত্তম প্রভাবসমূহের অবাধ্য এবং অজ্ঞানময় ও অবর প্রয়োজনসাধনেই প্রবৃত্ত। এমনকি জগৎকেও ইহা প্রতিফলিত করে মিথ্যারূপে; ইহা ভগ-বানের প্রতিফলনে অসমর্থ।

একাগ্রতার প্রয়োজন প্রথমতঃ এই কারণে—আমাদের ভাবনাগুলি ছোটে বহুবিস্তৃত সব কামনার পিছনে, ইন্দ্রিয়গুলি ও বিভিন্ন ঘটনায় বাহ্য মানসিক প্রতিক্রিয়া তাদের টেনে নেয় তাদের পথেই; এইভাবে তাদের

বিক্ষিপ্ত সঞ্চরণের ফলে সমগ্র সংকল্প ও মনের যে স্বাভাবিক চঞ্চল ইতস্ততঃ ভ্রমণ তা থেকে তাদের সরিয়ে আনার জন্যই এই প্রয়োজন। আমাদের কর্তব্য,---সংকল্প ও মননকে নিবদ্ধ করা এবং ইহার জন্য আবশ্যক বিপুল প্রয়াস, একনিষ্ঠ একাগ্রতা। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নিজেদের ও সত্যের মধ্যে আমাদের সাধারণ মানসিকতা যে আবরণ খাড়া করে তা ছিন্ন করার জন্য একাগ্রতা প্রয়োজন, কারণ বাহ্য জ্ঞান আহরণ করা যায় প্রসঙ্গক্রমে, স্বাভাবিক মনোযোগিতা ও গ্রহণের দ্বারা, কিন্তু আন্তর, প্রচ্ছন্ন ও পরতর সত্য আয়ত্ত করার একমাত্র উপায় হ'ল---মনের একান্ত একাগ্রতা তার বিষয়টির উপর এবং সংকল্পের একান্ত একাগ্রতা ইহা পাবার জন্য, এবং একবার পাওয়া হ'লে ইহাকে অভ্যাসগত ভাবে ধারণ ও ইহার সহিত নিজেকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করার জন্য। কারণ অভিন্নতাই সম্পূর্ণ জ্ঞান ও প্রাপ্তির সর্ত; এই প্রগাঢ় অভিন্নতা বোধলাভের উপায় হ'ল,--- সদ্-বস্তুকে অভ্যাসগত ও শুদ্ধভাবে প্রতিফলিত করা এবং ইহার উপর অখণ্ড একাগ্রতা দেওয়া; আর ইহা প্রয়োজনীয়ও বটে,---ভাগবত সত্তা ও নিত্য সদ্-বস্তুর সহিত আমাদের যে বিভাজন ও পার্থক্য আমাদের অসংস্কৃত, অজ্ঞ, মানসিকতার স্বাভাবিক অবস্থা তা সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করার জন্য এই অভিন্নতার প্রয়োজন।

অপরা বিদ্যার পদ্ধতি দিয়ে ইহাদের কোনোটিরই সাধন সম্ভব নয়। একথা সত্য যে এই সব ক্রিয়ায় আমরা এই বিষয়ে কিছু প্রস্তুত হই, কিন্তু তা কিছু দূর পর্যন্ত এবং তীব্রতার এক বিশেষমাত্রা অবধি, আর যেখানে তাদের ক্রিয়া বন্ধ হয় সেখানে যোগের ক্রিয়া এসে ভগবানের মধ্যে আমাদের উপচয়ের ভার নেয় এবং তা সম্পূর্ণ করার উপায় বাহির করে। সকল জ্ঞানানুশীলনের ফলেই---অবশ্য যদি না ইহা অতিরিক্ত পৃথ্বীমুখী আকর্ষণের দ্বারা কলুষিত হয় আমাদের সত্তার নির্মলতা, সূক্ষ্মতা ও শুদ্ধতাসাধন সুকর হয়। যে অনুপাতে আমরা আরো মনোময় হ'য়ে উঠি, সেই অনুপাতে আমরা আমাদের সমগ্র প্রকৃতির সূক্ষ্মতর ক্রিয়া পাই কারণ এই প্রকৃতি পরতর সব ভাবনা শুদ্ধতর সংকল্প, আরো কম স্থূল সত্য, আরো বেশী অন্তর্মুখী প্রভাব প্রতিফলিত ও গ্রহণ করার আরো উপযোগী হয়। শুদ্ধ করার কাজে নৈতিক জ্ঞানের এবং ভাবনা ও সংকল্পের নৈতিক অভ্যাসের সামর্থ্য যে কত বেশী তা সকলেরই জানা। দর্শনশাস্ত্র শুধু যে যুক্তিবুদ্ধিকে শুদ্ধ এবং ইহাকে বিশ্বাত্মক ও অনন্তের সংস্পর্শ লাভে প্রবণ করে

তা নয়, ইহার দ্বারা প্রকৃতির স্থিরতা সাধন ও জ্ঞানীর প্রশান্তিলাভও সুকর হয়; আর প্রশান্তি লাভেই বোঝা যায় যে আত্ম-কর্তৃত্ব ও শুদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বগত সৌন্দর্যে, এমনকি তার বিভিন্ন কান্তরূপে নির্বিশেষতার এক তীব্র সামর্থ্য আছে প্রকৃতিকে নির্মল ও সূক্ষ্মকরার কাজে এবং ইহার পরাকাষ্ঠায় ইহা শুদ্ধির পক্ষে এক মহাশক্তি। এমনকি মনের বৈজ্ঞানিক অভ্যাস এবং বিশ্ববিধান ও সত্যে নিস্পৃহ নির্বিশেষতাও শুধু যে যুক্তিবুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণশক্তিকে নির্মল করে তা নয় ইহা অন্য প্রেরণার দ্বারা প্রতিহত না হ'লে মন ও নৈতিক প্রকৃতিকে অবিচলিত, উন্নত ও শুদ্ধ করার কাজে সহায় হয়, তবে ইহার এই প্রভাবের দিকে তেমন মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

এই সব অনুশীলনের এক সুস্পষ্ট ফল এবং ইহাদের জন্য এক সতত প্রয়োজনীয় বিষয় হ'ল––সত্য গ্রহণ ও সত্যের মধ্যে বাস করার উদ্দেশ্যে মনের একাগ্রতা ও সংকল্পের শিক্ষা; এবং পরিশেষে অথবা যখন তারা সর্বাপেক্ষা তীব্র হয় তখন, যা পাওয়া সম্ভব ও পাওয়া যায়ও––তা হ'ল দিব্য সদ্‌-বস্তু সম্বন্ধে প্রথম এক বুদ্ধিগত এবং পরে এক প্রতিবোধাত্মক অনুভব যার পরিণতি হ'তে পারে ঐ সদ্‌-বস্তুর সহিত একপ্রকার প্রাথমিক অভিন্নতা বোধ। তবে এই সব এক বিশেষ সীমা ছাড়িয়ে যেতে অক্ষম। দিব্য সদ্‌-বস্তুর অখণ্ড প্রতিবোধ ও অন্তরে গ্রহণের জন্য সমগ্র সত্তার রীতি-সঙ্গত শুদ্ধি সাধনের একমাত্র উপায় হ'ল,––যোগের বিশেষ পদ্ধতিসমূহ। অপরা বিদ্যার সব বিক্ষিপ্ত একাগ্রতার বদলে আসা চাই যোগের একান্ত একাগ্রতা; অপরা বিদ্যা আনতে পারে বড়জোর এক অস্পষ্ট ও নিষ্ফল অভিন্নতা; ইহাকে সরিয়ে তার স্থলে আনা চাই সম্পূর্ণ, অন্তরঙ্গ, অমোঘ ও জীবন্ত মিলন; যোগ ইহাই আনে।

তবু যোগ তার সাধনার পথে অথবা তার সাধ্যলাভে অপরা বিদ্যার রূপগুলি বাদ দিয়ে ফেলে দেয় না, তবে ইহার ব্যতিক্রম হয় যখন ইহা পরিণত হয় এক চরম বৈরাগ্যবাদে বা রহস্যবাদে যাদের কাছে প্রপঞ্চের এই অন্য দিব্য রহস্য সম্পূর্ণ অসহনীয়। অপরা বিদ্যার এই সব রূপ থেকে যোগের পার্থক্য হ'ল যোগের লক্ষ্য প্রগাঢ়, বিশাল ও উচ্চ এবং ইহার লক্ষ্যের উপযোগী সব পদ্ধতির বিশিষ্ট ধরণের; কিন্তু ইহা যে শুধু সেসব থেকে শুরু করে তা নয়, ইহা পথের কিছু দূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সহকারী হিসাবে ব্যবহার করে। এখন বোঝা যায়, যোগের প্রস্তুতিজনক পদ্ধতির পক্ষে, যে শুদ্ধতা ইহার লক্ষ্য সেই লক্ষ্যের

পক্ষে নৈতিক ভাবনা ও আচরণের গুরুত্ব কত বেশী,--অবশ্য আন্তর আচরণের মতো বাহ্য আচরণের গুরুত্ব তত বেশী নয়। তাছাড়া, যোগের সমগ্র পদ্ধতিই মনস্তাত্ত্বিক; একরকম বলা যেতে পারে যে ইহা সুষ্ঠু মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের চরম অনুশীলন। দর্শন শাস্ত্রের তথ্যগুলিকেই অবলম্বন করে যোগ সেসব থেকে শুরু করে তার সত্তার বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে ভগবদ্-উপলব্ধির বিষয়ে তার কাজ; তবে দর্শনশাস্ত্র দেয় শুধু এক বুদ্ধিগত ধারণা আর যোগ ইহাকে নিয়ে যায় ভাবনার উজানে দর্শনে, এবং ধারণার উজানে উপলব্ধিতে ও প্রাপ্তিতে; দর্শনশাস্ত্র যাকে দূরবর্তী আচ্ছিন্ন প্রত্যয় ব'লে ক্ষান্ত হয়, যোগ তাকে নিয়ে আসে জীবন্ত সামীপ্যে ও আধ্যাত্মিক মূর্ততায়। সৌন্দর্যগ্রাহী ও ভাবপ্রধান মনকে এবং বিভিন্ন কান্ত রূপগুলিকে যোগ ব্যবহার করে--এমনকি জ্ঞানযোগও--একাগ্রতার অবলম্বনরূপে এবং ইহারা ঊর্ধ্বায়িত হ'য়ে প্রেম ও আনন্দ যোগের সমগ্র সাধন হয়, যেমন জীবন ও ক্রিয়া ঊর্ধ্বায়িত হ'য়ে কর্মযোগের সমগ্র সাধন হয়। প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের ধ্যান, মানবের মধ্যে এবং মানবের ও জগতের যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপী জীবন তার মধ্যে ভগবানের ধ্যান ও সেবা--এই সবকেই জ্ঞানযোগ উপাদানরূপে সমানভাবে ব্যবহার করতে পারে সর্ববিষয়ের মধ্যে ভগবদ্-উপলব্ধি সম্পূর্ণ করার জন্য। কেবল পার্থক্য এই যে সব কিছুই চালিত হয় সেই এক লক্ষ্যের দিকে, ভগবানের দিকে, সে সব পূর্ণ করা হয় দিব্য, অনন্ত, সার্বিক অস্তিত্বের ভাবনায় যাতে বিভিন্ন ঘটনা ও রূপের মধ্যে অপরা বিদ্যার বহির্মুখী, ইন্দ্রিয়গত, অর্থক্রিয়াকারী নিবিষ্টতার পরিবর্তে স্থাপিত হয় একমাত্র দিব্য নিবিষ্টতা। সাধ্যলাভের পরও যোগীর এই একই দিব্য নিবিষ্টতা থাকে। আগের মতোই যোগী সান্তের মধ্যে ভগবানকে জানে ও দেখে এবং জগতের মধ্যে ভগবদ্-চেতনা ও ভগবদ্-ক্রিয়ার প্রবাহপ্রণালী হ'য়ে থাকে। সুতরাং জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং জীবন বিষয়ক সকল কিছুকেই বিস্তৃত ও উন্নত করার কাজ তার যোগের অন্তর্ভুক্ত। কেবল পার্থক্য এই যে সে সকলের মধ্যেই দেখে ভগবানকে, দেখে পরম সদ্-বস্তুকে, আর তার কর্মের প্রেরণা হ'ল ভগবদ্-জ্ঞানের দিকে, পরম সদ্-বস্তু লাভের দিকে মানবজাতিকে সাহায্যদান। প্রাকৃত বিজ্ঞানের সব তথ্যের মাধ্যমে সে দেখে ভগবান, দশনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেখে ভগবান, সৌন্দর্যের বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে ও মঙ্গলের বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে দেখে ভগবান, জীবনের সকল কাজকর্মের মধ্যে দেখে ভগবান, ভগবানকে

দেখে জগতের অতীত ও ইহার বিভিন্ন পরিণতির মধ্যে বর্তমান ও ইহার সব প্রবণতার মধ্যে, ভবিষ্যৎ ও ইহার মহতী অগ্রসরতার মধ্যে। ইহাদের যে কোনোটির বা সকলগুলির মধ্যে সে আনতে সক্ষম চিৎ-পুরুষ থেকে পাওয়া তার ভাস্বর দর্শন ও মুক্ত সামর্থ্য। তার কাছে অপরা বিদ্যা এমন এক ধাপ হ'য়েছে যেখান থেকে সে আরোহণ করেছে পরা বিদ্যায়; তার জন্য পরা বিদ্যা অপরা বিদ্যাকে দীপ্ত ক'রে ইহাকে নিজের অঙ্গ করে নেয় যদিও ইহা হয় শুধু তার নিম্ন প্রান্ত এবং সর্বাপেক্ষা বাহ্য বিকিরণ।

ষট্‌বিংশ অধ্যায়

সমাধি

জ্ঞানযোগের লক্ষ্য সর্বদাই হওয়া চাই--বর্তমানে আমাদের কাছে স্বাভাবিক নয় এমন এক পরতর চেতনায় উপচয় বা উত্তরণ বা প্রয়াণ; আর এই লক্ষ্যের সহিত যৌগিক তন্ময়তার বিষয়ে অর্থাৎ সমাধিতে যে গুরুত্ব দেওয়া হয় তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। মনে করা হয় যে সত্তার এমন সব অবস্থা আছে যা শুধু সমাধিতেই লাভ করা সম্ভব; সেই অবস্থাই বিশেষ-ভাবে কাম্য যার মধ্যে সংবিতের সকল ক্রিয়া বিলুপ্ত হয় আর নিশ্চল, কালাতীত ও অনন্ত সত্তায় শুদ্ধ অতিমানসিক নিমজ্জন ব্যতীত কোনো চেতনা আদৌ থাকে না। এই তন্ময়তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে অন্তঃপুরুষ প্রস্থান করে সর্বোত্তম নির্বাণের নীরবতার মধ্যে তখন অস্তিত্বের কোনো ভ্রান্তিপূর্ণ বা অবর অবস্থার মধ্যে প্রত্যাবর্তনের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তিযোগে সমাধির গুরুত্ব ঐরূপ সব চেয়ে বেশী না হ'লেও সেখানেও ইহার স্থান আছে; সেখানে ইহা সত্তার এক মূর্ছিত অবস্থা যার মধ্যে দিব্য প্রেমের রভস অন্তঃপুরুষকে নিক্ষেপ করে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করা রাজযোগ ও হঠযোগের যোগসাধনের সোপানের সর্বোচ্চ ধাপ। তাহ'লে পূর্ণযোগে সমাধির কি স্বরূপ অথবা ইহার তন্ময়তার কি উপকারিতা? ইহা স্পষ্ট যে যেখানে জীবনের মধ্যে ভগবানকে পাওয়া আমাদের উদ্দে-শ্যের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে জীবনের নিবৃত্তির অবস্থা সর্বশেষ পূর্ণতাসূচক ধাপ বা সর্বোচ্চ কাম্য অবস্থা হ'তে পারে নাঃ অতগুলি যৌগিক প্রণালীতে যৌগিক তন্ময়তা যেমন এক লক্ষ্য, পূর্ণযোগে তা হ'তে পারে না, ইহা শুধু এক সাধন, আর এ সাধনের উদ্দেশ্য জাগ্রত জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া নয়, ইহার উদ্দেশ্য যে চেতনা দেখে, বেঁচে থাকে ও সক্রিয় সেই সমগ্র চেতনার প্রসার ও উন্নতি সাধন।

যে সত্যের উপর সমাধির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত তাকে আধুনিক বিদ্যা পুনরাবিষ্কার করছে কিন্তু ইহা ভারতীয় মনোবিদ্যায় কখনো নষ্ট হয় নি; এই সত্য এই যে, কি জগৎ-সত্তা অথবা কি আমাদের নিজেদের সত্তা-- ইহাদের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় অথবা আমাদের

কার্যে প্রয়োগ করা হয়। অবশিষ্ট সব পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন আছে সত্তার বিভিন্ন অধিচেতন স্তরে যেগুলি নেমে গিয়েছে অবচেতনের গভীরতম গহনে এবং ঊর্ধ্বে উঠেছে অতিচেতনার সর্বোচ্চ সব শিখরে অথবা যেগুলি আমাদের জাগ্রত আত্মার সংকীর্ণ ক্ষেত্রকে ঘিরে রেখেছে এক বিশাল পরিচেতন অস্তিত্বের দ্বারা, যার কিছু ইঙ্গিত মাত্র পায় আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়। এই তথ্যটি প্রাচীন ভারতীয় মনোবিদ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে চেতনাকে তিন পাদে ভাগ ক'রে—জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, সুষুপ্তির অবস্থা, "জাগ্রৎ", "স্বপ্ন", "সুষুপ্তি"; ইহার ধারণায় মানবসত্তার মধ্যে জাগ্রত আত্মা, স্বপ্ন-আত্মা সুষুপ্তি আত্মা আছে আর আছে সত্তার পরম বা কেবল আত্মা,—এক চতুর্থ বা তুরীয় আত্মা যা এইসবের অতীত এবং যা থেকে এই সব উৎপন্ন হ'য়েছে জগতের মধ্যে সাপেক্ষ অভিজ্ঞতার উপভোগের জন্য।

প্রাচীন গ্রন্থসমূহের পরিভাষা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে স্থূলমনের আয়ত্তাধীন এই দেহবদ্ধ জীবনে জড়বিশ্বের যে চেতনা আমরা স্বভাবতঃ পেয়েছি তা-ই জাগ্রত অবস্থা। পশ্চাতে অবস্থিত যে সূক্ষ্মতর প্রাণ-লোক ও মনোলোক আমাদের কাছে ভৌতিক অস্তিত্বের বিষয়সমূহের মতো ঐরূপ মূর্ত বাস্তব নয়—এমনকি যখন আমরা তাদের ইঙ্গিত পাই তখনো নয়—সেই প্রাণলোক ও মনোলোকের অনুরূপ চেতনা হ'ল স্বপ্নাবস্থা। সুষুপ্তি-অবস্থা হ'ল সেই চেতনা যা বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অতিমানসিক লোকের অনুরূপ; এই অতিমানসিক লোক আমাদের অনুভূতির অতীত, কারণ আমাদের কারণ শরীর বা বিজ্ঞানকোষ আমাদের মধ্যে বিকশিত হয়নি, ইহার শক্তিগুলি সক্রিয় নয় আর সেজন্য আমরা ঐ লোকের সম্পর্কে স্বপ্নশূন্য নিদ্রার অবস্থায় থাকি। ইহাদের অতীত তুরীয় হ'ল আমাদের শুদ্ধ আত্ম-অস্তিত্বের অথবা আমাদের কেবল সত্তার চেতনা; ইহাদের সহিত আমাদের আদৌ কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই, তা যা কিছু মানসিক প্রতিফলন আমরা পাই না কেন আমাদের স্বপ্নে বা আমাদের জাগ্রত অবস্থায় অথবা এমনকি আমাদের সুষুপ্তি চেতনায় যেথায় তারা পুনর্বার লাভের অযোগ্য হ'য়ে পড়েছে। এই চতুর্বিধ ক্রমবিন্যাস হ'ল সত্তার সোপানের সেই সব বিভিন্ন ক্রম যা দিয়ে আমরা প্রত্যারোহণ করি অনপেক্ষ ভগবানের দিকে। সুতরাং সাধারণতঃ আমরা জাগ্রত অবস্থা থেকে সরে না এসে, তার ভিতরে ও তা থেকে দূরে প্রবেশ না ক'রে এবং জড়জগতের সংস্পর্শ না হারিয়ে স্থূল মন থেকে চেতনার পরতর বিভিন্ন লোকে বা মাত্রায় প্রত্যাবর্তন করতে

সক্ষম হই না। সেজন্য, যারা এই সব পরতর মাত্রার অনুভূতি পাবার কামনা করে, তাদের কাছে সমাধি এক কাম্য বিষয়, স্থূল মন ও প্রকৃতির সব বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাবার এক উপায়।

যেমন যেমন সমাধি বা যৌগিক তন্ময়তা সাধারণ বা জাগ্রত অবস্থা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে গিয়ে চেতনার এমন সব স্তরে প্রবেশ করে যে-গুলিতে জাগ্রত মনের সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমেই কমে যায়, যেগুলি জাগ্রত জগতের বার্তা নিতে ক্রমেই অপটু হয় তেমন তেমন ইহা ক্রমশঃ আরো গভীরে অপসরণ করে। একটি বিশেষ সীমা ছাড়িয়ে গেলে, সমাধি সম্পূর্ণ হয়, আর যে অন্তঃপুরুষ তার মধ্যে অপসরণ করেছে তাকে তখন জাগ্রত করা বা আহ্বান করে ফিরিয়ে আনা একরূপ বা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে আসতে পারে তার নিজের ইচ্ছায় অথবা শারীরিক অনুরোধের প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা তবে প্রত্যাবর্তনের এক আকস্মিক আলোড়নের দরুণ এরূপ আঘাত শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক। বলা হয় যে সমাধির এমন সব পরম অবস্থা আছে যেখানে অন্তঃপুরুষ খুব বেশী দিন থাকলে আর ফিরতে পারে না; কারণ যে সূত্রটি তাকে জীবনের চেতনার সহিত বেঁধে রাখে তা থেকে তার সংযোগ ছিন্ন হয়, দেহ পড়ে থাকে, অবশ্য যে অবস্থায় তাকে রাখা হয়েছিল সেই অবস্থাতেই থাকে, লয়ের দ্বারা মৃত হয় না তবে যে অন্তঃপুরুষ-অধিকৃত প্রাণ সেখানে বাস করত তাকে আর ইহা ফিরে পেতে সক্ষম হয় না। পরিশেষে যোগী তার উন্নতির এক বিশেষ পর্যায়ে মৃত্যুর সাধারণ ঘটনা বিনা-ই নিশ্চিতভাবে দেহত্যাগের সামর্থ্য অর্জন করে; এইভাবে সে দেহত্যাগ করে সংকল্পের[১] প্রয়োগের দ্বারা অথবা এমন এক প্রণালীতে যাতে উর্ধ্বমুখী প্রাণ-ধারার ("উদান") দুয়ার দিয়ে প্রাণিক জীবনী-শক্তিকে প্রত্যাহার করা হয় এবং তার জন্য একটি পথ খোলা হয় মস্তকস্থিত গুহ্য ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে। সমাধির অবস্থায় জীবন থেকে প্রস্থান ক'রে সে সরাসরি লাভ করে তার অভীষ্ট বিষয়—সত্তার পরতর পাদ।

একা স্বপ্নাবস্থাতেই অসংখ্য শ্রেণীর গভীরতা আছে, অপেক্ষাকৃত কম গভীর শ্রেণী থেকে প্রত্যাবর্তন সহজ, স্থূল ইন্দ্রিয়ের জগৎ নিকটেই অবস্থিত, যদিও কিছু সময়ের জন্য তাকে বাহিরে রাখা হয়; মন আরো গভীরে

গেলে, এই জগৎ আরো দূরবর্তী হয়, ভিতরে এসে আন্তর সমাপত্তি ক্ষুণ্ণ করার ক্ষমতা তার কমে যায়, মন প্রবেশ করেছে সমাধির নিরাপদ গভীর-তায়। সমাধি ও সাধারণ নিদ্রার মধ্যে, অর্থাৎ যোগের স্বপ্নাবস্থা ও ভৌতিক স্বপ্নাবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। শেষেরটি স্থূলমনের অন্তর্গত; আগেরটিতে আসল সূক্ষ্ম মন স্থূলমানসিকতার মিশ্রণ থেকে মুক্ত হ'য়ে ক্রিয়ারত। স্থূলমনের সব স্বপ্ন অসংলগ্ন বিশৃঙ্খল স্তূপ যার মধ্যে কিছু আছে স্থূল জগৎ থেকে আসা অস্পষ্ট স্পর্শের এমন সব প্রতিক্রিয়া যার চারিদিকে অবর মানসশক্তিগুলি সংকল্প ও বুদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এলোমেলো অর্থহীন চিন্তার জাল বোনে, কিছু আছে মস্তিষ্ক-স্মৃতি থেকে আসা বিশৃঙ্খল ভাবানুষঙ্গ, কিছু আছে মনোময় লোকে বিচরণরত অন্তঃপুরুষ থেকে এমন সব প্রতিফলন যেগুলি সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয় না বুঝে অথবা অন্যদের সহিত না মিল ক'রে আর গ্রহণের সময় যেগুলি অভাবনীয়ভাবে বিকৃত হয় এবং বিশৃঙ্খলভাবে মিশে যায় অপর সব স্বপ্ন-বস্তুর সহিত, বিভিন্ন মস্তিষ্ক স্মৃতির বিষয়ের সহিত, স্থূলজগৎ থেকে আসা ইন্দ্রিয়সংস্পর্শের সব উদ্ভট প্রতিক্রিয়ার সহিত। অপর পক্ষে যৌগিক স্বপ্নাবস্থায় মন স্থূল জগৎকে আয়ত্ত না করলেও, নিজেকে আয়ত্ত করে স্পষ্ট ভাবে, কাজ করে সুসঙ্গতভাবে এবং সমর্থ হয় তার সাধারণ সংকল্প ও বুদ্ধিকে একাগ্র সামর্থ্য দিয়ে ব্যবহার করতে অথবা মনের আরো উন্নত লোকের পরতর সংকল্প ও বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে। বাহ্য জগতের অভিজ্ঞতা থেকে ইহা সরে আসে, স্থূল ইন্দ্রিয়গুলিকে এবং জড়বিষয়ের সহিত তাদের যোগাযোগের দ্বারগুলিকে ইহা সম্পূর্ণ বন্ধ করে; কিন্তু যা কিছু তার আসল ক্রিয়া অর্থাৎ ভাবনা, যুক্তিবুদ্ধি, গভীর চিন্তা, দর্শন—এসব সে পূর্বের মতোই সম্পন্ন করতে পারে আরো বিশুদ্ধতার সহিত এবং জাগ্রত মনের বিক্ষেপ ও অস্থিরতামুক্ত নিরঙ্কুশ একাগ্রতার শক্তি দিয়ে। ইহা তার সংকল্পের প্রয়োগে নিজের উপর অথবা নিজের পরিবেশের উপর এমন সব মানসিক, নৈতিক ও এমনকি ভৌতিক ফল উৎপাদনে সক্ষম হয় যেগুলি সমাধিভঙ্গের পরও বজায় থাকতে পারে এবং যাদের পরের ফলও আসতে পারে জাগ্রত অবস্থার উপর।

স্বপ্নাবস্থার সামর্থ্যগুলির পূর্ণ অধিকার পেতে হ'লে প্রথম দরকার হ'ল স্থূল ইন্দ্রিয়গুলির উপর বাহ্য জগতের রূপ, শব্দাদির আক্রমণ রোধ করা। অবশ্য, স্বপ্ন-সমাধিতে সূক্ষ্মদেহের অন্তর্গত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে বাহ্য

স্থূল জগৎকে জানা সম্ভব; নিজের ইচ্ছামতো বাহ্য জগতের ঐসবকে জানা যায় আর তা জানা যায় জাগ্রত অবস্থার চেয়ে আরো অনেক ব্যাপক পরিমাণে: কারণ স্থূল শারীরিক ইন্দ্রিয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি এত শক্তিমান যে তাদের ক্রিয়াক্ষেত্রের প্রসার আরো অনেক বেশী আর এই প্রসারকে কার্যতঃ অসীম করা যায়। কিন্তু স্থূল ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে স্থূল জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ জ্ঞান থেকে সূক্ষ্ম সব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার জ্ঞান সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সমাধির স্থির অবস্থার সহিত আমাদের সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গতি নেই, কারণ স্থূল ইন্দ্রিয়গুলির চাপ সমাধি ভেঙে দেয় এবং মনকে ডেকে ফিরিয়ে আনে তাদের স্বাভাবিক ক্ষেত্রে একমাত্র যেখানে তাদের সামর্থ্য নিবদ্ধ। কিন্তু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি তাদের নিজেদের সব লোক ও স্থূল জগৎ--উভয়েরই উপর কার্য করতে সমর্থ যদিও এই স্থূলজগৎ তাদের নিজেদের সত্তার জগৎ থেকে আরো দূরবর্তী। স্থূল ইন্দ্রিয়গুলির সব দ্বার সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য যোগে নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়. তার মধ্যে কতকগুলি ভৌতিক কৌশল; কিন্তু যে একটি সাধন সবচেয়ে পর্যাপ্ত তা হ'ল একাগ্রতার শক্তি; ইহার দ্বারা মনকে অন্তর্মুখী করে এমন গভীরতার মধ্যে আনা যায় যেখানে ভৌতিক বিষয়ের আহ্বান আর সহজে পৌঁছুতে পারে না। দ্বিতীয় প্রয়োজন হ'ল শারীরিক নিদ্রার ব্যাঘাত দূর করা। যখন মন স্থূল বিষয়ের সংস্পর্শ থেকে সরে এসে ভিতরে যায় তখন তার সাধারণ অভ্যাস হ'ল নিদ্রার জড়তা বা তার স্বপ্নের কবলিত হওয়া এবং সেজন্য যখন তাকে সমাধি লাভের জন্য ডাকা হয় তখন ইহা নিছক অভ্যাস বশে প্রথমেই যে প্রত্যুত্তর দেয় বা দিতে প্রবণ হয় তা প্রার্থিত প্রত্যুত্তর নয়, বরং তার শারীরিক নিদ্রার স্বাভাবিক প্রত্যুত্তর। মনের এই অভ্যাস দূর করা চাই; মনের শেখা চাই যেন ইহা স্বপ্নাবস্থার মধ্যে জাগ্রত থাকে, যেন আত্ম-অধিকারী হয়, তবে বহির্মুখী সজাগতা নিয়ে নয়, অন্তঃসমাহিত সজাগতা নিয়ে যাতে মন নিজের মধ্যে মগ্ন থাকলেও তার সকল সামর্থ্যই ইহা প্রয়োগ করে।

স্বপ্নাবস্থার অনুভূতিগুলি অনন্ত প্রকারের। কারণ ইহা যে শুধু স্বাভাবিক মানসিক সামর্থ্যগুলিকে অর্থাৎ যুক্তি, বিচার, সংকল্প, কল্পনাকে নিরঙ্কুশভাবে অধিগত করে সেগুলিকে ইচ্ছামতো যে কোনো ভাবে, যে কোনো প্রসঙ্গে, যে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে সক্ষম তা নয়, বরং স্থূল জগৎ থেকে আরম্ভ করে উচ্চতর বিভিন্ন মানসিক জগৎ পর্যন্ত যে

সকল জগতের মধ্যে তার স্বাভাবিক প্রবেশ আছে অথবা যে সবের মধ্যে ইহা ইচ্ছা করলেই প্রবেশ লাভ করে—সেই সকল জগতের সহিত ইহা সংযোগ স্থাপনে সমর্থ। এই কাজ ইহা করে সেই সব নানা উপায়ে যেগুলি স্থূল বহির্মুখী ইন্দ্রিয়সমূহের সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত প্রত্যক্‌বৃত্ত মনের সূক্ষ্মতা, নমনীয়তা ও ব্যাপক গতি-প্রবৃত্তির নিকট সুলভ। প্রথমে ইহা সকল বিষয়কে—তা ইহারা জড়জগতের অন্তর্গত হ'ক অথবা অন্যান্য লোকের হ'ক—জানতে পারে অনুভবযোগ্য প্রতিমূর্তির সহায়ে, তবে এই সব প্রতিমূর্তি যে শুধু দৃশ্য বিষয়ের তা নয়, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ, গতি, ক্রিয়া প্রভৃতি যে সকল বিষয় মন ও ইহার সব করণের বোধগম্য হয় সে সবেরও প্রতিমূর্তি ইহারা। কারণ সমাধির মধ্যে মন যেতে পারে আন্তর দেশে যাকে কখন কখন বলা হয় চিদাকাশ অর্থাৎ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম আকাশের সব গভীর প্রদেশের মধ্যে যেগুলি জড়বিশ্বের স্থূলতর আকাশের ঘন আবরণের দ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয় থেকে আড়াল করা থাকে, আর জড়জগতেই হ'ক অথবা অন্য কোনো জগতেই হ'ক—সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই নিজেদের এমন সব পুনর্গঠনকারী স্পন্দন, অনুভবযোগ্য প্রতিধ্বনি, প্রত্যুৎপত্তি ও পুনরাবর্তী প্রতিমূর্তি সৃজন করে যেগুলি ঐ সূক্ষ্মতর আকাশ গ্রহণ ক'রে ধারণ করে রাখে।

ইহাতেই দূরদর্শন, দূরশ্রবণ প্রভৃতি ঘটনাগুলির অধিকাংশের ব্যাখ্যা মেলে; কারণ এই সব ঘটনার অর্থ এই যে, সচরাচর না হ'লেও, জাগ্রত মানসিকতা কখনো এমন বিষয়ের সীমিত সূক্ষ্মচৈতন্য লাভ করে যাকে বলা যায় সূক্ষ্ম আকাশের প্রতিমূর্তি-স্মৃতি এবং যার দ্বারা শুধু যে অতীত ও বর্তমান বিষয়সকলের সংকেত বোঝা যায় তা নয়, এমনকি ভবিষ্যতের বিষয়ের সংকেতও বোঝা যায়; কারণ ভবিষ্যৎ বিষয়গুলি মনের উচ্চতর লোকের উপর জ্ঞান ও দর্শনের নিকট ইতিপূর্বেই সংসিদ্ধ হ'য়ে থাকে এবং তাদের প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত হ'তে পারে বর্তমান কালে মনের উপর। কিন্তু এই যে সব বিষয়গুলি জাগ্রত মানসিকতার কাছে অসাধারণ, দুষ্কর এবং হয় কোনো বিশেষ সামর্থ্য অর্জনের দ্বারা অথবা শ্রমসাধ্য অভ্যাসের পরই অনুভব করা যায় সেগুলি সমাধি চেতনার স্বপ্নাবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক, আর ইহার মধ্যে অধিচেতন মন মুক্ত থাকে। আর ঐ মন নানাবিধ লোকস্থিত বিষয়সমূহকেও জানতে পারে এবং তা যে শুধু এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিমূর্তির দ্বারা জানে তা নয়, তা জানে একপ্রকার ভাবনাদৃষ্টি বা ভাবনাগ্রহণ

ও সংস্কারের দ্বারা যা চেতনার সেই ঘটনার অনুরূপ যাকে আধুনিক "অতীন্দ্রিয়" বিজ্ঞানে বলা হয় ভাবনা-সংক্রমণ (Telepathy)। কিন্তু এখানেই স্বপ্নাবস্থার সামর্থ্যের শেষ হয় না। ইহা এক প্রকার মনোময় বা প্রাণময় সূক্ষ্ম শরীরে আমাদের নিজেদেরই এক প্রকার প্রক্ষেপ দ্বারা অন্যান্য লোক ও জগতের মধ্যে অথবা এই জগতেরই দূরবর্তী স্থানের ও দৃশ্যের মধ্যে বাস্তবিকই প্রবেশ ক'রে একপ্রকার কায়িক উপস্থিতির দ্বারা তাদের মধ্যে বিচরণ ক'রে নিয়ে আসতে পারে তাদের বিভিন্ন দৃশ্য, ও সত্য ও ঘটনার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এমনকি ইহা ঐ একই উদ্দেশ্যে মনোময় বা প্রাণময় শরীরকে সত্যসত্যই প্রক্ষেপ ক'রে তাতে পর্যটন করতে পারে; তখন স্থূল দেহ পড়ে থাকে গভীরতম সমাধির মধ্যে, সে যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ এই দেহে প্রাণের কোনো চিহ্ন থাকে না।

কিন্তু সমাধির স্বপ্নাবস্থার শ্রেষ্ঠ মূল্য এইসব বিপুল পরিমাণের বাহ্য বিষয়ে নয়, ইহার শ্রেষ্ঠ মূল্য তার সেই সামর্থ্যে যার দ্বারা ভাবনা, ভাবাবেগ, সংকল্পের পরতর ক্ষেত্র ও সামর্থ্যগুলি সহজেই মুক্ত করা যায় আর এই সব পরতর বিষয় দ্বারাই অন্তঃপুরুষের উচ্চতা, ক্রিয়াক্ষেত্র ও আত্ম-প্রভুত্ব বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের বিভ্রান্তকারী আকর্ষণ থেকে সরে এসে ইহা একাগ্রতাপূর্ণ আত্ম-একান্ততার সুষ্ঠু সামর্থ্যে স্বাধীন যুক্তি, ভাবনা, বিবেকের দ্বারা অথবা এক উত্তরোত্তর গভীর দর্শন ও অভিন্নতার দ্বারা আরো অন্তরঙ্গভাবে, আরো চূড়ান্তভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে যাতে সে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় ভগবানের মধ্যে, পরমাত্মার মধ্যে, বিশ্বাতীত সত্যের মধ্যে যেমন তাঁর সব তত্ত্ব, ও সামর্থ্য ও অভিব্যক্তির বিভাবে, আবার তেমন তাঁর পরতম মূল সৎ-স্বরূপে। অথবা ইহা নিবিষ্ট আন্তর হর্ষ ও ভাবাবেগের দ্বারা, যেন অন্তঃপুরুষের রুদ্ধ ও নিভৃত প্রকোষ্ঠে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে দিব্য প্রেমাস্পদের সহিত, সকল দিব্যসুখ, উল্লাস ও আনন্দের অধিপতির সহিত মিলনের রসাস্বাদনের জন্য।

পূর্ণযোগের পক্ষে সমাধির এই পদ্ধতির যে অসুবিধা আছে বলে মনে হয় তা এই যে যখন সমাধির অবসান হয় তখন সূত্র ছিন্ন হয় আর অন্তঃ-পুরুষ ফিরে আসে বাহ্য জীবনের বিক্ষেপ ও অপূর্ণতার মধ্যে, তবে এই সব গভীরতর অনুভূতির সাধারণ স্মৃতির দ্বারা বাহ্যজীবনের উপর যে উন্নতিবিধায়ক ফল আসা সম্ভব শুধু তা-ই থাকে। কিন্তু এই ব্যবধান, এই ছেদ অনিবার্য নয়। প্রথমতঃ জাগ্রত মনের কাছে সমাধি অবস্থার

অনুভূতিগুলি যে শূন্য মনে হয় তার কারণ শুধু এই যে চৈত্যপুরুষ তখনো এসবে অনভ্যস্ত; যতই ইহা সমাধির অধীশ্বর হয় ততই ইহা বিস্মৃতির কোনো ব্যবধান বিনাই আন্তর জাগরণ থেকে যেতে সক্ষম হয় বাহ্য জাগ-রণে। দ্বিতীয়তঃ একবার ইহা করা হ'লে আন্তর অবস্থার মধ্যে যা পাওয়া যায় তাকে জাগ্রত চেতনার দ্বারা অর্জন ক'রে জাগ্রত জীবনের স্বাভাবিক অনুভূতি, সামর্থ্য, মানসিক স্থিতিতে পরিণত করা আরো সহজ হয়। যে সূক্ষ্ম মন সাধারণতঃ অন্নময় পুরুষের জিদের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে তাহা এমনকি জাগ্রত অবস্থাতেও শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে যতক্ষণ না প্রসারশীল মানব ঐ জাগ্রত অবস্থাতেও তার স্থূল শরীরের মতো তার সব বিভিন্ন সূক্ষ্ম শরীরেও বাস করতে সক্ষম হয়, আর সক্ষম হয় তাদের কথা জানতে তাদের মধ্যে থাকতে, তাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, শক্তি ও সামর্থ্য ব্যবহার করতে, অতি-ভৌতিক সত্য, চেতনা ও অনুভূতির অধিকারী হ'য়ে বাস করতে।

সুষুপ্তি-অবস্থা উত্তরণ করে সত্তার পরতর সামর্থ্যে ভাবনা ছাড়িয়ে শুদ্ধ চেতনার মধ্যে, ভাবাবেগ ছাড়িয়ে শুদ্ধ আনন্দের মধ্যে, সংকল্প ছাড়িয়ে শুদ্ধ প্রভুত্বের মধ্যে; সচ্চিদানন্দের যে পরম অবস্থা থেকে জগতের সকল কার্যকলাপের উৎপত্তি তার সহিত মিলনের দ্বার ইহাই। কিন্তু এখানে আমাদের সাবধান হ'তে হবে যেন আমরা প্রতীক্ ভাষার প্রচ্ছন্ন গর্তে না পড়ি। এই সব পরতর অবস্থা বোঝাতে "স্বপ্ন" ও "সুষুপ্তি" পদের ব্যবহার শুধু রূপক মাত্র আর তার কারণ এই যে সাধারণ স্থূলমনের কাছে তার অপরিচিত সব লোক ঐরূপ বোধ হয়। যে তৃতীয় পাদকে "সুষুপ্তি" বলা হয় তাতে যে আত্মা গভীর নিদ্রামগ্ন থাকেন তা নয়। বরং সুষুপ্তি-আত্মাকে বলা হয়েছে "প্রাজ্ঞ" অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও বিদ্যার অধীশ্বর, বিজ্ঞানাত্মা, এবং "ঈশ্বর" অর্থাৎ সত্তার অধিপতি। স্থূল মনের কাছে ইহা নিদ্রা, আমা-দের বিশালতর ও সূক্ষ্মতর চেতনার কাছে ইহা অধিকতর জাগরণ। সাধা-রণ মনের কাছে যা কিছু তার সাধারণ অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত অথচ তার এলাকাভুক্ত সেসব মনে হয় স্বপ্ন; কিন্তু যে সীমারেখায় ইহা এমন সব বিষয়ের কাছে পৌছায় যেগুলি তার এলাকার বাহিরে সেখানে ইহা আর তখন সত্যকে এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও দেখতে পায় না, সে আসে গভীর নিদ্রার অবস্থায় যেখানে সব কিছুই শূন্য ও অবোধ্য, কিছুই গ্রহণ করা হয় না। ব্যক্তিবিশেষের চেতনার সামর্থ্য অনুযায়ী, ইহার প্রবুদ্ধতা ও জাগরণের

মাত্রা ও উচ্চতা অনুযায়ী এই সীমারেখার পরিবর্তন হয়। এই রেখাকে উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বে নেওয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত ইহা এমনকি মন ছাড়িয়েও যেতে পারে। অবশ্য, সাধারণতঃ অতিমানসিক সব স্তরের উপর মানব মন এমন কি সমাধির আন্তর জাগরণ নিয়েও জাগ্রত থাকতে অক্ষম; তবে এই অক্ষমতা জয় করা সম্ভব। এই সব স্তরের উপর জাগ্রত থেকে পুরুষ বিজ্ঞানময় ভাবনার, বিজ্ঞানময় সংকল্পের, বিজ্ঞানময় আনন্দের সব ক্ষেত্রের অধীশ্বর হয় আর যদি সে সমাধির মধ্যে তা করতে সমর্থ হয় তাহ'লে তার এই অনুভূতির স্মৃতি, ও অনুভূতির সামর্থ্যকে জাগ্রত অবস্থাতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আমাদের কাছে আরো পরতর যে স্তর উন্মুক্ত থাকে অর্থাৎ আনন্দের স্তর, এমনকি সেখানেও প্রবুদ্ধ পুরুষ অনুরূপভাবে আনন্দ-আত্মাকে অধিগত করতে পারে তাঁর সমাহিত অবস্থা এবং তাঁর বিশ্ব-ব্যাপ্তিত্ব,—এই উভয় বিভাবেই। কিন্তু তবু ঊর্ধ্বে আরো ক্ষেত্র থাকতে পারে যা থেকে কোনো স্মৃতি আনা সম্ভব নয়—এক এই স্মৃতি ছাড়া যা বলে, "যে কোনো ভাবেই হ'ক, বর্ণনা করা যায় না এমন ভাবে, আমি আনন্দে ছিলাম"—ইহা সেই অপরিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের আনন্দ যা ভাবনার দ্বারা প্রকাশের সকল যোগ্যতার অতীত অথবা রূপক বা লক্ষণের দ্বারা বর্ণনার অতীত। এমনকি সত্তার বোধও বিলুপ্ত হ'তে পারে এমন এক অনুভূতির মধ্যে যাতে প্রপঞ্চের কোনো অর্থ থাকে না, আর মনে হয় যে বৌদ্ধদের প্রতীক যে নির্বাণ তা-ই একমাত্র অবিসংবাদী সত্য। জাগরণের সামর্থ্য যত ঊর্ধ্বেই যাক না কেন, মনে হয় তারও উজানে কোনো স্তর আছে যাতে নিদ্রার, "সুষুপ্তির" রূপকটি তখনো প্রয়োজ্য হবে।

ইহাই যৌগিক তন্ময়তার, সমাধির তত্ত্ব; ইহার জটিল ব্যাপারের মধ্যে আমাদের এখন প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। পূর্ণযোগে ইহার দুইটি উপ-কারিতার কথা বলাই যথেষ্ট হবে। একথা সত্য যে একটা সীমা পর্যন্ত যা নির্দিষ্ট করা বা চিহ্নিত করা দুরূহ সমাধি থেকে যা সব পাওয়া যায়, প্রায় সেসব কিছুই অর্জন করা যায় সমাধি অবলম্বন না ক'রেও। কিন্তু তবু আধ্যাত্মিক ও চৈত্যিক অনুভূতির এমন কতকগুলি উচ্চ শিখর আছে যেগুলি সম্বন্ধে প্রতিবোধাত্মক অনুভূতির পরিবর্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতি গভীর ও সমগ্রভাবে লাভ করার একমাত্র উপায় হ'ল যৌগিক সমাধি। আর এমনকি যা সব অন্যভাবে অর্জন করা সম্ভব, সেসবেরও জন্য সমাধি এক সুলভ উপায় ও এক সুবিধাকর বিষয়, আর যেসব লোকে আমরা উন্নত আধ্যা-

ত্মিক অনুভূতি অন্বেষণ করি সেগুলি যত বেশী উচ্চ ও দুষ্প্রাপ্য হয়, ইহা অনিবার্য না হ'লেও তত বেশী আমাদের উপকারে আসে। একবার সেখানে ইহা পাওয়া গেলে, ইহাকে যতবেশী সম্ভব আনা দরকার জাগ্রত চেতনার মধ্যে। কারণ যে যোগের মধ্যে সকল জীবন সম্পূর্ণ ও অকুণ্ঠভাবে অন্তর্ভুক্ত তাতে সমাধির পূর্ণ উপকারিতা পাওয়া যায় কেবল তখনই যখন মানুষের মধ্যে দেহধারী পুরুষের অখণ্ড জাগরণের জন্য সমাধিলব্ধ বিষয়গুলিকে করা যায় স্বাভাবিক সম্পদ ও অনুভূতি।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

হঠযোগ

যোগের যেমন ভিন্ন ভিন্ন অনেক পথ আছে, সমাধিলাভের পথও প্রায় তেমন সংখ্যকই ভিন্ন ভিন্ন। বস্তুতঃ, ইহাতে এত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় --শুধু যে পরতম চেতনালাভের এক উৎকৃষ্ট সাধন হিসাবে তা নয়, আবার এই হিসাবেও যে ইহা সেই পরতম চেতনারই স্বকীয় অবস্থা ও পাদ একমাত্র যার মধ্যে আমাদের দেহ থাকাকালীন এই পরতম চেতনাকে সম্পূর্ণ অধিগত ও উপভোগ করা সম্ভব--যে কতকগুলি যোগসাধন পন্থাকে দেখায় যেন ইহারা শুধু সমাধিলাভের উপায় মাত্র। সকল যোগের স্বরূপই হ'ল পরমের সহিত ঐক্যের জন্য প্রয়াস ও তার প্রাপ্তি--পরমের সত্তার সহিত ঐক্য, পরমের চেতনার সহিত ঐক্য, পরমের আনন্দের সহিত ঐক্য, --অথবা যদি আমরা একান্ত ঐক্যের ভাবনা প্রত্যাখ্যান করি, তাহ'লে যোগের স্বরূপের হ'ল অন্ততঃ একপ্রকার মিলনের প্রয়াস ও তার প্রাপ্তি--যদিও এই মিলনের অর্থ শুধু এই যে পুরুষ বাস করে ভগবানের সহিত সত্তার একই পাদে ও পরিধির মধ্যে, "সালোক্য" অথবা এক প্রকার অবিচ্ছেদ্য সান্নিধ্যে "সামীপ্য"। ইহা লাভ করার একমাত্র উপায় হ'ল আমাদের সাধারণ মানসিকতার আয়ত্তাধীন চেতনার যে স্তর ও তীব্রতা তা অপেক্ষা চেতনার আরো উচ্চ স্তরে ও তীব্রতায় উত্তরণ করা। আমরা দেখেছি যে সমাধিই এইরূপ এক উচ্চতর স্তর ও মহত্তর তীব্রতার স্বাভাবিক স্থিতি। স্বভাবতঃই জ্ঞানযোগে ইহার গুরুত্ব অনেক বেশী কারণ এই যোগের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের তত্ত্বই হ'ল মানসিক চেতনাকে এমন এক স্বচ্ছতায় ও সমাহিত সামর্থ্যে উন্নীত করা যার দ্বারা ইহা প্রকৃত সত্তাকে জানতে, তার মধ্যে বিলীন হ'তে এবং তার সহিত অভিন্ন হ'তে সক্ষম হয়। কিন্তু দুটি বড় যোগপন্থায় ইহাদের গুরুত্ব এমনকি আরো বেশী। এই যে দুটি পন্থা,--রাজযোগ ও হঠযোগ--ইহাদের কথাই আমরা এখন আলোচনা করব; কারণ জ্ঞানমার্গের পদ্ধতি ও ইহাদের পদ্ধতির মধ্যে বিরাট প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, ইহারা যে জ্ঞানযোগের অনুরূপ তার চূড়ান্ত প্রমাণ এই যে তাদের মূল তত্ত্ব এই একই সমাধি। তবে তাদের বিভিন্ন ক্রমের পশ্চাতের মূল

ভাব সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ আলোচনা ছাড়া আর বেশী কিছু করা আমাদের প্রয়োজন নেই; কারণ সমন্বয়ী ও পূর্ণযোগে তাদের গুরুত্ব গৌণ, অবশ্য তাদের সব লক্ষ্য পূর্ণযোগের অন্তর্গত করা চাই, কিন্তু তাদের সব পদ্ধতি হয় পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায়, নয় তাদের প্রয়োগ করা যায় শুধু প্রাথমিক বা প্রাসঙ্গিক সহায়তার জন্য।

হঠযোগ এক শক্তিশালী কিন্তু দুরূহ ও কষ্টকর প্রণালী। ইহার ক্রিয়ার তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে এই তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে দেহ ও অন্তঃপুরুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। বন্ধন ও মোক্ষ, পশুসুলভ দুর্বলতা ও দিব্য সামর্থ্য, মন ও অন্তঃপুরুষের তমসাচ্ছন্নতা আর তাদের ভাস্বরতা, দুঃখ ও সীমার বশ্যতা আর আত্ম-প্রভুত্ব, মৃত্যু ও অমরত্ব——এই সব দ্বন্দ্বের চাবি-কাঠি হ'ল দেহ, তাদের রহস্য হ'ল দেহ। হঠযোগীর কাছে দেহ শুধু এক জীবন্ত জড়ের স্তূপ নয়, ইহা আধ্যাত্মিক সত্তা ও অন্নময় সত্তার মধ্যে এক রহস্যপূর্ণ সেতু; এমনকি হঠযোগসাধনা এক কৌশলী ব্যাখ্যাতাকে বলছেন দেখা গেছে যে বেদান্তের প্রতীক "ওম্" হ'ল রহস্যময় মানব-শরীরের এক সংকেত। অবশ্য যদিও হঠযোগী সর্বদাই স্থূল শরীরের কথাই বলে এবং ইহাকেই তার সব বিভিন্ন অভ্যাসের ভিত্তি করে, তবু সে ইহাকে শারীরসংস্থানবিৎ বা শারীর-ক্রিয়াবিদ্বানের দৃষ্টিতে দেখে না, বরং তাকে এমন ভাষায় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে যাতে স্থূল শরীরের পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীরের দিকেই লক্ষ্য করা হয়। বস্তুতঃ, আমাদের দৃষ্টি-কোণ থেকে হঠযোগীর সমগ্র লক্ষ্যকে এইভাবে সংক্ষেপে বলা যায়——যদিও হঠযোগী নিজে তা ঐভাবে বলতে চাইবে না——যে ইহা নির্দিষ্ট সব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা স্থূল শরীর মধ্যস্থ অন্তঃপুরুষকে এমন সামর্থ্য, আলোক, শুদ্ধতা, স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিভিন্ন উত্তরোত্তর উচ্চ পর্যায় দেবার এক প্রয়াস যেগুলি অন্তঃপুরুষের কাছে স্বাভাবিক ভাবে উন্মুক্ত হ'ত যদি অন্তঃপুরুষ এখানে বাস ক'রত সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে ও উন্নত কারণ শরীরের মধ্যে।

যারা মনে করে যে (প্রাকৃত) বিজ্ঞানের বিষয় শুধু জড় বিশ্বের বাহ্য ঘটনাবলী, তাদের পশ্চাতে যা সব রয়েছে সেসব নয়, তাদের কাছে হঠ-যোগের প্রক্রিয়াগুলিকে বৈজ্ঞানিক বলা অদ্ভুত মনে হবে; কিন্তু বিজ্ঞানের মতো হঠযোগের প্রক্রিয়াগুলিও বিভিন্ন বিধান ও তাদের কর্মধারার সু-নিশ্চিত অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সেসবকে সঠিকভাবে অনুশীলন

করা হ'লে তা থেকে সুপরীক্ষিত সব ফলও পাওয়া যায়। বস্তুতঃ হঠযোগ, তার নিজের ধারায় এক জ্ঞান শাস্ত্র; তবে আসল জ্ঞানযোগ হ'ল আধ্যাত্মিক অনুশীলনে প্রয়োগ করা হ'য়েছে এমন সত্তাবিষয়ক তত্ত্ব-জ্ঞান, এক মনো-বিজ্ঞানমূলক শাস্ত্র, হঠযোগ হ'ল সত্তার বিজ্ঞান, এক মনোভৌতিক শাস্ত্র। দুটিতেই স্থূল, চৈত্য ও আধ্যাত্মিক ফল পাওয়া যায়; কিন্তু তারা একই সত্যের দুই বিভিন্ন মেরুতে অবস্থিত হওয়ায়, একটির কাছে মনোভৌতিক ফলগুলির মূল্য নগণ্য, তার কাছে একমাত্র বিশুদ্ধ চৈত্য ও আধ্যাত্মিক ফলই আসল বিষয়, আর এমনকি বিশুদ্ধ চৈত্য ফলও আধ্যাত্মিক ফলের সহায়ক মাত্র, সমগ্র মনোযোগ সমাবিষ্ট থাকে এই আধ্যাত্মিক ফলে; অপরটিতে শারীরিক ফলের গুরুত্ব অতি বৃহৎ, সূক্ষ্মমানসিক ফলের মূল্য প্রচুর, আর আধ্যাত্মিক ফলই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্থক পরিণতি, তবে দেহের দিকেই এত বেশী ও নিবিষ্ট মনোযোগ দিতে হয় যে আধ্যাত্মিক পরিণতি দীর্ঘদিন ধরে এক স্থগিত রাখা দূরবর্তী বিষয় বলে গণ্য হয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে দুটিরই এক লক্ষ্যে উপনীত হওয়া নিশ্চিত। পরতমে যাবার জন্য হঠযোগও এক পথ, যদিও যেতে হবে এক দীর্ঘ, দুরূহ ও পুঙখানুপুঙখ সাধনার দ্বারা, "দুঃখম্ আপ্তুম্"।

সকল যোগসাধনারই পদ্ধতিতে অনুশীলনের তিনটি নীতি বর্তমান; প্রথম শুদ্ধিকরণ অর্থাৎ আমাদের শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক সংস্থানের মধ্যে সত্তার শক্তির মিশ্রিত ও অনিয়মিত ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন সকল বিচ্যুতি, বিশৃঙ্খলা, বাধার অপসারণ; দ্বিতীয়তঃ একাগ্রতা অর্থাৎ এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তঃস্থ সত্তার ঐ শক্তিকে পূর্ণ-মাত্রায় প্রখর করা এবং ইহাকে নিজের আয়ত্তে এনে স্বনির্দিষ্ট পথে নিয়োগ করা; তৃতীয়তঃ মুক্তি অর্থাৎ এক মিথ্যা ও সীমিত লীলার মধ্যে ব্যষ্টি-ভাবাপন্ন ক্রিয়া-শক্তির সংকীর্ণ ও দুঃখময় যে সব গ্রন্থি আমাদের প্রকৃতির বর্তমান বিধান তা থেকে বিমুক্তি। আমাদের মুক্ত সত্তার যে উপভোগ পরতমের সহিত আমাদের ঐক্য বা মিলন সাধন করে তা-ই চরম পরি-ণতি; যোগসাধনার উদ্দেশ্য ইহাই। এই তিন অপরিহার্য সোপান এবং ইহারা যেসব উচ্চ, উন্মুক্ত এবং অনন্ত স্তরে আরোহণ করে সেই সব স্তর— এই সবকেই হঠযোগ তার সকল অনুশীলনের মধ্যে নজরে রাখে।

ইহার শারীরিক শিক্ষার দুইটি প্রধান অঙ্গ হ'ল আসন ও প্রাণায়াম, অন্যগুলি ইহাদের সহায়ক মাত্র; আসনের অর্থ দেহকে নিশ্চলতার কতক-

গুলি বিশেষ ভঙ্গীতে অভ্যস্ত করা, আর প্রাণায়ামের অর্থ শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের দ্বারা দেহমধ্যস্থ শক্তির প্রাণিক ধারার চালনা ও নিরোধ। স্থূল আধারই যন্ত্র; কিন্তু স্থূল আধারের দুই উপাদান--দেহ ও প্রাণ: দেহ হ'ল আপতিক যন্ত্র ও ভিত্তি, আর প্রাণ, প্রাণ-শক্তি সামর্থ্য ও আসল যন্ত্র। বর্তমানে এই দুই যন্ত্রই আমাদের প্রভু। আমরা দেহের অধীন, আমরা প্রাণ-শক্তির অধীন, যদিও আমরা অন্তঃপুরুষ, যদিও আমরা মনোময় পুরুষ, তবু আমরা অতীব সীমিত মাত্রায় মাত্র আদৌ তাদের প্রভু হিসাবে দাঁড়াতে সক্ষম। এক নগণ্য ও সীমিত দৈহিক প্রকৃতির দ্বারা আমরা বদ্ধ, এবং ফলতঃ যে নগণ্য ও সীমিত প্রাণশক্তিকে দেহ সহ্য করতে সক্ষম অথবা যা ইহা কার্যে প্রয়োগ করতে সক্ষম শুধু তার দ্বারা আমরা বদ্ধ। উপরন্তু, আমাদের মধ্যে ইহাদের প্রত্যেকের ও উভয়ের ক্রিয়া শুধু যে সংকীর্ণতম সব সীমার অধীন তা নয়, ইহারা সততই অশুদ্ধতা দুষ্ট, আর যতবারই এই অশুদ্ধতা সংশোধন করা হয়, ততবারই ইহা আবার ফিরে আসে; সেই সঙ্গে ঐ ক্রিয়া সকল প্রকার বিশৃঙ্খলার অধীন, যেগুলির মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক, এক উগ্র অবস্থা, আমাদের সাধারণ স্থূল জীবনের অংশ অন্যগুলি অস্বাভাবিক, ইহার বিভিন্ন ব্যাধি ও বিকলতা। এই সব নিয়েই হঠযোগকে কাজ করতে হবে; এই সবকেই তার জয় করা চাই; আর ইহা সে করে প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতির সাহায্যে যেগুলি জটিল ও কষ্টকর, তবে তত্ত্বতঃ সরল ও কার্যকরী।

হঠযোগের আসন প্রণালীর মূলে দুইটি গভীর ভাবনা আছে যাদের সহিত বহু কার্যকরী আনুষঙ্গিক অর্থ জড়িত। প্রথমটি হ'ল শারীরিক নিশ্চলতাজনিত নিয়ন্ত্রণ, দ্বিতীয়টি নিশ্চলতাজনিত সামর্থ্য। জ্ঞানযোগে মানসিক নিশ্চলতার সামর্থ্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, হঠযোগে শারীরিক নিশ্চল-তার সামর্থ্য অনুরূপ কারণে তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির গভীরতর সব সত্যে অনভ্যস্ত মনের কাছে এই দুইই মনে হবে নিশ্চেষ্টতার নিস্তেজ নিষ্ক্রিয়তার জন্য অন্বেষণ। ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতই সত্য; কারণ মনের বা দেহের যে যৌগিক নিষ্ক্রিয়তা তা এমন এক অবস্থা যাতে থাকে শক্তির বিপুলতম বৃদ্ধি, অধিকার ও ধারণ। আমাদের মনের স্বাভাবিক সক্রিয়তার অধিকাংশই এক বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অস্থিরতা. ইহা শক্তির অপচয় ও দ্রুত পরীক্ষামূলক ব্যয়ে পূর্ণ; ইহার মধ্যে সামান্য অংশমাত্র নেওয়া হয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণকারী সংকল্পের ক্রিয়াপ্রণালীর জন্য--তবে মনে

রাখতে হবে, যে অপচয় বলা হয় তা এই দিক থেকে অপচয় হ'লেও বিশ্বপ্রকৃতির দিক থেকে অপচয় নয়; আমাদের কাছে যা অপচয় তাতে প্রকৃতির বিধানের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আমাদের দেহের সক্রিয়তাও ঐরূপ এক অস্থিরতা।

এই অস্থিরতা থেকে বোঝা যায় যে আমাদের দেহের মধ্যে যে সীমিত প্রাণ-শক্তি প্রবেশ করে বা উৎপন্ন হয় এমনকি সেটুকু পর্যন্ত ধারণ করতে আমাদের দেহ সততই অসমর্থ এবং তার ফলে এই প্রাণিক শক্তির এক সাধারণ ক্ষয় হয় আর পাওয়া যায় সুব্যবস্থিত ও সু-পরিমিত সক্রিয়তার এক সম্পূর্ণ গৌণ অংশ। উপরন্তু এই সবের পরিণাম স্বরূপ, দেহের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়ারত প্রাণশক্তিসমূহের গতিবৃত্তি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আদান প্রদান ও ভারসাম্যের ব্যাপারে এবং দেহের বাহির থেকে যেসব শক্তি--তা অপরের হ'ক অথবা পরিবেশের মধ্যে নানাভাবে সক্রিয় সাধারণ প্রাণিক শক্তির হ'ক--দেহের উপর কাজ করে তাদের সহিত দেহমধ্যস্থ শক্তিসমূহের আদানপ্রদানের ব্যাপারে সর্বদাই এমন এক অনি-শ্চিত ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য থাকে যা যে কোনো মুহূর্তে নষ্ট হওয়া সম্ভব। প্রতি বাধা, প্রতি ত্রুটি, প্রতি বাহুল্য প্রতি আঘাত থেকেই উৎপন্ন হয় বিভিন্ন অশুদ্ধতা ও বিশৃঙ্খলা। প্রকৃতিকে নিজে নিজে কাজ করতে ছেড়ে দেওয়া হ'লে, সে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সবের ব্যবস্থা ভালই করে; তবে যে মুহূর্তে মানুষের প্রমাদী মন ও সংকল্প প্রকৃতির বিভিন্ন রীতি ও তার বিভিন্ন প্রাণিক সহজসংস্কার ও বোধিতে হস্তক্ষেপ করে--বিশেষতঃ যখন তারা মিথ্যা বা কৃত্রিম রীতি সৃষ্টি করে তখন আরো বেশী অনিশ্চিত এক শৃঙ্খলা ও প্রায় নিত্য অব্যবস্থাই সত্তার সাধারণ অবস্থা হ'য়ে পড়ে। তথাপি এই হস্তক্ষেপ অনিবার্য, কারণ মানুষের জীবন শুধু তার অন্তঃস্থ প্রাণিক প্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, তার জীবন আরো মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য যেগুলি প্রকৃতি তার প্রথম ভারসাম্যের ব্যাপারে চিন্তা করেনি আর যেগুলির সহিত তার বিভিন্ন কর্মপ্রণালীকে মিল করতে হয় কষ্ট করে। সুতরাং এক মহত্তর স্থিতি বা ক্রিয়ার জন্য প্রথম আবশ্যক হ'ল এই বিশৃঙ্খল অস্থিরতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া, সক্রিয়তাকে শান্ত ক'রে নিয়-ন্ত্রিত করা। হঠযোগীর কাজ হ'ল দেহ ও প্রাণশক্তির স্থিতি ও ক্রিয়ার এক অস্বাভাবিক ভঙ্গী আনা, তবে এই অস্বাভাবিকতার লক্ষ্য আরো বেশী বিশৃঙ্খলা নয়, ইহার লক্ষ্য উৎকর্ষ ও আত্ম-কর্তৃত্ব।

আসনের নিশ্চলতার প্রথম উদ্দেশ্য হ'ল দেহের উপর আরোপিত অস্থিরতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া এবং তাকে বাধ্য করা যাতে দেহ প্রাণিক-শক্তিকে ক্ষয় ও অপচয় না ক'রে তা ধারণ ক'রে রাখে। আসন-অভ্যাসের যে অনুভূতি তা নিশ্চেষ্টতাজনিত শক্তির সমাপ্তি ও হ্রাস নয় বরং বেশী পরিমাণে শক্তির বৃদ্ধি, অন্তর্বর্ষণ ও চলাচল। অতিরিক্ত শক্তিকে কাজের দ্বারা বাহিরে ব্যয় করাতে অভ্যস্ত দেহের পক্ষে এই বৃদ্ধি ও এই রক্ষিত আন্তর ক্রিয়া সহ্য করা প্রথমে কষ্টকর হয়, আর তার কষ্ট বোঝা যায় তার প্রচণ্ড কম্পন থেকে; পরে দেহ নিজেকে অভ্যস্ত করে নেয় এবং যখন আসনটি আয়ত্ত হয় তখন ইহা দেখে যে আসনের ভঙ্গীটি গোড়াতে যতই তার কাছে দুরূহ বা অস্বাভাবিক হ'ক না কেন, শেষে ইহা বসার বা শোয়ার সবচেয়ে আরামপ্রদ ভঙ্গীর মতোই আরামপ্রদ। পরে যত পরিমাণেরই প্রাণিক শক্তি তার উপর প্রয়োগ করা হ'ক না কেন, ইহা উত্তরোত্তর তা ধারণ করতে সমর্থ হয়; তখন আর তার এই শক্তিকে কাজের মধ্যে বাহিরে নিক্ষেপ করার দরকার হয় না, আর এই বৃদ্ধির পরিমাণ এত বিশাল যে মনে হয় যেন ইহার সীমা নেই; ফলে সিদ্ধ হঠযোগীর দেহ সহিষ্ণুতা, বল, শক্তির অক্লান্ত প্রয়োগের এমন সব অদ্ভুত ক্রিয়ায় সমর্থ হয় যেগুলি মানুষের স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট দৈহিক শক্তিও করতে অক্ষম। কারণ তার দেহ এই শক্তিকে শুধু যে ধারণ ও রক্ষা করতে সক্ষম হয় তা নয়, ইহা দেহ-সংস্থানের উপর তার সম্পূর্ণ অধিকার ও ইহার মধ্য দিয়ে তার আরো সম্পূর্ণ ক্রিয়া সহ্য করতেও সক্ষম হয়। যে দেহ শান্ত, নিষ্ক্রিয় এবং ধারকসামর্থ্য ও ধৃতসামর্থ্যের অস্থির ভারসাম্যমুক্ত তাকে প্রাণশক্তি এইভাবে অধিকার ক'রে, তার মধ্যে এক শক্তিশালী একীভূত গতিবৃত্তিতে কাজ ক'রে আরো ক্ষমতাশালী ও কার্যকরী হ'য়ে ওঠে। বস্তুতঃ মনে হয় যেন দেহ প্রাণ-শক্তিকে ধারণ, অধিকার বা ব্যবহার করে না, বরং যেন প্রাণশক্তিই দেহকে ধারণ, অধিকার ও ব্যবহার করে—ঠিক যেমন মনে হয় যে অস্থির সক্রিয় মনের ভিতর যা কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি আসে মন তাকে আয়ত্ত ক'রে অনিয়মিত ও অপূর্ণভাবে ব্যবহার করে অথচ মন শান্ত হ'লে, আধ্যাত্মিক শক্তিই তাকে ধরে, আয়ত্ত ও ব্যবহার করে।

দেহ এইভাবে নিজ থেকে মুক্ত হ'য়ে, নিজেরই অনেক বিশৃঙ্খলা ও অনাচার থেকে শুদ্ধ হ'য়ে অংশতঃ আসনের দ্বারা এবং সম্পূর্ণভাবে আসন ও প্রাণায়ামের যুক্ত ক্রিয়ার দ্বারা এক সিদ্ধ যন্ত্র হ'য়ে ওঠে। তার শীঘ্রই

ক্লান্ত হবার প্রবণতা দূর হয়; স্বাস্থ্য-সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় প্রভূত পরিমাণে এবং ক্ষয়, জরা ও মৃত্যুর প্রবণতাও স্তব্ধ হয়। এমনকি সাধারণ আয়ু-সীমার ঊর্ধ্বে পরিণত বয়সেও হঠযোগী দেহের মধ্যে প্রাণের অক্ষুণ্ণ বীর্য, স্বাস্থ্য ও যৌবন রক্ষা করে; এমনকি শারীরিক যৌবনের বাহ্য রূপও ইহা আরো বেশী দিন রক্ষা করে। দীর্ঘজীবন লাভের সামর্থ্য তার বৃদ্ধি পায়, আর তার দৃষ্টিকোণ থেকে, দেহ যখন এক যন্ত্র তখন ইহাকে দীর্ঘ দিন অক্ষুণ্ণ ও ততদিন পর্যন্ত হানিকর দোষ থেকে মুক্ত রাখার গুরুত্ব কম নয়। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে হঠযোগে নানা প্রকারের আসন আছে, তাদের সংখ্যাও প্রচুর, মোট সংখ্যা আশীর ঊর্ধ্বে হবে আর তাদের মধ্যে কতক-গুলি অত্যন্ত জটিল ও দুঃসাধ্য। আসনগুলি নানাবিধ হওয়ার সুবিধা হ'ল পূর্বে যেসব ফলের কথা বলা হ'য়েছে সেগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আর দেহের ব্যবহারে আরো বেশী স্বাধীনতা ও নমনীয়তা পাওয়া যায়; তাছাড়া আরো যা সুবিধা হয় তা এই যে ইহাতে দেহমধ্যস্থ শারীরিক শক্তি ও ইহার সহিত সম্পৃক্ত পৃথ্বীশক্তি---এ দু'য়ের সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। তার একটি ফল এই যে পৃথ্বীশক্তির গুরুভার লঘু হয়; তার প্রথম নিদর্শন, ক্লান্তি জয়, আর শেষ নিদর্শন---"উত্থাপনের" ঘটনা, অর্থাৎ আংশিক উত্থান। স্থূল শরীর সূক্ষ্মশরীরের কিছু স্বভাব পেতে এবং প্রাণশক্তির সহিত ইহার বিভিন্ন সম্পর্কেরও কিছু অধিগত করতে শুরু করে। তাহাই এমন এক মহত্তর শক্তিতে পরিণত হয় যা আরো প্রবলভাবে অনুভব করা যায় অথচ যা আরো লঘু, স্বচ্ছন্দ ও সূক্ষ্ম ভৌতিক ক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ হয়; এইসব শক্তিরই চরম পরিণতি হ'ল হঠযোগের বিভিন্ন "সিদ্ধি" অর্থাৎ "গরিমা", "মহিমা", "অনিমা" ও "লঘিমা"র অসামান্য সামর্থ্য। তাছাড়া, হৃৎ-স্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন ক্রিয়া ও প্রবৃত্তির উপর প্রাণ আর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে না। শেষ পর্যন্ত এই সবকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করা সম্ভব, আর তাতে প্রাণের সমাপ্তি বা ক্ষতি হয় না।

কিন্তু আসন ও প্রাণায়ামের সুষ্ঠু সম্পাদনের এই যে সব ফল তা শুধু এক মূলগত শারীরিক সামর্থ্য ও স্বাধীনতা। হঠযোগের মহত্তর ব্যবহার আরো ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভর করে প্রাণায়ামের উপর। আসনের বেশী কাজ হ'ল সরাসরিভাবে শারীরিক সমগ্রতার অধিকতর জড়ীয় অংশের সহিত, যদিও এই কাজেও তার অপরটির সাহায্যের প্রয়োজন হয়; প্রাণায়াম শুরু করে আসন-লব্ধ শারীরিক নিশ্চলতা ও আত্ম-ধারণ থেকে আর তার বেশী

কাজ হ'ল সরাসরিভাবে সূক্ষ্মতর প্রাণিক অংশ, নাড়ীতন্ত্রের (স্নায়ুমণ্ডলীর) সহিত। এই কাজ করা হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের নানাবিধ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা; নিঃশ্বাসের (রেচক) ও প্রশ্বাসের (পূরক) সমতা থেকে আরম্ভ ক'রে উভয়েরই অতীব ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোময় নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত আর এসবের মাঝে থাকে শ্বাসের অন্তর্ধারণ (কুম্ভক)। এই যে শ্বাসের অন্তর্ধারণ যা প্রথমে করা হয় কিছু কষ্ট করে তা শেষ পর্যন্ত তার সতত স্বাভাবিক ক্রিয়া শ্বাস নেওয়া ও ফেলার মতোই সহজ হয় ও স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু প্রাণায়ামের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলি হ'ল নাড়ীতন্ত্রকে শুদ্ধ করা, সকল নাড়ীর (স্নায়ুর) মধ্য দিয়ে প্রাণশক্তিকে সঞ্চালন করা যেন কোনো বাধা, বিশৃঙ্খলা বা অনাচার না ঘটে এবং ইহার ব্যাপ্রিয়ার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা, যাতে দেহবাসী পুরুষের মন ও সংকল্প আর পূর্বের মতো দেহ বা প্রাণ বা তাদের সম্মিলিত সব সংকীর্ণতার অধীন না হয়। নাড়ীতন্ত্রের এক শুদ্ধকরা ও নির্বাধ অবস্থা আনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের এইসব ব্যায়ামের সামর্থ্য আমাদের শারীর বিদ্যার এক পরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য। দেহ-সংস্থানকে নির্মল করার বিষয়েও ইহা এক সহায় তবে প্রথমে ইহা তার সকল প্রণালী ও দ্বারের উপর সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় না; সেজন্য হঠযোগী তাদের সব সঞ্চিত মলিনতাকে নিয়মিতভাবে অপসারণ করার জন্য অতিরিক্ত স্থূল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। এইসব ব্যায়াম আসনের সহিত—এমনকি বিশেষ বিশেষ আসন বিশেষ বিশেষ ব্যাধি নাশের পক্ষে কার্যকরী হয়—ও প্রাণায়ামের সহিত যুক্ত হলে, দেহের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু প্রধান লাভ এই যে এই শুদ্ধি করা হ'লে, প্রাণশক্তিকে যে কোনো স্থানে, দেহের যে কোনো অংশে, এবং যে কোনো প্রকারেই অথবা তার গতির যে কোনো ছন্দেই চালনা করা সম্ভব হবে।

ফুসফুসের ভিতরে ও বাহিরে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজটিই আমাদের শরীর সংস্থানের মধ্যে প্রাণের, জীবনবায়ুর একমাত্র সর্বাপেক্ষা ইন্দ্রিয়গোচর, বাহ্য ও ধারণযোগ্য গতিবৃত্তি। যোগবিদ্যানুযায়ী প্রাণের গতিবৃত্তি পাঁচ প্রকারের; ইহা সমগ্র নাড়ীতন্ত্রকে ও সমগ্র জড়দেহকে ব্যেপে থাকে এবং তার সকল প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। হঠযোগী শ্বাসপ্রশ্বাসের বাহ্য ক্রিয়াটি আয়ত্ত করে, যেন ইহা একপ্রকার চাবিকাঠি যার সাহায্যে প্রাণের এইসব পাঁচটি সামর্থ্যের নিয়ন্ত্রণ তার কাছে সুলভ হয়। সে তাদের সব আন্তর ক্রিয়ার কথা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ভাবে জানতে পারে, এবং মানসিকভাবে সচেতন হয় তার সমগ্র

শারীরিক জীবন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে। সে তার দেহসংস্থানের সকল নাড়ীর অর্থাৎ স্নায়ুপ্রণালীর মধ্য দিয়ে প্রাণ চালনা করতে সক্ষম হয়। নাড়ীতন্ত্রের ষট্‌চক্রের মধ্যে অর্থাৎ স্নায়ুগ্রন্থিময় কেন্দ্রের মধ্যে প্রাণের যে ক্রিয়া তা-ও সে জানতে পারে এবং প্রত্যেকটির মধ্যে এই ক্রিয়াকে সে তার বর্তমান সীমিত, অভ্যাসগত ও যান্ত্রিক কর্মপ্রণালী ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়। সংক্ষেপে বলা যায় সে দেহমধ্যস্থ প্রাণের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে—যেমন ইহার স্থূলতম ভৌতিক বিষয়গুলিতে, তেমন ইহার সূক্ষ্মতম নাড়ীবিষয়ে এমনকি তাতেও যা বর্তমানে ইচ্ছা-প্রণোদিত নয় এবং আমাদের সাক্ষীস্বরূপ চেতনা ও সংকল্পের নাগালের বাইরে। এইভাবে দেহ ও প্রাণের শুদ্ধীকরণের উপর অবলম্বন করে তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছন্দ ও কার্যকরী ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়, আর ইহাই হঠযোগের উচ্চতর লক্ষ্যসমূহের ভিত্তি স্বরূপ।

কিন্তু তবু এই সবই এক ভিত্তি মাত্র—অর্থাৎ হঠযোগের দ্বারা ব্যবহৃত দুই সাধনের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী ভৌতিক অবস্থা। বিভিন্ন সূক্ষ্ম মানসিক ও আধ্যাত্মিক ফলের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উদ্দেশে এই সব প্রয়োগ করা সম্ভব তা এখনো বাকী আছে। দেহ ও মন ও চিৎ-পুরুষের মধ্যে এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে যে সংযোগ হঠযোগপ্রণালীর ভিত্তি তারই উপর ইহা নির্ভর করে। এইস্থানে ইহা রাজযোগের সহিত একই পথে আসে, আর এক বিশেষ বিন্দুতে উপনীত হ'লে একটি থেকে অপরটিতে সংক্রমণ সম্ভব হয়।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

রাজযোগ

হঠযোগীর জন্য যোগের সকল বন্ধ দুয়ারের চাবিকাঠি যেমন দেহ ও প্রাণ, তেমন রাজযোগে চাবিকাঠি হ'ল মন। কিন্তু যেহেতু দু'য়েতেই স্বীকার করা হয় যে দেহ ও প্রাণের উপর মন নির্ভরশীল--হঠযোগে বলা হয় যে মনের এই নির্ভরতা সম্পূর্ণ, আর প্রচলিত রাজযোগে বলা হয় যে ইহা আংশিক--সেহেতু এই উভয়শাস্ত্রেই আসন ও প্রাণায়ামের অনুশীলন অন্তর্গত; তবে একটিতে এই দুই প্রক্রিয়াই সমগ্র ক্ষেত্র অধিকার করে, আর অপরটিতে প্রতিটি একটি সরল প্রণালীতে নিবদ্ধ থাকে, এবং তাদের যুক্তভাবে ব্যবহার করা হয় মাত্র এক সীমিত ও মধ্যবর্তী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমরা সহজেই দেখতে পারি যে যদিও মানব তার সত্তায় এক দেহধারী পুরুষ, তবু সে তার পার্থিব প্রকৃতিতে কত বেশী পরিমাণে অন্নময় ও প্রাণময় সত্তা এবং কেমন, অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে, তার সব মানসিক বৃত্তি সম্পূর্ণ তার দেহ ও নাড়ীতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। এমনকি কিছু সময় আধুনিক প্রাকৃত বিজ্ঞান ও মনোবিদ্যার মত ছিল যে এই নির্ভরতা বাস্তবিকই এক তাদাত্ম্য; তারা এই কথা প্রতিপন্ন ক'রতে চেষ্টা ক'রেছে যে মন বা পুরুষ ব'লে পৃথক সত্তা কিছু নেই এবং সকল মানসিক বৃত্তিই বস্তুতঃ বিভিন্ন শারীরিক প্রবৃত্তি। এই অযৌক্তিক প্রকল্পের কথা বাদ দিলেও, এমনকি অন্যদিকেও এই নির্ভরতাকে এত বেশী বড় করা হ'য়েছে যে মনে করা হয় যে ইহা পুরোপুরি এক অপরিহার্য সর্ত আর মনের দ্বারা প্রাণিক ও দৈহিক প্রবৃত্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণের বা এইসব থেকে মনের নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সামর্থ্যের কথাকে বহুদিন এক প্রমাদ বা মনের এক রুগ্ন অবস্থা বা মতিভ্রম ব'লে গণ্য করা হ'য়েছে। সুতরাং মনের ঐ নির্ভরতাকে অখণ্ডনীয় বলেই স্বীকার করা হয়, আর প্রাকৃত বিজ্ঞান এই নির্ভরতার আসল চাবিকাঠি পায়ও না, পাবার চেষ্টাও করে না; এবং সেজন্য আমাদের জন্য বিমুক্তি ও কর্তৃত্বের কোনো রহস্য আবিষ্কারেও অক্ষম।

যোগের মনো-ভৌতিক বিজ্ঞান এই ভুল করে না। ইহা চাবিকাঠি পাবার চেষ্টা করে, তা খুঁজে পায় এবং বিমুক্তি সাধনে সক্ষম হয়; কারণ

ইহা পশ্চাতের সেই সূক্ষ্ম মানসিক বা মানসিক দেহের কথা বিবেচনা করে যার একপ্রকার স্থূল আকারের প্রতিকৃতি হ'ল ভৌতিক শরীর এবং তার দ্বারা ভৌতিক শরীরের এমন সব বিভিন্ন রহস্যের জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় যেগুলি কেবলমাত্র ভৌতিক অনুসন্ধানে জানা যায় না। এই যে মানসিক বা সূক্ষ্ম মানসিক দেহকে অন্তঃপুরুষ এমন কি মৃত্যুর পরেও রাখে তার মধ্যে তার নিজের সূক্ষ্ম প্রকৃতি ও ধাতুর অনুরূপ এক সূক্ষ্ম প্রাণিক শক্তিও আছে --কারণ যেখানেই কোনো প্রকারের প্রাণ আছে সেখানেই তার কার্যোপ-যোগী প্রাণিক ক্রিয়া-শক্তি ও ধাতু থাকতে বাধ্য--আর এই সূক্ষ্ম প্রাণিক শক্তিকে চালনা করা হয় 'নাড়ী' নামক বহুসংখ্যক প্রণালীর এক সংস্থানের মধ্য দিয়ে--ইহাই চৈত্য শরীরের সূক্ষ্ম স্নায়বিক গঠন; এই নাড়ীগুলিকে ছয়টি (অথবা প্রকৃতই সাতটি) কেন্দ্রে একত্র করা হয়; ইহাদের পারি-ভাষিক সংজ্ঞা পদ্ম বা চক্র; ইহারা এক আরোহী ক্রমপর্যায়ে ঊর্ধ্বে শিখর-দেশে ওঠে যেখানে আছে সহস্রদল পদ্ম যা থেকে এই সব মানসিক ও প্রাণিক ক্রিয়া-শক্তি প্রবাহিত হয়। এই সব পদ্মের প্রতিটিই তার নিজের বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক সামর্থ্য ক্রিয়া-শক্তি ও কার্যাবলীর পর্যায়ের কেন্দ্র ও কোষাগার--এক একটি পর্য্যায় আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বের এক একটি লোকের অনুরূপ--আর বাহিরে নিঃসৃত হ'য়ে তারা বিভিন্ন নাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় প্রাণিক শক্তিসমূহের স্রোতের সহিত মিলিত হয়ে ফিরে আসে।

চৈত্যশরীরের এই ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা ভৌতিক শরীরে আছে--ইহার মেরুস্তম্ভটি যেন একটি দণ্ড এবং নাড়ীগ্রন্থির কেন্দ্রগুলি যেন বিভিন্ন চক্র; এই চক্রগুলির নিম্নতমটি স্তম্ভের তলদেশে সংযুক্ত এবং সেখান থেকে চক্রগুলি উঠেছে মস্তিষ্ক পর্যন্ত আর শেষ হয় তাদের শিখর "ব্রহ্ম-রন্ধ্রে" বা করোটির শীর্ষে অবস্থিত। কিন্তু দেহপ্রধান মানবের মাঝে এই চক্র বা পদ্মগুলি বন্ধ থাকে অথবা শুধু আংশিক ভাবে খোলা থাকে; তার ফল এই যে শুধু সেই সব সামর্থ্য এবং শুধু সেই পরিমাণে তার মধ্যে সক্রিয় যা তার সাধারণ স্থূল জীবনের পক্ষে পর্যাপ্ত, আর মন ও অন্তঃ-পুরুষ শুধু সেই পরিমাণে কাজ করে যা ঐ জীবনের প্রয়োজনের সহিত সমতাপন্ন হবে। যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, দেহধারী পুরুষ যে কেন দৈহিক ও স্নায়বিক জীবনের উপর এত নির্ভরশীল মনে হয় তার আসল কারণ ইহাই--যদিও এই নির্ভরতা যতখানি মনে হয় তত সম্পূর্ণ বা তত

প্রকৃত নয়। অন্তঃপুরুষের সমগ্র ক্রিয়া-শক্তি স্থূল দেহ ও প্রাণের মধ্যে বিলসিত হয় না, মনের গূঢ় সব সামর্থ্যও ইহার মধ্যে জাগ্রত নয়, দৈহিক ও স্নায়বিক ক্রিয়া-শক্তিগুলিরই আধিপত্য বেশী। কিন্তু সকল সময়ই পরমা ক্রিয়াশক্তি সেখানে অবস্থিত, তবে সুপ্ত অবস্থায় বলা হয়, ইহা যেন সাপের মতো কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় নিদ্রিত রয়েছে,--সেজন্য ইহাকে "কুণ্ডলিনী শক্তি" বলা হয়--আর ঐভাবে ইহা থাকে নিম্নতম চক্রে, "মূলাধারে"। যখন প্রাণায়ামের দ্বারা উচ্চ ও নিম্ন প্রাণের ধারার বিভাজন বিলীন হয়, তখন এই কুণ্ডলিনী আঘাত পেয়ে জেগে ওঠে, ইহা নিজের কুণ্ডলী খুলে এক অগ্নিময় সর্পের মতো উপরে উঠতে শুরু করে আর ওঠবার পথে প্রত্যেক পদ্মটি বিদীর্ণ করে উঠতে থাকে যতক্ষণ না শক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্যে মিলনের গভীর সমাধিতে পুরুষের সাক্ষাৎ পায়।

প্রতীকের ভাষা কম ক'রে, আরো দার্শনিক ভাষায়---যদিও এই ভাষা হয়ত কম গভীর--ইহার অর্থ এই যে আমাদের সত্তার আসল ক্রিয়া-শক্তি সুপ্ত ও নিশ্চেতন থাকে আমাদের প্রাণিক সংস্থানের গভীর প্রদেশসমূহে আর তা জেগে ওঠে প্রাণায়ামের অনুশীলন দ্বারা। ইহার প্রসরণে, ইহা আমাদের মনস্তাত্ত্বিক সত্তার সকল কেন্দ্রগুলি উন্মুক্ত করে; এই সব কেন্দ্রেই অবস্থান করে সেই তত্ত্বের সব সামর্থ্য ও চেতনা যাকে হয়ত এখন বলা যাবে আমাদের অধিচেতন আত্মা; সুতরাং যেমন যেমন সামর্থ্য ও চেতনার এক একটি কেন্দ্র উন্মুক্ত হয়, তেমন তেমন আমরা ক্রমিক মনস্তাত্ত্বিক লোকের মধ্যে প্রবেশ লাভ করি এবং তাদের অনুরূপ সত্তার বিভিন্ন জগৎ অথবা বিশ্ব অবস্থার সহিত নিজেদের সংযুক্ত করতে সমর্থ হই; তখন আমাদের মধ্যে বিকশিত হয় সকল চৈত্য সামর্থ্য যেগুলি স্থূল মানবের পক্ষে অস্বাভাবিক, কিন্তু অন্তঃপুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক। পরিশেষে উৎক্রান্তির চরম সীমায় এই ঊর্ধ্বগামী ও প্রসার্যমাণ ক্রিয়াশক্তি সেই অতিচেতন আত্মার সাক্ষাৎ পায় যা আমাদের ভৌতিক ও মানসিক অস্তিত্বের পশ্চাতে ও ঊর্ধ্বে গূঢ়ভাবে আসীন থাকে; এই সাক্ষাতের ফলে মিলনের এক গভীর সমাধি আসে যাতে আমাদের জাগ্রত চেতনা লীন হ'য়ে যায় অতিচেতনের মধ্যে। এইভাবে ত্রুটিহীন ও অক্লান্ত প্রাণায়াম-অভ্যাসের দ্বারা হঠযোগী তার আপন পথে সেই সব চৈত্য ও আধ্যাত্মিক ফল পায় যেগুলির জন্য অন্য যোগ সাধনা করে আরো সরাসরি সব সূক্ষ্ম-মানসিক ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতির মাধ্যমে। এই প্রাণায়ামের সহিত যে একটি মাত্র মানসিক সাহায্য সে যোগ করে

তা হ'ল কোনো মন্ত্র, পবিত্র অক্ষর, নাম বা গুহ্য সূত্রের ব্যবহার; ইহা সকল ভারতীয় যোগসাধনাতেই ব্যবহার করা হয় ও সেসবে ইহার গুরুত্বও সমধিক। মন্ত্র, ষট্চক্র ও কুণ্ডলিনী শক্তির সামর্থ্যের এই যে রহস্য তা সেই সকল জটিল মনোভৌতিক বিদ্যা ও অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান সত্য যাদের সম্বন্ধে তান্ত্রিক দর্শন এক যুক্তিপূর্ণ বিবরণ ও পদ্ধতিসমূহের সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ সার সংগ্রহ আমাদের দিয়েছে বলে দাবী করে। ভারতবর্ষে যে সকল ধর্ম ও সাধনা এই মনোভৌতিক পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে তারা তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য অল্পবিস্তর ইহারই উপর নির্ভর করে।

হঠযোগের মতো রাজযোগও প্রাণায়াম ব্যবহার করে এবং তা করে ঐসব একই প্রধান প্রধান চৈত্য উদ্দেশ্যের জন্য, তবে ইহার সমগ্র তত্ত্ব বিষয়ে ইহা সূক্ষ্ম মানসিক সাধনা হওয়ায়, ইহা প্রাণায়ামকে ব্যবহার করে তার অনুষ্ঠানশ্রেণীর শুধু এক পর্যায় হিসাবে, এবং তা-ও করে অতীব সীমিত মাত্রায়, তিনটি বা চারটি বড় উপকারিতার জন্য। আসন ও প্রাণায়াম নিয়ে ইহা শুরু করে না, বরং ইহা প্রথমে জোর দেয় মানসিকতার নৈতিক শুদ্ধির জন্য। এই প্রাথমিক সাধনার গুরুত্ব অসীম, ইহা না হ'লে রাজযোগের অবশিষ্ট সাধনপথ কণ্টকর, দূষিত এবং অপ্রত্যাশিত মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক বিপদে পূর্ণ হওয়া সম্ভব।[১] প্রচলিত সাধনপন্থায়, এই নৈতিক শুদ্ধিসাধনকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়---পাঁচটি "যম" ও পাঁচটি "নিয়ম"। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আছে আচরণে নৈতিক আত্ম-সংযমের বিধিসমূহ যেমন, সত্যকথন, ক্ষতি বা হত্যা করা থেকে, চুরির কাজ থেকে নিবৃত্তি, প্রভৃতি (সত্য, অহিংসা, অস্তেয়); কিন্তু বস্তুতঃ এই সবকে মনে করা চাই নৈতিক আত্ম-সংযম ও শুদ্ধতার সাধারণ প্রয়োজনের কতকগুলি প্রধান লক্ষণমাত্র। আরো ব্যাপক অর্থে যমের অর্থ যে কোনো আত্ম-সংযম যার দ্বারা মানবের অন্তঃস্থ রাজসিক অহং-ভাব ও ইহার বিভিন্ন প্রচণ্ড আবেগ ও কামনা জয় করে শান্ত ও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হ'ল নৈতিক শান্তভাব, প্রচণ্ড আবেগশূন্যতা সৃষ্টি করা, এবং এইভাবে রাজসিক মানবের

১ আধুনিক ভারতে কোনো কোনো ব্যক্তি যোগে আকৃষ্ট হ'য়ে এই বিষয়ে অতি অল্প-পরিচিত পুস্তক বা ব্যক্তি থেকে, ইহার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জেনে প্রায়ই সোজা রাজযোগের প্রাণায়াম অবলম্বন করে, কিন্তু প্রায়শঃই ইহার ফল দুঃখময়। এই পথে ভুল করার ঝুঁকি নিতে পারে শুধু অতীব দৃঢ়চিত্ত পুরুষ।

মাঝে অহং-ভাবের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করা। ঠিক সেইরূপ নিয়মের অর্থ বিভিন্ন নিয়মিত অনুষ্ঠানের দ্বারা মনের শিক্ষা; এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল ভাগবত সত্তার ধ্যান, আর তাদের উদ্দেশ্য হ'ল সাত্ত্বিক শান্তভাব, শুদ্ধতা ও একাগ্রতার জন্য যোগ্যতা সৃষ্টি করা; আর ইহাদেরই উপর যোগের বাকীসবের দৃঢ় সাধনা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

তবেই অর্থাৎ এই ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হওয়ার পর আসন ও প্রাণায়ামের দরকার হয় এবং তখনই ইহাদের কাছ থেকে সুষ্ঠু ফল পাওয়া সম্ভব। মনের ও নৈতিক সত্তার সংযম নিজে শুধু আমাদের সাধারণ চেতনাকে সঠিক প্রাথমিক অবস্থায় নিয়ে আসে: যোগের সব মহত্তর লক্ষ্যের জন্য পরতর চৈত্যপুরুষের যে বিকাশ বা আবির্ভাব প্রয়োজনীয় তা ইহার দ্বারা সাধিত হয় না। এই আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজন হ'ল মানসিক সত্তার সহিত প্রাণিক ও ভৌতিক দেহের যে বর্তমান গ্রন্থি তা শিথিল করা এবং মহত্তর চৈত্য পুরুষের মধ্য দিয়ে অতিচেতন পুরুষের সহিত মিলনে উত্তরণ করার পথ নির্বিঘ্ন করা। ইহার উপায় হ'ল প্রাণায়াম। রাজযোগে যে আসন ব্যবহার করা হয় তা শুধু তার সবচেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গীতে অর্থাৎ সেই ভঙ্গীতে যা দেহ স্বভাবতঃ গ্রহণ করে যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটিয়ে নিয়ে বসে থাকা হয়, তবে ইহাতে পিঠ ও মাথা নিখুঁৎভাবে খাড়া ও সরলরেখায় রাখা চাই যাতে মেরুদণ্ড না বাঁকে। স্পষ্টতঃই এই শেষের বিধিটি ষট্‌চক্র এবং "মূলাধার" ও "ব্রহ্মরন্ধ্রের" মধ্যে প্রাণিক শক্তি চলাচলের তথ্যের সহিত সংযুক্ত। রাজযোগের প্রাণায়াম নাড়ীতন্ত্রকে শুদ্ধ ও নির্মল করে; ইহার দ্বারা আমরা প্রাণিক শক্তিকে দেহের মধ্য দিয়ে সমভাবে সঞ্চালন করতে ও প্রয়োজন অনুসারে আমাদের ইচ্ছামতো তাকে বিশেষ স্থানেও চালনা করতে সমর্থ হই আর এইভাবে আমরা সমর্থ হই দেহের ও প্রাণ-সত্তার অটুট স্বাস্থ্য ও নীরোগ অবস্থা রক্ষা করতে; দেহের মধ্যে প্রাণিকশক্তির পঞ্চ অভ্যস্ত ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণও ইহা আমাদের দেয়, আবার যেসব অভ্যস্ত বিভাজনের দ্বারা শুধু প্রাণশক্তির সাধারণ যান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি সাধারণ জীবনে সম্ভব হয় তাদেরও ইহা সেই সাথে ভেঙে দেয়। মনোভৌতিক সংস্থানের ছয়টি কেন্দ্র ইহা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে এবং প্রত্যেক আরোহী লোকের উপর জাগ্রত চেতনার মধ্যে নিয়ে আসে প্রবুদ্ধ শক্তির সামর্থ্য এবং অনাবৃত পুরুষের আলোক। ইহার সহিত মন্ত্রের ব্যবহার যুক্ত হওয়ায় ইহা দিব্য ক্রিয়া-শক্তিকে দেহের মধ্যে নিয়ে আসে এবং রাজযোগ

পদ্ধতির মুকুট স্বরূপ সমাধির মধ্যে একাগ্রতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে এবং তার সাধন সুগম করে।

রাজযোগের একাগ্রতাকে চারিটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়; ইহার শুরু—বাহ্য বিষয়সমূহ থেকে মন ও সব ইন্দ্রিয়—উভয়েরই প্রত্যাহারে, তার পরে আসে অপর সকল ভাবনা ও মানসিক বৃত্তি বাদ দিয়ে একাগ্রতার একটি মাত্র বিষয় ধারণ করা, তারও পরে, এই একটি বিষয়ে মনের সুদীর্ঘ তন্ময়তা (বা ধ্যান) এবং সর্বশেষে আসে চেতনার সম্পূর্ণ অন্তর্গমন যার দ্বারা ইহা সমাধির একত্বের মধ্যে সকল বহির্মুখী মানসিক বৃত্তি থেকে নিতে হয়। এই মানসিক শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হ'ল মনকে বাহ্য ও মানসিক জগৎ থেকে সরিয়ে এনে ভাগবতসত্তার সহিত মিলনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং প্রথম তিনটি পর্যায়ে কোনো মানসিক সাধন বা অবলম্বনের ব্যবহার প্রয়োজন হয় যার দ্বারা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত মন একটিমাত্র বিষয়ে নিবদ্ধ হয় আর সেই একটি বিষয় এমন কিছু হওয়া চাই যা ভগবানের ভাবনার প্রতিরূপ। সাধারণতঃ ইহা কোনো নাম বা রূপ বা মন্ত্র যার দ্বারা মননকে ঈশ্বরের অনন্য জ্ঞান বা আরাধনায় নিবদ্ধ করা যায়। ভাবনার উপর এই একাগ্রতার দ্বারা মন ভাবনা থেকে প্রবেশ করে সদ্-বস্তুর মধ্যে আর ইহার মধ্যে ইহা ডুবে যায় নীরব, তন্ময় ও এক হ'য়ে। ইহাই চিরাচরিত পন্থা। কিন্তু অন্য কিছু পন্থাও আছে যেগুলি ঐ একই রকম রাজযোগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারণ ইহারাও মনোময় ও চৈত্য সত্তাকে চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহার করে। তাদের কতকগুলির লক্ষ্য মনের অব্যবহিত তন্ময়তা অপেক্ষা বরং তার উপশম সাধনের দিকেই বেশী; এই সাধনায় মনকে শুধু নিরীক্ষণ করা হয় এবং তার যে ভ্রাম্যমাণ মননের উদ্দেশ্যহীন ছোটাছুটির অভ্যাস তা নিঃশেষ করতে দেওয়া হয় কারণ ইহা অনুভব করে যে তা থেকে সকল অনুমতি, উদ্দেশ্য ও আগ্রহ প্রত্যাহার করা হ'য়েছে; এবং অপর একটি অপেক্ষাকৃত বেশী শ্রমসাধ্য ও দ্রুত ফলপ্রসূ পদ্ধতিও নেওয়া হয় যার দ্বারা সকল বহির্মুখী মননকে বাদ দেওয়া হয় এবং মনকে বাধ্য করা হয় নিজের মধ্যে ডুবে যেতে যেখানে ইহার একান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে ইহা শুধু প্রতিফলিত করতে পারে শুদ্ধ সত্তাকে, আর না হয় প্রয়াণ করতে পারে তার অতিচেতন অস্তিত্বের মধ্যে। পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু উদ্দেশ্য ও ফল একই।

মনে হ'তে পারে যে এই হ'লেই রাজযোগের সমগ্র ক্রিয়ার ও লক্ষ্যের

সমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ ইহার ক্রিয়া হ'ল চেতনার তরঙ্গসমূহের, তার বহুবিধ বৃত্তির, "চিত্তবৃত্তির" স্তব্ধতা; ইহার জন্য প্রথমে, পঙ্কিল রাজসিক বৃত্তিগুলিকে নিরন্তর সরিয়ে তাদের পরিবর্তে শান্ত ও দীপ্ত সব সাত্ত্বিক বৃত্তি আনা হয় এবং তার পরে সকল বৃত্তিই স্তব্ধ করা হয়; আর ইহার উদ্দেশ্য হ'ল ভগবানের সহিত অন্তঃপুরুষের নীরব মিলন ও ঐক্য লাভ। বস্তুতঃ আমরা দেখি যে রাজযোগ সাধনপন্থায় গুহ্য সামর্থ্যের অনুশীলন ও ব্যবহারের মতো অপর কিছু উদ্দেশ্যও আছে যাদের মধ্যে কতকগুলি মনে হয় প্রধান উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কহীন ও এমনকি অসঙ্গত। এইসব সামর্থ্য বা সিদ্ধিকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করা হয় এই ব'লে যে ইহারা বিপজ্জনক ও বিভ্রান্তকারী, যোগীর যে একমাত্র ন্যায্য লক্ষ্য, ভগবদ্‌-মিলন তা থেকে তারা যোগীকে সরিয়ে আনে। সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হবে যে লক্ষ্যের দিকে যাবার পথে এই সব পরিহার করা উচিত; এবং একবার লক্ষ্যে উপনীত হ'লে তখন মনে হবে ইহারা তুচ্ছ ও অনাবশ্যক। কিন্তু রাজযোগ একটি চৈত্য বিদ্যা, যার মধ্যে চেতনার সকল পরতর অবস্থা এবং তাদের বিভিন্ন সামর্থ্য অন্তর্ভুক্ত; এইসবের দ্বারাই মনোময় পুরুষ উত্তরণ করে অতি-চেতনের দিকে, আবার পরমতমের সহিত তার মিলনের চরম ও শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনার দিকে। তাছাড়া, যোগী যতক্ষণ শরীরের মধ্যে থাকে ততক্ষণ সে যে সর্বদাই মানসিক নিষ্ক্রিয় ও সমাধিমগ্ন থাকে তা নয়, আর তার সত্তার পরতর লোকসমূহে যেসব বিভিন্ন সামর্থ্য ও অবস্থা তার লাভ করা সম্ভব সে সবের বিবরণ বিদ্যার সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয়।

প্রথমতঃ এই সব সামর্থ্য ও অনুভূতি প্রাণময় ও মনোময় লোকের অন্তর্ভুক্ত যেগুলি আমাদের বাস এই ভৌতিক লোকের ঊর্ধ্বে আর ইহারা সূক্ষ্মশরীরস্থ অন্তঃপুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক; স্থূলদেহের উপর নির্ভরতা যতই কমতে থাকে ততই এই সব অস্বাভাবিক ক্রিয়া সম্ভব হয় এবং এমনকি না চাইলেও সেগুলি আবির্ভূত হয়। রাজযোগ-বিদ্যার দেওয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা এই সবকে অর্জন ও দৃঢ় করা যায় এবং তখন তাদের প্রয়োগ করা না করা আমাদের ইচ্ছাধীন হয়; অথবা তাদের নিজেদেরই বিকশিত হ'তে দেওয়া যেতে পারে এবং তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে কেবল তখনই যখন তারা আসে অথবা যখন অন্তঃস্থ ভগবান আমাদের সে সব ব্যবহার করার প্রেরণা দেন; আর না হয়, এই সব স্বাভাবিকভাবে বিকশিত ও সক্রিয় হলেও, যোগের যে একমাত্র পরম লক্ষ্য তার প্রতি

একমনা ভক্তিবশে, সে সবকে ত্যাগ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, অতিমানসিক লোকসমূহের অন্তর্গত বিভিন্ন পূর্ণতর, মহত্তর সামর্থ্যও আছে যেগুলি ভগবানেরই আপন সামর্থ্য--তাঁর আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক ভাবময় সত্তায়। ইহাদিকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা দৃঢ়ভাবে বা অখণ্ডভাবে আদৌ অর্জন করা যায় না, তারা শুধু আসতে পারে ঊর্ধ্ব থেকে, আর না হয়, তারা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক হ'তে পারে যদি এবং যখন মানব মনের উজানে উত্তরণ ক'রে বাস করে আধ্যাত্মিক সত্তায়, সামর্থ্যে, চেতনায় ও ভাবনায়। তখন এইসব অস্বাভাবিক ও কষ্টলব্ধ সিদ্ধি না হ'য়ে, হয়ে ওঠে শুধু তার ক্রিয়ার নিজস্ব স্বভাব ও পদ্ধতি--অবশ্য যদি সে তখনো পূর্বের মতো প্রপঞ্চে সক্রিয় থাকে।

মোটের উপর, পূর্ণযোগের পক্ষে রাজযোগ ও হঠযোগের বিশিষ্ট পদ্ধতিগুলি কখনো কখনো উন্নতির কোনো কোনো পর্যায়ে উপকারে আসতে পারে, তবে অপরিহার্য নয়। একথা ঠিক যে তাদের প্রধান লক্ষ্যগুলি যোগের পূর্ণতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা চাই; তবে সেসবের সাধন অন্য উপায়ে সম্ভব। কারণ পূর্ণযোগের পদ্ধতিগুলি প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক হওয়া চাই, আর ভৌতিক পদ্ধতির উপর অথবা নির্দিষ্ট চৈত্য বা মনো-ভৌতিক প্রক্রিয়ার উপর বেশী পরিমাণে নির্ভর করার অর্থ উচ্চতর ক্রিয়ার পরিবর্তে নিম্নতর ক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমাদের পরে অল্প-কিছু বলার সুযোগ হবে যখন আমরা পদ্ধতিতে সমন্বয়ের সর্বশেষ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করব; এই আলোচনা করাই আমাদের বিভিন্ন যোগের বিবেচনার উদ্দেশ্য।